সাহিত্য

মাসিকপত্র ও সমালোচন।

শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি

সম্পাদিত

কলিকাতা

২।১ নং রামধন মিত্রের লেন, সাহিত্য-কার্য্যালয় হইতে
সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সাহিত্য

মাসিকপত্র ও সমালোচন।

শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি

সম্পাদিত

কলিকাতা

২।১ নং রামধন মিত্রের লেন, সাহিত্য-কার্য্যালয় হইতে
সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

৩০শ ভাগ। বৈশাখ; ১৩২৭। ১ম সংখ্যা।

সাহিত্য

মাসিকপত্র ও সমালোচন।

শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত।

লেখকগণের নাম

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ, শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীহারাধন বক্সী, শ্রীনগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীযতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীভূপতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীসতীন্দ্রনারায়ণ রায়, শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু ও সম্পাদক।

সূচী

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩।০ টাকা। এই সংখ্যার মূল্য ছয় আনা।

৩০শ ভাগ। আষাঢ় ; ১৩২৭। ৩য় সংখ্যা।

সাহিত্য

মাসিকপত্র ও সমালোচন।

শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত।

লেখকগণের নাম

শ্রীঅমৃতলাল শীল, শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ, শ্রীজীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীহরিপদ ঘোষাল; শ্রীইন্দিরা দেবী, শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীভূপতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, ও সম্পাদক।

সূচী

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩।০ টাকা। এই সংখ্যার মূল্য ছয় আনা।

৩০শ ভাগ। শ্রাবণ; ১৩২৭। ৪র্থ সংখ্যা।

সাহিত্য

মাসিকপত্র ও সমালোচন।

শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত।

লেখকগণের নাম

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ, শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীপদ্মনাথ দেবশর্ম্মা, শ্রীঅমৃতলাল শীল, শ্রীনলিনীমোহন রায় চৌধুরী, শ্রীইন্দিরা দেবী, শ্রীহারাধন বক্সী, শ্রীজীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীরাধাগোবিন্দলাল গোস্বামী, শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও সম্পাদক।

সূচী

৩০শ ভাগ। ভাদ্র ; ১৩২৭। ৫ম সংখ্যা।

সাহিত্য

মাসিকপত্র ও সমালোচন।

শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত।

লেখকগণের নাম

শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ, শ্রীহারাধন বক্সী, শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীশশধর রায়, শ্রীজীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীসতীন্দ্রনারায়ণ রায় ও সম্পাদক।

সূচী

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৷৷০ টাকা। এই সংখ্যার মূল্য ছয় আনা।

৩০শ ভাগ। আশ্বিন; ১৩২৭। ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

সাহিত্য

মাসিকপত্র ও সমালোচন।

শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত।

লেখকগণের নাম

শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক, শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ, শ্রীচন্দ্রশেখর কর বিদ্যাবিনোদ, শ্রীফণীন্দ্র-নাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত, শ্রীঅমৃতলাল শীল ও শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

সূচী

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৷৹ টাকা। এই সংখ্যার মূল্য ছয় আনা।

৩০শ ভাগ। কার্ত্তিক; ১৩২৭। ৭ম সংখ্যা।

সাহিত্য

মাসিকপত্র ও সমালোচন।

শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত।

লেখকগণের নাম

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ, শ্রীভূপতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু, শ্রীঅমৃতলাল শীল, শ্রীহৃষিকেশ সেন, শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়, ও শ্রীবিমলকান্তি মুখোপাধ্যায়।

সূচী

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩॥০ টাকা। এই সংখ্যার মূল্য ছয় আনা।

৩০শ ভাগ। অগ্রহায়ণ; ১৩২৭। ৮ম সংখ্যা।

সাহিত্য

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত।

লেখকগণের নাম।

শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীঅতুলবিহারী বক্সী, শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়,
শ্রীঅনন্তপ্রসাদ শাস্ত্রী, শ্রীরাজকুমার সেনগুপ্ত,
ও শ্রীজীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

সূচী।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩॥০]

[এই সংখ্যার মূ ছয় আনা।

৫৬নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা "তারা-প্রেস" হইতে
শ্রীশশধর ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৩০শ ভাগ।] ফাল্গুন ও চৈত্র ; ১৩২৭। [১১ ও ১২শ সংখ্যা।

সাহিত্য

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত।

লেখকগণের নাম।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, শ্রীপদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ, এম্, এ ; শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়, বিদ্যারত্ন, শ্রীগিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ, শ্রীযতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, রায় বাহাদুর, শ্রীবিমলকান্তি মুখোপাধ্যায়, শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায় ও সম্পাদক।

সূচী।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৷৷০] [এই সংখ্যার মূল্য দশ আনা।

সাহিত্য ; ৩০শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা।

সাহিত্যে স্বাস্থ্যরক্ষা।

(১) স্বাস্থ্যরক্ষা কাহাকে বলে ?

মানবদেহের সুস্থতা দুইটি জিনিসের উপর নির্ভর করে—পুষ্টিকর আহার ও নির্ম্মল বায়ু। স্বাস্থ্যবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, রোগের বীজাণু সকল আমাদের আহার্য্য দ্রব্য, পানীয় জল, বা বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়া আমাদের দেহে প্রবেশ করিয়া রোগোৎপাদন করে। কলেরার বীজ পানীয় জল বা দুগ্ধের মধ্য দিয়া শরীরে প্রবেশ করে; ক্ষয়কাশের বীজাণু ধূলিধূমাচ্ছন্ন দূষিত বায়ুর মধ্যে বাস করে, এবং নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে আমাদের দেহে প্রবেশ করে। মশা ম্যালেরিয়ার বাহন, নিতান্ত অলক্ষিত-ভাবে তাহার শুঁড় দিয়া আমাদের রক্তের সহিত তাহার প্রীতিসম্বন্ধ স্থাপন করে। আবার সম্প্রতি আর একটি রোগ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার নাম hook-worm অর্থাৎ বক্র কৃমি। ইনি মাটীর মধ্যে বাস করেন, আর আমাদের পদতলের মধ্য দিয়া অন্ত্রনালীর ভিতরে প্রবেশ করিয়া পরিপাক-শক্তির ব্যাঘাত জন্মান। এই hook-wormই নাকি বাঙ্গালীর নির্জ্জীবতার প্রধান কারণ।

যাহা হউক, এই সকল ভিন্ন ভিন্ন রোগের বীজাণু হইতে মনুষ্যদেহকে রক্ষা করা বর্ত্তমান সময়ে স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের প্রধান অনুসন্ধিৎসার বিষয় হইয়াছে। প্লেগ, বসন্ত, কলেরা প্রভৃতি কতকগুলি রোগের প্রতিষেধক বীজ আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেগুলি দ্বারা টীকা দিলে ঐ সকল রোগের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু সর্ব্বোপরি বাসস্থানের পরিচ্ছন্নতা ও নির্ম্মল বিশুদ্ধ জলবায়ু-সেবনই সর্ব্বপ্রকার রোগের প্রতিষেধক বলিয়া অবিসংবাদিত-রূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে।

শরীরের ন্যায় আমাদের মনেরও স্বাস্থ্যরক্ষার প্রয়োজন। A healthy mind in a healthy body—সুস্থ শরীরে সুস্থ মন লইয়া বাস করা সাধারণতঃ মনুষ্যত্বের আদর্শ। শরীরের ন্যায় মনের স্বাস্থ্যও পুষ্টিকর আহার্য্য এবং বিশুদ্ধ আবহাওয়ার (atmosphere) উপর নির্ভর করে। মনের সেই আহার্য্য কি? না জ্ঞানের বস্তু; আর তাহার আবহাওয়া কি? না

সমাজের পারিপার্শ্বিক অবস্থা। আমরা চক্ষুঃকর্ণাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা জ্ঞানের বস্তু সকল আহরণ করি; মন সেইগুলিকে আত্মসাৎ (assimilate) করিয়া লইয়া নিজের পুষ্টিসাধন করে। আমাদের শিক্ষাপ্রণালী সেই পরিপাকক্রিয়ার সাহায্য করে। জ্ঞানের বস্তু যেমন মনের আহার যোগাইয়া তাহার পুষ্টিসাধন করে, সেইরূপ বিশুদ্ধ পারিপার্শ্বিক অবস্থা তাহাকে রোগের হস্ত হইতে রক্ষা করে। পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিশুদ্ধতা রক্ষা করিবার জন্য সৎসঙ্গের একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু আমরা সর্ব্বদা ইচ্ছানুরূপ মানুষের সঙ্গ লাভ করিতে পারি না। আবার আমরা যে সকল লোকের সংসর্গে বাস করি, অল্প দিনের মধ্যেই তাহাদের নিকট নূতন কিছু শিক্ষালাভ করিবার উপায় থাকে না। আমাদের মন সর্ব্বদাই নূতনত্বের জন্য লালায়িত। সাহিত্য আমাদিগের সেই অভাব পূরণ করে। সৎ সাহিত্য আমাদিগের চতুঃপার্শ্বে একটা স্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়া আমাদিগের মন সুস্থ রাখে। আবার তেমনই অসৎ সাহিত্য একটা দূষিত আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়া আমাদিগের নানাপ্রকার মানসিক ব্যাধির উৎপাদন করে।

বঙ্কিমবাবু তাঁহার 'ধর্ম্মতত্ত্ব' গ্রন্থে দেখাইয়াছেন, আমাদের মানসিক স্বাস্থ্য সুপ্রবৃত্তি ও কুপ্রবৃত্তি সকলের মধ্যে সামঞ্জস্য দ্বারা রক্ষিত হইয়া থাকে। সেই সামঞ্জস্যের অভাব হইলেই মানসিক ব্যাধির উৎপত্তি হয়। সেই সামঞ্জস্য-বিধানের জন্য মনোবৃত্তি সকলের উপযুক্ত অনুশীলন (culture) আবশ্যক। আমাদের কতকগুলি মনোবৃত্তি স্বভাবতঃ অত্যন্ত সতেজ থাকে; আবার কতকগুলি স্বভাবতঃ নিস্তেজ থাকে। সাধারণতঃ আমাদের কামক্রোধাদি রজোগুণসমুদ্ভূত প্রবৃত্তিগুলি স্বভাবতঃ প্রবল, আর দয়া ক্ষমা ভক্তি প্রীতি প্রভৃতি সত্ত্বগুণসমুদ্ভূত প্রবৃত্তিগুলি ততদূর প্রবল নহে। সুতরাং মনোবৃত্তির অনুশীলনের অর্থ, যে সব কুপ্রবৃত্তি স্বভাবতঃ প্রবল, তাহাদিগের জোর কমাইয়া, সৎপ্রবৃত্তি সকলকে বর্দ্ধিত করা। তবে কোন প্রবৃত্তিকেই সমূলে উৎপাটন করা অনুশীলনের অর্থ নহে; তাহা মনুষ্যশরীরে সম্ভবপরও নহে। এরূপ দেখা যায়, অনেক সৎপ্রবৃত্তিও অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া মানসিক ব্যাধির উৎপাদন করে, যেমন অত্যধিক দয়া দ্বারা কত দাতা সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন। 'অতি দানে হতো বলিঃ'। যাহা হউক, যেমন সৎ সাহিত্য আমাদের সুপ্রবৃত্তির অনুশীলনে সাহায্য করে, সেইরূপ অসৎ সাহিত্য কুপ্রবৃত্তির অত্যধিক উত্তেজনা দ্বারা মানসিক সামঞ্জস্য নষ্ট করিয়া মানসিক ব্যাধির

উৎপাদন করে। এ বিষয়ে সমগ্র সাহিত্যের মধ্যে কাব্যের প্রভাব অত্যন্ত অধিক।

মনোবিজ্ঞানে আমাদের মানসিক বৃত্তিগুলিকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে—জ্ঞানশক্তি (knowledge), অনুভবশক্তি (feeling), আর ইচ্ছাশক্তি (willing)। জ্ঞানশক্তি বিবিধ তথ্য সংগ্রহ দ্বারা আমাদিগকে বহির্জগতে বিচরণের জন্য বর্ত্তিকাহস্তে পথ দেখাইয়া দেয়, অনুভবশক্তি সুখ-দুঃখাদির বোধ জন্মাইয়া আমাদের কর্ম্ম-প্রবৃত্তি জাগ্রত করে, আর ইচ্ছাশক্তি সেই সকল আকাঙ্ক্ষা-পরিতৃপ্তির জন্য আমাদিগকে বিষয়াভিমুখে পরিচালিত করে। আমাদের জীবনরূপ বাষ্পীয় পোতের জ্ঞান হইতেছে দিগ্‌দর্শন যন্ত্র (compass), অনুভবশক্তি হইতেছে বাষ্প (steam power), আর ইচ্ছা-শক্তি হইতেছে পরিচালনযন্ত্র (leaver), সুতরাং আমাদের প্রবৃত্তিমার্গে পরিচালনের জন্য অনুভবশক্তিরই প্রাধান্য স্বীকার করিতে হইবে। যেমন দর্শনবিজ্ঞানাদি শাস্ত্রাধ্যয়ন দ্বারা বুদ্ধিবৃত্তি পরিপুষ্ট হয়, তেমনই কাব্যানুশীলন দ্বারা আমাদের অনুভবশক্তির বিকাশ হয়। যে কারণে মানব-মনে অনুভব-শক্তির প্রাধান্য, সেই কারণে সাহিত্য-জগতে কাব্যের স্থানও অতি উচ্চ। সর্ব্বপ্রকার সাহিত্যের মধ্যে কাব্যই আমাদের সুপ্রবৃত্তির অনুশীলনে ও কুপ্রবৃত্তি দমনে অধিকতর সাহায্য করিতে পারে। আমরা কাব্যে সৃষ্ট নর নারীর সঙ্গ লাভ করিয়া জীবনের নূতনত্বের পিপাসা মিটাইতে পারি। সুতরাং আমাদের মানসিক স্বাস্থ্যবিধানে কাব্যের মূল্য অত্যন্ত অধিক।

(২) কাব্য ও আর্টের উপযোগিতা।

কাব্য কাহাকে বলে? কাব্যের একটা সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করা কঠিন। আমাদের সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ রসাত্মক বাক্যকে কাব্য নাম দিয়াছেন। কাব্য আমাদের মনে হর্ষবিষাদাদি রসের (feeling) উদ্রেক করে। কবি তাঁহার ইন্দ্রজালপ্রভাবে কতকগুলি কল্পিত নরনারীর সৃষ্টি করিয়া তাহাদের সাহায্যে আমাদের মনে রসোৎপাদন করেন। কবি তাহাদের জীবনের সাহায্যে আমাদের নিজের জীবনের ব্যাখ্যা করেন। এই জন্য এক জন বিখ্যাত ইংরেজ সমালোচক কাব্যের সংজ্ঞা দিয়াছেন—'Interpretation of life', অর্থাৎ, মানবজীবনের ব্যাখ্যা। কবি যে কৌশলে সেই ইন্দ্রজাল রচনা করেন, মিথ্যাকে সত্যের আকারে পরিণত করিয়া আমাদের মোহ উৎপাদন করেন, তাহাকে আর্ট (art) বলে। এই আর্ট হইতেছে কাব্যের প্রাণ। কিন্তু

আর্ট কাহাকে বলে, সে সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। কথিত আছে, এক জন বিখ্যাত চিত্রকর বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া একটি সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যের চিত্র আঁকিতেছিলেন। এক জন চাষা তাহা দেখিয়া বলিল, 'আপনি এই জন্য এত কষ্ট স্বীকার করিতেছেন কেন? ফটোগ্রাফের দ্বারা ত এক মুহূর্ত্তেই এই জায়গার ছবি তুলিতে পারেন।' বলা বাহুল্য, সেই চাষা আর্ট কি, তাহা বুঝিতে পারে নাই। কোনও বস্তু বা ব্যক্তির ফটোগ্রাফ তোলাই আর্ট নহে, সেই বস্তু বা ব্যক্তির ছবির সঙ্গে আর্টিষ্টের নিজের হৃদয়ের ছাপও উঠা চাই। যিনি তাহা পারেন, তিনিই প্রকৃত আর্টিষ্ট, প্রকৃত কবি। কারণ, তাঁহার চিত্রে interpretation of life দেখিতে পাওয়া যায়। Lifeএর interpretation দিতে হইলে হুবহু স্বভাবের নকল করিলে চলে না ; তাহার মধ্যে যেটুকু সুন্দর, যেটুকু সহজে চোখে ধরা পড়ে, তাহা বাছিয়া বাহির করিতে হয়। আবার যে ভাব কবি অন্যের মনে প্রতিফলিত করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা তাঁহার নিজের মনে যথার্থরূপে অনুভব করা চাই। বর্ত্তমান যুগের সুপ্রসিদ্ধ মনীষী কাউণ্ট টলষ্টয় (Count Tolstoy) তাঁহার "What is Art?" নামক গ্রন্থে আর্ট সম্বন্ধে অনেক প্রকার গবেষণা করিয়া তাহার নিম্নলিখিত সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন :—

'Art is a human activity consisting in this that one man consciously or unconsciously by means of certain external signs, hands on to others feelings he has lived through and that other people are infected by those feelings and also experience them.'

অর্থাৎ, এক জনের মনে যে অনুভূতির উদ্রেক হয়, তাহা যদি তিনি কোনও বাহিরের উপায়ে অন্যের মনে সংক্রামিত করিতে পারেন, তবে তাহাই আর্ট। আর্টের এই লক্ষণ হইতে আমরা পাইতেছি—

(১) আর্টের মূল বস্তু অনুভূতির বিষয়, It is a feeling.

(২) তাহা কবি নিজে প্রথমে অনুভব করিবেন, তাঁহার মধ্যে sincerity চাই, কেবল শোনা কথা বা পড়া কথা লিখিলে আর্ট হয় না।

(৩) কবি তাহা কোনও বাহ্য উপায়ে প্রকাশ করিয়া অপরের মনে সংক্রামিত করিয়া দিবেন।

(৪) তাহা কবির দেখাদেখি অন্যেও অনুভব করিতে পারিবে। যে শিল্প-বস্তুর মধ্যে এই কয়টি লক্ষণ বিদ্যমান, তাহা কাব্য হউক, চিত্র হউক, বা প্রতিমূর্ত্তি হউক, তাহাই work of art. ইহার সঙ্গে আর্টের আরও লক্ষণ

পাইতেছি—'Art is a means of union among men, joining them together in the same feeling.' অর্থাৎ, আর্টের দ্বারা মানব-হৃদয়ের একতা সম্পাদিত হয়; অর্থাৎ, কবি-হৃদয়ের সহিত তাঁহার পাঠক-বর্গের, এবং পাঠকবর্গের মধ্যে পরস্পরের মনে একই প্রকার ভাবের উদ্রেক হয়। 'A work of art that united every one with the author and with one another would be perfect art.'

কিন্তু সেই আর্টের বস্তু কিরূপ হওয়া উচিত?

'Art unites men. Surely it is desirable that the feelings in which it unites them should be "the best and highest to which men have risen" or at least should not run contrary to our perception of what makes for the well-being of ourselves and of others. And our perception of what makes for the well-being of ourselves and others is what Tolstoy calls "our religious perception".'

অর্থাৎ, যে সকল অনুভূতি দ্বারা মানব-হৃদয়ে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও উচ্চতম ভাবের বিকাশ হইয়া আমাদিগকে উন্নতির পথে পরিচালিত করে, তাহাই আর্টের বিষয় হওয়া উচিত। Tolstoyএর মতে, 'art is a human activity, and consequently does not exist for its own sake, but is valuable or objectionable as it is serviceable or harmful to mankind.' অর্থাৎ, আর্ট কেবল আর্টের জন্য নহে—যে পরিমাণে ইহা দ্বারা মানবসমাজের উপকার বা অপকার সাধিত হয়, সেই পরিমাণে ইহা ভাল অথবা মন্দ।

যাঁহাদের মতে আর্ট কেবল আর্টের জন্যই মূল্যবান্, সমাজের উপকারিতা বা অপকারিতার সহিত ইহার কোনও সম্বন্ধ নাই, কবির উদ্দেশ্য কেবল সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি ও আনন্দদান—স্কুলমাষ্টারী করা কবির কার্য্য নহে, তাঁহারা Tolstoy-এর এই মত অবশ্য স্বীকার করিবেন না। কিন্তু আমাদের হিন্দুর দেশে, বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র, ব্যাস-বাল্মীকি প্রভৃতি সিদ্ধ মহর্ষি-শাসিত সমাজে, চিরদিনই শিল্পকলা অন্যান্য মানব-প্রচেষ্টার (human activity) ন্যায় সমাজসেবায় নিযুক্ত থাকিবে। আমাদের দেশের আলঙ্কারিকগণ কাব্যকে 'ব্রহ্মস্বাদ-সহোদর' বলিয়া কাব্যের একটা লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। Count Tolstoy যে 'religious perception'এর উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার অর্থও এই সমাজসেবা—

'The religious perception of our time, in its widest and most prac-

tical application, is the consciousness that our well-being, both material and spiritual, individual and collective, temporal and eternal, lies in the growth of brother-hood among men—in their loving harmony with one another.'

অর্থাৎ, বর্ত্তমান যুগের ধর্ম্মভাব কি? না মানুষে মানুষে প্রীতিস্থাপন ও ভ্রাতৃভাবের প্রতিষ্ঠা। তাহার দ্বারাই মানবসমাজের কল্যাণ সাধিত হয়।

যাহা হউক, লোকশিক্ষা ও সমাজের উন্নতিসাধনই যদি আর্টের প্রধান উদ্দেশ্য হয়, তবে আমাদের বর্ত্তমান যুগের বাঙ্গালা কাব্য দ্বারা সে উদ্দেশ্য কি পরিমাণে সাধিত হইতেছে, এখন তাহার বিচার করিব।

(৩) উপন্যাসে সাহিত্য ও প্রেম।

সকলেই জানেন, কাব্য সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত—দৃশ্য কাব্য অর্থাৎ নাটক পদ্যকাব্য, গদ্যকাব্য—যেমন উপন্যাস ও গল্প। ইহার মধ্যে উপন্যাস ও গল্পই এই যুগে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। উপন্যাস ও গল্পই সর্ব্বজনপ্রিয় কাব্য। তাহার প্রধান কারণ এই, এই শ্রেণীর কাব্যে আমরা নব নব নরনারীর সঙ্গ লাভ করিতে পারি, এবং তাহাদের আচরণ দেখিয়া সহজেই আমোদ পাই। আর উপন্যাসে জীবনের ব্যাখ্যা অতি সুস্পষ্ট।

বসন্তের মলয়হিল্লোল বহিলে যেমন বনস্থলী পর্য্যন্ত পল্লব-পুষ্পে শোভিত হইয়া উঠে, বড়ই সুখের বিষয়, বিগত অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে, অর্থাৎ, মাইকেলের মেঘনাদবধ কাব্য ও বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশিত হইবার পর হইতে আমাদের বঙ্গসাহিত্যে অসংখ্য কাব্য নাটক নবেলের উৎপত্তি হইয়াছে। বসন্তকালে বনস্থলীতে যতগুলি পত্র পুষ্প গজাইয়া উঠে, তাহার সবগুলিই যেমন স্থায়ী হয় না, অথবা স্থায়ী ফল প্রসব করে না, সেইরূপ এই সকল কাব্য নাটক নবেলের সবগুলিই যে স্থায়ী হইয়াছে বা হইবে, এরূপ আশা করা যায় না। বরং দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাদের অনেকগুলি অকালে ঝরিয়া পড়িয়া বিস্মৃতিসাগরে ডুবিয়া গিয়াছে। তাহার প্রধান কারণ, সেগুলিতে প্রকৃত আর্টের অভাব। আমাদের বঙ্গসাহিত্যে অনেক কবি হইয়াছেন ও হইতেছেন, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে প্রকৃত আর্টের অধিকারী কয় জন? প্রকৃত আর্ট থাকুক বা না থাকুক, আজ কাল দেখিতে পাই, অনেক বাঙ্গালী লেখকেরই নবেল-রচনার দিকে মস্ত ঝোঁক হইয়াছে। কবিতার ন্যায় চৌদ্দ অক্ষর মিলাইতে হয় না বলিয়া অনেকেই মনে করেন, নবেল লেখা খুব সহজ। আবার পাঠকপাঠিকাগণও অতি সহজে, এমন কি, ঘুমাইতে ঘুমাইতে নবেল পড়িতে

পারেন। তাহার ফলে আজ কাল প্রতি মাসে বিস্তর নবেল ও গল্পের বই প্রকাশিত হইয়া মাসিকপত্রিকা সকলের বিজ্ঞাপনস্তম্ভগুলিকে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিতেছে। যদি কেবল মাসিকপত্রিকার বিজ্ঞাপনস্তম্ভে সেগুলি নিবদ্ধ থাকিত, তবে ক্ষতি ছিল না। কিন্তু তাহাদের অধিকাংশ নবেল ও গল্পের বই আমাদের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া সেখানে যে একটা অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার (unhealthy atmosphere) সৃষ্টি করিতেছে, আমাদের সমাজের বায়ু দূষিত করিতেছে, ইহাই আমাদের প্রধান আপত্তির কারণ। যে সকল লেখকের আর্ট নাই, তাঁহাদের গ্রন্থ তত অনিষ্টকর নহে; কারণ, তাহা কেবল একটা ক্ষণস্থায়িনী উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়াই লুপ্ত হইয়া যায়। কিন্তু এ বিষয়ে যাঁহারা প্রকৃত কবি ও আর্টিষ্ট, তাঁহাদিগের গ্রন্থই বেশী অনিষ্টকর—কারণ, তাঁহারা পাঠকপাঠিকার মনে একটা অস্বাস্থ্যকর ভাব চিরস্থায়িভাবে মুদ্রিত করিয়া দিতে পারেন। বড়ই দুঃখের বিষয়, যে সকল মহাত্মা প্রকৃত ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতার অধিকারী, তাঁহারা art for art's sake—এই ধুয়া ধরিয়া সমাজের বিশেষ অনিষ্টসাধন করিতেছেন।

এ স্থলে কেহ হয় ত বলিবেন, যাঁহারা নবেল নাটক পড়েন, তাঁহারা সেগুলিকে গল্প বলিয়াই মনে করেন, এবং তাহার দ্বারা সাময়িক আমোদ উপভোগ করেন মাত্র। তাহা তাঁহাদের জীবনে কার্য্যে পরিণত করিবেন, এরূপ পাগল সংসারে কে আছে?

এরূপ পাগল যে একেবারে নাই, এ কথা বলা যায় না। এ সম্বন্ধে কবিবর সার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমার প্রমাণ। তাঁহার 'চোখের বালি'র নায়িকা বিনোদিনীর সহিত বেহারীর এইরূপ কথোপকথন হইতেছে:—

'বিহারী কহিল—"তুমি অনেক কথা বলিবার চেষ্টা করিয়াছ, এবার আমিও একটা স্পষ্ট কথা বলি। তুমি আজ যে কাণ্ডটা করিলে এবং যে কথাগুলি বলিতেছ, ইহার অধিকাংশই তুমি যে সাহিত্য পড়িয়াছ, তাহা হইতে চুরী। ইহার বারো আনাই নাটক নবেল।"

'বিনোদিনী। "নাটক!—নবেল!"

'বিহারী। "হাঁ, নাটক, নবেল! সে খুব উচ্চ নয়। তুমি মনে করিতেছ এ সমস্ত তোমার নিজের, তাহা নহে। এ সবই ছাপাখানার প্রতিধ্বনি। যদি তুমি নিতান্ত নির্ব্বোধ মূর্খ সরলা বালিকা হইতে, তাহা হইলেও তুমি সংসারের ভালবাসা হইতে বঞ্চিত হইতে না। কিন্তু নাটকের নায়িকা ষ্টেজের উপরেই শোভা পায়, ঘরে তাহাকে লইয়া চলে না।"'

নাটক নবেল পড়িয়া কোনও কোনও গৃহস্থের কুলবধূ ষ্টেজের নায়িকা হইতে পারেন, ইহা কেবল রবীন্দ্রনাথের কল্পনা নহে, কবিবর স্বর্গীয় নবীনচন্দ্র সেনও 'আমার জীবন' গ্রন্থে তাহার দুই একটি দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। তিনি রাণাঘাটে থাকিবার সময়ে এক জন স্ত্রীলোক 'কুন্দনন্দিনী' নাম স্বাক্ষর করিয়া ও বিষ খাইয়া মরিবেন এরূপ ভয় দেখাইয়া তাঁহাকে প্রেমপূর্ণ পত্র লিখিয়াছিলেন। তাঁহার 'জ্যোৎস্না' নবেলের নায়িকা ভিন্ন আর কি হইতে পারেন? 'কুন্দনন্দিনী'র স্থষ্টিকর্ত্তা স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রও ঘরে ঘরে অনেক কুন্দনন্দিনী, শৈবলিনীর সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন,—তাঁহাদের কেহ কেহ হৃদরোগে, উদ্বন্ধনে, বিষপানে অকালে জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছেন—এ কথা পূজনীয় শ্রীযুক্ত তারাকুমার কবিরত্ন মহাশয় আমাকে বলিয়াছেন, এবং এ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রও নাকি তাঁহার নিকট শেষ বয়সে অনুতাপ করিয়াছিলেন।

নাটক নবেলে বর্ণিত প্রেমের চিত্র অপরিণতবয়স্ক ও অগঠিতচরিত্র বালকবালিকাদিগের মধ্যে কতটা হলাহল ছড়াইতে পারে, ইহা দ্বারা সহজেই বুঝা যাইতেছে। আমার বোধ হয়, কলেরা, প্লেগ, বসন্তের বীজ অপেক্ষাও এই প্রেমের বীজ সমাজ-শরীরে অধিকতর মারাত্মক।

'প্রেমের বীজ' বলিলাম, শুনিয়া কেহ হাসিবেন না। পাশ্চাত্য দেশের কোনও বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি রোগের germ (বীজের) ন্যায় love-(প্রেম)-এরও একটা germ আবিষ্কার করিয়াছেন! প্রেমিক ও প্রেমিকার শরীরে নাকি সেই germ কোনও সূত্রে প্রবেশ করিলে, তাহাদিগকে পাগল করিয়া তোলে। তবে প্লেগ, বসন্ত, কলেরার germ অতি শীঘ্রই কার্য্যকরী হইয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যে শরীর ধ্বংস করে; আর এই loveএর germ অলক্ষিতভাবে শরীরে অথবা মনে প্রবেশ লাভ করিয়া অতি ধীরে মানুষকে নিস্তেজ করিয়া ফেলে। এই কারণে আমার মতে hook-wormএর সহিত এই germএর অধিকতর সাদৃশ্য আছে। আজ কাল hook-worm সম্বন্ধে গবেষণা চলিতেছে। সেই সঙ্গে সঙ্গে প্রেমের germএর গবেষণা করিলেও মন্দ হয় না। তবে আমাদের ঋষিগণ বসন্তের টীকার ন্যায় এই প্রেমরোগের প্রতিষেধক একটা টীকার আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহার নাম বাল্যবিবাহ। কিন্তু তাহাতে উপন্যাসলেখকের বড়ই মুস্কিল। বোধ হয় সকলেই জানেন, যেমন কানু ছাড়া কীর্ত্তন হয় না, সেইরূপ প্রেম না হইলে উপন্যাস হয় না। এ সম্বন্ধে বন্ধুবর শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সংপ্রতি একটি প্রবন্ধ প্রকাশ

করিয়াছেন। আমার বোধ হয় অনেকেই সেই প্রবন্ধটি পাঠ করিয়াছেন। প্রেম না হইলে উপন্যাস হয় না, বাঙ্গালী উপন্যাসলেখকের পক্ষে ইহা নিতান্ত সাংঘাতিক কথা। যে ইয়ুরোপীয় সমাজে উপন্যাস এত প্রসার লাভ করিয়াছে, সেখানে ঔপন্যাসিক প্রেমের কিছুমাত্র অভাব নাই; কারণ, সে সমাজে বাল্য-বিবাহ নাই, পূর্ব্বরাগের পরে বিবাহ হয়, আবার স্ত্রী-স্বাধীনতা থাকাতে বিবাহের পূর্ব্বে এবং পরে স্ত্রী-পুরুষের অবাধে মেলা মেশার নিয়ম প্রচলিত আছে। কিন্তু বাঙ্গালী সমাজে ইহার একান্ত অভাব।

এই কারণে বাঙ্গালী উপন্যাসলেখককে প্রেমের 'প্লট্' গঠন করিবার জন্য অত্যন্ত মাথা ঘামাইতে হয়। বর্ত্তমান সময়ে এ দেশে যুদ্ধ বিগ্রহও নাই, যে কারণে সমাজে একটা উলট-পালট হইতে পারে, এবং রাজপুত যুবক জগৎসিংহ মুসলমান নবাবের অন্তঃপুরে বন্দী হইলে সেখানে নবাবপুত্রী আয়েষা তাঁহাকে 'বন্দী আমার প্রাণেশ্বর' এই বলিয়া সম্বোধন করিতে পারেন। আবার বঙ্গদেশের ব্রাহ্মসমাজ যদিও ইংরেজ-সমাজের অনুকরণে গঠিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে ইচ্ছা করিলে, নায়ক নায়িকা খুঁজিয়া বাহির করিতে পারা যায়, কিন্তু বাধ্য হইয়া প্লটের খাতিরে মন্দ কিছু লিখিলে চোখরাঙ্গানীর ভয় আছে,—এই দীন লেখক ধ্রুবতারা লিখিয়া সেইরূপ চোখরাঙ্গানী যে না পাইয়াছেন, এরূপ নহে। তদবধি নাকে খৎ দিয়াছেন যে, ও দিকে আর প্রাণ থাকিতে ঘেঁসিব না। এমন কি, সার রবীন্দ্রনাথও 'গোরা' লিখিয়া চোখরাঙ্গানী হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন নাই। সুতরাং বাধ্য হইয়া বাঙ্গালী উপন্যাসলেখককে হিন্দু সমাজের মধ্য হইতে অন্য প্রকারে প্রেমের কল্পনা করিতে হয়। সেই প্রেম সাধারণতঃ তিন মূর্ত্তি ধারণ করে; যথা—(১) বিধবার প্রেম, (২) সধবার প্রেম, এবং (৩) বার-বনিতার প্রেম। *

ক্রমশঃ।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ।

---

* জলপাইগুড়ি সাহিত্য-সমিতির তৃতীয় ও চতুর্থ অধিবেশনে লেখক কর্ত্তৃক পঠিত।

সম্রাট্ অভ্যাবর্ত্তী।

আমরা 'বৈবস্বত মনু' প্রবন্ধে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি যে, তিনি তিনটী বিস্তীর্ণ ভূভাগের রাজা ছিলেন। ঋগ্বেদে কোথাও তাঁহাকে রাজা বা সম্রাট উপাধিতে ভূষিত দেখি না। কিন্তু শতপথ ব্রাহ্মণ, মনুসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থে তাঁহাকে রাজা উপাধি প্রদান করা হইয়াছে। মনুর পর ও অভ্যাবর্ত্তীর পুর্ব্বে এই বংশে আর কেহ সম্রাট হইয়াছিলেন কি না, ঋগ্বেদে তাহার উল্লেখ নাই। ভরদ্বাজ ঋষি একটী স্তবে পৃথু-বংশীয় চয়মান-পুত্র অভ্যাবর্ত্তীকে সম্রাট উপাধি প্রদান করিয়াছেন। ঋষি যে যজ্ঞে এই স্তব রচনা করিয়া পাঠ করেন, তাহা একটী যুদ্ধ-বিজয়ের যজ্ঞ। (১) নিম্নে সূক্তটীর প্রধান প্রধান ঋক্গুলি উদ্ধার করা গেল।

---

(১) এতৎ। ত্যৎ। তে। ইন্দ্রিয়ং। অচেতি। যেন। অবধীঃ। বরশিখস্য। শেষঃ।
বজ্রস্য। যৎ। তে। নিহতস্য। শুষ্মাৎ। স্বনাৎ। চিৎ। ইন্দ্র। পরমঃ। দদার॥—৬।২৭।৪

হে ইন্দ্র! এই সেই তোমার বীরকর্ম্ম জানাইতেছে—বরশিখের পুত্রকে যাহার দ্বারা বধ করিয়াছ। তোমার ক্ষিপ্ত বজ্রের শব্দ ও শক্তি হইতে পরম (বা শ্রেষ্ঠ বরশিখপুত্র) বিদীর্ণ হইয়াছে।

বধীৎ। ইন্দ্রঃ। বরশিখস্য। শেষঃ। অভ্যাবর্ত্তিনে। চায়মানায়। শিক্ষন্।

বৃচীবতঃ। যৎ। হরিযূপীয়ায়াম্। হন্। পূর্বে। অর্ধে। ভিয়সা। অপরঃ। দর্ৎ॥—৬।২৭।৫

চয়মান-পুত্র অভ্যাবর্ত্তীকে প্রদান করিতে বরশিখপুত্রকে ইন্দ্র বধ করিয়াছেন। হরিযূপীয়ার সম্মুখভাগে অবস্থিত বৃচীবান্‌দিগকে যখন বধ করিয়াছিলেন, পশ্চাৎভাগে অবস্থিতগণ ভয়ে বিদীর্ণ হইয়াছিল।

ত্রিংশৎ শতং। বর্ম্মিনঃ। ইন্দ্র। সাকম্। যব্যাবত্যাম্। পুরুহূত। শ্রবস্যা।

বৃচীবন্তঃ। শরবে। পত্যমানাঃ। পাত্রা। ভিন্দানাঃ। ন্যর্থানি। আয়ন্॥—৬।২৭।৬

হে বহুলোক দ্বারা আহূত ইন্দ্র! যশ কামনা করিয়া, হিংসার্থ আগমনকারী ত্রিশ শত (বা ১৩০) জন বর্ম্মধারী বৃচীবানগণ যব্যাবতী তীরে (যজ্ঞ)-পাত্র ভগ্ন করিতে যাইয়া যুগপৎ নাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল।

যস্য। গাবৌ। অরুষা। সুযবস্যু। অন্তঃ। উঁ। সু। চরতঃ। রেরিহাণা।

সঃ। সৃঞ্জয়ায়। তুর্বশম্। পরা। অদাৎ। বৃচীবতঃ। দৈববাতায়। শিক্ষন্॥—৬।২৭।৭

যাঁহার অরুণ বর্ণ, শোভন-তৃণ-ভক্ষণকারী লেহন-শীল গোদ্বয় দ্যাবা-পৃথিবী-মধ্যে সুখে বিচরণ করে, সেই (ইন্দ্র) দেববাত-পুত্র সৃঞ্জয়কে বৃচীবানের নিকট হইতে তুর্বশ প্রদান করিয়াছেন।

দ্বয়ান্। অগ্নে। রথিনঃ। বিংশতিং। গাঃ। বধূমতঃ। মঘবা। মহ্যং। সম্রাট্।

অভ্যাবর্ত্তী। চায়মানঃ। দদাতি। দূণাশা। ইয়ং। দক্ষিণা। পার্থবানাম্॥—৬।২৭।৮

এই যুদ্ধ হরিয়ূপীয়া নামক স্থানে সংঘটিত হয় (৫ম ঋক্ দেখুন।) ঋষি বর্ণনা করিয়াছেন, বরশিখ-বংশীয় বৃচীবান্‌গণ (অথবা বরশিখপুত্র ও বৃচীবান্‌গণ) যব্যাবতী-তীরে অবস্থিত হরিয়ূপীয়া নামক যজ্ঞভূমিতে যজ্ঞপাত্র ভগ্ন করিতে (অর্থাৎ যজ্ঞ নষ্ট করিতে) আগমন করে। তাহারা সংখ্যায় ত্রিশ শত ছিল, এবং বর্ম্ম দ্বারা রক্ষিতদেহ হইয়া আসিয়াছিল। যব্যাবতী পার হইয়া হরিয়ূপীয়াতে ইহাদের কতকগুলি আসিতে পারিয়াছিল, এবং অপর সকলে পরপারে ছিল। বরশিখের পুত্র 'পরম' ও বৃচীবান্‌গণ সম্মুখে ছিল। ইহারা ইন্দ্র কর্ত্তৃক নিহত হয়।

এই স্তোত্রে আমরা একটী মূল্যবান বিষয় অবগত হই। তুর্বশ নামক এক ব্যক্তিকে ইন্দ্র বৃচীবান্‌দিগের নিকট হইতে দেববাত-পুত্র সৃঞ্জয়কে প্রদান করেন। (৭ম ঋক্ দেখুন।) সায়ণাচার্য্য এই ঋকের ব্যাখ্যা-কালে সম্রাট অভ্যাবর্ত্তীকে দেববাত-বংশীয় বলিয়াছেন। এই ব্যাখ্যা আমরা ভ্রান্ত বলিয়া মনে করি। কারণ, বর্ত্তমান সূক্তের অষ্টম ঋকে ঋষি অভ্যাবর্ত্তীকে পার্থব অর্থাৎ পৃথু-বংশীয় বলিয়াছেন। ৩য় মণ্ডলের ২৩শ সূক্তের ২য় ঋক্ দেবশ্রবা ও দেবাবাত নামক দুইটী ভরত-পুত্রের রচনা। (১) বামদেব ঋষির রচিত একটী ঋকে৽ সৃঞ্জয়কে দেববাতের পুত্ররূপে দেখিতে পাই। (২) ভরতের পুত্র দেববাত ও সৃঞ্জয়ের পিতা দেববাতকে, এই সকল প্রমাণ দ্বারা, আমরা অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া মনে করি। ইহা সত্য হইলে, ভরতের পৌত্র সৃঞ্জয় হরিয়ূপীয়ার যুদ্ধে সম্রাট্ অভ্যাবর্ত্তীর পক্ষাবলম্বন করেন। কিন্তু এই যুদ্ধ-বিজয়ে তুর্বশকে বৃচীবানের নিকট হইতে গ্রহণ ও সৃঞ্জয়কে দান করার অর্থ কি? ইহার দুই প্রকার অর্থ অনুমান করা যাইতে পারে; ১ম,—যদ্যপি তুর্বশকে বৃচীবান্‌দিগের শত্রু বলিয়া অনুমান করি, তবে এই যুদ্ধের পূর্ব্বে তুর্বশ বৃচীবান্‌দিগের গোজয় করিতে সম্রাট্ অভ্যাবর্ত্তী কর্ত্তৃক প্রেরিত হন। ঐ সময়ে তিনি বৃচীবান্‌দিগের দ্বারা বন্দীকৃত হন। বৃচীবান্-

---

হে অগ্নে! মঘবান্, সম্রাট্, চায়মান-পুত্র অভ্যাবর্ত্তী বধূযুক্ত রথ দুইটী (ও) কুড়িটী গো আমাকে দান করিতেছেন। পৃথুবংশীয়দিগের এই দক্ষিণা কেহ নষ্ট করিতে পারে না।

(১) অমন্থিষ্টাং। ভারতা। রেবৎ। অগ্নিং। দেবশ্রবাঃ। দেববাতঃ। সুদক্ষম্ ॥—৩।২৩।২
ভরতের দুই পুত্র দেবশ্রবা ও দেববাত সুদক্ষ অগ্নিকে মথিত করিয়াছেন।

(২) অয়ং। যঃ। সৃঞ্জয়ে। পুরঃ। দৈববাতে। সমিধ্যতে। দ্যুমান। অমিত্রদম্ভনঃ ॥—৪।১৫।৪
এই যে উজ্জ্বল, অমিত্রবধকারী, পুরোহিত (অগ্নি) দেববাত-পুত্র সৃঞ্জয়ের নিমিত্ত কাষ্ঠযুক্ত হইয়াছেন।

গণ এই অভিযানের প্রতিশোধ দিবার জন্য সম্রাট অভ্যাবর্ত্তীর যজ্ঞভূমি আক্রমণ করে। কিন্তু সৃঞ্জয় আপন ভারতজনদিগের সাহায্যে বৃচীবান্‌দিগকে পরাজিত ও তুর্বশকে উদ্ধার করেন্। এই কার্য্যের পুরস্কারস্বরূপ তিনি তুর্বশ লাভ করেন। ২য়ঃ,—ইহাও অনুমান করা যাইতে পারে, তুর্বশ বৃচীবান্‌দিগের নেতা হইয়া সম্রাট অভ্যাবর্ত্তীর যজ্ঞ নষ্ট করিতে আসেন। তথায় বৃচীবান্‌গণ পরাজিত ও তুর্বশ ধৃত হন। সৃঞ্জয় বন্ধুরূপে সাহায্য করায়, তুর্বশকে প্রাপ্ত হন। দ্বিতীয় অনুমান আমরা যুক্তিসঙ্গত মনে করি না। কারণ, পরুষ্ণী যুদ্ধে অভ্যাবর্ত্তীর ভ্রাতা চয়মান-পুত্র কবি ও তুর্বশ মিলিত হইয়া সুদাসের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। ইহা আমরা সুদাস প্রবন্ধে দেখাইয়াছি।

যেরূপ ভরদ্বাজ ঋষি এই স্তোত্রে সৃঞ্জয়ের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, সেইরূপ তাঁহার পুত্রগণ সৃঞ্জয়-পুত্র প্রস্তোকের নাম, তাঁহাদের রচিত স্তবে প্রকাশ করিয়াছেন। (১) এখানে যেমন ভরদ্বাজ ঋষি যজ্ঞে অভ্যাবর্ত্তী ও সৃঞ্জয়ের নাম উচ্চারণ করিয়াছেন, সেইরূপ ভরদ্বাজপুত্রগণ এক যজ্ঞে সৃঞ্জয় ও দিবোদাসের নাম উচ্চারণ করিয়াছেন। ভরদ্বাজ ঋষি পার্থবদিগের নিকট দক্ষিণা প্রাপ্ত হন। কিন্তু ভরদ্বাজপুত্রগণ দিবোদাস ও সৃঞ্জয়-পুত্র উভয়ের নিকট দক্ষিণা প্রাপ্ত হন। (২) এই সকল প্রমাণ হইতে অনুমান করি, সৃঞ্জয় অভ্যাবর্ত্তীর সমকক্ষ ছিলেন না। সম্ভবতঃ তিনি সম্রাটের করদ রাজা ছিলেন। সম্রাটের কোনও যজ্ঞে তাঁহার নিমন্ত্রণ হওয়ায়, আপনার পুরোহিত ভরদ্বাজ ঋষির সমভিব্যাহারে হরিযূপীয়ায় গমন করেন। কিন্তু বৃচীবান্‌দিগের আক্রমণ তিনি ব্যর্থ করায়, তাঁহার পুরোহিত ভরদ্বাজ সম্রাটের বৃচীবান্‌বিজয় যজ্ঞে হোতার পদে বৃত হন। সৃঞ্জয় যে বীর ছিলেন, তাহা তাঁহার তুর্বশ-লাভে জানা যাইতেছে।

দিবোদাস শম্বর জয় করেন; আমরা এই ইতিহাস অন্য প্রবন্ধে দেখাইয়াছি। ভরদ্বাজপুত্রগণ দিবোদাস ও সৃঞ্জয়-পুত্রের যজ্ঞ করায় জানা যাইতেছে যে, ইহা-

---

(১) মহি। রাধঃ। বিশ্বজন্যং। দধানান্। ভরদ্বাজান্। সার্ঞ্জয়ঃ। অভি।

অযষ্ট ॥—৬।৪৭।২৫

সর্ব্বজনহিতকর, মহৎ অন্নধারণকারী, ভরদ্বাজ পুত্রদিগকে সৃঞ্জয়-পুত্র (প্রস্তোক) পূজা করিয়াছেন।

(২) প্রস্তোকঃ। ইৎ। নু। রাধসঃ। তে। ইন্দ্র। দশ। কোশয়ীঃ। দশ। বাজিনঃ। অদাৎ।
দিবোদাসাৎ। অতিথিগ্বনা। রাধঃ। শাম্বরং। বসু। প্রতি। অগ্রভীষ্ম ॥—৬।৪৭।২২

হে ইন্দ্র! প্রস্তোক তোমায় ধনের দশ কোশ ও দশ অশ্ব দিয়াছেন। অতিথিগ্বের ধন—শাম্বর-সম্বন্ধীয় ধন—দিবোদাস হইতে গ্রহণ করিয়াছি।

দের মধ্যে মিত্রতা ছিল। ইঁহাদের যজ্ঞ একত্র হওয়ায় মনে হয়, ইঁহারা দুই জনে সম্রাট অভ্যাবর্ত্তীর অধীন দুই সেনাপতি ছিলেন।

সম্রাট্ অভ্যাবর্ত্তী পার্থবদিগের রাজা ছিলেন। অতএব, তাঁহার কোনও পূর্ব্ব-পুরুষের নাম পৃথু ছিল। পুরাণে পৃথু বেণের পুত্র বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। (১) মহাভারতে বেণকে মনুর পুত্র বলা হইয়াছে। পুরাণের এই নির্দ্দেশ সত্য হইলে, অভ্যাবর্ত্তী মনুর বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অতএব, তাঁহার বংশ-তালিকা এইরূপ হইবে,—মনু—বেণ—পৃথু—চয়মান—অভ্যাবর্ত্তী। সম্রাট অভ্যা-বর্ত্তীর রাজধানী কোন্ স্থানে ছিল, বেদ হইতে তাহা স্থির করা কঠিন। ভরদ্বাজ ঋষির পূর্ব্বোদ্ধৃত স্তবের ৫ম ঋক্ হইতে আমরা অবগত হই যে, হরিযুপীয়া নামক স্থানে তাঁহার যজ্ঞভূমি ছিল। ইহা যব্যাবতী নামক নদীতীরে অবস্থিত। সায়ণ অনুমান করেন, হরিযুপীয়া ও যব্যাবতী একই নগর বা একই নদীর নাম। বৈদিক যুগে, যজ্ঞভূমি পশু বলি দিবার জন্য যূপকাষ্ঠে অলঙ্কৃত হইত। (২) সম্ভবতঃ সম্রাট অভ্যাবর্ত্তীর যজ্ঞভূমি হরি নামক স্থানে অবস্থিত ছিল; উহা যূপবিশিষ্ট হওয়ায় হরিযূপীয়া নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। হরি শব্দের অর্থ—অশ্ব; অতএব সম্রাটের অশ্বমেধ যজ্ঞের এই স্থান ছিল। (৩)

নদীদিগের সঙ্গমস্থলই যজ্ঞভূমির প্রকৃষ্ট স্থান বলিয়া ঋষিগণ বিশ্বাস করি-তেন। অতএব, অভ্যাবর্ত্তীর যজ্ঞ-ভূমি যব্যাবতী ও অপর এক নদীর সঙ্গম-স্থলে অবস্থিত ছিল, অনুমান করা যাইতে পারে।

আফগানিস্থানের পশ্চিমে হরি নদী (বা হরি-রুদ্) অবস্থিত। হিরাট নগর ইহারই তীরে। এই নদী যে প্রদেশ দিয়া প্রবাহিত, জেন্দাবেস্তায় সে প্রদেশকে হরোয়ু বলা হইয়াছে। (৪) ঋগ্বেদে সরযু নামে এক নদীর নাম প্রাচীন ঋষিগণ উল্লেখ করিয়াছেন। (৫) জেন্দ ভাষার 'হ' সংস্কৃতে 'স' রূপে

---

(১) পৃথুং বৈণ্যং বভুরাজ্যে অভিষিক্তং চরাচরৈঃ।—পদ্মোত্তরখণ্ডে ২৯ অধ্যায়।

(২) যূপব্রস্কাঃ। উত। যে। যূপবাহাঃ। চষালং। যে। অশ্বযূপায়। তক্ষতি॥—১।১৬২।৬ যূপার্হ বৃক্ষের ছেদনকারিগণ, ও যাহারা যূপবহনকারী, যাহারা অশ্বযূপের জন্য চষাল কাটিয়া প্রস্তুত করে...।

(৩) উপহ্বরে। গিরীণাং। সঙ্গথে। চ। নদীনাম্। ধিয়া। বিপ্র। অজায়ত॥—৮।৬।২৮ গিরিদিগের গূঢ় স্থানে, নদীদিগের সঙ্গমস্থলে যজ্ঞ দ্বারা বিপ্র (ইন্দ্র) জন্মেন।

(৪) ভেন্দিদাদ—১ম অধ্যায়।

(৫) ৪।৩০।১৮ (বামদেব-রচিত); ৫।৩৯।৯ (অত্রির পুত্র শ্যাবাশ্বের রচনা।)

উচ্চারিত হয়। অতএব,সরযু ও হরোযু একই শব্দ। বৈদিক কালে প্রসিদ্ধ সরযু নদী যে দেশে প্রবাহিত ছিল, সেই দেশকে জেন্দাবেস্তায় হরোযু বলা হইয়াছে। সম্ভবতঃ সেই সময়ে সরযু নদী হরি নাম প্রাপ্ত হইয়া থাকিবে। আমরা ইহার এইরূপ কারণ অনুমান করি।—সরযু ও যব্যাবতীর সঙ্গমস্থলে প্রতিষ্ঠিত যূপবিশিষ্ট হরি নামক পুর প্রসিদ্ধি লাভ করায়, পরবর্ত্তী কালে ঐ দুই নদীর মধ্যে প্রধান সরযুকে হরি নামে এবং ঐ প্রদেশকে সরযু নামে অভিহিত করা হইয়াছিল।

আমরা পুরাণে অবগত হই যে, মনুবংশীয়গণ সরযুতীরে রাজত্ব করিতেন। সম্রাট অভ্যাবর্ত্তীকে আমরা মনু-বংশীয় বলিয়া মনে করি। তিনি বৈদিক কালে আফগানিস্থানের পশ্চিমে অবস্থিত সরযু নদী অর্থাৎ বর্ত্তমান হরি নদীর অবং বাহিক প্রদেশে রাজত্ব করিতেন। মনুবংশীয়গণ যখন অযোধ্যায় রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করেন, তাঁহাদের নূতন রাজধানী বেষ্টন করিয়া যে নদী প্রবাহিত ছিল, তাঁহাদের প্রাচীন ও প্রিয় সরযু নদীর নামানুসারে তাহাকেও তাঁহারা সরযু আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া আমাদের মনে হয়।

কেহ এই আপত্তি উত্থাপন করিতে পারেন যে, অভ্যাবর্ত্তীর যজ্ঞভূমি যদি সরযু ও যব্যাবতীর সঙ্গমস্থলে হয়, তবে ভরদ্বাজ ঋষি সরযুর নাম কেন উল্লেখ করেন নাই? দুইটীর মধ্যে যদি সরযুই প্রধান, তাহা হইলে ঋষির সরযুর নাম উল্লেখ করাই স্বাভাবিক ছিল। পাঠক স্মরণ রাখিবেন, ভরদ্বাজ ঋষি বলিবার চেষ্টা করিয়াছেন, কোন্ নদীর তীরে বৃচীবান্‌গণ পরাজিত হইয়াছিল। যব্যাবতী ক্ষুদ্র নদী বলিয়া শত্রুগণ ঐ নদী পার হইয়া হরিযূপীয়ায় আসিতে চেষ্টা করে। সরযু নদী পার হওয়া তত সহজ ছিল না। এই জন্য সরযু নদীর উল্লেখ করা ভরদ্বাজের আবশ্যক হয় নাই। শত্রুগণ যজ্ঞ নষ্ট করিবার উদ্দেশে আগমন করায়, হরিযূপীয়া নাম ঋষির বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল।

আর এক কারণে আমরা এই প্রদেশকে সম্রাট অভ্যাবর্ত্তীর রাজধানীর নিকটবর্ত্তী বলিয়া মনে করি। অভ্যাবর্ত্তী এক জন পার্থব ছিলেন, ভরদ্বাজের ঋক্ হইতে অবগত হই। পার্থবদিগের রাজ্যকে পার্থব রাজ্যও বলা যাইতে পারে। পারস্য দেশের পূর্ব্বার্দ্ধ-ভাগ প্রাচীন গ্রীকদিগের নিকট 'পর্থাব' ও রোমানদিগের নিকট 'পার্থিয়া' নামে প্রসিদ্ধ ছিল। 'পুর্থাব' নাম আমাদিগকে 'পার্থব' নাম স্মরণ করাইয়া দেয়। বর্ত্তমান কালের হরি নদী এই দেশের

মধ্য দিয়া প্রবাহিত। অতএব, এই স্থানেই যে পার্থবগণ রাজত্ব করিতেন, তাহাতে সন্দেহ করিবার অবকাশ থাকে না।

আস্ত্য প্রভৃতি প্রাচীন ঋষিদিগের ঋক্ হইতে জানা যায়,—পৃথিবী, পৃথ্বী নামেও অভিহিত হইত। (১) পৃথু শব্দ হইতে পৃথ্বী শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। পৃথুর রাজ্যকেই সম্ভবতঃ পৃথ্বী বলা হইত। আমরা অনুমান করি, পৃথ্বী শব্দ হইতেই পার্থিয়া ও পর্থাব শব্দদ্বয় উৎপন্ন হইয়াছে, এবং এই সকলের মূলে পৃথু শব্দই বর্ত্তমান। অতএব, পার্থিয়া দেশেই মনুবংশীয়গণ বাস করিতেন, এবং তাঁহাদের সাম্রাজ্য উত্তরে তুর্কিস্থান, দক্ষিণে সমুদ্র, পূর্ব্বে পঞ্জাব ও পশ্চিমে তুরুস্ক পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়।

ফরাসী রণাঙ্গণের কথা।

১

দায়গ্নি (Diagne) দেশগত প্রাণ; 'সেনিগল'বাসী তাই তাঁহার এত প্রিয়। তাঁহার সাহস ছিল দুর্জ্জয়—চরিত্র অনমুকরণীয়; কর্ত্তৃপক্ষকেও তাঁহাকে সম্মান করিতে হইত, কিন্তু তাহারা সব চেয়ে বেশী ভয় করিত তাঁহার Pan-Senegalism.। তাঁহার আগমনে স্বদেশের সৈনিকের কণ্ঠধ্বনি বিজয়দৃপ্তের তূর্য্যনিনাদে তাঁহার অভিনন্দন করিল—আফ্রিকার যুবক বুক বাড়াইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন দিল—একটীবার তাঁহার কর-পদ্ম চুম্বন করিল; কারণ, দায়গ্নিও যে আফ্রিকান, শুধু আফ্রিকান নয়, আপনার হইতে আপনার জন। এমন লোকের কাছে হৃদয় খুলিয়া সুখ পাইবে, ইহা বিশেষ বিচিত্র কথা নয়। এই হৃদয়স্পর্শী দৃশ্যের অভিনয়ও শেষ হইল। জাতির তথাকথিত প্রতিভূ হইলে-সাধারণতঃ লোকের ভাগ্যে এমন অরূপ সুযোগ ঘটে না—মর্ম্মে এরূপ সুখ কয় জন উপভোগ করিয়া থাকে? পর কাহার নিকট এমন ভাবে আপন হইয়া উঠে?

আর্ব্বী ভাষায় তাঁহার বক্তব্য তিনি জ্ঞাপন করিলেন। সুরম্য নগরে বিশ্রামের প্রয়োজন, কিন্তু সৈনিককে করিতে হইতেছে সামান্য শ্রমিকের কাজ—বিরামহীন জীবনের এ কষ্ট-কাহিনী তিনি শুনিলেন। ফ্রেঞ্চ উপনিবেশে সকলকে

(১) পূঃ। চ। পৃথ্বী। বহুনা। নঃ। উর্ব্বী॥—১।১৮৯।২

প্রাথমিক শিক্ষা লইতে হইবে—সে সম্বন্ধে কথা হইল; এ যজ্ঞের তিনি প্রথম হোতা। চরিত্রের দৃঢ়তা ও ইচ্ছাশক্তির প্রাবল্যে ইহা সফল হইতে পারে। যুদ্ধের শেষে ইহা যে সাধিত হইবে, সে বিষয়ে তাঁহার কিঞ্চিৎমাত্রও দ্বিধা নাই। যুদ্ধ যে যুদ্ধের জন্যই হইতেছে—বাহিরের পুষ্পরাজি আবর্জ্জনস্তূপের মত অন্তর-দেবতাকে ডাকিয়া আনিবে—তাঁহার ভবিষ্য-দৃষ্টি ইহার কতটুকু দেখিয়াছিল, তাহা বলা কঠিন। তাঁহার হৃদয় ছিল—তাঁহার প্রাণ ছিল, কিন্তু প্রাণের অতীত সেই অপার্থিব মানুষের সাক্ষাৎ তাঁহার ভিতরে আমরা পাই নাই। তাঁহারও মুখে ভারতের গৌরবকথা—স্বপ্নাতীত আশ্চর্য্য কাহিনী শুনিলাম—ভারতের মুরজধ্বনি সুদূর দেশের আর একটী লোকের হৃদয়-বীণার একটি তার ঝঙ্কৃত করিয়াছে, তাহা দেখিলাম। সৈন্য-পরিদর্শন শেষ হইল—কতকগুলি আফ্রিকানের সহিত একটী মোটরে তিনি চলিয়া গেলেন।

কিন্তু ইহাতে সৈনিকের ধর্ম্মঘট শেষ হইল না। একটীর পর আর একটী করিয়া সকল 'রেজিমেণ্ট' সিনাগেলি আপন দলে টানিল; কেবল আমরা কয়েক জন ইহাতে যোগ দিলাম না। তাহারা লোক পাঠাইয়া তাহাদের সহিত একযোটে কাজ করিতে আহ্বান করিল। আমরা বলিলাম, 'আমরা স্বেচ্ছাসৈনিক—বেতনভোগী সৈন্য হইতে আমাদের অবস্থা কিছু বিভিন্ন—আমাদের যে কোনও কাজ কর্ত্তৃপক্ষ করিতে বলিলে, সামর্থ্য থাকিলে আমরা তাহা করিব। তোমরা যে কারণে সৈন্যশ্রেণীভুক্ত হ'য়েছ, আমরা ঠিক সে কারণে সৈন্য হই নি—আমাদের অবস্থা কিছু স্বতন্ত্র; এবং বিশেষ কারণবশতঃ আইনের ভার নিজ স্কন্ধে লইতে আমরা প্রস্তুত নই—সুবিধামত আইন ভাঙ্গা এবং গড়া, কিংবা আমাদের কার্য্যের সামিল ক'রে লওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নয়—সেনাধ্যক্ষের সহিত সৈনিকের নিত্য নৈমিত্তিক সংঘর্ষে আমাদের যোগদান ঘটিয়া উঠিতে পারে না; কিন্তু তোমাদের সদিচ্ছায় আমাদের যথেষ্ট সহানুভূতি আছে; তবে এইটুকু জানিও, তোমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া তোমাদের ব্যাঘাত কোনক্রমে ঘটাইব না।'

সম্মুখে বিস্তৃত যুদ্ধক্ষেত্র—ধূসর ভূমি; তাহার এক প্রান্তে জীবন-নাটকের এই করুণাত্মক অঙ্কের অভিনয়; অপর প্রান্তে ভিউস (Veuise) উপত্যকায় মানুষের মরণ-অভিসার—অগ্রহায়ণ মাসে বাতাসে নুয়েপড়া ধানের মত সৈন্যেরা কাতারে কাতারে যুদ্ধে ভূতলশায়ী হইতেছে। রণবিশারদ মন্ত্রীরা ঘোষণা বাহির করিতে বাধ্য হইলেন—বিশ্রাম না হইলে যাহাদের একেবারে চলে না,

তাহারা ব্যতীত আর সকলকে যুদ্ধ-লাইনে আসিতে কাতরভাবে অনুনয় করিলেন। এ সময়ে ইতালীয় যুদ্ধপ্রান্তরে প্রত্যহ সৈন্য পাঠান হইতেছিল। ব্যাপার বুঝিয়া আমরা হত সৈন্যবৃন্দের স্থল পূর্ণ করিতে অগ্রসর হইলাম। শ্রমজনিত ক্লান্তি—অনেকেই বাস্তবিক অসুস্থ হইয়া পড়িল—লোকের অভাব, তা ছাড়া যুদ্ধে দায়িত্ব আছে; স্বেচ্ছা-সৈনিককেও ফিরিয়া আসিতে হইল। ইহার কারণ আর কিছু নয়—রণব্যূহের পিছনে যে সব 'অফিসার' থাকিত, তাহারা যুদ্ধরত সৈনিকের মনস্তত্ত্ব বুঝে নাই—তাহাদের ছিল আত্মশ্লাঘা, এক বিকট ঔদাসীন্য—কাজেই লোক চিনিবার সামর্থ্য তাহাদের জন্মে নাই। ফরাসীদের ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, শান্তি-সময়ের সৈন্যের মত ইহারা রুক্ষ হৃদয়হীন পশু নয়—অবস্থা-চক্রের ক্রীড়াপুত্তলীও নয়; ইহারা মানুষ; ইহাদের হৃদয় আছে—জীবন আছে, সূক্ষ্ম অনুভূতি আছে। ইহারা অন্তরের ভাবকে বেশী রকমেই ভালবাসিতে জানে; ষোড়শোপচারে বাহ্যাড়ম্বরের পূজা না করিলেও ইহাদের কর্ত্তব্যবোধ আছে। ইহারা কাল অবধি যে দুহিতা, মাতা, বনিতার মধ্যে খুব স্বাভাবিক স্বাচ্ছন্দ্যের জীবন যাপন করিয়াছে। ইহাদিগকে কাজ করাইতে দুর্দ্ধর্ষ ক্ষমতা-প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না—সাধারণ বুদ্ধি এবং সহৃদয়তা ইহাদিগকে কার্য্যে প্রণোদিত করিবার পক্ষে যথেষ্ট। শুধু যথেষ্ট নয়, আশুফলপ্রদ, কিন্তু এক জন কর্ণেলকে ইহাদের তত্ত্বাবধান করিতে হয়—তিনি যুদ্ধের প্রাণহীন যন্ত্রের মত, এ সবের বড় একটা ধার ধারিতেন না।

ইতালীর বিরুদ্ধে জার্ম্মেণীর বিজয়-অভিযান সহসা থামিল; সকলের ভয়, জার্ম্মেণীর বিচিত্র উদ্যমের নবপ্রকাশ কোথায় হয়। সাধারণতঃ যেমন হইয়া থাকে, রণপণ্ডিতগণ বুঝাইবার প্রয়াস পাইলেন, 'ফ্রান্স এবার কথনও আক্রান্ত হইতে পারে না'; কিন্তু জফ্রেই কেবল দূরদৃষ্টিবলে দেখিতে পান—'ফ্রান্স এবং প্যারি জর্ম্মেণীর এবারকার লক্ষ্য।' কাজেই যুদ্ধের তুমুল আয়োজন আরম্ভ হইল। সীমান্তরালে রণব্যূহের ৩০ কিঃ মিঃ পিছনেও এ বন্দোবস্ত চলিল—কারণ, ফরাসীরা বেশ বুঝিয়াছিল যে,রণবাহিনীর দেড় শত নূতন ডিভিসনের সহিত যুদ্ধে তাহাদিগকে পশ্চাৎপদ হইতে হইবে। অক্ষতভাবে পশ্চাৎপদ হওয়াও রণনৈপুণ্যের পরিচায়ক। প্যারিসের চতুঃপার্শ্বে, যাহারা যুদ্ধ হইতে অবসর পাইয়াছিল, তাহাদেরও পুনরায় কাজে লাগান হয়—যাহারা কিছু জানিত না, তাহারাও দশ টাকা বেতনে কাজ করিবার আজ্ঞা পায়। কৃচিৎ এই স্থানে, কচিৎ ওই স্থানে আক্রমণ সুরু হইল—কামানের বজ্রনিনাদ দিক প্রতিধ্বনিত

করিল—আমাদের আচ্ছন্ন করিয়া চতুর্দ্দিকে অজস্র গোলাপাত ;—দিকচক্রবালে প্রতিধ্বনি লজ্জা পাইয়া নীরব হইল। যুদ্ধের নগ্ন নৃত্য ধরিত্রীর বুক কাঁপাইয়া তুলিল। পর্য্যবেক্ষণকারী সৈন্যবৃন্দের বড় বড় কামান ছিল ; বাছাই বাছাই লোক নিয়া এই সৈন্যসমষ্টি—যেমন সৈন্য, তদুপযোগী যুদ্ধ-সরঞ্জাম ; বড় রকমের আশু কোনও কিছু করিতে ইহারা অব্যর্থ—এক একটা বজ্রবাণ মাটীর নীচে এক একটী গোপন আশ্রয় ধ্বংস করিল। সে সময় সকলেরই কণ্ঠে রণং দেহি, রণং দেহির অবিকম্পিত ধ্বনি!—দিন নাই, রাত নাই, কাজেরও বিরাম নাই —দিনের পর দিন গেল, কিন্তু গ্যাসের ভীতি গেল না—মুখ ধুইবার কিছু নাই, সে মুখে আহারও নাই। অনেকে মরিল—শত্রুর বিরুদ্ধে আর দাঁড়ান যায় না। আত্মরক্ষার যা কিছু নির্ম্মিত হইয়াছিল, সব ভাঙ্গিয়া গেল—মৃত্যুর সংখ্যা সৈন্যগণের মনে ভীতিসঞ্চার করিল। এমনই ভাবে ঘোর যুদ্ধ চলিতেছে, সেই সময় এক দিন শত্রুর গোলা ও গ্যাস হইতে আত্মরক্ষা অসম্ভব হইয়া উঠিল—আমরা আজ্ঞা পাইলাম, "যেমন করে পার আত্মরক্ষা কর ;" পিছু হটিতে বলিলে এই ধরণের সঙ্কেত করা হয়, দ্রুত পশ্চাৎপদ হইতে গিয়া গোলন্দাজ সৈন্যরা অনেক কামান ফেলিয়া গেল। যুদ্ধের জন্য কিছু দূরে পিছনে সৈন্যদের পুনরায় দৃঢ়বদ্ধ করা হইল, কিন্তু তখন কোনও আশা নাই : পূর্ব্বের মত জর্ম্মণ গোলাবর্ষণ আমাদের বিচলিত করিয়া তুলিল—এই তীব্র আক্রমণ অসহ্য হওয়ায় অনেকেই মাটীর নীচে গোপন সুড়ঙ্গে আশ্রয় নিল। জন কয়েক যোদ্ধা মৃত্যুকে তুচ্ছ করিয়া নির্ভয়ে কামান দাগিতে লাগিল—চতুর্থ কামানে ছিল বলাই, আর এক জন সার্জেণ্ট, একটী গোলায় তাদের কামান নিমেষে চূর্ণ বিচূর্ণ হইল ; গোলা আসিতেছে দেখিতে পাইয়া Rampartএ একটী নিভৃত গুহায় উভয়েই আশ্রয় লয় ; তৎসত্ত্বেও উভয়ে আহত হয়—সর্ব্বাঙ্গ রক্তরঞ্জিত ; সেই অবস্থায় কোনমতে তাহারা সুড়ঙ্গে নামিয়া আসে। আমাদের সঙ্গে যে নেকড়াটুকু ছিল, তাহা দিয়া ক্ষত বাঁধিয়া দিলাম ; কিন্তু কি দুর্ভাগ্য—শেষ আশাও নৈশ আঁধারে মিশিবার উপক্রম—অদৃষ্টের নির্ম্মম স্পর্শে সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। প্রথমে ২১০ মিঃ মিঃ গোলা, সঙ্গে সঙ্গে ৩১০ মিঃ মিঃ গোলার তরঙ্গের পর তরঙ্গে গোপন সুড়ঙ্গের উপর আহত প্রতিহত হইতে লাগিল, উৎক্ষিপ্ত সমুদ্রের উৎকট গর্জ্জনে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত হইবার সময়েও এমন রব উঠে না। দাঁতের উপর দাঁত দিয়া বজ্রহৃদয়ে মাটীর নীচে আমরা অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। কিছু দূরে একটী সুড়ঙ্গে আগুন জ্বলিয়া উঠিল ; সকলে ভাবিল, অন্ততঃ

জন কয়েক বীর সৈন্যকে চিতাগ্নি জীবন্ত আত্মসাৎ করিয়াছে। নিকটের সৈন্যরা নিজেদের জীবন তুচ্ছ করিয়া সেখানে গেল—উদ্দেশ্য, প্রোথিত সহযোদ্ধাদের মাটী হইতে টানিয়া বাহির করিবে। বড় আশ্চর্য্যের বিষয়—কেহই মরে নাই। এ ক্ষেত্রে কি করা যাইতে পারে, তাহা ভাবিয়া সকলে উদ্বিগ্ন; মাটীর নীচে থাকিলে যে বিপদ নাই, এমন নয়—বাহির হইলে বজ্র-অস্ত্রের রক্তবাণে অবধা মরিতে হইবে। মাটীর নীচে গোপন আশ্রয়ে কোনও ক্রমে থাকিবার সকলে সঙ্কল্প করিল—আমরা যেখানে ছিলাম,ভাগ্যবশতঃ সেখানকার মাটী ধসিয়া যায় নাই; তাহা যদি হইত, তবে আহত সৈন্যদের সহিত প্রাণ থাকিতে থাকিতে প্রোথিত হইতাম। এ রুদ্র আক্রমণেরও শেষ হইল; আহত যারা, Ambulance Carএ তাহারা হাঁসপাতালে গেল, মৃত যাহারা তাহারা তো মৃত্যুর সঙ্গেই নিশ্চিন্ত হইয়াছিল।

এই সঙ্গে যে সোম্মি নদীতটে আক্রমণের সূচনা হয়, এ সংবাদ আমরা পাই; এবং ভার্দ্দুনে আমরা যাহাতে প্রত্যাক্রমণ করিতে অসমর্থ হই, সে জন্য শত্রু যথেষ্ট আয়োজন করে। ইহার ফলে শুধু যে একটা তীব্র যুদ্ধ হয়, তাহা নয়; কাহার কত শক্তি, তাহার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য কামান দাগার একশেষ করা হয়। দিন দিন সৈন্যসংখ্যা হ্রাস পাইতে লাগিল—নূতন রেজিমেণ্টের দেখা নাই; আমাদেরও ছুটীর অবসর নাই। রণবিশারদের কল্পনাকেও লজ্জা দিয়া মৃত্যুর হার শতকরা ৫০এরও ঊর্দ্ধে উঠিল; আমাদের সরাইতে কর্ত্তৃপক্ষ তখন বাধ্য হইলেন—সে স্থানে পাঠান হইল আমেরিকার নূতন সৈন্য।

সোম্মি-তটে প্রথমে ইংরাজের ভাগ্যবিপর্য্যয় ঘটে। স্বপ্নেও তাহারা সে বিপদের কথা ভাবে নাই। হঠাৎ তাহাদের ৬০ কিঃ মিঃ পিছু হটিতে হয়—সৈন্যদের এক একটী ডিভিসনের কোনও খোঁজই পাওয়া যায় নাই—আর্টিলারীরও সমস্ত ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়—অন্ততঃ যারা এ যুদ্ধে লড়িয়াছিল, তারা এ কথা বলে। বিপদের বিকট দানব যখন ইংরাজকে এমন করিয়া অভিভূত করিবার প্রয়াস পায়, সে সময় সেনাপতি Magin ঔপনিবেশিক সৈন্য লইয়া উপস্থিত হন। তিনি মরোক্কো, জুভ ও সেনিগালি সৈন্যদের বজ্রের মত দৃঢ়বদ্ধ করিয়া গিরিশৃঙ্গ হইতে যেন যুগপৎ শত্রুর উপর গড়াইয়া দিলেন—নিমেষে শত্রুর দুর্দ্ধর্ষ প্রকোপের উপশম হইল। চোর চুরী করিয়া দ্রুত পলাইবার সময় পুলিসকে সম্মুখে দেখিয়া সহসা থামিয়া যায়, শত্রুর আক্রমণের বেগও তেমনই ভাবে হঠাৎ

থামিল। এ ক্ষেত্রে মানসিক প্রত্যবায় যথেষ্ট হয়,; কারণ, সৈন্যেরা সহস্রের পর সহস্রে মরিতে থাকে ; ইহার ফলে এ আক্রমণ স্থগিত হয়। আফ্রিকার এই বীর যোদ্ধৃবৃন্দের সহিত সাক্ষাৎ হইলে ক্লেমাসঁ বলেন,—"তোমাদের যুদ্ধ আমি দেখিয়াছি, বীরত্বের অগ্নি-স্ফুলিঙ্গে তোমাদের রক্তকণিকা উদ্দীপ্ত—বজ্রঅস্থিতে তোমাদের হৃদয় নির্ম্মিত।" উদার প্রকৃতির ভদ্রলোকমাত্রই স্বীকার করেন, এই 'কালা সেপাই' না আসিলে ইউরোপের সভ্যতা বর্ব্বরতা ও অজ্ঞানতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া নিশ্চয় ধ্বংসপ্রাপ্ত হইত।' প্রত্যেকে বলে, প্যারিস গেলেও আমরা যুদ্ধ চালাইব। কিন্তু মনে মনে সকলে বোঝে, ইহা হইলে জার্ম্মণী ফরাসীর গলে কিরূপ শাস্তির লৌহকবচ ঝুলাইয়া দিবে। যুদ্ধে বন্দী শত্রু সৈন্য বলে, "প্যারিস নিতে পারিলে ফরাসী জীবনের যাহা কিছু প্রেয়, তাহাদের ইতিহাস এবং সেই সঙ্গে এক শত সহস্র লোক চারি ঘণ্টা অন্তর অন্তর উড়াইয়া দিব—এমনই করিয়া ফ্রান্সের আত্মাকে যখন চিরতরে জয় করিব, তখন ফ্রান্সের রঙ্গমঞ্চে এ অভিনয়ের শেষ হইবে।" জার্ম্মণীর বিজয়দৃপ্তির এই কথা ফ্রান্সের বুকে ভীতিসঞ্চার করুক আর নাই করুক—ফ্রান্সকে ইহা আরও দৃঢ়বদ্ধ করিয়া তুলে। কোন্ অরূপ দেবতার অনির্দ্দিষ্ট অঙ্গুলিসঙ্কেত আপনার উদ্দেশ্যসাধন করিবার জন্য কোন্ মানুষের কোন্ প্রবৃত্তিকে কোথায় নিয়োজিত করিতেছিল, মানুষ তখন তাহা বোঝে নাই। মানুষের অহমিকা স্বমস্তকে পরিতে গিয়া সেই দেবতারই শিরে বিজয়মুকুট তুলিয়া দিয়াছে—প্রকৃতির এ কি বিচিত্র পরিহাস!

ক্রমশঃ।

শ্রীহারাধন বক্সী।

বঞ্চিত।

[কবি-সূক্তি।]

ছায়ার তরে তাপিত তনু,
যে তরুতলে যাই।
চমকি' উঠি' চাহিয়া দেখি,
তারি যে পাতা নাই!

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ব্যথার ব্যথী।

১

বড় যুদ্ধের জন্য যে বিরাট আয়োজন করিতে হয়, তাহা যুদ্ধক্ষেত্রের চতুঃসীমার মধ্যেই বদ্ধ থাকে না। জার্ম্মাণ যুদ্ধের জন্য ইংরাজকে যে আয়োজন করিতে হইয়াছিল, তাহার অনেকটা ভারতবর্ষেও লক্ষিত হইয়াছে। এমন কি, সে জন্য ভারত সরকারকে নূতন বিভাগের সৃষ্টি করিতে হইয়াছিল—পুরাতন বিভাগকে ভাঙ্গিয়া গড়িতে হইয়াছিল। সিমলার সমর বিভাগে আর্ম্মি হেড কোয়ার্টার্স দেখিলে তাহা বেশ বুঝা যাইত। সে সব আফিসে কত কাজ—কত লোক! সে সব আফিসে নানা কাজে মহিলার সংখ্যাও অল্প ছিল না—মহিলাদের মধ্যে যুবতী ও কিশোরীই অধিক। সেই তরুণীরা যমরাজের খাস্-মহালের সদর দপ্তরে কাজ করিলেও বয়ঃসুলভ আনন্দপ্রিয়তা পরিহার করিত না। কথায় কথায় তাহারা ব্যঙ্গ বিদ্রূপের ফোয়ারা ছাড়িয়া দিত—হাসি-তামাসায় আফিসের গাম্ভীর্য্য যেন বসন্তের সন্ধ্যার বাতাসে দিনের গুমটের মত উড়াইয়া দিত। আফিসের কাজ সারিয়া তাহারা যখন পথে বাহির হইত, যেন ছুটিয়া বাহির হইত, ঠিক ঐ বসন্তের সন্ধ্যার বাতাসের মত। তাহাদের বেশের বর্ণ-বৈচিত্র্য ঐ বাসন্তী সন্ধ্যার পশ্চিম-আকাশের মত। তাহাদের হাসির আওয়াজ ঐ বাসন্তী গগনে নানা পাখীর গানের মত। তাহাদের কেশ-বেশের সৌরভ ঐ বাসন্তী পবনের নানা ফুলের মৃদু মধুর গন্ধের মত।

আজ আশ্বিনের অপরাহ্নে যখন তরুণীরা আফিস হইতে বাহির হইয়া রাস্তায় পড়িল—সে ঐ ছুটাছুটি করিয়া—এ উহাকে ঠেলিয়া—এ উহার গায় পড়িয়া। দ্বারের কাছ হইতে খাকী পোষাক পরা গম্ভীরমূর্ত্তি দ্বারবান সরিয়া গেল—আফিসের পুরুষ কর্ম্মচারীরা মৃদু হাসিলেন। কেবল দুই জন তরুণীর মুখে হাসি নাই; তাহারা দুই জন এক সঙ্গে বাহির হইয়া আসিল। একটু পথ চলিয়া দুই জনই পশ্চিম দিকে চাহিল—সূর্য্য তখন আকাশের গায় গোলাপী রং কিরণের তুলিতে টানিয়া দিতেছে—পাহাড়ের চূড়ায় সোনালী হল করা শেষ হইয়াছে।

অ্যান বলিল, 'কাল ২১ শে সেপ্টেম্বর।'

অ্যাডা অ্যানের হাত ধরিয়া বলিল, 'তা' জানি অ্যান।'

অ্যান চাহিয়া দেখিল, অ্যাডার চক্ষুতে জল। সে আর অশ্রু সংবরণ

করিতে পারিল না—যেন নাড়া পাইয়া নেষ্টারশিয়ম ফুলে রজনীর সঞ্চিত শিশির গড়াইয়া পড়িল। অ্যান রুমাল বাহির করিয়া চক্ষু মুছিল—তাহার পর বলিল, 'অ্যাডা, তোমার বন্ধুত্বের ঋণ আমি কখন শোধ করিতে পারিব না। আমার এক একবার মনে হয়, বব কি আমাকে তোমার অপেক্ষা অধিক ভালবাসিতে পারিত? আমি জানি, ববের ভালবাসার সঙ্গে আর কাহারও ভালবাসার তুলনা করাও অন্যায়—তবুও আমার মনে হয়, তোমার ভালবাসা—'

অ্যাডার মুখ একবার সেই সান্ধ্য গগনের মত রক্তাভা ধারণ করিয়া তাহার পরই পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল। তাহার মনে হইল, যে কথা সে অ্যানের কাছ হইতে এত দিন গোপন রাখিয়াছে, সে কথা আজ আত্মপ্রকাশ করিবেই। সে আর অ্যানকে বঞ্চনা করিতে পারিবে না। সে পথের পার্শ্বে রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া ডাকিল, 'অ্যান!'

অ্যান ফিরিয়া চাহিল। তখন তাহার দুই চক্ষু ছাপাইয়া দুই গণ্ড বহিয়া অশ্রু ঝরিতেছে। সে অশ্রুর স্রোতে অ্যাডার সঙ্কল্প ভাসিয়া গেল—সে যাহা বলিতে যাইতেছিল, তাহা আর বলিতে পারিল না। সে আত্মসংবরণ করিয়া বলিল, 'অ্যান, রমণীর প্রতি রমণীর ভালবাসা যত সুন্দরই হউক না কেন, তাহাতে রমণী আশ্রয় পায় না—তাহার জন্য পুরুষের সবল ভালবাসা আবশ্যক; রমণীর ভালবাসায় সুখ থাকিতে পারে, শান্তি থাকে না। পুরুষের ভালবাসা রমণীকে পবিত্র করে—তাহার নারীত্বের মহিমা ফুটাইয়া তুলে। সে ভালবাসা না পাইলে রমণীর জীবন ব্যর্থ হয়।'

অ্যান বলিল, 'তাহাই বটে। সেই যে ২১শে সেপ্টেম্বর বব শেষ বিদায় লইয়া গিয়াছে, সেই দিন হইতে আমি এক দিনও তাহাকে হারাই নাই; বরং তাহাকে এমন ভাবে পাইয়াছি যে, আর হারাইবার ভয়ও হয় না। সে আমার—সে আমারই।' অ্যানের মুখে আনন্দের ও গর্ব্বের জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিল—যেন পশ্চিম গগনে স্বচ্ছ মেঘের পশ্চাৎ হইতে সূর্য্যের আলো আত্মপ্রকাশ করিল।

অ্যাডা যাহা বলিবে ভাবিয়াছিল, তাহা আর বলা হইল না—সে কথাটা তাহার বুকের মধ্যে থাকিয়া, মুখে বাহির হইবার পথ না পাইয়া তাহাকেই পীড়িত করিতে লাগিল। তবুও অ্যাডা তাহাকে প্রকাশ করিতে পারিল না, তাহার প্রকাশ-পথ রুদ্ধ করিয়া প্রাণপণ শক্তিতে তাহাকে চাপিয়া রাখিল। অ্যানের ঐ সরল বিশ্বাস—আর ঐ সরল বিশ্বাসের সুখ ও শান্তি সে কি নষ্ট

করিয়া দিতে পারে? নষ্ট করিয়া তাহার লাভ কি? সে তাহার নিজের বিশ্বাসে যে সুখ পাইয়াছে, সে সুখ হইতে সে অ্যানকে বঞ্চিত করিবে কেন?

তাহার পর দুই জন কোনও কথা না বলিয়া চলিল। যে স্থানে পথ দুই দিকে গিয়াছে, এবং অ্যানকে এক পথে ও অ্যাডাকে আর এক পথে যাইতে হইবে, সে স্থানটায় ওক গাছের একটা ঝোপের মত—পথের পার্শ্বেই একটা ঝরণার জল ঝর-ঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে, আর সেই জলের জন্য পাহাড়ের অঙ্গটা মসে ঢাকা। সেই স্থানে আসিয়া অ্যান বিদায় লইবার সময় অ্যাডাকে চুম্বন করিল। তাহার পর দুই জন দুই পথে গেল।

মোড় ফিরিবাই অ্যাডা একখানা পাথরের উপর বসিয়া পড়িল। সে যেন আর আপনাকে সামলাইতে পারিতেছিল না। তাহার পর সে জামার নিম্নে বুকের উপর হারে বদ্ধ একটা পদক বাহির করিল—পুনঃ পুনঃ সেটি চুম্বন করিল। সেটি ববের শেষ দান—অসীম বীরত্বের এই পুরস্কার সে মৃত্যু-কালে অ্যাডাকে দিতে বলিয়া গিয়াছিল। সেটি অ্যাডার কত প্রিয়! তবুও সে যেন চোরের মত সেটি গোপনে রাখে—পাছে অ্যান জানিতে পারে!

২

অ্যান ও অ্যাডা দুই জনে বাল্যকাল হইতে বন্ধুত্ব; দুই জন এক স্কুলে পড়িত—তদবধি উভয়ে ভালবাসা। অ্যানের পিতা সৈনিক বিভাগে কাজ করিতেন—অবসর লইয়া সিমলায় একটা গাছ বেচিবার বাগিচা বা নার্শরি করিয়াছিলেন। অ্যাডার মা বিধবা হইয়া আবার যাঁহাকে বিবাহ করিয়া-ছিলেন, তিনি সিমলায় চাকরী করেন।

অ্যানের বাড়ীর পরেই একখানি ছোট বাড়ী—সেখানিতে অ্যানের মাসীমা থাকিতেন। অ্যানের মেসো মহাশয় যখন রেলের এঞ্জিনিয়ার হইয়া সিমলায় আসিলেন, তখন মাসীমার জিদেই তাঁহাকে এ বাড়া লইতে হইয়াছিল; নহিলে এ বাড়ী তাঁহার পক্ষে ছোট। মাসীমার বড় ছেলে রবার্ট ওরফে বব—অ্যানীর অপেক্ষা পাঁচ বৎসরের বড়। সে তখন স্কুলে পড়ে। কিন্তু পড়ায় তাহার যে অধিক মন ছিল, এমন নহে। স্কুলের ছুটী হইলে সে ছুটিয়া বাহির হইত; গাছের ডাল হইতে পরগাছা আনিয়া, পাহাড়ের খোপে পাখীর বাসা আবিষ্কার করিয়া, বাগানে প্রজাপতি ধরিয়া সে যে আনন্দ পাইত, পড়ায়

কলেজে প্রবেশ করে, বা কোনও ব্যবসায়-শিক্ষায় মন দেয়, সে বয়সেও তাহার স্কুল ছাড়িতে তিন বৎসর বিলম্ব রহিয়া গেল। সে জন্য তাহার পিতা বিরক্তি প্রকাশ করিলে তাহার মাসীমা বলিতেন, সব ছেলেই বিদ্বান হয় না; হইলে অন্য কাজ করিবার কেহ থাকিবে না; তিনি অ্যানের সঙ্গে ববের বিবাহ দিবেন—অ্যান তাঁহার একমাত্র সন্তান; বব তাঁহার বাগানের কাজ করিবে। কথাটা ববের পিতা বড় কানে করেন নাই। কিন্তু সময়ে অসময়ে অ্যানের মা এতবার কথাটা বলিলেন যে, কান না দিয়াও আর উপায় রহিল না। তখন তিনি ভাবিয়া দেখিলেন, অ্যানের পিতার বাড়ী, বাগান, ব্যবসায়—এ তিনের দাম নিতান্ত কম নহে।

পিতা যখন ভাবিতে লাগিলেন, বব তখন স্থির করিয়া ফেলিল—ভাগ্যলক্ষ্মী যখন নির্ভাবনায় জীবনযাত্রার উপায় ও একটা পত্নী দিতে আসিয়াছেন, তখন তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করা সুবুদ্ধির কাজ নহে। অ্যান যে তাহাকে বিবাহ করিতে অসম্মত হইবে না, সে বিশ্বাস তাহার ছিল। কেন না, সে বুঝিয়াছিল—তাহার সঙ্গ অ্যানের ভাল লাগে। দুর্ব্বল সবলকে শ্রদ্ধা করে, এবং সে শ্রদ্ধা সুযোগ পাইলে ভালবাসায় পরিণত হইতে বিলম্ব হয় না। কাজেই ব্যাপারটা দাঁড়াইয়াছিল—অ্যান জানিত, বব তাহাকে বিবাহ করিবে; বব জানিত, অ্যান তাহাকে বিবাহ করিবে; উভয়ের পিতা মাতাও তাহাই জানিতেন।

এই অবস্থায় স্কুল ছাড়িয়া বব যখন বাহির হইল, তখন অ্যানের পিতা তাহাকে বাগানের কাজ দেখিতে বলিলেন। বব কয় দিন সে কাজ দেখিয়া বুঝিল, সে কাজে যতটা ধৈর্য্যের প্রয়োজন, তাহার তাহা নাই। সে স্থির করিল, বাগান ও ব্যবসা দেখার কাজ অ্যানই করিতে পারিবে; সে যদি একটা চাকরী পায়—আয়ের আর একটা পথ হইবে। সে একটা চাকরী যোগাড় করিয়া লইল। সে কাজটাও তাহার ভাল লাগিত, কারণ, তাহাতে প্রতি দিন গতায়াতে দশ বারো মাইল ঘোড়ায় চড়া হইত। স্বভাবতঃ সুস্থ ও সবল বব যৌবনে শ্রমসাধ্য কাজই ভালবাসিত। সুস্থদেহ যুবকের যৌবনচাঞ্চল্য কাজের শ্রমেই আপনাকে ব্যয় করিতে চাহে—বর্ষার জলে নদী যখন ভরিয়া উঠে, তখন বেগবৃদ্ধি তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। আর সে কাজে বব তাহার উপরিস্থিত কর্ম্মচারীকে এত সন্তুষ্ট করিল যে, চাকরীতে তাহার উন্নতি আশাতীত দ্রুতভাবে হইতে লাগিল।

৩

ববের সহিত তাহার বিবাহ হইবে, এই নিশ্চয়তায় নির্ভর করিয়া অ্যানের ভালবাসা বাড়িতে লাগিল। কিশোরীর ভালবাসা প্রথম যে অবলম্বন পায়, তাহাকেই জড়াইয়া বাড়িয়া উঠে। সে ভালবাসা যাহাকে অবলম্বন করে, তাহাকে ধন্য করিয়াই আপনি ধন্য হয়। বিশেষ অ্যান—সে পিতা মাতার একমাত্র সন্তান—স্নেহের আওতায় বাড়িয়া—দুর্ব্বল হইয়াছিল; সে আত্ম-নির্ভরশীল হইতে পারে নাই, পরন্তু একটা আশ্রয় ও অবলম্বন চাহিত। তাহার তরুণ হৃদয়ের ভালবাসা সবল ববকে অবলম্বন করিয়া বাড়িতে লাগিল, এবং তাহার কল্পনা সেই ভালবাসার কিরণপাতে তাহার বাগানের ফুলের মত বিচিত্র বর্ণে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। সে কল্পনা কত সুখের! আশা যে স্বপ্ন-রচনার অবকাশ প্রদান করে, সে স্বপ্ন কত আনন্দের! অ্যান সেই সুখে মগ্ন হইয়া থাকিত—সেই স্বপ্নে বিভোর থাকিত।

কিন্তু ববের ভাব ঠিক তেমন ছিল না। দুর্ব্বল অ্যান যে সবল তাহাকে অবলম্বন করিতে চাহে, তাহাতে তাহার যুবক-হৃদয় গর্ব্বে পূর্ণ থাকিত, এবং সেই গর্ব্বকেই সে ভালবাসা বলিয়া মনে করিত। কিন্তু যে ভালবাসা যুবককে যুবতীর প্রতি আকৃষ্ট করে, তাহার স্বপ্নে বিভোর করে, সহস্র কাজের মধ্যে তাহার মুখ মনে করায়, সে ভালবাসার সঞ্চার সে হৃদয়ে অনুভব করে নাই। কিন্তু অ্যানের প্রতি যে তাহার ভালবাসা নাই, ইহা সে এক দিনও অনুভব করে নাই।

অ্যানের বাড়ীতেই ববের সঙ্গে অ্যাডার পরিচয়। অ্যাডা অবস্থাহেতু আত্মনির্ভরশীল হইয়াছিল। সে যে গৃহে আশ্রয় পাইয়াছিল, সে গৃহে তাহার অধিকার নাই—মাতার নূতন স্বামী তাহাকে আদর করিলেও সে অনুভব করিত, সে আদর আন্তরিকতাহীন—সে আদরে তাহার দাবী নাই—তাহা দয়াদত্ত। কাজেই তাহাকে আপনার উপর আপনি নির্ভর করিতে হইত। সে বুঝিয়াছিল, সংসারে তাহাকে তাহার স্থান খুঁজিয়া সেই স্থানটুকু জুড়িয়া বসিতে হইবে, কেহ তাহার জন্য স্থান দেখিয়া দিবে না, কোনও স্নেহশীল হৃদয় তাহার জন্য সে কষ্ট স্বীকার করিবে না। মা? সে ত তাঁহার কাছে পূর্ব্ব-জীবনের স্মৃতি—তিনি কেবল তাহারই জন্য সে স্মৃতি মুছিয়া ফেলিতে পারিতে-ছেন না। তাহার উপর সে স্বভাবতঃ সবল। যৌবনের চাঞ্চল্য যখন সবলকে আশ্রয় করে, তখন তাহা কথায়—কাজে—হাসিতে—চাহনিতে ফুটিয়া উঠে;

তাহা গোপন করা যায় না। অ্যাডার দেহে ও ব্যবহারে যৌবনের সেই সজীবতার চিহ্ন সর্ব্বদাই সপ্রকাশ থাকিত। সে যে দিনই অ্যানের বাড়ী আসিত, সে দিন বাগানে গাছের টবগুলি সরাইয়া—ঘুরাইয়া—নূতন ভাবে সাজাইয়া দিত। বাগানের এক পাশে একটি ছোট কাঠের চালা ছিল—তাহার উপর লতানে গোলাপের শাখায় অজস্র গোলাপ ফুটিত—তাহার মধ্যে একখানা বেঞ্চ। সেই বেঞ্চে বসিয়া বব সময় সময় অ্যানকে ও অ্যাডাকে লক্ষ্য করিত। অ্যানের শ্রান্ত ভাবে ও অ্যাডার উৎসাহে কি প্রভেদ! অ্যাডার প্রতি তাহার মনে প্রশংসার ভাব উৎপন্ন হইত—কিন্তু সে মনে করিত, তাহা প্রশংসা ব্যতীত আর কিছুই নহে। অ্যাডার সেই উৎসাহচাঞ্চল্য—সে তাহার সজীবতারই বিকাশ। সেই চাঞ্চল্য—কাজ করিতে করিতে তাহার মুখে শ্রমজনিত রক্তাভা—তাহার শ্রমে আনন্দ—তাহার হাসি, এ সব ববের ভাল লাগিত। কিন্তু সে একবারও মনে করে নাই, সে ভাল লাগার সঙ্গে ভালবাসার কোনও সম্বন্ধ থাকিতে পারে; ভাল লাগা ভালবাসার অগ্রদূত হইতেও পারে। সে কথা মনে করিলে সে নিশ্চয়ই আপনাকে সাবধান করিত; কারণ, তাহার আপনার উপর তাহার প্রভুত্বের অভাব ছিল না।

এমনই ভাবে দিন কাটিতে লাগিল। যুদ্ধ আরম্ভ হইলে যখন আর্ম্মি হেড কোয়ার্টার্সে কাজ বাড়িল, তখন প্রথমে যে মেয়েরা কার্য্যপ্রার্থী হইল—অ্যাডা তাহাদের এক জন। তাহার চাকরী হইল। সে মনে করিল, সে এত দিনে আপনার ভার আপনি বহিবার পথ পাইল। তাহার আনন্দের আর অবধি রহিল না। সে সোৎসাহে তাহার কাজ করিতে লাগিল—যেন মুক্তির আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিল।

৪

সে দিন আফিসে ছুটী ছিল। কয় দিন হইতে বৃষ্টিও আর বড় হইতেছিল না—আকাশ শরতের ভাব ধারণ করিতেছিল। সে দিন অ্যাডার আফিসের কয় জন কিশোরী পাল্লা দিয়া বেড়াইতে গিয়াছিল—কে কত দূর হাঁটিয়া যাইতে পারে। তাহারা ম্যাল হইতে রওনা হইয়া গিয়াছিল, কথা ছিল, মসোবরায় ওয়াইল্ড ফ্লাওয়ার হল হোটেলে যাইয়া অপরাহ্নে আহার করিবে, এবং চা পান করিয়া ফিরিয়া আসিবে। সকালে আহারের পর সকলে নির্দ্দিষ্ট স্থানে সমবেত হইয়া হাঁটিতে আরম্ভ করিয়াছিল। মসোবরায় পঁহুছিতেই অনেকে শ্রান্ত

হইয়া পড়িয়াছিল, এবং ফিরিবার সময় অ্যাডা ও আর এক জন ব্যতীত আর সকলেই হার মানিয়া রিক্স গাড়ীতে আসিয়াছিল। অ্যাডা ও তাহার সঙ্গীটি কতক পথ আসিবার পর সঙ্গীটিও হার মানিয়া একখানা চলতি রিক্সয় উঠিয়া বসে। সে বলিয়াছিল, 'অ্যাডা, তোমারই জিত—আমি হার স্বীকার করিলাম; এখন চল, রিক্সয় ফিরিয়া যাই—নহিলে যাইতে রাত্রি হইবে।' অ্যাডা তাহাতে সম্মত হয় নাই। সে একা হাঁটিয়া সিমলায় ফিরিতেছিল। পথের উপর হইতে নিম্নে কুজ্ঝটিকাহীন পর্ব্বতাঙ্গে সরল গাছগুলির ঘনশ্যাম পল্লবশোভা—এখানে ওখানে অযত্নে প্রস্ফুটিত ডালেয়ার বর্ণবৈচিত্র্য বা কুসুমখচিত ঝুমকা-লতার বাহার—এই সব দেখিতে দেখিতে সে সিমলার দিকে অগ্রসর হইতেছিল। পথে যে স্থানটায় একটা সুড়ঙ্গ আছে, তাহারই কিছু দূরে একটা নির্জ্জন স্থানে আসিয়া অ্যাডা একটু বিশ্রামলাভের জন্য একখানা পাথরের উপর বসিল। নিম্নে একটা ঝরণায় জল ঝর-ঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িতেছিল—অ্যাডা চাহিয়া দেখিল, জল এমন সমান ভাবে পর্ব্বতাঙ্গ বাহিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে, যেন ছবিতে ঝরণা আঁকা রহিয়াছে, তাহার পর জল নিম্নে একখানা পাথরের উপর পড়িয়া যেন চূর্ণ হইয়া লক্ষ লক্ষ বিন্দুতে পরিণত হইয়া ছড়াইয়া গড়াইয়া যাইতেছে। দেখিতে অ্যাডার এত ভাল লাগিতেছিল যে, সে কিছুক্ষণ তন্ময় হইয়া তাহা দেখিতে লাগিল। তাহার পর ঝরণার জলধারা যেন একটু অস্পষ্ট হইয়া আসিল। বুঝি কুজ্ঝটিকা উঠিতেছে। অ্যাডা চাহিয়া দেখিল—সূর্য্য ডুবিয়াছে—সন্ধ্যার অন্ধকার আকাশের কনককিরণ শোষণ করিয়া লইতেছে।

সে উঠিবে বলিয়া দস্তানা পরিতেছে, এমন সময় এক জন ইংরাজ সৈনিক সেই স্থানে আসিয়া পড়িল—তাহাকে দেখিয়া অভিবাদন করিল—'গুড ইভিনিং, মিস্।' যুদ্ধের সময় সৈনিকদিগের আদর এত বাড়িয়াছিল যে, তাহারা অপরিচিতাকে এমন ভাবে সম্বোধন করিলেও কেহ তাহাতে অপরাধ লইত না। মানুষ যতই কেন শান্তিপ্রিয় হউক না—যুদ্ধ জগতে স্বাভাবিক অবস্থা—যুদ্ধই সমাজের ও অধিকারের ভিত্তি। সৈনিক তাহার নিদর্শন। তাই সৈনিক মানুষের মনে প্রশংসার আকর্ষণ সংস্থাপন করিতে পারে। সে প্রভাব স্ত্রীলোকের উপর যত অধিক হয়, পুরুষের উপর তত অধিক হয় না। তাই এবার যুদ্ধের সময় সৈনিকেরা যেন রমণীর মনুষ্যত্বের আদর্শ হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাতে অনেক রমণীর সর্ব্বনাশও হইয়াছে।

মাথা নোয়াইয়া প্রত্যভিবাদন জানাইয়া দস্তানার বোতাম আঁটিতে আঁটিতে অ্যাডা উঠিয়া দাঁড়াইল। সৈনিক আসিয়া পাথরখানার উপর বসিয়া বলিল, 'চলিয়া যাইতেছ ?'

সে কথা কহিতেই অ্যাডা মদের গন্ধ পাইল—'হাঁ' বলিয়াই সে সরিয়া আসিবার উদ্যোগ করিল।

সৈনিক তাহার হাত ধরিয়া বলিল, 'মিস্, অত নির্দ্দয় হইও না।'

অ্যাডা হাত ছাড়াইয়া লইবার চেষ্টা করিল—ছাড়াইয়া লইতে পারিল না। তাহার ভয় হইল। চীৎকার করিলেও কেহ শুনিতে পাইবে না—স্থান জনহীন; সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে; সে একা!

এমন সময় অদূরে বাইসিকলের ঘণ্টাধ্বনি শ্রুত হইল—দেখিতে দেখিতে বাইকে চড়িয়া বব সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং এই দৃশ্য দেখিয়াই নামিয়া আসিল। সে অ্যাডার দিকে না চাহিয়াই সৈনিককে জিজ্ঞাসা করিল—'কাপুরুষ, এ কি ব্যবহার ?'

সৈনিক বলিল, 'তুমি কে ?'

সে ববকে ঘুঁসি মারিবার উদ্যোগ করিতেই বব তাহার নাকের উপর ঘুঁসি মারিল। নাক দিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল—সৈনিক অ্যাডার হাত ছাড়িয়া ছুটিয়া পলাইল। অ্যাডা মূর্চ্ছিত অবস্থায় পড়িয়া গেল। বব একবার মনে করিল, ছুটিয়া যাইয়া সৈনিককে ধরে—কিন্তু তাহা হইল না। সে নত হইয়া মূর্চ্ছিতা কিশোরীকে তুলিতে গেল; দেখিল—অ্যাডা!

অ্যাডার মুখ পাণ্ডুবর্ণ—সে তখনও হাঁফাইতেছে—পতনে তাহার গ্রীবার এক স্থান প্রস্তরসংঘর্ষে ছড়িয়া গিয়াছে।

বব নত হইয়া অ্যাডার সংজ্ঞাশূন্য দেহ মৃত্তিকা হইতে তুলিল—তুলিয়া যখন পাথরের উপর রাখিবে, তখন অ্যাডের সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল, সে চক্ষু মেলিল। তখনও ববের দৃঢ় বাহু তাহার অবসন্ন দেহকে বেষ্টিত করিয়া ধরিয়া আছে।

তাহার পর বব শিশুর মত তাহাকে সেই পাথরের উপর শায়িত করিল। অ্যাডার মনে হইল, সে অনাস্বাদিতপূর্ব্ব সুখের আস্বাদন পাইয়াছে—তাহার স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল।

বব বলিল, 'অ্যাডা, তুমি একটু শুইয়া থাক—সুড়ঙ্গের মধ্যে জল আছে, আমি রুমালখানা ভিজাইয়া আনি—তোমার মুখে কাদা লাগিয়াছে।'

অ্যাডা সাগ্রহে হাত ধরিয়া বলিল, 'না। আমার ভয় করিতেছে।'

অগত্যা ববকে বসিতে হইল।

অল্পক্ষণ পরেই অ্যাডা উঠিয়া বসিল—ববকে কৃতজ্ঞতা জানাইবার চেষ্টা করিল, ভাষা পাইল না। কিন্তু বব তাহার দৃষ্টিতেই তাহা বুঝিতে পারিল।

তাহার পর বব আবার রুমাল ভিজাইয়া আনিবার প্রস্তাব করিলে, অ্যাডা বলিল, 'চল, আমিও যাই।'

ববের হাতে ভর দিয়া অ্যাডা উঠিল, এবং তাহার উপর ভর দিয়া চলিতে লাগিল। বব এক হাতে বাইক ঠেলিয়া চলিল—আর এক দিকে অ্যাডা ভর দিল।

এইরূপে সুড়ঙ্গের মধ্যে আসিয়া বব সুড়ঙ্গ-প্রাচীরে বাইকখানা ঠেস দিয়া রাখিয়া জলে রুমাল ভিজাইয়া লইল, এবং তাহাতে অ্যাডার মুখ মুছাইয়া দিল। অ্যাডা মনে করিল, বলে—'বাড়ী যাইয়া ধুইব—এখন ধুইয়া কাজ নাই'—কিন্তু বলিতে ইচ্ছা হইল না।

দুই জনে যখন সুড়ঙ্গের বাহিরে আসিল, তখন অ্যাডা সুস্থ হইয়াছে—তখন আর তাহার চলিবার জন্য অবলম্বনের প্রয়োজন নাই। তবুও সে ববের গাত্রে ভর দিয়াই চলিতে লাগিল—যে কোন দিন অবলম্বন ভালবাসে নাই, আজ তাহার কাছে অবলম্বন ভাল লাগিতে লাগিল—সে যেন একটা অবলম্বনের প্রয়োজন অনুভব করিতে লাগিল। শেষে কিছু দূর চলিয়া পথে একখানা খালি রিক্‌স পাইয়া বব যখন জিদ করিয়া অ্যাডাকে তাহাতে তুলিয়া দিল—তখন অ্যাডার মনে হইল, সমস্ত পথটা কেন সে ববের গায়ে ভর দিয়াই চলিল না? সে ত হাঁটিয়া যাইতে পারিত!

৫

বাইক ঠেলিতে ঠেলিতে বব গল্প করিতে করিতে অ্যাডার রিক্‌সর সঙ্গে চলিল। সিমলা সহরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রথম ডাক্তারখানার সম্মুখে আসিয়াই সে রিক্‌স দাঁড় করাইল। অ্যাডা জিজ্ঞাসা করিল, 'কি হইবে?'

বব বলিল, 'তুমি নামিয়া আইস; তোমার ঘাড়ে যে যে জায়গায় ছড়িয়া গিয়াছে, সেই সেই জায়গায় ঔষধ দেওয়াইব।'

অ্যাডা প্রথমে আপত্তি করিল; কিন্তু বব একটু জিদ করিয়া বলিল, সে আর বাক্যব্যয় না করিয়া তাহার সঙ্গে ডাক্তারখানায় প্রবেশ করিল।

অ্যাডাকে তাহার বাড়ীর দ্বার পর্য্যন্ত পঁহুছাইয়া দিয়া বব বিদায় লইল।

অ্যাডা বলিল, 'তোমাকে ধন্যবাদ দিতেছি—আমি তোমার কাছে বড় কৃতজ্ঞ।'

বব বলিল, 'কৃতজ্ঞতা কিসের জন্য? ও কথা মুখে আনিও না—মনেও করিও না; নহিলে আমি আর কখনও তোমার সঙ্গে কথা কহিব না।'

বিদায়কালে অ্যাডা যখন ববের করে কর স্থাপিত করিল, তখন তাহার মনে হইল, বব একটু দীর্ঘ সময় তাহার হাত আপনার হাতে ধরিয়া রাখিল। ববের মনে হইল, অ্যাডার হাত কাঁপিতেছিল। তাহার পর বাইকের আলো জ্বালিয়া তাহাতে উঠিয়া বব চলিয়া গেল—অ্যাডা গৃহে প্রবেশ করিল।

সে রাত্রিতে শয্যায় শয়ন করিয়া অ্যাডার মনে হইল, সে যেন কোনও গুপ্ত রাজ্যের সন্ধান পাইয়াছে। সে রাজ্য তাহার মনের মধ্যেই ছিল—কিন্তু এত দিন তাহার দ্বার রুদ্ধ ছিল, আজ কোনও যাদুকরের ঐন্দ্রজালিক স্পর্শে সে দ্বার মুক্ত হইয়া গিয়াছে। প্রকৃতির যেমন বসন্ত আছে, জীবনেরও কি তেমনই বসন্ত আছে? সে কি এক দিন সহসা শীতের কুজ্ঝটিকা সরাইয়া পাখীর গান—ফুলের গন্ধ—দক্ষিণা বাতাস আর নীল আকাশ লইয়া দেখা দেয়?

ববেরও মনের মধ্যে সব যেন ওলট-পালট হইয়া গিয়াছিল। অ্যাডার সংজ্ঞাশূন্য দেহ তুলিবার সময় যেমন—নিভৃতে শয্যায় শয়ন করিয়াও তেমনই সে যেন তাহার বুকে কিশোরীর সেই কোমল—তপ্ত—দ্রুত শ্বাসপ্রশ্বাসে স্পন্দিত বক্ষের স্পর্শ অনুভব করিতেছিল। অ্যাডার সেই মূর্চ্ছিত মুখের কথা কেবলই তাহার মনে পড়িতেছিল। সে ভাবিল—এ কি? সে আপনার চিন্তা হইতে আপনি অব্যাহতি পাইবার যথেষ্ট চেষ্টা করিল—পারিল না; শেষে শেষ রাত্রিতে ঘুমাইয়া পড়িল। সকালে ঘুম ভাঙ্গিবার সঙ্গে সঙ্গে যখন তাহার মনের চক্ষুর সম্মুখে আবার অ্যাডার মুখ ফুটিয়া উঠিল, তখন সে আপনার উপর রাগ করিল, এবং কাজে বাহির হইয়া যাইবার পূর্ব্বেই অ্যানের কাছে যাইয়া পূর্ব্ব দিনের সব ঘটনা বিবৃত করিল।

অ্যান যখন বলিল, সে অ্যাডাকে দেখিতে যাইবে, তখন ববই তাহাকে সঙ্গে করিয়া অ্যাডার বাড়ীতে লইয়া গেল।

কিন্তু বব ও অ্যাডা, যে যত চেষ্টাই কেন করুক না—কেহই অপরের প্রতি আকর্ষণ হইতে মুক্ত হইতে পারিল না; বরং চেষ্টার ফলে আকর্ষণ যেন প্রবলই হইতে লাগিল। দুই একবার উভয়ে সাক্ষাৎও হইল। শেষে বব এক দিন অ্যাডাকে বলিল, 'যে কথা অনেক দিন হইতে তোমাকে বলিব বলিব

করিয়া বলিতে পারি না—সে কথা ত আর গোপন করিতেও পারি না। আমি তোমাকে ভালবাসি।'

এ কথা পুরুষ যখন মুখে বলে, রমণী তাহার অনেক পূর্ব্বেই বুঝিতে পারে। অ্যাডা তাহা বুঝিয়াছিল, এবং বুঝিয়াছিল বলিয়াই কেবল ভাবিতেছিল—এ কি হইল? সে ববের কথায় বিন্দুমাত্র বিস্ময় প্রকাশ করিল না; জিজ্ঞাসা করিল, 'কিন্তু অ্যান—?'

বব বলিল, 'আমি সে কথা অনেকবার ভাবিয়াছি; অ্যানের প্রতি আমাকে আকৃষ্ট করিতে চেষ্টাও করিয়াছি। কিন্তু পারিতেছি না। যেখানে ভালবাসা নাই, সেখানে ভালবাসার ভাণ করা—সে আমি পারিব না। বিশেষ, অ্যানের সঙ্গে ছলনা আমি করিব না। এখন যদি আমি তাহাকে বিবাহ করি, তবে সে কেবল তাহার অর্থের লোভে জানিয়া তাহাকে নরকে টানিয়া আনিব।'

অ্যাডা ভাবিতে লাগিল।

বব জিজ্ঞাসা করিল, 'কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি—আমি কি তোমার হৃদয়ে স্থান পাইতে পারি?'

অ্যাডা ববের দিকে চাহিল—তাহার প্রেমপূর্ণ দৃষ্টিতে বব তাহার প্রশ্নের উত্তর পাইল। সে বলিল, 'আমি অ্যানকে সব কথা বলিব। সে আমাকে ক্ষমা করিবে।'

অ্যাডা বলিল, 'এখনই বলিও না।'

'ভাল—তুমি যাহা বলিবে, আমি তাহাই করিব।'

৬

বব কেমন করিয়া অ্যানকে সব কথা বলিবে, তাহারই পরামর্শে এক মাস কাটিয়া গেল—বব অধীর হইয়া উঠিতে লাগিল। এমন সময় সংবাদ আসিল—ববের ডাক পড়িয়াছে, তাহাকে যুদ্ধে যাইতে হইবে।

তখন অ্যানকে কথাটা বলিবার কথা নূতন করিয়া ভাবিতে হইল। বব বলিল, 'আমি যাইবার পূর্ব্বেই অ্যানকে কথাটা বলিয়া যাইব—তাহার সহিত ছলনা করিয়া, তাহার মনে ভুল বিশ্বাস রাখিয়া আমি মৃত্যুক্ষেত্রে যাইতে পারিব না।'

অ্যাডা বলিল, 'কিন্তু তুমি যাইবার সময় তাহার সুখস্বপ্ন নষ্ট করিয়া দিয়া—তাহাকে কাঁদাইয়া যাইবে?'

শেষে দুই জনে অনেক পরামর্শ করিয়া স্থির করিল, বব একখানি পত্রে সব কথা লিখিয়া যাইবে; অ্যাডা সময় বুঝিয়া সেখানি ডাকে দিবে।

যাত্রার পূর্ব্ব দিন বব পত্রখানি অ্যাডাকে দিল—অ্যাডা সেখানি আপনার কাছে রাখিয়া দিল। সে দিন সঙ্কেতানুসারে উভয়ে সামারহিলে আসিয়াছিল। ফিরিবার সময় বব বলিল, 'অ্যাডা, আমি যেন তোমাকে পাইবার উপযুক্ত যশ লইয়া ফিরিতে পারি।' সে অ্যাডার একখানি হাত তুলিয়া লইয়া চুম্বন করিল।

সেই প্রেমনিদর্শন স্মৃতি লইয়া পর দিন বব যুদ্ধক্ষেত্রে যাত্রা করিল।

৭

পথ হইতে বব অ্যাডাকে পত্র লিখিল—'অ্যানকে পত্রখানা দিয়াছ ত? আহা বেচারা বোধ হয় বড় দুঃখিত হইবে। কিন্তু মিথ্যার মধ্যে বাস করিয়া প্রেমহীন দাম্পত্য জীবনযাপন করা নরক। সে সেই নরকযাতনার সম্ভাবনা হইতে মুক্তি পাইলে,সে জন্য এক দিন না এক দিন আমাকে আশীর্ব্বাদ করিবে। উপযুক্ত স্বামীর প্রকৃত প্রেমে তাহার জীবন সুখময় হউক—ইহাই আমার একান্ত কামনা।'

অ্যাডা কিন্তু অ্যানের পত্র ডাকে দিতে পারিল না। বব চলিয়া যাইবার পর হইতে অ্যান এত বিষণ্ণ—সে তাহাকেই একমাত্র বন্ধু জানিয়া তাহার সঙ্গে ববের কথা এত কহে—ভবিষ্যতের স্বপ্নকথা এত বিবৃত করে যে, সহসা তাহার সে সুখস্বপ্ন নষ্ট করিতে অ্যাডার মন সরিতেছিল না। না হয়—দিনকতক পরেই অ্যান প্রকৃত কথা জানিবে।

যুদ্ধক্ষেত্র হইতে—'কামানের গর্জ্জনে শব্দিত পরিখা হইতে' ববের আর এক পত্র আসিল। তাহার শেষাংশে আবার সেই কথা—'অ্যান পত্র পাইয়া কি রাগ করিয়াছে?'

পত্র পাইয়া অ্যাডা মনে করিল—বব পত্র দিতে বলিতেছে, পত্র দিতে তাহার মন সরিতেছে না, এ অবস্থায় তাহার কর্ত্তব্য কি? ববের পত্র বুকে লইয়া রাত্রিতে সে কেবল সেই কথাই ভাবিতে লাগিল। তাহার এ প্রশ্নের উত্তর কে দিবে?

রাত্রিতে অ্যাডা ঘুমাইতে পারিল না। পর দিন প্রভাতে সংবাদপত্র খুলিয়াই সে তাহার প্রশ্নের উত্তর পাইল—কি নির্ম্মম, কি ভীষণ উত্তর! সে

উত্তর তাহার যৌবনস্বপ্নের সঙ্গে সঙ্গে তাহার হৃদয় চূর্ণ করিয়া দিল। শত্রুরা ইংরাজের অধিকৃত পরিখা দখল করিবার উদ্যোগ করিলে প্রত্যাবর্ত্তনকালে সঙ্গীদিগের প্রত্যাবর্ত্তনপথ নিরাপদ করিবার জন্য অসীম চেষ্টা করিয়া বব বীরের শেষ শয়ন গ্রহণ করিয়াছে।

অ্যাডার বুক ভাঙ্গিয়া গেল। শরীর অসুস্থ বলিয়া সে সে দিন আফিসে গেল না—ভাবিল, আর কাঁদিব না। তাহার পর অ্যানের কথা তাহার মনে পড়িল। সেও তাহার সঙ্গে এক শোকে কাতর—আজ সেই তাহার ব্যথার ব্যথী। কোনরূপে আপনার বুকে বল বাঁধিয়া সে অ্যানের কাছে গেল।

তখন অপরাহ্নের আকাশে রবিকর যেন দীপ্ত স্বর্ণবর্ণ ছড়াইয়া দিয়াছে। ম্লানমুখে অ্যান বারান্দার এক পার্শ্বে বসিয়া ছিল—তাহার নয়নও রোদনস্ফীত—তাহার পাণ্ডুগণ্ড বারান্দার নিম্নে সেলভিয়া ফুলের প্রতিবিম্বে রক্তাভ দেখাইতেছে। অ্যাডা কোনও কথা না বলিয়া একখানি চেয়ার টানিয়া অ্যানের পার্শ্বে বসিল। কেহ কোনও কথা কহিল না—উভয়েই অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল। সন্ধ্যার পর অ্যাডা যখন বিদায় লইল, অ্যান তখন অশ্রু-প্লুত কাতরনয়নে তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, 'অ্যাডা, তোমার এই সহানুভূতি আমার পক্ষে দেবতার দান।'

অ্যাডা কোনও কথা না বলিয়া অ্যানের ললাট চুম্বন করিল—অ্যানের অশ্রুতে অ্যাডার অশ্রু মিলিল।

৮

সেই দিন হইতে অ্যাডাই অ্যানের একমাত্র বন্ধু। অ্যাডার সঙ্গলাভের জন্য অ্যানও অ্যাডার আফিসে চাকরী লইল। দুই জনে ববের কত কথাই হয়। কেবল অ্যাডা তাহার বেদনার স্বরূপ অ্যানকে বলে নাই—সে যে কি ব্যথার ব্যথী, তাহা প্রকাশ করে নাই।

* * * *

ববের মৃত্যুর তিন মাস পরে এক দিন অ্যাডা সামরিক আফিসের এডজুটাণ্ট জেনারলের নিকট হইতে একখানি পত্র পাইল—তিনি তাহাকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলিয়াছেন।

পর দিন অ্যাডা সেই আফিসে গেল। এডজুটাণ্ট জেনারল তাহার দুঃখে দুঃখ প্রকাশ করিয়া তাহাকে একটি পদক দিলেন—তাহা সৈনিকের অসাধারণ

বীরত্বের পুরস্কার। বব সেই পুরস্কার অর্জ্জন করিয়াছিল, এবং হাঁসপাতালে মৃত্যুকালে সে পুরস্কারের নিদর্শন অ্যাডাকেই দিতে বলিয়াছিল।

অ্যাডা পদকটি লইল—সাগ্রহে চুম্বন করিল—অশ্রুসিক্ত করিল। তাহার পর তাহার মনে হইল, এ পদক কি সে অ্যানকে দিতে পারে? আজ তাহার বন্ধুত্ব—তাহার সমবেদনা সকল পরাজিত করিয়া তাহার প্রেম দৃঢ়ভাবে উত্তর দিল—না। অ্যাডা বুঝিল, এ উপহারও তাহাকে তাহার ভালবাসারই মত গোপনে রাখিতে হইবে।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

স্থল-পদ্ম।

স্থলপদ্ম! স্থলপদ্ম! ফোটো এখন কোথা?
ফুলবাগানটি আলো ক'রে ফুটেছিলে হেথা!
দুধে-আল্‌তা রঙ্‌টি তোমার, গালটি ভরা হাসি,
এতটুকু দেহে তোমার ছিল রূপের রাশি।
হাসিই ছিল শোভা তোমার, রঙ্‌ যা সে ত হাসি;
রূপ না হাসি—যাই সে ফুটুক, হয় না সে ত বাসি!
স্থলপদ্ম! স্থলপদ্ম! মনে বড় ব্যথা।
রইলে কোথায় কোলটি ছেড়ে কাঁদিয়ে আমায় হেথা॥

শ্রীযতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

ওড়িষ্যার সাময়িক সাহিত্য।

ওড়িয়া সাময়িক সাহিত্যের এখনও শৈশব। বিগত শতাব্দীর শেষার্দ্ধে ওড়িষ্যায় ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হয়। ইহার ফলে সাময়িক সাহিত্যের সৃষ্টি।

১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দ ওড়িষ্যার এক চিরস্মরণীয় বৎসর। সেই বৎসরে লক্ষ লক্ষ নরনারী দুর্ভিক্ষ-রাক্ষসের করাল কবলে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে। দেশব্যাপী এই নিদারুণ হাহাকার, অন্নহীনের এই মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদের মধ্যে ওড়িষ্যার সর্ব্বপ্রথম সাপ্তাহিক পত্রিকা—'উৎকল-দীপিকা'র জন্ম হয়। নানা বাধা, নানা বিঘ্ন সত্ত্বেও ইহা যে অদ্যাবধিও জীবিত—তাহা কেবল ইহার প্রথম সম্পাদক শ্রীগৌরীশঙ্কর রায়ের জীবনব্যাপী অক্লান্ত পরিশ্রম ও অসাধারণ

স্বার্থত্যাগের ফলে। ইহার জন্মের পর কত যে মাসিক, পাক্ষিক, সাপ্তাহিক জলবুদ্বুদের মত ক্ষণস্থায়ী জীবন লইয়া উঠিয়াছে ও পড়িয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। এই সকল অল্পায়ু মাসিক পত্রিকাগুলির মধ্যে বালেশ্বর হইতে প্রকাশিত 'উৎকল-দর্পণ' (১৮৭৩), শ্রীপ্যারীমোহন আচার্য্য সম্পাদিত 'উৎকল-পুত্র' (১৮৭৪), কটকের 'উৎকল-মধুপে'র (১৮৭৮) নাম উল্লেখ-যোগ্য। এই পত্রিকাগুলিতে কবি রাধানাথ রায়, কবি মধুসূদন রাও, ঔপন্যাসিক ফকিরমোহন সেনাপতি, নাট্যকার রামশঙ্কর রায় প্রভৃতি এই যুগের ওড়িয়া সাহিত্যরথিগণের রচনা প্রথম প্রকাশিত হয়।

বিংশ শতাব্দীর ওড়িয়া মাসিকপত্রিকাগুলির মধ্যে 'উৎকল-সাহিত্যে'র স্থান অতি উচ্চ। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীবিশ্বনাথ কর এই পত্রিকা প্রকাশিত করেন। আজ তেইশ বৎসর এই অক্লান্তকর্ম্মী সম্পাদক প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিয়া কত বিদ্রূপ, কত উপেক্ষা সহ্য করিয়া তাঁহার এই ক্ষুদ্র তরীটিকে সাফল্যের কূলে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছেন। বহুসংখ্যক নবীন লেখক এই পত্রিকা দ্বারা প্রথম সাহিত্যক্ষেত্রে আকৃষ্ট হইয়া এখন যশস্বী হইয়াছেন।

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে মান্যবর শ্রীব্রজসুন্দর দাসের সম্পাদকতায় 'মুকুর' প্রকাশিত হয়। নবীন লেখকদিগকে উৎসাহ-দান ইহার সর্ব্বপ্রথম লক্ষ্য।

পুরী জিলায় সাক্ষীগোপাল একটি হিন্দুতীর্থ। সেখানে উচ্চশিক্ষিত স্বার্থত্যাগী বহুসংখ্যক যুবক নূতন পদ্ধতিতে পরিচালিত একটী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। সাক্ষীগোপাল এখন শিক্ষা ও জ্ঞানপ্রচারের এক কেন্দ্র হইয়াছে। ইঁহারা ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে 'সত্যবাদী' নামক একখানি পত্রিকা প্রকাশিত করেন। এই পত্রিকা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ওড়িষ্যায় স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিতে পারিয়াছে।

'উৎকল-সাহিত্যে'র ফাল্গুন সংখ্যায় প্রথমেই 'ওড়িষ্যার শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক ফকিরমোহন সেনাপতির কর্ম্মবহুল বিচিত্র জীবনকথা। ৪০ বৎসর পূর্ব্বের করদ রাজ্য ঢেঙ্কানলের অতি সুন্দর চিত্র! পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বাণীভূষণের 'নাগানন্দে'র অনুবাদ ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইতেছে। রায় সাহেব অন্নদাচন্দ্র দাসের Scott's Lay of the Last Minstrelর অনুবাদ উপাদেয় হইয়াছে। শ্রীশশিভূষণ রায় বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর সমালোচনা করিয়াছেন। আজ কাল বিদ্যালয়ে যে শিক্ষাপদ্ধতি অনুসৃত হয়, তাহাতে বালকগণের বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ না হইয়া হ্রাস হয়। শৈশবে যে বালক তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালী বলিয়া প্রশংসিত হইত, কিছু কাল বিদ্যালয়ে শিক্ষার পর তাহার বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা কমিয়া গিয়াছে, এমনও দেখা যায়। না বুঝিয়া মুখস্থ, বোধ হয়, আর কোনও দেশের বালককে এত বেশী করিতে হয় না। যে দেশের বিদ্যালয়ে শিশুকে ঘোড়ার অর্থ অশ্ব, সিংহের অর্থ মৃগেন্দ্র, ভয়ের অর্থ ভীতি শেখান হয়, সে দেশের ভবিষ্যৎ যে উজ্জ্বল নহে, তাহা বলাই বাহুল্য।

পৌষের 'মুকুরে' শ্রীজগবন্ধু সিংহ 'প্রাচীন উৎকল' শীর্ষক প্রবন্ধে অনেক প্রাচীন ওড়িয়া কবির পরিচয় দিয়াছেন। বলরাম দাস রাজা প্রতাপরুদ্র দেবের সমসাময়িক এক জন কবি। জাতিতে কায়স্থ হইলেও পরম ভক্তিপরায়ণ বৈষ্ণব বলিয়া সর্ব্বত্র সম্মানিত হইতেন। ইঁহার প্রধান কীর্ত্তি রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবতের সরল ওড়িয়া অনুবাদ। ইঁহার ওড়িয়া

ভাগবত এখনও ওড়িষ্যার পল্লীতে পল্লীতে প্রতি সান্ধ্য-বৈঠকে সুরসংযোগে গীত হয়। কিংবদন্তী আছে যে, বলরাম শূদ্র বলিয়া জগন্নাথের রথে আরোহণ করিবার অনুমতি পান নাই। মনের দুঃখে তিনি সমুদ্রতীরে বালুকার উপর জগন্নাথের মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া তদ্‌গতচিত্তে মহাপ্রভুর ধ্যান করিতে থাকেন। ভক্তাধীন ভগবান সেই কাতর প্রার্থনা শুনিয়া সেই স্থানে তাঁহাকে দেখা দেন। 'বিদগ্ধচিন্তামণি'-রচয়িতা কবি অভিমন্যু সামন্তসিংহার রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার এই গ্রন্থ-রচনা সম্বন্ধে একটী কিংবদন্তী আছে। কবিজায়া অতিশয় পতিব্রতা, সাধ্বী ছিলেন। তিনি প্রায়ই বলিতেন যে, তোমার বিহনে আমি বাঁচিব না। কবি এই উক্তি পরীক্ষা করিবার মানসে এক দিন তাঁহার মিথ্যা মৃত্যুসংবাদ লোকমুখে পত্নীর নিকট প্রচার করেন। এই সংবাদ শুনিয়াই কবিজায়ার সংজ্ঞালোপ হয়। অল্পক্ষণ পরে কবি এই সংবাদ-প্রেরণের ফলাফল জানিবার জন্য গৃহে ফিরিয়া দেখিলেন যে, পত্নীর প্রাণপক্ষী উড়িয়া গিয়াছে। শোকে অধীর হইয়া তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া সারাজীবন ধর্ম্মালোচনায় অতিবাহিত করেন। 'বিদগ্ধচিন্তামণি'তে কবি অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন—পদলালিত্যে ও ভাবসম্পদে ইহা অতুলনীয়। একটী পদের মূল ওড়িয়াতে উদাহরণ-স্বরূপ প্রদত্ত হইল :—

শরৎ-বর্ণনা।—'শরদ রে নীরদ বিশদ প্রভা
জলজলজ নভনির্ম্মল আভা যে।
মুনিকাশ কুসুম বিকাশ হেলে
পত্র আবলি লোধ্র তরু বহিলে যে।
ত্রিনেত্র পত্র হেলে অতি সমস্ত
পুরে পুরে কুমারী গীত বহুত যে।
কেদার পক্ক দেখি আনন্দ কীর
পর্ব্বে তোষিলে দেবী অবনিশ্বর যে।'

ভীমা ধীবর নামক এক কৈবর্ত্তজাতীয় কবি যুধিষ্ঠিরের অক্ষক্রীড়ার উপাখ্যান 'কপটপাশা' গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন। কবি অরক্ষিত দাস শূন্যসংহিতা, জ্ঞানটীকা রচনা করিয়াছেন। ইনি নামবাদী ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা।

ফাল্গুনের 'সত্যবাদী'তে শ্রীকৃপাসিন্ধু মিশ্র 'ইংরাজ বণিকদিগের ওড়িশাভিগমন' প্রবন্ধে বঙ্গোপসাগরে ইংরাজ বণিকের বালেশ্বরে প্রথম কুঠী-স্থাপনের বিবরণ দিয়াছেন। বহুকালাবধি বালেশ্বর বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র ছিল। সমুদ্রগামী পোত সকল বালেশ্বর বন্দরে আসিত। কিন্তু বালেশ্বরের এই সৌভাগ্য স্থায়ী হইল না। হুগলী বাণিজ্য-কেন্দ্র হইল। বলঙ্গা নদীর মোহানা বালুকা দ্বারা অবরুদ্ধ হওয়ায় বাণিজ্য-পোত বালেশ্বর পর্য্যন্ত আসিতে পারিত না। এ দিকে আবার পশ্চিমে মহারাট্টাদিগের অত্যাচারে দেশের শিল্প, ব্যবসায় শ্রীহীন হইয়া পড়িল। বালেশ্বরের প্রসিদ্ধ তাঁতীরা তাহাদের তাঁত ফেলিয়া দেশবিদেশে পলায়ন করিল।

শ্রীগোপীনাথ নন্দশর্ম্মা 'ওড়িয়া শব্দসন্দর্ভে' ওড়িয়া ও বাঙ্গালা ভাষার উচ্চারণের তুলনা-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—'ওড়িয়া ভাষা অপেক্ষা বাঙ্গালা ভাষায় 'শ' ও 'ষ'কারের উচ্চারণ সমধিক। ওড়িয়ায় যেখানে 'স' ও 'জ'কার উচ্চারিত হয়, বাঙ্গালীরা সেই স্থলে যথাক্রমে 'শ' ও 'য'

উচ্চারণ করেন; এবং ওড়িয়া শব্দের 'অ'কার ও 'উ'কারের স্থলে বাঙ্গালায় 'আ' ও 'ও'কার দেখা যায়। যথা—

উড়িয়া	বাঙ্গালা
অন্ধার	আঁধার
অথর	আথর
আউড়াইবা	আওড়ান
পিণ্ড	পিণ্ড ইত্যাদি।

শ্রীভূপতিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

দ্বিতীয় পক্ষ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ করা কর্ম্মভোগ ছাড়া যে আর কিছুই নহে, ইহা বিশ্বনাথ আকুলি সেই দিন বুঝিতে পারিলেন, যে দিন মাতঙ্গিনী প্রথম ঘর করিতে আসিয়া আপনার ঘর সংসার বুঝিয়া লইবার চেষ্টা করিল। সেই দিন আকুলি মহাশয় স্পষ্ট বুঝিলেন যে,লোকের নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া, রাগে ছোট ভাইটাকে পৃথক্ করিয়া দিয়া, এবং মাতঙ্গিনীর ভাই গণেশ চক্রবর্ত্তীকে সাড়ে চারি শত টাকা দিয়া চত্বারিংশদ্ বর্ষ বয়সে এই চতুর্দ্দশবর্ষীয়ার পাণিগ্রহণ আদৌ নীতি-সম্মত হয় নাই। এ বয়সে এই নবীন পত্নীর মনস্তুষ্টিসাধন অপেক্ষা বিশ্বনাথের তুষ্টিসাধনের চেষ্টা করিলে ইহকালে শান্তি এবং পরকালে সদ্গতি লাভ হইতে পারিত।

সে সদ্গতিলাভের আকাঙ্ক্ষা আকুলি মহাশয়ের যে একেবারেই ছিল না, এমন নহে, এবং প্রথমা পত্নীর স্বর্গলাভের পর পাঁচ বৎসরকাল সেইরূপ চেষ্টাই করিয়া আসিতেছিলেন। প্রথম প্রথম পুনরায় বিবাহ করিবার জন্য অনেকেই অনুরোধ করিয়াছিল; এমন কি, ছোট ভাই শ্রীপতি দুই একটা সম্বন্ধও স্থির করিয়া ফেলিয়াছিল। কিন্তু বিশ্বনাথ তখন রূঢ়ভাবেই সে সকল সম্বন্ধ প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন, এবং কনিষ্ঠের কাকুতি মিনতির উত্তরে বলিয়া-ছিলেন, 'আর কেন ভাই, তুই বেঁচে থাক্, যেমন হোক তোর তো দুটী হয়েছে, বাপের জলপিণ্ড লোপ পাবে না। সম্বলের মধ্যে তো গামছা আর নামাবলি। যজমান আজ আছে, কাল নাই, আকাশবৃত্তি। এর উপর

আর সংসারের ভার বাড়িয়ে জড়িয়ে পড়ার চাইতে ছেলে দু'টোকে মানুষ ক'রবার চেষ্টা কর।'

শ্রীপতিও বুঝিল, যুক্তি মন্দ নহে। বাস্তবিক, যেরূপ দিন কাল পড়িয়াছে, তাহাতে দিন চলাই দায়। সম্পত্তির মধ্যে কয়েক ঘর যজমান ; যজমানের আয়ও আর পূর্ব্ববৎ নাই। যে দুই চারি বিঘা ব্রহ্মোত্তর আছে, তাহাতে কোনও বৎসর ফসল হয়, কোনও বৎসর হয় না। সে বৎসর হয় তো কিছু দেনাও করিতে হয়। এ অবস্থায় তিন চারি শত টাকা খরচ করিয়া বিবাহ দেওয়া সুযুক্তির কাজ হয় না। আর এই টাকাটাও ঘর হইতে বাহির হইবে না, দেনা করিতে হইবে। সে দেনা যে কিরূপে শোধ যাইবে, তাহারও কোনও নিশ্চিত নাই। সুতরাং জ্যেষ্ঠের উপদেশমত নিরস্ত হওয়াই ভাল।

এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া শ্রীপতি নিরস্ত হইল। বিশ্বনাথও বিশ্বনাথের চিন্তায় পরকালের পথটা সুগম করিয়া আনিতে লাগিলেন।

এমনই করিয়া চারিটা বৎসর কাটিয়া গেল। এই চারি বৎসরে বিশ্বনাথ যে কেবল বিশ্বনাথের চিন্তাতেই চিত্তটাকে সমর্পণ করিতে পারিলেন, তাহা নহে ; হিসাব করিয়া দেখিলে ইহার অধিকাংশ সময়টাই যে ইহকালের চিন্তায় অতিবাহিত হইয়াছে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ থাকে না। আবার সাংসারিক চিন্তার মধ্যে নিজের চিন্তার অংশই বেশী হইয়া পড়ে। সংসারে থাকিতে হইলেই সংসারের নানা জ্বালা যন্ত্রণা আছে ; শরীরের সুখ অসুখ, মনের শান্তি অশান্তি সকলই আছে। সময়ে সময়ে এমন একটা অবস্থা দাঁড়ায় যে, সে অবস্থায় এক জন স্ত্রীলোকের সহায়তা-গ্রহণ অত্যাবশ্যক হইয়া পড়ে, এবং সে সহায়তাটুকু না পাইলে যেরূপ কষ্টে সেই অবস্থাটা কাটাইয়া উঠিতে হয়, তাহাতে অতি বড় ধৈর্য্যশীল ব্যক্তিরও ধৈর্য্য বিচলিত হইয়া পড়ে। জ্বর হইয়াছে, মাথার যাতনায় ছটফট করিতেছে, সে সময়ে এক জন কাছে বসিয়া মাথায় একটু বাতাস দিলে বা কপালে হাত বুলাইয়া দিলে যাতনার অনেক উপশম হয়। বিশ্বনাথ ছোট ভাইকে ডাকিলেন ; কিন্তু সে তখন যজমান-বাড়ী গিয়াছে ; ভাদ্রবধূ কাছে আসিবে না, বড় ভাইপো কালী পাঠশালায়, ছোট ফটিক খেলা ছাড়িয়া রুগ্ন জ্যেঠামশায়ের যাতনাসূচক আর্ত্তনাদ শুনিতে কিছুতেই স্বীকৃত হইবে না। বিশ্বনাথ বিছানায় মাথা ঠুকিয়া, কপালে হাত চাপড়াইয়া, আর্ত্তনাদে গৃহখানাকে কাঁপাইয়া তুলিলেন ; কিন্তু তাহাতে বাড়ীর লোকদের বিরক্তিসঞ্চার ব্যতীত তাঁহার যন্ত্রণার কিছুমাত্র উপশম

হইল না। সেই অবস্থায় পড়িয়া বিশ্বনাথ ভাবিয়া স্থির করিলেন, সংসারে থাকিতে হইলে বিবাহ করা নিতান্তই আবশ্যক, এবং এবার অসুখ হইতে উঠিয়াই তিনি এই অত্যাবশ্যক কার্য্যটী সম্পন্ন করিয়া ফেলিবেন।

কিন্তু অসুখ সারিয়া গেলে যখন মাথার যাতনা কিছুমাত্র অনুভূত হইত না, এবং মাথায় বাতাস দিবার লোকেরও কোনও প্রয়োজন থাকিত না, তখন ভাবিতেন, 'ছিঃ, এ বয়সে আবার বিবাহ! অসুখ তো দু'দিন, কিন্তু বিবাহ করিলে অশান্তি যে বারো মাস।' দিন কতক দুই বেলা ভাত খাইয়া দেহটা একটু সবল হইলেই তিনি বিবাহের প্রয়োজনীয়তাটা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইলেন।

সমস্ত দিন উপবাস দিয়া যজমানের সত্যনারায়ণপূজা সারিয়া রাত্রিতে বিশ্বনাথ বাড়ী ফিরিলেন। ছোটবৌ তখন ছেলেদের লইয়া শুইয়া পড়িয়াছেন। অনেক ডাকাডাকির পর তিনি উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিলেন। বিশ্বনাথ তাহার সম্মুখে চাউলের পুঁটুলীটা ধপাস করিয়া ফেলিয়া দিয়া নিজের ঘরে গেলেন। ঘর অন্ধকার। বিশ্বনাথ দেশলাই খুঁজিয়া লইয়া আলো জ্বালিলেন। মুখে হাতে জল দিবার জন্য গাড়ুটা লইয়া দেখিলেন, তাহাতে বিন্দুমাত্র জল নাই। ছোটবৌ জল তুলিয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু ছেলেরা যে কখন সব জলটুকু ফেলিয়া দিয়াছে, তাহা সে লক্ষ্য করে নাই। বিশ্বনাথ কিন্তু ছেলেদের দোষ বুঝিলেন না; তিনি রাগে ছোট বউয়ের উপর তর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। ছোটবৌ তাড়াতাড়ি এক ঘটী জল রাখিয়া গেল।

মুখ হাত ধুইয়া বিশ্বনাথ তামাক আনিতে গেলেন। কিন্তু ভাঁড়ে একটুও তামাক নাই। সেটা যে তাঁহার নিজেরই বিস্মৃতির ফল, ইহা বুঝিলেও, তিনি রাগে হুঁকা কলিকা আছড়াইয়া দিয়া আপনার অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে দিতে দাবার উপর আসিয়া বসিলেন। ছোটবৌ নিজের ঘর হইতে এক ছিলিম তামাক দিয়া গেল। বিশ্বনাথ হয় তো তাহা সাজিয়া খাইলেন, নয় তো অন্ধকার দাবার উপর গুম্ হইয়া বসিয়া রহিলেন। অতীতের স্মৃতি আসিয়া তাঁহাকে বর্ত্তমান জীবনের সহিত অতীত জীবনের পার্থক্য বুঝাইয়া দিতে লাগিল।

হায়, তখনও তো তিনি এইরূপে কত দিন বাড়ী ফিরিয়াছেন। তখন কিন্তু একটা ডাকের বেশী দুইটা ডাক দিতে হইত না। শুধু তাঁহার কণ্ঠধ্বনিটা শুনিবার জন্যই কে প্রস্তুত হইয়া বসিয়া থাকিত। বাড়ী ঢুকিলেই হাত হইতে পুঁটুলীটা কাড়িয়া লইয়া গাড়ু, গামছা আগাইয়া দিত, এবং পা ধুইয়া হাত মুখ না মুছিতেই কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে হুঁকাটা তাঁহার সম্মুখে

ধরিত। তার পর তামাক খাওয়া শেষ না হইতেই ভাত বাড়িয়া ডাকিত, 'উঠে এস।'

বিশ্বনাথ যদি বলিতেন, 'থাম না, তামাকটা খেয়ে নিই।' তাহা হইলে কোমল তিরস্কারের স্বরে বলিত, 'খালি পেটে অত তামাক টানে না, পেটে এক মুঠো দিয়ে সারারাত ধ'রে তামাক খেও, কেউ তোমাকে বারণ করবে না।'

হয় তো সে কাছে আসিয়া বাঁ হাতে হুঁকাটা কাড়িয়া লইত। আর আজ! শুক্‌না গাড়ুটা গড়াগড়ি যাইতেছে, ঘরে আলো জ্বালিবারও লোক নাই, তামাকের ভাঁড় খালি পড়িয়া রহিয়াছে; নিজে যতক্ষণ ভাত দিতে না বলিব, ততক্ষণ কেহ ভাত দিবে না; ভাত দিলেও তাহা খাওয়াইবার জন্য তেমন আগ্রহ কাহারও নাই। উঃ, সংসারের কি বিড়ম্বনা! বিশ্বনাথের দুই চোখ বহিয়া হুহু করিয়া জল গড়াইত।

না, সংসারে থাকিতে হইলে সংসারীর মত থাকাই দরকার; সংসারে সন্ন্যাসী সাজিয়া থাকা চলে না। রক্তমাংসের শরীর; ক্ষুধা তৃষ্ণা, রাগ তাপ, সুখ দুঃখ সকলই আছে। এগুলা নিয়মিত করিয়া শরীর-যন্ত্রটাকে ঠিক পথে চালাইতে পারে, এমন এক জন লোকের দরকার।

কিন্তু আহারান্তে মাথাটা যখন ঠাণ্ডা হইয়া আসিত, তখন এই দরকারী লোকটাকে আনিয়া আপনার সুখস্বাচ্ছন্দ্য বর্দ্ধিত করা উচিত কি না, তাহা ভাবিয়া স্থির করা হইত যে, এই রকম লোকটা খুব দরকারী বটে, কিন্তু সকল লোকই যে ঠিক তাহার মত হইবে, তাহারই বা নিশ্চয়তা কি? যদি না হয়, তখন যে 'লাভঃ পরং গোবধঃ'। তখন যে ঝকমারীর মাশুল দিতে প্রাণ ওষ্ঠাগত হইবে।

তখন যদি কোনও বিষয়ে ত্রুটীর জন্য শ্রীপতি পত্নীকে তিরস্কার করিত, তাহা হইলে বিশ্বনাথ তাহাকে প্রবোধ দিয়া বলিতেন, 'ওরে ভাই, সংসারে এত খুঁটীনাটী ধরতে গেলে কি চলে? ঐ তো একটা প্রাণী, ক'দিক্ দেখবে?'

এমনই করিয়া কখনও ধৈর্য্য, কখনও বা অধৈর্য্যের সহিত চারিটী বৎসর কাটিয়া গেল। কিন্তু পঞ্চম বর্ষে ঘটনাস্রোত এমনই বিপরীত দিকে প্রবাহিত হইল যে, বিবাহ করাকেই বিশ্বনাথ শ্রেয়ঃ জ্ঞান করিলেন, এবং একটা কঠিন শপথ করিয়া বিবাহে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সে বৎসর ফাল্গুন মাসে এক যজমানের বিবাহ দিতে বিশ্বনাথ কলিকাতায় গিয়াছিলেন। ফিরিবার সময় গাড়ীতে এমন জ্বর হইল যে, গাড়ী হইতে নামিয়া তিনি বাড়ী পর্য্যন্ত যাইতে পারিলেন না, পথে হেয়াতপুরে গণেশ চক্রবর্ত্তীর বাড়ীতে আশ্রয় লইলেন। গণেশের সঙ্গে তাঁহার বেশ জানাশুনা ছিল, দূর সম্পর্কে কুটুম্বিতার একটু গন্ধও ছিল। সুতরাং সেখানে তাঁহার অযত্ন হইল না; গণেশ ডাক্তার আনিয়া ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা করিল, আর তাহার অবিবাহিতা ভাগিনেয়ী মাতঙ্গিনী প্রাণপণে অতিথি ব্রাহ্মণের সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিল।

মাতঙ্গিনীর বয়স তখন চৌদ্দ বৎসর; মাতৃপিতৃহীন হইয়া মাতুলের আশ্রয়েই বাস করিতেছিল। মাতুলও তাহাকে সযত্নে লালন পালন করিতেছিলেন। কেন না, তাহার দ্বারা মাতুলের খুব একটা লাভের আশা ছিল। গণেশ শ্রোত্রিয়, মাতঙ্গিনীও শ্রোত্রিয়ের মেয়ে। সুতরাং যে কোনও শ্রোত্রিয়ের হাতে তাহাকে অর্পণ করিলে কন্যাপণস্বরূপ কিছু টাকা হাতে আসিবেই। ইহার উপর মাতঙ্গিনীর রূপও একটু ছিল, মুখের চেহারাটাও মন্দ ছিল না। ঠিক পানের মত না হইলেও মুখখানা বেশ সৌষ্ঠবসম্পন্ন, ঠোঁট দু'টীতে একটু লালের আভাও ছিল। বিশেষ, টানা চোখ দুইটীতে মুখের সৌষ্ঠব যেন একটু বাড়িয়া গিয়াছিল, এবং তাহার দ্বারাই মুখের অন্যান্য সৌন্দর্য্যের যে একটু আধটু ত্রুটী ছিল, তাহার পূরণ হইয়া গিয়াছিল।

মাতঙ্গিনী বারো বছরে পা দিতেই গণেশ তাহার বিবাহের চেষ্টা দেখিতেছিলেন, কিন্তু দুই বৎসরেও মনোমত পাত্র খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না। এ দিকে মেয়ের বয়স যতই বাড়িয়া উঠিতেছিল, গৃহিণী স্বামীকে ততই তাড়া দিতেছিলেন, এবং মেয়ে বড় হওয়ায় পাড়ায় পাড়ায় যে নিন্দার সূচনা হইয়াছে, তাহাও বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। গণেশ কিন্তু তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, মনোমত পাত্র না পাইলে তো বিবাহ দেওয়া যায় না। মা-বাপ-মরা মেয়ে, যেমন তেমন ছেলের হাতে ধরিয়া দিলে লোকে নিন্দার আরও অবসর পাইবে। এ কথায় গৃহিণীকে নিরস্ত হইতে হইল।

আসল কথা, মনোমত পাত্রের অভাব হয় নাই, অভাব হইয়াছিল মনোমত টাকার। মেয়ের রূপ ও বয়স দেখিয়াও কেহই দুই শত টাকার অধিক দিতে স্বীকৃত হইতেছিল না। কিন্তু তিন বৎসর প্রতিপালন করিয়া এমন

সুরূপা বয়ঃস্থা মেয়েটাকে এত অল্প টাকায় বিক্রয় করিতে গণেশের মন সরিতেছিল না। দুই শত টাকার মধ্যে খুব কম করিয়া খরচ করিলেও বিবাহে পঞ্চাশটা টাকা খরচ হইবেই। বিবাহের পরও কোন্ না একটা বৎসর খাওয়া পরা যোগাইতে হইবে। তাহারও দাম কোন্ না পঞ্চাশটা টাকা। তাহা হইলে বাকী থাকে মাত্র এক শত টাকা। এক শত টাকার আশায় তিনি কি এত কাল খাওয়া পরা যোগাইয়া আসিতেছেন ? অন্ততঃ তিন শত টাকার কমে তিনি এই দাঁও ছাড়িতে পারেন না। কাজেই পাত্রের অভাব না থাকিলেও চৌদ্দ বছরেও মাতঙ্গিনীর বিবাহ হয় নাই। লোকে এ সম্বন্ধে কোনও কথা তুলিলে গৃহিণী তাহাদিগকে আশ্বাস দিয়া জানাইতেন যে, জন্ম মৃত্যু বিবাহ এই তিন কাহারও হাত-ধরা নয়। বিবাহের ফুল না ফুটিলে তো বিবাহ হইবে না।

বিবাহের ফুল না ফুটিলেও যৌবনকুসুম কিন্তু আস্তে আস্তে ফুটিয়া উঠিতেছিল, এবং তাহার বিকাশে মাতঙ্গিনীর দেহখানার উপর দিয়া যেন একটা লাবণ্যের মৃদু হিল্লোল বহিয়া যাইতেছিল। প্রতি অঙ্গের যেখানে যেটুকু অসম্পূর্ণতা ছিল, তাহা ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ হইয়া আসিতেছিল, টানা টানা চোখ দুইটাতে একটু মাদকতা আসিয়া দৃষ্টিটাকে একটু তীব্র—একটু অলস করিয়া তুলিয়াছিল। আর কোথা হইতে একটা অজ্ঞাত সঙ্কোচ আসিয়া সেগুলাকে ঢাকিয়া ফেলিবার জন্য সর্ব্বদাই যেন সচেষ্ট হইতেছিল।

সেই নবযৌবনবিকশিত দেহ লইয়া মাতঙ্গিনী যখন রুগ্ন অতিথির সেবায় ব্যাপৃত হইল, তখন বিশ্বনাথ গণেশ চক্রবর্ত্তীর আতিথেয়তা অপেক্ষা এই সেবাপরায়ণা কিশোরীর সেবানিপুণ হাত দুইখানির কোমল স্পর্শটাকেই বেশী করিয়া অনুভব করিতে লাগিলেন। নিদাঘশুষ্ক নদীগর্ভে আকস্মিক প্লাবনের মত তাঁহার প্রৌঢ় হৃদয়ে একটা আকাঙ্ক্ষার মৃদু প্লাবন আসিয়া সংযমের বাঁধের নায়ে এক একটা তরঙ্গের আঘাত দিতে লাগিল।

দিব্যি মেয়েটী! যেমন রূপ, তেমন গুণ। রূপের অপেক্ষা গুণই বরং বেশী। অজ্ঞাত অপরিচিত বৃদ্ধ, তাহার উপর কত যত্ন, কত মমতা ; যেন কত আপনার জন! স্ত্রী থাকিতে রোগশয্যায় এমনই সেবা পাওয়া যাইত বটে, কিন্তু এই সেবা সে সেবা অপেক্ষাও যেন অধিকতর মিষ্ট। হাতখানি কি নরম, তাহার স্পর্শ কি কোমল, কি আরামপ্রদ! বিবাহ তো করিব না, কিন্তু যদি বিবাহ করিতে হয়, তবে এইরূপ সেবাপরায়ণা গুণবতী একটী স্ত্রী

পাইলে এ বয়সে যেন অনেক আরাম, অনেকটা শান্তি পাওয়া যায়। কিন্তু ছিঃ, আবার!

রোগশয্যায় পড়িয়া এমনই একটা চিন্তা লইয়া বিশ্বনাথ যখন রোগযন্ত্রণা বিস্মৃত হইতেন, তখন মাতঙ্গিনী সহাস্যমুখে আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইত, এবং বিশ্বনাথের কাণে বীণার ঝঙ্কারের প্রতিধ্বনি তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিত, 'এখন কেমন আছেন?'

বিশ্বনাথও হাসিয়া উত্তর দিতেন, 'মন্দ নয়।'

'মাথার যাতনা আছে?'

'সামান্য।'

বিশ্বনাথ মিথ্যা বলিতেন। মাথার যাতনা তখন একটুও না থাকিলেও মাতঙ্গিনীর সুকোমল হস্তের স্পর্শলাভের লোভটুকু সংবরণ করিতে না পারিয়া বলিতেন, 'সামান্য।' মাতঙ্গিনী ধীরে ধীরে আসিয়া শিয়রে বসিত, এবং হাতখানি বাহির করিয়া বিশ্বনাথের কপালের উপর রাখিত। সে স্পর্শে বিশ্বনাথ যেন আচ্ছন্নভাবে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া পড়িয়া থাকিতেন। জানালার ফাঁক দিয়া ফাল্গুনের বাতাস ঝির্-ঝির্ করিয়া বহিয়া যাইত; তাহার সঙ্গে আম্রমুকুলের গন্ধ আসিয়া প্রাণের রুদ্ধ দ্বারে ধীরে ধীরে আঘাত করিতে থাকিত।

তার্ পর জ্বর যখন ক্রমে সারিয়া আসিল, এবং সেই সঙ্গে মাতঙ্গিনীর সমাগম ও স্পর্শসুখসৌভাগ্য বিরল হইয়া উঠিতে লাগিল, তখন বিশ্বনাথ অন্তরের মধ্যে যেন একটা ব্যাকুলতা অনুভব করিতে লাগিলেন। কিন্তু সে ব্যাকুলতা প্রকাশ করিবার কোনও অবসর পাইলেন না। পুষ্পপল্লববিহীন শুষ্কপ্রায় প্রাচীন বৃক্ষটি মলয়স্পর্শে অন্তরে একটা সিহরণ অনুভব করিলেও যেমন শাখা-পল্লব-সঞ্চালনে সে সিহরণ ব্যক্ত করিতে না পারিয়া শুধু স্তব্ধ-ভাবে দাঁড়াইয়া থাকে, বিশ্বনাথও তেমনই হৃদয়ের অব্যক্ত উচ্ছ্বাস হৃদয়েই চাপিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

একটু সুস্থ হইয়া উঠিলে গণেশ এক দিন তাঁহার কাছে বসিয়া গল্প করিতে করিতে আপনার সাংসারিক অস্বচ্ছলতার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিলেন, এবং মাতঙ্গিনীর বিবাহ দিয়া সে অস্বচ্ছলতা দূর করিতে সচেষ্ট হইলেও যে উপযুক্ত পাত্রের অভাবে তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছেন না, ইহাও জ্ঞাপন করিলেন। পরিশেষে ইহাও জানাইয়া দিলেন যে, নানা স্থানে হতাশ হইয়া

শেষে গোপীগঞ্জের এক পঞ্চাশদ্‌বর্ষবয়স্ক বৃদ্ধকেই পাত্র মনোনীত করিয়াছেন; কিন্তু বৃদ্ধ বড় কৃপণ; তিনি সর্ব্বসমেত চারি শত টাকার অধিক দিতে স্বীকৃত নহেন, কিন্তু গণেশ নগদ পাঁচ শত মুদ্রা না পাইলে রাজি হইতে পারেন না। টাকা যখন লইতে হইতেছে, তখন আর চক্ষুলজ্জায় কি ফল? বিশেষ, মাতঙ্গিনীর মত বয়ঃস্থা সুরূপা মেয়ে, ইত্যাদি।

শুনিয়া বিশ্বনাথ চিন্তিত হইলেন। মাতঙ্গিনী পঞ্চাশ বছরের বুড়ার হাতে পড়িবে শুনিয়া তাঁহার মনটা যেন দমিয়া গেল। সে দিন তিনি এ সম্বন্ধে কোনও উচ্চবাচ্য করিলেন না। সেই দিন রাত্রিতে শয়নের পূর্ব্বে মাতঙ্গিনী তাঁহাকে তামাক সাজিয়া দিতে গেলে বিশ্বনাথ প্রীতিগম্ভীরস্বরে তাহাকে বলিলেন, 'আমি এই কয় দিনে তোমাকে বড়ই কষ্ট দিলাম, না?'

সলজ্জ-হাস্য-সহকারে নতমুখে মাতঙ্গিনী উত্তর দিল, 'কষ্ট আর কি?'

সহাস্যে বিশ্বনাথ বলিলেন, 'কষ্ট নয়ই বা কেন? এই বুড়াকে নিয়ে তুমি যেন ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে পড়েছিলে। কিন্তু সত্য বলতে কি, অসুখে এমন সেবা আমি অনেক দিন পাই নাই।'

বিশ্বনাথের স্বরটা যেন একটু ভারী হইয়া আসিল। মাতঙ্গিনী লজ্জারক্ত-মুখে নীরব থাকিলেও বৃদ্ধের বেদনাটুকু অনুভব করিয়া সে সহানুভূতিতে কোমল দৃষ্টিটা উত্তোলন করিয়া একবার বিশ্বনাথের ব্যথামলিন মুখের দিকে চাহিল। বিশ্বনাথ বলিলেন, 'যাক্‌, আর একটা দিন কষ্ট; পরশু চলে যাচ্ছি।'

'পরশু যাবেন? আর দিনকতক থাকবেন না?'

মাতঙ্গিনীর স্বরে যেন একটু ব্যগ্রতা প্রকাশ পাইল। বিশ্বনাথ বলিলেন, 'অসুখ সেরে গিয়েছে, আর তো থাকলে চলে না।'

মাতঙ্গিনী চুপ করিয়া রহিল। বিশ্বনাথ একটু হাসিয়া বলিলেন, 'আবার হয় তো তোমার বিয়ের সময় আসবো।'

মাতঙ্গিনী মাথা নীচু করিয়া নখ খুঁটিতে লাগিল। বিশ্বনাথ পরিহাসের স্বরে বলিলেন, 'কিন্তু বরটী চমৎকার জুটেছে, আমার চেয়েও একটু বেশী বুড়ো।'

বিশ্বনাথ দেখিলেন, মাতঙ্গিনীর মুখখানা সিঁদুরের মত লাল হইয়া উঠিয়াছে। তিনি ইহাতে নিজেই যেন একটু লজ্জা অনুভব করিয়া বলিলেন, 'আমরাই বুড়ো ব'লে বিয়ে করতে চাই না। কিন্তু আমাদের চাইতে বুড়োরা কি রকমে যে বিয়ে কত্তে চায়, তা বুঝতে পারি না।'

মাতঙ্গিনী এবার একটু হাসিয়া বলিল, 'আপনি কি বুড়ো ?'

'যুবাও নই।'

'অথচ বুড়ো বলাও চলে না।'

বিশ্বনাথ চমকিয়া উঠিলেন। মাতঙ্গিনী তাঁহাকে বুড়া বলিয়া স্বীকার করে না। কেন ? বিশ্বনাথ যেন একটু চঞ্চল হইয়া পড়িলেন ; ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, 'আচ্ছা, মনে কর, আমার মত বুড়ার সঙ্গে যদি তোমার বিয়ে হয় ?'

মাতঙ্গিনী উত্তর করিল, 'হয় হবে।'

'তাতে তুমি অসুখী হবে না ?'

'সুখ অসুখ আবার কি ? আমার সুখ অসুখে তো কপালের লিখন খণ্ডন যাবে না।'

বিশ্বনাথ নীরবে বসিয়া গম্ভীরভাবে হুঁকায় টান দিতে লাগিলেন। মাতঙ্গিনী ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল।

দোষ কি ? গোপীগঞ্জের ভুলু চক্রবর্ত্তী বায়ান্ন বৎসরে বিবাহ করিয়া যদি সংসারী হইবার আশা করিতে পারে, তবে চুয়াল্লিশ বৎসরে তিনি কেন বিবাহ করিতে পারিবেন না ? আর তিনি যে এখনও বুড়া হন নাই, মাতঙ্গিনী তো ইহা স্পষ্ট স্বীকার করিল। বাস্তবিক তিনি কিসে বৃদ্ধ হইয়াছেন ? মাথার চুল দুই এক গাছা সাদা হইয়াছে মাত্র, ইহা ছাড়া বার্দ্ধক্যের লক্ষণ কিছুই তো দেখা যায় না। ইন্দ্রিয় সব তো তেমনই সবল ; তাহাদের ক্রিয়া-শক্তি তো কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই ; বার্দ্ধক্যে মন না কি অবসন্ন হইয়া পড়ে ; কিন্তু কৈ, মনে তো একটুও অবসাদ আসে নাই ? তবে তিনি বৃদ্ধ কিসে ? কি জন্য তিনি এই বয়স হইতে সংসারের সুখ সম্বন্ধ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ব্যর্থ উদাস জীবন যাপন করিবেন ? না না, তিনি বিবাহ করিবেন, আর বিবাহ করিতে হইলে মাতঙ্গিনীকেই সহধর্ম্মিণী করিতে হইবে। বৃদ্ধের সেবা মাতঙ্গিনীর মত আর কে করিতে পারে ?

পর দিন সকালে বিশ্বনাথ কথাপ্রসঙ্গে গণেশের নিকট বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন, এবং মাতঙ্গিনীর বিনিময়ে তিনি চারি শত টাকা পর্য্যন্ত দিতে প্রস্তুত, ইহাও জানাইয়া দিলেন। গণেশ পাঁচ শত চাহিলেন। অবশেষে উভয়েরই সম্মানরক্ষার জন্য মাঝামাঝি সাড়ে চারি শত টাকায় রফা হইল। বিশ্বনাথ ফাল্গুনের শেষেই বিবাহের দিন স্থির করিয়া পর দিন বাড়ী চলিয়া গেলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বাড়ী আসিয়া বিশ্বনাথ বিবাহের কথাটা কিরূপে যে শ্রীপতির নিকট পাড়িবেন, তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। অবশেষে অনেক ভাবিয়া পর দিন সন্ধ্যার পর তামাক খাইতে খাইতে নিজের অসুখের কথা পাড়িলেন; এবং সে অসুখ যে খুবই সাংঘাতিক হইয়া উঠিয়াছিল, ভাগ্যক্রমে গণেশ চক্রবর্ত্তীর বাড়ীতে আশ্রয় লইয়াছিলেন, এবং তাহার ভাগিনেয়ী মাতঙ্গিনীর সেবা পাইয়াছিলেন বলিয়াই এ যাত্রা বাঁচিয়া গিয়াছেন, নতুবা তাঁহাকে আর ফিরিতে হইত না, ইহা সবিস্তারে বর্ণন করিয়া কনিষ্ঠের ভীতি উৎপাদন করিলেন। পরিশেষে একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, 'কিন্তু ভাই, গণেশের ব্যবহারে মুগ্ধ হ'য়ে একটা বড় কুকাজ ক'রে এসেছি।'

শ্রীপতি সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, 'কুকাজ কি রকম দাদা?'

বিশ্বনাথ বলিলেন, 'গণেশের ভাগিনেয়ীটী চোদ্দ বছরে পড়েছে, অথচ বিয়ে হচ্ছে না। গণেশের একান্ত জেদ—আমি মেয়েটীকে গ্রহণ করি। সে আমার জন্য যা করেছে, তাতে আমি তো কিছুতেই তার অনুরোধটা এড়িয়ে আসতে পারলাম না।'

শ্রীপতি হর্ষপ্রফুল্লকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, 'এ আর মন্দ কাজ কি দাদা, আমারও তো বরাবর ইচ্ছা যে, তুমি আবার সংসারী হও।'

বিশ্বনাথ হাসিয়া বলিলেন, 'পাগল! আমি সংসারী নই তো সন্ন্যাসী হ'য়ে আছি কি? জগদম্বার কৃপায় তুমি বেঁচে থাক, আমার কালী, ফটিক বেঁচে থাক; তোমাদের নিয়েই তো সংসার।'

শ্রীপতি বলিল, 'তা হ'লেও তোমার নিজের সুখ অসুখ, সুবিধা অসুবিধা আছে তো?'

মাথাটা নাড়িয়া বিশ্বনাথ বলিলেন, 'কিছু না, কিছু না। আর এ বয়সে সুখ অসুখ এত দেখলে চলবে কেন? এখন সুখ দুঃখ সব বিশ্বনাথের পায়ে দিয়ে কোনও রকমে দিন কয়টা কাটিয়ে যেতে পারলেই হ'লো। আর তোমাদের কল্যাণে তা যেতেও পারবো। কিন্তু না বুঝে কথা দিয়ে এসেছি, সেই এক মস্ত ভাবনা।'

শ্রীপতি বলিল, 'তার আর ভাবনা কি দাদা।'

বিশ্বনাথ গম্ভীরমুখে বলিলেন, 'ভাবনা বৈ কি রে ভাই, বিয়ে তো আর কথার কথা নয়। বিশেষ গণেশ চক্রবর্ত্তীকে তো চেন?'

উৎকণ্ঠিতভাবে শ্রীপতি জিজ্ঞাসা করিল, 'সে কত চায়?'

বিশ্বনাথ বলিলেন, 'সে অনেক; সাড়ে চার শো।'

'সাড়ে চার শো!' বিস্মিতভাবে শ্রীপতি জ্যেষ্ঠের মুখের দিকে চাহিল।

বিশ্বনাথ বলিলেন, 'তাই অনেক দর কষাকষির পর হ'য়েছে। গোপীগঞ্জের ভুলু চক্রবর্ত্তী পাঁচ শো দিতে চায়। মেয়েটী একে বয়ঃস্থা, তায় সুন্দরী কি না। তা চুলোয় যাক্ রূপ, আমাদের এখন একটা মেয়ে মানুষের দরকার।'

বলিয়া তিনি শ্রীপতির মুখের উপর সাগ্রহে দৃষ্টিপাত করিলেন। কিন্তু শ্রীপতির মুখে হর্ষ বা উৎসাহের লক্ষণ কিছু না দেখিয়া যেন একটু বিমর্ষ হইয়া পড়িলেন। একটু পরে চিন্তিতভাবে বলিলেন, 'এ দিকে দিনও বেশী নাই, মাসের ২৭শে দিন স্থির হ'য়েছে।'

শ্রীপতি এবার বিকৃতমুখে বলিল. 'দিন তো ঠিক হ'য়েছে, কিন্তু এতগুলো টাকা আসবে কোথা থেকে?'

বিশ্বনাথ মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, 'তাই তো ভাবছি রে ভাই, কম টাকা নয় তো, সাড়ে চার শো। তার উপর ধর খরচও কোন্ না পঞ্চাশটা টাকা পড়বে। তা হ'লেই ধর পাঁচ শো। পশ্চিম মাঠের পাঁচ বিঘেটা—'

বাধা দিয়া শ্রীপতি বলিল, 'জমী বাঁধা দিলে খাব কি?'

কনিষ্ঠের উত্তর শুনিয়া বিশ্বনাথের বলিতে ইচ্ছা হইল, 'খাবে ছাই।' কিন্তু সে রাগটা সংবরণ করিয়া বাহিরে বেশ শান্তভাব দেখাইয়া বলিলেন, 'আমিও কি তা ভাবছি না রে ভাই, ঐ পাঁচ বিঘেই হ'লো লক্ষ্মী; আর যে সব আছে, সে তো দু'কাঠা দশ কাঠা। কিন্তু এ দিকে কথা দিয়ে এসেছি, তারই বা কি হয়?'

শ্রীপতি খানিকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তার পর কোনও উত্তর না দিয়াই আস্তে আস্তে উঠিয়া গেল। বিশ্বনাথ অন্ধকারে ভ্রূকুটী করিয়া বসিয়া রহিলেন।

রাত্রিতে আহারের সময় শ্রীপতি বলিল, 'কাল তা হ'লে একখানা চিঠি লিখে গণেশ চক্রবর্ত্তীকে জবাব দেব?'

'তাই দাও' বলিয়া বিশ্বনাথ উঠিয়া আসিলেন। ছোটবউ স্বামীকে সম্বোধন করিয়া বলিল, 'জবাব দেওয়ার চাইতে টাকাটারই না হয় যোগাড় দেখ না।'

তীব্রকণ্ঠে শ্রীপতি উত্তর করিল, 'হু' পাঁচ টাকা কি না, যোগাড় দেখবো ? পাঁচ পাঁচ শো টাকা, পাব কোথায় ?'

ছোট বৌ যেন আশ্চর্য্যসহকারে বলিয়া উঠিল, 'পাঁচ শো ? এত ?'

শ্রীপতি বলিল, 'তা নয় তো কি ? একে তো গণেশ চক্রবর্ত্তী সাক্ষাৎ কশাই, তার উপর পেয়েছে বিয়ে-পাগলা বুড়ো। একেবারে চুটিয়ে কেটেছে।'

'উনি তো তাতেই মত দিয়ে এসেছেন ?'

'তা দেবেন না কেন ? বিয়ে-পাগলা হ'য়েছেন, ধান বেচে জমী বাঁধা দিয়ে কোনও রকমে বিয়েটা হ'য়ে গেলে হয়। তার পর সংসারটা না খেয়ে মরুক না।'

বিশ্বনাথ ঘরের দাবায় বসিয়া তামাক সাজিতেছিলেন ; কনিষ্ঠের তীব্র মন্তব্য শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন। আরে অকৃতজ্ঞ ! আমি আজ বিয়ে-পাগলা বুড়া, কিন্তু তোর বিবাহে যখন চারি শত টাকা খরচ হইয়াছিল, তখন সে টাকার যোগাড় কে করিয়াছিল ? এই বিশ্বনাথ আকুলিই যে দেনা করিয়া সে টাকা আনিয়াছিল, আর এক বেলা আধ-পেটা খাইয়া সে দেনা শোধ করিয়াছিল ! আজ তুই সংসারী, আজ তোর স্ত্রী পুত্র হইয়াছে, কিন্তু তোর এই সংসারটা বিশু আকুলীর বিন্দু বিন্দু রক্ত দিয়াই যে গড়িয়া উঠিয়াছে ! আজ তুই বিয়ে-পাগলা বলিয়া দাদাকে উপেক্ষা করিতে পারিস্, কিন্তু এক দিন এই দাদাকে বাদ দিলে তোর যে একটা মুহূর্ত্তও চলিবার উপায় ছিল না !

ক্রোধে অধর দংশন করিয়া বিশ্বনাথ প্রতিজ্ঞা করিলেন, আমি যদি এই বিবাহ না করি, তবে আমার নাম বিশু আকুলিই নয়।

পর দিন বিশ্বনাথ গ্রামের পাঁচ জন মধ্যস্থ ডাকিয়া একেবারে ভাগ বাটোয়ারা করিতে বসিলেন। দেখিয়া শুধু শ্রীপতি নয়, প্রতিবাসীরাও বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইল। বিশু আকুলি হঠাৎ পাগল হইলেন কি না ভাবিয়া অনেকেই ব্যাকুল হইল। বিশ্বনাথ কিন্তু কাহারও ব্যাকুলতার দিকে দৃক্‌পাত করিলেন না। তিনি ধান চাল হইতে জমী জায়গা পর্য্যন্ত সব ভাগ করিয়া লইলেন। শ্রীপতি ভয়ে ভয়ে চুপ করিয়া রহিল। একবার শুধু বলিল, 'এর চাইতে বিঘে তিনেক জমী বেচে ফেল দাদা।'

বিশ্বনাথ কঠোরস্বরে উত্তর দিলেন, 'না।'

ধান চাল সমস্ত বেচিয়া, জমী জমা বন্ধক দিয়া বিশ্বনাথ পাঁচ শত টাকা হাতে করিলেন। প্রতিবেশীরা বলিলেন, 'বিশু ঠাকুর, এই বয়সে এতগুলা

বিশ্বনাথ বিরক্তির সহিত উত্তর দিলেন, 'কে আমাকে বিনা পয়সায় মেয়ে দিতে যাবে?'

পরেশ মুখুয্যে বলিলেন, 'বিত্ত, জমী জায়গা সব নষ্ট করলে, এর পর খাবে কি?'

বিশ্বনাথ রাগতভাবে উত্তর করিলেন, 'বামুনের ছেলে ভিক্ষা ক'রে খেতে পারবো, কিন্তু অসুখ বিসুখে এক ফোঁটা জলের জন্য হা-হা করতে পারবো না।'

শ্রীপতি জ্যেষ্ঠকে বুঝাইয়া বলিল, 'দাদা, রাইপুরে একটী মেয়ে আছে, শ' তিনেক টাকার মধ্যেই হ'তে পারে। বল তো চেষ্টা দেখি।'

বিশ্বনাথ ভ্রূকুটী করিয়া বলিলেন, 'বিয়ে-পাগলা বুড়োর বিয়ের চেষ্টা দেখলে লোকে তোমাকেও পাগল বলবে ভাই। এত বড় দুর্নামটা স্বীকার করবার তোমার কোনও দরকার নাই।'

অগত্যা শ্রীপতিকে নিরস্ত হইতে হইল। নির্দ্দিষ্ট দিনে বিশ্বনাথ বিবাহ করিয়া টোপর মাথায় দিয়া নববধূ ঘরে আনিলেন। বৌ দেখিয়া কেহ তাহার রূপের প্রশংসা করিল; কেহ বয়স দেখিয়া মুখ ফিরাইয়া হাসিল; কেহ বা তাহার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। বিশ্বনাথ কিন্তু সে সকল সমালোচনায় কর্ণপাত না করিয়া উৎসাহসহকারে পাকস্পর্শের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন।

ক্রমশঃ।

শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

উৎকলে বৌদ্ধধর্ম্ম।

বর্ত্তমান, অতীতের বিভূতি লইয়া আসিয়াছে। অতীতে যাহা ছিল, বর্ত্তমান তাহাকে আত্মসাৎ করিয়া নূতন ভঙ্গীতে উপস্থিত হইয়াছে। এক কথায় বলিতে গেলে বর্ত্তমান অতীতের পরিণতিমাত্র। সেইরূপ, বর্ত্তমান কালেই ভবিষ্যতের বীজ নিহিত রহিয়াছে। বর্ত্তমান অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া যে পথ দেখাইতেছে, ভবিষ্যতের কর্ম্মস্রোতঃ সেই পথেই যাইবে। অতীতের স্বরূপ নির্দ্দেশ করিবার উপায় দুর্লভ। ভবিষ্যৎও কিরূপ মূর্ত্তি ধরিয়া প্রকট হইবে, তাহারও নির্দ্ধারণ দুরূহ। তবে, অতীত বর্ত্তমান কালে যে সকল রেখা অঙ্কিত করিয়া দিয়াছে, তাহাদিগকে পরিস্ফুট করিলে অতীত কালে মনুষ্যসমাজ

কিরূপে চলিত, তাহার কতকটা ধারণা হয়। সেইরূপ, বর্ত্তমানের সঙ্কেত বুঝিয়া কল্পনা এবং অনুমানের সাহায্যে ভবিষ্যৎকে গড়িয়া তোলা যাইতে পারে। প্রথম অনুশীলনের পন্থাটিকে আণুবীক্ষণিক অনুশীলন, এবং দ্বিতীয়টিতে দূর-বীক্ষণিক অনুশীলন বলা যাইতে পারে। আজ এই আণুবীক্ষণিক অনুশীলন দ্বারা অতীতের গুটিকয়েক লুপ্তপ্রায় চিহ্ন লইয়া অতীতের মূর্ত্তি গড়িবার চেষ্টা করিব। একান্ত ম্রিয়মাণ ও অবসন্ন হইয়া তাহারা যে সজীব সভ্যতার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে, তাহার কিঞ্চিৎ নিদর্শন এই প্রবন্ধে দিবার চেষ্টা করিব। সফল হইব কি না, জানি না। কারণ, আমার গবেষণার প্রসার অতি অল্প।

উৎকল ধর্ম্মক্ষেত্র। উৎকলের ইতিহাস ধর্ম্মের ইতিহাস। বৌদ্ধ, জৈন, গাণপত্য, শৈব, সৌর, শাক্ত এবং বৈষ্ণব ধর্ম্মের এক একটা কেন্দ্র আজিও এই দেশে দেখা যায়। সত্য বটে, খণ্ডগিরির খণ্ডবিখণ্ড গুম্ফায় আরতির শঙ্খঘণ্টা বহু দিন বাজে নাই, এবং উদয়গিরির আকাশগঙ্গায় শৈবালাকীর্ণ সলিলে জৈন ধর্ম্মমন্দিরের চূড়া পূর্ব্বের মত প্রতিফলিত হয় না। ললিত-গিরিরও ঘোর দুর্দ্দশা। যে দিন বৌদ্ধধর্ম্মের বিজয়কেতন ললিতগিরির শিরে স্নিগ্ধ সমীরণে সঞ্চারিত হইত, সে দিন আজ বিস্মৃত স্বপ্নের মত বোধ হয়। কালের কি কুটিল গতি! বহু শতাব্দীর পরে ললিতগিরির ভগ্নস্তূপের মধ্য হইতে বৌদ্ধদেবের অতিমানুষতার এক বিরাট প্রস্তরমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছিল। লোকে সেই মূর্ত্তির চরণতলে হৃদয়সর্ব্বস্ব লুটাইয়া দিল না, পূজোপহারে তাঁহার সংবর্দ্ধনা করিল না। পরন্তু, তাঁহাকে 'কলিযুগের ভেণ্ডা' নামে অভিহিত করিয়া তাচ্ছীল্যে পাশ কাটাইয়া চলিয়া গেল। বৌদ্ধযুগের শেষ অবস্থাতেও যদি এইরূপ বিরাট মূর্ত্তি ভগ্নস্তূপের মধ্য হইতে সহসা আবিষ্কৃত হইত, তাহা হইলে ভারতবর্ষ এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত আন্দোলিত হইয়া উঠিত। এই ললিতগিরির দুর্দ্দশার বিষয় বলিতে গেলে প্রকৃতই চোখে জল আসে। ভগ্নস্তূপের ভিতর হইতে কতকগুলি বৌদ্ধমূর্ত্তি বাহির হইয়াছিল। এক জমীদার সেইগুলি কেন্দ্রাপাড়ার বিলাসভবনে রাখিয়াছেন। অবান্তর হইলেও আপনাদিগের নিকট আমার সানুনয় নিবেদন এই যে, কটক বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বিহার ও উড়িষ্যা গবর্মেণ্টের নিকট ললিতগিরির পূরাকীর্ত্তিসংরক্ষণের জন্য নিবেদন করিয়া ধন্য হউন। বৌদ্ধধর্ম্মের এই দুই প্রধান পীঠের যেরূপ দুর্দ্দশা, গাণপত্য এবং সৌর ধর্ম্মের কেন্দ্রদ্বয় ধানমণ্ডল এবং কোণারকেরও সেইরূপ। কিন্তু কোণারকের তক্ষশিল্পে আকৃষ্ট হইয়া দেশ দেশান্তর হইতে অনেক লোক

আসে, এবং নিকটবর্ত্তী স্বল্পতোয়া চন্দ্রভাগা নদীর তীরে বৎসরে একবার যাত বসে। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মের যে দুইটী কেন্দ্রের কথা বলিয়াছি, তাহা রেল-রাস্তা হইতে কিছু দূরে। জীর্ণ কঙ্কালসার ভগ্নস্তূপে এমন শিল্পচাতুর্য্য নাই যে, সুদূর জনপদ হইতে যাত্রী আকৃষ্ট হইবে। প্রত্নতত্ত্ববিৎ অর্থাভাবে এই সকল ভগ্নস্তূপ হইতে নিধি আবিষ্কার করিতে পারেন না। টাটা মহোদয়ের আনুকূল্যে কাশীধামের নিকট ভগ্নস্তূপ খনন করিয়া যেরূপ প্রাচীনের নিদর্শন সংগৃহীত হইয়াছে, আমার অনুমান, ললিতগিরিতে খনন করিলেও সেইরূপ হইতে পারে। আজিও রাজাধিরাজ অশোকের শিলালিপি উৎকলে বিদ্যমান আছে। হুয়েনসাং যখন উৎকলে আসিয়াছিলেন, তখন তিনি এই দেশে হাজার বৌদ্ধ মঠ এবং দশ হাজার বৌদ্ধ শ্রমণ দেখিয়াছিলেন। এই দেশের বৌদ্ধগণ মহাযানবাদী ছিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, বর্ত্তমান কালে উৎকলের কোনও স্থানে বৌদ্ধদেবের কোনও মূর্ত্তির উপাসনা হয় না। লক্ষ লক্ষ মঠের মধ্যে একটীও বৌদ্ধমঠ নাই!

কিমিতিবিদ্যার মূলমন্ত্র এই যে, কোনও বস্তুর ধ্বংস হয় না। একটী গোলকের ভিতর কিঞ্চিৎ তূলা রাখিয়া তাহার মুখ আঁটিয়া দিন। পরে তড়িৎপ্রবাহের দ্বারা সেই তূলায় অগ্নিসংযোগ করুন। তূলা ভস্মীভূত হইয়া যাইবে। কিন্তু তূলা সহিত গোলকের ভার কিছুমাত্র কম দেখা যাইবে না। এ জগতে ধ্বংস বলিয়া কিছু নাই। যাহা আমরা ধ্বংস বলি, তাহা রূপান্তরমাত্র। বোধ হয়, স্থূল জগতের এই মূলমন্ত্র ভাবজগতেও প্রয়োগ করা যাইতে পারে। ভাবের ধ্বংস হয় না, রূপান্তর হয় মাত্র। বেদের সময় হইতে হিন্দুধর্ম্মে একটী নাস্তিকতার সূত্র গ্রথিত হইয়া রহিয়াছে। সেই নাস্তিকতার সূত্র পরবর্ত্তী সময়ে বৌদ্ধদিগের নিরাকারবাদ বা শূন্যবাদে পরিণত হইয়াছিল। আরও পরে সেই শূন্যবাদ বা নিরাকারবাদ বৌদ্ধধর্ম্মের আশ্রয়-গ্রন্থি ত্যাগ করিয়া বিচ্ছিন্ন ভাবে হিন্দুধর্ম্মেই বিদ্যমান রহিয়াছে। এই নিরাকার-বাদ আজিও উৎকলে বিলক্ষণ দেখা যায়। যে উৎকলখণ্ডে গ্রামে গ্রামে, প্রান্তরে প্রান্তরে দেবদেবীর শত শত মন্দির বিদ্যমান আছে, যে উৎকল-খণ্ডের নরনারীর ভক্তিপ্রবণতা সর্ব্বগুণের অলঙ্কারস্বরূপ, সেই দেশে আজিও এই নিরাকারবাদ জীবন্ত ভাবে দুইটী শাখাধর্ম্মে বিরাজ করিতেছে। এই দুইটী ধর্ম্মের নাম শূন্যবাদ ও অলেখবাদ। অলেখধর্ম্মের নামান্তর কুম্ভীপটুয়া। ঢেঙ্কানল ও তৎসংলগ্ন গড়জাত মহলে অলেখধর্ম্মের বিশেষ প্রাদুর্ভাব দেখা

যায়। অলেখবাদিগণ নিরাকারের উপাসনা করেন, এবং মূর্ত্তিপূজার বিদ্বেষী হইলেও তাঁহারা সাকার উপাসনায় বিশেষ আস্থাবান নহেন। অলেখবাদ ও শূন্যবাদের কতকগুলি প্রামাণিক গ্রন্থ আছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব-সময়ে উৎকলে যখন ভাবের গঙ্গা বহিয়া যায়, সেই সময়েই বোধ হয় বৌদ্ধধর্ম্মের শেষ চিহ্ন বিলুপ্ত হয়। নব হিন্দুধর্ম্মের কলকল প্রবাহের মুখে বৌদ্ধধর্ম্মের শুষ্ক অস্থিনিচয় কোথায় ভাসিয়া গেল। এই বিপ্লবের সময় কতকগুলি ধীশক্তি-সম্পন্ন কবি বৌদ্ধধর্ম্মের দিক হইতে গুটিকতক কথা লিখিয়া গিয়াছেন। এই লেখকদিগের মধ্যে অচ্যুতানন্দ, অনন্ত, বলরাম, জগন্নাথ এবং যশোবন্তই প্রধান। এরূপ কিংবদন্তী আছে যে, এই পঞ্চমহাত্মা শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গ শিষ্য ছিলেন। শিষ্য না হইলেও তাঁহারা যে মহাপুরুষ ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহা-দিগের গ্রন্থের পরিচয় এ প্রবন্ধে দেওয়া যাইতে পারে না। তাঁহারা যে কত গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহার সংখ্যা আজ পর্য্যন্ত করা হয় নাই। আজিও তাঁহাদিগের অনেক গ্রন্থ তালপত্রে সংবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে কেহই সেই সকল গ্রন্থ প্রকাশিত করে নাই। তবে সংকলন হইতে যত দূর বুঝিতে পারিয়াছি, সেই সকল গ্রন্থে অনেকটা সমান ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল কবি শ্রীচৈতন্য-প্রচারিত নামধর্ম্মের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবান ছিলেন না। ভক্তিরসে আপ্লুত অমিয়ার আস্বাদ এই সকল গ্রন্থে পাওয়া যায় না। তাঁহারা লৌকিক কর্ম্মকাণ্ডের প্রতিও যেন প্রসন্ন ছিলেন না। এক কথায় বলিতে গেলে, তাঁহারা শ্রীচৈতন্য-প্রচারিত ভক্তিবাদ ও জ্ঞানবাদের সমন্বয় করিবার চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। কিন্তু তাঁহাদিগের মতিগতি যেন শুষ্কজ্ঞানবাদের দিকে স্বতই গিয়াছে। সাকার উপাসনা যে নিতান্ত অর্ব্বাচীনের পক্ষে, তাহা তাঁহারা অনেক স্থলেই বলিয়াছেন। তাঁহাদিগের লেখার বিশেষত্ব এই যে, তাঁহারা সকলেই ভবিষ্যতে ধর্ম্মের অভ্যুদয়ের আভাস দিয়াছেন। তাঁহাদিগের বিশ্বাস, ভবিষ্যতে সত্যধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হইবে, এবং হিন্দুধর্ম্ম সকল জঞ্জাল হইতে মুক্ত হইয়া কর্ম্মকাণ্ড এবং পূজাবাহুল্যের হাত হইতে পুনরায় নিস্তার পাইবে। যে যুগে তাঁহাদিগের আবির্ভাব হইয়াছিল, সে যুগে তাঁহাদিগের উপাস্য আদর্শের সাফল্যের আশা ছিল না। লোকমত, শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া ভক্তিমার্গকে অবলম্বনস্বরূপ করিয়া লইয়া-ছিল। লোকে বৌদ্ধবাদের সুদূর পশ্চাতে পড়িয়াছিল। যে আদর্শকে মানুষ জীবনসর্ব্বস্ব করিয়া লইয়াছে, তাহার সাফল্য কোনও কালে হইবে না,

এইরূপ চিন্তার অপেক্ষা দুঃখকর বুঝি আর কিছুই নাই। তাই অচ্যুতানন্দ দাস প্রভৃতি লেখকগণ বর্ত্তমানের আশা ত্যাগ করিয়া ভবিষ্যতের অরুণরাগ-রঞ্জিত চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। তাঁহাদিগের মতে, সংসারে পাপ এবং দুরাচারের প্রাবল্য হইলে নানা আধিব্যাধির উৎপাতে জনসমাজ উৎসন্ন যাইবে। যে কয় জন ধর্ম্মাত্মা সারধর্ম্ম অর্থাৎ শূন্যবাদ বা অলেখবাদ আশ্রয় করিয়া থাকিবেন, কেবল তাঁহারাই টিকিয়া যাইবেন। তাঁহাদিগের বংশধরগণ কালক্রমে ভারতবর্ষে ছড়াইয়া পড়িবে। বর্ত্তমানের প্রতি বিরাগ এবং ভবিষ্যতের প্রতি আশা অচ্যুতানন্দ দাস প্রভৃতি লেখকদিগের একটী বিশেষত্ব। তাঁহাদিগের বৌদ্ধযুগের বৃন্দাবন ত বহু দিন অতীতের স্মৃতিমাত্রসার হইয়াছে। তাঁহাদিগের জীবদ্দশায় বা তৎপরবর্ত্তী সময়ে সে বৃন্দাবনের পুনরাবির্ভাব সম্ভবপর নয়। তাই তাঁহারা ভবিষ্যতের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছেন। ভবিষ্যৎ কালে বৌদ্ধধর্ম্ম আবার দেশকে জাগ্রত করিয়া তুলিবে, এই আশামাত্র সম্বল করিয়া তাঁহারা জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন। স্থানে স্থানে তাঁহাদিগের লেখা দুর্ব্বোধ, ব্যাসকূটের মত অর্থহীন। লেখক তাঁহার মনোগত ভাব যেন ইঙ্গিতে অন্তরঙ্গ শিষ্যদিগকে বুঝাইতেছেন। সাধারণের বোধগম্য ভাষায় তাঁহাদিগকে ভাব প্রকাশ করিতে বিশেষ কুণ্ঠিত দেখা যায়। সর্ব্বসাধারণ তাঁহাদিগের গ্রন্থের অর্থ গ্রহণ করিলে তাঁহাদিগের উপাস্য ধর্ম্মভাবের কোনও হানি হইতে পারে, এই ভয়ে যেন তাঁহারা ইঙ্গিতে আভাস দিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন। রাজা প্রতাপরুদ্র দেবের রাজত্বকালের শেষ ভাগে বৈষ্ণবধর্ম্ম উড়িষ্যার রাজধর্ম্ম হয়। সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম্ম এবং তাহার ছায়াবলম্বনে গঠিত ছোট ছোট ধর্ম্ম-সম্প্রদায়কে অনেক নিগ্রহ ভোগ করিতে হয়। এই নিগ্রহের কথা পরে বলিব। আমার মনে হয়, রাজনিগ্রহের ভয়েই অচ্যুতানন্দ প্রভৃতি লেখকগণ স্থানে স্থানে আভাসে তাঁহাদের উপদেশের মর্ম্ম ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন।

শূন্যবাদী কিংবা অলেখবাদীর যে সকল ধর্ম্মগ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে, তাহার কোনটিকে বৌদ্ধশাস্ত্র বলিবার উপায় নাই। বুদ্ধ, ধর্ম্ম, এবং সঙ্ঘের কথা বিশদভাবে কোনও গ্রন্থে নাই। অহিংসা এবং জীবে দয়ার কথা পদে পদে আছে। কিন্তু অহিংসা, বৌদ্ধ, জৈন, এবং বৈষ্ণব ধর্ম্মের সাধারণ সম্পত্তি। মহাভারতেও অহিংসাবাদের কথা আছে। তবে, বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবের সময় ঐ সকল কথা প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে কি না, বলা কঠিন। বোধ হয়, অহিংসাবাদ হিন্দুধর্ম্মের প্রাচীন দার্শনিকতার অঙ্গস্বরূপ। বৌদ্ধধর্ম্ম সেই দার্শনিকতাকে

বাড়াইয়া তুলিয়াছিলেন, এবং বৈষ্ণবধর্ম্ম স্বীয় ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার করিয়াছিলেন : সে যাহা হউক, হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম্মের পরস্পর দ্বন্দ্ব এবং রেষারেষির কথা ইতিহাসে দেখা যায় না। আজিও বুদ্ধদেব দশ অবতারের এক অবতার বলিয়া গণ্য। হিন্দুগণ বৌদ্ধদিগের নির্য্যাতন করিয়াছেন, এরূপ দৃষ্টান্ত ইতিহাসে নাই বলিলেও চলে। পরন্তু, যত দূর প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, তাহা হইতে মনে হয়, এই দুই ধর্ম্ম প্রতিদ্বন্দ্বিতাবিহীনভাবে ভারতবর্ষে বহু শতাব্দী ধরিয়া চলিয়া আসিয়াছে। মুণ্ডিতমুণ্ড বৌদ্ধ শ্রমণগণ তরবারির আঘাতে ভারতবর্ষ হইতে লোপ পান নাই : পরবর্ত্তী সময়ে অনাচার এবং গর্হিতাচারের প্রভাবে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বিগণ হিন্দুধর্ম্মের অশরীরী দেহে দুষ্ট ব্রণের মত কষ্টদায়ক হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। কোনও উৎকট অস্ত্রচিকিৎসায় সে ব্রণের উপশম হয় নাই। স্বাস্থ্যের উন্নতির সহিত সে ব্রণ ক্রমে ক্রমে গলিয়া সুস্থ দেহে মিশিয়া গিয়াছে। হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম্মের সংমিশ্রণ ও সমন্বয়ে সে সকল ধর্ম্মমতের সৃষ্টি হইয়াছিল, সে সকলের দৃষ্টান্ত আমরা শূন্যপুরাণ প্রভৃতিতে দেখিতে পাই। এই সকল ধর্ম্মমতের প্রায় বারো আনা বৌদ্ধমতের প্রতিবিম্ব, কিন্তু পট এবং পারিপার্শ্বিক সমস্তই হিন্দুধর্ম্মের। বৌদ্ধধর্ম্মকে তরল করিয়া হিন্দুধর্ম্মের ছাঁচে যতটুকু ঢালা সম্ভব, লেখকগণ ঢালিয়াছেন। অবশিষ্ট পরিহার করিয়াছেন, কিংবা হিন্দুধর্ম্মের সাজে সাজাইয়া লোকের সম্মুখে ধরিয়াছেন। আশ্চর্য্যের কথা, যে সময় অচ্যুতানন্দ দাস প্রভৃতি লেখকগণ উড়িষ্যার দুর্গম শৈলসংকুল প্রদেশে বৌদ্ধ এবং হিন্দুধর্ম্মের সমন্বয় করিয়া নূতন ভাষায় এবং নূতন ভঙ্গিমায় বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন, ঠিক সেই সময়ে বঙ্গদেশে রমাই পণ্ডিত প্রভৃতি লেখক ধর্ম্মমঙ্গল রচনা করিয়া স্নিগ্ধোজ্জ্বল ভাষায় বৌদ্ধধর্ম্মের স্তিমিত গৌরব প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের প্রচারিত অদ্বৈতবাদের প্রবাহ কিঞ্চিৎ মন্দগতি হইয়া আসিলে অন্তঃকম্পনের বশে বৌদ্ধধর্ম্মে একটি অবিচ্ছিন্ন তরঙ্গের সঞ্চার হইয়াছিল। সেই তরঙ্গের চঞ্চল শেখরে হিন্দুধর্ম্মের শুভ্র ফেন দীপ্ত থাকিলেও তাহার ঘাত-প্রতিঘাতে বৌদ্ধধর্ম্মের নিস্বান ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাই একই সময়ে বঙ্গদেশের শস্যশ্যামল বিস্তীর্ণ বক্ষে, এবং উড়িষ্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন উষর উপত্যকায় সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। সে সাড়ার প্রতিধ্বনি ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া গিয়াছে। বুঝি বা সমতল বঙ্গদেশে সেই প্রতিধ্বনির শেষ তানের লয় হইয়া গিয়াছে। কিন্তু উড়িষ্যার বন্ধুর প্রান্তরে সে প্রতিধ্বনির মৃদুতর রেষ আজিও আমাদের কর্ণে বাজিয়া মর্ম্ম স্পর্শ করে। দীনহীনের পর্ণকুটীরে আজিও

শূন্য গীতা, অমরজুময়, অলেখসংহিতা, নিরাকার ভাগবত প্রভৃতি তালপত্র-লিখিত গ্রন্থনিচয় পঠিত হইতেছে। খ্রীষ্টের জন্মের ৫০০ শতাব্দীর পূর্ব্বের সুদূর কপিলাবস্তুর সহিত এই সকল গ্রন্থের যে কি মধুর সম্পর্ক রহিয়াছে, তাহা ভাবিলে কল্পনা অবশ হইয়া পড়ে।

বৈষ্ণবধর্ম্মের সহজ সম্প্রদায়ে বৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষ নিদর্শন পাওয়া যায়। মহাযান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে ইন্দ্রিয়সংযম এবং সন্ন্যাস বৈরাগ্যের দ্বারাই প্রথমতঃ নির্ব্বাণপদলাভের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। ভগবান বুদ্ধের শিষ্য আনন্দ নারীজাতিকে সন্ন্যাসের অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন। কালে বৌদ্ধ বিহার ও সঙ্ঘারামে বহুতর শ্রাবক ভিক্ষুসঙ্ঘের ন্যায় শত শত শ্রাবিকাও আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন। স্ত্রীপুরুষের একত্র অবস্থানের বিষময় ফল অবশ্যম্ভাবী। সাধারণতঃ জিতেন্দ্রিয় শ্রাবকগণ কামিনীকাঞ্চনের যথেষ্ট বিরোধী ছিলেন, কিন্তু কোনও কোনও শ্রাবক প্রবৃত্তির সাধনা দ্বারা মোক্ষফল লাভের উপায় অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। ভোগসাধনের দ্বারা যে সহজ আনন্দ লাভ হয়, এবং তদ্দ্বারাই নির্ব্বাণ পদ সিদ্ধ হইতে পারে, এই নব সম্প্রদায় অতি গোপনে এইরূপ প্রচার করিতে লাগিলেন। চৈতন্য মহাপ্রভুর অভ্যুদয়ের বহু পূর্ব্বে যে বৈষ্ণবেরা বজ্রযানের তান্ত্রিক মত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা চণ্ডীদাসের পদাবলীতে স্পষ্ট ব্যক্ত আছে। চণ্ডীদাসের বহু পদে বাশুলী দেবীর পরিচয় পাওয়া যায়। কোনও প্রামাণিক হিন্দুশাস্ত্রে বাশুলী দেবীর নামোল্লেখ নাই। প্রাচ্যবিদ্যার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের মতে, বজ্রেশ্বরী সাধারণের মুখে অপভ্রংশে বাজশলী বা বাশুলীতে পরিণত হইয়াছে। চণ্ডীদাস বজ্রযান-উদ্ভূত তান্ত্রিক বৈষ্ণবধর্ম্মের সাধক ছিলেন। তিনি প্রবৃত্তিমার্গ অবলম্বন করিয়া সাধনা করিতেন।

হাসিয়া বাশুলী কয়, শুন চণ্ডী মহাশয়,
　আমি থাকি রসিক নগরে।
সে গ্রামে দেবতা আমি, ইহা জানে রজকিনী,
　জিজ্ঞাস গে যতনে তাহারে॥
সে দেশের রজকিনী, হয় রসের অধিকারী,
　রাধিকা স্বরূপ তার প্রাণ।
তুমি ত রমণের গুরু, সে ত রসের কল্পতরু,
　তার সনে দাস অভিমান॥
চণ্ডীদাস কহে মাতা, কহিলে সাধনকথা,
　রামী সতা প্রাণপ্রিয়া হৈলা।
নিশ্চয় সাধনগুরু, সেই রসের কল্পতরু,
　তার প্রেমে চণ্ডীদাস মৈলা॥

অতএব আমরা দেখিতেছি, বজ্রযানের বিলাসসাধনা চৈতন্যদেবের বহু পূর্ব্বে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে প্রবেশ লাভ করে। গৌড় বঙ্গ হইতে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাব-

বিলোপের সহিত মুণ্ডিতকেশ বৌদ্ধ শ্রাবক ও শ্রাবিকাগণের নিতান্ত দুরবস্থা ঘটে। তাহারা তৎকালীন বৈষ্ণবসমাজের আশ্রয় লাভ করিয়া পরবর্তী কালে নেড়া-নেড়ী নামে পরিচিত হয়। নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর পুত্র বীরভদ্র যে বহু শত নেড়া-নেড়ীর উদ্ধার করিয়াছিলেন, তাহা আনন্দ-ভৈরব নামক গ্রন্থে আমরা দেখিতে পাই।

মহাপ্রভুর মনের কারণ না যায় বর্ণনে।
নিত্যানন্দ প্রভুর চরিত্র দেখ হে নয়নে ॥
বীরভদ্র গোসাঞির কি কহিব গুণে।
বৈরাগীকে শিখাইল আপন কারণে ॥
যদি এহো বাক্যে কেহো প্রতীত না হয় মনে।
বারশত নেড়াকে তেরশত নেড়ী দিল কিনে ॥
যে সব বৈরাগী প্রকৃতির মুখ নাহি দেখে।
এখন প্রকৃতি বিনে তিলার্দ্ধ না থাকে ॥
অনন্ত হরি প্রভু সহজ তত্ত্ব ধর্ম্ম।
বৈরাগীকে শিখাইলা প্রকৃতির মর্ম্ম ॥

বৈষ্ণব ধর্ম্মের সহজপন্থী ধর্ম্ম সম্প্রদায় বজ্রযানের বর্ত্তমান উত্তরাধিকারী। বৈষ্ণব ধর্ম্ম উড়িষ্যায় জনসাধারণের ধর্ম্ম। চৈতন্য মহাপ্রভু ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় বার উড়িষ্যায় আসিয়া পুরীর সাগর-সৈকতে তাঁহার জীবনলীলার অবসান করেন। এই মহাপুরুষের ভাবস্রোতঃ অন্তঃসলিলা পাতকনাশিনী-রূপে আজিও উড়িষ্যায় ভাবমন্দাকিনী হইয়া রহিয়াছে। উড়িষ্যায় সহজপন্থী-দিগের সংখ্যা কত, তাহা নিরূপণ করিবার কোনও উপায় নাই। তবে গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে ঐ সম্প্রদায়মতাবলম্বী দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহাদিগের সাধন ভজনের কথা আমি বিশেষ কিছু জানি না। সহজ ধর্ম্মের মতে পরকীয়া রতিই সার। এক তন্ত্রের মার্গ অনেকটা সহজ ধর্ম্মের অনুরূপ। তবে বিবাহ-বন্ধনহীন নেড়া-নেড়ীর দলে সাধনার নামে অনেক স্থলেই বীভৎস ব্যাপার হইয়া থাকে। মূলে কিন্তু সহজ মত আনন্দ-উপাসনায় প্রতিষ্ঠিত। আমার মনে হয়, সহজ ধর্ম্ম বৌদ্ধ ধর্ম্ম হইতে উদ্ভূত বলিয়াই উড়িষ্যায় অতি-প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে।

সমাজের নিম্নতম স্তরে হিন্দু দেব দেবীর এবং ব্রাহ্মণগণের প্রভাব অপেক্ষা-কৃত অধিক দেখা যায়। ব্রাহ্মণগণের ঠিক নিম্নে যে সকল জাতির স্থান, তাঁহাদিগকে লইয়াই ব্রাহ্মণগণের সম্মান এবং প্রতিষ্ঠা। অতএব তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণগণ সমান বলিয়া গণ্য না করিলেও অনেকটা সভ্য ভাবে দেখিয়া থাকেন। কিন্তু সমাজ যাহাদিগকে চিরকাল পতিত করিয়া রাখিয়াছে, তাহারাই সর্ব্বদা ব্রাহ্মণের ভয়ে জড়সড় হইয়া থাকে। সুদূর অতীতে সমাজ যে দাসত্বের ছাপ মারিয়া দিয়াছে, তাহা আজিও মুছিয়া যায় নাই। ঐ সকল জাতির মধ্যে মনসা, মঙ্গলা, ষষ্ঠী, আকাল প্রভৃতি দেবতা হইতে হিন্দুদিগের গ্রামাণিক

শাস্ত্রসম্মত যত দেবতা আছেন, সকলেই বিশেষ সমাদৃত হন। লৌকিক ধর্ম্মের প্রতি নিম্ন জাতির যেরূপ আস্থা এবং ভক্তি দেখা যায়, উন্নত জাতির সেরূপ দেখা যায় না। কিন্তু উড়িষ্যায় ডোম, বাহুরী, শবর প্রভৃতি জাতি আজিও ব্রাহ্মণের অনুশাসন মানিয়া চলে না। উড়িষ্যায় ব্রাহ্মণের প্রভাব অতি সঙ্কুচিত এবং মৃদু। বৌদ্ধ ধর্ম্মের অতি-প্রচলনের ফলে বোধ হয় এইরূপ হইয়াছে। বাহুরী এবং ডোমদিগের বিশেষত্ব এই যে, তাহারা হিন্দু দেব দেবীর পূজা করে না। অবশ্য, বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রভাব বিস্তৃত হইয়া ঐ সকল জাতির পূর্ব্বতন ধর্ম্মভাব কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত করিয়াছে। আজ কাল অনেক বাহুরী এবং ডোম তাহাদিগের আঙ্গিনায় তুলসীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া তুলসীর পূজা করিয়া থাকে। কিন্তু যে সকল বাহুরী এবং ডোম সভ্যতার কেন্দ্র হইতে দূরে বসবাস করিতেছে, তাহারা সনাতন ধর্ম্মভাব অনেকটা বজায় রাখিয়াছে। বাহুরী জাতি মূর্ত্তি পূজা করে না। তাহারা নিরাকার নিরঞ্জন পরম পুরুষের ভক্ত। আমার বোধ হয়, বাহুরী এবং ডোম জাতির উপাসনাতত্ত্বের আলোচনা করিলে, এই দুই জাতি পূর্ব্বে যে শূন্যবাদী ও বৌদ্ধবাদী ছিল, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইবে। প্রাচ্যবিদ্যার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের মতে, বৌদ্ধ যুগে বাহুরী জাতি সমাজের উচ্চ স্থান অধিকার করিত। প্রতাপরুদ্রদেবের সময় পর্য্যন্ত বৌদ্ধ ভাব বজায় ছিল। ঐ রাজা কিম্বা তাঁহার অমাত্যগণ রাজদণ্ডের ভয় দেখাইয়া বৌদ্ধভাবাপন্ন অনেক বাহুরীকে বৈষ্ণব করিয়া তুলেন। যে সকল বাহুরী নূতন বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত না হইয়া সনাতন ধর্ম্ম মানিয়া চলিল, তাহাদিগকে প্রতাপরুদ্রদেব পতিত করিলেন। হিন্দুরাজগণ প্রকৃতপক্ষে সমাজপতি ছিলেন। তাঁহারা অনুজ্ঞার বশে নীচকে উচ্চ এবং উচ্চকে নীচ করিতেন। আজিও উড়িষ্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমীদার সমাজপতির কার্য্য করিয়া থাকেন। তাঁহারা ব্যক্তিবিশেষকে পতিত করিতে পারেন। প্রতাপরুদ্র দেবের মত প্রবল নরপতি যে সমগ্র বাহুরী জাতিকে পতিত করিয়াছিলেন, তাহা কিছু বিচিত্র নহে।

স্ত্রীজাতি স্বভাবতঃই রক্ষণশীল। ধর্ম্মবিশ্বাস তাঁহাদিগের হৃদয়ে এরূপ বদ্ধমূল যে, তাঁহারা কিছুতেই সে বিশ্বাস ছাড়িতে পারেন না। তাই আজিও কুলললনাদিগের মধ্যে দুই একটা ব্রতকথায় বৌদ্ধ ভাবের অবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। বৈশাখ মাসে স্ত্রীলোকেরা ধর্ম্মঘট ব্রত করিয়া থাকেন। ঐ ব্রতে কোনও দেব দেবীর পূজা হয় না। কতকগুলি জলপূর্ণ মৃন্ময় কুম্ভ উৎসর্গ করিয়া

ব্রাহ্মণকে বিতরণ করা হয়। ব্রতকথায় লেখা আছে, দ্রৌপদী নামে কোনও এক রাজ্ঞী জীবদ্দশায় নানা ব্রত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর যমদূত তাঁহার আত্মাকে যমালয়ে লইয়া যায়। যম তাঁহাকে বলিলেন, 'আপনি প্রায় সমস্ত ব্রত উদ্‌যাপন করিয়াছেন, কিন্তু ধর্ম্মঘট ব্রত করেন নাই বলিয়া আপনার আত্মার সদ্গতি হয় নাই। অতএব নিজালয়ে ফিরিয়া যান, এবং ধর্ম্মঘট ব্রত করুন, তাহা হইলে আর কখনও যমালয়ে আসিতে হইবে না।' উড়িষ্যায় ধর্ম্মঠাকুরের উপাসনা দেখা যায় না। পশ্চিম বঙ্গের বহু স্থানে ডোম, বাগ্দী, দুলে প্রভৃতি ছোট জাতির মধ্যে ধর্ম্মপূজা আছে। ধর্ম্মঘট ব্রত ধর্ম্মপূজার রূপান্তরমাত্র বলিয়া মনে হয়। মনে হয়, পুরাতন বৌদ্ধ মতের শূন্যপূজা এই ব্রতে অনেকটা বজায় রহিয়াছে। কোনও দেব দেবী নাই। আত্মার মঙ্গলের জন্য যমালয়ে যাইতে হইবে না বলিয়াই ধর্ম্মঘট ব্রত করা হয়। পরবর্ত্তী বৌদ্ধ যুগে ধর্ম্মের মূর্ত্তি কল্পিত হইয়াছিল। সেই মূর্ত্তি হিন্দুর দেব দেবীর ন্যায় পূজা পাইতেন।

উড়িষ্যার প্রজা যখন জমীদারের বিরুদ্ধে মিলিত হয়, এবং দলবদ্ধ হইয়া খাজনা বন্ধ করে, তখন সেই সংহতি বা 'মেলী'কে ধর্ম্মঘট বলে। বৌদ্ধ বিহার ও সঙ্ঘারামে সাধারণের মত লইয়া কার্য্য হইত, এবং বর্ত্তমান কালে সভা সমিতিতে যেরূপ ভোট লইবার ব্যবস্থা আছে, সঙ্ঘারামেও সেইরূপ ছিল। প্রজার দলবদ্ধতাকে কেন ধর্ম্মঘট বলে, তাহা নিরূপণ করা কঠিন। তবে মেলীর বৈঠকে অধিকাংশ প্রজার মত গৃহীত হয়, এবং সেই মতে ভিন্নমতাবলম্বী স্বল্পসংখ্যক প্রজাও বাধ্য হয়। বৌদ্ধ বিহারে অধিকাংশ ভিক্ষুর মত ভিন্ন-মতাবলম্বী স্বল্পসংখ্যক ভিক্ষুদিগকে বাধ্য করিত, এবং সেই প্রথা মেলী বৈঠক অবলম্বিত হইয়াছে বলিয়াই বোধ হয় মেলীর নাম ধর্ম্মঘট হইয়াছে। বৌদ্ধ যুগের পূর্ব্বে হিন্দুদিগের কোনও বৈঠক বা মজলিসে এইরূপ প্রথার প্রচলন বিষয়ে ইতিহাসে কোনও প্রমাণ নাই। মেলী বৈঠকে কোনও ঘটস্থাপনা হয় না। প্রজাগণ নিজ নিজ অভিমত ব্যক্ত করিলে অধিকাংশের মত গ্রাহ্য হয়, এবং সেই মতে সমগ্র প্রজামণ্ডলী পরিচালিত হয়। উড়িষ্যার প্রজাদিগের জীবনী-শক্তির বিকাশ মেলীর সময়েই দেখা যায়। যদি বৌদ্ধবিহারের অভিমত প্রথা সত্যই লোকসাধারণের দ্বারা গৃহীত হইয়া থাকে, তাহা হইলে ধর্ম্মঘটকে বৌদ্ধ যুগের নিদর্শন বলা যাইতে পারে।

বালেশ্বর জেলার উত্তরাংশে এবং মেদিনীপুরের দক্ষিণ অঞ্চলে আজিও এক বৌদ্ধ রাজ-কন্যা... ব্রত আখ্যায়িকায় পূজিত হইয়া আসিতেছেন। তাঁহার

নাম জিতবাহন। ভাদ্র মাসের শুক্ল অষ্টমীতে ঐ ব্রত হয়। ব্রত-কথায় জিতবাহনকে সূর্য্যের পুত্র বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। গ্রামের বড় রাস্তার মোড়ে একটী চতুষ্কোণ গর্ত্ত খুলিয়া তাহাতে চিল, শৃগাল এবং ক্ষেত্রপালের মূর্ত্তি স্থাপিত হয়। কুলাঙ্গনাগণ নিজ নিজ ব্রতোপচার পাঠাইয়া দেন, এবং সকলে অবহিতচিত্তে জিতবাহনের কথা শ্রবণ করেন। জিতবাহনের ব্রত করিলে পুত্র কন্যার মঙ্গল হয়। ব্রত-কথায় লিখিত আছে, এক চিল ও শৃগাল সর্ব্বপ্রথমে জিতবাহনের ব্রত করে। শৃগাল ক্ষুধায় কাতর হইয়া ব্রতসংযম ভঙ্গ করে। পরজন্মে শৃগাল পরমসুন্দরী কন্যা হইয়া জন্ম গ্রহণ করে, এবং মাহিষ্মতীপুরের রাজঘরণী হয়। চিলও মাহিষ্মতীপুরের মন্ত্রীর স্ত্রী হয়। পূর্ব্বজন্মের সুকৃতির ফলে মন্ত্রীর স্ত্রী জিতবাহনের কথা বিস্মৃত হন নাই। তিনি বৎসর বৎসর ঐ ব্রতাচরণ করিতেন। তাঁহার সাতটি সুন্দর পুত্র হয়। মাহিষ্মতীপুরের রাণী পূর্ব্বজন্মের পাপের ফলে মৃৎবৎসা-রোগগ্রস্তা হন। তিনি ঈর্ষ্যাপরবশ হইয়া মন্ত্রীর সাতটী সুকুমার বালককে হত্যা করেন, কিন্তু জিতবাহনের বরে তাঁহারা বাঁচিয়া উঠেন। অবশেষে রাণীর চৈতন্যোদয় হইল। তিনি নিজ পাপে লজ্জিত হইয়া জিতবাহনের শরণাপন্ন হন, এবং জিতবাহনের বরে উৎকট মৃত-বৎসা রোগ হইতে উদ্ধার পাইয়া অনিন্দ্যসুন্দর পুত্র লাভ করেন। জিতবাহন শালিবাহনের পুত্র। শালিবাহন অন্ধ্রভৃত্যবংশীয়। মৌরেয় বংশ-ধ্বংসের পর মগধের নিকট অন্ধ্রভৃত্য নৃপতিরা কিছুকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। ঐ বংশীয় রাজগণ তৈলঙ্গেও রাজত্ব করিতেন। অতএব, মগধ হইতে অন্ধ্রবংশীয় রাজগণ তৈলঙ্গে গিয়াছিলেন, কিংবা তৈলঙ্গ হইতে তাঁহারা মগধে রাজ্যস্থাপন করেন, ইহা নিশ্চিত জানিবার উপায় নাই। অন্ধ্রনৃপতিগণ বৌদ্ধ ছিলেন। ভারতবর্ষের প্রাচীন বৌদ্ধ অট্টালিকায় ইঁহাদিগকে শতাকর্ণী বা শাতবাহন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। সঞ্চি, অমরাবতী প্রভৃতি অনেক স্থানের মন্দিরে তাঁহাদিগের নাম দেখা যায়। তাঁহারা বৌদ্ধধর্ম্মের নানাবিধ নীতি সংকলন করেন। এই সময়ে বৌদ্ধ সন্ন্যাসিগণ চীন, তিব্বত, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি নানা স্থানে আপনাদিগের ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। কুলললনাগণ আজিও যে বৌদ্ধ রাজার পূজা করিতেছেন, তাঁহার যে বিশেষ প্রভাব ছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ইতিহাসে শালিবাহন কিংবা তাঁহার পুত্র জিতবাহনের বিশেষ পরিচয় নাই। অশোক প্রভৃতি রাজার ব্রতগাথা নাই। বোধ হয়, উত্তর বালেশ্বর এবং মেদিনীপুর অঞ্চলে জিতবাহন বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব বিস্তার করি-

য়াছিলেন। সেই জন্য আজিও সুকোমলহৃদয়া কুলনারী তাঁহার স্মৃতির পূজা করিয়া থাকেন। ইতিহাসের মানদণ্ড বড় কঠিন এবং নির্ম্মম। ইতিহাস বিজিত নৃপতির স্মৃতি হেলায় মুছিয়া ফেলে, তাঁহার নামগন্ধ লোপ করিবার চেষ্টা করে। তাই বোধ হয় রক্ষণশীলা কুলললনার কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে আজিও জিতবাহনের স্মৃতি সমাদৃত হইয়া আসিতেছে।

উড়িষ্যার প্রধান তীর্থ পুরীর শ্রীমন্দিরে বৌদ্ধপ্রভাব জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। মাগুনিয়া দাশ নামক উড়িয়া কবির একটী পদ আছে।

দেখিলে সিংহাসনোপরে পদ অঙ্গুলি নাহি হাত
বিজয়ে, বৌদ্ধরূপরে শ্রীদারু ব্রহ্ম জগন্নাথ॥

দেউলতোলা নামক উড়িয়া পুস্তকে 'জগন্নাথ দেবঙ্কর বরাহিমূর্ত্তি ধারণ' নামে চতুর্থ অধ্যায়ে লেখা আছে—

এবে বৌদ্ধরূপে হরি নীলাচল পরে।
শ্রীমুখ দেখাই মুক্তি দেউছ সবারে॥
* * *
দারুব্রহ্মরূপে মুহি এঠায়ে বসিবি।
বৌদ্ধরূপে নীলাচলে লীলা প্রকাশিবি॥

ঐ পুস্তকের পঞ্চম অধ্যায়ে দেখা যায়—

কুশশয্যা করি রজা সেঠারে শুইলে।
রাত্র অর্দ্ধে জগন্নাথ স্বপ্নে দেখা দিলে॥
বোলন্তি রাজন তুহি ভালু কাঁহি পাঁই।
কলিযুগে বৌদ্ধরূপ ধরিবই মুঁহি॥
হস্ত নাহি বলি যদি মনে,কষ্ট তোর।
সুবর্ণর হাত রজা কর তু তিয়র॥

ভক্তকবি বলরাম দাশ তাঁহার সারস্বত-গীতার মঙ্গলাচরণে লিখিয়াছেন।—

জয় ধর্ম্ম শ্রীপুরুষোত্তম। অনাদি স্তুতি পরমব্রহ্ম॥
অব্যক্ত পুরুষ নিরাকার হরি। সর্ব্বঘটে অছ ব্রহ্মরূপ ধরি॥
নাহি রেখ রূপ তোর শ্রীবিজ্ঞপুরুষ। বিষ্ণুর গোচর হোইছ প্রকাশ॥
মন নয়ন চিত্ত চেতন নাহি তোর। কর্ম্ম ধর্ম্ম সর্ব্ব ঠারে সিদ্ধ নকর॥
মহাশূন্য তোর নাম। ওঁকার শব্দ এজে বেদান্ত আগম॥

'যশমতী মালিকা' উড়িয়া-ভাষায় একটী প্রাচীন গ্রন্থ। আজিও লোকে ঐ গ্রন্থের যথেষ্ট সমাদর করে, এবং অনেক গৃহস্থের বাড়ীতে ঐ গ্রন্থ ভাগবত এবং চৈতন্যচরিতামৃতের সহিত একাসনে স্থান পাইয়া পূজিত হইতেছে।

ঐ গ্রন্থে স্পষ্ট লেখা আছে, নীলাচলে হরি বুদ্ধ-রূপ ধারণ করিয়া বিহার করিতেন। কিন্তু মুকুন্দদেবের ৪১ অঙ্ক হইতে তিনি নীলাচল ত্যাগ করিয়া গুপ্তভাবে অলেখ প্রভুর সেবা করিতেছেন। ভগবানের এই দীন হীন বেশ দেখিয়া কেহই তাঁহাকে চিনিতে পারিবে না। কেবল প্রকৃত অলেখবাদী বা কুম্ভিপটুয়াগণ পূর্ব্বজন্মের সুকৃতির বলে ভগবানকে চিনিতে পারিবেন। মালিকার এই উক্তি হইতে বেশ জানা যাইতেছে যে, অলেখবাদিগণ সম্পূর্ণ বৌদ্ধভাবাপন্ন এবং বৌদ্ধদিগের বর্ত্তমান প্রতিভূস্বরূপ।

মালিকায় হরি গরুড়কে বলিতেছেন—

শুনরে নন্দন তোতে দেউ অছি কহি।
কলিযুগ শেষকতু থিবুবাট চাহি॥
মুকুন্দদেবঙ্ক একচালিশি অঙ্করে।
বুদ্ধরূপকু তেজি থিবু গুপতরে॥
আম্ভে যেতে বেলে পিণ্ড ত্যজিবুরে স্নত।
সকল দেবতা যাক হেবে সেই মত॥
হরিহর ব্রহ্মা এক অটইত মুঁহি।
নিজ আত্মা থিব মোর অলেখর তঁহি॥
মায়া কায়া ধরি অবধূত বুলাইবুঁ।
অলেখ প্রভুঙ্ক আম্ভে সেবা করি থিবুঁ॥
চতুর পাদে কলি আসি ঘুটিলাক মহী।
মহাতেজ ব্রহ্ম উদোহবে শূন্যদেহী॥
নবকল্পঠারু প্রভু উদে হোই থিবে।
খণ্ডগিরি মণিনাগ কপিলাস ঠাবে॥
ফলপত্র ক্ষীর জল করিণ আহার।
খেল খেলুথিবে প্রভু ব্রহ্মাণ্ড যাঙ্কর॥

নর মনুষ্য যে আজি দেবলোক যাএ।
জানি নপারিবে কেহি প্রভুঙ্ক উদয়ে॥
সে শূন্য পুরুষ মীনে বিচার যে কলে।
নর সঙ্গে মঞ্চেলীলা করিবু বইলে॥
মহাঘোর পাতক, হৈব অবনীর।
ভক্তে জাত হইছন্তি আকারে আম্ভর॥
বুদ্ধরূপ ধরি গুরুরূপে জ্ঞান দেবে।
কুম্ভিপটি দেই বাণা প্রকাশ করিবে॥
অতিথি যে ক্ষীণরূপ ন চিনিবে কেহি।
পূর্ব্বর ভকত যে চিনিব ভীম ভোই॥
তাঙ্ক মুনে প্রভুঙ্কর ভজন হোইব।
অলেখমণ্ডল শূন্যপণ্ড যে রহিব॥
ভক্ত জনে গাই তাহা পরম সন্তোষে।
মহিমা নাম গায়ন গুরু উপদেশে॥

জগন্নাথ দেবের শ্রীমন্দিরের আঙ্গিনায় এখন যেখানে সূর্য্যনারায়ণের মন্দির আছে, সেখানে বুদ্ধদেবের একটী বৃহৎ প্রস্তরময় মূর্ত্তি ছিল। একটী প্রাচীর দিয়া সেই মূর্ত্তিকে আবৃত করা হইয়াছে। মুকুন্দদেবের রাজত্বকালে এইরূপ করা হইয়াছিল বলিয়া প্রাচ্যবিদ্যার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় অনুমান করেন। পুরীর রাজবংশাবলীতে একাধিক মুকুন্দদেবের উল্লেখ আছে। যবন সেনাপতি কালাপাহাড় যখন উৎকল আক্রমণ করেন, তখন উৎকলের সিংহাসনে এক জন মুকুন্দদেব বিরাজ করিতেন। বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাসলেখক তারানাথের মতে, ঐ মুকুন্দদেব বৌদ্ধমতাবলম্বী এবং একান্ত ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। লোকে তাঁহাকে ধর্ম্মরাজ নামে অভিহিত করিত। মালিকার মতে, মুকুন্দদেবের সময়

বুদ্ধদেব পুরীর প্রধান পীঠ ছাড়িয়া যান; এবং বৌদ্ধগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পর্ব্বত-কন্দরে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। হুয়েনসাং তাঁহার প্রসিদ্ধ ভ্রমণবৃত্তান্তে পুরী বা চরিত্রপুরের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। হুয়েনসাং যখন চরিত্রপুরে আসিয়াছিলেন, তখন বুদ্ধদেবের দন্ত পুরীতে পূজিত হইত। পরে সিংহলের রাজা ঐ দন্ত লইয়া যান, এবং আজিও ঐ দন্ত সিংহল দেশে পূজিত হইতেছে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, পুরী একটী প্রাচীন বৌদ্ধপীঠ ছিল। অনেকে বলেন, জগন্নাথ দেবের আকারের সহিত বৌদ্ধ চৈত্যের অনেক সৌসাদৃশ্য আছে। চৈত্যের নমুনায় শ্রীমূর্ত্তি গঠিত হইয়াছে। কিন্তু এই বিষয়ে বিভিন্ন মতবাদ আছে বলিয়া যুক্তি দ্বারা কোনও একটী মত সমর্থন করা আবশ্যক বিবেচনা করিলাম না।

শ্রীসতীন্দ্রনারায়ণ রায়।

সুসন্তান।

১

সবডেপুটীর জন্মদাতা হইয়াও গৌরহরি অধিকারী কেন আদালতের পেয়াদাগিরি করিত, তাহার কারণ কেহই জানিত না; সেই জন্য মফঃস্বল ঘুরিয়া রক্তাক্ত চাদরখানি মাথায় জড়াইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে গৌরহরিকে এক দিন বাড়ী আসিতে যে দেখিল, সেই দুঃখ প্রকাশ করিল। কেহ কেহ যাহা বলিল, তাহার অর্থ এই,—জীবনের চেয়ে চাকরীর মায়া যাহার অতি প্রবল, পরিণামে তাহাকে ঐরূপ ফলই ভোগ করিতে হয়। কেহ বা বলিল, কাঁচা পয়সা হজম করা সহজ কথা নহে।

গৌরহরি কাহারও কথার প্রতিবাদ করিল না, কাপড়ের খুঁটে চোখের জল মুছিয়া গৃহিণীকে বলিল, 'আমি আর বসতে পারছি না, মাদুরখানা পেতে দাও।'

গৌরহরির জীবনে এই ঘটনা নূতন নহে। আরও দুই বার অস্থাবর পরওয়ানা জারি করিতে গিয়া সে এই ভাবে মাথা বাঁধিয়া বাড়ী আসিয়াছিল। আরও কত বার সে জ্বরে ভুগিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বাড়ী আসিয়া মাদুরে শুইয়া সারিয়া উঠিয়াছিল, তাহার পর মাথায় পাগড়ী ও কাঁধে চাপরাস লইয়া

---

* কটক বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পঞ্চম সমাগমে পঠিত।

আদালতে হাজিরা দিয়াছিল। তখনও তাহার খড়ের ঘরখানির চাল দিয়া বর্ষার জল পড়িত, নিদাঘ সূর্য্য উঁকি মারিত। এখনও তাই। তখন পেটের ভাত ও পরণের কাপড় অতি কষ্টে জুটিত, এখনও তাই। পূর্ব্বে মাথা ফাটিলে মাথার ব্যথায় সে কাতর হইত, আজ হৃদয়ের ব্যথাই তাহাকে অধিকতর কাতর করিয়াছে,—তাহারই ছেলে যে হাকিম! যাহার দাস দাসী পেট ভরিয়া খাইতে পায়, তাহারই মাতা পিতা অন্নের কাঙ্গাল! গৌরহরি দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া বলিল, 'এ কি প্রায়শ্চিত্ত ভগবান?' তাহার পর মাটিতে শুইয়া বলিল, 'বাঁচি ত পেয়াদাগিরি আর করব না।' গৃহিণী তুলসীতলায় প্রণাম করিয়া বলিলেন, 'আমার নরহরিকে সুমতি দাও ঠাকুর!' গৌরহরি মাথা তুলিয়া বসিবার চেষ্টা করিল, পারিল না, পাশ ফিরিয়া শুইয়া বলিল, 'ও আবার কি, লোকে শুনবে যে। বেঁচে থাকতে চাকরী আমি ছাড়ছি না, এ তুমি ঠিক জেনো।'

২

আদালতের পেয়াদাগিরির আয়ে অতি কষ্টে দিন কাটাইয়া গৌরহরি পুত্রকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাস করাইয়াছিল; তাহার পর এক দয়ালু পাদ্রী সাহেবের পা জড়াইয়া ধরিয়া কলেজে পড়াইবার ব্যবস্থা করিয়াছিল। সাহেব কলেজের বহি ও বেতন দিতেন, মধ্যে মধ্যে দুই পাঁচ টাকা নগদও দিতেন। বাকী ব্যয় গৌরহরি যে কষ্টে বহন করিত, তাহা তাহার স্ত্রী ছাড়া বাহিরের কেহ জানিত না। বেতন মাসে আটটা টাকা, আর পরওয়ানা জারির বকসিস, সে আর কত? যে যাহা দিত, তাহাতেই সে সন্তুষ্ট হইত, কিছু না পাইলেও মিথ্যা রিপোর্ট লিখিত না। এই জন্যই তাহার অন্নকষ্ট ঘুচিত না। সে ভাবিত, গত জন্মের পাপের ফলে এ জন্মে তাহার এই কষ্ট; আবার এ জন্মে পাপের বোঝা বহিয়া পর জন্মে সে কোথায় দাঁড়াইবে?

তাহার স্ত্রীও তাহারই মত নিজের অবস্থা বুঝিয়া চলিতে শিখিয়াছিল। নরহরি মানুষ হইলে আর তাঁহাদের কোনও কষ্ট থাকিবে না, ইহা ভাবিয়াই সে পরের কাছে দৈন্য প্রকাশ করিত না। পাড়ার মেয়েরা স্নানের ঘাটে অলঙ্কারের কথা তুলিলে গৌরের স্ত্রী বলিত, 'মাথায় সিঁদুর আর হাতে শাঁখা —এর কাছে আর গহনা লাগে না।'

গ্রামের মধ্যে গৌরহরির হিতৈষীর অভাব ছিল না; কারণ, গ্রামের বহু

ব্রাহ্মণ অন্তিমে তাহার কাঁধে চড়িয়া শ্মশানঘাটে গিয়াছেন, এবং অব্রাহ্মণের শ্রাদ্ধের দিনে সে শত কাজ ফেলিয়া পরের কাজ নিজের ভাবিয়া কর্ম্মকর্ত্তার বাড়ীতে ছুটাছুটি করিত। কিন্তু এ সব কাজ নরহরির ভাল লাগিত না। কখনও সে বিরক্ত হইয়া মুখ ভার করিয়া ঘরের মধ্যে বসিয়া থাকিত; কখনও বা পিতার কাছে স্পষ্ট ভাবে মনোভাব ব্যক্ত করিত। গৌরহরি সরলভাবে বুঝাইয়া দিত, যাহাতে পরের উপকার হয়, এমন কাজ যতই হীন হউক, তাহাতে লজ্জা নাই। নরহরি বুঝিত, উহা মূর্খের কথা। ইহা নরহরির পাঠদশার কথা।

নরহরি বি-এ পাস করিল। আত্মীয় স্বজন অনেকেই গৌরহরিকে উপদেশ ও পরামর্শ দিলেন, 'ছেলেটাকে বাড়ীতে বসিয়ে রেখো না, ইস্কুল-মাষ্টারীতে দাও, তোমার দুঃখ দূর হবে।' কিন্তু গৌরহরি ও পথে না গিয়া একেবারে পাদ্রী সাহেবের কুঠীতে গিয়া মেম সাহেবকে লম্বা সেলাম করিয়া বলিল, 'নরহরি আপনাদের ছেলে, তাকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করলেন, এখন ভাল একটা কাজ করে দিয়ে প্রতিপালন করুন।' কিছু দিন পরে নরহরি সাধারণের, এমন কি, গৌরহরিরও বিস্ময় উৎপাদন করিয়া সবডেপুটী হইয়া আলিপুরে গেল। তখন সকলেই বলিল, 'একেই বলে পাতাচাপা কপাল, নইলে বি-এ পাস ত ছড়াছড়ি, কিন্তু সবডেপুটী কয়টী?' তাহা শুনিয়া গৌরহরি বলিল, 'শুধু বি-এ পাশ করলে হয় না, যোগ্যতা থাকা চাই।'

৩

নরহরি সাহেবী পোষাক পরিয়া যে দিন বিচারাসনে বসিল, সে দিন তাহার হরিষে বিষাদের দিন। আজ সে এত লোকের কাছে 'হুজুর' ও ধর্ম্মাবতার, কিন্তু তাহার পিতা তাহারই চাপরাসীর মত একটা হীন কর্ম্ম করে, সে কথা আর কত কাল চাপা থাকিবে? নরহরি সেই দিনই পিতাকে পত্র লিখিল, 'কাজ ছাড়িয়া দাও, মাসে দশ টাকা দিব, তাহাতেই তোমার ও মায়ের বেশ চলিবে।' গৌরহরি প্রত্যুত্তর দিল, 'আর একটী বৎসর কাজ করিলে মাসে চারি টাকা পেন্সন পাওয়া যাইবে। হঠাৎ কি চাকরী ছাড়া যায় বাবা?' তাহার পর তিন মাস না যাইতেই এই দুর্ঘটনা, গৌরহরি মাথা ভাঙ্গিয়া বাড়ী আসিল।

পাঁচ সাত দিন মাথায় জলপটী বাঁধিয়া মাথার ঘা শুকাইলে এক দিন

গৌরহরি গৃহিণীকে বলিল, 'ভেবে দেখলাম, কাজে ইস্তফা দেওয়াই ঠিক। পেয়েদাগিরিটা হাকিমের বাপদের জন্যে নয়, এ কথা এ ক'দিন শুয়ে শুয়ে বেশ করে' ভেবে দেখেছি। ইস্তফাপত্র আজই ডাকে দিচ্ছি, কাল আলিপুরে গিয়ে নরহরির সঙ্গে দেখা করে ফিরে এসে তোমাকে নিয়ে যাব। কেমন ?'

গৃহিণী বলিলেন, 'ছেলের মতেই এখন কাজ করা ভাল।'

গৌরহরি বলিল, 'হাঁ গো হাঁ, সেই জন্যেই ত আগে ইস্তফা দিয়ে তবে ছেলের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি।'

৪

সে দিন রবিবার—বিশ্রামের দিন। নরহরি মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর বাসায় বসিয়া একখানি খবরের কাগজ পড়িতেছিল। এক বেহারী ব্রাহ্মণ কোর্টে চাপরাসীর ও বাসায় পাচকের কাজ করিত। সে আহারান্তে দড়ির খাটিয়ায় শুইয়া ভিজা গামছায় কপালের ঘাম মুছিতেছিল। ঝি রান্নাঘরে আপন মনে বিড় বিড় করিয়া বকিতে বকিতে ভাতের সঙ্গে পুঁই ডাঁটা চিবাইতেছিল। এমন সময়ে গৌরহরি ঘর্ম্মাক্তকলেবরে দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'বাবা! বাসা ঠিক করতে গোটা সহর ঘুরতে হয়েছে।' বলিয়াই ঘরের মধ্যে অগ্রসর হইল।

চাপরাসী ঠাকুর খাটিয়ার উপর উঠিয়া বসিয়া মৃদুগম্ভীর স্বরে হাঁকিল, 'আরে, ঠারো,—ঠারো।'

গৌরহরি নরহরির দিকে চাহিয়া বলিল, 'ভাল আছিস ? চিঠিও এক খান দিস না বাবা ?'

এ কালের অতিথিরা ধনীর দুয়ারে যে ভাবে অভ্যর্থিত হয়, তেমনই ভাবে বিরক্তিব্যঞ্জক সুরে নরহরি গৌরহরিকে বলিল, 'এখন এখানে আসারই বা কি দরকার ছিল ?'

গৌরহরি হাঁপ ছাড়িয়া বলিল, 'কাজে ইস্তফা দিয়ে এসেছি। তুমি ত একটা পয়সাও পাঠাও নাই, একটা সংবাদও দাও নাই।'

নরহরি হাকিমোচিত সুরে বলিল, 'খরচপত্র দেওয়া হবে না, এমন কথা বলা হয় নাই। এই সে দিন রামধনবাবু সবজজের সঙ্গে আলাপ হল। তিনি কার কাছে আমার পরিচয় পেয়েছিলেন, আমাকে দেখেই বললেন, "অধিকারী কেমন কাজকর্ম্ম করছে ?" কি লজ্জার কথা !'

গৌরহরি রাগিয়া উঠিল, বলিল, 'আমি এমন কি অন্যায় কাজ করেছি যে, আমার পরিচয়ে তোমার লজ্জা হয়? বলবে,—পেয়াদাগিরি। বাপু হে! পেয়াদাগিরি এত কাল করেছিলাম বলেই তোমাকে লেখাপড়া শিখাতে পেরেছি, পাদ্রী সাহেবের সুপারিসে তোমার হাকিমী জুটিয়ে দিতে পেরেছি, নইলে—'

কথায় বাধা দিয়া নরহরি ক্রুদ্ধস্বরে বলিল, 'বৃথা চেঁচামেচি করে লাভ কি?'

গৌরহরি বলিল, 'চেঁচামেচি আমি করি নাই, তুমিই করছ, তা বেশ, আমি এখন আসি।' বলিয়াই চলিয়া গেল। এঁটো হাতে রান্নাঘর হইতে ঝি দৌড়িয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কে এয়েলো বাবুজী?'

নরহরি উত্তর দিল, 'গাঁয়ের একটা লোক।'

গৌরহরি চলিয়া যাইবার পর নরহরি কিছুক্ষণ ঘরের মধ্যে আপন মনে পায়চারি করিল, তাহার পর সে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইল তাহা এই,—(১) প্রতি মাসে মাতার নামে পঁচিশ টাকা মণি-অর্ডার করিয়া পাঠাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য; (২) পিতার জীবিতাবস্থায় স্বগ্রামে না যাওয়াই উচিত; (৩) হাকিমের পিতা বা আত্মীয় কেহ অল্প বেতনের চাকরী করিলেও হাকিমত্ব যথাযথভাবে রক্ষিত হইতে পারে; (৪) পিতাকে জলযোগ করাইয়া পাথেয়াদি দিয়া মিষ্ট বাক্যে বিদায় দিলেই ভাল হইত, কিন্তু তাহার নির্ব্বোধ পিতা তাহাকে সে সুযোগ না দিয়াই চলিয়া গেল, সুতরাং সে নির্দ্দোষ!

৫

গৌরহরি বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া নরহরির আচরণের কথা কাহাকেও বলিল না; গৃহিণীকে তীর্থযাত্রার আয়োজন করিতে বলিয়া পর দিনই বাস্তু-বাড়ীখানি বন্ধক রাখিয়া কিছু অর্থ সংগ্রহ করিল। কিন্তু বিধাতা তাহার ভাগ্যে তীর্থযাত্রা লেখেন নাই, তিন দিনের জ্বরে তাহাকে গঙ্গাযাত্রা করিতে হইল, কিন্তু তাহাও অতি কষ্টে। তাহার পর নরহরি গ্রামে আসিয়া পিতৃ-শ্রাদ্ধের যে বিরাট আয়োজন করিল, তাহা দেখিয়া সকলেই তাহাকে ধন্য ধন্য করিল। পুরোহিত মহাশয় উপযুক্ত দক্ষিণা পাইয়া নরহরিকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, 'একশ্চন্দ্রস্তমো হন্তি ন চ তারাগণৈরপি।' পাড়ার এক দন্তহীন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ক্ষীরের সহিত বঁদে মাখিয়া গিলিতে গিলিতে সাশ্রুনয়নে নরহরির দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'হায় রে, আজ যদি গৌর ভায়া বাঁচিয়া থাকিত! তার ত যাবার সময় হয় নাই, সে যে আমার চেয়ে ছোট ছিল।'

আরও কিছুকাল পরে বাস্তুবাড়ীখানি ঋণের দায় হইতে মুক্ত করিয়া কাঁচা ঘর ফেলিয়া নরহরিকে পাকা বাড়ী তৈয়ারী করিতে যে দেখিল, সেই বলিল, 'নরহরি অধিকারী বংশের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে। সে গৌরহরির সুসন্তান!'

শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সহযোগী সাহিত্য।

জাতীয় সমতা।

জাপানের "এসিয়ান রিভিউ" পত্রে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জাতিসমূহের মধ্যে সাম্য-স্থাপন সম্বন্ধে একটী সুন্দর প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। এই জাপানী লেখকটী যে বর্ত্তমান অবস্থায় অভিজ্ঞ, পরন্তু ভবিষ্যদ্দর্শী রাজনীতিক, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

জর্ম্মণ শক্তির পতনের পর মিত্রশক্তিবর্গের যে শান্তি-বৈঠক বসিয়াছিল, তাহাতে শান্তি-প্রতিষ্ঠার উদ্দেশে নানা উপায় অবলম্বনের চেষ্টা হইয়াছিল। কি করিলে ভবিষ্যতে জগতে আর যুদ্ধবিগ্রহ না ঘটে, কি করিলে জগতের জাতিনিচয়ের মধ্যে সকল বিসংবাদই আপোষে মীমাংসিত হইয়া যায়, তাহারই উপায় উদ্ভাবনে বড় বড় মনীষা-সম্পন্ন রাজনীতিক বহু দিন যাবৎ জল্পনা কল্পনা করিয়াছিলেন। জগতে যত দিন স্বার্থের প্রাধান্য বিদ্যমান থাকিবে, জাতিগত দ্বেষ হিংসা যত দিন জগতে বিরাজ করিবে, তত দিন চিরশান্তির আশা সুদূর-পরাহত। এ কথা যে এই সমস্ত প্রথিতযশা রাজনীতিক জানিতেন না, তাহা নহে; তবে এই দ্বেষ হিংসা লোভ স্বার্থ সত্ত্বেও যতটা সম্ভব সমতা-স্থাপনে তাঁহারা আগ্রহান্বিত হইয়াছিলেন। অন্ততঃ সংবাদপত্রে প্রকাশিত শান্তি-বৈঠকের কার্য্য-বিবরণে জগতের লোকে এইরূপই বুঝিয়াছিল।

শান্তি-বৈঠকে প্রবল প্রতীচ্য শক্তিগণের মধ্যে হংসমধ্যে বকের ন্যায় একমাত্র জাপানই প্রবল প্রাচ্য শক্তি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। জাপান জানিতেন, জগতের সমস্ত জাতির মধ্যে সমতা-স্থাপন না করিলে চিরশান্তি-প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প কথামাত্রে পর্য্যবসিত হইবে। প্রবল দুর্ব্বল, শ্বেত অশ্বেত, সকল জাতিই সমান, কোনও জাতিই বর্ণ হিসাবে শ্রেষ্ঠ বা নিকৃষ্ট নহে,—এই মহামন্ত্র যত দিন না মান্য হয়, তত দিন যে জগতে চিরশান্তি বিরাজ করিতে পারে না, এ কথা জাপান বিলক্ষণ বুঝিতেন। তাই জাপানই প্রথমে শান্তি-বৈঠকে (Racial equality) 'জাতীয় সমতা'-প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব উত্থাপিত করেন। কিন্তু জাপানের এই সাধু প্রস্তাব শান্তি-সভায় গৃহীত হইল না; 'কেন না, মিত্রশক্তিগণের মধ্যে ছয় জন আপন আপন স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিবার উদ্দেশে এই প্রস্তাবের অনুমোদন করিলেন না।'

তাই জাপানী লেখক বলিতেছেন,—এটা যেন ঠিক অদৃষ্টের উপহাস! যাহারা সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চকণ্ঠে ন্যায়-ধর্ম্ম দয়া-মনুষ্যত্বের সমর্থক বলিয়া আপনাদিগকে জগতে জাহির করিতে-ছিলেন, তাঁহারাই সর্ব্বাগ্রে এই সমতা-প্রতিষ্ঠা-প্রস্তাবের বিপক্ষে ঘোর প্রতিবাদ উত্থাপন করিলেন,—ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি হইতে পারে? কিন্তু তাঁহারা যদি একটু চিন্তা করিয়া দেখেন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন, ভবিষ্যতে নর-রক্তস্রোতনিবারণের পক্ষে এই প্রস্তাবই একমাত্র উপায়। লীগ অব নেশানের বৈঠকের পক্ষে এই প্রস্তাব গ্রহণ করা এবং প্রস্তাবমত কার্য্য করা অতীব প্রয়োজনীয়।

জাপানী লেখক দূরদর্শী রাজনীতিক হইয়াও এখনও কেন এই আশা করেন, বুঝিতে পারি না। যাহারা খ্রীষ্টের উপাসক হইয়াও খ্রীষ্টকে বর্জ্জন করিয়াছে, যাহারা খ্রীষ্টের মূলমন্ত্র "তৃণাদপি সুনীচেন" নীতিকে বর্জ্জন করিয়া স্বার্থকে সিংহাসনে বসাইয়া পূজা করিতেছে, যাহারা ঐশ্বর্য্যগর্ব্বে ও বলদর্পে এই পৃথিবীটাকেই 'বীর' জাতির উপভোগ্যা বলিয়া মনে করিতেছে,—তাহারা স্বেচ্ছায় আত্ম-প্রাধান্য পরিত্যাগ করিয়া অশ্বেত জাতিকে সাম্যের চক্ষে নিরীক্ষণ করিবে, ইহা কি কখনও সম্ভবপর হইতে পারে?

তবে জাপানী লেখক মহাশয় এই সম্পর্কে অশ্বেত জাতিনিচয়কে যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহা প্রত্যেক সভ্যতামানী প্রাচ্য জাতির অবহিতচিত্তে শ্রবণ করা এবং যত দূর সম্ভব সেই উপদেশ-মত কার্য্যানুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। লেখক বলিতেছেন,—'জাতীয়-সমতা-প্রতিষ্ঠার উপরে আমাদের জীবন মরণ নির্ভর করিতেছে। কেবল জাপান নহে, জগতের সমস্ত অশ্বেত জাতির পক্ষেই ইহা জীবন-মরণের কথা। প্রকৃতপ্রস্তাবে এক জাপান ব্যতীত সমগ্র এসিয়া ও আফরিকার অধিবাসী সম্পূর্ণরূপে বা আংশিক ভাবে শ্বেত জাতিসমূহের পদানত। ফলে এই হইয়াছে যে, এই আন্তর্জাতিক শান্তি-বৈঠকে তাহাদের পক্ষের কথা বলিবার তাহাদিগকে কোনও সুবিধা দেওয়া হইল না; সুতরাং একমাত্র জাপানই এই জাতীয় বৈষম্য-রক্ষারূপ ঘোর অন্যায়ের বিপক্ষে প্রতিবাদ করিয়া ভোটে পরাজিত হইল।'

বৈঠকে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল না, কেন না, শ্বেত জাতির প্রতিনিধিরা একমত হইয়া জাপানের প্রস্তাবের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইলেন। লেখক বলিতেছেন,—জগতের অশ্বেত জাতিরা কি এমনই করিয়া আপনাদের মধ্যে একমত হইতে পারেন না? না, তাহা পারেন না। অশ্বেত জাতিদের মধ্যে যদি একতা থাকিত, অশ্বেত জাতিরা যদি 'Union is strength' মন্ত্রের সার্থকতা বুঝিতেন, তাহা হইলে জগতে তাঁহাদিগকে আজ হীন হইয়া থাকিতে হইত না। জাপানী লেখক বলিতেছেন,—অশ্বেত জাতির মধ্যে একতার অভাবই এই প্রস্তাবে জাপানের পরাজয়ের মূলে নিহিত। অবশ্য, অশ্বেত জাতিবর্গের দৈহিক ও মানসিক বলের অভাবও কতক পরিমাণে এই প্রস্তাবে জাপানের পরাজয়ের কারণ। তাই জাপানী লেখক পৃথিবীর সকলমতাবলম্বী অশ্বেত জাতিগণকে এই ব্যাপারে একতাবন্ধনে আবদ্ধ হইবার নিমিত্ত আহ্বান করিতেছেন। কেবল তাহাই নহে, আধুনিক মতে যাহাকে যথার্থ শক্তি বলে, সেই শক্তির অনুশীলন করিতে সমস্ত অশ্বেত জাতিকে তিনি সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছেন।

বর্ণভেদের ফলে ন্যায়ধর্ম্ম, মনুষ্যত্ব বা দয়াধর্ম্মের অর্থ ভিন্নরূপ হয় না। ন্যায়ধর্ম্মে বলে, জাতীয় বৈষম্য চিরতরে দূরীভূত করা কর্ত্তব্য। অন্যথা শত শান্তি-বৈঠক বসাইলেও জগতে যথার্থ স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে না।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

প্রবাসী। চৈত্র।—শ্রীবীরেশ্বর সেনের 'অনন্তের ধ্যানে' উপাসনা-রত মুসলমান সাধুর চিত্র। অবনীন্দ্রনাথের শিষ্য-সম্প্রদায়ে যে পরিবর্ত্তনের সূচনা হইয়াছে, পাকা হাতের তুলিতে যে উৎকর্ষ ও স্বভাবের সাদৃশ্য ক্রমে বিবর্ত্তিত হইতেছে, এ চিত্রের মনুষ্য-মূর্ত্তিতে তাহার বিশেষ কোনও লক্ষণ নাই। ইহার লঘু বর্ণের লীলা উপভোগ্য। শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়ের 'অন্ন-সমস্যা' এইবার বোধ হয় সমাপ্ত হইল। আচার্য্য বলিতেছেন,—'মাড়োয়ারী এক পয়সার ছাতু খেয়ে পিঠে কাপড়ের বস্তা ফেলে ব্যবসায়ে প্রথম চেষ্টা আরম্ভ করে। পরে তারাই লক্ষপতি হয়ে দাঁড়ায়। আর একটা দোকান করতে গেলেই তোমাদের প্রথমে চাই বড় বড় আলমারি টেবিল। ২৭।২৮ বৎসর পূর্ব্বে আমি যখন 'বেঙ্গল কেমিক্যাল' আরম্ভ করি, তখন কুলীর মত খেটেছিলাম। কয়েক বৎসরের মাহিনা থেকে ৮০০৲ টাকা জমিয়ে "বেঙ্গল কেমিক্যাল" আরম্ভ করি—আজ তার মূলধন ২০।২৬ লক্ষ টাকা।' আশা করি, তাঁহার উপদেশ বাঙ্গালী সার্থক করিতে পারিবে। শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদারের 'সুরভি' হইতে দুই চরণ উদ্ধৃত করিলাম।—

> 'প্রাণের গলায় ঘ্রাণের মালা গেথেছি ;
> আকাশ-তলায় হাওয়ার আসন পেতেছি।'

যাঁহার আসন হাওয়ায় পাতা, গলায় ঘ্রাণের মালা গাঁথা [পরা নয়!] তাঁহার পক্ষে নিশ্চয়ই অসম্ভব নহে! বাঙ্গালা কবিতায় 'হাওয়া'র প্রকোপ আজ কাল অত্যন্ত বাড়িতেছে। মধ্যমনারায়ণ সংগ্রহ করিয়া এ সকল কবিতার রসগ্রহ করিতে হয়। শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্রের 'বসন্তে' বাঙ্গালার নূতন ছড়া-ছন্দের কবিতা। ষোল পংক্তি কবিতা, তাহার মধ্যেও হেঁয়ালি! 'বাঁধ না রাখা, রঙ্‌টি পাকা সহসা সব রঙিয়ে তোলে!' ইহার প্রথম অংশের অর্থ নিশ্চয়ই 'নিহিতং গুহায়াম্'। 'রঙ্‌টি পাকা' ও রাঙিয়ে তোলে'র মধ্যে 'সহসা' কেন? 'হঠাৎ' বা এই শ্রেণীর কিছু বাদ পড়িল কেন? শ্রীসতীশচন্দ্র রায়ের 'সৎমা' চলনসই গল্প। চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সমিতির ইতিহাস' উল্লেখযোগ্য সুরচিত নিবন্ধ। শ্রীমতী সীতা দেবীর 'সোনার খাঁচা' এই সংখ্যায় সমাপ্ত হইল। শ্রীগোকুলচন্দ্র নাগের 'দুই-সন্ধ্যা'র মর্ম্ম আমরা বুঝিতে পারিলাম না।—রবীন্দ্রনাথের কথিকার অনুকরণ আছে, ছোট গল্পের বকাল আছে, কাব্যির আমেজ আছে, ভাষায় কর্ত্তা, কর্ম্ম, ক্রিয়া প্রভৃতির বিপর্য্যয় আছে, নাই কেবল কোনও মশলার পরিণতি। শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়ের 'বাণিজ্যে লক্ষ্মী' পড়িয়া বাঙ্গালী পাঠক উপকৃত হইবেন। লেখক তাঁহার প্রতিপাদ্য ভালের মত বুঝাইয়া গিয়াছেন,—বাঙ্গালীকে আত্মরক্ষার

পথ দেখাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার একটি উক্তি,—'আমরা শ্রম বিনিময় করিতে চাই, কিন্তু শ্রমের মূলে যে বুদ্ধি, সে বুদ্ধিবিকাশের উদ্যোগ করিতেছি না'—অত্যন্ত সত্য। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র, আচার্য্য যোগেশচন্দ্র প্রভৃতি বিশেষবিৎ জ্ঞানবৃদ্ধগণ বাঙ্গালীকে জাগাইবার চেষ্টা করিতেছেন। ইহাতে যুগধর্ম্মের অভিব্যক্তিই প্রত্যক্ষ করিতেছি। জীবনের অন্ত ক্ষেত্রে যাঁহারা সমগ্র জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন, সেই জ্ঞানযোগীরা আজ জাতির কর্ণে কর্ম্মযোগের মন্ত্র দান করিতেছেন। জ্ঞানের তপস্যায় সমগ্র জীবন উৎসর্গ করিয়া যাঁহারা সমগ্র জাতির অবিচলিত শ্রদ্ধার অধিকারী হইয়াছেন, যাঁহারা বাঙ্গালার উত্তরপুরুষগণের জীবনের আদর্শ, তাঁহাদের এই সাবধান-বাণী আমাদের জাতীয় জীবনে নিশ্চয়ই বিফল হইবে না। রবীন্দ্রনাথ 'সাহিত্য-বিচারে' সংক্ষেপে তাঁহার 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের বিরুদ্ধ সমালোচনার উত্তর দিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন,—'আমার মতে সন্দীপ সীতা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছে, তাহা সন্দীপেরই যোগ্য—অতএব সে কথা অন্যায় কথা বলিয়াই তাহা সঙ্গত হইয়াছে। এবং সেই সঙ্গতি সাহিত্যে নিন্দার বিষয় নহে।' মম্মটের সেই পুরাতন কথা মনে পড়িল,—'রামাদিবৎ প্রবর্ত্তিতব্যং ন রাবণাদিবৎ।' সন্দীপের মত 'ন প্রবর্ত্তিতব্যম্', 'ঘরে বাইরে' শেষ করিয়া পাঠকের মনে ইহা জাগে কি না? সন্দীপ যে আদর্শ চরিত্র নয়, রবীন্দ্রনাথ প্রকারান্তরে, এক প্রকার স্পষ্টাক্ষরে গতানুগতিক বাঙ্গালীকে তাহা বলিয়া দিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়াছেন। শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্তের 'বিলাতে শিশু-বিদ্যালয়ে' অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য আছে। প্যারীবাবুর 'পুষ্করে' নূতন কথা নাই। শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তীর 'বসন্তে বর্ষা'য় দেখিতেছি, 'বকের পাখা যায় গো দেখা বকের বিপিনে।' বকে বকে অনুপ্রাস হইয়াছে, এবং 'বিপিনে' ও 'চিনে' বেশ মিল হইয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু 'বকের বিপিন' কি? বক-নামধেয় গাছের বন বোধ হয়? 'ভুঁই-চাঁপা আজ সাজল চাঁপা নিয়েছি চিনে'—এই চরণের শেষটুকু 'নিয়েছি চিনে' পাদপূরণে 'চ-বা-তু-হি'র মত নিতান্ত নিরর্থক ও টানিয়া বোনা। এই ক্ষুদ্র কবিতার এরূপ কষ্টকল্পনার উদাহরণ বড় অল্প নয়। কবির হাত আছে। একটু ঘষিয়া মাজিয়া ছাপিলে ক্ষতি কি? শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্তের 'জীবনরূপে' দেখিতেছি,—'হে বিরাট উদাত্ত পথিক!' পথিকের এ বিশেষণে নূতনত্ব আছে। তাহার পর—'এ কি শকতির কূপ!' শেষটুকু বেশ—

'জরাহীন মৃত্যুহীন
সর্ব্বকালে হয়ে লীন
ভেসে চলি অনন্ত-ভুবনে।'

শ্রীঅমৃতলাল শীলের 'হায়দ্রাবাদে ধর্ম্মমন্দির' ও স. চ.-র 'স্বদেশী বানানো' উল্লেখযোগ্য।

ভারতী। শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী 'মানসিকে' লিখিয়াছেন—'উপদ্রবে সমূহ ক্ষতি হতে পারে।' 'সমূহ' শব্দের অর্থ 'অত্যন্ত' নয়। ইহা যে অর্থের দ্যোতনা করে, তাহাই কি ইহার পক্ষে যথেষ্ট নয়? শ্রীভূপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীর 'ধর্ম্মশাসন-তন্ত্র বা থিওক্রেসি' খাটিয়া লেখা—সুচিন্তিত প্রবন্ধ। শ্রীকিরণধন চট্টোপাধ্যায়ের 'ডাকাতের গান' পড়িয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়াছি। নাম সহি না থাকিলে বাঙ্গালার 'কাবি'ও বলিতে পারিত,—'কোন্ ডাকাতের এ ডাকাতী?' ইহাতে সাম্য ও সমাজতন্ত্রের ছিটা ফোঁটা প্রচারিত হইয়াছে। অতঃপর

বাঙ্গালা দেশে ডাকাতীও দুষ্কর হইয়া উঠিল। কবিতায় হুঙ্কার—যে সে ডাকাতের কর্ম্ম নয়। শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিকের 'আগাছা'য় বাঙ্গালার কাব্যি-কুঞ্জের সৌন্দর্য্য বাড়িবে না। শ্রীসত্যসুন্দর দাসের 'মাসকাবারী' উল্লেখযোগ্য। শ্রীমোহিতলাল মজুমদারের 'পূর্ণিমা-স্বপ্ন' নামক কবিতাটি 'ডাকাতের গান' ও 'আগাছা'র পর relief বলিয়া মনে হইল। 'মেট্রোভিকের গড়া মূর্ত্তি ৪নং' গৃহস্থের কাজে লাগিবে—ছেলেদের ভয় দেখানো চলিবে। তাহার পর, শ্রীত্রিবিক্রম বর্ম্মণের 'বেতালের প্রশ্ন'। ইহা ছড়ার উপর—লালা। তর্জ্জা কোথায় লাগে? ঝুমুর হারিয়া গিয়াছে। ক্রমে সুর চড়িয়াছে। 'বেতালের প্রশ্ন' কাঁচা হাতের ভোঁতা নখের আঁচড়—কিন্তু 'বিবর্ণ কি ঘণ্টাকর্ণ' তাহা নয়। 'শ্রীনবকুমার কবিরত্ন' ছদ্ম-নামে আত্মগোপন করিয়া ফুট-নোটে বরাত দিয়াছেন,—'মাঘের "নারায়ণে" মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন লিখিত "রবীন্দ্রনাথের ছন্দ" শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।' অর্থাৎ, আমি আড়ালে আছি, আবডালেই থাকিব, কিন্তু যাহাকে 'বিকর্ণ' অর্থাৎ কাণ-কাটা, ঘণ্টাকর্ণ, গৃধ্র, কীট, বলদ-ধুরন্ধর বলিতেছি, তাহার পরিচয়টা তোমরা জানিয়া রাখ। 'শাস্ত্র পুঁথি ফুঁড়ে ফুঁড়ে করলে শুধু কীটপণা'—পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বরের পক্ষে নিশ্চয়ই ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু নবকুমার কবিরত্ন! তুমি যে শীলতা, ভব্যতা, সভ্যতা ও কবিতা 'ফেঁড়ে ফেঁড়ে করলে বিবর্ণ কীটপণা' সে বিষয়েও ত কোনও সন্দেহ নাই।—নবকুমার ঘোমটা দিয়া আত্মগোপন করিলেও লোকে তাঁহাকে চিনিতে পারিবে। অন্ততঃ আমরা চিনিয়াছি, এবং মর্ম্মাহত হইয়াছি। বড় রক্ত সহবত, শিক্ষা, দুর্লভ নর-জন্মে সর্ব্বাপেক্ষা সুদুর্লভ কবি—এ সকলও কি তর্জ্জা-ওয়ালা সাজিয়া প্রতিপক্ষকে শকার-বকার করিবার প্রলোভন হইতে মানুষকে রক্ষা করিতে পারিবে না? 'রবীন্দ্রনাথের ছন্দ' বুঝিবার কাণ যাহার নাই, সে যদি বিকর্ণ বা ঘণ্টাকর্ণ হয়, তাহা হইলে যাহারা আত্মগোপন করিয়া সাহিত্যে খেউড়ের আমদানী করে, তাহারা কি? রবীন্দ্র-নাথের 'ছন্দ' বুঝিয়াও যাহাকে বিনামার আচ্ছাদনে আত্মগোপন করিয়া এমন কুকর্ম্ম করিতে হয়, তাহার মত দুর্ভাগ্য কে? রবীন্দ্রনাথের ছন্দ যাহার কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়াছে, সে ভ্রান্ত হইতে পারে, কিন্তু কাপুরুষ হইতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের যুগে, তাঁহার সমক্ষে, তাঁহার সৃষ্ট সাহিত্যে, তাঁহার ভক্তের পক্ষে যদি এমন অনাচার সম্ভব হয়, তাহা হইলে বুঝিব, রবীন্দ্রনাথের সাধনা ব্যর্থ হইতেছে,—'কালোহ্যয়ং নিরবধির্বিপুলা চ পৃথ্বী'—রবীন্দ্রনাথ ভবিষ্যতের কবি, ভাবী বাঙ্গালার কবি, বর্ত্তমানে অন্ততঃ তাঁহার ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গ ভক্তমণ্ডলীর পক্ষে তাঁহার বিপুল শক্তি ব্যর্থ হইয়াছে। বিধাতা কি এইরূপ খেউড়-সাহিত্যের ভিত্তি করিবার জন্যই বাঙ্গালীকে রবীন্দ্র-সমৃদ্ধি দান করিয়াছিলেন? বঙ্কিমচন্দ্রের পর আমরা রবীন্দ্রনাথকে পাইয়াছিলাম।—রবীন্দ্রনাথের পর কি আমরা ত্রিবিক্রম ও কবিরত্নকে লইয়া দুধের সাধ ঘোলে মিটাইব? ভক্তি কি ভক্তকে ভক্তি-ভাজনের ভাবে অনুপ্রাণিত করে না? 'তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনং তদুপাসনমেব'—সাহিত্যের তপোবনে সাধকের মূলমন্ত্র নহে? দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত, স্বর্ণকুমারীর অর্চ্চিত, রবীন্দ্রনাথের পুষ্পাঞ্জলি-পূত 'ভারতী'তেও ইহা দেখিতে হইল!—যে চতুর্দ্দশপদী কবিতা উপলক্ষ করিয়া ত্রিবিক্রম তর্জ্জার বিক্রম প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই উপলক্ষ করিয়া রবীন্দ্রনাথ চৈত্রের 'প্রবাসী'তে 'সাহিত্য-

বিচার' প্রবন্ধের সূচনায় লিখিয়াছেন,—'হৃদয়াবেগ যখন অত্যন্ত প্রবল হয়, তখন মানুষ গদ্য ছাড়িয়া পদ্য ধরে। সম্প্রতি তাহারও সূচনা প্রকাশ পাইতেছে। এক জায়গায় দেখিলাম, "ঘরে-বাইরে" সম্বন্ধে ক্ষোভ চোদ্দ অক্ষরের লাইনে লাইনে রক্তবর্ণ হইয়া ফুটিয়াছে। ইহাতে পদ্য সাহিত্যের বিপদ চিন্তা করিয়া উদ্বিগ্ন হইলাম। পাছে ইহা সংক্রামক হইয়া পড়ে, সেই জন্য এ সম্বন্ধে উদাসীন থাকিতে পারিলাম না।' সে ক্ষেত্রে 'ক্ষোভ চোদ্দ অক্ষরের লাইনে লাইনে রক্তবর্ণ হইয়া ফুটিয়াছিল', এ ক্ষেত্রে রোষ ও আক্রোশ পচা, ধসা, গলা ঘায়ের মত ফুটিয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের আশঙ্কা সত্যে পরিণত হইয়াছে।—এ রোগ সংক্রামকই বটে। অধিকন্তু যত সংক্রমিত হয়, ততই বীভৎস ও মারাত্মক হইয়া উঠে। সংসারে ত্রিবিক্রমের দল দু হাতে ছড়াইতে পারে, ছড়াইয়াও থাকে; কিন্তু প্রতিভাশালী নবকুমার কবিরত্ন,—তুমিও? আত্মহত্যা আর কাহাকে বলে? শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কাণা, খোঁড়া 'সালতামামী' বিকর্ণ ঘণ্টাকর্ণের উপযুক্ত লেজুড় বটে। ইহা যদি কবিতা হয়, তাহা হইলে আমরা নাচার।

প্রাচীন বাঙ্গালার কয়েকখানি ভূমিবিক্রয়-দলীল।

বিগত পঞ্চ-সপ্ততি বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষের নানা স্থানে ভারতীয় বিভিন্ন ঐতিহাসিক যুগের নিদর্শন-রূপে নানা প্রকারের প্রাচীন লিপি আবিষ্কৃত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বিষয়ভেদে, বিশেষতঃ লিপিসম্পাদকগণের উদ্দেশ্যভেদে, এই প্রাচীন লিপিগুলিকে মোটামুটি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে—পারমার্থিক ও লৌকিক। কিন্তু ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, প্রথম শ্রেণীর লিপি হইতেও আমরা এমন অনেক ঐতিহাসিক উপাদান সংগ্রহ করিতে পারি, যাহা বাস্তবিক দ্বিতীয় শ্রেণীর লিপির বিষয়ীভূত হওয়া উচিত; এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর লিপিতেও কখনও কখনও এমন অনেক বিষয় অবগত হওয়া যায়, যাহা বাস্তবিক পক্ষে প্রথম শ্রেণীর লিপিতেই আবদ্ধ থাকা উচিত। ধর্ম্মশিক্ষা ও নীতিশিক্ষার বিস্তার, বৌদ্ধ-জৈন-ধর্ম্মাবলম্বীদের জন্য বিহার-প্রতিষ্ঠা ও ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মাবলম্বীদের জন্য দেবমন্দিরের প্রতিষ্ঠা, যজ্ঞ-সম্পাদন, তীর্থস্থানে ভ্রমণ ও পূজাদান, দেব-ব্রাহ্মণের জন্য পুরোহিত, বিহার, দেবকুল প্রভৃতির চিরস্থিতির জন্য অর্থ ভূমি প্রভৃতির অতিসর্গ—এইরূপ নানা সদিচ্ছায় প্রণোদিত হইয়া লিপিসম্পাদনকারিগণ যে যে লিপিকে স্মরণীয় করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়াছেন, আমরা সেই সকল লিপিকে প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করিব। আর, সাধারণতঃ সম্রাটগণ, সামন্তরাজগণ, রাজামাত্যগণ, বা অন্য কোনও রাজানুজীবী বা প্রজাবর্গের মধ্যে যে কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তি যে কোনও সাধারণ কারণ উপলক্ষ্য করিয়া যদি ব্রাহ্মণকে বা অব্রাহ্মণকে কোনও গ্রামাদি দান করিবার উদ্দেশ্যে, অথবা, কোনও বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ঘটনাকে দেশমধ্যে চিরপ্রচারিত রাখিবার উদ্দেশ্যে কোনও লিপি সম্পাদন করাইয়া থাকেন, তাহা হইলে, আমরা সেই লিপিগুলিকে দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করিব।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা যে দশখানি লিপির আলোচনা করিব, সেগুলি উপরি-উল্লিখিত দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত, এবং সেগুলির মর্ম্ম ও আকার নূতন প্রকারের। এই লিপিগুলি প্রায় ত্রয়োদশ হইতে পঞ্চদশ শত বৎসরের লিপি।

লিপিকে দুইটি ভাগে বিভক্ত করিয়া লইব। এক ভাগে চারিখানি ও অপর ভাগে ছয়খানি থাকিবে। প্রথম লিপিচতুষ্টয়ের মধ্যে কোনও কোনওখানি প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে আবিষ্কৃত হইয়া থাকিলেও, ইং ১৯১০ সালের পূর্ব্বে সেগুলি প্রকাশিত হইতে পারে নাই। (১) দ্বিতীয় লিপিষট্‌কের মধ্যে একখানি লিপি ইং ১৯০৯ সালে প্রকাশিত হইয়া থাকিলেও (২) তাহা ইং ১৯১৫ সালে তুল্য প্রকারের লিপিপঞ্চকের আবিষ্কারের পূর্ব্বে সম্যক্‌ভাবে ব্যাখ্যাত হইতে পারে নাই। শেষোক্ত লিপিপঞ্চকের যথাযথ পাঠোদ্ধার ও ব্যাখ্যা কার্য্যের (৩) সৌকর্য্যার্থ লেখককে দ্বিতীয় ভাগের অপরখানির ও প্রথম ভাগের লিপিচতুষ্টয়ের পাঠ ও ব্যাখ্যার পুনরালোচনা (৪) করিতে হইয়াছিল। প্রথম ভাগের লিপিচতুষ্টয়ের প্রাপ্তিস্থান পূর্ব্ববঙ্গের ফরিদপুর জেলাতে অবস্থিত, এবং তন্মধ্যে সম্প্রতি ঢাকা-মিউজিয়মে রক্ষিত (ঘ)-সংখ্যক তাম্রশাসনখানি ব্যতীত অবশিষ্ট তিনখানি বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটীর সম্পত্তি। দ্বিতীয় ভাগের লিপিষট্‌কের মধ্যে ১নং সংখ্যক তাম্রফলকখানি উত্তরবঙ্গের রাজসাহী জেলার অন্তর্গত নাটোর মহকুমায় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, এবং অবশিষ্ট পাঁচ-খানি তাম্রশাসন উত্তরবঙ্গের দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত দামোদরপুর গ্রামে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এই ছয়খানি লিপিই সম্প্রতি বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির সংগ্রহালয়ে রক্ষিত আছে। দামোদরপুরের লিপিপঞ্চক আবিষ্কৃত হইবার প্রায় পাঁচ ছয় মাস পূর্ব্ব পর্য্যন্তও 'ফরিদপুরের লিপিচতুষ্টয় মৌলিক কি কূটশাসন?' এই কথা লইয়া শ্রীযুক্ত এফ্. ই. পার্জ্জিটার মহোদয় ও আমাদের বন্ধুবর ঐতি-হাসিক ও প্রাচীন-লিপি-বিশারদ শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্. এ. মহা-শয়ের মধ্যে দীর্ঘকালব্যাপী বাদানুবাদ (৫) দৃঢ়ভাবে চলিতেছিল। আমাদের বিবেচনায় দামোদরপুরের তাম্রশাসন-পঞ্চকের আবিষ্কার-দিবসেই এই তর্কের অবসান হইয়া গিয়াছে। ইহাদের পাঠ ও ব্যাখ্যার প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে এইরূপ বলা যাইতে পারিবে যে, স্বর্গীয় ব্লক মহোদয় এবং তদীয় শিষ্য বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যে মনে করিয়াছিলেন যে, ফরিদপুর-লিপিগুলি কূট-শাসন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, তাহা এখন ভ্রান্ত মত বলিয়া গ্রাহ্য। পণ্ডিতবর

(১) *Indian Antiquary*, 1910.
(২) *I. A. S. B.*, 1909.
(৩) *Epi. Ind.* Vol. XV, Part III. (শীঘ্রই প্রকাশিত।)
(৪) সাহিত্য, ১৩২৩ বঙ্গাব্দ।
(৫) *I. A. S. B.*, 1914.

পার্জ্জিটার মহোদয় 'এই তাম্রশাসনগুলি মৌলিক শাসনের অন্তর্গত' এইরূপ যে মত প্রকাশ করিয়া অদ্যাপি তাহা অক্ষুণ্ণ ভাবিয়া আসিতেছিলেন, সেই মতই গ্রাহ্য। এযাবৎ আবিষ্কৃত অন্যান্য তাম্রশাসনের পাঠ ও লিপিবিষয় হইতে ফরিদপুরে আবিষ্কৃত শাসনচতুষ্টয়ের পাঠ ও লিপিবিষয় ভিন্ন প্রকারের বলিয়াই বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শেষোক্তগুলিকে কূট (বা জাল) শাসন মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু এখন নিশ্চিতভাবে এইরূপ বলা অসঙ্গত হইবে না যে, পাঠের ও বিষয়ের বিভিন্নতার ও বৈশিষ্টের জন্যই ভারতীয় প্রাচীন লিপি-সাহিত্যে পূর্ব্ববঙ্গের এই তাম্রশাসনচতুষ্টয়ের ও উত্তরবঙ্গের অচিরাবিষ্কৃত লিপিষট্‌কের স্থান ও মূল্য অত্যন্ত অধিক। দামোদরপুরের লিপিপঞ্চকে বর্ণিত বিষয়ের নূতনত্ব লক্ষ্য করিয়া পার্জ্জিটার মহোদয় লেখককে এক পত্রে এইরূপ লিখিয়াছেন যে, তিনি বহু পূর্ব্বেই বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে বলিয়াছিলেন যে, যেযাবৎ আবিষ্কৃত লিপি হইতে বিভিন্ন প্রকারের লিপিও পরে আবিষ্কৃত হইতে পারে, এরূপ আশা করা যাইতে পারে, এবং তিনি মনে করেন যে, এখন পর্য্যন্তও প্রায় সার্দ্ধ-সহস্র-বৎসর-পূর্ব্বের উৎকীর্ণ লিপির সাহায্যে সম্পাদিত দলীলাদির সর্ব্বপ্রকার ভেদ আবিষ্কৃত হয় নাই। (৬)

ভারতীয় প্রাচীন লিপি-মালা-সাহিত্যে অধিকাংশ লেখই রাজার দান-পত্র। কিন্তু বর্ত্তমান প্রবন্ধে আলোচ্য শাসনগুলি ব্রহ্মোত্তর বা দেবোত্তর-সম্পত্তি-রূপে প্রদত্ত ভূমির সম্বন্ধে কোনও দান-পত্র নহে। এইগুলিকে আমরা বিশিষ্ট প্রকারের বিক্রয়-দলীল মনে করিতে পারি। এক দিকে বিক্রেতার রূপে গভর্মেণ্ট, বা কখনও কখনও গভর্মেণ্ট ও গ্রাম-মহত্তর এবং বিষয়-মহত্তরগণ, অন্য দিকে ক্রেতার রূপে যে কোনও ব্যক্তি, এই উভয় পক্ষকে ভূমি-ক্রয়-বিক্রয় সম্বন্ধে যাহা যাহা করিতে হইত, এই লিপিগুলিতে তাহার কথা লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।

এই তাম্রশাসনগুলির পাঠ পর্য্যালোচনা করিলে, বৃহস্পতি-রচিত স্মৃতিতে উল্লিখিত 'ক্রয়-পত্রে'র ('a deed of purchase') যে সংজ্ঞা দেওয়া আছে, তাহা স্মরণ-পথে উদিত হয়। মনীষী ইয়োলীর (Jolly) মতে এই বৃহস্পতি-স্মৃতি খৃষ্টীয় ষষ্ঠ-সপ্তম শতাব্দীতে রচিত গ্রন্থ। এই গ্রন্থে 'ক্রয়-পত্রে'র এইরূপ ব্যাখ্যা

(৬) 'I told Mr. R. D. Banerji long ago that we might expect to find inscriptions of kinds different from what were known then, and I do not think we have yet discovered every kind of inscribed transaction that was current 1500 years ago.'

দেখা যায় (৭) :—'যদি কোনও ব্যক্তি কোনও গৃহ, ক্ষেত্র, বা অন্য কোনও সম্পত্তি ক্রয় করিয়া, ক্রীত সম্পত্তির মূল্য যথাযথভাবে নির্দ্দেশ করিয়া দলীল সম্পাদন করেন, তাহা হইলে, সেইরূপ দলীলকে "ক্রয়-পত্র" বলা হয়।' পূর্ব্ববঙ্গে ও উত্তরবঙ্গে আবিষ্কৃত আলোচ্য দলীলগুলি প্রায় একই প্রকারের শাসন। দলীলগুলিতে আরও এই একটি বিশেষত্ব লক্ষিত হয় যে, ক্রেতা ক্রীত ভূমিভাগ দেবকুলাদি-প্রতিষ্ঠার জন্য, অথবা ব্রাহ্মণাদিকে দান করিবার জন্য, অথবা ব্রাহ্মণবসতি বসাইবার জন্যই ক্রয় করিয়াছেন। সেই জন্য এই শ্রেণীর লিপিগুলিকে কেবল ভূমিক্রয়-পত্র না বলিয়া, বরং সেগুলিকে (৮) 'ক্রীত-ভূমির দানপত্র' বলিলেই অধিকতর সঙ্গত হয়। খুব সম্ভব, এই দলীলগুলি প্রথমতঃ গভর্মেণ্ট আফিসে রচিত হইয়া তৎপরে তাম্রপট্টে উৎকীর্ণ হইত, এবং অবশেষে গভর্মেণ্ট-মুদ্রা-যুক্ত হইয়া রেজিষ্টারী করা দলীলরূপে ক্রেতাকে দেওয়া হইত। ক্রেতার ভূমিতে দাবী দেখাইবার জন্যই যেন এইরূপ তাম্রপট্টের ব্যবস্থা ছিল। আশা করা যাইতে পারে যে, এইরূপ ও অন্যরূপ ভূমি-দানপত্র ভারতের অন্যান্য স্থানেও অতঃপর আবিষ্কৃত হইবে। কিন্তু যদিও ভারতবর্ষের অন্য কোনও স্থানে আলোচ্য বিক্রয়-দলীলের মত তাম্রপট্টে উৎকীর্ণ দলীল এ যাবৎ আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া জানা যায় না, তথাপি অতি পূর্ব্ব-কালেও যে ভারতের নানা স্থানে প্রচলিত মূল্যে ভূমি বিক্রীত হইত, তাহার কথা পশ্চিম-ভারতে অবস্থিত খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর এক গুহালিপিতে স্পষ্ট-ভাবে উল্লিখিত দেখিতে পাওয়া যায়। নাসিকের এই গুহালিপিতে বর্ণিত আছে (৯) যে, ক্ষহরাত-রাজ ক্ষত্রপ নহপানের জামাতা, দিনীক-পুত্র, ঋষভদত্ত, ৪০০০ কার্ষাপণ-মুদ্রা মূল্যরূপে দিয়া কোনও এক ব্রাহ্মণের নিকট হইতে একখানি ক্ষেত্র ক্রয় করিয়া তৎপ্রদত্ত গুহাতে নিবাসের জন্য নানা দিগ্দেশ হইতে আগত বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের আহারের ব্যবস্থার জন্য তাহা দান করিয়াছিলেন। অর্থশাস্ত্র, ধর্ম্মসূত্র ও ধর্ম্মশাস্ত্র—এই সকল প্রাচীন সাহিত্যেও ভূমি-বিক্রয়ের অনেক উল্লেখ দৃষ্ট হয়। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে (১০) 'বাস্তু-বিক্রয়' সম্বন্ধে একটি স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদ

---

(৭) *Sacred Books of the East*—Vol. XXXIII, Brihaspati—Chap. VIII, 7, p. 305.

(৮) ঐ, Chap. VIII, 6, p. 305.

(৯) Nasik Buddhist Cave Inscription, No. 10—*Epi. Ind.* Vol. VIII, p. 78.

(১০) কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র—Mysore, Second Edition, 1919, অধি—৩য়, পরিচ্ছেদ—৯, পৃঃ ১৬৮ ইত্যাদি।

আছে—তাহাতে ক্ষেত্র, আরাম, সরোবর, গৃহ প্রভৃতি নানা প্রকারের বাস্তুর বিক্রয়ের বিষয় উল্লিখিত আছে। এই প্রসঙ্গে কৌটিল্য লিখিয়াছেন যে, এইরূপ ভূমি-বিক্রয় ক্রেতার আত্মীয়গণের ও প্রতিবেশীদের সন্নিধিতে সম্পাদিত হইবে, এবং বিক্রীয়মান বাস্তু, যিনি অধিক মূল্য দিতে চাহিবেন, তাঁহাকেই দেওয়া হইবে, এবং ক্রেতাকে বিক্রয়-মূল্যের একাংশ শুল্করূপে রাজাকে দিতে হইবে।

উপরি-উল্লিখিত পূর্ব্ববঙ্গের ও উত্তরবঙ্গের বিক্রয়-দলীলগুলির সম্যক্‌ভাবে পর্য্যালোচনার ফলে তাহাদের যে অভিনব আকার ও প্রকার লক্ষ্য করা যায়, আমরা এই প্রবন্ধে প্রথমতঃ তাহার কথা বলিব,—তৎপরে এই লিপি দশটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিব। দ্বিতীয় প্রবন্ধে এই লিপি-দশক হইতে ভারতে, বিশেষতঃ বঙ্গদেশে, ৫ম হইতে ৭ম খৃষ্টাব্দের মধ্যে যে পদ্ধতিতে বা প্রথাতে ভূমি বিক্রীত হইত, তাহার আলোচনা করিব। এই লিপিগুলিতে আমরা তৎকালের রাজনীতিক ইতিহাসের যে যে উপাদান পাই, এই উভয় প্রবন্ধের কোনটিতে আমরা বিশেষভাবে তাহার কোনও আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব না। উত্তরোত্তর যখন লিপিগুলির পাঠ ও ব্যাখ্যা প্রকাশিত হইবে—তৎসঙ্গে সেই আলোচনার অবতারণা করিব। নিম্নে আমরা এই লিপি-গুলির পাঠ হইতে দুইটি আদর্শ-পাঠের সন্নিবেশ করিয়াছি। তাহা হইতে সহজেই অনুমিত হইবে যে, এই শ্রেণীর ভূমিবিক্রয়-দলীলগুলিতে ছয়টি ভিন্ন ভিন্ন অংশ আছে। প্রথম অংশে স্থানীয় শাসনকর্ত্তার অধিকরণের সমক্ষে, বা তাহার এবং গ্রামমহত্তর ও বিষয়মহত্তরগণের সমক্ষে, ভূমি-ক্রয়-প্রার্থনাকারীর বিজ্ঞাপন। এই প্রসঙ্গে দেশের রাজা বা সম্রাটের, এবং তদধীন প্রদেশ-শাসনকর্ত্তার ও তদধীন বিষয়পতি প্রভৃতির নাম ও পদের কথা উল্লিখিত আছে। কোনও কোনও শাসনে, বিশেষতঃ উত্তরবঙ্গে আবিষ্কৃত শাসনগুলিতে, এই অংশেই সর্ব্বপ্রথম সন-তারিখ-দিবসের কথাও উল্লিখিত আছে। দ্বিতীয় অংশে যে সদুদ্দেশ্যে প্রার্থনাকারী ভূমি ক্রয় করিতে ইচ্ছা করেন, তাহার উল্লেখ। প্রসঙ্গক্রমে এই অংশে স্থানবিশেষে ক্ষেত্রভূমি বা খিলভূমির কত পরিমাণ কত সুবর্ণ বা দীনার মুদ্রায় বিক্রীত হইত, তাহারও উল্লেখ আছে। ক্রেতার প্রার্থনা বিজ্ঞাপিত হইলে পুস্তপালগণকে তাহাদের নিজ প্রাচীন দলীলাদির পর্য্যালোচনা করিয়া প্রস্তুত ক্রয়-বিক্রয়ের অবধারণা করিয়া দিতে হইত—তৃতীয় অংশে সেই অবধারণার কথাই উল্লিখিত আছে। চতুর্থ অংশে উপযুক্ত

মূল্য লইয়া ভূমিবিক্রয়ের অনুমতির সন্নিবেশ। ইহাতে গ্রামমহত্তর ও গ্রামের অন্যান্য গণ্যমান্য লোকের সমক্ষে পরিমাপক নলবিশেষের দ্বারা বিক্রীয়মান ভূমির পরিমাপ করিয়া সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দিবার কথাও উল্লিখিত থাকে। পঞ্চম অংশে, কি উদ্দেশ্যে ক্রেতা স্বয়ং বা তাঁহার পক্ষে বিক্রেতা, কোনও ব্যক্তিবিশেষকে বা দেববিশেষকে বিক্রীত ভূমি দান করিবেন, তাহার বর্ণনা দেওয়া আছে। ষষ্ঠ বা শেষ অংশে প্রদত্ত ভূমির রক্ষায় বা বিলোপে কি ফলাফল হইতে পারে, ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত শ্লোক উদাহরণরূপে উল্লেখ করিয়া, তাহা বর্ণিত হইয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গের শাসনগুলিতে দেখা যায় যে, এই ষষ্ঠ অংশেই লিপি-সম্পাদনের সময়—সন, তারিখ ও দিবস উল্লিখিত হইয়াছে। স্থানীয় শাসন-কর্ত্তার অধিকরণে প্রচলিত শাসনমুদ্রা দ্বারা এই প্রকার দলীলগুলি লাঞ্ছিত করা হইত।

খৃষ্টীয় ৫ম—৭ম শতাব্দীতে উত্তরবঙ্গে প্রচলিত ভূমি-বিক্রয়-দলীলের লিখন-প্রণালীর আদর্শ বা নমুনা (সংস্কৃত ভাষায়) নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।—

মুদ্রা বা মোহর—'কোটিবর্ষাধিষ্ঠানাধিকরণস্য'।

১। সংবৎ.........মাসে......দিনে .....পরমদৈবত-পরমভট্টারক-মহারাজাধিরাজ—শ্রী [অমুকে] পৃথিবীপতৌ .....তৎপাদপরিগৃহীতে [অমুক] ভুক্তৌ উপরিক-মহারাজ-শ্রী [অমুকে] [অমুক] বিষয়ে চ তন্নিযুক্তকে বিষয়পতৌ শ্রী [অমুকে] সংব্যবহরতি, অধিকরণং [অমুক—অমুক] পুরোগং [অমুকেন] বিজ্ঞাপিতম্॥

২। ইহ বিষয়ে সমুদয়বাহ্যাপ্রহতখিলক্ষেত্রাণাং ত্রিদীনারিক্য-কুল্যবাপ-বিক্রয়োঽনুবৃত্তঃ—ইচ্ছাম্যহং......ইত্যাদিকং কর্ত্তুং কারয়িতুং বা—তদর্হথ যথা-ক্রয়মর্য্যাদয়া মত্তো দীনারানুপসংগৃহ্য অপ্রদাধর্ম্মেণ নীবীধর্ম্মেণ বা দাতুমিতি॥

৩। এতদ্বিজ্ঞাপ্যমুপলভ্য পুস্তপাল [অমুকেন] [অমুকৈর্ব্বা] অবধৃতং 'যুক্তমনেন বিজ্ঞাপিতং অস্ত্যয়ং বিক্রয়মর্য্যাদাপ্রসঙ্গ স্তদীয়তামস্মৈ'।

৪। পুস্তপাল [অমুকস্য] [অমুকানাং বা] অবধারণয়া এতস্মাদ্ বিজ্ঞাপ-কাদ্ দীনারানুপসংগৃহ্য এতাবৎসংখ্যকঃ (কাঃ) কুল্যবাপঃ (পাঃ) অষ্টক-নবক-নলাভ্যামপবিঞ্ছ্য অপ্রদাধর্ম্মেণ দত্তঃ (ত্তাঃ)॥

৫। অনেনাপি বিজ্ঞাপকেন বিজ্ঞাপ্যমানেন বা [অমুক] কার্য্যার্থং [অমুকায় অমুক] দেবায় বা দত্তঃ (ত্তাঃ)॥

৬। উত্তরকালং সংব্যবহারিভি র্দেবভক্ত্যানুমন্তব্যম্। উক্তং চ ব্যাসেন [অথবা] অপিচ ভূমিদানসম্বদ্ধাঃ শ্লোকাঃ [ইত্যাদি]॥

খৃষ্টীয় ৫ম—৭ম শতাব্দীতে পূর্ব্ববঙ্গে প্রচলিত ভূমি-বিক্রয়-দলীলের লিখন-প্রণালীর আদর্শ বা নমুনা (সংস্কৃত ভাষায়) নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।—

মুদ্রা বা মোহর—'বারকমণ্ডলবিষয়াধিকরণস্য'।

১। মহারাজাধিরাজ শ্রী [অমুকে] তৎপ্রসাদ-লব্ধাস্পদস্য [অমুক] স্থানে মহারাজ-মহাপ্রতীহার-উপরিক [অমুকস্য] অধ্যাসনকালে, [অমুক] বিষয়ে তদ্বিনিযুক্তক-বিষয়পতি [অমুকস্য] সংব্যবহরতঃ, [অমুকেন] সাদরমভিগম্য জ্যেষ্ঠকায়স্থ [অমুক] প্রমুখং অধিকরণং অন্যে চ প্রধানাঃ ব্যবহারিণঃ বিষয়-মহত্তরাশ্চ [অমুকাঃ], [বিষয়মহত্তর-অমুক-পুরোগাঃ প্রকৃতয়শ্চ ইতি বা] বিজ্ঞপ্তাঃ ॥

২। ইচ্ছাম্যহং ভবতাং প্রসাদাৎ সকাশাদ্বা অর্ঘেণ ভবন্তাঃ ক্ষেত্রখণ্ডং ক্রীত্বা [অমুকায়] প্রতিপাদয়িতুম্। তদর্হথ মত্তো মূল্যং গৃহীত্বা বিষয়ে বিভজ্য দাতুমিতি ॥

৩। এতদভ্যর্থনমধিকৃত্য .....পুস্তপাল অমুকেন অবধৃতমস্তীহ বিষয়ে প্রাক্‌সমুদ্রমর্য্যাদা চতুর্দ্দীনারিক্য কুল্যবাপেন ক্ষেত্রাণি বিক্রীয়মানকানি ইতি ॥

৪। পুস্তপাল-[অমুকস্য] অবধারণয়া অবধৃত্যাস্মাভিঃ [অমুকাৎ] দীনারানাদায় প্রতীতধর্ম্মশীল-[অমুক] হস্তাষ্টক-নবক-নলাভ্যামপবিঞ্চ্য [অমুকায়] ক্ষেত্রকুল্যবাপঃ (-পাঃ) তাম্রপট্টধর্ম্মেন বিক্রীতঃ [-তাঃ]॥

৫। অনেনাপি ক্রীত্বা [অমুকায়] পুত্রপৌত্রক্রমেণ বিধিনা তাম্রপট্টীকৃত্য সীমালিঙ্গনির্দ্দিষ্টং কৃত্বা প্রতিপাদিতঃ (-তাঃ)। ইতি সীমালিঙ্গানি চাত্র...... ॥

৬। আগামি-সামন্তরাজৈশ্চ......ভূমিদাং সুতরাং প্রতিপালনীয়মিতি। ভবন্তি চাত্র ধর্ম্মশাস্ত্রশ্লোকাঃ ..... ॥ সম্বৎ.....মাসে......দিনে..... ॥

উপরি-উল্লিখিত আদর্শ বা নমুনার উদাহরণরূপে আমরা নিম্নে যথাসম্ভব পৌর্ব্বাপর্য্য নির্দ্দেশ করিয়া দলীল দশখানির মর্ম্ম বিবৃত করিলাম। উত্তরবঙ্গের ছয়খানি তাম্রশাসনকে আমরা ১নং হইতে ৬নং সংখ্যায় উল্লেখ করিব, এবং পূর্ব্ববঙ্গের চারিখানিকে 'ক' হইতে 'ঘ' সংখ্যায় পরিচিত করিব।

১নং—ধনাইদহে আবিষ্কৃত, ১১৩ গুপ্তাব্দে (খৃঃ ৪৩২—৩৩) সম্পাদিত গুপ্তসম্রাট্ প্রথম কুমার গুপ্তের রাজ্যসময়ের তাম্রলিপি (খণ্ডিত)।

কোনও ব্যক্তি, সম্ভবতঃ কোনও 'আযুক্তক' বা রাজকর্ম্মচারী, গ্রামের কুটুম্বিগণের (গৃহস্থগণের), গ্রামমহত্তরগণের ও গ্রামের অষ্টকুলাধিকরণগণের নিকট, এবং সম্ভবতঃ বিষয়পতির অধিকরণেরও নিকট উপস্থিত হইয়া বিজ্ঞাপিত

করিতেছেন যে, তিনি খাদাপার বা খাটাপর বিষয়ে প্রচলিত মর্য্যাদার বা রীতির অনুসরণ করিয়া উপযুক্ত মূল্য প্রদান করিয়া, এক 'কুল্যবাপ' ভূমি ক্রয় করিতে ইচ্ছা করিতেছেন। প্রার্থনা-পত্রে প্রার্থয়িতা বিজ্ঞাপিত করিয়াছিলেন যে, তিনি নীবীধর্ম্ম-ক্ষয়পূর্ব্বক ভূমি ক্রয় করিতে চাহিতেছেন—অর্থাৎ ক্রীত ভূমি হস্তান্তরিত করিবার ক্ষমতা তাঁহার যেন অক্ষুণ্ণ থাকে। সে যাহা হউক, তাঁহার প্রার্থনা গ্রাহ্য হইল। পুস্তপালগণের অবধারণাক্রমে অষ্ট-নবনল পরিমাণে মাপিয়া প্রার্থয়িতা আযুক্তকের নিকট এক কুল্যবাপ ভূমি বিক্রীত হইল। তিনি আবার তাঁহার ক্রীত ভূমি বরাহস্বামী নামক এক সামবেদী (ছন্দোগ) ব্রাহ্মণকে দান করিয়া ফেলিলেন।

২নং—দামোদরপুরে আবিষ্কৃত, ১২৪ গুপ্তাব্দে (খৃঃ ৪৪৩—৪৪৪) সম্পাদিত গুপ্তসম্রাট্ প্রথম কুমার গুপ্তের রাজ্যসময়ের তাম্রশাসন।

কর্প্পটিক-নামক এক ব্রাহ্মণ পুণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তির অন্তঃপাতী কোটিবর্ষ বিষয়ের রাজধানীতে ('অধিষ্ঠানে') বর্ত্তমান অধিকরণের (১১) সমক্ষে উপস্থিত হইয়া বিজ্ঞাপিত করিলেন যে, তিনি নিজ অগ্নিহোত্রের সুবিধার জন্য নীবীধর্ম্মানুসারে 'অপ্রদ', অপ্রতিহত, খিল-ক্ষেত্র প্রচলিত মূল্যে ক্রয় করিতে ইচ্ছা করিতেছেন। পুস্তপালগণের অবধারণাক্রমে তাঁহার নিকট হইতে তিন দীনার মূল্যরূপে গ্রহণ করিয়া এক কুল্যবাপ-পরিমিত ভূমি বিক্রীত হইল।

৩নং—দামোদরপুরে আবিষ্কৃত, ১২৯ গুপ্তাব্দে (খৃঃ ৪৪৮—৪৪৯) সম্পাদিত গুপ্তসম্রাট্ প্রথম কুমার গুপ্তের রাজ্যসময়ের তাম্রশাসন।

কোনও ব্যক্তি [তাম্রশাসন স্থানে স্থানে ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ায় তাঁহার নাম অপরিজ্ঞাত] ২নং তাম্রশাসনে উল্লিখিত কোটিবর্ষের অধিষ্ঠানাধিকরণের

(১১) এই দুইটী (২নং ও ৩নং) দলীলের সম্পাদন-সময়ে পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তিতে শাসনকর্ত্তা ছিলেন 'উপরিক' চিরাতদত্ত, এবং তদ্দ্বারা নিযুক্ত কোটিবর্ষবিষয়ের বিষয়পতি ছিলেন 'কুমারামাত্য' বেত্রবর্ম্মা। পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির এই শাসনকর্ত্তাকে পরমদৈবত-পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ সম্রাট্ কুমারগুপ্ত কর্ত্তৃক শাসকপদে নিযুক্ত হইতে হইয়াছিল। কোটিবর্ষ-বিষয়ের অধিকরণ অর্থাৎ রাজ্যশাসনপরিষৎ কোটিবর্ষের অধিষ্ঠানে বা রাজধানীতে অবস্থিত ছিল। আমরা এই বিষয়-শাসন-পরিষদে বা অধিকরণে সেই সময়ে চারি জন সদস্য থাকিবার কথা স্পষ্ট উল্লিখিত দেখিতে পাই। বণিক্ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরূপে 'নগরশ্রেষ্ঠী'কে, সার্থবাহ-সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরূপে 'প্রথম-সার্থবাহ'কে, কারুসম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরূপে 'প্রথমকুলিক'কে ও লেখক-সম্প্রদায়ের (সম্ভবতঃ কলম-কার্য্যোপজীবিগণের) প্রতিনিধিরূপে 'প্রথম-কায়স্থ'কে অধিষ্ঠানের অধিকরণে বিষয়পতির সহায়তাকারী সদস্য-রূপে থাকিতে দেখা যায়।

নিকট উপস্থিত হইয়া বিজ্ঞাপিত করিলেন যে, তাঁহার পঞ্চ-মহাযজ্ঞ-প্রবর্তনের জন্য তিনি প্রচলিত মূল্য দিয়া অপ্রদাধর্ম্মের ক্ষয় করিয়া, অর্থাৎ ভবিষ্যতে ক্রীত ভূমির হস্তান্তরিত করিবার ক্ষমতা রক্ষা করিয়া, কিছু ভূমি ক্রয় করিতে চাহিতেছেন। তাঁহার প্রার্থনা গ্রাহ্য হইল; পুস্তপালগণের অবধারণাক্রমে দুই দীনার মূল্য লইয়া পাঁচ দ্রোণ পরিমিত ভূমি তাঁহার নিকট বিক্রীত হইল।

৪নং—দামোদরপুরে আবিষ্কৃত, গুপ্তসম্রাট্ বুধগুপ্তের রাজ্যসময়ের তাম্রশাসন। [দলীল-সম্পাদনের সংবৎ লুপ্ত]।

চণ্ডগ্রামের 'গ্রামিক' নাভক পুণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তির শাসনকর্ত্তার অধিকরণসমীপে উপস্থিত হইয়া বিজ্ঞাপিত করিলেন যে, তিনি ব্রাহ্মণ ও আর্য্যগণের বসতি বসাইবার অভিপ্রায়ে 'সমুদয়-বাহ্য' (রাজস্ব-বাদ) 'অপ্রদ' খিলক্ষেত্র সেই গ্রামে প্রচলিত মূল্যে খরিদ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন। নাভকের ঐ প্রার্থনার কথা পুণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তির শাসনকর্ত্তা উপরিক মহারাজ ব্রহ্মদত্তের রাজধানী পলাশবৃন্দ নামক স্থানের মহত্তরগণ, অষ্টকুলাধিকরণগণ, গ্রামিকগণ ও কুটুম্বিগণ চণ্ডগ্রামের ব্রাহ্মণ ও আর্য্যগণকে ও সেই স্থানের অন্যান্য প্রধান প্রধান প্রজাকে বলিয়া পাঠাইলেন। নাভকের প্রার্থনা মঞ্জুর হইল। মহত্তরাদির প্রত্যবেক্ষণ-সহায়তা লইয়া অষ্টক-নবক-নল দ্বারা মাপিয়া এক কুল্যবাপ ভূমি নাভকের নিকট হইতে দুইটি দীনার মুদ্রা গ্রহণ করিয়া বিক্রীত হইল। প্রার্থয়িতা নাভকের পক্ষ হইতে বিক্রয়কারিগণই এই বিক্রীত ভূমি নাগদেব নামক এক ব্রাহ্মণকে প্রদান করিলেন। প্রার্থনার যুক্তিযুক্ততা সম্বন্ধে ও সেই গ্রামের বিক্রয়মর্য্যাদা সম্বন্ধে পুস্তপাল পত্রদাসকে 'অবধারণ' করিতে হইয়াছিল।

৫নং—দামোদরপুরে আবিষ্কৃত গুপ্তসম্রাট বুধগুপ্তের রাজ্যসময়ের তাম্রশাসন। [দলীল-সম্পাদনের সংবৎ লুপ্ত]।

পুণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তির অন্তঃপাতী কোটিবর্ষ বিষয়ের অধিষ্ঠানের (রাজধানীর) অধিকরণসমীপে উপস্থিত হইয়া অধিকরণের অন্তর সদস্য 'নগরশ্রেষ্ঠী' রিভুপাল আবেদন করিলেন যে, তিনি প্রচলিত ক্রয়মর্য্যাদার অনুসরণ করিয়া উপযুক্ত-মূল্য-প্রদানপূর্ব্বক কতক কুল্যবাপ সবাস্তু ক্ষেত্রভূমি খরিদ করিয়া, তাহাতে দেবতা কোকামুখস্বামী ও শ্বেতবরাহস্বামীর জন্য দুইটি দেবকুল ও দুইটি 'কোষ্ঠিকা' নির্ম্মাণ করাইবার ইচ্ছা করিতেছেন। আবেদনপত্রে তিনি ইহাও জানাইয়াছিলেন যে, এই দুই দেবতার জন্য ডোঙ্গা গ্রামে ইতিপূর্ব্বে

তিনি একাদশ কুল্যবাপ ক্ষেত্রভূমির অতিসর্গ করিয়াছিলেন। পুস্তপালগণের অবধারণাক্রমে এই প্রার্থনার যুক্তিযুক্ততা ও রিভুপালের পূর্ব্ব দানের সত্যতা নির্দ্ধারিত হইলে পর, প্রতি কুল্যবাপ ভূমির তিন দীনার মূল্য হিসাবে, কতক সবাস্ত ক্ষেত্রভূমি বিক্রীত হইল। এই দলীল-সম্পাদন-সময়ে পুণ্ড্রবর্দ্ধনে সম্রাট্ কর্ত্তৃক নিযুক্ত শাসনকর্ত্তা ছিলেন উপরিক-মহারাজ জয়দত্ত, এবং তাঁহার নিযুক্ত কোটিবর্ষের বিষয়পতি ছিলেন আযুক্তক-গণ্ডক বা শণ্ডক। বিষয়াধিষ্ঠানের অধিকরণের এক মোহর বা মুদ্রা এই শাসনে সংলগ্ন ছিল।

৬নং—দামোদরপুরে আবিষ্কৃত, ২১৪ গুপ্তাব্দে (খৃঃ ৫৩৩—৩৪) সম্পাদিত, গুপ্তসম্রাট্ ভানু (?) গুপ্তের রাজ্যসময়ের তাম্রশাসন।

পুণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তির অন্তঃপাতী কোটিবর্ষ বিষয়ের অধিষ্ঠানের (রাজধানীর) অধিকরণসমীপে উপস্থিত হইয়া অমৃত দেব নামক এক অযোধ্যাবাসী 'কুলপুত্র' আবেদন করিলেন যে. তিনি অনুবৃত্ত মূল্য দিয়া কতক কুল্যবাপ 'সমুদয়-বাহ্য' (রাজস্বরহিত) 'অপ্রহত' (অকৃষ্ট) খিলক্ষেত্র ক্রয় করিয়া তাহা অপ্রদাধর্ম্মানুসারে তাম্রপট্ট-সম্পাদনপূর্ব্বক ভগবান শ্বেতবরাহস্বামীর দেবকুলের খণ্ডস্ফুট্ট-প্রতিসংস্কারের জন্য, দেবতার বলিচরুসত্র-প্রবর্ত্তনের জন্য ও গব্য-ধূপ-পুষ্প-মধুপর্ক-দীপাদির উপযোগের জন্য দিতে ইচ্ছা করিতেছেন। প্রথম পুস্তপাল নরনন্দি প্রভৃতির অবধারণাক্রমে আবেদনকারী অমৃতদেবের নিকট হইতে পঞ্চদশ দীনার মুদ্রা গ্রহণ করিয়া চারিটি স্থানবিশেষে পাঁচ কুল্যবাপ সবাস্ত ক্ষেত্রভূমি বিক্রীত হইল। এই দলীলের সম্পাদনসময়ে পুণ্ড্রবর্দ্ধনের শাসনকর্ত্তা ছিলেন উপরিক-মহারাজ এক (অজ্ঞাতনামা) রাজপুত্র, এবং তাঁহার দ্বারা নিযুক্ত কোটিবর্ষ বিষয়ের বিষয়পতি ছিলেন স্বয়ম্ভুদেব। এই শাসনে কোটিবর্ষ-বিষয়ের রাজধানীতে অধিষ্ঠিত অধিকরণের মোহর বা মুদ্রা সংযুক্ত আছে।

(ক)—ফরিদপুর জেলায় আবিষ্কৃত, ধর্ম্মাদিত্যের রাজ্যশাসনের তৃতীয়াব্দে সম্পাদিত তাম্রশাসন।

মহারাজাধিরাজ ধর্ম্মাদিত্যের রাজ্যশাসনসময়ে যখন নব্যাবকাশিকায় [খ ও গ শাসন দ্রষ্টব্য] তাঁহার প্রসাদ-ভাজন অর্থাৎ তৎকর্ত্তৃক নিযুক্ত মহারাজ স্থাণুদত্ত শাসনকর্ত্তা ছিলেন, এবং যখন তাঁহার অধীন (তদ্‌বিনিযুক্ত) বারকমণ্ডল নামক বিষয়ের বিষয়পতি ছিলেন জজাব, তখন 'সাধনিক' বাতভোগ বিষয়াধিকরণের ও বিষয়-মহত্তরগণ-পুরঃসর প্রকৃতিবর্গের নিকট উপস্থিত হইয়া আবেদন করিলেন যে, তিনি প্রচলিত হারে মূল্য দিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে ক্ষেত্রখণ্ড ক্রয়

করিয়া ব্রাহ্মণকে দান করিতে ইচ্ছা করিতেছেন। এইরূপ অভ্যর্থনা বা আবেদন করিবার পর, পুস্তপাল বিনয়সেন অবধারণ করিয়া বিজ্ঞাপিত করিলেন যে, এই বিষয়ে (জেলাতে) বিক্রীয়মান ক্ষেত্রখণ্ড প্রতি কুল্যবাপ চারি দীনার হারে বিক্রীত হয়, এবং বিক্রয়-মূল্য হইতে তাহার ষষ্ঠ ভাগ রাজার প্রাপ্য হয়। তৎপরে বাতভোগের আবেদন গ্রাহ্য হইলে, তাঁহার নিকট হইতে দ্বাদশ দীনার মুদ্রা গ্রহণ করিয়া তিন কুল্যবাপ ভূমি শিবচন্দ্রের হস্ত-পরিমাণে অবধারিত অষ্টক-নবক-নল দ্বারা মাপিয়া তাম্রপট্ট-ধর্ম্মানুসারে বিক্রীত হইল। ক্রেতা বাত-ভোগ ক্রীত ক্ষেত্রখণ্ড চন্দ্রস্বামি-নামক ভরদ্বাজ-গোত্রীয় ব্রাহ্মণকে দান করিলেন। ভবিষ্যতে কোনরূপ সীমা-বিবাদ উপস্থিত না হয়, এই উদ্দেশ্যে দলীলে সুস্পষ্ট-ভাবে সীমা-লিঙ্গগুলি নির্দ্দিষ্ট করিয়া লিখিত হইয়াছে। এই শাসনে বারকমণ্ডল-বিষয়ের অধিকরণের মোহর বা মুদ্রা সংযুক্ত আছে।

(খ)—ফরিদপুর জেলায় আবিষ্কৃত ধর্ম্মাদিত্যের রাজ্যশাসনসময়ের তাম্র-শাসন। [সম্পাদন-কাল অনুল্লিখিত]।

মহারাজাধিরাজ ধর্ম্মাদিত্যের রাজ্যশাসনসময়ে, যখন নব্যাবকাশিকা-প্রদেশে তদীয় অনুমোদন-লাভে লব্ধাস্পদ মহাপ্রতীহার-উপরিক নাগদেব প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা ছিলেন, এবং যখন বারকমণ্ডল-বিষয়ে নাগদেব-কর্ত্তৃক নিযুক্ত গোপালস্বামী বিষয়পতি ছিলেন, তখন বসুদেবস্বামি-নামক এক ব্রাহ্মণ জ্যেষ্ঠ কায়স্থ (প্রধান-সেক্রেটারী) নয়সেন-প্রমুখ বিষয়ের (জেলার) অধিকরণের ও বিষয়মহত্তরগণের নিকট উপস্থিত হইয়া বিজ্ঞাপিত করিলেন যে, তিনি তাঁহাদের অনুগ্রহে প্রচলিত হারে মূল্য দিয়া ক্ষেত্রখণ্ড খরিদ করিয়া, পিতা-মাতার ও নিজের পুণ্যাভিবৃদ্ধির আশায়, তাহা লৌহিত্যসগোত্র সোমস্বামি-নামক ব্রাহ্মণকে প্রদান করিতে ইচ্ছা করিতেছেন। এই অভ্যর্থনার পর পুস্তপাল জন্মভূতির অবধারণাক্রমে প্রতি কুল্যবাপ চারি দীনার হারে দুই দীনার মূল্যরূপে গ্রহণ করিয়া, প্রতীত ও ধর্ম্মশীল শিবচন্দ্রের হস্ত-পরিমাণে অবধারিত অষ্টক-নবক-নল দ্বারা মাপিয়া, কতক ভূমি বসুদেব স্বামীর নিকট বিক্রীত হইল। এই ক্রীত ভূমি আবেদনকারী ক্রেতা নিজে, কিংবা তাঁহার পক্ষ হইতে বিক্রেতৃ-গণই সোমস্বামীকে দান করিয়াছিলেন, তাহার স্পষ্ট উল্লেখ লিপিতে দৃষ্ট হয় না। এই তাম্রশাসনেও বারকমণ্ডল-বিষয়ের অধিকরণের মোহর বা মুদ্রা যুক্ত আছে।

(গ)—ফরিদপুর জেলায় আবিষ্কৃত, গোপচন্দ্রের রাজ্যশাসনের ঊন-

মহারাজাধিরাজ গোপচন্দ্রের রাজ্যশাসনসময়ে, যখন নব্যাবকাশিকা-প্রদেশে মহাপ্রতীহার কুমারামাত্য উপরিক নাগদেব রাজ কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া প্রদেশ শাসন করিতেছিলেন, এবং যখন তাঁহার নিযুক্ত বৎসপালস্বামী বারকমণ্ডল-বিষয়ের বিষয়পতি ছিলেন, তখন এই বিষয়পতি স্বয়ং ভূমি-ক্রয়-প্রার্থী হইয়া, নিজের অধিকরণসমক্ষে এবং বিষয়মহত্তর ও অন্যান্য প্রধান ব্যবহারিগণের নিকট উপস্থিত হইয়া আবেদন করিলেন যে, তিনি প্রচলিত হারে মূল্য দিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে ক্ষেত্রভূমি খরিদ করিয়া ভট্টগোমিদত্তস্বামি-নামক ব্রাহ্মণকে প্রদান করিতে ইচ্ছা করিতেছেন। নয়ভূতি-নামক পুস্তপাল এই আবেদন গ্রাহ্য বলিয়া অবধারণ করিলে পর, প্রতি কুল্যবাপ চারি দীনার হিসাবে চারি দীনার মূল্য গ্রহণ করিয়া বিষয়াধিকরণ দ্বারা 'কুলবার' রূপে প্রকল্পিত ব্যক্তিগণ প্রতীত ও ধর্ম্মশীল শিবচন্দ্রের হস্ত-পরিমাণে অবধারিত অষ্টক-নবক-নল দ্বারা মাপিয়া, এক কুল্যবাপ ক্ষেত্রভূমি বিক্রয় করিলেন। বিষয়পতি বৎসপালস্বামী এই ক্রীত ভূমি আবার ভট্টগোমিদত্তস্বামীকে পুত্র-পৌত্রক্রমে ভোগ করিবার জন্য প্রদান করিলেন। তাম্রশাসনে বিক্রীত ভূমির সীমালিঙ্গ নির্দ্দিষ্ট আছে, এবং তাহাতে বিষয়াধিকরণের মোহর বা মুদ্রা সংযুক্ত আছে।

(ঘ)—ফরিদপুর জেলায় (ঘাগ্রাহাটীতে) আবিষ্কৃত, সমাচারদেবের রাজ্যশাসনের চতুর্দ্দশাব্দে সম্পাদিত তাম্রশাসন।

*মহারাজাধিরাজ সমাচারদেবের রাজ্যশাসনসময়ে যখন নব্যাবকাশিকা প্রদেশে অন্তরঙ্গ-উপরিক জীবদত্ত রাজানুগ্রহে শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত ছিলেন, এবং যখন তাঁহার অনুমোদনলব্ধ বারকমণ্ডল বিষয়ের বিষয়পতির পদে পবিত্রক নামক ব্যক্তি নিযুক্ত ছিলেন, তখন জ্যেষ্ঠাধিকরণিক দামুক-প্রমুখ অধিকরণের নিকট, এবং বিষয়মহত্তর ও অন্যান্য প্রধান প্রধান ব্যবহারিগণের নিকট সুপ্রতীকস্বামি-নামক ব্রাহ্মণ আবেদন করিলেন যে, তিনি বলিচরুসত্রাদির প্রবর্ত্তনের জন্য ও ব্রাহ্মণকার্য্যের উপযোগের জন্য তাঁহাদের নিকট হইতে কিছু চিরাবসন্ন খিলভূমি তাম্রপট্টধর্ম্মানুসারে পাইবার জন্য প্রার্থনা করিতেছেন। এই অভ্যর্থনা-প্রাপ্তির পর, উপরি-উল্লিখিত ব্যবহারিগণ একত্র হইয়া বসিয়া ধার্য্য করিলেন যে, প্রার্থয়িতা ব্রাহ্মণকে ভূমি দান করিবার জন্য করণিক-নয়নাগ প্রভৃতি কয়েক জন গণ্যমান্য লোককে কুলবার-রূপে নির্ব্বাচিত করিয়া দেওয়া হউক। এই কুলবারগণ তাম্রপট্টধর্ম্মে পূর্ব্বপ্রদত্ত তিন কুল্যবাপ ভূমি রাখিয়া ব্যাঘচোরক নামক স্থানে ভূমির অবশিষ্টাংশ সুপ্রতীক স্বামীকে প্রদান করিলেন।

এই ঘ-চিহ্নিত তাম্রশাসনখানি অন্যান্য নয়খানি শাসনের মত 'বিক্রীত ভূমির দানপত্র' নহে। তাহা না হইলেও, প্রার্থনা-বিজ্ঞাপনাংশে ও অন্যান্য বিষয়েও, ইহাতে অবশিষ্ট নয়খানিতে যে প্রথা অবলম্বন করিয়া ভূমিচ্ছেদের কথা বর্ণিত আছে, প্রায় তদ্রূপ প্রথাই অবলম্বিত দেখা যায়; সেই জন্য আমরা ইহার সংক্ষিপ্তসার প্রদান করিলাম। ইহাতে ভূমি-বিক্রয়ের কথা নাই বলিয়াই পুস্তপালগণের অবধারণের বা নলাদি দ্বারা ভূমি-মাপের কথাও নাই। আগামী প্রবন্ধে এই দলীলগুলিতে ব্যবহৃত ভূমি-বিক্রয়-প্রথার অন্যান্য প্রসঙ্গপ্রাপ্ত বিষয়ের আলোচনা করিব।

শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক।

সাহিত্যে স্বাস্থ্যরক্ষা।

(৪) বিধবার প্রেম।

আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে বিধবার প্রেমে পড়ার চিত্র কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। প্রাচীন কবিগণ ব্রহ্মচারিণী বিধবাকে চিরদিন সম্মানের চক্ষে দেখিয়া আসিয়াছেন। রামায়ণে বালির স্ত্রী তারা বা রাবণ-বনিতা মন্দোদরীর তৎকালে প্রচলিত সেই সেই সমাজের প্রথা অনুসারেই পুনর্ব্বার দেবরের সহিত বিবাহ হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহারা কাহারও প্রেমে পড়েন নাই। আমাদের আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যে, স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রই কুন্দনন্দিনীর সৃষ্টি করিয়া ইহার পথ দেখাইয়াছেন। কুন্দনন্দিনীর পরে রোহিণীও তাঁহার সৃষ্টি। কিন্তু কুন্দফুল সূর্য্যমুখীর পাশে অতি নিভৃতে, নিতান্ত জড়সড় হইয়া ফুটিয়াছিল, ফুটিতে ফুটিতে অকালে শুকাইয়া গেল। কবি তাহাকে নায়িকার পদে অভি-ষিক্ত করিয়া তাহাকে লোকচক্ষুর সম্মুখে খুব বড় করিয়া ধরেন নাই। রোহিণী বিধবা হইলেও কোকিলের কুহু রবে মাতোয়ারা হইবার বীজ তাহার রক্তের মধ্যে ছিল। সে যখন গৃহে ছিল, তখন তাহাকে বিধবা বলিয়া চেনা কঠিন হইত। সে গৃহত্যাগ করিয়া বারবিলাসিনীর গ্রেডে প্রমোশন পাইল। আর সে সধবা থাকিলেও যে গৃহত্যাগ করিত না, এ কথা হলপ করিয়া বলা যায় না। কবির মানসোদ্যানের নীলোৎপল ভ্রমরের পার্শ্বে রোহিণী যেন উজ্জ্বল-বর্ণ, গন্ধহীন বিলাতী ফুল—তাহার দ্বারা টেবল সাজান চলে, কিন্তু তাহা দেবপূজায় লাগে না। ফল কথা, কুন্দনন্দিনী বা রোহিণীকে কবি নায়িকার

আসন দেন নাই, বরং তাহাদের শোচনীয় পরিণাম দেখাইয়া তিনি সমাজের উপকারসাধন করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের পরে আমরা পাইয়াছি কবিবর রবীন্দ্রনাথ-সৃষ্ট বিধবা চরিত্র—'চোখের বালি'র বিনোদিনী। বিনোদিনী মৃদুগন্ধ, ক্ষুদ্রাবয়ব কুন্দফুল নহে, আবার বিলাতী মরসুমী ফুলও নহে—একেবারে সদ্যঃপ্রস্ফুটিত গোলাপ। কবিবর বিনোদিনী-চরিত্রে তাঁহার আর্টের চরমোৎকর্ষ দেখাইয়াছেন! তবে গোলাপও বিদেশী ফুল,—এই গোলাপও শিবপূজায় লাগে না। কবি প্রথমেই বিনোদিনীর পরিচয় দিতে বসিয়া বলিয়াছেন—

'বিনোদিনীর বাপ বিশেষ ধনী ছিল না, কিন্তু তাহার একমাত্র কন্যাকে সে মিসনারী মেম রাখিয়া বহু যত্নে পড়া শুনা ও কারুকার্য্য শিখাইয়াছিল।'

হিন্দুর ঘরের মেয়ে মিশনারী মেমের শিক্ষায় কিরূপ জীবে পরিণত হইতে পারে, আমরা বিনোদিনী-চরিত্রে তাহা পাইতেছি। বিনোদিনীর সহিত প্রথমে মহেন্দ্র নামক এক ধনী যুবকের বিবাহের সম্বন্ধ হইয়া সে সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া গেল। পরে মহেন্দ্রের মাতা তাঁহার এক গ্রামসম্পর্কীয় ভ্রাতুষ্পুত্রের সহিত এই গরিবের মেয়েটীর বিবাহ দেওয়াইলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বিনোদিনী তাহার অল্প কাল পরেই বিধবা হইল। এ দিকে মাতার নির্ব্বন্ধাতিশয্যে মহেন্দ্রও আশা নাম্নী একটী ক-অক্ষর-জ্ঞানহীনা, সম্পূর্ণ-সংসারানভিজ্ঞা বালিকাকে বিবাহ করিল। মহেন্দ্রের অনুরোধে প্রথমে তাহার অন্তরঙ্গ বন্ধু বিহারীও সেই বালিকাকে বিবাহ করিতে রাজি হইয়াছিল, কিন্তু মেয়ে দেখার পরে মহেন্দ্রই তাহাকে বিবাহ করিতে চাহিল, বিহারী নিতান্ত ভালমানুষের মত সরিয়া দাঁড়াইল। ইহার পরে ঘটনাসূত্রে বিনোদিনীও আসিয়া মহেন্দ্রের বাড়ীতে আশালতার পার্শ্বে স্থান পাইল, এবং তাহার পর হইতেই বিনোদিনীর প্রেমের লীলাখেলা আরম্ভ হইল। প্রেমের খেলা জিনিসটা কখনও হিন্দুর গৃহে প্রচলিত ছিল না, ঘরের বাহিরে অবশ্য ছিল। রবীন্দ্রনাথই প্রথমে হিন্দু গৃহে তাহা প্রবেশ করাইয়াছেন। বিনোদিনী মিশনারী মেমের দ্বারা শিক্ষিতা, হয় ত ইংরেজী নবেলও দুই চারিখানা পড়িয়া থাকিবে, তাই flirtation, coquetry প্রভৃতি ইংরেজী ধরণের প্রেমের খেলার মর্ম্ম বুঝিয়াছিল। তাই সে মহেন্দ্র ও বিহারীকে অবলম্বন করিয়া অনেক খেলাই খেলিয়াছে। অথবা বলিতে গেলে গ্রন্থকার স্বয়ং মহেন্দ্র, বেহারী, বিনোদিনী ও আশাকে লইয়া ... খেলা দেখাইয়াছেন, ইহারা যেন তাঁহার হাতের দাবার ঘুঁটী—'চোখের

বালি' উপন্যাসখানি একটা সতরঞ্চ খেলার ছক—গ্রন্থকার এই ছকের উপর তাঁহার ইচ্ছামত এই সকল ঘুঁটী চালাইয়া কীর্ত্তি মাৎ করিয়াছেন। উপন্যাসের মধ্যে শতরঞ্চ খেলারই অপর নাম উপন্যাসে মনোবিজ্ঞান-চর্চ্চা। ইহাই না কি এখন খুব উচ্চ দরের আর্ট। যাহা হউক, বিনোদিনী, মহেন্দ্র ও বিহারীকে লইয়া কিরূপ খেলা খেলিয়াছিল, তাহার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দিতেছি। বিনোদিনী মহেন্দ্রের গৃহে স্থান পাইয়া, আশার স্বামি-সৌভাগ্য দেখিয়া ঈর্ষ্যানলে জর্জ্জরিত হইল।

'আশার প্রতি মহেন্দ্রের সোহাগ যত্ন বিনোদিনীর প্রণয়বঞ্চিত চিত্তকে সর্ব্বদাই আলোড়িত করিয়া তুলিত. তাহাতে বিনোদিনীর বিরহিনী কল্পনাকে যে বেদনায় জাগরূক করিয়া রাখিত তাহার মধ্যে উগ্র উত্তেজনা ছিল। যে মহেন্দ্র তাহাকে তাহার সমস্ত জীবনের সার্থকতা হইতে ভ্রষ্ট করিয়াছে, যে মহেন্দ্র তাহার মত স্ত্রী রত্নকে উপেক্ষা করিয়া আশার মত ক্ষীণবুদ্ধি দীন-প্রকৃতি বালিকাকে বরণ করিয়াছে, তাহাকে বিনোদিনী ভালবাসে কি বিদ্বেষ করে, তাহাকে কঠিন শাস্তি দিবে, না, তাহাকে হৃদয় সমর্পণ করিবে, তাহা বিনোদিনী ঠিক করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই।'

তাহা ঠিক বুঝিতে না পারুক, বিনোদিনী মহেন্দ্রকে ধরিবার জন্য নানা ফাঁদ পাতিতে লাগিল। অবশেষে যখন মহেন্দ্র তাঁহার ফাঁদে পড়িল, তখন তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া এই চিঠি লিখিল—

'আমার কাছে কি চাও তুমি? ভালবাসা? তোমার এ ভিক্ষাবৃত্তি কেন? জন্মকাল হইতে তুমি কেবল ভালবাসাই পাইয়া আসিতেছ, তবু তোমার লোভের অন্ত নাই!

'জগতে আমার ভালবাসিবার ও ভালবাসা পাইবার কোন স্থান নাই। তাই আমি খেলা করিয়া ভালবাসার খেদ মিটাইয়া থাকি। যখন তোমার অবসর ছিল, তখন সেই মিথ্যা খেলায় তুমিও যোগ দিয়াছিলে। কিন্তু খেলার ছুটী কি ফুরায় না? ঘরের মধ্যে তোমার ডাক পড়িয়াছে, এখন আবার খেলার ঘরে উঁকি ঝুঁকি কেন? এখন ধুলা ঝাড়িয়া ঘরে যাও। আমার ত ঘর নাই, আমি মনে মনে একলা বসিয়া খেলা করিব, তোমাকে ডাকিব না।'

'আমি মনে মনে একলা বসিয়া খেলিব'—এটা বিনোদিনীর মিথ্যা কথা। কারণ, ইহার পূর্ব্বে হইতেই বিনোদিনী 'বেহারী ঠাকুরপো'র দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল, এবং তাহাকে অল্পে অল্পে নিজের দিকে আকর্ষণ করিতেছিল।

বাঘিনী যেমন একটা শীকার ধরিয়া তাহার সঙ্গে খেলা করে, এবং তাহার ঘাড় ভাঙ্গিয়া রক্ত খাইয়া অন্য শীকারের জন্য ধাবিত হয়, বিনোদিনীও সেইরূপ মহেন্দ্রের ঘাড় ভাঙ্গিয়া এখন বিহারীর প্রতি ধাবিত হইল। পূর্ব্ব হইতেই সে বিহারীর মনে একটা মোহের সঞ্চার করিয়াছিল, তাই বিহারী এমন বাঘিনীর মধ্যেও দেবী হৃদয়ের পরিচয় পাইয়াছিল। বিনোদিনী রাত্রে

বিহারীর বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিকট প্রেম ভিক্ষা চাহিল। বিনোদিনী বলিল—

'শুন ঠাকুরপো, আমি নির্লজ্জ হইয়া বলিতেছি, তুমি আমাকে ফিরাইতে পারিবে, মহেন্দ্র আমাকে ভালবাসে বটে, কিন্তু সে নিরেট অন্ধ, আমাকে কিছুই বোঝে না। একবার মনে হইয়াছিল তুমি যেন আমাকে বুঝিয়াছ, একবার তুমি আমাকে শ্রদ্ধা করিয়াছিলে—সত্য করিয়া বল—সে কথা আজ চাপা দিতে চেষ্টা করিও না।'

'বিহারী। সত্যই বলিতেছি, আমি তোমাকে শ্রদ্ধা করিয়াছিলাম।'

'বিনোদিনী। ভুল্ কর নাই ঠাকুরপো, কিন্তু বুঝিলেই যদি, শ্রদ্ধা করিলেই যদি, তবে সেইখানেই থামিলে কেন? আমাকে ভালবাসিতে তোমার বাধা কি ছিল? আমি আজ নির্লজ্জ হইয়া তোমার কাছে আসিয়াছি, এবং আমি নির্লজ্জ হইয়া তোমাকে বলিতেছি—তুমিও আমাকে ভালবাসিলে না কেন? আমার পোড়া কপাল! তুমিও কি না আশার ভালবাসায় মজিলে? না, তুমি রাগ করিতে পাইবে না। বোস ঠাকুরপো, আমি কোন কথা ঢাকিয়া বলিব না। তুমি যে আমাকে ভালবাস, সে কথা তুমি যখন নিজে জানিতে না, তখনও আমি জানিতাম। কিন্তু আমার মধ্যে তোমরা কি দেখিতে পাইয়াছ, আমি কিছুই বুঝিতে পারি না। ভালই বল, আর মন্দই বল, তাহার আছে কি? বিধাতা কি পুরুষের দৃষ্টিরজন্যে অন্তর্দৃষ্টি কিছুই দেন নাই। তোমরা কি দেখিয়া—কতটুকু দেখিয়া ভোলো! নির্ব্বোধ! অন্ধ!'

এই হিংস্র জন্তুর সঙ্গে বিহারীর অনেক কথা হইল, এবং বিহারী তাহাকে তাহার নবেলি প্রেমের জন্য টিট্‌কারী দিল, এবং অবশেষে তাহাকে দেশে চলিয়া যাইতে বলিল। বিনোদিনী সেই রাত্রে সেখানে থাকিতে চাহিল। বিহারী বলিল—

'না, এত বিশ্বাস আমার নিজের 'পরে নাই।'

এই কথায় বিনোদিনী একটা Scene করিয়া বসিল। সে তৎক্ষণাৎ চৌকী হইতে ভূমিতে লুটাইয়া পড়িয়া বিহারীর দুই পা প্রাণপণ বলে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া কহিল,—

'ঐটুকু দুর্ব্বলতা রাখ ঠাকুরপো! একেবারে পাথরের দেবতার মত পবিত্র হইয়ো না। মন্দকে ভালবাসিয়া একটু মন্দ হও।'

বলিয়া বিনোদিনী বিহারীর পদযুগ বারংবার চুম্বন করিল। বিহারী বিনোদিনীর এই আকস্মিক অভাবনীয় ব্যবহারে ক্ষণ কালের জন্য যেন আত্মসংবরণ করিতে পারিল না। তাহার শরীর মনের সমস্ত গ্রন্থি যেন শিথিল হইয়া আসিল। বিনোদিনী বিহারীর এই স্তব্ধবিহ্বল ভাব অনুভব করিয়া তাহার পা ছাড়িয়া দিয়া নিজের দুই হাঁটুর উপর উন্নত হইয়া উঠিল, এবং চৌকীতে আসীন বিহারীর গলদেশ বাহুতে বেষ্টন করিয়া বলিল—

'জীবনসর্ব্বস্ব, জানি, তুমি আমার চিরকালের নও,—কিন্তু আজ এক মুহূর্ত্তের জন্ম আমাকে ভালবাস! তারপরে আমি আমাদের সেই বন জঙ্গলে চলিয়া যাইব, কাহারও কাছে কিছু চাহিব না। মরণ পর্য্যন্ত রাখিবার মত আমাকে একটা কিছু দেও!—বলিয়া বিনোদিনী চোখ বুজিয়া তাহার ওষ্ঠাধার বিহারীর কাছে অগ্রসর করিয়া দিল।'

বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের এই বর্ণনায় নবেলী প্রেম চরম মাত্রায় (climax) উঠিয়াছে। ইহার নিকট বঙ্কিমচন্দ্রের বর্ণিত আয়েষার 'এই বন্দী আমার প্রাণেশ্বর' শিশুর আলিঙ্গন।

বিনোদিনী যাহা চাহিয়াছিল, তাহাই পাইল। বিহারী যদিও প্রথমে বিনোদিনীকে বলিয়াছিল—'তোমার এই প্রেমের আলাপ বারো আনা নাটক নবেল।' কিন্তু অবশেষে সে এই বাঘিনীর দ্বারা পরাভূত হইল। তাই দেখিতে পাই যে, 'শনিগ্রহ' মহেন্দ্রের ভবনে উদিত হইয়া 'বন্ধুর প্রণয়, দম্পতির প্রেম, গৃহের শান্তি ও পবিত্রতা একেবারে ছারখার করিয়া দিল', বিহারী প্রবল ঘৃণায় সেই বিনোদিনীকে সমস্ত অন্তঃকরণের সহিত সুদূরে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল কৈ? বিহারী চক্ষু বুজিয়া সেই মুখকে স্মৃতিলোক হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু কোনও মতেই তাহাকে আঘাত করিতে তাহার হাত উঠিল না—একটী অসম্পূর্ণ ব্যাকুল চুম্বন তাহার মুখের কাছে আসন্ন হইয়া রহিল, পুলকে তাহাকে আবিষ্ট করিয়া তুলিল।

ইহার পর বিহারী অন্যমনস্ক হইবার জন্য নানা প্রকার সৎকার্য্য আরম্ভ করিল ও পশ্চিমে বেড়াইতে গেল। বিনোদিনী অল্প কয়েক দিন তাহার দেশের বাড়ীর জঙ্গলের মধ্যে থাকিয়া অবশেষে নিতান্ত নির্লজ্জভাবে মহেন্দ্রের সঙ্গে বাহির হইয়া আবার কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল, এবং অধিকতর নির্লজ্জভাবে সেই প্রেমোন্মত্ত মহেন্দ্রের স্কন্ধে চড়িয়া বেহারীর খোঁজ করিতে লাগিল। পরে এক দিন আলাহাবাদে বেহারীর বাগানবাটীতে মহেন্দ্রের অসাক্ষাতে বিনোদিনীর সঙ্গে বেহারীর দেখা হইল। তখন বেহারীর মনে প্রথমে বিনোদিনীর প্রতি ঘৃণার উদ্রেক হইল, সে কোনও কথা না বলিয়া চলিয়া যাইতেছিল। বিনোদিনী বলিল—

'আজ যদি তুমি বিমুখ হইয়া এমন করিয়া চলিয়া যাও, তবে আমি তোমারি শপথ করিয়া বলিতেছি আমি মরিব।'

বিহারী তখন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—

'বিনোদিনী, তোমার জীবনের সঙ্গে আমাকে তুমি জড়াইবার চেষ্টা করিতেছ কেন? আমি তোমার কি করিয়াছি? আমি ত কখনও তোমার পথে দাঁড়াই নাই—তোমার সুখ দুঃখে

হস্তক্ষেপ করি নাই ?' বিনোদিনী কহিল "তুমি আমার কতখানি অধিকার করিয়াছ, তাহা একবার তোমাকে জানাইয়াছি, তুমি বিশ্বাস কর নাই। তবু আজ তোমার বিরাগের মুখে সেই কথাই জানাইতেছি।.........ঠাকুরপো যাহা মনে করিতেছ, তাহা নহে। এ ঘরে কোন কলঙ্ক স্পর্শ করে নাই। তুমি এই ঘরে এক দিন শয়ন করিয়াছিলে—এ ঘর তোমারই জন্য উৎসর্গ করিয়া রাখিয়াছি—ঐ ফুলগুলা তোমারি পূজা করিয়া আজ শুকাইয়া আছে। এই ঘরেই তোমাকে বসিতে হইবে।'

'শুনিয়া বিহারীর পুলক সঞ্চার হইল।'

বিহারী ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া খাটে বসিল। বিনোদিনী তাহার জন্য পাগল হইয়া কত জায়গায় ঘুরিয়াছে, মহেন্দ্র তাহাকে কিরূপ প্রতারণা করিয়াছে, ইত্যাদি কথা বলিল। বিহারীর হৃদয় আবার গলিয়া গেল। অবশেষে মহেন্দ্র আসিয়া যখন উভয়কে একত্র দেখিয়া টিট্‌কারী দিল, তখন বিহারী বলিল—

'মহেন্দ্র, বিনোদিনীকে আমি বিবাহ করিব, তোমাকে জানাইলাম, অতএব এখন হইতে তুমি সংযত হইয়া কথা কও।' বিনোদিনী তাহা শুনিয়া বলিল—'ছি ছি, এ কথা মনে করিতে লজ্জা হয়। আমি বিধবা, আমি নিন্দিতা, সমস্ত সমাজের কাছে আমি তোমাকে লাঞ্ছিত করিব এ কখন হইতেই পারে না। ছি ছি, এ কথা তুমি মুখে আনিও না।'... ......বিহারী বলিল 'বিনোদিনী আমি তোমাকে ভালবাসি।' 'সেই ভালবাসার অধিকারে আমি আজ একটী মাত্র স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিব' বলিয়া বিনোদিনী ভূমিষ্ঠ হইয়া বিহারীর পদাঙ্গুলি চুম্বন করিল। পায়ের কাছে বসিয়া কহিল 'পরজন্মে তোমাকে পাইবার জন্য আমি তপস্যা করিব—এ জন্মে আমার আর কিছু আশা নাই, প্রাপ্য নাই। আমি অনেক দুঃখ দিয়াছি, অনেক দুঃখ পাইয়াছি, আমার অনেক শিক্ষা হইয়াছে। সে শিক্ষা যদি ভুলিতাম তবে আমি তোমাকে হীন করিয়া আরো হীন হইতাম। কিন্তু তুমি উচ্চ আছ বলিয়াই আজ আমি আবার মাথা তুলিতে পারিয়াছি—এ ইচ্ছা আমি ভূমিসাৎ করিব না।'

'আমি অনেক দুঃখ দিয়াছি, অনেক দুঃখ পাইয়াছি, আমার অনেক শিক্ষা হইয়াছে।'

বিনোদিনীর এই শেষ কালের অনুতাপ আমাদিগের হৃদয় স্পর্শ করে, সন্দেহ নাই। এখানেই কবির আর্টের সার্থকতা। কারণ, পাপের প্রতি ঘৃণা যেমন আমাদের স্বাভাবিক, পাপীর প্রতি করুণাও সেইরূপ আমাদের মনের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। বিনোদিনীর প্রতি আমাদের যতই ঘৃণা হইয়া থাকুক, তাহাকে শেষ জীবনে পাপের জন্য অনুতাপ করিতে দেখিয়া তাহার প্রতি সহানুভূতির উদ্রেক হয়। আর, তাহার প্রথম জীবনের হিংস্রবৃত্তি ও ভোগলালসা বিহারীর প্রেমে প্রশমিত হইয়া তাহাকে যথার্থ তপস্বিনী করিয়া তুলিয়াছিল। হিন্দু বিধবার পক্ষে অবশ্যই পরপুরুষের প্রতি প্রেমে তপস্বিনী হওয়াটাও নিতান্ত

দোষের, সন্দেহ নাই। তবুও বিনোদিনী যে ভাবে জীবন আরম্ভ করিয়াছিল, তাহার পক্ষে ইহা মন্দের ভাল, সন্দেহ নাই। আমার কথা এই, গ্রন্থকার এক জন হিন্দু বিধবাকে এইরূপ পরপুরুষের প্রেমে তপস্বিনী সাজাইয়াও তাহার প্রতি আমাদের সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়া সমাজের অনিষ্ট করিয়াছেন। আর এই গ্রন্থের প্রায় পনের আনা ভাগে পাপের চিত্র অতি উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে, এইরূপ পাপ-চিত্রের সহিত পাঠক-পাঠিকার মনের ঘনিষ্ঠতা জন্মিলে, পাপের প্রতি ঘৃণাও ক্রমে কমিয়া আসে। এই হিসাবে এই গ্রন্থ সমাজ-শরীরের পক্ষে বিষস্বরূপ।

ক্রমশঃ।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ।

পরিচয়।

১

'লুকিয়ে পড়লো যে হে। সরে পড়বে নাকি? একটু চলে চলো; ধরতেই হবে। কি, পারবো না? আচ্ছা, দেখ ত পারি কি না। পালাবে কোথায়; ঝোপটার পরেই একেবারে মাঠ।'

'আচ্ছা মহিম, তুমি অনর্থক ওকে ধাওয়া করবে কেন বল দিকি? দারোগা-গিরি ফলাবে?'

'তা নয় হে, তা নয়। অত বড় মাছটা চোখের ওপর দিয়ে নিয়ে যাবে, একটু ভাগও দেবে না?'

'আহা, বেচারি কত কষ্ট করে ধরেছে, আর তুমি তাতে ভাগ বসাতে চাও।

কথা কহিতে কহিতে উভয়ে ঝোপের ধারে আসিয়া পড়িলেন। হঠাৎ শুনিতে পাইলেন,কে যেন গায়িতেছে, 'ভোলার মা তোর ভোলায় নাকি পেঁচোয় পেয়েছে?' ক্ষণকাল পরেই একটি ষোল সতর বৎসরের অপরিচিত যুবক তাঁহাদের সম্মুখীন হইল। দুই জন ভদ্রলোককে দেখিয়া যুবক প্রণাম করিল।

'ওহে ছোকরা শোন ত। জাল ঘাড়ে একটা জেলে ছোঁড়া তিন চার সের একটা মাছ নিয়ে কোন্ দিকে সরে পড়লো বলতে পার?'

অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া আগন্তুক কহিল, 'কখন? কোথায় দেখলেন মশায়?'

'কখন? কোথায়? এইমাত্র, এইখান দিয়েই গেল।'

'জাল ঘাড়ে ? মাছ হাতে করে—'

'আমি তো বাপু আর এখানে এজাহার দিতে আসিনি যে, একটা কথার ওপর সাত হাজার জেরার জবাব দিতে হবে। লাল টুকটুকে জামাটি গায়ে দিয়ে বেশ বাহার দিয়ে বেড়াচ্ছ ত ; আর একটা কাজের বেলায়—'

'আজ্ঞে, একটা লোক গিয়েছে যেন এদিক দিয়ে, কিন্তু তার কাছে জাল ছিল না, হাতে মাছও ত দেখিনি। আচ্ছা, তার গায়ে কি একটা কাল জামা ছিল ?'

'অনেক দূরে ছিলুম বাপু, ভাল ঠাহর করে উঠ্‌তে পারিনি। তবে হাঁ—ঐ রকমই একটা কিছু ছিল বলে বোধ হয়।'

'বগলের কাছে সাদা কাপড়ের একটা তালি লাগান ?'

'হবে।'

'কাল সুতোর শেলাই ?'

'আর জ্বালাও কেন বাপু ? এই দিক দিয়ে ত আসছ, কোনও লোক-টোক কি তোমার চোখে পড়েনি ?'

যুবক চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া দুই পা পিছাইয়া গিয়া কহিল, 'বলেন কি মশায় ?'

'কি রকম !'

'আজ্ঞে, সামান্য কুটি একটা চোখে পড়্‌লে অস্থির হতে হয়, আর একটা জল-জ্যান্ত লোক চোখে পড়লে কি আর রক্ষে ছিল !'

'উঃ, বেটা কি পাজী !'—প্রকাশ্যে কহিলেন, 'বলি, তুমি কি কাউকে দেখেছ—'

'আপনাদের আশীর্ব্বাদে ঢের দেখেছি—'

'আঃ,—তা নয়। তিন চার সের একটা মাছ—'

'আজ্ঞে, তিন চার সের মাছ ?—হাঁ, দেখেছিলুম ; কবে জানেন—হাঁ, হাঁ, ঐ নাম করতে নেই—ভট্‌চাজের ঠাকুরমার ছেরাদ্দে,—উঃ সে—'

'আচ্ছা বাপু, মাছ না দেখে থাক নাই দেখেছ। এমনি কোনও লোককে যেতে দেখেছ—যে রকমটা বল্লুম ?'

'আপনি ত কোনও রকমই কিছু বলেন নি মশায়। আর যদিই বলে থাকেন, তা হলেও যে কাউকে দেখেছি, এমন ত মনে হচ্ছে না।'

নিজ-মূর্ত্তি ধরিয়া রুক্ষস্বরে কহিলেন, 'তুমি যে একেবারে আকাশ থেকে পড়্‌লে দেখ্‌ছি। এইমাত্র বল্লে দেখেছ, আবার বলছ 'না'? দেখ, ও সব চালাকী-টালাকি আমার কাছে খাটবে না,—বুঝলে? ঠিক ঠিক জবাব দিয়ে যাও।'

'আজ্ঞে, হাতের কাছে সাদা কাপড়ের তালি লাগান—কাল জামা গায়ে একটা লোককে—হাঁ হাঁ, আধ ঘণ্টা আগে হরিনাভির দিকে যেতে দেখেছি বটে।'

'আধ ঘণ্টা নয়, আধ ঘণ্টা নয়; আমি যার কথা বল্‌ছি, সে তিন মিনিটও হবে না।'

'ভগবান জানেন মশায়, তা হলে আমি দেখিনি।'

মহিমবাবু ক্ষণকাল যুবকের মুখের দিকে চাহিয়া কি দেখিলেন, পরে কহিলেন, 'আচ্ছা, আর একটা কথা শোন।'

'যখন এতগুলো কথা শুনতে পেলুম, তখন এটাও শুনতে পাব।'

'বড় ফক্কড় ছোঁড়া! বলি তা নয়, একটু এগিয়ে এস!' বলিতে বলিতে মহিমবাবু স্বয়ং অগ্রসর হইয়া তাহার হাতখানি ধরিয়া ফেলিয়া বলিলেন, 'এইবার সোনারচাঁদ, একবার জামাটা খুলে ফেল দিকি।'

যুবক অতিশয় বিস্মিতভাবে মহিমবাবুর মুখের পানে চাহিয়া রহিল। মহিমবাবু জামাটি খুলিয়া উল্টা করিয়া পুনরায় পরাইয়া হরেনকে বলিলেন, 'কেমন হে, এই না?'

'সাবাস দাদা, বলিহারি তোমার বুদ্ধিকে! আমি ভেবেছিলুম কি জান? এ বেটা জেলেটার আপনার লোক-টোক হবে; আর না হয় ত ভাগ পাবার লোভে ঐ রকম্ কচ্ছে। ও মশায়! তা না হয়ে শম্মারাম নিজেই কি না—'

'আমিও তাই ভেবেছিলুম।' পরে যুবকের দিকে ফিরিয়া কহিলেন, 'এইবার বাপু, সোজা বলে ফেল দিকি—মাছটি কোথায় রেখেছ?'

'মাছ আমি লুকোইনি, যেতে যেতে হাত থেকে কোথায় যে পড়ে গেল, দেখতে পেলুম না; আমি নিজেই খুঁজে মরছি।' বলিয়া যুবক এ দিক ও দিক ঝোপের ভিতর খুঁজিতে লাগিল। মহিমবাবু ধমক দিয়া উঠিলেন, 'খবরদার, আর এক পা এগিও না; যতক্ষণ না জায়গাটা আমি নিজে খুঁজে দেখছি, ততক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাক।' যুবক ফিরিয়া আসিল, এবং বোকার ন্যায় এরূপে এ দিক ও দিক তাকাইতে লাগিল, যেন মাছটি কোথাও হারাইয়া ফেলিয়াছে। হরেন আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না, প্রশ্ন করিল, 'কি

হে, হঠাৎ যে হাঁদা হয়ে গেলে? দিগ্বিদিক জ্ঞান হারাওনি ত? ডান দিক বাঁ দিক চিনতে পার?'

'কেন পারব না?' পরে বাম হস্ত দেখাইয়া—'এই দেখুন না—এই ডান হাত।'

'আর ওটা?'

মহিম।—কাজেই বাঁ হাত।

'প্রমাণ?'

'এটা বুঝ্‌লে না? বেটা যে নেঙ্গা।'

হরেন হাসিয়া উঠিল; পরে বন্ধুকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিল, 'There are more things in heaven and earth Hora—'

'কি হল আবার?'

'নড়ে কি হে ও দিকে? সাপটাপ না কি?'

'কই, কোথায়? হাঁ হে, সাপই বটে, তবে রকমারি সাপ।' পরে যুবকের দিকে ফিরিয়া কহিলেন, 'কি হে বাপু, এইবার?'

'আপনার বরাতে আছে, তাই পেয়ে গেলেন।'

'তোমার নামটি কি বল ত বাপু।'

সহসা কি মনে করিয়া যুবক ভয়ানক চটিয়া উঠিল; ক্রুদ্ধস্বরে কহিল, 'ভূতি লস্কর।'

'মালঞ্চার লস্করদের ছেলে তুমি?'

'হাঁ গো হাঁ, মালঞ্চার লস্করদের ছেলে।'

'হাঁ, আমি শুনেছি বটে, তারা না কি বেশ লোক। তা রাগো কেন বাপু? এখন বল দিকি, এটা নিয়ে কোথায় যাচ্ছিলে?'

'কোথায় যাবো আবার? চুলোয় যাচ্ছিলুম। এক ভদ্দরলোকের ওখানে দেবার কথা ছিল, তাই নিয়ে যাচ্ছিলুম।'

'কোন্ ভদ্রলোক?'

'দারোগা মহিমবাবু।'

'কে পাঠালে?'

'তাই বলে' আমি আদালত ঘর করে বেড়াই আর কি। আমাকে অত বোকা পাওনি।'

মহিমবাবু ক্ষণকাল কি ভাবিলেন, পরে কহিলেন, 'মহিমবাবুকে চেন?'

'আজ্ঞে, আজও ত চেনবার দরকার হয়নি।'

হরেন।—'চিনিয়ে দেব?'

'আজ্ঞে, মাফ্ করবেন—' মহিমবাবু বাধা দিয়া বলিলেন, 'ওহে, আমারই নাম মহিম মুখুজ্যে।'

যুবক কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল। 'কেমন করে' জানবো দারোগা মশাই? পেন্নাম।'

দুই বন্ধুতে তাহার ভাব দেখিয়া না হাসিয়া থাকিতে পারিলেন না। শেষে মহিমবাবু বলিলেন, 'আচ্ছা ভূতি, মাছটা নিয়ে আমার ওখানেই যাচ্ছিলে তো? তা বেশ—তাই যাও। আর বাড়ীতে বোলো, এটা যেন এবেলাই রান্না হয়।'

'আজ্ঞে, তা বলব, কিন্তু ধরুন যদি—'

'আবার কি?'

যুবক কি বলিতে যাইতেছিল, সহসা সামলাইয়া লইয়া বলিল, 'আজ্ঞে, এ বেলা কি আর যেতে পারব?—বড় ক্ষিধে লেগেচে, খেয়ে দেয়ে ও বেলা না হয়—'

'তার চেয়ে এক কাজ কর না? বাজারের ধার দিয়েই ত যাবে, এই দুয়ানীটা নাও, কিছু জল-টল খেয়ে জিরিয়ে-টিরিয়ে যেও। ভাল, আর এক কথা—বাড়ীতে বোলো, পাঁচ ছ' জন লোককে আজ খেতে বলেছি।'

'আজ্ঞে, তা বলব বৈ কি। তবে পেন্নাম হই দারোগা বাবু।'

২

'মহিম, তুই দারোগা হবার যোগ্য বটে।'

'এই করেই যে চুল পাকালুম দাদা, আমার কাছে উড়ে যাবে?'

'বেটা কি চালাক!'

'চালাক কি হে?—চাষার ছেলে ভদ্দর লোকদের সঙ্গে মিশে একটু ফাজিল হয়েছে। বেটাকে ভাল করেই শেখাতুম, তবে কি জান—'

'মাছটা নিয়ে যদি সরেই পড়ে, তা হলে কি করবে?'

মহিমবাবু ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, 'মধ্যে মধ্যে লস্কররা ভেট পাঠিয়ে থাকে। সেটা কি পাঁচ জনে জানে, না ওরা কাউকে বলে? ওই জন্যেই ও অত সাবধান হচ্ছিল, এ আর বুঝলে না?'

এমন সময় ভূতি লস্কর দৌড়িয়া আসিয়া কহিল, 'আপনার বাড়ীটা ঠিক চিনতে পারব কি করে'?'

'তা হলে আমার বাড়ীতে মাছটা নিয়ে যাচ্ছিলে কি করে?'

'আজ্ঞে, জিজ্ঞেস করে' করে' যাবো ভেবেছিলুম, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, যদি কেউ মিথ্যে কথা বলে ঠকিয়ে নেয়? তাই ভাবলুম, যখন আপনার সঙ্গে দেখা হল, তখন আপনার কাছ থেকেই বাসাটা জেনে নিই।'

'কেউ ঠকাবে না হে, কেউ ঠকাবে না। দারোগার জিনিস হজম করা সহজ নয়; সে সাহস কারো হবে না। জিজ্ঞেস করেই যেতে পারবে।'

'তা হলে বল্‌ব—বিকেলে পঞ্চাশ জন লোক খাবে।'

'বিকেলে নয় সকালে। পঞ্চাশ জন নয় পাঁচ ছ' জন। নাঃ—লস্করদের ছেলে এত হাঁদা—কাজ নেই, এই কাগজে লিখে দিলুম, এইটে দিও, তা হলেই হবে।'

ভূতি লস্কর বিদায় হইবার ঘন্টা দুই পরে দারোগাবাবু সবান্ধবে বাড়ী ফিরিলেন। সকলকে যথাযথ সমাদর করিয়া ডাক হাঁক আরম্ভ করিয়া দিলেন, 'ওরে রেজো, ও মাণ্‌কে, ভদ্দর লোকদের তামাক দিয়ে যানা রে। বসুন না বিজয়বাবু, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন?'

'তা যেন বসলুম; কিন্তু এ রকম করে যে এ তল্লাটে আর টেঁকা যায় না। তোমার আশাতে ছিলুম, কিন্তু তুমি—'

'চেষ্টার ত কিছু ত্রুটী করছি না; কিন্তু কি করি বলুন। আজও পর্য্যন্ত তার চেহারাখানাও একবার দেখতে পেলুম না; কোথায় থাকে, কি করে, সে সন্ধানও কেউ দিতে পারলে না। হয় ত সে আমাদের দলেরই এক জন হয়ে বেড়াচ্ছে। বেটা যেন Hidden Hand!'

'বহুরূপী হে, একেবারে বহুরূপী। বেটাকে সনাক্ত করা বড় শক্ত; অথচ এ অঞ্চলে এমন লোক নেই বললেই হয়, যিনি একবারও তার পাল্লায় পড়েন নি। অত কথার দরকার কি আমাদের; নৃপেনবাবু গো—আহা! বেচারী কি রকম নিরীহ লোক—সেবারে একটা চুরীর মামলায় পড়ে গিয়ে তিন শ' টাকা দণ্ড দিলেন। সেও আমাদের গোবর্দ্ধনের কৃপায়।'

'তাঁর অপরাধ?'

'তিনি নাকি পুলিসে রিপোর্ট করেছিলেন। যে কেউ বেটার পেছনে লেগেছে, কিছু না কিছু দণ্ড দিয়ে তবে রেহাই পেয়েছে। এটুকু ছেলে এমন—'

'এত দূর! আচ্ছা আমি একবার উঠে পড়ে লাগছি। এর একটা কিনারা

করে তবে ছাড়বো। বেটাকে একবার সামনে পেলে হয়; তা হলেই—বুঝলেন না—টুঁটী টিপে—'

'তুমি ত দাদা লাগবে, এ দিকে ক্ষুধাদেবী যে এক হাত লেগেছেন।'

হেমবাবু আর নীরব থাকিতে না পারিয়া বলিলেন, 'বল কি হরেন দা! তুমি না নির্জ্জলা একাদশী করবে বলেছিলে?'

'এখনই কোন না বলছি—দেখে নিও এক ফোঁটাও জল খাব না।'

'আচ্ছা, তা খাস্‌নে। এখন একটু সবুর কর। আমি একবার বাড়ীর ভেতর থেকে দেখে আসি কত দূর কি হল।'

মহিম বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেলে বিজয়বাবু বলিলেন, 'ওহে হরেন, তোমাদের শিকারটা যে বড় জবর দেখছি। বাবা, লুচি ভাজার যা গন্ধ বেরিয়েছে, এতে সিমলার 'দেবী রিকশ কুঠী'র লোকগুলোও দৌড়ে আসবে।'

'আপনি ত তা হলে বড্ড বললেন দেখছি। ঘ্রাণেই যদি অর্দ্ধভোজন হয়ে যায়, আসলে ত তা হলে ফাঁকী পড়তে—কি, কি হে মহিম, দেরী কত? ও কি, তোমার হাতে ওটা কি?'

মহিম একখানি পত্র হরেনের হস্তে দিলেন। হরেন পত্রখানি পড়িতে লাগিল—

'মা রেণু—

'এই মাছটা পাঠালুম। হরেন নাছোড়বান্দা; বোধ হয় পাঁচ ছয় জনে মিলে আজ সকালে হাজির হবে। যা হ'ক রেজোকে দিয়ে ভাল করে বন্দোবস্ত করে নিও। আমার ফিরতে বারোটা একটা হবে।

ইতি মহিম—

পুঃ—মনে করছি গোবরার ধারটা দিয়ে দেব। গোটা পঁচিশ টাকা লোকটার হাতে পাঠাবে। জানা লোক, সন্দেহের কারণ নেই। ইতি।'

সকলেই হাসিয়া উঠিলেন। হরেন কহিল, 'কি গো দারোগাবাবু, গোবর্দ্ধনকে চিনতে পারলে? তোমায় হাতের লেখাটি পর্য্যন্ত—'

শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

সহযোগী সাহিত্য।

জাতির সজীবতা।

'এসিয়ান রিভিউ' পত্রে 'বর্ত্তমান জাপান' সম্বন্ধে মার্কুইস ওকুমা যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, আমরা তাহার সারসংগ্রহ করিয়া দিলাম।—

ব্যষ্টির জীবনের অনেক লক্ষণ সমষ্টির জীবনেও স্বপ্রকাশ হইয়া থাকে। মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে যেমন কখনও সজীবতার, আবার কখনও বা অবসাদের লক্ষণ প্রকাশ পায়, তেমনই মানুষের সমাজগত বা জাতিগত জীবনে কখনও সজীবতার, আবার কখনও বা জীবন্মৃতের ভাব দেখা দেয়। ব্যষ্টির জীবনে যেমন সাংসারিক দুঃখ দৈন্য শোক তাপ হৃদয়ের সুকোমল বৃত্তিনিচয়কে অভিভূত করিয়া অবসাদ ও কর্ম্মে অলসতা আনিয়া দেয়, জাতির জীবনে তেমনই ভাবের দুঃখ দৈন্য মনের সংকীর্ণতা উৎপাদন করিয়া জাতিকে জীবন্মৃত করিয়া ফেলে।

উচ্চ আদর্শের অনুশীলনাভাব ভাবের অভাব। জাতির জীবনে ভাবের প্রবাহ যতই শুষ্ক হইতে থাকে, ততই জাতির মনোবৃত্তিগুলি সংকীর্ণ হইতে সংকীর্ণতর খাতে প্রবাহিত হয়; ফলে অতি মহান জাতিও গণ্ডীর পর গণ্ডী দিয়া ক্রমশঃ জীবনীশক্তির স্পন্দনসঞ্জাত উন্নতি-প্রবাহের পথ রুদ্ধ করিয়া ফেলে।

আজ ভারতবাসী হিন্দুরও ঠিক এই অবস্থা। ভারতবাসী হিন্দু অবসন্ন, জীবন্মৃত। ছিল দিন, যখন এই ভারতবাসীই 'আপনার গর্ব্বভরে শালতরুসম' উন্নত ছিল। কেবল পারত্রিক নহে, ঐহিক উন্নতিমার্গের পথে ভারতই পথপ্রদর্শক ছিল। আর এখন? কুমারী কবি তরু দত্তের ভাষায় বলিতে ইচ্ছা করে;—

> 'Head of the human column, thus
> Ever in swoon wilt thou remain ?
> Thought, freedom, truth, quenched ominous.
> Whence then shall Hope arise for us,
> Plunged in the darkness all again.'

হৃদয়ের মর্ম্মস্থল হইতে এই আর্ত্তনাদ উত্থিত হইয়াছে। এ অবসাদ হইতে ভারতের মুক্তির উপায় কি নাই? কবি বলিয়াছেন;—

> 'Our remedies oft in ourselves do lie,
> Which we ascribe to heaven ; the fated sky
> Gives us free scope ; only, doth backward pull
> Our slow designs, when we ourselves are dull.'

আবার যখন দৈব অনুকূল হইবে, তখন আমাদের অবসাদ দূরে যাইবে, আবার ভারত সজীব হইবে, আবার উষার কনককিরীট শিরে ধরিয়া বিদ্যা, লক্ষ্মী, শক্তি সিদ্ধি অঙ্কে লইয়া আমরা উন্নতির পথে অগ্রসর হইব,—এই আশা হৃদয়ে পোষণ করিলে কোনও কালে জাতির

সজীবতা আসিবে বলিয়া মনে হয় না। 'ন হি সুপ্তস্য সিংহস্য বিশন্তি বদনে মৃগাঃ।' জগতের উন্নতিশীল জাতিমাত্রই যে পথে অগ্রসর হইয়া অবসাদের হাত এড়াইয়াছে, সেই পথে আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে।

বর্ত্তমান উন্নতিশীল জাতিদের মধ্যে জাপান অন্যতম। জাপানের তুলনা প্রথমেই দিলাম, তাহার কারণ, জাপও আমাদের মত প্রাচ্য জাতি। কিছু দিন পূর্ব্বে এই জাপানই ভারতের মত 'অবসাদ-হিমে' ডুবিয়াছিল। সেই জাপান আজ পৃথিবীর প্রধান শক্তিসমূহের মধ্যে পরিগণিত কেন? ইহুদার আমরামের পুত্র মোসেস যেমন যাদুকরের জেলকীদণ্ডের ইঙ্গিতে লোহিত সমুদ্রের অগাধ জলরাশির মধ্যে নিপীড়িত ইহুদীগণের জন্য প্রশস্ত পাদচারণার পথ করিয়া দিয়াছিলেন, অথবা আরব্যোপন্যাসের আলাউদ্দীন যেমন অঙ্গুরীয় বা প্রদীপ ঘষিয়া জিনি দৈত্যের সাহায্যে নিমেষের মধ্যে বিশাল ও সুসজ্জিত প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিল, সেই ভাবে কি কেহ যাদুদণ্ডের অথবা জিনি পরীর সাহায্যে জাপানের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন-সাধন করিয়াছে? না, জাপানের নবজাগরণে যাদুদণ্ডের সম্পর্ক নাই, জিনি পরীর সম্বন্ধ নাই, জাপানবাসীই জাপানের এই অদ্ভুত পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছে। 'Our remedies oft in ourselves do lie' অর্থাৎ, 'আমাদের ক্রটীবিচ্যুতির সংশোধন আমাদের স্বহস্তেই রহিয়াছে', এই মহামূল্য বাণীর সার্থকতা জাপানবাসী আজ আপনাদের মহৎ কার্য্যে, আপনাদের জ্বলন্ত স্বার্থত্যাগে দেখাইয়াছে।

জাপানের মহামনীষী দেশহিতৈষী রাজনীতিক মার্কুইস ওকুমা জাপানের রাজধানী টোকিও হইতে প্রকাশিত 'এসিয়ান রিভিউ' নামক বিখ্যাত মাসিক পত্রে জাপানের এই আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহারই সার মর্ম্ম উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব, জাপান কোন্ যাদুমন্ত্রবলে অসম্ভবকেও সম্ভব করিয়াছে।

মার্কুইস ওকুমা ভারতের সহিত জাপানের তুলনা করিয়া বলিতেছেন,—'ভারত প্রকাণ্ড দেশ। ঐ দেশের সমস্ত জাতি যদি একতা-সূত্রে আবদ্ধ থাকিত, তাহা হইলে সমগ্র ইউরোপও সম্মিলিত হইয়া ভারতকে পরাস্ত ও ধূল্যবলুণ্ঠিত করিতে পারিত না। কিন্তু ভারতের দেশীয় রাজন্যগণের মধ্যে আত্মকলহের ফলে ইংরাজ একাকী এত বড় দেশটাকে জয় করিয়া অধীনতা-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়াছে। ইউরোপীয় সভ্যতা-বিস্তারের পথ রুদ্ধ করিতে না পারিয়া ভারতবর্ষ যে সময়ে এইরূপে পরপদানত হয়, তখন জাপানেরও ঠিক ভারতেরই মত অবস্থা ছিল।

জাপানও তখন জীবন্মৃত। জাপানের জাতীয় জীবনেও তখন কিছুমাত্র সজীবতা ছিল না। সেই সংকীর্ণতা, সেই দলাদলি, সেই জাতি বা সম্প্রদায় ভেদের অশাস্ত্রীয় গোঁড়ামি, সেই ব্রাহ্মণ শূদ্র বা সামুরাই সোগান ও সাধারণ জাপানীর ভেদবিচার,—সেই সবই জাপানে দেখা দিয়াছিল। সাধারণ জাপানীর সহিত সামুরাই-বংশীয়েরা এক সঙ্গে উঠা বসা করিলে, এক সঙ্গে স্কুলে পড়িলে, এক সঙ্গে রেলে জাহাজে ভ্রমণ করিলে সর্ব্বনাশ হইবে, এই ধারণা তখন জাপানবাসীর মনে বদ্ধমূল হইয়াছিল। সংকীর্ণতার ফলে যাহা হইয়া থাকে, গণ্ডীর গণ্ডী দেওয়ার ফলে যাহা হইয়া থাকে, জাপানেও তাহা হইয়াছিল। জাপানবাসী অন্তর্বিপ্লবের রক্তে স্নাত প্লাবিত হইয়া জগতে হেয়, নগণ্য ও দুর্ব্বল বলিয়া পরিগণিত হইতে লাগিল।

কিন্তু এক দিনে জাপানে অদ্ভুত পরিবর্ত্তন ঘটিল। জাপানের সামুরাই জাতি বা ক্ষাত্রশক্তিসম্পন্ন আভিজাত্যবংশীয়েরা দেশের দুর্দ্দশায় ব্যথিত চিন্তিত হইয়া এক দিনে বহু কাল যাবৎ উপভুক্ত অধিকার স্বত্বের স্বার্থ বিসর্জ্জন দিলেন। জগতের ইতিহাসে এই অপূর্ব্ব স্বার্থত্যাগের কথা সুবর্ণাক্ষরে চিত্রিত হইয়া থাকিবে। দেবতার মঙ্গলার্থে দধীচির অস্থিদান, শরণাগত কপোতের জন্য শিবির শরীরদান, অতিথির প্রীত্যর্থে কর্ণের পুত্রদান, অথবা আশ্রয়দাতার মঙ্গলার্থে কুন্তীর পুত্রদান মহৎ কার্য্য। এ সকল লোমহর্ষণ স্বার্থত্যাগের জ্বলন্ত দৃষ্টান্তের কথা শুনিলে হৃদয় প্রফুল্ল হয়, চিত্ত শুদ্ধ হয়, মন উন্নত হয়। কিন্তু জাতির মঙ্গলের জন্য, দেশের মঙ্গলের জন্য জাপ-সামুরাই সম্প্রদায়ের এই জ্বলন্ত স্বার্থত্যাগের দৃষ্টান্ত যে এই সমস্ত সাধু দৃষ্টান্ত অপেক্ষা কোনও অংশে হীন নহে, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। বরং আমাদের মনে হয়, ব্যক্তিগত স্বার্থত্যাগ অপেক্ষা একটা সমগ্র সম্প্রদায়ের এই সম্মিলিত স্বার্থত্যাগ ব্যাপার আরও কঠিন, আরও অধিক প্রশংসার্হ। এক জন ব্যক্তিগতভাবে স্বার্থ-ত্যাগের সঙ্কল্প স্থির করিতে যত বাধা বিঘ্ন বা অন্তরায় প্রাপ্ত হয়, একটা সমগ্র সম্প্রদায় সমষ্টিগতভাবে তাহা অপেক্ষা নিশ্চিতই অধিক বাধা বিঘ্ন প্রাপ্ত হয়। বহু কালের অধিকার-স্বত্ব-স্বার্থ সম্প্রদায়ের এক জন ত্যাগ করিতে কষ্ট বোধ নাও করিতে পারে, কিন্তু স্বার্থত্যাগ ব্যাপারে সম্প্রদায়ের সকলকে একমতাবলম্বী করিতে কত কষ্ট পাইতে হয়, তাহা সহজেই অনুমেয়।

জাপানের স্বদেশপ্রাণ মহাপুরুষগণ এক দিনে আভিজাত্য সম্প্রদায়ের প্রভাব দূর করিলেন, অন্ধ কুসংস্কার দূর করিয়া প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বিভিন্ন জ্ঞানালোকের মধ্যে ভাবসমন্বয়ের ব্যবস্থা করিলেন, অপর জাতির গুণোৎকর্ষ স্বীকার করিয়া সেই গুণের অনুশীলনে যত্নবান হইলেন, চীনের মত অপর জাতিকে 'foreign devil' বা বিদেশী ভূত বলিয়া অথবা আমাদের মত ভারতেতর জাতিকে ম্লেচ্ছ আখ্যা দিয়া ঘৃণায় মুখ বাঁকাইয়া অন্য শিক্ষার সংস্পর্শে আসিতে অপমান বোধ করিলেন না। জাপান-সম্রাটের অধীনে সকলেই এক হইয়া গেল, অথচ লোক-মত ও গণতন্ত্র ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত হইল, সঙ্গে সঙ্গে সকল দেশের সকল রকমের সুশিক্ষার দীক্ষা লাভ করিয়া মানুষের মধ্যে পরিগণিত হইতে, সজীব জাতিসমূহের মধ্যে পরিগণিত হইতে জাপানীরা বদ্ধপরিকর হইল।

জাপানে সংস্কার-ক্রিয়া অতি দ্রুতগতিই চলিল। অন্যায়-অধিকারমূলক সংকীর্ণ জাতি-ভেদ-প্রথা সমূলে উৎপাটিত হইল। ভূতপূর্ব্ব সোগান প্রিন্স টোকুগাবার পুত্রগণ ও সামুরাই সামন্তগণের পুত্রকন্যাগণ সাধারণ জাপানীর পুত্রকন্যাগণের সহিত একই স্কুলে পড়িতে লাগিল। ধনী নির্ধন নাই, রাজপুরুষ মজুর নাই,—সকলেই একই স্থানে বিদ্যাশিক্ষার অধিকার পাইল। এমন ভাবে আপামর সাধারণের মধ্যে ইতর-বিশেষ না করিয়া শিক্ষাদান ইংলণ্ড, ফ্রান্স, বা জার্ম্মাণীতেও হয় না; সুতরাং শিক্ষা সম্বন্ধে জাপানকে জগতে সর্ব্বাপেক্ষা 'ডেমোক্রাটিক' বলিতে হয়।

যে জাপানী এমন আশ্চর্য্য সংস্কার সাধন করিতে পারে, সে যে জগতের সকল সভ্য দেশের [illegible] শিখাইয়া লইবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি ?

জাপানীর দেশে পূর্ব্বে যে বিজ্ঞান, দর্শন, বা ব্যবহারশাস্ত্রের নামগন্ধও ছিল না, তাহাতে ব্যুৎপন্ন হইবার জাপানীর আশ্চর্য্য শক্তি আছে। সংস্কারের পরে জাপানী নূতন ভাবে শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হইয়া আশ্চর্য্যরূপে প্রতীচ্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানে ব্যুৎপন্ন হইয়া শক্তিসম্পন্ন হইয়াছে, এবং এক্ষণে প্রথম শ্রেণীর শক্তি বলিয়া পরিগণিত হইতেছে। জাপান যদি আজ দৈবের উপর সমস্ত কর্ত্তব্যের ভার ফেলিয়া দিয়া অলস জড়ের মত বসিয়া থাকিত, তাহা হইলে সেও আজ ভারতের ন্যায় পরমুখাপেক্ষী ও পরসেবাব্রতে ব্রতী হইয়া জগতে হেয় ঘৃণ্য জীবনযাপন করিত।

একবার মার্কুইস ওকুমার বর্ণিত জাপানের অতীত অবস্থার সহিত ভারতের বর্ত্তমান অবস্থার তুলনা করিয়া দেখ দেখি। শাস্ত্রনির্দ্দেশের অনুযায়ী জাতিভেদের ধারা এক, আর এখনকার গণ্ডীর ভিতর গণ্ডী দেওয়া জাতিভেদের ধারা এক। যে যুগে জ্ঞান ও বীরত্বের আদর ছিল, সে যুগে শূদ্রীগর্ভজাত বিদুরের মন্ত্রণা রাজসভায় সাদরে গৃহীত হইত, সূতের মুখে সহস্র সহস্র ঋষি তপস্বী ধর্ম্মকথার আলোচনা শুনিতেন, ধর্ম্মপালন কেবলমাত্র প্রাণহীন আচার অনুষ্ঠানে পর্য্যবসিত হয় নাই। জাপানের অবনতির দিনে যেমন জাতিভেদের বন্ধন জাতির শৌর্য্য বীর্য্য জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতিবিধানের অনুকূল না হইয়া কেবল মাত্র জাতিবিদ্বেষের ও পরস্পরের প্রতি ঈর্ষ্যা ঘৃণার উৎপত্তির কারণ হইয়াছিল, ভারতেও তেমনই হইয়াছে। জাপানী যেমন অপরের জ্ঞানালোক লইয়া আপনার দেশের জ্ঞানালোকের সহিত সামঞ্জস্য করিয়া অপরের শিক্ষায় ব্যুৎপন্ন হইবার আশ্চর্য্য ক্ষমতা ধারণ করে, ভারতবাসীর তেমনই বা তদপেক্ষা অধিক ক্ষমতা আছে। তবে ভারতবাসীর জাপানী সামুরাইয়ের মত অদ্ভুত স্বার্থত্যাগ করিবার ক্ষমতা নাই। ইহাই ভারতবাসীর জাতীয় জীবনের পরীক্ষায় বিফলতার প্রকৃষ্ট কারণ। যত দিন ভারতবাসী শাস্ত্রসঙ্গত জাতিবিভাগ মানিয়া অজ্ঞান-স্বার্থপরতা-প্রণোদিত জাতিবিদ্বেষ ভুলিয়া—'একবার শুধু ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ বৈশ্য শূদ্র ভুলে' দেশমাতৃকার পূজার এক মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে না শিখিবে, তত দিন ভারত যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকিবে। মার্কুইস ওকুমার জাপানের সম্বন্ধে ইঙ্গিতে এই কথাই বুঝিতে হয়। এখনকার দিনে অতি বড় গোঁড়া-নামধারী হিন্দুও নিজের মেয়েকে ইংরেজী স্কুলে পাঠাইতে দ্বিধা বোধ করেন না, অতি বড় গোঁড়া শাস্ত্রানুধ্যায়ী ব্রাহ্মণ ছেলেকে বি. এ. এম. এ. পাশ করাইতে ছাড়েন না, অতি নিরীহ টুলো পণ্ডিত রেলে ষ্টীমারে ছত্রিশ বর্ণের সহিত একত্র বিহার করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন না, অথচ এই কপট আভিজাত্যের অভিমান কেন? দেশের যাহারা মেরুদণ্ডস্বরূপ, সেই কৃষিব্যবসায়ী 'অন্ত্যজ' জাতিসমূহ যে ক্রমে 'পর' হইয়া যাইতেছে, ইহাও কি আমাদের দেখিবার অবকাশ নাই?

ব্যবসায়ে জাতিভেদ।

মিষ্টার আর্ণল্ড রাইট 'মাইসোর ইকনমিক জর্ণাল' পত্রে 'Economics in the West' নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,—

এ দেশের জাতিভেদ স্বায়ত্তশাসনাধিকার-প্রদানের পক্ষে প্রধান অন্তরায়,—'ভারতহিতৈষী'

এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ার মুখে যখন তখন এই কথা শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই শ্রেণীর সমালোচক পরের ছিদ্র অন্বেষণ করিবার সময় সহস্রাক্ষ হইয়া থাকেন বটে, কিন্তু নিজের ঘরের কথা আলোচনার সময় একবারে কাণা হইয়া পড়েন। ইঁহারা কি নিজের দেশের জাতির বেড়ার কথা শুনেন নাই? না, জানিয়া শুনিয়াও অজ্ঞতার ভাণ করিয়া থাকেন? ইঁহাদের দেশে আভিজাত্যবংশীয় ও সাধারণ গৃহস্থের মধ্যে অথবা ধনী মহাজন ও দরিদ্র শ্রমজীবীর মধ্যে দুর্ভেদ্য প্রাচীর কি নাই? আমাদের দেশে অতি বড় ধনবান রাজা রাজড়া বা জমীদার মহাজন স্বজাতীয় অতি দরিদ্রের ঘরেও বিবাহের সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারেন; ইঁহাদের সমাজে ঐ দুই শ্রেণীর মধ্যে বিবাহে আদান-প্রদান আছে কি?

আবার ইঁহাদের দেশে ব্যবসায় বাণিজ্যে যে বিষম জাতিভেদ আছে, তাহার দৃষ্টান্ত জগতে কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর। ইঁহাদের দেশে 'ট্রেড-ইউনিয়ান'গুলি শ্রমজীবিগণের মধ্যে যে ভাবে জাতিভেদপ্রথা চালাইতেছেন, তাহাতে এক শ্রেণীর শ্রমজীবীর প্রতি ঘোর অন্যায় অত্যাচার করা হইতেছে। এমন অত্যাচার আমাদের দেশে সামাজিক শাসনে হয় না। আমাদের দেশে সামাজিক শাসনে বড় জোর জাতি মারা যায়, সমাজে 'ঠেকো' করা যায়, ধোপা নাপিত বন্ধ করা যায়, কিন্তু ভাতে মারা যায় না। পাশ্চাত্য দেশের 'ট্রেড-ইউনিয়ান'রা অসংখ্য শ্রমজীবীকে ভাতে মারিতেছে। আবার যাহারা এই ট্রেড-ইউনিয়ানের কোপে পড়িয়া মারা যাইবার উপক্রম করিতেছে, তাহারা অবলা অসহায়া রমণী, এইটুকু আরও আশ্চর্য্যের কথা! হাণ্টার-কমিটীর সমক্ষে সাক্ষ্য দিবার সময়ে জেনারল ডায়ার বুক ফুলাইয়া বলিয়াছিলেন, 'In the west we hold women sacred'. পাশ্চাত্য দেশে রমণীকে কিরূপ পুণ্য পবিত্র ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখা হয়, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত বিবরণ হইতে জানা যাইতে পারে।

যুদ্ধের সময়ে বিলাতে যখন পুরুষগণ দলে দলে যুদ্ধে যাইতে থাকেন, তখন বাণিজ্য ব্যবসায়ে দারুণ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। তখন প্রায় আড়াই লক্ষ রমণীকে নানা শ্রম শিল্প ও ব্যবসায় বাণিজ্যে লাগাইয়া দেওয়া হয়। সে সময়ে রমণীরা বহু দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যেও নিযুক্ত হইয়াছিল। তাহারা আপন আপন কার্য্যে সকলের সন্তোষসাধন করিয়াছিল। বহু রমণী ঘরের সুখ ও স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া কেবল দেশের মঙ্গলের জন্য এই সকল কাজে যোগদান করিয়াছিল। সুতরাং সকলেই আশা করিয়াছিল যে, যুদ্ধান্তেও এই মহিলা শ্রমজীবীদের সম্বন্ধে সুবিচার করা হইবে, অর্থাৎ উহাদিগকে স্থায়িভাবে নিযুক্ত করা হইবে।

কিন্তু 'ট্রেড-ইউনিয়ান'গুলির চক্রান্তে সে আশায় ছাই পড়িল। তাহারা ব্যবসায়ে জাতিভেদ আনিয়া ফেলিল। পুরুষ শ্রমজীবীরই অধিকার আগে, এই মন্ত্রে অনুপ্রাণিত হইয়া তাহারা স্ত্রী-শ্রমজীবীদিগকে সমস্ত শ্রমশিল্প ও ব্যবসায় বাণিজ্য হইতে তাড়াইতে লাগিল। একটী মহিলা-শ্রমশিল্প-সমিতি হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে, সেই যুদ্ধকালের আড়াই লক্ষ স্ত্রী-শ্রমজীবী এক্ষণে মাত্র উন-আশী হাজারে দাঁড়াইয়াছে! ইহাও গত বৎসরের মে মাসের কথা। তাহার পর এক বৎসর পুরিতে চলিল। ইহার মধ্যে হাজার শতে দাঁড়াইয়াছে কি না, কে জানে?

স্ত্রী-জাতির মর্য্যাদাটা কেমন, একবার দেখুন। এই বিষয়ে লেখালেখি যথেষ্ট হই-

য়াছে। কোনও একটী কারখানার কর্ত্তৃপক্ষ উল্লিখিত মহিলা-সমিতিকে লিখিয়াছিলেন, 'যুদ্ধ স্থগিত হইবার কথাবার্ত্তা স্থির হইয়া যাইবার পর 'এঞ্জিনিয়ারগণের সম্মিলিত সমিতি'' আমাদিগকে স্ত্রী-কারিকরগণকে ছাড়াইয়া দিবার জন্য ভয়ঙ্কর পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল, কারণ, যুদ্ধের পূর্ব্বে আমরা ঐ সকল পদে কখনও স্ত্রীলোক নিযুক্ত করি নাই। আমাদের বিশ্বাস, এঞ্জিনিয়ার সমিতির এই সিদ্ধান্ত সমীচীন নহে, আমরা ইহার ঘোর প্রতিবাদ করিতেছি। কিন্তু আমাদের কোনও হাত নাই। আমরা ট্রেড-ইউনিয়ানসমূহের নিয়ম কানুন ও সিদ্ধান্ত মানিতে বাধ্য। যত দিন আমাদিগকে অনুমতি দেওয়া হইবে, তত দিন আমরা স্ত্রী-শ্রমজীবী নিযুক্ত করিতে থাকিব, কারণ, এযাবৎ তাহারা কার্য্যে আমাদিগকে পূর্ণ সন্তোষ প্রদান করিয়াছে। তাহাদিগকে আদর্শ করিয়া পুরুষ শ্রমজীবী কার্য্য করিলে শ্রমশিল্পের উন্নতি হয়, এ কথা আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি।'

কি অত্যাচার! কারখানাওয়ালারা স্ত্রী-শ্রমজীবীদিগকে রাখিতে চাহিতেছে, তাহাদের কার্য্যের ভূয়সী প্রশংসা করিতেছে, অথচ ব্যবসায়ের মোড়লেরা তাহাদিগকে বিনা দোষে 'একঘরে' করিতেছে। আমাদের পল্লীমণ্ডলেরা সামাজিক অপরাধীর ধোপা নাপিত বন্ধ করে বটে, কিন্তু বিলাতী ব্যবসায়ের মণ্ডলদের মত নিরপরাধ স্ত্রীলোককে ভাতে মারে না। প্রভেদ এইটুকু।

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু।

ভূমধ্যসাগরে।

৩০শে সেপ্টেম্বর আমাদিগকে 'মালোয়া' জাহাজে উঠিতে হইল বটে, কিন্তু পর দিন সকালেও জাহাজ ছাড়িল না। সকাল কাটিয়া মধ্যাহ্ন হইল—তাহার পর জাহাজ ছাড়িবার আয়োজন দেখা গেল। আমাদিগকে প্রমনোড ডেকে কুচকাওয়াজ করান হইল; এক এক দলকে এক একখানি ছোট নৌকা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইল। আমাদের কয় জনের বোটের নম্বর ৬। এই সব বোট জাহাজের পার্শ্বে ঝুলান থাকে। বোটে আহার্য্য ও পানীয় থাকে। যদি সহসা বিপদ ঘটে—জাহাজ ডুবিয়া যায়, তবে এই সব বোট নামাইয়া ভাসাইয়া দেওয়া হয়; নির্দ্দিষ্ট যাত্রীরা বোটে উঠিয়া বসেন। প্রত্যেক বোটে কয় জন করিয়া নাবিক দেওয়া হয়। তাহার পর—'অনন্ত সাগর মাঝে দাও তরী ভাসাইয়া।' যদি ভাগ্যক্রমে ভাসিতে ভাসিতে কোন জাহাজের কাছে আসিয়া পড়িয়া উদ্ধারের উপায় হয়। আমাদিগকে আরও উপদেশ দেওয়া হইল, সূর্য্যাস্ত হইতে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত কেহ জাহাজের মুক্ত স্থানে দেশলাই জ্বালিতে বা চুরুট টানিতে পারিবে না—পাছে শত্রুর জাহাজ দেখিতে পায়।

আর কখনও জাহাজ হইতে কোনও জিনিস জলে ফেলিবে না। জার্ম্মাণ সবমেরিণ জলের উপর কাগজের টুকরা বা দেশলাইয়ের বাক্স দেখিয়া জাহাজের সন্ধান করিয়াছে, এমনও জানা গিয়াছে।

বেলা সাড়ে তিনটার সময় জাহাজ ছাড়িল। খালের মধ্য দিয়া পোর্ট সইদ ছাড়াইয়া জাহাজ ভূমধ্যসাগরে পড়িল। জাহাজ সাগরে আসিবার পর প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল আমাদিগকে ডেকে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইল। কূলের কাছে 'মাইন' থাকে, তাহাতে ঠেকিলে জাহাজ নষ্ট হয়—সবমেরিণের ভয় ত আছেই। কাজেই এ সময় বড় সাবধান হইতে হয়। পাশাপাশি দুইখানি জাহাজ—'মালোয়া' ও 'কৈশর-ই-হিন্দ'; সম্মুখে একখানি ও দুই পার্শ্বে দুই-খানি জাপানী ডেষ্ট্রয়ার প্রহরী; উপরে এরোপ্লেন। সজ্জার কোনও ত্রুটী নাই। কিন্তু আশঙ্কারও অবধি নাই। যুদ্ধের সময় ইংরাজের বা ফরাসীর যে সব জাহাজ প্রাচী ও প্রতীচীতে গতায়াত করিয়াছে, জাপানের যুদ্ধ-জাহাজ-সমূহ সে সকল রক্ষা করিবার ভার লইয়াছিল। এই সময় মিত্রশক্তিদিগের মুখে জাপানী জাহাজের কর্ম্মচারীদিগের প্রশংসার আর অন্ত ছিল না। ট্যারণ্টো বন্দরে কোনও সৈনিক কর্ম্মচারী আমাদিগকে তাহাদের কর্ত্তব্যনিষ্ঠার একটি গল্প বলিয়াছিলেন। কোনও জাপানী ডেষ্ট্রয়ার একখানি ইংরাজ জাহাজের প্রহরী হইয়া আসিতেছিল। পথে জার্ম্মাণ সবমেরিণের আক্রমণে জাহাজখানি জলমগ্ন হয়। জাপানী ডেষ্ট্রয়ার সবমেরিণখানিকে আক্রমণ করিয়া নষ্ট করে। কিন্তু বৃটিশ জাহাজখানি রক্ষা করিতে পারেন নাই বলিয়া জাপানী তরীর কর্ম্মচারী এতই লজ্জিত হয়েন যে, বন্দরে উপনীত হইয়া তিনি এক ঘণ্টার ছুটী চাহেন—তিনি আত্মহত্যা (হারিকিরি) করিয়া লজ্জার হাত এড়াইবেন। বৃটিশ সৈনিক কর্ম্মচারীরা অনেক বুঝাইয়া তাঁহাকে নিরস্ত করিয়াছিলেন। ইহা গল্প কি সত্য ঘটনা, বলিতে পারি না, কিন্তু বৃটিশ কর্ম্মচারীরা যে জাপানীদিগকে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিতেন, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। তাহার কারণ, জাপান বলবান হইয়াছে। হেমচন্দ্র তাঁহার 'ভারত-সঙ্গীতে' জাপানকে 'অসভ্য জাপান' বলিয়াছিলেন। সে দিন আর নাই। তাই রুস যুদ্ধের পর এক জন জাপানী রাজনীতিক বলিয়াছিলেন, সভ্যতার স্বরূপ কি? সাত শত বৎসর হইতে জাপান জগতের নানা দেশে শিল্প পণ্য পাঠাইয়াছে, কিন্তু তাহার 'অসভ্য' অপবাদ ঘুচে নাই। আর রুস যুদ্ধে জয়ী জাপান নরহত্যায় নৈপুণ্য দেখাইয়াই প্রতীচ্য জগতে সভ্য বলিয়া

বিবেচিত হইয়াছে! জার্ম্মাণ যুদ্ধে জাপান যত লাভবান হইয়াছে, তত আর কেহই নহে। জাপান ধন জন ব্যয় করে নাই, পরন্তু ধন সঞ্চয় করিয়াছে—বল সঞ্চয় করিয়াছে, আর বাণিজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় করিয়াছে। যুদ্ধের সময় জার্ম্মাণ মালের আমদানী বন্ধ হওয়ায় জাপান সস্তা মালে ভারতের বাজার প্লাবিত করিয়া দিয়াছে। কিন্তু বাণিজ্যবিস্তারই যে জাপানের একমাত্র উদ্দেশ্য, তাহাও নিশ্চিত বলা যায় না।

যাইবার সময় জাহাজের পার্শ্বে কয়টী বড় বড় মাছ দেখা গেল। আমি আমার সঙ্গীদিগকে বলিলাম, 'বাঙ্গালায় বিশ্বাস—'মৎস্য-যাত্রা' শুভ।' এক জন বলিলেন, 'শুভই হউক, আর অশুভই হউক, যাত্রা ত আরম্ভ হইল। এখন যাহা হইবার হইবে।' এ কথা অদৃষ্টবাদী প্রাচ্যদেশবাসীর উপযুক্তই বটে। বাস্তবিক এই 'যদ্ভবিষ্য' ভাব আমাদিগের সকল কার্য্য কিরূপে নিয়ন্ত্রিত করে—ইহাতে আমাদের মানসিক ভাব কিরূপে গঠিত হইয়াছে, তাহার প্রমাণ আমি এই যাত্রায় যত পাইয়াছি, তত আর কোথাও পাই নাই। আমরা রণবিমুখ ভারতবাসী। কিন্তু প্রাণভয়ে আমরা যত অভিভূত হইতাম, ইউরোপীয়রা তদপেক্ষা অধিক অভিভূত হইতেন। যখন রাত্রির শেষে দিনের আলো কেবল ফুটিয়া উঠে—সমুদ্রের অন্ধকার জল গাঢ় ধূসর বর্ণ ধারণ করিয়া দিবালোকে দীপ্ত হইবার জন্য অপেক্ষা করে, সেই সূর্য্যোদয়পূর্ব্বকালে এবং দিনের আলোর পর রাত্রির অন্ধকার যখন কেবল জলের উপর ছড়াইয়া পড়িতে থাকে, সেই সূর্য্যাস্তপরবর্ত্তী রজনীমুখে সবমেরিণ লক্ষ্য করা দুষ্কর। সুতরাং সেই দুই সময়েই অধিক ভয়ের সম্ভাবনা। সে সময় প্রায় সব য়ুরোপীয় যাত্রী জাহাজের ডেকে আসিয়া উপনীত হইতেন—যদি জাহাজ ডুবে! আমরা কিন্তু ডেকে আসিবার জন্য অতটা ব্যস্ত হইতাম না। দুই দেশের জলবায়ুতে যেমন—মানব-প্রকৃতিতেও তেমনই প্রভূত প্রভেদ আছে। ইহকালসর্ব্বস্ব য়ুরোপীয়রা বিপজ্জনক ক্রীড়া ভালবাসে, শিকার করিতে জঙ্গলে প্রবেশ করে, সখ করিয়া বিমানে আরোহণ করে; কিন্তু কাহারও বসন্ত বা বিসূচিকা হইয়াছে শুনিলে সে দিকে যায় না। আমরা বিপজ্জনক কাজ সর্ব্বপ্রযত্নে পরিহার করি—যুদ্ধের নামে শিহরিয়া উঠি, কিন্তু আমাদের দেশেই—পরকালের জন্য সতী পতির চিতায় পুড়িয়া মরিয়াছেন—জননী পুত্রকন্যাকে গঙ্গাসাগরে বিসর্জ্জন করিয়া অশ্রুমোচন করিতে করিতে শূন্যহৃদয়ে শূন্যগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন—আজও লোক মৃত্যু আসন্ন বুঝিতে পারিলে আপনার 'গঙ্গাযাত্রা'র

আয়োজন করিতে বলেন। এই যে প্রভেদ, ইহা প্রকৃতিগত—দুই চারি পুরুষের শিক্ষাফলে ইহা দূর করা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না।

জাহাজ ভূমধ্যসাগরে অগ্রসর হইলে এরোপ্লেন ফিরিয়া গেল। আমি ডেক হইতে জাহাজের বৈঠকখানার দিকে চলিলাম। আমি আমার 'লাইফ বেল্ট'টি ডেকে আমার চেয়ারের উপর রাখিয়াছিলাম। আমি কয় পদ অগ্রসর হইলেই এক জন কর্ম্মচারী আসিয়া বলিলেন, 'আপনি আদেশ অতিক্রম করিতেছেন।' আহারে, বিহারে, শয়নে. উপবেশনে 'লাইফ বেল্ট' সঙ্গের সাথী—ত্যাগ করিলে অপরাধী হইতে হয়।

'মালোয়া' প্রসিদ্ধ পি. এণ্ড ও. কোম্পানীর বড় জাহাজ। তাহার সাজ-সজ্জা ভাল—বৈঠকখানা, খানাঘর সব সুসজ্জিত। বৈঠকখানাটি বিচিত্র চিত্রে সুন্দর—বসিবার আসনাদি মূল্যবান। জাহাজখানি বড় বলিয়া হেলে দুলে না—বোধ হয়, সেই জন্য আমার সামুদ্রিক পীড়া বা বিবমিষা অনুভূত হইল না। আমি বৈঠকখানায় বসিয়া খাতা খুলিয়া 'প্রত্যাবর্ত্তন' লিখিতে আরম্ভ করিলাম। প্রায় ২০ মিনিট লিখিয়াছি, এমন সময় সহসা শঙ্কাব্যঞ্জক ধ্বনি ধ্বনিত হইল। সে ধ্বনি শুনিবামাত্র সকলকে—যিনি যে অবস্থাতেই থাকুন—ডেকে আপন আপন নির্দ্দিষ্ট বোটের কাছে আসিয়া দাঁড়াইতে হয়। সকলে যে যাহার নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া দাঁড়াইলাম। কিন্তু কোনও আসন্ন বিপদের চিহ্ন দেখিতে পাইলাম না। জাহাজের কর্ম্মচারীরা ও সৈনিক কর্ম্মচারীরা পরিদর্শন করিয়া যাইবার পর আবার তূর্য্যনাদ হইল—আর দাঁড়াইয়া থাকিবার প্রয়োজন নাই। তখন বুঝা গেল, প্রথম বারের শঙ্কা-ব্যঞ্জক ধ্বনি—মিথ্যা; লোককে অভ্যস্ত রাখিবার জন্য মধ্যে মধ্যে এমন ধ্বনি করা হয়। তাহার পর যখন তখন এমন ধ্বনি ধ্বনিত হইত। নির্দ্দিষ্ট সময়ে জাহাজের ডেকে প্যারেড ত করিতেই হইত; তদ্ব্যতীত যখন তখন এইরূপ মিথ্যা ধ্বনি বা false alarm শুনা যাইত।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে সকলেই ডেকে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। য়ুরোপীয় যাত্রীরা কেবলই জাহাজডুবীর—সবমেরিণের গল্প করিতে লাগিলেন। বুঝা গেল, মুখে তাঁহারা যাহাই কেন বলুন না, মনে ভয় আছে।

সন্ধ্যার পর ডেকে আলো জ্বালা হইল না। উপরে আকাশ অন্ধকার—নিম্নে সাগর অন্ধকার—সেই অন্ধকারে অন্ধকার জাহাজ চলিতে লাগিল। জাহাজের সব কামরার গবাক্ষ সন্ধ্যা না হইতেই ধাতুনির্ম্মিত আবরণ দিয়া

রুদ্ধ করা হয়—দ্বারে ভারি পর্দ্দা—কোনও দিক হইতে আলো বাহির হইতে পায় না।

রাত্রিতেও মধ্যে মধ্যে শঙ্কাব্যঞ্জক ধ্বনি করা হয় শুনিয়া আমি প্রস্তাব করিলাম, অন্ধকারে ছুটাছুটি করিয়া ডেকে না আসিয়া ডেকেই ঘুমান ভাল। শেষে আমরা ভারতবাসী কয় জনই আহারের পর ডেকে আসিয়া আমাদের বোটের কাছে শয়ন করিলাম।

ডেকে শুইয়াছিলাম, কাজেই পর দিন প্রত্যুষে—দিবালোক বিকশিত হইতে না হইতে নিদ্রাভঙ্গ হইল। জাহাজে

'আমি কেহ না উঠিতে ত্যজিব শয়ন,
জাগিবে না ঊষা আগে।'

স্থির করা ভাল। য়ুরোপীয়রা সাধারণতঃ বেলায় শয্যাত্যাগ করেন; কাযেই প্রত্যুষে যাইলে স্নানের ঘর শূন্য পাওয়া যায়—নিশ্চিন্ত ভাবে স্নান করা চলে। আমি তাহাই করিতাম।

স্নান সারিয়া যখন ডেকে আসিলাম, তখন খালাসীরা ডেক ধৌত করিয়া গিয়াছে—ডেক শুকায় নাই; দুই চারি জন য়ুরোপীয় যাত্রী ঘুমাইবার পোষাকেই নগ্নপদে ভিজা ডেকের উপর পায়চারি করিতেছেন। অনেকের বিশ্বাস, সমুদ্রের লবণাক্ত জলে সিক্ত ডেকে নগ্নপদে ভ্রমণ করিলে স্বাস্থ্য ভাল থাকে। প্রতীচীতে এককালে নগ্নপদে ভ্রমণ বর্ব্বরতার পরিচায়ক বলিয়া বিবেচিত হইত। এখন আবার দেখিতে পাই, স্বাস্থ্যোন্নতির আশায় কেহ কেহ নগ্নপদে সমুদ্র-সৈকতে ভ্রমণ করেন।

বেলা হইলে দেখা গেল, আকাশ নীল—রবিকর উজ্জ্বল—সমুদ্র সুন্দর, জলের উপর তরঙ্গমালা গড়াইয়া গড়াইয়া আসিতেছে, তরঙ্গচূড়ায় ফেনের শ্বেত শোভা। সমুদ্র কামরূপ। কিন্তু বৈচিত্র্যের অভাবে জলযাত্রা অল্পকালমধ্যেই বিরক্তিকর হইয়া উঠে। সমুদ্রে গমনকালে লোকে আর একখানি জাহাজ, একটি জলচর বিহগ—এ সব কত আগ্রহসহকারে লক্ষ্য করে। কিন্তু এ সময় সাধারণতঃ জাহাজ বড় গতায়াত করে না। তবুও সময় সময় এক একখানি মালের জাহাজ দেখা যাইত। সে সব জাহাজ প্রায়ই পুরাতন। এক দিন সেইরূপ একখানি জাহাজ লক্ষ্য করিয়া এক জন সৈনিক আমাকে বলিয়াছিলেন, 'আমি ঐ সব বাণিজ্যতরীর লোকের সাহসের প্রশংসা করি। আমরা তিনখানি যুদ্ধের জাহাজ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া যাইতেছি। কিন্তু উহারা

অরক্ষিত অবস্থায় যাইতেছে। ঐ সব জাহাজই বৃটিশ বাণিজ্যের ভিত্তি।' তবে আজ কাল সে সব জাহাজও ক্যামোফ্লাজ বা বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত করা—দূর হইতে দেখিলে জাহাজের কোন্ দিক অগ্রভাগ—কোন্ দিক পশ্চাদ্ভাগ তাহা বুঝিতে পারা যায় না। যুদ্ধের সময় এই ক্যামোফ্লাজ করা খুবই প্রচলিত হইয়াছে।

অন্য সময় জাহাজে নানারূপ খেলা প্রভৃতিতে সময় কাটে—ক্রিকেট খেলা হয়, আবৃত্তি হয়। এখন সকলেই শঙ্কিত—এই অস্বাভাবিক আবহাওয়ায় আনন্দের কুসুম বিকশিত হইতে পারে না। মান্দ্রাজের 'হিন্দু'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত কস্তুরীরঙ্গ আয়াঙ্গার দাবা খেলায় ওস্তাদ—তিনি সময় সময় দাবার ছক লইয়া বসিতেন, কখনও কখনও এক বা দুই জন য়ুরোপীয় যাত্রী খেলিতে আসিতেন; কিন্তু দুই এক বাজি খেলিয়াই চলিয়া যাইতেন। তবে কেহই আয়াঙ্গার মহাশয়কে হারাইতে পারিতেন না। তিনি দিগ্বিজয়ী ছিলেন।

দুই দিন কাটিয়া গেল। এই দুই দিনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোনও ঘটনাই ঘটিল না। দিন রাত্রি জাহাজ সমানভাবে চলিতে লাগিল। সেই প্যারেড, সেই শঙ্কিত ভাব—সেও সমান চলিতে লাগিল। জাহাজে দুই জন ইটালিয়ান সৈনিকের সহিত ও এক জন বেলজিয়ান রাজকর্ম্মচারীর সহিত পরিচয় হইল। ইটালিয়ান সৈনিকদিগের বেশ ধূসর বর্ণের। দুই জনেই যুদ্ধক্ষেত্রে পীড়িত হইয়া স্বাস্থ্য লাভ করিবার জন্য মিশরে ছিলেন—এখন স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন, আবার সেনাদলে যোগ দিতে হইবে। বেলজিয়ান রাজকর্ম্মচারীটি বেলজিয়মের উপনিবেশে তূলার চাষের সুবিধা অসুবিধা বুঝিবার জন্য সরকার কর্ত্তৃক তথায় প্রেরিত হইয়াছিলেন। যুদ্ধ শেষ হইলেই বেলজিয়ম উপনিবেশে তূলার চাষের পত্তন করিবে। তিনি ভারতবর্ষ হইতে শ্রমজীবী লইয়া যাইবার কথার আলোচনা করিলেন। অবশ্য তিনি বলিলেন, ভারতবর্ষ হইতে শ্রমজীবীরা তথায় যাইলে বিশেষ লাভবান হইবে। আমাদের মুসলমান সঙ্গী মৌলবী সে প্রস্তাবে বিশেষ আগ্রহপ্রকাশও করিলেন। আমার কিন্তু কঙ্গোয় বেলজিয়মের অত্যাচার স্মরণ করিয়া সেই 'আকাশের চাঁদ হাতে পাইবার' প্রস্তাবে উৎসাহ সঞ্চার হইল না। বেলজিয়ম কঙ্গোয় প্রজাপীড়নে যে বর্ব্বরতার পরিচয় দিয়াছে, তাহা জার্ম্মাণীর বর্ব্বরতারই অনুরূপ। আমি তাঁহাকে সে কথা বলিলাম; আরও বলিলাম, আমরা ভারতবর্ষে শিল্প প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহি—বাণিজ্যের বিস্তারসাধন করিতে চাহি—সে জন্য ভারতেই শ্রমজীবীর প্রয়োজন। ভারত-

বাসীরা যে শ্রমজীবী হইয়া বিদেশে যাইয়া লাঞ্ছনা ভোগ করে, ইহা কোনও ভারত-বাসীরই অভিপ্রেত হইতে পারে না। দেশ হইতে শ্রমজীবীরা বিদেশে যাইলে দেশের কত ক্ষতি হয়, আয়ার্লণ্ডে তাহা বুঝা গিয়াছে। যাহারা শ্রমশীল—উৎসাহ-সম্পন্ন—উত্তমপূর্ণ, তাহারাই বিদেশে যায়। তাহারা দেশের সম্পদ; তাহাদের অভাবে দেশ দরিদ্র হয়। কারণ, তাহাদের শ্রম, উৎসাহ ও উত্তম দেশের উন্নতি-কর কার্য্যে প্রযুক্ত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। শ্রমবিমুখ, উৎসাহহীন, উত্তমশূন্য লোকের দ্বারা বিশেষ কাজ হয় না। আমার এ সব কথা বেলজিয়ানটির ভাল লাগিয়া-ছিল কি না সন্দেহ। তাঁহার ভাল লাগুক আর না লাগুক, ভারতবাসী যাহাতে স্বদেশে থাকিয়া পেটের ভাত ও পরণের কাপড় সংগ্রহ করিতে পারে, তাহার উপায় করাই ভারতবাসীর প্রধান কর্ত্তব্য। সেই সমস্যার সমাধান করিতে না পারিলে আমাদের জাতীয় জীবন বিপন্ন হইবে—বিদেশে শ্রমজীবীর কাজ করিতে যাইয়া লাঞ্ছনা ভোগ করিলে আমাদের জাতীয় আত্ম-সম্মান নষ্ট হইবে। আরবী ইরাকে অর্থাৎ মেসোপোটেমিয়ায় ভারতবাসীকে বসবাস করিতে দিবার প্রস্তাব হইয়াছে। কিন্তু দেশে কি আমাদের স্থানাভাব হইয়াছে? দেশের শিল্প বাণিজ্যের প্রসারবৃদ্ধি হইলে কি দেশেই দেশের লোকের অন্নসংস্থানোপায় হইতে পারে না? সুজলা বাঙ্গালার জনাকীর্ণ পল্লী জঙ্গল করিয়া বাঙ্গালী কি মেসোপোটেমিয়ার বারিহীন মরু দেশ শস্যশ্যামল করিতে যাইবে? তাহাই কি আমাদের নিয়তি?

৩রা অক্টোবর (১৬ই আশ্বিন) রাত্রিকালে একটু বৃষ্টি হইল। ডেকের উপর আমাদের গাত্রেও যে ছিটা ফোঁটা জল পড়িল না, এমন নহে। কিন্তু বালিশ ও কম্বল লইয়া অন্ধকারে পথ খুঁজিয়া কামরায় যাইতে ইচ্ছা হইল না। আমরা ডেকের উপরেই রহিলাম।

পর দিন সকালে ১১টার সময় জাহাজের প্রত্যেক কামান হইতে পাঁচটি করিয়া গোলা ছাড়া হইল। এখন যাত্রী-জাহাজেও কামান বসান হইয়াছে—দিবারাত্রি কামানের কাছে গোলন্দাজ দাঁড়াইয়া থাকে, সঙ্কেত পাইলেই গোলা ছাড়িবে। আমাদের জাহাজে হাউইট্জার কামান—দুই পার্শ্বে দুইটী, পশ্চাতে একটী। প্রত্যেক কামান হইতে পাঁচটি করিয়া গোলা ছাড়া হইল। কেন, বলিতে পারি না; বোধ হয়, অভ্যাস রাখিবার জন্য। 'ডেপ্থ্ চার্জ্জ' গোলা দেখিলাম। সমুদ্র যেন বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। ইহাতে জল এতই আলোড়িত হয় যে, জলের মধ্যে সবমেরিণ উল্টাইয়া যায়।

৫ই সকালে সূর্য্যোদয় হইলেই বুঝা গেল, আমরা কূলের কাছে আসিয়াছি। ঠিক সেই সময় একটি ঘটনা ঘটিল—সহসা জাহাজে বিপদব্যঞ্জক ধ্বনি ধ্বনিত হইল। আমরা যে যাহার নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইয়া দেখিলাম, 'কৈশর-ই-হিন্দ' জাহাজখানি দ্রুতবেগে আমাদের দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে বাম পার্শ্বে ঘুরিয়া আসিতেছে, এবং একখানি রণতরী বেগে যেন কোনও তরীর অনুসরণ করিতেছে। সকলেই উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিলাম। অল্পক্ষণ পরেই রণতরীখানি যথাস্থানে ফিরিয়া আসিল। শুনিলাম, একখানি সবমেরিণ দেখা গিয়াছিল।

বেলা আটটা বাজিলেই ট্যারণ্টো বন্দর দেখা গেল। বিপদসঙ্কুল ভূমধ্যসাগর অতিক্রম করিয়া ইটালীতে উপনীত হইলাম।

ট্যারণ্টো স্বাভাবিক—উৎকৃষ্ট বন্দর। বোধ হয়, ইটালীর এক প্রান্তে অবস্থিত বলিয়াই এই বন্দরে অধিক জাহাজ ভিড়ে না। এখন—যুদ্ধের সময় ইহা সামরিক প্রয়োজনে ব্যবহৃত হইতেছে। সমুদ্রকূলের কাছে আসিয়া সংকীর্ণ হইয়াছে—দুই ধার পোস্তা বাঁধান—পোস্তার পর গৃহ—মধ্যে সেতু, জাহাজ গতায়াতের সময় তুলিয়া দেওয়া হয়। তাহার পর—সংকীর্ণ অংশের পর আবার জলবিস্তার, সেই জলবিস্তারে এখন ফরাসী, ইংরাজ ও ইটালিয়ান বহু জাহাজ রহিয়াছে। যে স্থানে সমুদ্র সংকীর্ণ, সেই স্থানে কূলের উপর ইটালীর সরকারের আফিস—গৃহচূড়ায় ইটালীর পতাকা উড়িতেছে। আজ ইটালী ইংরাজের বন্ধু; তাই সেই গৃহের সম্মুখ দিয়া জাহাজ যাইবার সময় জাহাজের কর্ম্মচারী ও যাত্রী সকলেই টুপী খুলিয়া দাঁড়াইলেন। সেতু তুলিয়া দেওয়া হইল। জাহাজ তাহার পর ভিতরে প্রবেশ করিল, এবং কূলের কাছে যাইয়া নোঙ্গর করিল। তখন বেলা নয়টা।

কূলে একতলা গুদমের মত গৃহ—লম্বা লম্বা গৃহ—সামরিক প্রয়োজনে নির্ম্মিত, আর খাকী পোষাক পরা লোক। কূল হইতে সামরিক কর্ম্মচারীরা জাহাজে আসিলেন—আর সব যাত্রীর ফর্দ্দ মিলাইয়া তাঁহাদের নামিবার ব্যবস্থা হইল—জিনিসপত্রও নামান হইল। কিন্তু আমাদের কি ব্যবস্থা হইবে, কেহ বলিতে পারিলেন না। অথচ পর দিনই জাহাজ ফিরিয়া যাইবে! ক্রমে মধ্যাহ্ন অতীত হইয়া গেল; আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইল—বিন্দু বিন্দু বর্ষণও হইতে লাগিল। জাহাজের এক জন কর্ম্মচারী কূলে যাইতেছিলেন; আমরা তাঁহাকে দিয়া আর. টি. ও. (রেলওয়ে ট্রান্সপোর্ট অফিসার) মহাশয়কে সংবাদ দিলাম। সেই সংবাদ পাইয়া তাঁহার, বোধ হয়, আমাদের কথা মনে পড়িল। তিনি ছোট

ষ্টীমলঞ্চে ষ্টীমারে আসিয়া আমাদিগকে কূলে অবতরণ করিতে বলিলেন। একখানা খোলা ষ্টীম-বোটে আমাদের মাল নামান হইল। জালে মাল বাঁধিয়া ক্রেণ বা কপিকলে নামাইয়া দেওয়া হইল। জিনিসগুলা বৃষ্টিতে ভিজিতে লাগিল। আয়াঙ্গার মহাশয় বড় বড় বাক্সে চাটনীর বোতল বোঝাই করিয়া আনিয়াছিলেন—সে সব চূর্ণ হইয়া গেল।

আর. টি. ও. আমাদিগকে কোন্ জেটীতে নামিতে হইবে বলিয়া দিয়া যাত্রার আয়োজন করিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আমরা কোন্ ষ্টীমারে যাইব?' তিনি মালবাহী বোট দেখাইয়া দিলেন। আমি দেখিলাম, দড়ীর সিঁড়ি দিয়া নামিয়া সে বোটে যাইতে হইবে। আমি মিষ্টার স্যাণ্ডরককে বলিলাম, 'আমি ত সিঁড়ি দিয়া নামিতে পারিব না।' বিপুলবপু স্যাণ্ডরক বলিলেন, 'আমি যদি পারি, তবে আর কাহারও ভাবনার কারণ নাই।' আমি আর. টি. ও.কে সে কথা জানাইলে তিনি যাইয়া ষ্টীমলঞ্চ পাঠাইয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া চলিয়া গেলেন।

তিনি যাইয়া লঞ্চ পাঠাইয়া দিলে আমরা জাহাজ ত্যাগ করিলাম, এবং ট্যারণ্টোয়—ইটালীতে অবতীর্ণ হইলাম।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

ন্যায়রত্নের নিয়তি।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

রামদেবপুর ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম। গ্রামের অধিবাসিগণ প্রায় সকলেই কৃষক; কৃষিকর্ম্মই তাহাদের জীবিকার একমাত্র অবলম্বন,চাষ ভিন্ন তাহারা আর কোনও কর্ম্ম জানেও না, বোঝেও না। তাহারা প্রত্যহ প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিয়া প্রথমেই তাহাদের বলদগুলিকে সযত্নে খাইতে দেয়; তাহার পর একটু বেলা হইলে, পূর্ব্ব দিনের বাসি পান্তা যাহা ঘরে থাকে, তাহাই তেঁতুল ও লবণের সাহায্যে তৃপ্তিসহকারে ভোজন করিয়া, পায়ে পানাই ও মাথায় 'মাথাল' আঁটিয়া, বলদগুলির সহিত মিষ্ট আলাপ করিতে করিতে তাহাদিগকে লইয়া গ্রামপ্রান্তবর্ত্তী ক্ষেতের দিকে অগ্রসর হয়। তাহাদের স্কন্ধে লাঙ্গল, এক হাতে খড়ের বুঁদি, অগ্নিসংযোগে তাহা ধূমায়মান, অন্য হস্তে গেঁটে কল্‌কে শোভিত একটি খেলো হুঁকা। এই সর্ব্বসন্তাপহারী হুঁকাটিই তাহার কঠোর পরিশ্রমের

একমাত্র অবলম্বন ; এই জন্য দা-কাটা গৃহজাত তামাক ও বুঁদীর আগুন তাহার কার্য্যক্ষেত্রের অপরিহার্য্য সঙ্গী। ইহাই বাঙ্গালার কৃষকের প্রকৃত চিত্র। এই অশিক্ষিত উচ্চাভিলাষহীন দরিদ্র কৃষকেরাই সমাজের মেরুদণ্ড ; কিন্তু দুই শতাব্দী পূর্ব্বে তাহাদের অবস্থা যেরূপ ছিল, এখনও সেইরূপ আছে।

এই সকল কৃষকের স্ত্রীলোকেরা মোটা খাইয়া মোটা পরিয়া প্রসন্ন মনে দিবারাত্রি যেরূপ কঠোর পরিশ্রম করে, তাহারা যত অল্পে সন্তুষ্ট, পৃথিবীর কোনও দেশে তাহার তুলনা মিলে কি না, জানি না। রাত্রি এক প্রহর থাকিতে তাহারা শয্যাত্যাগ করিয়া গৃহকর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, ধান ভানে, চিঁড়া কোটে, মুড়ি ভাজে। রাত্রিশেষে ঢেঁকির শব্দে সমগ্র পল্লী প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে। তাহার পর উষালোকে পূর্ব্বাকাশ সুরঞ্জিত হইলে তাহারা বাহিরের কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় ; গোয়াল পরিষ্কার করে ; কেহ কেহ তাহাদের কুটীরের প্রাচীরের পশ্চাতে গোবরের 'চাপড়ী' দেয়, কারণ, কৃষকপত্নীরা তাহা শুকাইয়া ইন্ধনস্বরূপ ব্যবহার করে। কেহ গৃহের সঙ্কীর্ণ আঙ্গিনাখানিতে ছড়া ঝাঁট দেয়, মা-লক্ষ্মীর মন্দিরতুল্য পবিত্র গোলাগুলির সম্মুখভাগ গোময়াম্বুলিপ্ত করে, ঘর নিকায়, তাহার পর তুষের আগুনে ধান সিদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হয়। তাহাদের পরিধানে জোলার তাঁতে নির্ম্মিত মোটা কাপড়। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময় ম্যাঞ্চেষ্টারের তাঁতীরা বস্ত্র দ্বারা তাহাদের লজ্জা নিবারণ করিত না। চরকার সুতায় জোলার কাপড় হইত, সে সকল কাপড় পুরাতন হইলেও ছিঁড়িতে জানিত না, এবং কোনও দিন ধোপার বাড়ী পাঠাইবার আবশ্যক হইত না, কৃষকরমণীরা মলিন বস্ত্রগুলি ক্ষারে সিদ্ধ করিয়া কোনও জলাশয়ে কাচিয়া আনিত। যে সকল কৃষকের অবস্থা একটু সচ্ছল, তাহাদের স্ত্রী কন্যারা কাঁসা পিতলের দুই একখানি অলঙ্কার পরিত ; কাহারও ভাগ্যে রূপার পৈঁছা বা মর্দ্দানা জুটিলে সে আপনাকে মহা ভাগ্যবতী মনে করিত। ইহাতে তাহারা যে সুখ ও আনন্দ পাইত, লক্ষপতির প্রাসাদে বিলাসের অসংখ্য উপকরণের মধ্যে তাহা নাই।

সংসারের সকল কাজ শেষ হইলে কৃষকরমণীগণ গ্রামপ্রান্তবাহিনী নদী বা বিলের ঘাটে উপস্থিত হয় ; সেখানে গ্রামস্থ অধিকাংশ গৃহস্থবধূর সমাগম হওয়ায় তাহারা সকলে মিলিয়া সাংসারিক সুখ দুঃখের কথার আলোচনা করে, মুখে গল্প চলে বটে, কিন্তু সেখানেও হাতের বিরাম নাই। কেহ ক্ষার-সিদ্ধ কাপড় কাঠের পিড়ির উপর আছড়াইয়া কাচিতে থাকে, কেহ বালি দিয়া

বাসন মাজে, কেহ কাহারও মাথা ঘষিয়া দেয়, সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের গল্প চলে, স্বামীর কথা, ছেলেমেয়ের কথা, রন্ধনের কথা—সে সকল আলোচনার সহিত বহির্জগতের কোনও সম্বন্ধ নাই, তাহাদের ক্ষুদ্র পল্লী ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিবারের সঙ্কীর্ণ সীমায় তাহাদের গল্পের সমস্ত উপাদান নিহিত। এই ক্ষুদ্র পল্লীই তাহাদের নিকট সমগ্র পৃথিবী। কোনও ভিন্ন গ্রামে কাহারও পুত্র কন্যার বিবাহ হইলে তাহারা সেই গ্রাম সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা জানে মাত্র। কিন্তু সেই সকল গ্রামও তাহাদের বাসপল্লী হইতে দুই চারি ক্রোশ মাত্র দূরে অবস্থিত।

স্নানান্তে কৃষকরমণীরা জলপূর্ণ কলসী কক্ষে লইয়া অন্য হাত দুলাইতে দুলাইতে সারি বাঁধিয়া ঘরে ফিরিয়া আসে। তাহাদের মধ্যে অবরোধপ্রথার তেমন আদর নাই; যুবতীরা অপরিচিত বা নিঃসম্পর্কীয় লোকের সম্মুখে যাইতে কুণ্ঠিত হয় বটে, কিন্তু বর্ষীয়সী কৃষকপত্নী'রা মধ্যাহ্নে স্বামী পুত্রের জন্য তাহাদের কৃষিক্ষেত্রে জলখাবার লইয়া যায়, এবং তাহাদের স্বামী পুত্রেরা মাঠের কাজ শেষ করিয়া বেলা তৃতীয় প্রহরে গৃহে প্রত্যাগমন করিলে তাহাদিগকে পরিতোষসহকারে আহার করায়, অন্নব্যঞ্জনাদি পরিবেশনান্তে তাহাদের কাছে বসিয়া ভোজন লক্ষ্য করে; মোটা চাউলের লাল ভাত তাহাদের খাদ্য, ভাতের উপকরণও যৎসামান্য; কিন্তু আহার করিতে করিতে যদি তাহারা কোনও তরকারীর প্রশংসা করে—তাহা হইলে এই সকল কৃষকরমণীর মনে আর আনন্দ ধরে না। এই জন্যই বোধ হয় কোনও কৃষকপরিবারের আতিথেয়তায় মুগ্ধ হইয়া এক জন দিগ্বিজয়ী সম্রাট বলিয়াছিলেন, 'যদি পৃথিবীতে কোথাও সুখ ও সন্তোষ থাকে, তবে এইখানেই আছে।'

গৃহস্থালীর কাজ শেষ হইলে অপরাহ্নেও এই সকল কৃষকরমণী আলস্যে সময় কাটায় না; তাহারা কেহ কাঁথা শেলাই করে, কেহ জাঁতায় গম পেষে, চাকিতে অড়হর বা ছোলা ভাঙ্গিয়া ডাল প্রস্তুত করে, কেহ চরকার কাছে বসিয়া 'ঘেনর ঘেনর' শব্দে সূতা কাটিতে আরম্ভ করে। উদয়াস্ত সমস্ত দিনের মধ্যে তাহাদের বিরাম বিশ্রাম নাই, আলস্য বা ঔদাস্য কাহাকে বলে, তাহা তাহারা জানে না। কাজ লইয়াই তাহারা সুখী, কাজের অভাবই তাহাদের অসুখের কারণ। রোগ হইলে যতক্ষণ তাহারা অভিভূত হইয়া না পড়ে, ততক্ষণ তাহারা কাজ না করিয়া স্থির থাকিতে পারে না, এবং যখন একেবারে 'নাতান' হইয়া পড়ে, তখন রোগের যন্ত্রণা অপেক্ষা তাহারা যে খাটিতে পারিতেছে না, এই কষ্টই তাহাদের অধিকতর মর্ম্মান্তিক হয়। সংসারের সেবাই তাহাদের জীবনের ব্রত।

এই সকল দরিদ্র কৃষকের বাড়ী ঘরগুলিই বা কেমন পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন। ঘরের মেঝে হইতে গৃহপ্রাঙ্গণ পর্য্যন্ত ঝর ঝর করিতেছে। প্রায় সকল গৃহস্থের বাড়ীতেই তাহাদের অবস্থানুযায়ী ধান ও অন্যান্য শস্যপূর্ণ দুই চারিটী গোলা আছে। গোলায় খড়ের চাল, বাঁশের বাখারি ও চাটাইয়ে নির্ম্মিত এই সকল গোলার অভ্যন্তরভাগ গোময়মিশ্রিত মৃত্তিকা দ্বারা অনুলিপ্ত। গোলার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বারে সিন্দূর চন্দনের ফোঁটা শোভা পাইতেছে। প্রত্যেক গৃহস্থের গৃহের অদূরে শাক শব্জীর এক একটি বেড়। তাহার ভিতর দুই চারি ঝাড় কলাগাছ আছে। যখনকার যে শাক, তাহা বেড়ের একাংশে প্রচুরপরিমাণে জন্মিয়াছে, আঙ্গিনার এক পাশে পাতকুয়া, প্রত্যহ অপরাহ্ণে তাহা হইতে জল তুলিয়া শাকের ক্ষেতে ঢালিয়া দেয়, বেড়ার কোথাও দুই চারিটী বেগুন গাছ, কোথাও এক সারি 'আকাশ-মরিচে'র গাছ, সবুজ পাতার ভিতর হইতে পাকা মরিচগুলি হিঙ্গুলের মত বর্ণ বিকাশ করিতেছে। কোথাও একটি বাঁশের মাচা, লাউ গাছ উঠিয়াছে, ছোট বড় লাউগুলি মাচার নীচে ঝুলিতেছে, সাদা সাদা ফুলে গাছ ভরিয়া গিয়াছে। ঘরের কোণে কঞ্চিতে ভর করিয়া পুঁই গাছ ঘরের চালে উঠিয়াছে। তাহার লতায় পাতায় ঘরের চাল ঢাকিয়া গিয়াছে। কাহারও ঘরের কাণাচে এক ঝাড় বাঁশ। বায়ু প্রবাহে বাঁশগুলি আন্দোলিত হইয়া 'ফর ফর' শব্দ করিতেছে। আঙ্গিনার এক পাশে গাঁদা, সন্ধ্যামণি, বা অতসীর ফুল ফুটিয়া চারি দিক আলো করিয়া রাখিয়াছে।

গ্রামে বাজার নাই। সপ্তাহে এক দিন মাত্র জমীদারের কাছারীবাড়ীর সম্মুখে সামান্য একটা হাট বসে। গ্রামে হাট বাজার না থাকায় গ্রামবাসীরা বিশেষ কোনও অসুবিধা বা অভাব বুঝিতে পারে না। প্রায় সকলেরই ক্ষেতে ধান হয়। মুগ, কলাই সকল ক্ষেত্রে উৎপন্ন না হইলেও, অড়হর, ছোলা, মশুর, শর্ষপ, মশিনা প্রভৃতি ডাল ও তৈলের 'খন্দ' এবং গোধুম ও যব সকলেই অল্পাধিক-পরিমাণে উৎপন্ন করে, সুতরাং ডাল ও তৈলের জন্য তাহাদিগকে মুদীর দ্বারস্থ হইতে হয় না। বাড়ীর 'বেড়ে' সময়োপযোগী শাক শব্জী উৎপন্ন হয়। ক্ষেতে যে কাপাসের তুলা উৎপন্ন হয়, কৃষকরমণীরা তাহা চরকায় কাটিয়া সূতা প্রস্তুত করে, এবং সেই সূতা জোলাদের দিয়া পরিধেয় বস্ত্র ও গামছা প্রস্তুত করাইয়া লয়, পারিশ্রমিক অর্থের বিনিময়ে তাহারা কৃষকদের নিকট ধান ও অন্যান্য 'খন্দ' গ্রহণ করে। এইরূপে সংসারযাত্রা-নির্ব্বাহের জন্য যাহা কিছু আবশ্যক, সমস্তই তাহাদের ক্ষেতে উৎপন্ন হয়। হাট হইতে লবণ সংগ্রহ করিয়াই তাহারা নিশ্চিন্ত;

মৎস্যকে তাহারা অন্নের অপরিহার্য্য উপকরণ মনে করে না। যে দিন গ্রামান্তর হইতে জেলেনীরা নিকটবর্ত্তী নদী বা বিলের চিংড়ী, পুঁটি, ময়া (মৌরুল্লা) বা ট্যাংরা মাছ বিক্রয় করিতে আসে, সে দিন কৃষকরমণীরা আধ পালি ধান বা ছোলার বিনিময়ে তাহাই ক্রয় করে, এবং সেই বিশেষ দিনটিতে তাহাদের স্বামী পুত্রের ভোজন মহাসমারোহে সম্পন্ন হইল মনে করে। সকলের গৃহেই দুই একটী দুগ্ধবতী গাভী আছে, তাহার দুগ্ধে ছেলেদের, এমন কি, ছেলের বাপেদেরও 'ধাত রক্ষা' হয়। এই সকল কারণে সে কালে যখন পল্লীরমণীগণ গৃহকার্য্যের অবসানে 'পিঁড়ে'য় বসিয়া নিশ্চিন্তমনে চরকা কাটিত, তখন কি সুগভীর সুখ ও শান্তিতে পূর্ণ হইয়া চরকার একঘেয়ে শব্দের সহিত সুর মিলাইয়া তাহারা ছড়া কাটিত—

'চরকা আমার সোয়ামী পুত, চরকা আমার নাতি,
চরকার দৌলতে আমার দুয়োরে বাঁধা হাতী!'

'দুয়োরে হাতী বাঁধা' বিপুল ঐশ্বর্য্যের নিদর্শন, রাজা বা বড় বড় জমীদার ভিন্ন সাধারণ লোকের দরজায় হাতী বাঁধা থাকে না। কিন্তু যাহাদের মন অনাবশ্যক অভাবের ভারে প্রপীড়িত নহে, স্ব স্ব অবস্থায় যাহারা সন্তুষ্ট, তাহাদের সেই সন্তোষ ও প্রীতি দুয়ারে হাতী বাঁধিয়াও অনেকের বিস্তর তপস্যার ফল বলিয়া মনে করিবার কারণ আছে।

ক্রয় বিক্রয়ের প্রণালীর কথা শুনিয়াই আমাদের এ কালের সহরবাসী পল্লীচরিত্রানভিজ্ঞ পাঠকপাঠিকাগণ বুঝিয়াছেন, গৃহস্থদের কাহারও কোনও দ্রব্য ক্রয়ের প্রয়োজন হইলে মূল্যস্বরূপ ধান্য বা অন্য কোনও শস্য প্রদান করে। আবার অনেকে পরস্পরকে ধান্যের পরিবর্ত্তে কলাই বা গোধূম দিয়া, কেহ বা গোধূম বা ছোলার পরিবর্ত্তে শর্ষপ, মসিনা বা তুলা দিয়া স্ব স্ব অভাব পূর্ণ করে। সুতরাং কোনও কৃষকের ক্ষেত্রে তাহার আবশ্যকানুযায়ী শস্য উৎপন্ন না হইলেও তাহার অভাবে তাহাকে অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না। কেবল ইহাই নহে, ছুতার লাঙ্গল বা কামার লাঙ্গলের ফাল, বিদে, কোঁদলি প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া দিয়া নগদ মূল্যের পরিবর্ত্তে মজুরীস্বরূপ ধান ও অন্যান্য শস্য পাইয়া থাকে, প্রত্যেক লাঙ্গলের জন্য বা লাঙ্গলের ফালের জন্য কি পরিমাণ শস্য দিতে হইবে, তাহারও নিয়ম আছে। অনেক কৃষক কামার বা ছুতারকে দিয়া কাজ করাইয়া লইয়া তখনই তাহার প্রাপ্য পরিশোধ করে না। কামার কুমারেরা সংবৎসর ধরিয়া তাহাদের কাজ করিয়া দেয়, নূতন শস্য উৎপন্ন হইলে

তাহারা বস্তা বোঝাই করিয়া তাহাদের বার্ষিক প্রাপ্য লইয়া আসে। টাকা পয়সার মুখ তাহারা কদাচিৎ দেখিতে পায়। একটী মোহর আমাদের পক্ষে যেরূপ আদরের সামগ্রী—একটী টাকাও তাহাদের নিকট সেইরূপ। এমন কি, মজুরেরা ফসল কাটিয়া বা বেড় বাতাড় বাঁধিয়া নগদ পয়সায় মজুরী পায় না, তাহারা 'ধানে খন্দে' তাহাদের মজুরী আদায় করে। কিন্তু অধিকাংশ স্থলে মজুরেরও তেমন দরকার হয় না, দুই চারি ঘর চাষা এক যোগে পর্য্যায়-ক্রমে পরস্পরের জমী চষিয়া দেয়, এই ভাবে তাহারা ধান নিড়ায়, পাকা ধান কাটে। তাহারা পরস্পরের সাহায্যে বিপদ সঙ্কট হইতেই উদ্ধার লাভ করে, এরূপ নহে, এই উপায়ে তাহারা সাংসারিক সকল কার্য্যই সুসম্পন্ন করিয়া থাকে। এই প্রকার 'অদলে বদলে' কাজ চালাইবার নিয়ম ও পদ্ধতি প্রচলিত থাকায় গ্রামস্থ সকল লোক পরস্পরের সহিত সখ্যতা-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করে। সকলেরই হৃদয় যেন এক সূত্রে বাঁধা; যে উন্মার্গগামী হতভাগ্য গ্রামবাসী কর্ম্মদোষে সেই একতাসূত্র হইতে বিচ্ছিন্ন হয়, সে গ্রামস্থ অন্য সকলের সহানুভূতি ও সহায়তায় বঞ্চিত হইয়া নিঃসঙ্গ বনবাসের ক্লেশ অনুভব করে, এবং উপায়ান্তর না দেখিয়া অবশেষে বিদ্রোহী ভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক গ্রামবাসীদের শরণাপন্ন হয়। কিন্তু সে বিনা দণ্ডে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে না; তাহার অপরাধের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ তাহাকে যথাসাধ্য ভোজের আয়োজন করিতে হয়। গ্রামস্থ যে সকল লোকের সহিত তাহার কোনও না কোনও পুরুষের একটু সম্বন্ধ আছে, তাহারা সকলেই এই ভোজ উপলক্ষে স্ত্রী পুরুষ সকলে মিলিয়া তাহার গৃহে উপস্থিত হয়; সেই সময় গ্রামস্থ কাহারও গৃহে ভিন্ন গ্রামের কোনও কুটুম্ব উপস্থিত থাকিলে সে-ও তাহার গৃহে পরম সমাদরে আহূত হয়, এবং সকলে প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়া তাহার কার্য্যোদ্ধার করে। মনে হয়, তাহার গৃহে প্রীতির বারোয়ারি উৎসব আরম্ভ হইয়াছে।

গ্রামে বিদ্যাচর্চ্চা নাই। কৃষিবিদ্যা ভিন্ন কেবল দুই প্রকার বিদ্যাকে তাহারা আমোল দেয়। একটী বিদ্যা কাষ্ঠশিল্পসম্বন্ধীয়—যাহার সাহায্যে লাঙ্গল, ঢেঁকি, গরুর গাড়ীর চাকা ও 'ধুরো' প্রভৃতি প্রস্তুত হয়; অন্য বিদ্যা লৌহশিল্পসম্বন্ধীয়—যাহা লাঙ্গলের ফাল, কোদালী, নিড়ানী, কাস্তে, দা প্রভৃতি নির্ম্মাণের জন্য অপরিহার্য্য। তাহারা জানে, এই দুই বিদ্যা না থাকিলে কৃষিকার্য্য অচল হয়। অন্যান্য বিদ্যার আলোচনা তাহারা আদৌ আবশ্যক মনে করে না। কারণ,

রামদেবপুরের গোমস্তা হীরু মণ্ডলের মত 'বিদ্যেন' হইয়া দুই হাতে ঘুষ লওয়া ভিন্ন অন্য কোনও লাভ আছে—ইহা তাহাদের ধারণা করিবারও শক্তি নাই। আধুনিক ভদ্রসমাজে যাঁহারা শিক্ষিতাভিমানী, তাঁহাদেরই বা সে শক্তি কোথায়? আমরাও কি অর্থোপার্জ্জনকেই বিদ্যাশিক্ষার মূল উদ্দেশ্য বলিয়া গ্রহণ করিতেছি না? এই জন্যই এখন বি. এ. পাশের মূল্য কুলিগিরির মজুরী অপেক্ষা কমিয়াছে দেখিয়া হাহাকার রবে দিঙমণ্ডল পূর্ণ করিতেছি।

কিন্তু বিদ্যা যখন আমাদের অহঙ্কারের জয়ঢাক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধির বোঝা মাত্র না হইয়া কন্যাদায়গ্রস্ত হতভাগ্যের চক্ষুজল মুছাইতে পারিবে, স্বদেশের কল্যাণ ও উন্নতিসাধনে নিয়োজিত হইবে, তখনই তাহা সার্থক হইবে। নূতন যুগে যদি সে সময় আসে!

কিন্তু এ সকল চিন্তা গ্রাম্য চাষাদের মাথায় কেন, তাহাদের বিস্ময়োৎপাদক, বিদ্যার জাহাজ হীরু মণ্ডলের মস্তিষ্কেও উদিত হইবার আশঙ্কা নাই। সুতরাং চাষারা নিশ্চিন্তমনে চাষ করে, অন্য লোকে পৈতৃক পেশা অনুসারে নিজের কাজ করে। ছেলেরা গরু চরায়, বাঁশি বাজায়, এবং মেঠো সুরে—

'সুমৃষ্ট ফল খাও রে কৃষ্ট, আমি—এনেছি—ই—ই'

বলিয়া মাঠ কাঁপাইয়া গান করে; হাতের 'পাচন'কে 'এড়ো' করিয়া মাঠের আমবাগানে আম পাড়ে, তেঁতুল পাড়ে, পাকা কৎবেল পাড়িয়া ভাঙ্গিয়া খায়। তবে ব্রজের রাখালের মত গোপনারীর কলসী ভাঙ্গিতে শেখে না। হেঁড়েডুডু, দাণ্ডাগুলি প্রভৃতি খেলায় পরমানন্দে তাহাদের মধ্যাহ্ন অতিবাহিত হয়। রৌদ্রে তাহারা অবসন্ন হয় না, শীতেও কাতর হয় না। মুক্ত প্রান্তরের নির্ম্মল বায়ু তাহাদের দেহে নবজীবনের হিল্লোল বহিয়া আনে। এই সকল বালক বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া লাঙ্গল ধরিতে শিখিলেই তাহাদের পিতা মাতা মনে করে, 'ছেলে লায়েক হয়েছে!' ভদ্রলোকের ছেলেরা বি. এ. পাশ করিয়াও পিতার গলগ্রহ হইয়া থাকিতে লজ্জা বোধ করিতেছে না, কিন্তু চাষাদের বার তের বছরের ছেলে তাহাদের কৃষিকার্য্যের প্রধান সহায়। কৃষকযুবকেরা কঠোর পরিশ্রমের পর অপরাহ্নে স্থানে স্থানে দলবদ্ধ হইয়া তামাক খায় ও গল্প আরম্ভ করে। আমাদের দুই তিন জন হাকিম একত্র হইলেই যেমন 'সার্ব্বিসে'র কথা, উপরালা ম্যাজিষ্ট্রেট, জজের কথা, ভবিষ্যৎ আশা ও আকাঙ্ক্ষার আলোচনা হয়, দুই উকীলে দেখা হইলে যেমন ব্যবসায়গত সুখ দুঃখের কথা হয়, সেইরূপ এই সকল কৃষকযুবকেরা একত্র সমবেত হইলেই তাহাদের জমীর ও চাষের কথা

লইয়া আলোচনা চলে। কাহার কোন্ জমীখানি ভাল, কাহার কোন্ বলদে কেমন লাঙ্গল টানে, বা গাড়ী বহে, কাহার ক্ষেতে কত ধান হইয়াছে, এবার কাহার কাহার 'খন্দ' ভাল হইয়াছে,—এই সকল আলোচনাতেই তাহাদের মধুর সন্ধ্যা অতিবাহিত হয়। তাহারা শীতকালে অগ্নিকুণ্ড করিয়া বহ্নি সেবন করে; আবার খেজুর রস পাড়িয়া ঠিলি ধরিয়া চুমুক দেওয়াও চলে। কিন্তু গ্রীষ্মকালেও তাহাদের আড্ডা মন্দ জমে না। বিশেষ কোনও পর্ব্বদিনে (যেমন অম্বুবাচীতে) লাঙ্গল বন্ধ থাকিলে, তাহারা ঢাক বাজাইয়া মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, সন্ধ্যার পর নগরসংকীর্ত্তনে বাহির হয়। (যুদ্ধকালে রণ-দামামা ও যুদ্ধজয়ের পর সংকীর্ত্তন সভ্যসমাজেও দেখিতে পাইতেছি।) কেহ চাক শছ লইয়া, কেহ বা ছিপ্ লইয়া নদীতে বা খাল বিলে মাছ ধরিতে যায়। সামান্য চ্যাং, শোল, ফলুই, বাইন মাছ পাইলেই তাহারা আনন্দে অধীর হইয়া উঠে! পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মৎস্য তাহাদের দুষ্প্রাপ্য, আমাদের ভদ্রসমাজের পোলাওয়ের ন্যায় মহা সৌখীন খাদ্য! এইরূপ নানা কর্ম্মে রত থাকায় গ্রামস্থ কৃষকযুবকেরা পরনিন্দা ও পরচর্চ্চা করিবার অবসর পায় না।

গ্রাম ও গ্রামের কৃষকগণের জীবনযাত্রার এই বিবরণ শুনিয়া কেহ কেহ মাথা নাড়িয়া বলিবেন, 'বৃদ্ধ গ্রন্থকার আফিংএর ঝোঁকে স্বপ্ন দেখিতেছে! এ রকম গ্রাম একালেও আছে,—ইহা তামা তুলসী গঙ্গাজল হাতে লইয়া বলিলেও বিশ্বাস করি না।' আমরা বর্ত্তমান কালের কথা বলিতেছি না; এখন কৃষকের ও কৃষক-পল্লীর অবস্থা কিরূপ শোচনীয় হইয়াছে, আমাদের দুর্ব্বল লেখনী তাহা বর্ণনা করিতে পারে না। সমাজের মেরুদণ্ডস্বরূপ এই সকল কৃষকের ও তাহাদের পল্লীর প্রতি যাঁহাদের গভীর ঔদাসীন্য, তাঁহারা প্রতিষ্ঠাবান স্বদেশহিতৈষী হইতে পারেন, কিন্তু স্বদেশহিতের প্রথম সোপান—সমাজের মেরুদণ্ডের দৃঢ়তাসাধন, ইহা অস্বীকার করিতে পারেন না।

আমরা যে সময়ের কথা আলোচনা করিতেছি, সেই সময় রামদেবপুরের অবস্থাই এইরূপ ছিল। এখন ইহা স্বপ্নের বিষয় হইলেও রামদেবপুরের কৃষকগণ তখন এইরূপ সুখে ছিল। বলরাম ঘোষ এই গ্রামের মণ্ডল। তাহার আটখানি লাঙ্গল বহিত, এবং দশ 'খাদা' অর্থাৎ, দেড় শত বিঘারও অধিক পরিমাণ জমী সে আবাদ করিত। বাড়ীতে আট নয়খানি ঘর, কুড়ি পঁচিশটা বড় বড় গোলা, ধান ও নানা প্রকার শস্যে গোলাগুলি পরিপূর্ণ। গোয়ালে গরু মহিষ ধরিত না। ঘরে প্রতি দিন এক মণ দুধ হইত। তাহাতে দধি, ক্ষীর, ছানা, মাখম,

ঘৃত প্রস্তুত হইত। দেখিলে মনে হইত, মা লক্ষ্মী সশরীরে তাহার গৃহে বিরাজ করিতেছেন। একাল হইলে ভাবিতাম, লোকটা কি মূর্খ! এত যার ঐশ্বর্য্য, সে দুপুরের রৌদ্রে গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া মাঠে লাঙ্গল বহে, আবার মাঠের মধ্যে কোথায় কোন্ ব্রাহ্মণ পিপাসায় ছাতি ফাটিয়া মরিতেছে শুনিয়া সপরিবারে গাড়ী লইয়া তাহাকে উদ্ধার করিতে যায়! ক্ষেপেছে না কি?

কিন্তু মূর্খ বলরাম সে দিনের মত চাষ বন্ধ করিয়া ন্যায়রত্ন ও সুমতিকে গাড়ীতে তুলিয়া বাড়ী লইয়া আসিল। আজ তাহার কি আনন্দ! তাহার পক্ষে সে কি সুপ্রভাত, যে দিন ব্রাহ্মণের পদরজে তাহার গৃহ পবিত্র হইল, তাহার জীবন সার্থক হইল। সে ন্যায়রত্নকে সযত্নে গাড়ী হইতে নামাইয়া পরম ভক্তি-ভরে তাঁহার পা দুখানি মুছাইয়া দিল। পাদোদক পান করিয়া মাথায় হাত মুছিল। তৃপ্তিতে তাহার নেত্রযুগল অর্দ্ধনিমীলিত হইল। ন্যায়রত্নের জন্য একখানি ঘর তাড়াতাড়ি পরিষ্কার করা হইল। এই ঘরে তাহার লক্ষ্মীপূজা হইত। সুমতি মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মী হইয়া সেই গৃহে অধিষ্ঠিত হইল।

বলরামের স্ত্রী রাইমণি মাঠ ভাঙ্গিয়া গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া সুমতির হাত মুখ ধুইবার ব্যবস্থা করিল, তাহার স্নানের জন্য জল তুলিয়া দিল; তাহার পর এক ঘড়া জল নিজের মাথায় ঢালিয়া সুমতির রন্ধনের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইল। খাদ্যসামগ্রী সমস্তই তাহার গৃহে ছিল, রাইমণি তাহার পুত্রবধূ ও কন্যার সাহায্যে অতি অল্প সময়েই সকল আয়োজন শেষ করিল। সুমতি শ্রান্ত দেহেও মনের আনন্দে রন্ধন করিল, পিতাকে আহার করাইয়া স্বয়ং আহার করিল, এবং তাঁহাদের ভুক্তাবশিষ্ট অন্ন ব্যঞ্জন মহাপ্রসাদজ্ঞানে পরিবারস্থ সকলের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিয়া বলরামের স্ত্রী চরিতার্থ হইল। বলরামের মনে হইল, তাহা অমৃত!

ক্রমশঃ।

শ্রীজীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

ভ্রান্তি।

[হায়েনের অনুসরণে।]

মাধবী পূর্ণিমা রাত্তি অলসা বিবশা,
দূরে মুরলীর গাথা পুলক-রভষা ;
সমীরে সুরভিমাখা হৃদয়ে বিলাস,
মিলনে অতৃপ্তি ভরা বিরহে হুতাশ।
রূপ যেন দলমল করিয়া বেড়ায়,
সুখ যেন মুখ তুলে চাহিতে না পায়।
সুখ রাস-রস-গলা এক উৎপলিনী,
শশী মুখপানে চেয়ে কাটায় যামিনী।
চেয়ে চেয়ে সুধা পিয়ে মিটিল না আশ,
মানিনী পালটি' শির ফেলিল নিঃশ্বাস।
বদন করিয়া নত উঠিল কাঁদিয়া
দেখিল চরণ ধরি শশাঙ্ক পড়িয়া।

শ্রীবেনোয়ারীলাল গোস্বামী।

দ্বিতীয় পক্ষ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

'বৌ, ও বৌ!'

'কেন গা দিদি ?'

ছোট বৌ হাসিয়া বলিল, 'দুর ছুঁড়ী, আমি তোর দিদি, না তুই আমার দিদি ?'

মাতঙ্গিনীও হাসিয়া উত্তর করিল, 'তাই বুঝি তুমি দিদিকে 'তুই' বলছো ?'

একটু লজ্জার হাসি হাসিয়া ছোট বৌ বলিল, 'তা বটে, কিন্তু ভাই, তুই আমার চাইতে বয়সে এত ছোট যে, তুমি বলতে পারা যায় না।'

মাতঙ্গিনী বলিল, 'আর তুমিও বয়সে এত বড় যে, তোমাকে দিদি ছাড়া আর কিছু বলাই চলে না।'

উভয়েই হাসিয়া উঠিল। খানিকটা হাসিয়া ছোট বৌ বলিল, 'কিন্তু ভাই, বয়সে ছোট হ'লেও তুই তো সম্বন্ধে বড়।'

হাসি চাপিয়া মুখখানাকে গম্ভীর করিয়া মাতঙ্গিনী বলিল, 'নিশ্চয়, কেন না আমি তোমার বড়ঠাকুরের মত বৃদ্ধের স্ত্রী—অর্দ্ধাঙ্গিনী।'

তাহাকে একটা ঠেলা দিয়া হাসিতে হাসিতে ছোট বৌ বলিল, 'মুখে আগুন!'

মাতঙ্গিনী বলিল, 'এরি মধ্যে মুখে আগুন দিলে চলবে কেন দিদি? এখনও যে সাড়ে চার শ' টাকার এক পয়সাও শোধ যায় নি।'

'শোধ দেবে কে? তুই?'

'আমাকে খেয়ে প'রে কতকটা শোধ দিতে হ'বে বৈ কি।'

'তা হ'লে বড়ঠাকুরের খুব উপকারই করবি দেখছি।'

'বুড়ো বয়সের স্ত্রী এর চাইতে বেশী উপকার করতে পারে না।'

'এক মুঠো রেঁধেও বুঝি দেয় না?'

'রাঁধতে গেলে আমার সোনার অঙ্গে কালি লাগবে।'

'আমার কিন্তু ইচ্ছে হয়, আগুন ধরিয়ে তোমার সোনার অঙ্গটাকে আরও রাঙ্গা ক'রে দিই।'

'তুমি আমার স্নেহময়ী দিদি কি না!'

বলিয়া মাতঙ্গিনী হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। ঈষৎ তিরস্কারের সুরে ছোট বৌ বলিল, 'ন্যাকামি রাখ্। এখন উনুন ধরিয়ে রান্নাটা চাপিয়ে দে না। বুড়ো মানুষ, সেই কখন্ তেতে পুড়ে এসে রাঁধবে, তবে খাবি?'

সহাস্যে মাতঙ্গিনী বলিল, 'বুড়ো সোয়ামীর হাতের রান্না খেতে বড্ড মিষ্টি লাগে দিদি। তুমি দিন কতক খেয়ে দেখ না।'

ঈষৎ হাসিয়া ছোট বৌ বলিল, 'সেটা কি ক'রে পরখ করবো বল্, আমার সোয়ামী তো বুড়ো নয়।'

'তাও বটে' বলিয়া মাতঙ্গিনী গম্ভীরভাবে গ্রীবা আন্দোলন করিল। ছোট বৌ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া গম্ভীরস্বরে বলিল, 'বুড়ো ব'লে উপহাস কচ্চিস্ বটে, কিন্তু বুড়ো সোয়ামীর কাছে যেমন ভালবাসা পাওয়া যায়—'

'বড্ড দিদি, বড্ড; বুকের কল্জের চাইতেও বেশী।'

তাহার মুখের দিকে সকোপ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া ছোট বৌ বলিল, 'তুই বড় ঠেঁটা।'

'সে কথা সত্যি দিদি' বলিয়া মাতঙ্গিনী হাসিতে লাগিল।

মাতঙ্গিনী স্বামীর ঘর করিতে আসিয়া যখন দেখিল, স্বামী ছোট ভায়ের সঙ্গে পৃথক্-অন্ন হইয়াছেন, এবং তিনি স্বতন্ত্র ভাবে রাঁধিয়া খাইতেছেন, তখন সে খুব বিস্ময় অনুভব করিল। তার পর বিশ্বনাথ যখন তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, এই সংসারে সে-ই গৃহিণী, সে যাহা করিবে তাহাই হইবে, যাহাকে খাইতে দিবে, সে খাইতে পাইবে, তাহাকে কিছু বলিবার বা তাহার উপর কর্ত্তৃত্ব করিবার কেহই নাই, তখন এই অবিসংবাদী গৃহিণীত্ব লাভ করিয়া মাতঙ্গিনী কিছুমাত্র উৎফুল্ল বা উৎসাহিত হইল না; বরং আপনাকে গৃহিণী-পদের সম্পূর্ণ অযোগ্য জ্ঞানে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িল। তার পর যখন শুনিল যে, তাহাকে এই গৃহিণীপদে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই স্বামী নিতান্ত নির্লজ্জভাবে কনিষ্ঠকে পৃথক্ করিয়া দিয়াছেন, বিষয় সম্পত্তি সব বিক্রয় বা বন্ধক দ্বারা নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন, তখন আপনার প্রতি স্বামীর গভীর অনুরাগ-স্মরণে সে কিছুমাত্র আনন্দ অনুভব করিল না, অধিকন্তু অতীতবয়স্ক স্বামীর নির্লজ্জতায় তাঁহার উপর বিরক্ত হইয়া উঠিল। সে ক্রুদ্ধভাবে স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি এমন কাজ করলে কেন?'

বিশ্বনাথ প্রীতিপূর্ণস্বরে উত্তর দিলেন, 'তোমাকে পাবার জন্য।'

রাগে চোখ কপালে তুলিয়া মাতঙ্গিনী বলিল, 'আমাকে পেয়ে তুমি কি স্বর্গে যাবে?'

তাহার এই ক্রোধ-দর্শনে বিশ্বনাথ যেন একটু দমিয়া গেলেন। ম্লান-হাস্যসহকারে বলিলেন, 'স্বর্গে যাবার ইচ্ছা এক দিন খুবই ছিল মাতু, কিন্তু তোমাকে ছেড়ে এখন আর আমি স্বর্গে যেতে চাই না।'

ক্রোধরুদ্ধকণ্ঠে মাতঙ্গিনী জিজ্ঞাসা করিল, 'কেন, আমি কি বল তো?'

এই কঠিন প্রশ্নের উত্তর বিশ্বনাথ দিতে পারিলেন না; তিনি নীরবে ক্ষুব্ধ দৃষ্টিতে মাতঙ্গিনীর রোষরক্ত মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। মাতঙ্গিনী মুখটা ফিরাইয়া লইয়া বলিল, 'আমি কিন্তু তোমাকে রেঁধে দিতে পারবো না, তা ব'লে রাখছি।'

বিশ্বনাথ বলিলেন, 'তুমি না পার, আমি পারবো মাতু।'

ভ্রূভঙ্গী করিয়া মাতঙ্গিনী উত্তর করিল, 'বেশ।'

মাতঙ্গিনী মুখে যাহা বলিল, কাজেও তাহাই করিল। সকালে সে যখন বিছানা ছাড়িত, তখন সকালের রৌদ্রটা প্রখর হইয়া উঠানে, ঘরের দাবায়

ছড়াইয়া পড়িয়াছে, বিশ্বনাথ গৃহকর্ম্ম শেষ করিয়া যজমানবাড়ী চলিয়া গিয়াছেন। মাতঙ্গিনী মুখ হাত ধুইয়া ফটিককে কোলে লইয়া বসিত। ছোট বৌ যদি বলিত, 'হাঁ বৌ, এত বেলায় উঠে ছেলে নিয়ে বস্‌লি যে?'

মৃদু হাসিয়া মাতঙ্গিনী উত্তর দিত, 'একটু বসি দিদি।'

তর্জ্জনসহকারে ছোট বৌ বলিল, 'সকাল থেকে অনেক কাজ করলি কি না। বুড়ো মানুষ, কাজ করবে, আর তুই শুয়ে থাকবি! একটু লজ্জাও করে না?'

ঘাড় নাড়িয়া মাতঙ্গিনী বলিল, 'বড্ড লজ্জা করে দিদি, সেই জন্যেই তো উঠতে পারি না।'

'তোর লজ্জার মুখে ছাই!' বলিয়া ছোট বৌ রোষভরে কার্য্যান্তরে প্রস্থান করিল। মাতঙ্গিনী আস্তে আস্তে উঠিয়া কাপড় কাচিতে গেল।

মধ্যাহ্নে বিশ্বনাথ আসিয়া ডাকিলেন, 'নতুন বৌ!'

মাতঙ্গিনী তখন ফটিককে কোলে বসাইয়া তাহাকে ভাত খাওয়াইয়া দিতেছিল। স্বামীর আহ্বান কর্ণে প্রবেশ করিলেও তাহাতে কিছুমাত্র দৃক্‌পাত না করিয়া ধীর স্থির ভাবে আরব্ধ কার্য্য সম্পন্ন করিতে লাগিল। ছোট বৌ কিন্তু ব্যস্ততাসহকারে বলিল, 'শুনতে পাচ্চিস্ না, বড়ঠাকুর ডাকছেন।'

উপেক্ষাসূচক মুখভঙ্গী করিয়া মাতঙ্গিনী বলিল, 'ডাকছেন তার কি করবো? আমি কি বসে আছি?'

ছোট বৌ আশ্চর্য্যান্বিতভাবে বলিল, 'ওমা, বসে আছি কি লো? তেতে পুড়ে এলো, আর তুই নিশ্চিন্দি হ'য়ে ওকে ভাত খাওয়াবি? নে ওঠ্।'

ঝঙ্কারের স্বরে মাতঙ্গিনী উত্তর করিল, 'তেতে পুড়ে এলো, তা আমি গিয়ে করবো কি? মাথায় জল ঢালবো?'

বলিয়া ভাতের গ্রাসটা ফটিকের মুখের কাছে আনিয়া বলিল, 'নে, হাঁ কর্, লক্ষ্মী আমার, যাদু আমার।'

আবার ডাক আসিল, 'নতুন বৌ!'

সে ডাকে কান না দিয়া মাতঙ্গিনী ভাতের ডেলা পাকাইতে পাকাইতে বলিল, 'এই কাগা, এই বগা—'

'এই তোর মাথা' বলিয়া ছোট বৌ ছুটিয়া আসিয়া ফটিককে তাহার কোল হইতে টানিয়া লইল। মাতঙ্গিনী তাঁহার দিকে ফিরিয়া চোখ মুখ ঘুরাইয়া বলিল, 'ছেলেটাকে টেনে নিলে যে?'

উষ্ণস্বরে ছোট বৌ বলিল, 'বেশ করেছি। আমার ছেলের উপর তোমার এত দরদ দেখাতে হবে না।'

হাতের ভাতগুলা থালায় আছাড়িয়া ফেলিয়া মাতঙ্গিনী উঠিয়া দাঁড়াইল; ক্রোধরুদ্ধস্বরে বলিল, 'আচ্ছা, আর কক্ষণো যদি দরদ দেখাই তবে—'

বক্তব্য শেষ না করিয়াই মাতঙ্গিনী চঞ্চলপদে সে স্থান ত্যাগ করিল।

বিশ্বনাথ তখন পা হাত ধুইয়া যজমানবাড়ী হইতে আনীত জিনিসপত্রগুলি গুছাইয়া তুলিতেছিলেন; মাতঙ্গিনী উপস্থিত হইলে মুখখানাকে একটু ভারী করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এতক্ষণ কোথায় ছিলে?'

মাতঙ্গিনী গম্ভীরমুখে উত্তর দিল, 'কোথায় থাকবো আবার? ফটিককে ভাত খাইয়ে দিচ্ছিলাম।'

ভ্রূভঙ্গী করিয়া বিশ্বনাথ বলিলেন, 'তুমি ছাড়া তাকে খাওয়াবার লোক নাই কি?'

মাতঙ্গিনী বলিল, 'লোক তো সাড়ে সাত জন। দিদি রান্না নিয়ে ব্যস্ত, ছেলেটা নিজে খেতে বসলে মোটেই খায় না।'

বিশ্বনাথ পত্নীর দিকে একটা তীব্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, 'তার খাওয়াটা আগে দেখতে গিয়েছিলে, কিন্তু নিজেদের খাওয়ার যোগাড় কিছু করেছ কি?'

'আমি কি যোগাড় করবো?'

'তবে বার মাস কি আমিই তার যোগাড় করবো?'

'সে তোমার খুসী।'

'খুসী নয়; তুমি না পার, কাজেই আমাকে করতে হবে। কিন্তু আমি রেঁধে দেব, তুমি খাবে, সেটা কি ভাল দেখায়?'

'মন্দ দেখায়, দিও না।'

'না দিলে খাবে কি?'

'আমার ভাবনা আমি ভাববো, তোমাকে সে জন্য ভাবতে হবে না।'

বিরক্তভাবে বাহিরে আসিয়া বিশ্বনাথ তামাক সাজিতে বসিলেন। মাতঙ্গিনী যেমন দাঁড়াইয়া ছিল, তেমনই দাঁড়াইয়া রহিল।

তামাক খাইয়া বিশ্বনাথ রন্ধনের উদ্যোগে প্রবৃত্ত হইলেন। সাহায্যের জন্য দুই একবার মাতঙ্গিনীকে ডাকিলেন। মাতঙ্গিনী কিন্তু আসিল না, উত্তর পর্য্যন্ত দিল না। রাগে বিশ্বনাথের পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত কাঁপিতে লাগিল। একবার

ইচ্ছা হইল, রান্না খাওয়া সব ফেলিয়া তিনি এক দিকে ছুটিয়া চলিয়া যান। কিন্তু সে উপায় যে আর নাই। তিনি সকলের নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া মাতঙ্গিনীকে ঘরে আনিয়াছেন; এখন তাহাকে ফেলিয়া পলাইলে চলিবে কেন? তাহার সকল অন্যায় অত্যাচার নিঃশব্দে মাথা পাতিয়া লইতেই হইবে; তাহাতে একটুও টুঁ-শব্দ করিবার যো নাই, করিলে লোক-হাসান' হইবে মাত্র। উঃ, বুড়া বয়সে এ আবার কি কর্ম্মভোগ!

উনানে ফুৎকার দিতে দিতে চোখ ফাটিয়া জল আসিতে লাগিল। বিশ্বনাথ প্রাণপণশক্তিতে সে জলের বেগ রুদ্ধ করিয়া ডাকিলেন, 'এক গ্লাস জল নিয়ে এস নতুন বৌ।'

মাতঙ্গিনী জল লইয়া আসিল। বিশ্বনাথ বলিলেন, 'শুধু জলটা খাব? ঘরে মিষ্টি কিছু নাই?'

মাতঙ্গিনী ঘর হইতে খানকতক বাতাসা আনিয়া দিল। বিশ্বনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সন্দেশ ছিল না?'

মাতঙ্গিনী বলিল, 'দু'টী সন্দেশ আছে। ফটিক খাবে, থাক্।'

বিশ্বনাথ দাঁতে দাঁত চাপিয়া রোষ-ক্ষুব্ধ-দৃষ্টিতে মাতঙ্গিনীর মুখের দিকে চাহিলেন; তার পর বাতাসাগুলো উঠানে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া গ্লাসের জলটা গলায় ঢালিয়া দিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

অপরাহ্নে বিশ্বনাথ একখানা বাঙ্গালা ভাগবত লইয়া পড়িতেছিলেন—

'সংসার মাঝারে এক প্রশস্ত কানন,
ভবাটবী নাম তার ভীষণদর্শন।
অতি ভয়ঙ্কর ঘেরা বেড়া ইন্দ্রজালে,
শ্বাপদসঙ্কুল উহা থাকে সর্ব্বকালে।
সে বিপিনে দস্যুরূপী রিপু ছয় জন,
ভয়ঙ্কর ভাবে তথা রহে সর্ব্বক্ষণ।
দারা সুত আদি যত পরিজনগণ,
শৃগালস্বরূপে করে কাননে ভ্রমণ।
লতাগুল্মসমাচ্ছন্ন দুর্গম গহ্বর,
সে বনের সর্ব্বস্থানেআছে বহুতর।
মোহ মায়া আদি দুঃখ গর্ত্তের ভিতরে,
কতবিধ বিষকীট সতত সঞ্চরে।'

উঃ, মায়া, মায়া! দারা পুত্র পরিজন, সকলেই এই সংসার-কাননে দুঃখের আধার; সকলেই বিষকীটের সদৃশ। সে কীটের দংশনে কি তীব্র জ্বালা! হায় ভগবান! ভীষণ সংসারারণ্যে দস্যুরূপী ষড়রিপুর শাসনে প্রাণ যে যায়! গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বিশ্বনাথ পুনরায় পড়িতে লাগিলেন—

'কথনো জঠরানল পিশাচের প্রায়।
জীবেরে কাতর করে ক্ষুৎপিপাসায়।
অনুক্ষণ নিদ্রারূপী অজগরগণ,
সময় পাইয়া জীবে করে আকর্ষণ।
মধু আশে মধুক্রম নিকটেতে গিয়া,
মক্ষিকা-দংশনে দেহ যায় যে জ্বলিয়া।
মধুকর সম ভাবে রমণী সকল,
যন্ত্রণা প্রদান করে মানবে কেবল।'

মানব-চরিত্রের গভীর অন্তস্তল পর্য্যন্ত পর্য্যবেক্ষণ করিয়া অন্তর্দর্শী মহাজনগণ কি কঠোর সত্যই লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন! মধুলাভের আশায় মধুচক্রের নিকট ছুটিয়া গেলাম, মধু তো পাইলাম না, শুধু মক্ষিকার দংশনে সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া পুড়িয়া গেল। তৃষ্ণায় কাতর হইয়া সাগরের পাশে ছুটিয়া আসিলাম, উল্লাসে অঞ্জলি ভরিয়া জল লইয়া মুখে তুলিলাম, ওহো, আশার এ কি কঠোর পরিহাস! পিপাসার নিবৃত্তি তো হইলই না, শুধু তীব্র লবণাস্বাদে কণ্ঠ দগ্ধ হইয়া গেল। মরীচিকা, মরীচিকা! মায়ার সংসারে সকলই মায়া! জগদীশ! এ মায়ার নিগড় হইতে মুক্তিলাভের উপায় কি?

দিনান্তের সূর্য্য পশ্চিম গগনে ঢলিয়া পড়িয়াছিল; তাহার শেষ রশ্মিটুকু নারিকেলপত্রশীর্ষ হইতে গড়াইয়া পড়িয়া দিগন্তের কোলে বিলীন হইয়া যাইতেছিল; শুধু একটা ক্ষীণ রক্তিম ছটা পশ্চিম আকাশপ্রান্তটাকে উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছিল। সেই অস্তোন্মুখ সূর্য্যের শেষরশ্মিপ্রদীপ্ত আকাশপ্রান্তে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বিশ্বনাথ যেন আপনার মুক্তির উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। মাতঙ্গিনী আসিয়া কখন যে পাশে দাঁড়াইয়াছে, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না।

সহসা একটা চাপা হাসির শব্দে তাঁহার যেন চমক হইল। ফিরিয়া চাহিতেই দেখিলেন, সম্মুখে মাতঙ্গিনী দাঁড়াইয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছে; পশ্চিম আকাশের সুবর্ণদ্যুতির একটা মৃদু ছটা আসিয়া তাহার মুখখানার উপর কি এক অপূর্ব্ব লাবণ্যের জ্যোতি ঢালিয়া দিতেছে। সে মুখের দিকে চাহিয়া

বিশ্বনাথ যেন মুগ্ধ হইলেন, মায়াময় সংসারের মরীচিকা-ভীতি অন্তর্হিত হইল, মুক্তিলাভের ব্যাকুল কামনা দূরে চলিয়া গেল। বিশ্বনাথ আপনার মুগ্ধ দৃষ্টিটাকে সহসা ফিরাইতে পারিলেন না।

মাতঙ্গিনী তেমনই হাস্যপ্রফুল্লমুখে জিজ্ঞাসা করিল, 'আকাশের দিকে চেয়ে কি ভাবছিলে ?'

বিশ্বনাথ যাহা ভাবিতেছিলেন, তাহা বলিতে সঙ্কুচিত হইলেন ; দৃষ্টিটা ফিরাইয়া লইয়া মস্তক কণ্ডূয়ন করিতে করিতে বলিলেন, 'ভাবছিলাম,—কত কি ভাবছিলাম।'

মাতঙ্গিনী বলিল, 'তবু কি ভাবছিলে—শুনি।'

বিশ্বনাথ এবার মিথ্যার আশ্রয় লইলেন ; বলিলেন, 'ভাবছিলাম—তোমাকে কি রকমে সুখী করবো।'

একটা হাস্যোজ্জ্বল কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া মাতঙ্গিনী বলিল, 'সত্যি ?'

'তুমি আমার কথায় বিশ্বাস কর না নতুন বৌ ?'

'খুব করি। কিন্তু আমাকে সুখী করবার জন্য তোমার এত ভাবনা কেন ?'

'তুমি যে আমার স্ত্রী। স্ত্রীকে সুখী করাই স্বামীর কর্ত্তব্য কর্ম্ম।'

'কিন্তু কিসে আমায় সুখী করবে ? ভিটে পর্য্যন্ত বাঁধা দিয়ে তো বিয়ে করেছ।'

সে তোমাকে পাবার জন্যই করেছি নতুন বৌ।'

'বেশ করেছ। কিন্তু এখন আমাকে খাওয়াতে পরাতে হবে তো ? যা আনছো, তাতে দু'বেলা খেতেই কুলায় না। এর উপর দেনাই বা শোধ করবে কিসে, আর আমাকে সুখী করবেই বা কি দিয়ে ?'

সত্যই তো ; মেয়ে মানুষ, না পায় একখানা ভাল কাপড়, না পায় দু'খানা গহনা। বিবাহের সময় প্রথমা-স্ত্রীর ব্যবহৃত যে দুই একখানা গহনা দিয়াছিলেন, মহাজনের সুদের তাগাদায় সেগুলা পর্য্যন্ত বাঁধা পড়িয়াছে। গহনা চুলোয় যাক্, একটু ভাল খাওয়া, তাহাও জুটে না। অথচ তিনি স্ত্রীকে সুখী করিবার জন্য ব্যস্ত। বিশ্বনাথ একটা নিঃশ্বাস ছাড়িয়া মাথা নীচু করিলেন।

মাতঙ্গিনী ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, 'আবার ঠাকুরপো বলছিল, নীলু ঘোষ নাকি নালিস করবে।'

ইহা বিশ্বনাথও যে শুনেন নাই, তাহা নহে ; তাহার দুই শত টাকা সুদে-আসলে সাড়ে তিন শত হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এবং সেদিন সে স্পষ্টই বলিয়াছে,

এই মাসের ভিতর অন্ততঃ সুদের অর্দ্ধেক টাকা না পাইলে সে নিশ্চয় নালিস করিবে। বিশ্বনাথ দুই এক স্থানে টাকাটা সংগ্রহ করিবার চেষ্টাও করিয়াছিলেন, কিন্তু ঋণগ্রস্ত ব্রাহ্মণকে টাকা ধার দিতে কেহই সাহসী হয় নাই। অগত্যা তিনি অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়াই নিরস্ত হইয়াছিলেন।

নালিসটা অবশ্যম্ভাবী জানিলেও শ্রীপতি যে ইহা লইয়া বাড়ীর মধ্যে একটা আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়াছে, এটা যেন নিতান্তই অসহ্য বোধ হইল। এই সঙ্গে শ্রীপতি যে নিজের বুদ্ধিমত্তার বড়াই করিয়া জ্যেষ্ঠকে নির্ব্বোধ প্রতিপন্ন করিয়াছে, বিশ্বনাথ অনুমানেই তাহা বুঝিয়া লইলেন। সুতরাং মাতঙ্গিনীর কথার উত্তরে তিনি ক্রুদ্ধভাবে বলিলেন, 'নীলু ঘোষ বুঝি ওর সঙ্গে পরামর্শ করেছে?'

মাতঙ্গিনী বলিল, 'পরামর্শ করবে কেন? পরম্পরায় বোধ হয় শুনেছে।'

ভ্রূভঙ্গী করিয়া বিশ্বনাথ বলিলেন, 'শুনেছে শুনেইছে, নালিস করে, আমার বিষয় বেচে নেবে, ওর তো নেবে না? তবে ওর এত মাথাব্যথা কেন?'

কেন যে মাথাব্যথা, তাহা মাতঙ্গিনী জানিত না, সুতরাং সে ইহার কোনও উত্তর দিতে পারিল না। বিশ্বনাথ মুখখানাকে বিকৃত করিয়া পুনরায় ভাগবতের উপর দৃষ্টি সন্নিবিষ্ট করিলেন। মাতঙ্গিনী দাঁড়াইয়া আঁচলে পাক দিতে দিতে বলিল, 'আবার পুঁথি নিয়ে বসলে যে?'

বিশ্বনাথ একটু উষ্ণস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি করবো?'

'এ বেলা খাওয়া দাওয়ার কি হবে?"

'যা হয় হবে তখন।'

বিশ্বনাথ একটু জোরে জোরে পড়িতে লাগিলেন,—

'কখনো জঠরানল পিশাচের প্রায়,
জীবেরে কাতর করে ক্ষুৎপিপাসায়।'

মাতঙ্গিনী একটু দাঁড়াইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থানোদ্যত হইল। বিশ্বনাথ তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'চলে গেলে যে?'

মাতঙ্গিনী ফিরিয়া দাঁড়াইল। বিশ্বনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'চাল কি মোটেই নাই?'

মাতঙ্গিনী উত্তর দিল, 'না।'

বিশ্বনাথ বিরক্তিসূচক মুখভঙ্গী করিলেন। মাতঙ্গিনী নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার দিকে রুক্ষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বিশ্বনাথ বলিলেন, 'এমন সময় আমি কোথায় কি পাব?'

মাতঙ্গিনী নিরুত্তর। বিশ্বনাথ একটু চড়া গলায় বলিলেন, 'তবে এ বেলা আর খাওয়া দাওয়ার ঝঞ্ঝাটে কাজ নাই।'

'আচ্ছা' বলিয়া মাতঙ্গিনী চলিয়া গেল। বিশ্বনাথ পুঁথি মুড়িয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। তখন দিনের আলো নিবিয়া গিয়াছে; সন্ধ্যার ধূসর ছায়া গাছপালা ঢাকিয়া দিয়াছে; গাছের পাশ দিয়া দুই একটা নক্ষত্র মিট মিট করিয়া পৃথিবীর দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। অন্ধকার আকাশের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বিশ্বনাথ স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিলেন।

মাতঙ্গিনী আসিয়া বলিল, 'খাবে না ব'লে আজ সন্ধ্যা-আহ্নিকও করবে না?'

বিশ্বনাথ চমকিতভাবে ফিরিয়া চাহিলেন, এবং পুঁথি তুলিয়া রাখিয়া আহ্নিক করিতে চলিলেন।

আহ্নিকে বসিয়া বিশ্বনাথ সে দিন তাহাতে মনোনিবেশ করিতে পারিলেন না, ইষ্টদেবতাকে ডাকিতে গেলে সংসার আসিয়া চিত্তটাকে বিক্ষিপ্ত করিয়া দিতে লাগিল। ইষ্টদেবি, এ কি করিলে মা? জীবনের সায়াহ্নে আয়ুঃসূর্য্য যখন নিস্তেজভাবে পশ্চিম গগনে ঢলিয়া পড়িতেছে, সন্ধ্যার অন্ধকার ধীরে ধীরে ঘনাইয়া আসিয়া বাসনার আলোক ম্লান করিয়া দিতেছে, তখন আবার ছিন্ন-প্রায় জীবনসূত্রটাকে সংসারের সহিত এমন করিয়া কেন জড়াইয়া দিলে? বুড়া বয়সে এ আবার কি কর্ম্মভোগ মা? এ ভোগের অবসান কবে হইবে?

বিশ্বজননীর উপর নিদারুণ অভিমানে বিশ্বনাথের দুই চোখ বহিয়া অনু-তাপের অশ্রুধারা গড়াইতে লাগিল।

এমন সময় কে ডাকিল, 'আকুলি মশায় বাড়ী আছেন?'

বিশ্বনাথ উচ্চকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কে?'

উত্তর আসিল, 'আমি ভবতারণ।'

'এস ভায়া' বলিয়া বিশ্বনাথ তাড়াতাড়ি জপটুকু সারিয়া লইয়া বাহিরে আসিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ভবতারণের সহিত বিশ্বনাথের একটু আত্মীয়-সম্পর্কই ছিল না, তাহার সঙ্গে অনেকটা ঘনিষ্ঠতাও ছিল। প্রথমা স্ত্রীর মামাতো ভাই বলিয়া সে আগে প্রায়ই এখানে আসিত, এবং যখনই আসিত, মাসাধিক কাল না থাকিয়া যাইত না। কেহ তাহাকে যাইতেও বলিত না, বা তাহার অবস্থিতিতে বিরক্ত হইত

না। কেন না, সে যে কয় দিন থাকিত, সে কয় দিন শুধু হাট বাজার করিয়া বা মাছ ধরিয়া আনিয়া গৃহস্থের উপকার করিত না, নানা ভাবের বাজে গল্প করিয়া, গান গাহিয়া, যাত্রার দলের বক্তৃতা করিয়া বাড়ীখানাকে এমন সরগরম করিয়া রাখিত যে, সে চলিয়া গেলে দিন কতক বাড়ীটা সকলের কাছেই যেন নিতান্ত ফাঁকা বোধ হইত। এমন কি, বিশ্বনাথ তাহার এই বাচালতায় কর্ণপাত না করিলেও সে চলিয়া যাইবার পর দুই এক দিন হয় ত বলিতেন, 'ভবা ছোঁড়া চলে' গেলে বাড়ীখানা যেন কেমনতর হ'য়ে পড়ে।'

ভবতারণের কোনও নির্দ্দিষ্ট কাজ কর্ম্ম ছিল না। পাঠশালার গুরুমহাশয়ের নিকট শিক্ষা শেষ করিয়া ঘরে বসিয়া হাতের লেখাটা একটু পাকাইয়াছিল। তার পর কখনও যাত্রার দলে ঢুকিত, কখনও কোনও দোকানে খাতা লেখার কাজ করিত, কখনও বা রামায়ণ-গানে দোহারী করিতে যাইত। যখন কোনও কাজ থাকিত না, তখন দিদির কাছে আসিয়া পড়িত। সংসারের ভার ঘাড়ে ছিল না। বড় ভাই বিবাহ করিয়া সংসারী হইয়াছিল। কিন্তু তাহার বিবাহের দেনা শোধের জন্য যে দিন তিন বিঘা লাখরাজ জমীর বিক্রয়-কোবালায় ভবতারণকে সহি দিতে হইল, সেই দিন ভবতারণ প্রতিজ্ঞা করিল, জগতে যত অসাধ্য দুষ্কর্ম্ম আছে, প্রয়োজন হইলে সে তাহার সকলই করিতে পারিবে, কিন্তু দেনা করিয়া বিবাহের মত দুষ্কর্ম্ম কিছুতেই করিবে না। সুতরাং বড় ভাই বা অন্যান্য আত্মীয়গণের বিস্তর অনুরোধ সত্ত্বেও সে এই দুষ্কর্ম্ম করিতে পারে নাই। দিদির সনির্ব্বন্ধ অনুরোধের উত্তরে বলিয়াছিল, 'বিয়ে কর্‌তে পারি দিদি, কিন্তু 'কস্য কর্জ্জপত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে' লিখতে পারবো না।' অগত্যা বিবাহ অসম্ভব বুঝিয়া দিদিকে নিরস্ত হইতে হইয়াছিল।

যাত্রার দল, রামায়ণের গান প্রভৃতি কাজে ঘুরিয়া ভবতারণ অনেকগুলা নেশাকে আয়ত্ত করিয়া লইয়াছিল। কিন্তু গাঁজা ছাড়া আর সকল নেশাই পোষাকীস্বরূপ ছিল, সে শুধু গাঁজাটাকেই আটপৌরে করিয়া রাখিয়াছিল; এবং এই আটপৌরে জিনিসটার অত্যন্তাভাব উপস্থিত হইলেই তাহাকে বাধ্য হইয়া চাকরী স্বীকার করিতে হইত। শুধু যে কয় দিন দিদির কাছে থাকিত, সেই কয় দিন তাহার কোনও ভাবনা থাকিত না, দিদি গোপনে আলো চাল, পাওনা কাপড় গামছা বেচিয়া যাহা সঞ্চয় করিতেন, তাহা দিয়াই এই বাউণ্ডলে ভাইটার অভাবপূরণ করিতেন।

কিন্তু এক স্থানে স্থায়িভাবে থাকা ভবতারণের ভাল লাগিত না। দিনকতক

পরে দিদির আদর যত্নের মধ্যে যখন আর কোনও নূতনত্ব থাকিত না, তখন হঠাৎ এক দিন সকালে চাদরখানা কাঁধে ফেলিয়া 'চললাম দিদি' বলিয়া সে চলিয়া যাইত, দিদির অনুরোধে আর এক বেলা থাকিতেও স্বীকৃত হইত না।

বছর চার আগে শেষ বার যখন আসিয়াছিল, তখন দিদির খুব অসুখ। ভবতারণ পনরো দিন দিদির পাশে বসিয়া সেবা করিয়াছিল, এক দণ্ডের জন্যও কাছছাড়া হয় নাই। কেবল সন্ধ্যার পর একবার বাহিরে গিয়া গাঁজা খাইয়া আসিত। কিন্তু শেষ পাচ দিন—অবস্থা যখন খুব সঙ্গীন হইয়া উঠিল, তখন ভবতারণ গাঁজা খাইতেও বাহির হয় নাই; এই কয় দিন সে গাঁজা না খাইয়াই কাটাইয়া দিয়াছিল। তাহার এই ঐকান্তিক সেবা দেখিয়া বিশ্বনাথ পর্য্যন্ত মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে দিদি তাহার হাতে ধরিয়া বলিয়াছিলেন, 'নেশা ভাং ছেড়ে দিয়ে বিয়ে-থা করিস্ ভব।'

উত্তরে ভবতারণ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়াছিল, 'তোমার কথায় নেশা ছেড়ে দিতে পারবো দিদি, কিন্তু বিয়ে কর্‌তে পারবো না।'

দিদির মৃত্যুর পর ভবতারণ সেই যে চলিয়া গিয়াছিল, আর এ-মুখো হয় নাই। যাইবার সময় শ্রীপতি বলিয়াছিল, 'মাঝে মাঝে এসো হে ভব, একেবারে ভুলে থেক না।'

উত্তরে ভবতারণ বলিয়াছিল, 'এ বাড়ীটাকে কিছুতেই ভুলতে পারবো না ছোড়্‌দা', তবে আসবো কি না—বলতে পারি না।'

চাদরের খুঁটে চোখ মুছিয়া ভবতারণ সেই যে বাড়ীর দরজা পার হইয়াছিল, দীর্ঘ পাঁচ বৎসর পরে আজ আবার সেই দরজায় ঢুকিয়া ডাকিল, 'আকুলি মশায়!'

তাহার কণ্ঠস্বরে কেবল বিশ্বনাথ নহে, শ্রীপতি পর্য্যন্ত চমকিয়া উঠিল। সে নিজের ঘর হইতে ছুটিয়া বাহিরে আসিয়া হর্ষোদ্বেলকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, 'কে হে, ভব নাকি?'

'হাঁ ছোড়্‌দা' বলিয়া ভবতারণ সম্মুখের ঘরের দাবার উপর ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল। শ্রীপতি বলিল, 'তবু ভাল, হঠাৎ পথ ভুলে নাকি?'

সহাস্যে ভবতারণ বলিল, 'পথ ভুলেই বটে এক রকম। নয় তো আজ পাঁচ বচ্ছর পরে—ঠিক পাঁচ বচ্ছর, না ছোড়্‌দা?'

'তাই হবে' বলিয়া শ্রীপতি একখানি আসন আনিয়া দিল। বিশ্বনাথ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেমন আছ? অনেক দিন তো খোঁজ খবরই নাই।'

কপালের ঘাম মুছিতে মুছিতে ভবতারণ উত্তর করিল, 'আর কে কার খোঁজ খবর রাখে আকুলি মশায় ? দিদি যদি থাকতো—'

বিশ্বনাথ গম্ভীরস্বরে বলিলেন, 'হোক্ না হে, সে গিয়েছে, আমি তো আছি।'

ভবতারণ নীরবে জামাটা খুলিতে লাগিল। বিশ্বনাথ বলিলেন, 'অবশ্য, বলতে পার, তোমরাই কোন্ খোঁজখবর নিয়েছ। কিন্তু সময় সময় মনে হ'তো বটে, তা নানা ঝঞ্ঝাটে—বুঝলে কি না—ঘটে ওঠে নি।'

ভবতারণ হাসিয়া বলিল, 'ঘটে উঠলেই বা হ'তো কি ? আমার মত ভবঘুরে লোকের সন্ধান পাওয়া কি তোমাদের কাজ ?'

বিশ্ব। আজ কোথা থেকে ? বরাবর বাড়ী থেকে না কি ?

ভব। উহুঁ, চাঁপাডাঙ্গায় যাত্রা করতে গিয়েছিলাম। ফেরবার পথে মনে হ'লো, এত কাছাকাছি যখন এসে পড়েছি, তখন একবার দেখাটা করেই যাই।

শ্রীপতি জিজ্ঞাসা করিল, 'আবার যাত্রার দলে ঢুকেছ না কি ?'

ভবতারণ বলিল, 'তা নয় তো লাটের দপ্তরের চাকরী কোথায় পাব বল। তবু একটা বিদ্যে সেধে রেখেছিলাম, তাই কোনও রকমে পেটটা চলে যাচ্চে।'

শ্রীপতি বলিল, 'মন্দ কি ? কার দলে কাজ কচ্ছো ?'

ভবতারণ বলিল, 'আমতার হরিশ চাটুয্যের দলে। দলটা একেবারেই গিয়েছিল, হাজার দুই টাকা দেনা ক'রে আবার একটু গুছিয়ে তুলেছে।'

বিশ্বনাথ আর কি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু তাহা শুনিবার অপেক্ষা না করিয়াই ভবতারণ তড়াক্ করিয়া উঠিয়া পড়িল, এবং দ্রুতপদে শ্রীপতির রন্ধনশালায় উপস্থিত হইয়া ডাকিল, 'ছোড়দি !'

ছোট বৌ রাঁধিতেছিল, তাড়াতাড়ি উঠিয়া পীড়িখানা পাতিয়া দিল। ভব না বসিয়াই ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া বলিল, 'কেমন আছ তোমরা ছোড়দি ? কেলো কোথায় ?'

ছোট বৌ বলিল, 'সে বুঝি শুয়ে পড়েছে। তুমি তো ভাল আছ ?'

'দিব্যি আছি' বলিয়া ভব ছোট বোয়ের পাশে ফটিককে দেখিয়া বলিয়া উঠিল, 'এই নূতন লোকটী কে ছোড়দি' ?'

ঈষৎ হাসিয়া ছোট বৌ বলিল, 'এ লোকটীকে চেন না ? তা চিনবেই বা কি করে' ? এ তো তখন পেটে।'

'দেখি, নূতন লোকটা কেমন' বলিয়া ভব হাত বাড়াইয়া ফটিককে বুকে তুলিয়া লইল, এবং তাহাকে বুকে চাপিয়া অজস্র চুম্বনে আকুল করিয়া তুলিল।

শ্রীপতি আসিয়া স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল, 'ভবর চাল নিয়েছ তো ছোট বৌ ?'

বিদ্রূপের স্বরে ছোট বৌ বলিল, 'ভাগ্যে তুমি ব'লে দিলে !'

আহারে বসিয়া ভব জিজ্ঞাসা করিল, 'আকুলি মশাই খাবেন না ?'

শ্রীপতি এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিল না ; নতমুখে গণ্ডূষ করিয়া তাড়াতাড়ি মুখে ভাত তুলিতে লাগিল। ছোট বৌ ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, 'ওঁরা আলাদা হ'য়েছেন।'

ভাতের গ্রাসটা মুখের কাছে ধরিয়া অতিমাত্র বিস্ময়ের সহিত ভব জিজ্ঞাসা করিল, 'বাহবা ! ওঁরা আলাদা হ'য়েছেন কি রকম ? ওঁরা আবার কারা ?'

ছোট বৌ তখন ধীরে ধীরে সংক্ষেপে বড় কর্তার দ্বিতীয়বার বিবাহের ইতিহাস কীর্ত্তন করিল। ভবতারণ স্তব্ধভাবে বসিয়া সে ইতিহাস শ্রবণ করিল ; তার পর হাতের ভাতগুলা পাতে আছড়াইয়া দিয়া উগ্রস্বরে বলিয়া উঠিল, 'বাহবা ! বুড়ো বয়সে উনি আবার বিয়ে কর্‌তে গেলেন কেন বল ত ?'

শ্রীপতি হাসিয়া বলিল, 'তাতে তোমার এত রাগ কেন বল ত ?'

ভবতারণ কোনও উত্তর না দিয়া ক্রোধগম্ভীরমুখে নীরবে আহার কার্য্য সম্পন্ন করিতে লাগিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পর দিন ভবতারণ সকালে উঠিয়াই বিশ্বনাথকে বলিল, 'আপনি আবার বিয়ে করেছেন না আকুলি মশাই ?'

বিশ্বনাথ একটু সন্ত্রস্তভাবে উত্তর করিলেন, 'হাঁ ভায়া, সংসার চলে না, কাজেই—বুঝলে কি না, অমনি একটা—'

জোরে মাথা নাড়িয়া ভবতারণ বলিল, 'অমনি একটা কি ? না আকুলি মশাই, সংসার চলে না, কপালে ছিল, এ সব বাঁধা দোহাইয়ের কোনটা দিয়েই আপনি রেহাই পেতে পারেন না। আপনি এটা খুবই মন্দ কাজ করেছেন। করেছেন কি না—বলুন ?'

ভবতারণ অনুকূল উত্তর-প্রাপ্তির আশায় তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে বিশ্বনাথের মুখের দিকে চাহিল। বিশ্বনাথ কিন্তু সহসা কোনও উত্তর দিতে পারিলেন না।

অন্য কেহ হইলে হয় ত নিজের কাজের কোনও কৈফিয়ৎ দিতে চাহিতেন না, কিন্তু ভবতারণকে ইহার একটা সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ দেওয়া আবশ্যক বোধ করিলেন। কেন না, ভবা ছোঁড়া যে তাঁহার কার্য্যটাকে অন্যায় বলিয়া জানিয়া রাখিবে, ইহা নিতান্তই লজ্জার কথা। অথচ কৈফিয়তে কি বলিবেন, তাহাও যেন খুঁজিয়া পাইলেন না। অগত্যা তাহার তীক্ষ্ণদৃষ্টির সম্মুখে মাথাটা নীচু করিয়া হতবুদ্ধির ন্যায় বসিয়া রহিলেন।

তাঁহাকে নিরুত্তর দেখিয়া ভবতারণ দৃঢ়-কঠোর-স্বরে বলিল, 'আপনি মুখে বলুন আর নাই বলুন, আপনার কাজটা খুব ভয়ানক অন্যায় হ'য়েছে। এই বয়সে বিয়ের জন্যে ভায়ের সঙ্গে আলাদা হওয়া, এটা বোধ হয় আমরাও পেরে উঠি না আকুলি মশায়।'

কথাটা শেষ করিয়াই সে সবেগে মস্তকটা একবার আন্দোলন করিয়া বিশ্বনাথের সম্মুখ হইতে প্রস্থান করি

বিশ্বনাথ নিতান্ত অস্বচ্ছন্দচিত্তে [illegible]রিয়া বসিয়া রহিলেন। তার পর ভবতারণ দৃষ্টিপথের অতীত হই[illegible] তাঁহার যেন চমক হইল। মনে হইল, ছি ছি! ভবা ছোঁড়া এমন শক্ত শক্ত কথাগুলা বলিয়া গেল, আর তিনি তাহার একটা উত্তরও দিতে পারিলেন না! সাধে কি তিনি বিবাহ করিয়াছেন? সময়ে অসময়ে মুখে এক গণ্ডূষ জল দিবার লোক নাই যে। যখন তিনি অসুখে পড়িয়া ছটফট করিতেন, তখন ঐ ছোঁড়া কি তাঁহার সেবা করিতে আসিত? আর যে ভাইকে তিনি হাতে করিয়া মানুষ করিয়াছেন, সেই ভাই-ই যখন তাঁহাকে বিয়ে-পাগলা বুড়ো বলিয়া উপহাস করিয়াছে, তখন তাহার সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া তিনি কি এমন অপরাধ করিয়াছেন? ছি ছি! এমন সোজা উত্তর থাকিতে তাঁহার মুখে একটা কথাও যোগাইল না! বিশ্বনাথের ইচ্ছা হইল, ভবকে ডাকিয়া এই উত্তরগুলা শুনাইয়া দেন। কিন্তু সেটা এখন নিতান্ত অসাময়িক হইবে বলিয়া অগত্যা তাঁহাকে নিরস্ত থাকিতে হইল। কিন্তু ক্রোধ ও বিরক্তি আসিয়া তাঁহার মনটাকে যেন তিক্ত করিয়া তুলিতে লাগিল। তিনি ভ্রূভঙ্গীতে মুখখানাকে বিকৃত করিয়া স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিলেন।

এমন সময় মাতঙ্গিনী সম্মুখে আসিয়া গম্ভীরস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, 'বসে বসে এত ভাবছো কি?'

চমকিতভাবে বিশ্বনাথ বলিলেন, 'ভাবছি? না, কিছুই না।'

মাতঙ্গিনী বলিল, 'ঐ ছোঁড়াটা অত কথা শুনিয়ে দিয়ে গেল, একটা উত্তর দিতে পারলে না?'

একটু ইতস্ততঃ করিয়া বিশ্বনাথ বলিলেন, 'উত্তর? কি আর উত্তর দেব?'

তাঁহার মুখের উপর ক্রুদ্ধ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া মাতঙ্গিনী বলিল, 'কেন? উত্তর কি নাই? তুমি কি করেছ না করেছ, তার কৈফিয়ৎ নেবার ও কে?'

মস্তকে হস্তাবমর্ষণ করিতে করিতে ম্লানহাস্যসহকারে বিশ্বনাথ উত্তর করিলেন, 'কেউ নয়। কিন্তু ছোঁড়াটার স্বভাবই ঐ রকম নতুন বৌ, মুখের উপর স্পষ্ট স্পষ্ট কথা শুনিয়ে দেয়, কারো তোয়াক্কা রাখে না।'

ক্রোধরুদ্ধকণ্ঠে মাতঙ্গিনী বলিল, 'ওর তোয়াক্কাই বা কে রাখে! ও কি তোমার অন্ন মাপচে যে, তোমাকে বুড়ো ব'লে এত তিরস্কার করে গেল?'

তাহার দিকে সহাস্যে দৃষ্টিপাত করিয়া বিশ্বনাথ বলিলেন, 'বুড়ো বলেছে, তাই বুঝি তোমার এত রাগ? কিন্তু ও তো মিথ্যা বলে নি নতুন বৌ, তুমিও তো আমাকে বুড়ো বল।'

গর্জ্জন করিয়া মাতঙ্গিনী বলিল, 'বেশ করি, আমি বুড়ো বলি। কিন্তু ও ছোঁড়া বলে কোন্ লজ্জায়? বুড়ো হ'য়ে তুমি ওর কি করেছ?'

গম্ভীরভাবে মস্তকসঞ্চালন করিয়া বিশ্বনাথ বলিলেন, 'ওর কিছু না করলেও তোমার ক্ষতি তো করেছি নতুন বৌ। সেইটাই ওর প্রাণে বেজেছে।'

মুখভঙ্গী করিয়া মাতঙ্গিনী বলিল, 'ওঃ! ভারী আমার দরদী কি না! বলে —মার চেয়ে যে ভালবাসে, তারে বলি ডান।'

মাতঙ্গিনী প্রস্থানোদ্যত হইল। বিশ্বনাথ বলিলেন, 'তুমি ছোঁড়ার উপর বড্ড রেগেছ নতুন বৌ, কিন্তু ও ছোঁড়াকে তুমি চেন না। দিন কতক ব্যবহার করলেই দেখবে, দোষে গুণে ছোকরা কত ভাল। তখন তুমিও ওকে ভাল না ব'লে থাকতে পারবে না।'

জোরে মাথা নাড়িয়া মাতঙ্গিনী বলিল, 'কক্ষণো না। আমি ওকে ভয়ানক ঘৃণা করি।'

বলিয়া সে সদম্ভ পদক্ষেপে চলিয়া গেল। বিশ্বনাথ মুগ্ধদৃষ্টিতে তাহার গর্ব্বিত গতির দিকে চাহিয়া চাহিয়া ভবতারণের তিরস্কারগুলাকে মন হইতে যেন মুছিয়া ফেলিলেন।

একটু পরেই মাতঙ্গিনী পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া বলিল, 'আচ্ছা, ও যখন তোমার আত্মীয়, তখন দিদির ওখানে খাবে কেন?'

বিশ্বনাথ চিন্তিতভাবে বলিলেন, 'খাওয়াটা অন্যায় বটে। কিন্তু আমার এখানে তৈরী ক'রে দেয় কে?'

মাতঙ্গিনী বলিল, 'কেন? আমি এত কচি খুকী না কি?'

তাহার মুখের উপর হাস্যোজ্জ্বল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বিশ্বনাথ বলিলেন, 'আমার মত বুড়ার গৃহিণী কি কচি খুকী হ'তে পারে?'

মাতঙ্গিনী ঠিক পাকা গৃহিণীর মত মুখখানাকে ভারী করিয়া বলিল, 'তামাসা রেখে দাও, উঠে হাট বাজার ক'রে নিয়ে এস। আমি দিদিকে ব'লে আসি, ওর চাল যেন না নেয়।'

উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই মাতঙ্গিনী দ্রুতপদে সেখান হইতে চলিয়া গেল। বিশ্বনাথ আপন মনে মুখ টিপিয়া একটু হাসিলেন; তার পর গামছা লইয়া বাজার করিতে চলিলেন।

ক্রমশঃ।

শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

অযোগ্য।

১

রেবতীবাবু স্ত্রীকে ডাকিয়া কহিলেন, 'শুনলে ত—বিন্ধ্য তর্কভূষণ মশাই যা' বলে গেলেন। ওর ভাগ্য কি তোমার আমার চেষ্টায় বদ্‌লাবে—কেন মনে খুঁত করে কষ্ট পাচ্ছ—শশধরের সঙ্গেই মনুর বিয়ে দিয়ে ফেল। ৯ই ফাল্গুন দিনটাও বেশ ভাল আছে।'

মনুর মা বিন্ধ্যবাসিনী স্বামীর কথার প্রতিবাদে শুধু কহিলেন—'তা কি হয় কখনও? মনু, শশ' দুটীতে চিরদিন এক সঙ্গে ভাই বোনের মত মানুষ হয়ে এলো। এখন অন্য রকম করতে গেলে তা কি মানায়? আগে আরও একটু খোঁজপাতি করা যাক্, কোথায় না জোটে, তখন শশ' ত আছেই।'

রেবতীবাবু বিষণ্ণভাবে একটু হাসিয়া বলিলেন, 'মনকে চোখ্ ঠারছ বিন্ধ্য, কোথাও না জোটে ত শশ' আছে—বলছ, সত্যিই কি তাই? আমি ত যেটুকু ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছি, তাতে মনে হচ্ছে, মনুর ভাগ্যলিপি তুমিই সফল করে দেবে। জন্মসূত্রে বিষয়ের অধিকারী হয়ে সবাই সংসারে আসে না। অনেককেই নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখ্‌তে হয়, শশ'র উপর সে ভরসা আমার খুবই আছে। অমন ধীরবুদ্ধি, অক্রোধী, সংযতস্বভাব ছেলে আজ কালকার বাজারে কটা পাবে শুনি।' এ কথার পর বিন্ধ্যবাসিনী স্বামীর কথার আর

প্রতিবাদ করিতে সাহস করিলেন না, কহিলেন, 'তা' যা' ভাল বোঝ কর, আমি আর কি বলব, তবে চিরদিন মনে করে এসেছি, মনু আর শশর বিয়ে দিয়ে জামাই বৌয়ের সাধ মেটাব, শশকে পেটেই ধরিনি এই যা, নইলে সেও ত আমার মনুর চাইতে কিছু কম নয়। মনু শ্বশুরবাড়ী যাবে, শশর বৌ এসে আমার সংসার বজায় রাখবে, এই আমার চিরদিনের সাধ। তা আমার কপালে তা হবে কেন? নইলে ভগবান্ ত সবই দিয়েছিলেন, আমার পোড়া কপালেই শুধু না সইল না।' এই বলিয়া বিন্ধ্যবাসিনী মৃত সন্তানদের মনে করিয়া বার বার আঁচল দিয়া চোখের জল মুছিতে লাগিলেন। স্ত্রীর মনে সাধ আহ্লাদের কতখানি আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ রহিয়াছে, রেবতীমোহন তাহা জানিতেন, সেই জন্য তিনি চুপ করিয়া রহিলেন।

মনু তাঁহাদের একমাত্র জীবিত সন্তান। বাপ মার চোখে তাহার সৌন্দর্য্যের সীমা ছিল না, সাধ্যানুসারে শিক্ষাও তাঁহাকে দিয়াছেন। উপযুক্ত ঘর বর দেখিয়া বিবাহ দিবেন, এই কল্পনা করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু সে দিন বড় আশায় তর্কভূষণ মহাশয়কে মনুর করকোষ্ঠী দেখাইতে গিয়া তাঁহাদের আশা নৈরাশ্যের কোন্ অতলে তলাইয়া গিয়াছে। হরিনাথ তর্ক-ভূষণ জ্যোতিষার্ণবের জ্যোতিষজ্ঞান অভ্রান্ত। তিনি হাত দেখিয়া যাহাকে যাহা বলিয়া দিয়াছেন, এ পর্য্যন্ত কখনও তাহার এক চুল তফাৎ হইতে দেখা যায় নাই। তর্কভূষণ মহাশয় মনুর হাত দেখিয়া রেবতীনাথকে অন্তরালে লইয়া গিয়া কহিয়াছিলেন, 'আপনার কন্যাটীকে দেখিলাম, সাক্ষাৎ লক্ষ্মীস্বরূপা, কিন্তু উঁহার ভাগ্য বড় অপ্রসন্ন। পতি-স্থানে পাপগ্রহ বলবান্ থাকা প্রযুক্ত যেমনটা হওয়া উচিত ছিল, তেমনটি হইবে না। অযোগ্য বিবাহই ইহার ফল।'

রেবতীনাথ তখন অর্দ্ধ অবিশ্বাসে ভাবিয়াছিলেন, ভাগ্যের সহিত লড়িয়া দেখিবেন। তর্কভূষণ মহাশয় বলিয়াছিলেন, 'একটি ভাল পাত্র খুঁজিয়া বিবাহ দিবেন। শশধরের অপেক্ষা ভাল পাত্র পাওয়া না যায়, উহাকেই দিবেন।' অনেক চেষ্টা ও অর্থব্যয় করিয়াও মনোমত পাত্র মিলিল না। যত দিন যাইতে লাগিল, রেবতীনাথের পুরুষকারের গর্ব্ব ততই ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল। বৃথা চেষ্টা ছাড়িয়া যাহা হাতের কাছে আছে, তাহাই অবলম্বন করা শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে হইতেছিল। তাঁহার বিধবা বোন শৈলবালা যখন এগারো মাসের পিতৃহীন দেবরের পুত্রটী লইয়া তাঁহার কাছে আসিল, এবং এক বৎসরের মধ্যে শশধরকে রেবতীমোহনের হস্তে দিয়া যে দিন পরপারে প্রস্থান করিল, সে দিন রেবতী-

নাথ ইহাকে গলগ্রহ ভাবেন নাই। মনুর মাও বিবাহ হইয়া আসিয়াই ছেলের মার পদ লইয়াছিলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের যখন একটী একটী করিয়া অনেকগুলি সন্তান আসিল গেল, তখনও শশধরকে বুকে করিয়াই বিন্ধ্যবাসিনী সন্তান-শোক ভুলিয়াছিলেন। অবশেষে অনেক যাগ যজ্ঞ ব্রত উপবাসের ফলে তাঁহাদের মণিমালার জন্ম। মনু ও শশ এক বৃন্তে দুটী ফুল—একত্র খেলা ধুলা ও শিক্ষার সহিত তাহারা এমন ভাবে বাড়িয়া উঠিয়াছিল যে, ভাই বোন ছাড়া অপর কোনও সম্বন্ধ কল্পনা করিতেও বাধিত।

স্বামীর কথায় একটুখানি ইতস্ততঃ করিয়া বিন্ধ্যবাসিনী কহিলেন, 'আচ্ছা, আমাদের অতুলের সঙ্গে একবার চেষ্টা করে দেখলে হয় না?'

অতুল তাঁহাদের ধনী প্রতিবাসী বীরেশ্বর বাবুর পুত্র। বীরেশ্বর বাবু দালালী করিয়া বিস্তর অর্থোপার্জ্জন করিয়াছিলেন, এবং অর্থই তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র। তিনি শিক্ষিত পুত্রের বিবাহে দশ হাজার টাকা পণ লইবেন, স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। রেবতীবাবু তাহা জানিতেন, সেই জন্য স্ত্রীর কথায় বিষণ্ণমুখে ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, 'পাগল!'

বিন্ধ্যবাসিনী সহজে দমিলেন না, বলিলেন, 'অতুলের মনুকে খুবই পছন্দ, তুমি চেষ্টা করেই দেখ—তার পর না হয়—'

'শেষেরটাই পড়ে রয়েছে কি না, অতুলের বাপ দশ হাজার টাকা চান, পারবে কি দিতে? ছেলের পছন্দে কিছু এসে যায় না।' এই বলিয়া উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই রেবতীনাথ বাহিরে চলিয়া গেলেন।

২

বিকালে বিন্ধ্যবাসিনী ভাঁড়ার ঘরে মাসকাবারী জিনিসপত্র গুছাইয়া তুলিতেছিলেন, 'পিসীমা' বলিয়া ডাক দিয়া অতুল দরজার কাছে বাহিরে দাঁড়াইল। বিন্ধ্যবাসিনী একখানা আসন আগাইয়া দিয়া কহিলেন, 'আসনখানা বিছিয়ে নিয়ে বসো বাবা। মনুর সঙ্গে শশর বিয়ে দেওয়াই ঠিক করা গেল অতুল।'

অতুল তখন আসন গ্রহণ না করিয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিসঞ্চালন দ্বারা মনুরই সন্ধান করিতেছিল। পরিহাসের সুরে কহিল, 'মনুর অপরাধ?'

বিন্ধ্যবাসিনী কহিলেন, 'অপরাধ—সে গরীবের ঘরে জন্মেছে। নইলে তুমিই বল ত অতুল, মেয়ে কি আমার অসুন্দর? কি করব বাছা—সবই বরাত। খোঁজপাতি করতে একটুও কসুর করলুম না—ঘর বর জোটে ত কোষ্ঠী মেলে না—কাঁহাতক আর পারা যায়?—মেয়েও দিন দিন তালগাছ হয়ে উঠছে যে!'

অতুল অসহিষ্ণুভাবে কহিল, 'তাই বলে তাকে এমন ভাবে দণ্ড দিতে হবে?'

বিন্ধ্যবাসিনী মশলার হাঁড়িগুলি তাকের উপর সাজাইয়া রাখিতে রাখিতে কহিলেন, 'উপায় কি বাবা? অদৃষ্টের সঙ্গে ত আর লড়াই করা চলে না—তর্কভূষণ মশাই সেই দু বছর আগে ওর হাত দেখে বলে দিলেন, মনুর নাকি ভাল বিয়ে হবে না—বাবু ত শুনে পর্য্যন্ত শশকে মেয়ে দেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। আমিই জেদ করে এত দিন পাঁচ জায়গায় দেখা শুনা কল্লুম বই ত নয়—আর শশই কি অপাত্তর অতুল?'

একটুখানি অপ্রতিভভাবে হাসিয়া অতুল কহিল 'না, অপাত্র কেন? তবে মনুর যোগ্য নয়, এ কথা—একবার কেন—একশ বার বল্‌ব।'

একটা ছোট রকম চাপা নিঃশ্বাসে মনের ভিতরকার অনেক দিনের সঞ্চিত বাসনা চাপা দিয়া মনুর মা কহিলেন, 'তোমরা আশীর্ব্বাদ কর অতুল, শশর দারিদ্র্যদোষেই যেন মনুর বরাতের সকল দুঃখু কেটে যায়।'

তর্কভূষণ মহাশয়ের সহিত তর্কের সম্ভাবনা আপাততঃ হস্তচ্যুত। বিধি-লিপির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিবার যুক্তি ও শশধরের বিপক্ষে সাক্ষ্য দিবার মত প্রমাণ অনুপস্থিত, অগত্যা মনুর ভবিষ্যৎ অতুলকে যতই কেন ভাবাইয়া তুলুক না, প্রতিবাদের অক্ষমতায় তাহাকে সমস্তই মানিয়া লইতে হইল।

এমন সময় মনু আসিয়া হাসিয়া কহিল, 'অতুলদা, অমন হাঁড়ীপানা মুখ করে দাঁড়িয়ে যে? আমি তোমার গলার শব্দ পেয়ে কখন থেকে এই আসছ, এই আসছ মনে কচ্ছি, তোমার আর সময়ই হয় না। কি হচ্ছিল মার সঙ্গে ঝগড়া?'

অতুল মুখ টিপিয়া মৃদু দুষ্টামীর হাসি হাসিতেছিল, কহিল, 'যা দিন দিন তাল গাছ আর হাতী হচ্ছ আর ত তোমায় ঘরে রাখা চল্‌বে না, তাই কি করে বিদায় কর্‌তে পারা যায়, তারই পরামর্শ কচ্ছিলাম।'

মনু রাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছিল, অতুল কাছে আসিয়া বাধা দিয়া কহিল, 'তোমার হাতে ওটা কি—দেখালে না যে বড়—বাঃ!' মনু আঁচল চাপা দিয়া হাতের জিনিসটী লুকাইবার ভানে কহিল, 'যা তুমি আমার শুভানুধ্যায়ী! কেন দেখাব?' শেষে অতুলের সাধ্যসাধনাতে কৃত্রিম কোপ ত্যাগ করিয়া মনু অকৃত্রিম আনন্দে জিনিসটী বাহির করিয়া মেলিয়া ধরিল। একখানি ফিকা নীল রঙ্গের রেশমী রুমাল। মনু তাহার চারি কোণে রেশম দিয়া নক্‌সা আঁকিয়া ভিতরে নাম লিখিয়াছে। অতুল ভাল করিয়া না দেখিয়া মুহূর্ত্তে গম্ভীর হইয়া

নীরসকণ্ঠে কহিল, 'কার জন্তে শুনি—ভাগ্যবানটী নিশ্চয় শশধর।' অতুলের কণ্ঠস্বরে বিদ্রূপের সহিত বেশ ঝাঁজও ছিল। মনু বিস্মিতচক্ষে তাহার পানে চাহিয়া মুখ নামাইয়া লইল, কহিল, 'বুনেছিলাম অবশ্য তোমার জন্তে, কিন্তু এখন দেখছি তাকে দিলে হতো ভাল।'

'আমার জিনিস তাকে প্রাণ থাক্‌তে কখনও নয়'—বলিয়া অতুল রুমালখানা কাড়িয়া লইতে গিয়া সহসা মনুর হাতখানাও সেই সঙ্গে নিজের মুঠোর মধ্যে চাপিয়া ধরিল। সেই ফুলের মত নরম—তেমনি শুভ্র হাতখানির কোমলস্পর্শে অতুলের মনে কি এক অজ্ঞাত অভিনব ভাবের স্পন্দন হইতে লাগিল। অতুল আগেও ত মনুর হাত কত দিন ধরিয়াছে, কই এমন ভাব ত কখনও উপলব্ধি করে নাই। অতুলের মুখের ভাবে কোনও পরিবর্ত্তন আসিয়াছিল কি না, বলা যায় না, মনু কিন্তু ভীত ও বিস্মিতভাবে হাত টানিয়া লইতেই সহসা চমক ভাঙ্গার মত অতুল দ্রুতপদে একেবারে বাটীর বাহিরে চলিয়া গেল, এবং কোথাও না থামিয়া নিজের শয়নকক্ষে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল। বিছানায় পড়িয়া একবার নিজের অতীত জীবনটাকে সে ভাল করিয়া নাড়া দিয়া জাগাইয়া তুলিতে চাহিল।

সেই ছোট বেলার তিনটী বালক-বালিকার একত্র খেলাধূলায়, হাসি-কান্নায়, মান-অভিমান কত সুখেই তখনকার দিনগুলি কাটিয়া গিয়াছে। তখন শশধর ছিল তাহার প্রিয় বন্ধু—শত্রু নয়। একত্র তাহারা পাঠশালায়,স্কুলে, ক্রমে কলেজে ভর্ত্তি হইল। সেই সময় হইতেই কে জানে কেন শশধর তাহার চক্ষুঃশূল হইয়া উঠিল। মনুকে উপলক্ষ করিয়া ক্রমে বিদ্বেষ এমন স্থলে আসিয়া পঁহুছিয়াছে যে, শশধরের ছায়া মাড়াইতেও এখন সে ঘৃণা বোধ করে। অতুল মনে করিত, শশ মনুর শৈশবের ভাই বোনের ভালবাসার স্থলে এখন অন্য ভালবাসার স্থান হইয়াছে। রেবতীনাথের মনের ইচ্ছাও তাহার অজানিত ছিল না। ছোট বেলায় মনু শশর প্রতি একটু পক্ষপাত দেখাইলে সে রাগ করিয়া তাহার খেলানা, পুতুল, হাঁড়ীকুড়ি—সব ভাঙ্গিয়া দিত, আড়ী দিত, নানা উৎপাতে অনর্থ করিয়া তুলিত। শেষে বিন্ধ্যবাসিনী আসিয়া নিজের ছেলেকে কৃত্রিম কোপে শাসন করিয়া পরের ছেলেকে আদর করিয়া শান্ত করিতেন। শান্ত সহিষ্ণু শশধর ইহাতে কখনও প্রতিবাদ করে নাই। সে জানিত, মুখে মা যাহাই বলুন, মনের টান তাহার উপরেই মার বেশী। শশধরের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে গিয়া অতুল পড়াশুনায় দ্রুত উন্নতি করিয়াছিল। সে বড়মানুষের আদরের

ছেলে। যখন যাহা চাহিয়াছে, তখনই তাহা পাইয়াছে ; ব্যর্থতার ব্যথা তাহাকে কখনও অনুভব করিতে হয় নাই। শিক্ষাগারে সে শশধরের নীচে পড়িয়া থাকে নাই। জীবনের প্রতিযোগিতায় আজ সেই শশধর তাহাকে ছাড়াইয়া গেল। মনু-লাভের প্রতিযোগিতায় সেই জয়ী হইল। যে, মনুর সহিত কথা কহিলে, খেলা করিলে তাহার সহ্য হইত না, সেই পরাশ্রিত দরিদ্রের হুকুমেই এখন মনু উঠিবে বসিবে, তাহার অনুমতি লইয়া অতুলের সম্মুখে বাহির হইবে। অতুলের বাঁচিয়া থাকায় ধিক্। কালও সে জানিত না যে, মনুকে সে কতখানি ভালবাসে। বিদ্বেষ ও পরাজয়ের নিষ্ঠুর আঘাতে তাহার ঘুমন্ত চিত্তবৃত্তি যেন অত্যন্ত সহসাই জাগিয়া উঠিয়াছে। মনুকে প্রাণ ধরিয়া কখনই সে শশধরকে দিতে পারিবে না। মনু অপরের হইলেও হয় ত সহ্য হইত, কিন্তু শশধরের হইবে, ইহা একেবারেই অসহ্য।

৩

সংসারে কখনও কখনও যেমন অসম্ভব ঘটনাও সম্ভব হইতে দেখা যায়, অতুলের পিতার ধনুর্ভঙ্গ পণও তেমনি অসম্ভবরূপে পরিবর্ত্তিত হইতে দেখা গেল। রেবতীনাথকে অতর্কিত আশ্চর্য্যানুভবের সুযোগ দিয়া যে দিন তিনি উপযাচক হইয়া মনুকে পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করিবার প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন, সে দিন গভীর সুখে বিন্ধ্যবাসিনী আনন্দাশ্রুজলে মনে মনে ইষ্টদেবের যুগল চরণ ধৌত করিলেও পিতাকে স্বমতে আনিতে অতুলকে যে কতখানি দুঃখ সহ্য করিতে হইয়াছে, তাহা ভাবিয়া রেবতীনাথ জামাতার উদ্দেশে একটা সহানুভূতির নিঃশ্বাস ফেলিলেন। এ বিবাহে বিন্ধ্যবাসিনীর মত রেবতীনাথকে অতটা খুসী হইতে দেখা গেল না। তাঁহার মনে হইল,নির্ব্বিবাদী শান্ত সহিষ্ণু শশধরের হাতে মনুকে দিতে পারিলেই বুঝি তাহার দুর্জ্জেয় অদৃষ্টলিপির বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারিতেন। অতুল অবশ্য ছেলে ভাল, কিন্তু শশধরে যেন কি আছে, যাহা অতুলের নাই।

বিবাহের পর মেয়ে পাঠাইয়াই রেবতীনাথ বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার অনুমান ব্যর্থ হয় নাই। অতুল জোর করিয়াই কর্ত্তৃপক্ষের নিকট মনুকে বিবাহ করিবার অনুমতি আদায় করিয়াছে। একমাত্র কন্যার বিবাহে রেবতীনাথ অবস্থার অতিরিক্তই ব্যয় করিয়াছিলেন, তবু মেয়ের গহনা হইতে ফুলশয্যার তত্ত্ব পর্য্যন্ত কিছুই মনুর শাশুড়ীর মনে ধরিল না। বধূর শিক্ষা দীক্ষা, বয়স রূপ, চাল চলন, কিছুই সমালোচনার হাত এড়াইল না। নগদ দশ হাজারের স্থলে পাঁচটী হাজার মাত্র পাইয়া বীরেশ্বর বাবুও নূতন বৈবাহিকের উপর হাড়ে

চটিয়া গেলেন। ধূর্ত্ত রেবতীনাথ ও তাঁহার পত্নী যে এত দিন ধরিয়া এত আদর যত্নে কেন অতুলকে তাঁহাদের বাড়ী যাইতে দিয়াছিলেন, সে রহস্যও এখন আর তাঁহার অবিদিত রহিল না। যুবতী কন্যাকে অনূঢ়া রাখার উদ্দেশ্যও এখন তাঁহারা বেশ বুঝিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা বুঝিলে কি হইবে, তাঁহাদের অদূরদর্শী পণ্ডিত-মূর্খ ছেলেটা যে নিজের পায়েই নিজে কুঠারাঘাত করিল! নতুবা যাক্—। গৃহিণী হইতে বাড়ীর চুনা পুঁটী পর্য্যন্ত সকলেই বধূ ও বধূর পিতামাতার উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িল। মা বাপের চির-আদরিণী মনুর শ্বশুরবাড়ীর ব্যঙ্গ বিদ্রূপ ও পিতা মাতার নিন্দা শুনিয়া শুনিয়া সারা দিনের রুদ্ধ অশ্রুর বাঁধ যখন রাত্রে ভাঙ্গিয়া পড়িত, তখন অতুলের অকৃত্রিম স্নেহ আদরের কোমলশীতল স্পর্শে চোখের জল বর্দ্ধিত হইলেও তাহার মনের ব্যথা মুহূর্ত্তে জুড়াইয়া যাইত। স্বামী যে কতখানি ভালবাসিয়া, কত দুঃখ সহিয়া তাহাকে হৃদয়ে স্থান দিয়াছেন, বালিকা হইলেও মনু তাহা বুঝিতে পারিত। নিজের দুঃখ ভুলিয়া তাই সে চোখের জল মুছিয়া মুখে হাসিত। অতুল বলিত, 'মনু,' স্বার্থপরের মত তোমায় এখানে এনে আমি কেবল কষ্ট দিলুম। কিন্তু কি করব, তোমায় না পেলে আমি যে বাঁচতুম না।' স্বামিসৌভাগ্যে গরবিনী মনু মনে মনে ভাবিত, 'স্বর্গ কোথায় জানি না, পৃথিবীতে যদি স্বর্গ থাকে, তবে সে বুঝি এই। দুঃখ বেদনা না সহিলে কি স্বর্গলাভ হয়?'

অনেক দিন হইতেই অতুল চাকরীর চেষ্টা করিতেছিল। এইবার পুলিসের সব-ইনেস্‌পেক্টারী পাইয়া পড়া ছাড়িয়া দিল, এবং কর্ম্মস্থলে যাইবার সময় মনুকে সঙ্গে লইতে চাহিল। মা ছেলের এই সাহেবীয়ানা দেখিয়া মনে মনে বিরক্ত হইলেও মুখে কোনও আপত্তি জানাইলেন না। স্বামীর কাছে কহিলেন, 'তখনই জানি, একলা ঘরের একলসেঁড়ে মেয়ে যখন এনেছি, তখন ছেলেকে আমার পর করে দেবেই।'

কর্ত্তা চাপা হাসি হাসিয়া কহিলেন, 'তুমি বৌ এনে সে কথা জেনেছ গিন্নী, আমি তার অনেক আগে থেকেই জানি। সেই যে ছোট খোকা একটা গান করে—"বাপ্ পেয়েছি, মা পেয়েছি, ব্রজের কথা ভুলে গেছি!" এখন নূতন সব পেয়েছে, পুরাণোর আর দরকার কি?' মনুর কানেও এ সব কথা উঠিল। লজ্জায় মরিয়া গিয়া সে ভাবিল, 'সত্যই ত, বাপ মা সব ছাড়িয়া তাহাকে লইয়া স্বামী একা সংসার পাতিবেন, তা কি কখনও হয়।' অতুলকে বলিতে গিয়া কোনও ফল হইল না, সে কহিল, 'হয় গো হয়, বাপ মাকে ত ত্যাগ করে যাওয়া

হচ্ছে না। চাকরী যখন করবই, তখন মেসের রান্না খেয়ে মরব, সেইটে কি তোমার ভাল হবে? জান ত, একলা আমি থাকতে পারি না, তার উপর সারা দিন খেটে খুটে এসে একলা বাড়ীতে কি মানুষ থাকতে পারে?' মনু কহিল, 'তবে মাকে নিয়ে যাও।' মা শুনিয়া কহিলেন, 'বৌয়ের সুপারিস বুঝি! ঘর সংসার ভাসিয়ে দিয়ে আমার কি বাপু সেখানে গিয়ে থাকা পোষায়? শাশুড়ীকে নিয়ে যাও না, খুসী হয়ে যাবে।' মনুর যাওয়াই অগত্যা স্থির হইয়া গেল।

নূতন জায়গায় নূতন গৃহস্থালীতে নূতনত্বের মোহে মাসকতক তাহাদের বেশ সুখেই কাটিল। অতুল যখন কাজে যায়, মনু তাহার জন্য নিজ হাতে নূতন নূতন খাবার তৈয়ার করে। দুপুরবেলা অতুল ও তাহার ভাই ও ভাগিনেয়-দের জন্য ভেলভেটের জুতার কাপড়ে রেশমের ফুলপাতা বুনে। ঘর সাজাই-বার লেশের পর্দ্দা, রেশমের ফুল পাতা বাহার কুশণ, কার্পেটের আসন, আরও সব কত প্রকার সূচিকর্ম্ম করে। কোনও কাজ না পাইলে, লাইব্রেরী হইতে গোয়েন্দাদের অদ্ভুত কীর্ত্তিকলাপের কাহিনী আনাইয়া পাঠ করে। নিজের হাতে কতক টবে, কতক জমীতে গাছ পুতিয়া সে একখানি ছোট খাট বাগান তৈয়ারী করিয়াছিল। সে বাগানে গাঁদা, মোরগ, চন্দ্রমল্লিকা, জবা, পাতাবাহার ক্রোটনের সহিত মূলা, বেগুন, পালম শাক, সীমেরও অভাব ছিল না। অতুলও এই বাগানের কার্য্যে তাহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিত; মাটী কোপান, কুয়া হইতে জল উঠান, এ সব কাজ তাহাকেই বেশীর ভাগ করিতে হইত। ইচ্ছা করিয়াই তাহারা অপরের সাহায্য গ্রহণ করিত না। মনু মাটীর কাঁকর বাছিত; আগাছা উপড়াইয়া ফেলিত, এতটুকু অনাবশ্যক জঞ্জালও তাহাদের সখের বাগানে জন্মিতে পাইত না।

ক্রমশঃ।

শ্রীইন্দিরা দেবী।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

শিক্ষক। প্রথম খণ্ড; প্রথম সংখ্যা; বৈশাখ।—লব্ধপ্রতিষ্ঠ মুসলমান লেখক খান সাহেব কাজি ইমদাদুল হক এই নূতন পত্রের সম্পাদক। শিক্ষা-সম্বন্ধীয় আলোচনাই 'শিক্ষকে'র উদ্দিষ্ট। ইহার মলাটে 'মটো' দেখিতেছি—'সৎশিক্ষাবিধানই দেশের ও সমাজের সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য।' দেশকে ও সমাজকে সেই কর্ত্তব্যপালনে সাহায্য করিবার

জন্যই কাজি সাহেব এই উদ্যমে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহার উদ্যম সফল হউক। বাঙ্গালার গতানুগতিক মাসিক-সাহিত্যে 'শিক্ষকে'র আবির্ভাব অন্ততঃ রসান্তরের অবতারণা করিবে। 'শিক্ষক' নামক 'সূচনা'য় দেখিতেছি,—'শিক্ষক শব্দটি আমরা ব্যাপক অর্থেই গ্রহণ করিতেছি, এবং তদনুসারে বালক-বালিকাগণের সমগ্র পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিষয় আলোচনা করিবার জন্য এই পত্রখানি উন্মুক্ত রাখিতে চাহি। ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি উন্নতিশীল দেশে এরূপ ধরণের সাময়িক পত্রের অভাব নাই। সেই সকল পত্রে শিক্ষাতত্ত্ববিৎ, পরিদর্শক, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, চিকিৎসক প্রভৃতি নানাশ্রেণীর চিন্তাশীল লেখকগণ বালক-বালিকাদিগের শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক উন্নতির বিষয়ে আপন আপন পরীক্ষালব্ধ সিদ্ধান্ত সকল আলোচনা ও প্রচার করিয়া থাকেন। তাঁহাদের এরূপ আলোচনা ও প্রচারের উদ্দেশ্য এই যে, যাহাতে বালক-বালিকাদিগের স্বাভাবিক শক্তির কোনরূপ অপচয় না ঘটিয়া তাহাদের শরীর ও মনের সম্পূর্ণ বিকাশ হইতে পারে, এবং যাহাতে তাহারা ভবিষ্যতে সবল, সুস্থ, কর্ম্মঠ ও সচ্চরিত্র হইয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে, তাহার উপায় অন্বেষণ করা। বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদের দেশে এই উদ্দেশ্যের কোন অংশই যে সাধিত হইবার উপায় নাই, এ কথা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন। প্রথমতঃ, বিদ্যা-উপার্জ্জন; সেটা স্কুল-পাঠশালায় বড় একটা হয় না; কারণ, আমাদের স্কুল-পাঠশালাগুলি প্রধানতঃ পরীক্ষার স্থান, বিদ্যাদানের স্থান নহে। দ্বিতীয়তঃ, বল ও স্বাস্থ্যলাভ; এ সম্বন্ধে কোন কথা বলা অপেক্ষা প্রত্যেকের পক্ষে অনুভব করিয়া লওয়াই সহজ। তৃতীয়তঃ, নৈতিক উৎকর্ষ; এটা ত কেবল কয়েকটি বচন মুখস্থ করার মধ্যেই আবদ্ধ। চতুর্থতঃ, কর্ম্মপটু হওয়া—তাহারও সীমা অধিকাংশের বেলাতেই কেরাণীগিরি পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট। আর জীবন-উপভোগের কথা, সে আর বলিয়াই কাজ নাই। এই নিদারুণ শোচনীয় অবস্থার বিষয় গম্ভীরভাবে চিন্তা করা কি কর্ত্তব্য নহে? * * * শিক্ষাবিষয়ক একখানি মাসিক পত্রের প্রচার দ্বারা এই সকল বিষয়ের দিকে চিন্তা-স্রোত প্রবাহিত করিবার এবং কর্ত্তব্যনির্ণয়ের চেষ্টা করিবার বিশেষ সুবিধা হইতে পারে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া আমরা এই মাসিক পত্রখানি পরিচালনের আয়োজন করিয়াছি।' সম্পাদক যে বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত হইয়া এই শুভ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, সেই বিশ্বাসই তাঁহাকে জয়যুক্ত করুক। 'শিক্ষকে'র কর্ম্মক্ষেত্র যেরূপ বিস্তৃত, আশা করি, কাজি সাহেব সেইরূপ একনিষ্ঠ কর্ম্মীদিগের আন্তরিক সাহায্য ও সাহচর্য্যে বঞ্চিত হইবেন না। শ্রীসারদাকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়ের 'আমাদের প্রাথমিক পাটীগণিত' ও শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের 'শিক্ষার আনন্দ' সুলিখিত নিবন্ধ—আমাদের শিক্ষা-বিভাগের ও অভিভাবকগণের পক্ষে 'হিতং মনোহারি চ।' শ্রীগোপালচন্দ্র সরকারের 'লিখনশিক্ষা' উল্লেখযোগ্য। 'কাজের কথা'য় 'দু হাজার বছরের পাঁজী', 'আবহাওয়ার নিক্তি', 'তথ্য-চয়ন', 'নীরব পাঠ', 'দৃষ্টান্তের অভাব' তথ্য-পূর্ণ। 'বিবিধ' শিক্ষাবিষয়ক তথ্য ও আলোচনার সংগ্রহ। ইহা আরও পুষ্ট ও সমৃদ্ধ হইতে পারে। শ্রীযোগেশচন্দ্র দত্তের 'ভারতীয় শিক্ষার এক অধ্যায়' মনু হইতে সঙ্কলিত। প্রাচীন আদর্শের অনুশীলন ও বর্ত্তমানের সহিত তাহার তুলনায় আলোচনা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত আবশ্যক। কাজি সাহেব মহম্মদ-পন্থীদিগের শাস্ত্র হইতে শিক্ষার আদর্শ উদ্ধার,

করিয়া বাঙ্গালীকে দান করুন। শ্রীবিনয়ভূষণ সরকারের 'অটল খুড়োর বৈঠকখানা' অচল। আশা করি, 'শিক্ষক' বাঙ্গালীর সমাদর ও তদপেক্ষা মূল্যবান সাহায্য লাভ করিবে; বাঙ্গালার চিন্তাশীল বিশেষবিৎ লেখকগণ 'শিক্ষকে'র সহায় হইবেন; আর, সম্পাদক কাজি সাহেব ভাষার প্রতি একটু দৃষ্টি রাখিতে ভুলিবেন না—কারণ, তাহাও শিক্ষার একটা অঙ্গ। শিক্ষিত সমাজে মাতৃভাষার এমন লাঞ্ছনা আর কোনও দেশে দেখা যায় না। মাতৃভাষায় অধিকার নিশ্চয়ই 'সৎশিক্ষা'র অন্তর্গত।

নবযুগ। প্রথম বর্ষ; প্রথম সংখ্যা, বৈশাখ।—সুদূর আসামের শিলচর হইতে একখানি বাঙ্গালা মাসিক প্রকাশিত হইতেছে, ইহা আশার কথা, আনন্দের কথা, তাহাতে সন্দেহ কি? অসমীয়া স্বতন্ত্র হইয়া গেল। উড়িয়া স্বতন্ত্র ভাষায় পরিণত হইল। কয়েক বর্ষ পূর্ব্বেও ৺কান্তিচন্দ্র ভট্টাচার্য্য সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন,—'উড়িয়া স্বতন্ত্র ভাষা নহে'। তাঁহার পুস্তিকা ঐ শিরোনামেই প্রকাশিত হইয়াছিল। আসাম ভাষায় ভিন্ন হইয়াছে।—সেই আসামে যাঁহারা বাঙ্গালার প্রতিষ্ঠা করিতেছেন, তাঁহারা বাঙ্গালীর কৃতজ্ঞতার পাত্র। —সর্ব্বপ্রথমে 'নবযুগ'—উচ্ছ্বাস ও উদ্দীপনার সমাহার—অনেক কথা আছে, অথচ বিশেষ কোনও কথাই নাই। উপসংহারে 'উত্তিষ্ঠতঃ জাগ্রত'ও আছে। লেখক 'উত্তিষ্ঠত' পদে বিসর্গ দিয়া বদান্যতার পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীহট্ট কলেজের ছাত্রাবাসে রবীন্দ্রনাথ যে উপদেশ দিয়াছিলেন, সেই বক্তৃতার সারমর্ম্ম 'আকাঙ্ক্ষা' নামে প্রকাশিত হইয়াছে।—রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন—'স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্চি, বুড়োদের উপর বাঁধা হুকুম রয়েচে জায়গা ছেড়ে দেবার জন্যে। নকীব হাঁকচে, সরে যাও, সরে যাও। কেন রে বাপু, যাট পঁয়ষট্টি বছরের পাকা আসন ছাড়ব কেন? ঐ যে আস্‌চেন মহারাজ, ঐ যে কুমার, ঐ যে কিশোর। ভগবান কেবলি ফিরে ফিরে তরুণকে মর্ত্ত্যের সিংহাসনে পাঠিয়ে দিচ্চেন। তার কি কোন মানে নেই? তার মানে এই যে, তিনি তাঁর সৃষ্টিকে পিছনে বাঁধা পড়ে থাক্‌তে দেবেন না। নূতন মন নূতন শক্তি বারে বারে নূতন করে তাঁর কাজ আরম্ভ যদি না করে, তা হ'লে অসীমের প্রকাশ বাধা পাবে। অসীমের ত জরা নেই। এই জন্যে বুদ্‌বুদের মত জরা কেবলি ফেটে মিলিয়ে যায়, আর পৃথিবীর কোল জুড়ে তরুণ ফুলের মধ্যে তরুণ প্রভাতের আলোয় দেখা দেয় তরুণের দল। ভগবান কেবলি নূতনকে বাঁশি বাজিয়ে ডাক্‌চেন, আর তারা দলে দলে আসচে, আর সমস্ত জগৎ আদর করে তাদের জন্যে দ্বার খুলে দিচ্চে।' দেহের জরা মনকে জরাজীর্ণ করিতে পারে না। প্রবীণ রবীন্দ্রনাথ মনে নবীন—তিনি তরুণের তারুণ্য দিয়া ভবিষ্যতের ভাগ্য গঠন করিবার আদেশ দিতেছেন। 'সঙ্গীতশাস্ত্র' নামক ক্ষুদ্র প্রবন্ধে দেবাদিদেব মহাদেব হইতে আকবরের আমোল পর্য্যন্ত ভারতীয় সঙ্গীতের উন্নতি, অবনতি ও পুনরুন্নতির ইতিহাস আছে। এক-নিঃশ্বাসে রামায়ণ-পাঠের মত। প্রত্যেক পর্য্যায়ের ইতিহাস লইয়া এক একটি প্রবন্ধ লিখিলে হয় না? 'সাধু নাগ মহাশয়' অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। নাগ মহাশয়ের জীবনকাহিনী পূর্ব্বে প্রচারিত হইয়াছে; পরবর্ত্তী লেখকের কর্ত্তব্য—পূর্ব্ববর্ত্তী রচনায় সমৃদ্ধি-সংযোগ। পুরাতনেরই পুনরাবৃত্তি অথবা পূর্ব্বসঞ্চিত তথ্যসূত্রে মামুলি উচ্ছ্বাসের সাগর-সৃষ্টি সাহিত্যে অজাগলস্তনের ন্যায় নিতান্ত নিষ্ফল। 'অভ্যর্থনাধ্যক্ষের অভিনন্দন'

নামক সুরচিত, তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধটি 'চতুর্থ সুরমা-সাহিত্য-সম্মিলনী'র শ্রীহট্ট-অভ্যর্থনা-সমিতির অধ্যক্ষ শ্রীপ্রমোদচন্দ্র দত্তের রচিত। ইহাতে অনেক কাজের কথা আছে।—'ইতিহাস যেখানে বিস্মৃতির সীমারেখায় মিলাইয়া যায়—সেই অস্পষ্ট অতীত কালে—আর্য্য-অনার্য্য-সভ্যতা মিলিত হইয়াছিল এই পুণ্য ভূমির সীমান্তে। আমাদের এই শ্রীভূমি, শুধু বাঙ্গালার প্রান্তভূমি নহে, আর্য্য সভ্যতারও একতম প্রান্ত। কত বীর্য্যবান্ অনার্য্য জাতি দেশ জয় করিতে আসিয়া বিজয়ীর গর্ব্ব পরিত্যাগ করিয়া শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছে। তাহার [সাক্ষ্য ?] ইতিহাস আজও বহন করিতেছে—উত্তরে জয়ন্তীয়া, দক্ষিণে কিরাতরাজ্যের ধ্বংসাবশেষ, আধুনিক ত্রিপুরারাজ্য ও পূর্ব্বে কাছাড়ের বিলুপ্ত হেড়ম্ব রাজ্য। ইহারা সকলেই আজ আর্য্য-সভ্যতায় গৌরবান্বিত। এই যে পরকে আপনার করিবার শক্তি আর্য্য-সভ্যতার ছিল, তাহা লোপ পাইয়াছে বলিয়াই আজ জয়ন্তীয়ার জাতি খাসিয়ারা পাদ্রীর নিকট ধর্ম্মশিক্ষা ও আমাদের নিকট অবহেলা লাভ করিয়া বাংলা বর্ণমালাকে খাসিয়া গিরিমালা হইতে সুরমা উপত্যকায় ফেরৎ পাঠাইয়াছে। হিড়িম্বা রাক্ষসীর বংশধরত্ব লাভ করিয়া যে বিজেতৃগণ আর্য্য-সভ্যতা গৌরবের সহিত গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাদের অনুচরগণকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বাংলার পরিবর্ত্তে ইংরেজী শিক্ষা দিবার জন্য শুনিতে পাই শিক্ষা বিভাগ কল্পনা করিতেছেন। যে লুসাই ও কুকী জাতি হিন্দু নামের প্রার্থনীয় গণ্ডীর ভিতরে প্রবেশ লাভ করিতে পারিলে বাংলা ভাষাকেই দ্বিতীয় মাতৃভাষা-রূপে গ্রহণ করিত, তাহারা খ্রীষ্ট ধর্ম্মের সঙ্গে ইংরেজী ভাষাকে ভজনা করিতেছে। আমাদের চিরদিনের প্রতিবেশী ইহারা আমাদের ভাষা ভুলিয়া পর হইতে চলিয়াছে। হৃদয়ের যে বল, মনের যে নবীনতা হিন্দু অহিন্দুর মিলন ঘটাইয়াছিল, সে দিন কি আর ফিরিয়া আসিবে না?' এই সমস্যাই ভারতের সমস্যা।—কন্যাকুমারী হইতে হিমাচল পর্য্যন্ত ভারতভূমির সর্ব্বত্র আমাদের আপন 'পর' হইয়া যাইতেছে। আর্য্যসমাজ পরিত্যক্তকে আবার গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। বিস্তৃত ভারতের আর কোথাও ত সে চেষ্টা নাই। বাঙ্গালায় যাহারা আমাদের রক্তমাংস, আমরা তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া দুর্ব্বল, বিকল, অঙ্গহীন, শক্তিহীন হইতেছি; অন্যপন্থীরা তাহাদিগকে গ্রহণ করিয়া পুষ্ট, সমৃদ্ধ, সংহত, শক্তিশালী হইতেছে। বৈষ্ণবকবির সেই আক্ষেপ মনে পড়ে—

'আমার নাগর যায় পর-ঘর
আমারই আঙ্গিনা দিয়া!'

'শ্রীহট্টের কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিষয়' উল্লেখযোগ্য। শ্রীঅচ্যুতচরণ চৌধুরীর 'শ্রীক্ষেত্র-কথা'র নূতনত্ব নাই। তিনি তাঁহার প্রিয় ও পুরাতন ক্ষেত্র ত্যাগ করিলেন কেন?

প্রভাতী। প্রথম বর্ষ; নিদাঘ-সংখ্যা। নব-প্রকাশিত ঋতুপত্র। বিজ্ঞাপনে আছে—'প্রভাতী দ্বৈমাসিক পত্র।' দ্বৈমাসিকে অরুচি হইবার কারণ কি? 'প্রভাতী'র নিবেদন 'সবুজ' ভাষায় লেখা, অথচ লেখক এত সংস্কৃত শব্দ পুঞ্জীভূত করিয়াছেন যে, দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। ভাষার মত ভাবও সবুজ। নমুনা—'এই যে নবভাবের উদ্বোধন আজ আমাদের এই প্রাণময় চাঞ্চল্যের মধ্যে টেনে এনেছে, তাকে নিশ্চেষ্ট ভাবে গ্রহণ করলে আমাদের চলবে না, দেশের সকলের অন্তরে অন্তরে তাকে জাগিয়ে তুলতে হবে, তাকে উন্নত

হতে উন্নততর পথে পরিচালিত করতে হবে।' এই একই কথা আমরা বহু দিন সবুজ-কুঞ্জের সবুজ ভাষায় ও সবজে ভাবে শুনিয়া আসিতেছি। সকলেই বলে, 'করতে হবে।' কিন্তু করে কে? ক্রিয়া, অসমাপিকা ক্রিয়া প্রভৃতিকে জবাই ও 'রাজধানী কলিকাতা'র সন্নিহিত সুন্দর-বনের হালুম-ভাষার 'কল্লুম' প্রভৃতি ও কোন্ অজানা দেশের 'গেছে', 'দেছে' ইত্যাদি ও চারুচন্দ্রী 'মতো' ও 'কী' প্রভৃতির সমাহারেই কি এই অনুভবের অতীত, দৃষ্টিশক্তির বহির্ভূত 'প্রাণময় চাঞ্চল্যের মধ্যে' নব-ভাবের উদ্বোধনকে 'অন্তরে জাগিয়ে' বা চাগিয়ে তুলতে পারবে? তা ত মনে হয় না। তোমরা ক্রিয়াটাকে আগে বসাইয়া বল,—'আমরা চাই সুযোগ।' আমরা বাপ-পিতামহের ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বলি,—'সুযোগ চাই।' এই ক্রিয়ার হের-ফেরেই কি ভারতের ভাগ্য, বিশ্বসাহিত্যের ভাগ্য, বিশ্বভারতীর ভাগ্য নির্ভর করিতেছে? 'স্বয়ংপ্রকাশমান প্রতিভা থাকে কয় জনের?'—তোমার এই প্রশ্নটি যেন আমাদের মুখ হইতে কাড়িয়া লইয়াছ! কষ্টকল্পনা, একঘেয়ে ঘ্যানঘ্যানানী, 'নূতন কিছু করো'র ভ্যাংচানীর প্রতিভা অবশ্য সবুজ-পত্রীরই একচেটে। কিন্তু সে প্রতিভায় কি 'উন্নত চিন্তাশক্তির উন্মেষ' বা 'ভাব প্রকাশ করিবার শক্তির উৎকর্ষ-সাধন' হয়? শ্রীমতী হৈমবতী দেবীর 'প্রার্থনা' পড়িয়া মনে হইল, ভগবান বেচারীর অবস্থা সম্মুখাগম-চক্রবর্ত্তী সার আশুতোষ সরস্বতী ইত্যাদি—ইত্যাদির অপেক্ষাও শোচনীয়। সরস্বতী কাণা, খোঁড়া, কুঠে, কুঁজো, কুঁড়ে ইত্যাদির আবদারে ব্যতিব্যস্ত—বিশ্ববিদ্যালয়টাকে মোসাহেবের মোসাফিরখানায় পরিণত করিয়াও তাঁহার স্বস্তি নাই, নিস্তার নাই। তিনি 'এক', উমেদার 'বহু'। চাকরী, প্রসাদ সান্ত, আবদার অনন্ত! ছু খুঁট মেলে কেমন করিয়া? কিন্তু ভগবানের সঙ্কটের কাছে আশুতোষের সঙ্কট কোথায় লাগে?—এই হৈমবতীর প্রার্থনা দেখ, আর 'গীতাঞ্জলি'র পরবর্ত্তী এই শ্রেণীর সমস্ত আধ্যাত্মিক আবদার-পুঞ্জের গণনা কর। কোনও কবি অন্ধ হইয়াছেন, কেহ মায়াতে বদ্ধ হইয়াছেন, বিশ্ব খুঁজিয়া অনন্তের দেখা পান নাই; অতএব, সুতরাং, এবং শুধু এই কয়টি কারণে ও অজুহাতে অনন্তকে ফরমাস, হুকুম, বা আরজ করিতেছেন যে,—'নীরব এ বীণা বাজায়ে তোল গো আঘাতি মোহন সুরে!' ভাবিয়া দেখ, এগজামিনার করিয়া দিলে চলিবে না; ল-কলেজের চাকরী, পোষ্ট-গ্রাজুয়েটের নোকরী, কিছুতেই শাণিবে না। তাহা এ জগতে সম্ভব, কিন্তু 'নীরব বীণাকে বাজায়ে তোলা'? কে অস্বীকার করিবে, ভগবানের পক্ষেও তাহা বকমারী? আবার, 'আঘাতি মোহন সুরে' বাজাইয়া তুলিবার হুকুম! মোহন সুর বেচারাই বা কি অপরাধ করিল যে, 'অনন্ত' অর্থাৎ সাদা কথায় ভগবান বীণার তারগুলিকে রেহাই দিয়া তাহাকেই আঘাত করিবেন? আর মোহন সুর যদি আহতই হয়, তাহা হইলে সে 'বাপ্ রে!' বলিয়া একবার আর্ত্তনাদ করিয়া তখনই হয় মূর্চ্ছা, নয় অক্কা লাভ করিবে; তাহা হইলে 'নীরব' বীণা এক লহমা সরব হইতে পারে বটে, কিন্তু ভগবানের পক্ষেও তাহাকে 'বাজাইয়া তোলা' দুষ্কর হইয়া উঠিবে, তিনিও তাহাকে শিকায় তুলিতে বাধ্য হইবেন। সার আশুতোষকেও বাঙ্গালা কাব্যের 'অনন্তে'র মত এমন উমেদার-সঙ্কটে পড়িতে হয় না, তাহা কে অস্বীকার করিবে? 'নূতনের মধ্যে পুরাতনের প্রকাশ' শ্রীযদুনাথ সরকারের ঐতিহাসিক প্রবন্ধ। 'তাহা হইলেই সকল বলা হইল।' কারণ, এ ক্ষেত্রে তিনি অদ্বিতীয়।

'ছয় শত বৎসরের তুর্ক জাতির শাসন আমাদের দেশ, সমাজ, ভাষা, ভাব ও রীতিনীতির মধ্যে কি পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছে,—মুসলমান ভারতের কোন কোন দান আমাদের জাতীয় ভাণ্ডারে প্রচ্ছন্ন বা প্রকট ভাবে রহিয়াছে', সরকার মহাশয় এই সুরচিত ক্ষুদ্র নিবন্ধে তাহা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। হিন্দু মুসলমান সকলকে আমরা প্রবন্ধটি পড়িতে বলি। 'প্রাপ্তি' শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়ের কবিতা। কবিতাটির ধ্বনি মধুর—ইহা বহু সৌন্দর্য্যের গুদামও বটে। কিন্তু ইহার 'মেল্‌তা'য় সব মাটী করিয়াছে—'প্রিয়াতে আমার ঘুচেছে পাবার সকলটাই!' 'সকলটাই' যেন কালা বাঙ্গালী ব্যারিষ্টারের নেক্‌টাই—একবারে অসহ্য। পুনশ্চ—'আলো, ছায়া, সুর, গন্ধ মধুর সৌরভের।' গন্ধও আছে, সৌরভও আছে—অধিকন্তু ন দোষায়? কিন্তু কবি অনায়াসে এক মুর্গী দুইবার জবাই করিবার দায় হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারিতেন। তৎযথা,—'আলো, ছায়া, সুর, গন্ধগোকুল সৌরভের!' তাহা হইলে ছন্দও থাকিত, চরণ পুরিত, গন্ধগোকুলের সৌরভের সঙ্গে একটু প্রাণ-স্পন্দনও থাকিত। আজ কাল 'ডেমক্রাসী'র কল্যাণে বিক্রমপুরের তাড়ায় নদীয়ার রায়তে যে প্রাণস্পন্দন দেখা যাইতেছে! আর একটি কথা—আজ কাল কবিতা চিরিয়া কবিকে আবিষ্কার করিতে হয়! অর্থাৎ, কবি যদি লেখেন, 'প্রভু! তোমা বিনে কিছু চাই নে', তাহা হইলে ধরিয়া লইতে হয়, কবি লালাবাবুর মত সর্ব্বত্যাগী, মোরব্বার মত মুখরোচক ভাল সমালোচনাও চান না! সেইরূপ বিচারে কবির

'কণ্ঠে প্রিয়ার শত পাপিয়ার ঐক্যতান!'

এই চরণটির বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে সন্দেহ থাকে না, 'প্রাপ্তি'র কবি বধির, অর্থাৎ কালা, অন্ততঃ উঁচু আওয়াজ কানে তোলেন না! এক একটা ডাকুতা পাপিয়া এক-দমে কুড়ি-পঁচিশ-ত্রিশ বার 'চোক্ গেল' ঝঙ্কারে গগন পবন কাঁপাইয়া তোলে। এক শো'কে পঁচিশ—অন্ততঃ কুড়ি দিয়া গুণ কর; ভাবিয়া দেখ, দিন-রাতে কত বার পাপিয়ার এইরূপ 'ঐক্যতান' সম্ভব? তার পর কল্পনা কর—প্রিয়ার কণ্ঠে এইরূপ 'শত পাপিয়ার ঐক্যতান' এবং তোমার কর্ণকুহরে শ্রবণশক্তি থাকিলে, তোমার পক্ষে 'প্রাপ্তি'র উপর কবিতা লেখা চুলোয় যাক, একখানা তিন লাইন—চিঠি নয়—চিট্‌ লেখাও সম্ভব কি না? প্রিয়ার কণ্ঠে একটা কাদাখোঁচা বা কাঠঠোকরার একানে তান অধিষ্ঠান করিলেই মানুষ পাগল হইয়া যায়। আর, প্রিয়ার কণ্ঠে শত পাপিয়ার ঐক্যতান সত্ত্বেও যে কবি কবিতা লিখিয়া ছাপাইতে পাঠান, সে কবি? বিশ্লেষণ বলিতেছে, তিনি বধির! একটি চরণ অতি সুন্দর—

'কোমলতাময় যেন কিশলয় সে দেহ-ভার!'

মোটের মাথায় কবিতাটি উপভোগ্য। 'নীল-নয়নের তরে গগনের দর্প চুর!' parallel passage—'বিড়ালাক্ষী বিধুমুখী।' বিশ্লেষণের ফল—ইঙ্গ-বঙ্গ। 'আকাশে বাতাসে * * * দেখিতে পাই।' আকাশে অনেকেই দেখে। কিন্তু বাতাসে? আজ বন্ধু প্রমথকে মনে পড়িতেছে।—সে চিত্রকর ছিল। বলিত, আমি বাতাস আঁকিতে পারি; আঁকিয়াছি। সে বাতাস আঁকিত, বাতাসে কিছু দেখিত কি না, বলিতে পারি না। তবে কি এই ভাবটি বাতাসের খেলা? শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন তাঁহার কবিতার শিরোনামায় এবং 'আদাবন্তে চ মধ্যে চ' সত্যই ঘোষণা করিয়াছেন,—'ওগো আর আমি নাই!' শ্রীবিশ্বনাথ রায়ের 'পিতৃপূজা' উল্লেখ-যোগ্য সন্দর্ভ। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেনের 'মেঁও-ধরা' পড়িয়া চোখে জল আসে। কবিতাটি করুণরসাত্মক নয়, বরং বিপরীত, তবু। বাস্তবিক, 'প্রভাতী' এই 'ম্যাও' ধরিয়া বাহাদুরী করিয়াছে। কবিতারসরসিক ও কাবি-চিটে-মসগুল অনেক মাসিক আছে বটে, কিন্তু আর কেহ ইহা পারিয়া উঠিত না। শ্রীশরদিন্দুনাথ রায় বি. এ. নামক এক জন কবির 'প্রিয়ে কলহশীলে' পড়িয়া বিষম ফাঁপরে পড়িলাম—যিনি লিখিয়াছেন এবং যিনি ছাপিয়াছেন, এই উভয়ের মধ্যে কে বেশী বাহাদুর? এ রসিকতাও কি সাহিত্যের মজলিসে চলে?

গোবিন্দদাসের করচা।

পুণ্যভূমি নবদ্বীপের প্রেমাবতার মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ১৪৩২ শকের ৭ই বৈশাখ (১৯ এপ্রেল ১৫১০ খৃঃ) নীলাচল হইতে দক্ষিণ-ভ্রমণে যাত্রা করিয়াছিলেন; এবং প্রায় একুশ মাস পরে ১৪৩৩ শকের মাঘ (জানুয়ারী ১৫১২) পুরীতে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। এই সময়ের মধ্যে দুই বৎসরের বর্ষাকাল (বা চতুর্ম্মাস্য) আট মাস শ্রীরঙ্গধাম ও অন্য কোনও স্থানে কাটাইয়াছিলেন, অবশিষ্ট ১৩ মাস ভ্রমণ করিয়াছিলেন। এই ভ্রমণবৃত্তান্ত কেবল দুইখানি পুস্তকে বিস্তৃতভাবে পাওয়া যায়। বৃন্দাবনবাসী কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর প্রণীত চৈতন্যচরিতামৃতে ও গোবিন্দদাসের করচাতে। ভ্রমণের এক শতাব্দী পরে চরিতামৃত গ্রন্থখানির লেখা শেষ হয় (১৫৩৭ শক, ১৬১৬ খৃঃ)। গোবিন্দের করচা ঠিক কোন্ সময়ে লেখা হইয়াছে, জানা নাই; কিন্তু গোবিন্দ বলেন, তিনি মহাপ্রভুর ভ্রমণে একমাত্র সঙ্গী ছিলেন, তখন তিনি বৃদ্ধ। ভ্রমণের সময়ে "করচা করিয়া রাখি শক্তি অনুসারে" (১৭ পৃঃ)। নীলাচলে ফিরিবার পর দুই এক বৎসরের মধ্যেই লেখা শেষ করিয়া থাকিবেন। অতএব, চরিতামৃতের প্রায় এক শতাব্দী পূর্ব্বে করচা লেখা হইয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, চরিতামৃতের বর্ণনার সহিত করচার বর্ণনার মিল নাই। কিন্তু করচার গ্রন্থকার যখন স্বচক্ষে দেখিয়া ও চরিতামৃতের গ্রন্থকার এক শতাব্দী পরে পরের মুখে শুনিয়া বা পরের পুস্তক দেখিয়া লিখিয়াছেন, তখন করচাকেই ঐতিহাসিক ও বিশ্বসনীয় বলিতে হইবে। "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে"র লেখক দীনেশবাবুও করচাখানিকে প্রামাণ্য গ্রন্থ বলিয়াছেন; কিন্তু করচাখানিকে অবিশ্বাস করিবারও যে যথেষ্ট কারণ আছে, তাহা বোধ হয় দেখেন নাই। আমি কারণগুলি সুধী পাঠকবর্গের সম্মুখে ধরিতেছি, তাঁহারা বিচার করুন।

১। মহাপ্রভুর জীবন সম্বন্ধে যে যে গ্রন্থকার বা করচাকারেরা যে সময়ে তাঁহার নিকটে ছিলেন, এবং যে সময়ের ঘটনার অভিজ্ঞতা বেশী, সেই সময়ের কথাগুলিই বিস্তারিতরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, অন্য সময়ের ঘটনাগুলি হয় মোটে লেখেন নাই, বা সূত্ররূপে কেবল ঘটনার স্কন্ধ করিয়া গিয়াছেন মাত্র। যেমন মুরারি গুপ্ত প্রভুর বাল্য জীবন সবিস্তারে লিখিয়াছেন, কিন্তু পরবর্ত্তী

কালের কথা জানিতেনও না, লেখেনও নাই। রাম রায় প্রভুর কেবল গম্ভীর লীলা ও শেষ জীবন সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, ইত্যাদি। আবার, ইঁহাদের লেখা সংস্কৃতে, সাধারণ বাঙ্গালী পাঠক বুঝিতে পারে না। ১৬০০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে শ্রীবৃন্দাবনে প্রত্যহ চৈতন্যভাগবত (সে সময়ে ইহাকে চৈতন্যমঙ্গল বলিত) পাঠ করা হইত। কিন্তু ভাগবতে প্রভুর শেষ বয়সের লীলা-কথা প্রায় কিছুই নাই, বা অতি সংক্ষেপে আছে। শ্রীবৃন্দাবনের বৈষ্ণব-প্রধানেরা অশীতিপর বৃদ্ধ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীকে বাঙ্গালাতে একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ সবিস্তারে লিখিতে অনুরোধ করিলেন। বৃদ্ধাবস্থা বলিয়া কবিরাজ স্বীকৃত হইলেন না। কিন্তু ঠিক এই সময়ে গোবিন্দজীর পূজক আদেশ-মালা দিয়া গেল। বৃদ্ধ কবিরাজ আর এড়াইতে পারিলেন না; কেন না, ভক্তদের অনুরোধ এখন ভগবানের আজ্ঞা-রূপ ধারণ করিয়াছিল। তিনি লিখিয়াছেন—

'আমি লিখি ইহা মিথ্যা করি অনুমান।
আমার শরীর কাষ্ঠপুতলী সমান॥
বৃদ্ধ জরাতুর আমি অন্ধ বধির।
হস্ত হালে মনোবুদ্ধি নহে মোর স্থির॥
নানা রোগগ্রস্ত চলিতে বসিতে না পারি।
পঞ্চ রোগ পীড়ায় ব্যাকুল রাত্রি দিন মরি॥'

এই অবস্থাতে পুস্তকলিখন আরম্ভ করিয়া নয় বৎসরের অক্লান্ত চেষ্টায় ১৫৩৭ শকে (১৬১৫ খৃঃ) চৈতন্যচরিতামৃত শেষ করিলেন। পুস্তকে যখন যে গ্রন্থকার বা করচাকারের উক্তি গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছেন, কোনও স্থানে পরের লেখা নিজের বলিয়া চালাইবার চেষ্টা করেন নাই, অথবা ঘটনার সত্যতা সপ্রমাণ করিবার জন্য আদি লেখকের উল্লেখ করিয়াছেন। প্রভুর দক্ষিণ-ভ্রমণ-কাহিনী কাহার লেখা হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন, কিছুই বলেন নাই, কেবল বলিয়াছেন—

'অতএব নামমাত্র করিয়ে গণন।
কহিতে না পারি তার যথা অনুক্রম॥'

চরিতামৃতের লেখক যখন যে লেখকের লেখা হইতে কোনও ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন, তখনই এইরূপে স্বীকার করিয়াছেন, যথা :—

১। রথাগ্রে মহাপ্রভুর নৃত্যবিবরণ।
চৈতন্যাষ্টকে রূপ গোসাঞি করিয়াছেন বর্ণন॥ মধ্য ১৩

২। দামোদর স্বরূপের করচা অনুসারে।
রামানন্দ মিলনলীলা করিল প্রচারে॥ মধ্য ৯

৩। দামোদর স্বরূপ আর গুপ্ত মুরারি।
মুখ্য মুখ্য লীলাসূত্রে লিখিয়াছে বিচারি॥ আদি ১৩

৪। আদিলীলা মধ্যে প্রভুর যতেক চরিত।
সূত্ররূপে মুরারি গুপ্ত করিলা গ্রথিত॥ আ। ১৩

৫। বৃন্দাবন দাস ইহা চৈতন্যমঙ্গলে।
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন প্রভুকৃপাবলে॥ আ। ১৭

৬। শিবানন্দ সেনের পুত্র কবি কর্ণপূর।
রূপের মিলন গ্রন্থে লিখিয়াছেন প্রচুর॥ মধ্য ১৯

৭। স্বরূপ গোসাঞি আর রঘুনাথ দাস।
এই দুই করচাতে এ লীলা প্রকাশ॥
সেকালে এ দুই রহে মহাপ্রভুর পাশে।
আর সব করচা-কর্ত্তা রহে দূরদেশে॥ অন্ত ১৪

৮। রঘুনাথ দাসের সদা প্রভু সঙ্গে স্থিতি।
তাঁর মুখে শুনি লিখি করিয়া প্রতীতি॥ অন্ত ১৪

৯। চটকগিরি-গমনলীলা রঘুনাথ দাস।
চৈতন্য-স্তবকল্পবৃক্ষে করিয়াছেন প্রকাশ॥ অন্ত ১৪

কিন্তু কোথায়ও গোবিন্দ কর্ম্মকারের করচার উল্লেখ নাই। দক্ষিণ-ভ্রমণ কাহার লেখা দেখিয়া লিখিয়াছেন, বলেন নাই। সম্ভব যে, প্রভুর প্রত্যাগমনের পর তাঁহার সঙ্গী কৃষ্ণদাসের কাছে কোনও ভক্ত দক্ষিণের তীর্থস্থানের নামগুলি লিখিয়া রাখিয়াছিলেন, কিংবা মহাপ্রভুর মুখে সার্ব্বভৌমের বাড়ী ভক্তেরা শুনিয়া থাকিবেন। যখন পুরীতে প্রত্যাগমনের প্রথম রাত্রিতে "সার্ব্বভৌমের সঙ্গে আর লৈয়া নিজগণ। তীর্থযাত্রা কথা কহি কৈলা জাগরণ॥" মধ্য ৯। ক্রমে কাহারও মনে ছিল না, যাহা মনে ছিল, তাহা বলিয়াছিলেন, নামগুলিও যাহা মনে ছিল, তাহা বলিয়াছিলেন, কতক অশুদ্ধ উচ্চারণ বলিয়াছিলেন, বা পরবর্ত্তী নকলনবীশেরা ইচ্ছামত উচ্চারণে ওলট-পালট করিয়া দিয়াছিলেন। যেমন চরিতামৃতে আছে, "পীতাম্বর শিবস্থানে গেলা গৌরহরি।" সম্ভব যে আদি পুঁথিতে ছিল, 'চীতাম্বর শিবস্থানে গেলা গৌরহরি'। নকলকারী কখনও চীতাম্বর শব্দ শোনেন নাই, ভাবিলেন, শব্দটি পীতাম্বর হইবে, অমনি চীতাম্বর কাটিয়া পীতাম্বর করিয়া দিলেন। চীতাম্বর শিব আধুনিক চিদাম্বরম্ (Chidambaram) মাদ্রাস হইতে রামেশ্বরের পথে ১৫১ মাইল দূরে।

চরিতামৃতের মতে, কৃষ্ণদাস নামক এক ভাল মানুষ ব্রাহ্মণ প্রভুর সঙ্গে ছিলেন, কিন্তু গোবিন্দের করচার মতে কেবলমাত্র গোবিন্দই সঙ্গে ছিলেন। যে কেহ সঙ্গে থাকুক না কেন, তিনি কোনও রূপ করচা করিয়া রাখেন নাই। করচা থাকিলে নিশ্চয় একটা ক্রম থাকিত। চরিতামৃতের নামগুলি একখানি মানচিত্রে চিহ্নিত করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, পুরীতে ফিরিয়া আসিয়া কেবল স্মরণশক্তির উপর নির্ভর করিয়া কতকগুলি তীর্থস্থানের নাম বলিয়া দিয়াছেন, কতকগুলি বড় তীর্থস্থানের নাম (অবশ্য শৈব তীর্থের) ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় ছাড়িয়া দিয়াছেন। প্রভু যখন ছোট ছোট শিবমন্দিরও দেখিয়া বেড়াইয়াছেন, তখন বড়গুলি পথে পাইয়াও কখনই ছাড়েন নাই। শাক্তভীর্থে বোধ হয় যান নাই। গোবিন্দদাসের করচাখানি প্রামাণিক গ্রন্থ ধরিলে স্বীকার করিতে হইবে যে, চরিতামৃতের এক শতাব্দী পূর্ব্বে লেখা হইয়াছিল, অতএব কবিরাজ গোস্বামী নিশ্চয় দেখিয়া থাকিবেন। প্রভুর সঙ্গীর চক্ষে দেখা, করচা করা বর্ণনা থাকিতে তিনি অন্য বর্ণনা বা শোনা কথার সাহায্য কখনই লয়েন নাই; অর্থাৎ, চরিতামৃতের বর্ণনা করচা হইতে সংগ্রহ করা। কিন্তু দুইখানি পুস্তক পাশাপাশি রাখিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, উভয়ে মিল নাই; তীর্থস্থানের নামে, ক্রমে, বর্ণনায়, কিছুতেই মিল নাই। এমন কি, চরিতামৃত-লেখক গোবিন্দ কর্ম্মকার নামক কোনও ব্যক্তির অস্তিত্বেও বিশ্বাস করেন নাই। পূর্ব্বে বলিয়াছি, চরিতামৃত-মতে কৃষ্ণদাস নামক এক ভাল মানুষ ব্রাহ্মণ প্রভুর সঙ্গে ছিলেন, করচা-মতে কেবল গোবিন্দ কর্ম্মকার। কেহ হয় ত ভাবিতে পারেন যে, কৃষ্ণদাস ও গোবিন্দ একই ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু করচা-কার সে সন্দেহ করিবার অবসর দেন নাই। করচাকার স্বয়ং বলিতেছেন যে, দক্ষিণ-যাত্রার কথা উঠিতেই নিত্যানন্দ বলিলেন,—"দক্ষিণ-যাত্রায় তুমি যাবে অতি দূর। সঙ্গে যাক কৃষ্ণদাস ব্রাহ্মণ ঠাকুর॥ পবিত্র হইয়া বিপ্র তাহাই করিবে। যখন ইহারে যাহা করিতে বলিবে॥" কিন্তু "এত শুনি প্রভু মোর কন হাসি হাসি। গোবিন্দের সঙ্গ আমি বড় ভালবাসি॥ যে যাক সে নাহি যাক গোবিন্দ যাইবে। আমার যে কার্য্য তাহা গোবিন্দ করিবে॥" অর্থাৎ, প্রভু কৃষ্ণদাসকে সঙ্গে লইলেন কি না, স্পষ্ট করিয়া বলা হইল না, তবে কৃষ্ণদাস ও গোবিন্দ যে এক ব্যক্তি নহে, তাহা প্রমাণিত হইল। ইহার দশ লাইন পরে করচাকার বলিতেছেন, "তিন জনে বাহিরিনু দক্ষিণ-যাত্রায়।" এই "তিন জন" পদ দ্বারা বোধ হইতেছে, প্রভু কৃষ্ণদাসকে নিত্যানন্দের অনুরোধে ও গোবিন্দকে

আপন ইচ্ছায় সঙ্গে লইলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইহার পর সমস্ত করচাতে কোনও স্থানে কৃষ্ণদাসের অস্তিত্বের প্রমাণ নাই, বরং অনুপস্থিতির ইঙ্গিত আছে। দক্ষিণ-ভ্রমণকালে অহমদাবাদের কাছে কুলীনগ্রামবাসী রামানন্দ বসু ও তাঁহার ভৃত্য গোবিন্দচরণের সহিত দেখা হইল। করচালেখক গোবিন্দদাস এই সেবক গোবিন্দচরণের সহিত মিতালি পাতাইলেন দেখিয়া প্রভু বলিলেন, "গোবিন্দ যদ্যপি মিতে হইল তোমার। তবে রামানন্দ মিতে হইল আমার॥" ইহার পর চার জনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। যেখানে যখন আহার যোগাড় করিয়া প্রভু ভোগ দেন, সেখানেই "প্রসাদ পাইনু তবে মোরা তিন জনে। মুহি রামানন্দ আর গোবিন্দচরণে॥" এই পদ পুস্তকে তিন স্থানে একই রূপ আছে। ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে যে, কৃষ্ণদাস বা অন্য কোনও সেবক বা সঙ্গী প্রভুর সহিত ছিল না। কিন্তু রামানন্দ গৃহস্থ, ধনবান জমীদার, সে সন্ন্যাসীর ভিক্ষালব্ধ অন্ন খায় কেন, তাহা কবি বলেন নাই। চরিতামৃত-মতে প্রভুর সঙ্গী কৃষ্ণদাসকে মল্লার দেশে ভট্টমারী সন্ন্যাসীরা "স্ত্রীধন দেখাইয়া তারে লোভ জন্মাইল।" কৃষ্ণদাস প্রভুকে ছাড়িয়া ভট্টমারী-গৃহে চলিয়া গেলেন, কিন্তু প্রভু তাহাকে উদ্ধার করিয়া "কেশে ধরি বিপ্র লঞা করিলা গমন।" নীলাচলে আসিয়া সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে সকল কথা বলিয়া কৃষ্ণদাসকে প্রভু ত্যাগ করিলেন। চরিতামৃতের এই বিস্তারিত বর্ণনা অবিশ্বাস করিবার কারণ নাই, কিন্তু বিশ্বাস করিলে গোবিন্দ কর্ম্মকারের ও তাহার করচার অস্তিত্বে অবিশ্বাস করিতে হয়।

২। করচাতে কোনও কোনও বর্ণনা অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। যেমন গোবিন্দ যেখানেই ভিক্ষা করিতে গিয়াছেন, গ্রামবাসীরা তাঁহাকে "আটা চুনা" ভিক্ষা দিয়াছে, প্রভু "রুটি পাকাইয়া ভোগ" দিয়াছেন। কিন্তু দাক্ষিণাত্যের পূর্ব্বার্দ্ধে, অর্থাৎ তেলেঙ্গী ও তামিল দেশে লোকের প্রধান খাদ্য চাউল। গৃহস্থেরা অতিথি ভিখারী বিশেষতঃ সন্ন্যাসীকে চাউল দিয়া থাকে। কোনও কোনও গৃহস্থ-ঘরে জোয়ারির আটা থাকা সম্ভব, কিন্তু হিন্দু গৃহস্থরা অতিথিকে বিশেষতঃ সন্ন্যাসীকে আটা দেওয়া এখনও অতি হেয় বিবেচনা করে। অবশ্য সন্ন্যাসী স্বয়ং চাউলের বদলে আটা চাহিলে ভিন্ন কথা। আজ কাল রেলের সাহায্যে বড় নগরে গম পাওয়া যায় বটে, কিন্তু পল্লীগ্রামে এখনও আটা দুর্লভ। এক জন জনমানবহীন স্থানে "ত্রিরাত্রি চলিয়া গেল বৃক্ষের তলায়। অনাহারে উপবাসে কিছু নাহি খায়॥ চতুর্থ দিবসে এক রমণী আসিয়া।

আতিথ্য করিয়া গেল আটা চূণা দিয়া ॥" (৭১ পৃঃ—এ ঘটনা আধুনিক কডাপা Cuddapah জেলায় ঘটিয়াছে। এটি খাঁটী চাউল-খাদকের দেশ। যুক্ত-প্রদেশ বা পঞ্জাবে এরূপ আতিথ্য সম্ভব।)

থোড়া থোড়া চূনা আটা সংগ্রহ করিয়া। (৮২ পৃঃ কাবেরীকূলে—চাউলের দেশ)

এক জন গ্রাম্যলোক চূনা আনি দিল (১০৯ পৃঃ—ত্রিবঙ্কু নগরে—চাউলের দেশ)

ফল মূল চূনা আনি দেয় যোগাইয়া (১১০ পৃঃ— ঐ

কেহ ফল মূল আনে কেহ আনে আটা।

কেহ চূনা আনি দেয় অতিথির বাটা ॥ ১১৪ ঐ

আটা ভিক্ষা দিলা সবে বহুত আমায় ॥ (১১৬ পৃঃ—তুঙ্গভদ্রাতীরে। এখানে জোয়ারি জন্মায়। জোয়ারির আটা দেওয়া সম্ভব।)

৩। করচাতে রামানন্দ বসুর চরিত্র অদ্ভুত। রামানন্দ প্রভুর ভক্ত, ধনবান, সেবক লইয়া তীর্থ ভ্রমণ করেন, পরে জগন্নাথের রথের পট্টডোরের যজমান হইয়া আজ চার শত বৎসর তাঁহার বংশধরেরা পট্টডোর যোগাইতেছেন। সোমনাথে পাণ্ডারা অর্থ চাহিলে "হাসিয়া বলিলা প্রভু সন্ন্যাসীর ঠাঁই। টাকা, কড়ি, অন্ন, বস্ত্র, কিছু দিতে নাই ॥" কিন্তু "এই বাত শুনি কানে গোবিন্দ চরণ। দুই মুদ্রা পাণ্ডা হস্তে করিলা অর্পণ ॥" স্মরণ রাখিতে হইবে যে, তখনকার দুই মুদ্রা, মূল্যে এখনকার দুই টাকা অপেক্ষা অনেক বেশী ও সাধারণ যাত্রীরা দুই মুদ্রা পাণ্ডাকে দিতে পারিত না। এই ঘটনার কয়েক দিবস পরে এক দিন আমঝোরা নগরে ভিক্ষা জুটিল না। করচার কবি বলিতেছেন, "ক্ষুধার জ্বালায় মোরা ছট ফট করি।" (২০৪ পৃঃ)। সমস্ত দিনের পর গোবিন্দ দুই সের আটা ভিক্ষা করিয়া আনিলেন, প্রভু ষোলখানা রুটী গড়িয়া ভোগ দিলেন। খাইবার পূর্ব্বে এক ভিখারিণী বালক কোলে করিয়া অনাহারে কষ্ট পাইয়া কাঁদিয়া ভিক্ষা চাহিল। প্রভু আপনার ভাগ সমস্তই তাহাকে তুলিয়া দিলেন। সে তুষ্টা হইয়া আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে চলিয়া গেল। আর "অনাহারে দিলা প্রভু দিন কাটাইয়া।" গোবিন্দ "রজনীতে কিছু ফল ভিক্ষা মেগে আনি। ফল সেবা করি প্রভু কাটায় রজনী"। প্রভুর এমন অবস্থাতেও তাঁহার ভক্ত, ধনবান সঙ্গী, রামানন্দ বসু স্বয়ং নগরের হাটে খাদ্য ক্রয় করিয়া, আহার করিয়া সম্ভবতঃ নিদ্রা দিতেছিলেন। প্রভুকে ভিক্ষা দিতে অগ্রসর হন নাই। কথাটা বাঙ্গালী-চরিত্রের সহিত, ভক্ত-চরিত্রের সহিত, বৈষ্ণব-চরিত্রের সহিত, তীর্থযাত্রি-চরিত্রের সহিত, কোনও চরিত্রের সহিতই

খাপ খায় না। ইহার কয়েক দিবস পরে এই ধনবান যাত্রীর সেবক, পাণ্ডাকে মুদ্রাদাতা, দ্বারিকা হইতে ফিরিবার সময়ে বরোদা নগরে পঁহুছিয়া

"গোবিন্দচরণ মুহি ভিক্ষা করিবারে। উপস্থিত হইলাম গৃহস্থের দ্বারে।" এখানে এ ধনবান যাত্রীরা ভিক্ষা করে কেন? আবার কয়েক স্থানে পাই, প্রভু সন্ন্যাসীর ভিক্ষালব্ধ অন্ন রাঁধিলে "প্রসাদ পাইনু তবে মোরা তিন জনে। মুহি রামানন্দ আর গোবিন্দচরণে॥" এ চরিত্রের সামঞ্জস্য হয় কেমন করিয়া?

৪। প্রভু ৩রা মাঘ সন্ন্যাস লইবার সময়ে মাথা মুড়াইয়াছিলেন। ৭ই বৈশাখ দক্ষিণ যাত্রা করেন। রাম রায়ের কাছে দশ দিন ছিলেন। সিদ্ধবট (করচাতে অক্ষয়বট, কিন্তু অক্ষয়বট কোনও স্থানের নাম নহে, পঁহুছিতে জ্যৈষ্ঠের প্রথম সপ্তাহের বেশী হইতে পারে না; অথচ সেখানে (করচা মতে) "খসিল জটার ভার ধূলায় ধূসর।" এই চার মাসে খসিবার মত জটা হইল কেমন করিয়া? অনেক সন্ন্যাসীরা পরচুলে বটের আঠা মাখাইয়া জটা প্রস্তুত করেন বটে, কিন্তু দক্ষিণ ভ্রমণ করিয়া ফিরিয়া আসিবার পর যখন প্রভুর কাছে তাঁহার গুরুস্থানীয় ব্রহ্মানন্দ ভারতী চর্ম্মাম্বর পরিয়া আসিয়াছিলেন, তখন প্রভু তাঁহাকে চিনিতে চাহেন নাই। "মুকুন্দ কহে এই আগে দেখ বিদ্যমান। প্রভু কহে তেঁহো নহে তুমি আগেয়ান॥ অন্যেরে অন্য কহ নাহি তোমার জ্ঞান। ভারতী গোসাঞি কেন পরিবেন চাম॥" চর্ম্মাম্বর ত্যাগ করিলে তবে তাঁহাকে প্রণাম করিয়াছিলেন। সেই প্রভু কি স্বয়ং জটা পাকাইতে পারেন? আমি ত বিশ্বাস করিতে পারি না।

৫। চরিতামৃত-মতে প্রভু দক্ষিণ-ভ্রমণকালে মহীসুর-সীমানায় পয়স্বিনী-তীরে আদিকেশব-মন্দিরে ব্রহ্মসংহিতা ও তাহার পর কৃষ্ণবেণা-তীরে বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ-সমাজে কর্ণামৃত গ্রন্থ পাইয়াছিলেন। এই পুস্তক দুইখানি তিনি রাম রায়কে দিয়াছিলেন। রাম রায় বঙ্গীয় বৈষ্ণবসমাজে প্রচলিত করেন। সেকালে পুঁথি হাতে লেখা হইত, অতএব কর্ণামৃতের গল্প সাধারণ বৈষ্ণবদের কানে উঠিতে ৪০।৫০ বৎসর সময় ধরিলে বেশী হয় না। এই কর্ণামৃতে বিল্বমঙ্গলের গল্প আছে। এখন ছাপার কৃপায় বঙ্গীয় পাঠকমাত্রেই বিল্বমঙ্গলের গল্প জানে। কিন্তু যখন করচা লেখা হইয়াছিল (অর্থাৎ ১৫১৫ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে) তখন কয় জন বাঙ্গালী বৈষ্ণব এ গল্প শুনিয়াছিল? গোবিন্দ কর্ম্মকারের না জানাই সম্ভব ছিল। কিন্তু প্রভুর দক্ষিণ যাইবার পথে, গ্রন্থ পাইবার

বহু পূর্ব্বে, পদ্মকোটে (Puddoocotah) এক অন্ধ দ্বারা কবি প্রভুর স্তুতি করাইয়াছেন; সেই অন্ধ বলিতেছে, "বস্ত্ররূপে দ্রৌপদীর রাখিলে সম্মান। অন্ধ বিল্বমঙ্গলের চক্ষু দিলা দান॥" স্তুতির মধ্যে এরূপে কোনও পূর্ব্ব ঘটনার উল্লেখ কেবল এমন অবস্থায় সম্ভব, যখন শ্রোতৃমাত্রেই বুঝিতে পারে। এই বিল্বমঙ্গলের উল্লেখ দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, এই কবিতা এমন সময়ে লেখা, যখন বঙ্গীয় পাঠকমাত্রই কর্ণামৃতের গল্প জানিত।

৬। করচাতে কতকগুলি বর্ণনা এমন উজ্জ্বল যে, বোধ হয়, কবি স্বয়ং দেখিয়া লিখিয়াছেন, শোনা কথা লেখেন নাই। যেমন নীলগিরি ও পশ্চিম ঘাটের-বর্ণনা, কন্যাকুমারীতে সমুদ্র-বর্ণনা ইত্যাদি। আবার স্থানবিশেষে চরিতামৃতের লেখাকে অশুদ্ধ বা গ্রাম্য ভাষা ভাবিয়া নিজে বুদ্ধি খাটাইয়া সাধুভাষা ও শুদ্ধ করিতে গিয়া অশুদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছেন। যেমন, চরিতামৃতে আছে—"শিয়ালী ভৈরবী দেবী করি দরশন।" ইহা দেখিয়া করচার কবি ভাবিয়াছেন, ভৈরবী ঠাকুরাণী স্ত্রী-শিয়াল বা শৃগালী ছিলেন, অথবা ভৈরবীর নাম শ্রীমতী শৃগালী দেবী ছিল, তাই লিখিয়াছেন, "শৃগালী ভৈরবী নামে আর এক মূরতা। নদীর কূলেতে হয় তাঁহার বসতি।" কিন্তু চরিতামৃতে নদীতীরে কুটীর বা গর্ত্তবাসিনী কোনও শৃগালকুলোদ্ভবা তপস্বিনীর অথবা শৃগালী-নামধারিণী তপস্বিনীর বর্ণনা করা হয় নাই। পাঠক মহাশয় একখানি ব্র্যাডশা লইয়া খুঁজিলেই পাইবেন যে, সাউথ ইণ্ডিয়ান রেল (S. I. R.) মাদ্রাস হইতে দক্ষিণে রামেশ্বর পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই পথে মাদ্রাস হইতে (Egmore হইতে) ১০১ মাইল দূরে ভিল্লুপুরম (Villupuram Junction) জংশন, ভিল্লুপুরম হইতে দক্ষিণ দিকের পথে ৬৩ মাইল দূরে শিয়ালী Shiyali নগর। শিয়ালীতে একটি প্রসিদ্ধ শিবমন্দির আছে। সম্ভব যে, পূর্ব্বে যে পদটী ছিল "শিয়ালী ভৈরব শিব করি দরশন", পরে কোনও নকলকারী শিয়ালী শব্দকে স্ত্রীলিঙ্গ ভাবিয়া "শিয়ালী ভৈরবী দেবী" করিয়া দিয়াছে। তাহার বহু কাল পরে করচালেখক শৃগালী করিয়া ফেলিয়াছেন।

করচাকার ভূগোল ও ইতিহাস দুই-ই অগ্রাহ্য করিয়াছেন। প্রভু আমেদাবাদের কাছে ঘোগা নামক গণ্ডগ্রামে বারমুখী নামে বেশ্যাকে ভক্তি দান করেন, পরে—

বারমুখী কুলটারে প্রভু ভক্তি দিয়া।
সোমনাথ দেখিবারে চলিল ধাইয়া॥

জাফেরাবাদের দিকে প্রভু চলি যায়।
বহু কষ্টে তিন দিনে পৌঁছায় তথায়॥

কিন্তু যোগা হইতে জাফেরাবাদ মানচিত্রে ১৬০ এক শত ষাট মাইল অপেক্ষা কিছু বেশী। পথ ঘাট সে কালে কিরূপ ছিল, জানি না, তবে মধ্যে মধ্যে বন জঙ্গল ছিল, হাঁটা পথে ১৮০ মাইল ধরিলে বেশী হয় না। প্রত্যহ ৫০।৬০ মাইল হাঁটা অসম্ভব। জাফেরাবাদ হইতে

প্রভাতে উঠিয়া মোরা সোমনাথে যাই।
ছয় দিন পরে গিয়া সেখানে পৌঁছাই॥

জাফেরাবাদ হইতে সোমনাথ বড় জোর ত্রিশ ক্রোশ। এই ৩০ মাইল হাঁটিতে ছয় দিন, আর ১৬০ মাইল হাঁটিতে তিন দিন!

৮। করচা-মতে প্রভু কন্যাকুমারী হইতে ত্রিবঙ্কু দেশে (Travancore) গেলেন। "এথাকার রাজা তার নাম রুদ্রপতি।" করচাকার এই রুদ্রপতির অনেক সুখ্যাতি করিয়াছেন। কিন্তু দক্ষিণে "রুদ্র" নাম বৈষ্ণবের হয় না, কেবল শৈবের হয়, এবং ত্রিবঙ্কুর রাজারা চিরকাল ঘোর বৈষ্ণব। এইরূপে সন্দেহ হওয়ায় ত্রিবঙ্কুরের ইতিহাস সংগ্রহ করিয়া দেখিলাম যে, প্রভু যখন দক্ষিণে ভ্রমণ করিয়াছিলেন (অর্থাৎ ১৫১০।১৫১১ খ্রীষ্টাব্দে) তখন ত্রিবঙ্কুর রাজা ছিলেন "শ্রী বীর এরবী বর্ম্মা রাজা" (Sri Veer Erwi Varma Raja) তিনি ১৫০৪ হইতে ১৫২৮ পর্য্যন্ত রাজ্য করিয়াছিলেন। ইতিহাসে ১৩৩৫ খৃষ্টাব্দ হইতে আজ পর্য্যন্ত কোনও রাজার নাম রুদ্রপতি নাই। করচালেখক যে কেবল কল্পনা-বলে এ সকল বর্ণনা লিখিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

৯। প্রভু যখন দক্ষিণে যান, তখন তাঁহার ভক্তমধ্যে অনেকগুলি ব্রাহ্মণ ছিলেন, তথাপি প্রভুর সঙ্গে রাঁধিয়া দিবার মত কোনও লোক গেল না, আর ভক্তরা বাছিয়া বাছিয়া একটি পেটুক কামারকে সঙ্গে দিলেন, প্রভুকে প্রত্যহ আপনার বিহ্বলতা ভুলিয়া হাত পোড়াইয়া আপনার ও সেবকের, পেট ঠাণ্ডা করিতে হইত। কথাটা বড় অশ্রদ্ধেয় ও অবিশ্বসনীয়।

মহাপ্রভু দক্ষিণের বিষ্ণুমন্দির ও অধিকাংশ শিবমন্দির দেখিয়াছিলেন, কিন্তু কামাক্ষী, মীনাক্ষী ইত্যাদি প্রসিদ্ধ শক্তিমন্দিরে গিয়াছিলেন কি না, জানা যায় না। শঙ্করাচার্য্য শাক্ত ধর্ম্মকে "অধর্ম্ম" বলিয়াছিলেন, পরে স্বপ্নাদেশ পাইয়া কাঞ্চীর কামাক্ষী ও মদুরার মীনাক্ষীমন্দিরে বসিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন। হয়

ও প্রভু শাক্তমন্দিরে যান নাই, কিন্তু শিবমন্দিরের ও কয়েকটি বড় মন্দিরের নাম নাই। যখন অন্য শিবমন্দিরে গিয়াছিলেন, তখন সেখানেও গিয়া থাকিবেন; সম্ভব, প্রভুর সঙ্গী তীর্থের ফর্দ্দ দিবার সময়ে ভুল করিয়াছেন।

গোবিন্দ কর্ম্মকারের করচা অবিশ্বাস করিবার যে কয়টি কারণ দেখাইলাম, উহার কোনও একটি স্বতন্ত্র রূপে ধরিলে অবিশ্বসনীয় বলিবার মত যথেষ্ট কারণ হয় না। কিন্তু সকলগুলি একত্র ধরিলে আর বিশ্বসনীয় বলা চলে না। করচা সম্বন্ধে "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে"র লেখক বলেন, "তাঁহার লেখায় এমন একটু সারল্যমাখা সত্যপ্রিয়তা আছে, যাহাতে করচাখানি ফোটোগ্রাফের ন্যায় সুন্দর ও বিশুদ্ধ বলিয়া প্রতীয়মান হয়।...অনেকাংশে প্রামাণিক ঐতিহাসিক গ্রন্থ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।"

আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এই করচাখানি মহাপ্রভুর দক্ষিণ-ভ্রমণের বহু পরে, চরিতামৃত লেখা হইবারও বহু পরে, কোনও ব্যক্তি কতক স্বয়ং দেখিয়া, কতক লোকমুখে শুনিয়া ও কল্পনাবলে লিখিয়াছেন, এবং মহাপ্রভুর নামের সহিত গ্রথিত করিয়াছেন। অতএব, কেবল দক্ষিণ-দেশ-বর্ণনারূপে উহার মূল্য যাহাই হউক, মহাপ্রভুর ভ্রমণ-বর্ণনারূপে উহার কোনও মূল্য নাই।

শ্রীঅমৃতলাল শীল।

সাহিত্যে স্বাস্থ্যরক্ষা।

৩

রবীন্দ্রনাথের চোখের বালির পরে, বিধবার প্রেমে পড়া লইয়া আরও কয়েকখানা বই বাহির হইয়াছে। তাহার মধ্যে বর্ত্তমান সময়ের লোকপ্রিয় সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাসলেখক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বড়দিদি' ও 'পল্লী-সমাজ' উল্লেখযোগ্য। এই সকল বই অনেকেই পড়িয়াছেন, সুতরাং ইহাদের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া অনাবশ্যক।

'বড়দিদি' মাধবী দেবী এক জমীদারের কন্যা; যোগেন্দ্রনাথ নামক একটি সুশিক্ষিত সচ্চরিত্র যুবকের সহিত তাহার এগার বৎসর বয়সে বিবাহ হয়; তাহার তিন বৎসর পরেই সে বিধবা হয়। স্বামীর মৃত্যুর পরে মাধবী স্বামীর উপদেশে ক্রোধ হিংসা দ্বেষ প্রভৃতি ত্যাগ করিয়া স্নেহ মমতা লইয়া পিতৃভবনে ফিরিয়া আসিল, এবং পিতার সংসারে স্নেহময়ী সর্ব্বময়ী কর্ত্রী হইয়া পড়িল। সুরেন্দ্রনাথ নামক একটি এম. এ. পাশকরা উকীলের ছেলে বিলাত যাইতে

না পারিয়া রাগ করিয়া বাড়ী ছাড়িয়া চাকুরীর চেষ্টায় কলিকাতায় আসিয়া মাধবীর ছোট ভগ্নী প্রমীলার গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হইল। ছেলেটি নিতান্ত বাহ্যজ্ঞানশূন্য। সে প্রায়ই অন্যমনস্ক হইয়া Mathematicsএর problem চিন্তা করিত। তাহার আচরণ দেখিয়া কেহ তাহাকে চিনিতে পারিল না। তাহার নিতান্ত অসহায় অবস্থা দেখিয়া মাধবীর তাহার প্রতি দয়া হইল। সেও খাওয়া পরা প্রভৃতি সকল বিষয়ে বড় দিদির প্রতি নিতান্ত নির্ভরশীল হইয়া পড়িল। ক্রমে মাধবীর তাহার প্রতি ভালবাসা জন্মিল। সুরেন্দ্রনাথও অলক্ষিতভাবে বড়দিদিকে ভালবাসিয়া ফেলিল। প্রমীলাকে রীতিমত না পড়ানর দোষে এক দিন মাধবী তাহার প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করিল। পরে চাকরের কথায় সুরেন্দ্র সেখান হইতে হঠাৎ এক দিন চলিয়া গেল। তখন মাধবীর শিরে বজ্রাঘাত হইল। পরে কলিকাতার রাস্তায় চলিতে চলিতে সুরেন্দ্র গাড়ী চাপা পড়িয়া হাঁসপাতালে আনীত হইল। সেখানে ক্রমে সুস্থ হইয়া তাহার পিতাকে সংবাদ পাঠাইয়া আনিয়া তাঁহার সঙ্গে বাড়ী ফিরিয়া গেল। পরে সে তাহার মাতামহের বিস্তীর্ণ জমীদারীর মালিক হইয়া বিবাহ করিল। কিন্তু সে জীবনে সুখী হইল না। তাহার ম্যানেজারের হাতে জমীদারীর ভার ছাড়িয়া দিয়া কুৎসিত আমোদ প্রমোদে গা ঢালিয়া দিল। এ দিকে মাধবীর পিতার মৃত্যুর পরে, তাহার ভ্রাতৃবধুর কর্ত্তৃত্ব সহ্য করিতে না পারিয়া, সে তাহার বহুকালপরিত্যক্ত স্বামিগৃহে ফিরিয়া আসিল। তাহার স্বামীর বাড়ী সুরেন্দ্রনাথের জমীদারীর মধ্যে। আর এক জন দূর-সম্পর্কীয় আত্মীয় সুরেন্দ্র-নাথের ম্যানেজারের সহিত চক্রান্ত করিয়া মাধবীর সম্পত্তি বাকী খাজনার জন্যে নিলাম করাইয়া খরিদ করিয়া লইল। হঠাৎ সুরেন্দ্রনাথ এই কথা জানিতে পারিল, এবং তৎক্ষণাৎ ঘোড়ায় চড়িয়া মাধবীর শ্বশুরের গ্রামে যাত্রা করিল। সুরেন্দ্রনাথ তখন রুগ্ন, বেগে যাইতে যাইতে তাহার মুখ দিয়া রক্ত উঠিল। মাধবী সে দিন বাড়ী ছাড়িয়া নৌকায় যাত্রা করিয়াছিল; সুরেন্দ্রনাথ 'বড়দিদি বড়দিদি' বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে সেই নৌকা ধরিল। তখন তাহার মুখ দিয়া রক্ত উঠিতেছে। মাধবী তাহাকে কোলে শোয়াইয়া সেই নৌকায় সুরেন্দ্রনাথের বাড়ীতে লইয়া আসিল। সেখানে বড় দিদির কোলে মাথা রাখিয়া সুরেন্দ্রনাথ প্রাণত্যাগ করিল।

গল্পটি ক্ষুদ্র, কিন্তু গ্রন্থকারের কলা-কৌশলে মাধবী-চরিত্র সুন্দর ফুটিয়াছে, এবং নিতান্ত মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছে। কিন্তু এ স্থানে আমাদের নালিশ এই, তিনি

মাধবীকে দেবীরূপে চিত্রিত করিয়া অবশেষে মানবী করিলেন কেন? তাহার স্বামী মৃত্যুকালে তাহাকে বলিয়াছিল—'তুমি সৎপথে থাকিও, তোমার পুণ্যে আবার তোমাকে পাইব।' মাধবী স্বামীর সেই সদুপদেশ ভুলিল কেন? 'যে জীবন তুমি আমার সুখের জন্য সমর্পণ করিতে, তাহা সকলের সুখে সমর্পণ করিও।' ইহা ত উত্তম কথা। হিন্দু বিধবার ইহাই ত জীবনের আদর্শ হওয়া উচিত। মাধবী ত প্রথমে এই আদর্শের অনুসরণ করিয়া বাড়ীর সকলের বড়দিদি হইয়াছিল। মাষ্টারটিও তাহাকে সেই সূত্রে বড়দিদি বলিত। সে যেরূপ নির্ম্মলচরিত্র যুবক, তাহার মনে কুভাব আসিতেই পারে না। বড়দিদিও তাহার স্নেহময়ী ভগিনীর স্থান অধিকার করিয়া থাকিতে পারিতেন। কিন্তু সেই পুণ্যময় গৌরবান্বিত সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া, দেবতুল্য স্বামীকে ভুলিয়া, মাধবী প্রেমে পড়িলেন কেন? আমরা গ্রন্থমধ্যে এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজিয়া পাই না। বিনোদিনীর রক্তে যেমন প্রেমে পড়ার বীজ ছিল, এবং তাহার বাল্যকালের শিক্ষায় সেই বীজের বিকাশ হইয়াছিল, মাধবীর মধ্যে ত আমরা সেরূপ কিছু পাই না। সুরেন্দ্রনাথের মধ্যেও সে সকল ভাবের একান্ত অভাব। তবে ইহার এই এক উত্তর হইতে পারে, 'Cupid is blind'—কন্দর্পদেবের দেশ কাল পাত্র বিবেচনা নাই। কিন্তু ইহা নিতান্ত মামুলী কৈফিয়ৎ। আসল কথা এই, প্রেম না হইলে নবেল হয় না, আর বিধবাকে প্রেমে না ফেলিলে নবেলের উপকরণ কোথা হইতে আসিবে? কিন্তু গ্রন্থকার ত বাৎসল্য রস ফুটাইয়া অনেক গল্প লিখিয়াছেন। তাঁহার 'বিন্দুর ছেলে', 'রামের সুমতি', 'মেজদিদি' প্রভৃতি গল্প ত মধুর—অতি মধুর। তিনি 'বড়দিদি'কে বড়দিদি রাখিয়াও বাৎসল্য রস বেশ ফুটাইতে পারিতেন, তাহা হইলে এই গ্রন্থখানি বীভৎসরসপ্রধান হইত না। তবে আজ কাল লোকে এইরূপ উৎকট রসই বেশী পছন্দ করে। গ্রন্থকারও বোধ হয় তাহাদের খোরাক যোগান আবশ্যক মনে করেন। কিন্তু এইরূপ অপবিত্র প্রেমের চিত্র দ্বারা সমাজের কি অনিষ্ট হইতেছে, ইহা একবার চিন্তা করা উচিত। মাধবীর এক সখী মনোরমা তাঁহার স্বামীকে মাধবীর প্রেমে পড়ার কথা লিখিয়াছিলেন। তদুত্তরে তিনি লিখিলেন—

'মাধবী পোড়ারমুখী তাহাতে আর সন্দেহ নাই, কেন না বিধবা হইয়া মনে মনে আর এক জনকে ভালবাসিয়াছে। তোমাদের রাগ হইবার কথা—বিধবা হইয়া সে তোমাদের সধবার অধিকারে হাত দিতে গিয়াছে।...কিন্তু কি জান মনোরমা; তুমি আমাকে আশ্চর্য্য করিতে পার নাই, আমি একবার একটা লতা দেখিয়াছিলাম, সেটা আধ ক্রোশ ধরিয়া ভূমি-

তলে লতাইয়া লতাইয়া অবশেষে একটা বৃক্ষে জড়াইয়া উঠিয়াছে। এখন তাহাতে কত পাতা, কত পুষ্প মঞ্জরী। তুমি যখন এখানে আসিবে, তখন দু'জনে সেটিকে দেখিয়া আসিব।'

আমরা এখানে গ্রন্থকারের মাধবীকে মানবী করার কতকটা কৈফিয়ৎ পাইতেছি। তাঁহার মতে, বিধবা আশ্রয়বৃক্ষশূন্য লতার ন্যায় কেন মাটীতে পড়িয়া থাকিবে? তাহার অন্য বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া পুষ্প ফলে শোভিত হওয়াই জীবনের সার্থকতা। অবশ্য, ইহাই বর্ত্তমান সময়ের liberal view (উদার মত); কিন্তু এই উদার মত হিন্দু সমাজ এ পর্য্যন্ত গ্রহণ করে নাই। আমাদের মতে স্বধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিতা হিন্দু বিধবা রূপ লতা ভূমিতলে গড়াইবে কেন? তাহার স্থান দেবমন্দিরের চূড়ায়! তাহার সেই গৌরবের স্থান হইতে তাহাকে ভ্রষ্ট করিবার পক্ষে যাঁহারা সাহায্য করেন, তাঁহারা সমাজের উপকার না করিয়া অপকার করেন।

এই গ্রন্থকারের "পল্লীচিত্রে" আর একটি হিন্দু বিধবার পতনের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। যদু মুখুয্যের কন্যা রমা ওরফে রাণী তারিণী ঘোষালের পুত্র রমেশের খেলার সাথী ছিল। সেই সূত্রে দুই জনের মধ্যে প্রণয় জন্মিয়াছিল। কিন্তু তখন তাহারা প্রেম কাহাকে বলে, তাহা অবশ্যই বুঝিত না। উভয়ের বিবাহের প্রস্তাব হইয়াছিল, কিন্তু যদু মুখুয্যে ঘোষালের পুত্রের সহিত কন্যার বিবাহ দিতে রাজি হইলেন না। রমার অন্যত্র বিবাহ হইল; কিন্তু বিধির বিধানে সে অল্পকাল পরেই বিধবা হইল। সে তাহার ভাই যতীনকে লইয়া তাহার পিতার ভবনে বাস করিতে লাগিল, এবং পিতার জমীদারী রক্ষা করিতে লাগিল। বিষয় সম্পত্তি লইয়া রমেশের পিতা তারিণী ঘোষালের সঙ্গে যদু মুখুয্যের অনেক বিবাদ বিসংবাদ হইয়াছিল, কিন্তু রমেশ রুড়কী কলেজে অধ্যয়ন করিত, দীর্ঘ কাল বাড়ী আসে নাই। পিতার মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধ করিবার জন্য সে বাড়ী আসিল। তারিণীর ভাই বেণী অত্যন্ত খারাপ লোক। সে রমার সহিত রমেশের অসদ্ভাব ঘটাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু ফল তাহার উল্টা হইল। প্রথম দর্শনে রমেশ রমাকে এইরূপ সম্ভাষণ করিল—

'রমার সেই কথাটি আমি কোন দিন ভুলতে পারব না বড়দা! যখন মা মরে গেলেন ও তখন খুব ছোট। সেই বয়সেই আমার চোখ মুছিয়ে দিয়ে বলেছিল, "রমেশদা, তুমি কেঁদ না, আমার মাকে আমরা দুজনে ভাগ করে নেব।" তোর সে কথা বোধ হয় মনে হয় না রমা, না? আচ্ছা আমার মাকে মনে পড়ে কি?'

এই সম্ভাষণে আমরা বাল্যসখীর প্রতি একটি স্নেহশীল উদার হৃদয়ের

নির্দ্দোষ প্রীতি ভিন্ন আর কিছু পাই না। কিন্তু রমার মাসীর রূঢ় ব্যবহারে রমেশের সেই প্রীতিপূর্ণ হৃদয় যেন থমকিয়া গেল। রমাও নিতান্ত লজ্জিতা হইয়া তাহার মাসীকে বলিল—'যে যতখানি বলুক না কেন, এতখানি বিষ জিব দিয়ে ছড়াতে তোমার মত কেউ ত পেরে উঠত না।'

ইহার পরে রমেশ রমার সঙ্গে আর আত্মীয়তা করিতে যায় নাই। বরং রমেশের পিতার শ্রাদ্ধ উপলক্ষে যখন রমার মাসী আসিয়া বেণীর মাতা বিশ্বেশ্বরীকে অপমান করিয়া গেল, তখন রমার বিরুদ্ধেও রমেশের মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। রমা কিন্তু তাহার ভাই যতীনের নিকট রমেশের স্কুলের উন্নতির জন্য বদান্যতার কথা শুনিয়া রমেশের প্রতি মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হইতে লাগিল। ইহার পর পুকুরের মাছ ধরা লইয়া ও একটা বাঁধ কাটা লইয়া উভয়ের মধ্যে ঘোরতর মনোমালিন্য হইল। তবে ইহার মধ্যে এক দিন তারকেশ্বরে হঠাৎ রমার সহিত রমেশের দেখা হইলে রমা তাহাকে তাহার নিজ বাসায় লইয়া গিয়া যত্নপূর্ব্বক খাওয়াইয়াছিল। বিদেশে এক জন প্রতিবেশীর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হইলে এরূপ কে না করে?

মোট কথা, ইহাতে উভয়ের মধ্যে প্রেমসঞ্চারের কারণ কি? বাল্যকালে, অনেক বালক বালিকাই এক সঙ্গে খেলা করে, তাই বলিয়া বয়স হইলেই কি তাহারা প্রেমে পড়িবে? এরূপ যদি হয়, তাহা হইলে ত বালক বালিকাদিগকে এক সঙ্গে খেলা করিতে দেওয়াই অন্যায়! তুমি হয় ত বলিবে, প্রতাপ শৈবলিনী যখন খেলা করিতে করিতে প্রেমে পড়িয়াছিল, তবে ইহারা পড়িবে না কেন? কিন্তু প্রতাপ শৈবলিনী যেমন প্রেমে পড়িয়াছিল, সে রকম আর কত শত বালক বালিকা প্রেমে পড়ে নাই। আর বাল্যকালের সেই নির্ম্মল, নির্দ্দোষ প্রণয় বিবাহ হওয়ার পরেও স্থায়ী থাকিবে, তাহার কোন্ কথা আছে? শৈবলিনীর বিবাহের পরে যে কারণে সে স্বামীকে ভালবাসিতে পারিল না, গ্রন্থকার তাহা উত্তমরূপে দেখাইয়াছেন। এ স্থলে রমার রমেশের সহিত প্রেমে পড়িবার কি কারণ আছে? রমা কুন্দনন্দিনীর ন্যায় অবস্থায় পড়িয়া রমেশকে ভালবাসিতে শেখে নাই। রমা রোহিণীর ন্যায় কোকিলের কুহুতানে মাতিয়া উঠে না। রমা বিনোদিনীর ন্যায় ইংরেজী মেম দ্বারা শিক্ষিতা নহে, এবং বিলাতী হাব ভাবও শিক্ষা করে নাই। তবে সেই অর্দ্ধশিক্ষিতা নির্ম্মলচরিত্রা সরলা হিন্দু বিধবা তাহার মৃত পতিকে ভুলিয়া রমেশকে কেন ভালবাসিবে? সেই 'cupid is blind' ভিন্ন আমরা ইহার কোনও সন্তোষ-

জনক উত্তর খুঁজিয়া পাই না। আর সেই ভালবাসাও শত্রুতাসাধন করিয়া ভালবাসা, অর্থাৎ, যেমন হিরণ্যকশিপু বিষ্ণুর সহিত শত্রুতা করিয়া সামীপ্য-মুক্তি লাভ করিয়াছিল, এ সেইরূপ।

আবার রমেশও খুব উদারহৃদয়, পরোপকারী, উচ্চশিক্ষিত যুবক। সে পল্লীগ্রামের দলাদলি ও নানা প্রকার হীনতা দেখিয়া তাহার উন্নতিসাধনের জন্য জীবন উৎসর্গ করিল। কিন্তু তাহার চিত্তেও আবার রমার প্রতি প্রেম-সঞ্চার হইল কেন? রমা অবশ্য তাহার বাল্যসখী ছিল, কিন্তু বাল্যসখীর বিবাহ হইয়া গেলেও কি তাহার প্রতি প্রেম পোষণ করিতে হইবে? দুর্ভাগ্য-ক্রমে সে বিধবা হইলে, তাহার সেই বৈধব্য ব্রত ভঙ্গ করান কি যথার্থ ভালবাসার পরিচয়? অবশ্য, রমেশ সেরূপ কোনও চেষ্টা করে নাই; তবুও রমা যখন এক দিন যতীনকে সঙ্গে করিয়া তাহার সঙ্গে নিভৃতে দেখা করিতে আসিল, তখন রমেশ হৃদয়ের আবেগে বলিল—

'তোমাকে ভালবাসতাম রমা। আজ আমার মনে হয়, তেমন ভালবাসা বোধ করি কেউ কখনো বাসেনি।...তুমি ভাবচ তোমাকে এ সব কাহিনী শোনানো অন্যায়। আমার মনেও সেই সন্দেহ ছিল বলেই, সে দিন তারকেশ্বরে যখন একটি দিনের যত্নে আমার সমস্ত জীবনের ধারা বদলে দিয়ে গেলে তখনও চুপ করেছিলাম।'

রমা বলিল—

'তবে আজকেই বাড়ীতে পেয়ে আমাকে অপমান করচেন কেন?'

রমেশ বলিল—

'অপমান? কিছু না। এর মধ্যে মান অপমানের কোন কথা নেই। এ যাদের কথা হচ্ছে, সে রমাও তুমি কোন দিন ছিলে না, সে রমেশও আমি আর নেই। বিশ্বাস হয়েছিল,—তুমি যা' ইচ্ছা বল, যা' খুসি কর, কিন্তু আমার অমঙ্গল তুমি কিছুতেই সইতে পারবে না। বোধ করে ভেবেছিলাম, সেই যে ছেলেবেলায়—একদিন আমাকে ভালবাসতে, আজও তা' একেবারে ভুলতে পারনি। তাই ভেবেছিলাম, কোন কথা তোমাকে না জানিয়ে —তোমার ছাওয়ায় বসে আমার সমস্ত জীবনের কাজগুলো ধীরে ধীরে করে যাব।'

রমেশের এই আবেগপূর্ণ হৃদয়ের প্রেম-প্রলাপ অবশ্যই রমার হৃদয়ে প্রতি-ঘাতের সৃষ্টি করিল। ইহার পর যদিও রমা ভৈরব আচার্য্যের মোকদ্দমায় সাক্ষ্য দেওয়ার সময় সত্য গোপন করিয়া রমেশকে জেলে দেওয়ার সহায়তা করিয়াছিল, সে কেবল অভিমানভরে, এবং নিজের কলঙ্ক ঢাকিবার জন্য। কিন্তু রমেশ জেলে গেলে তাহার ঘোর অনুতাপ আরম্ভ হইল, এবং পরে সে রোগে শয্যাশায়িনী হইল। অবশেষে বিশ্বেশ্বরী যখন রমাকে সান্ত্বনা দিতে আসিলেন, তখন রমা তাঁহাকে বলিল—

'আমি যখন আর থাকব না, তখনও যদি তিনি আমাকে ক্ষমা করতে না পারেন, তবে শুধু এই কথাটি আমার হ'য়ে তাঁকে বোলো জ্যাঠাইমা, যত মন্দ ব'লে তিনি আমাকে জানতেন, তত মন্দ আমি ছিলাম না। আর যত দুঃখ তাঁকে দিয়েছি, তার অনেক দুঃখও যে আমি পেয়েছি—তোমার মুখের এই কথাটি হয় ত তিনি অবিশ্বাস করবেন না।'

বিশ্বেশ্বরী রমার হৃদয়ের ভাব বুঝিতে পারিয়া তাহাকে বুক দিয়া চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন—

'চল মা, আমরা কোন তীর্থে গিয়া থাকি। যেখানে বেণীও নাই, রমেশও নাই,—যেখানে চোখ খুললেই ভগবানের মন্দিরের চূড়া চোখে পড়ে—সেইখানে যাই। আমি সব বুঝতে পেরেচি রমা। যদি যাবার দিনই তোর এগিয়ে এসে থাকে, তবে এ বিষ বুকে পুরে জ্বলে পুড়ে সেখানে গেলে ত চলবে না। আমরা বামুনের মেয়ে, সেখানে যাবার দিনটিতে আমাদের তার মতই গিয়ে উপস্থিত হ'তে হবে।'

রমা অনেকক্ষণ চুপ করিয়া পড়িয়া থাকিয়া উচ্ছ্বসিত দীর্ঘশ্বাস আয়ত্ত করিতে করিতে শুধু কহিল,—

'আমিও তেমনি করেই যেতে চাই জ্যাঠাইমা।'

ইহার পরে রমেশ জেল হইতে ফিরিয়া আসিলে রমা ঝিকে দিয়া তাহাকে ডাকাইয়া আনিয়া বলিল—

'আমার যতীনকে তুমি হাতে তুলে নিয়ে, আমার সকল অপরাধ ক্ষমা করে, আজ আশীর্ব্বাদ করে আমায় বিদায় দাও রমেশদা, আমি যেন নিশ্চিন্ত হয়ে আমার স্বামীর কাছে যেতে পারি।'

রমার এই শেষ কথাগুলি পড়িতে পড়িতে চোখের পাতা ভিজিয়া উঠে, সন্দেহ নাই। এখানেই কবির আর্টের বিকাশ হইয়াছে। কিন্তু পরক্ষণেই আবার পূর্ব্বকথা স্মরণ করিয়া রমাকে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়—

'ঠাকুরাণী, এত দিন তোমার সেই স্বামী বেচারা কোথায় ছিল? তোমার বাল্যসখা রমেশকে পাইয়া তাহাকে ভুলিলে কেন? তুমি না অত্যন্ত বুদ্ধিমতী, তুমি বুদ্ধিবলে পিতার জমীদারী শাসন করিয়া থাক, কিন্তু নিজের চিত্ত দমন করিতে পারিলে না? তুমি এত দূর সতর্ক যে, রমেশের চাকর ভজুয়া তোমার বাড়ীতে পুকুরের ভাগের মাছ চাহিতে আসিয়াছিল বলিয়া তুমি তাহার নামে পুলিসে ডাইরী করাইয়া রাখিলে, অথচ তুমি রমেশের সঙ্গে ব্যবহারে একটুও সাবধান হইতে পারিলে না? তুমি যে এত ঘন ঘন তারকেশ্বরে গিয়া শিবপূজা কর, তাহার সার্থকতা কোথায়? তোমার এই পতন নিতান্তই ইচ্ছাকৃত, ইহা তোমার একটা সখ; অথবা গ্রন্থকারের সখ—কারণ প্রেম না হইলে নবেল হয় না।'

গ্রন্থকার নবেল লেখার জন্য তাঁহার 'পল্লীচিত্রে' এই অবৈধ প্রেমের চিত্র অঙ্কিত করিয়া পল্লীগ্রামের দলাদলি ও কলহদূষিত বায়ু যে আরও দূষিত করিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহার ফলে পল্লীগ্রামে অতি কুৎসিত আকারে প্রচলিত পরকীয় ও পরকীয় প্রেম সভ্য বেশ ধারণ করিয়া সাধারণের ঘৃণার স্তর কাটাইয়া উঠিতে পারে।

ক্রমশঃ।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ।

ন্যায়রত্নের নিয়তি।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

ন্যায়রত্ন আহারান্তে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। অপরাহ্নে বলরাম তাঁহার কাছে গিয়া বসিল, এবং তিনি কোথা হইতে আসিতেছেন, কোথায় যাইবেন, ইত্যাদি সকল কথা শুনিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিল। সেই দয়ার্দ্র হৃদয় আশ্রয়দাতাকে তাঁহার বিপদের কথা শুনাইয়া ব্যথিত করিতে ন্যায়রত্নের প্রবৃত্তি হইল না, বিশেষতঃ, ভূস্বামীর নিন্দনীয় ব্যবহারের আলোচনা অবৈধ কার্য্য বলিয়াই তাঁহার ধারণা ছিল। যাহা হউক, ন্যায়রত্নের কথা শুনিয়া বলরাম বুঝিতে পারিল, আপাততঃ তাঁহার ঘর বাড়ী নাই, তিনি নিরাশ্রয় হইয়া কন্যা সহ পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, কোথায় যাইবেন—তাহারও স্থিরতা নাই; সুবিধা হইলে তাঁহারা রামদেবপুরেও বাস করিতে পারেন। বলরামের ন্যায় পরোপকারী ভক্তিমান ধার্ম্মিক লোক যে গ্রামের মণ্ডল, সে গ্রামে ব্রাহ্মণের বাস না থাকিলেও বাসের অযোগ্য নহে। বলরাম ন্যায়রত্নের কথা শুনিয়া কোনও মতামত প্রকাশ করিল না; সে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া গেল। ন্যায়রত্ন তাহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া বুঝিলেন, সে কি একটা মতলব করিয়া উঠিয়া গেল।

গ্রামের অধিকাংশ অধিবাসীই বলরামকে তাহাদের মুরুব্বী বলিয়া মনে করিত; কেহই বলরামের আদেশ বা উপদেশ অগ্রাহ্য করিত না। বলরাম তাহার দুই পুত্র ও রাখাল কৃষাণদের গ্রামস্থ সকল লোকের বাড়ী বাড়ী পাঠাইয়া সংবাদ দিল, তাহাদের সহিত কোনও গুরুতর বিষয়ের পরামর্শ আছে; সন্ধ্যার পর তাহার বাড়ীতে বৈঠক বসিবে, সেই বৈঠকে তাহাদের উপস্থিত থাকা আবশ্যক।

সন্ধ্যার পর বলরামের বাড়ীতে প্রকাণ্ড বৈঠক বসিল। গ্রামস্থ যাবতীয় লোক সেই বৈঠকে উপস্থিত হইল। তাহাদের সহিত বলরামের কি পরামর্শ, হঠাৎ গ্রামের কোনও বিপদের আশঙ্কা ঘটিয়াছে কি না, ইহা বুঝিতে না পারিয়া, তাহাদের আহ্বানের কারণ জানিবার জন্য সকলেই অত্যন্ত উৎসুক হইয়া উঠিল। বলরাম তাহাদের চাঞ্চল্য লক্ষ্য করিয়া, বৈঠকের এক প্রান্তে দণ্ডায়মান হইয়া বলিল, 'ভাই সকল, আমি যে আজ কি জন্যে তোমাদের এখানে আস্‌তে বলে-

ছিলাম, তা শোন। আমার বাপদাদার পুণ্যির জোরে আজ আমার বাড়ীতে এক 'বেরাম্মন' ঠাকুরের পায়ের ধুলো পড়েছেন। এই ঠাকুরটি প্রাচীন 'নোক'। খবর নিয়ে জান্‌তে পেরেছি, তাঁর না আছে ঘড় বাড়ী, না আছে মাথা গুঁজবার একটু ঠাঁই। মেয়ে গলায় ক'রে তিনি পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। দেখ, আমাদের এই রামদেবপুর গাঁয়ে একঘরও বেরাম্মনের বাস নেই; হিন্দুর গাঁয়ে বেরাম্মন নেই, এ কি সামান্যি নজ্জার কথা? বেরাম্মনরাই হলেন আমাদের 'দেবদা'। আমরা যদি এ গাঁয়ে এই ঠাকুরটিকে বসাতে পারি, তাতে পুণ্যি আছে। আমরা ত কেউ মৌরুসি পাট্টা নিয়ে সংসারে আসি নি, এক দিন যেতে হবে সম্মাইকে। 'ধম্মতা' আগে দেখ্‌তে হয়, সঙ্গে যদি কিছু যায় ত তাই যাবে। পেটে ত আমরা সম্মাই খাইচি, পেটে না খায় কে? যদি কিছু পুণ্যির কাজ করে যেতে পারি, তবেই বেঁচে থাকা 'সাথ্‌ক'। তাই আমি বলি কি, এই বেরাম্মন ঠাকুর যাতে এ গাঁ থেকে আর কোথ্‌ না যান—সে রকম চেষ্টা চরিত্তির করলে হয় না? এতে তোমাদের মতটা কি শুনি। এ কাজে তোমরা রাজী আছ কি না বল।'

বৃদ্ধ হলধর ঘোষ দূর সম্পর্কে বলরামের মামা। সে বৈঠকের মধ্যে উঠিয়া বলিল, 'বলা বাবাজি যে পেস্তাব করেছে—সে বড্ড সরেশ পেস্তাব, এ পেস্তাবে যে মাথা নাড়বে—সে স্থমুন্দি হিঁদুই নয়। বেরাম্মন আমাদের দেবদা, এক ঘর দেবদা গাঁয়ে বসাবো, এর বাড়া খোসের কথা আর কি আছে? কি কও তোমরা দশ ঠাকুর?'

দশ ঠাকুর একযোগে বলিল, 'ঠাউর মশায়কে গেরামে বসাও, আর কিছু না হোক, দায়ে অদায়ে ত একটু 'চন্নামেত্তো' (চরণামৃত) পাওয়া যাবে। কথায় বলে, হিঁদুর কাজই হচ্ছে গো-বেরাম্মনের সেবা। তা গরু ত আমাদের অনেক আছে, কেবল বেরাম্মনের সেবাতেই আমরা বঞ্চিত ছিলাম, ভগবান যখন ঠাউরকে এখেনে পেটিয়েছে, তখন তাকে ছাড়া হবে না।'

বৈঠকে সকলেই একবাক্যে বলরামের প্রস্তাবের সমর্থন করিল দেখিয়া তাহার আনন্দের সীমা রহিল না। তখন ব্রাহ্মণকে কোথায় স্থান দেওয়া যায়, এই কথা লইয়া বৈঠকে আলোচনা আরম্ভ হইল। সকলেই দরিদ্র কৃষক, তাহারা সহসা এই জটিল সমস্যার মীমাংসা করিতে পারিল না, তখন বলরাম সর্ব্বসমক্ষে প্রস্তাব করিল, তাহার বাড়ীর অদূরে নদীতীরে তাহার দুই বিঘা লাখরাজ জমী আছে; সেই জমীতে ব্রাহ্মণকে বসাইতে পারিলে, সেই জমী দুই বিঘার যেরূপ

সদ্ব্যবহার হইবে, এরূপ আর কিছুতেই হইবে না। এই দুই বিঘা জমী সে ব্রাহ্মণের গৃহনির্ম্মাণের জন্য দান করিল। কিন্তু গৃহনির্ম্মাণের কি ব্যবস্থা হইবে? গ্রামস্থ কৃষকেরা পরামর্শ করিয়া সাধ্যানুসারে এ বিষয়ে সাহায্য করিতে সম্মত হইল, কেহ তাহার ঝাড়ের দশখানি, কেহ কুড়িখানি বাঁশ, কেহ তাহার ক্ষেত্রের কোষ্টার দড়ি, কেহ তাহার এক বিঘা ভুঁয়ের খড় দিতে প্রতিশ্রুত হইল। বৈঠকে তিন জন ঘরামী উপস্থিত ছিল, তাহারা পারিশ্রমিক না লইয়া ঘর বাঁধিয়া ছাইয়া দিতে রাজী হইল। ঘরামীর জোগাড়েরা অতি দরিদ্র, দিন আনে দিন খায়, তাহাদের খাটাইতে হইলে মজুরী দিতে হইবে বুঝিয়া বলরাম বলিল, সে স্বয়ং তাহাদের মজুরী দিবে। সে সোৎসাহে তাহার প্রতিবেশী নটবর ঘোষকে বলিল, 'ভয় কি মিতে? ঠাকুরের ঘর তুলে দিতে না হয় আমার আধ গোলা ধান বের করতে হবে; বলা কি তাতে ডরায়? মা লক্ষীর কৃপা থাকলে অমন পাঁচ গোলা ধান আমার ক্ষেতের এক কোণা থেকে উঠবে।'

গ্রামে কামার, কুমার, মজুর প্রভৃতি সকল শ্রেণীর লোকই ছিল, তাহাদের মধ্যে যাহারা সে দিন বৈঠকে উপস্থিত হইতে পারে নাই, এই সাধু প্রস্তাব শুনিয়া তাহারাও পরে ন্যায়রত্নের গৃহনির্ম্মাণ কার্য্যে সাধ্যানুযায়ী সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইল।

সেই বৈঠকে ইহাও স্থির হইয়াছিল যে, যত দিন পর্য্যন্ত ঠাকুরের বাড়ী প্রস্তুত হইয়া তাহা বাসোপযোগী না হয়, তত দিন ঠাকুর বলরামের বাড়ীতেই বাস করিবেন। ন্যায়রত্ন একে প্রাচীন ব্রাহ্মণ, তাহার উপর তাঁহার জীবিকা-নির্ব্বাহের কোনও অবলম্বন নাই, সকলের চেষ্টায় তাঁহার ঘর বাড়ী হইল, কিন্তু তাঁহার সংসার চলিবার উপায় কি? বলরাম প্রস্তাব করিয়াছিল, তাঁহাদের ভরণপোষণের জন্য প্রত্যেক চাষী গৃহস্থকে প্রতি বৎসর এক কাঠা ধান ও অন্যান্য খন্দ কিছু কিছু দিতে হইবে। ধান ভিন্ন যে যে শস্য উৎপন্ন করে—তাহাই কিছু কিছু প্রদান করিয়া তাঁহাদের অভাব দূর করিবে। বলরামের এই প্রস্তাব সঙ্গত মনে করিয়া সকলেই তাহাতে সম্মতি প্রদান করিয়াছিল। সেই বৈঠকে ইহাও স্থির হইয়াছিল যে, চাষী ভিন্ন অন্য প্রজাদের তাহাদের বাৎসরিক আয়ের অনুপাতে একটি নির্দ্ধারিত নিয়মে কিছু কিছু পড়তা দিতে হইবে। এ বিষয়ে কেহ আপত্তি করিলে তাহাকে একঘরে হইয়া থাকিতে হইবে—গ্রামবাসীরা তাহার সহিত কোনও সম্বন্ধ রাখিবে না। একঘরে হইয়া থাকা সশ্রম কারাদণ্ড অপেক্ষা গুরুতর দণ্ড—তাহা গ্রামস্থ সকলেই জানিত।

পরামর্শ শেষ হইলে যখন বৈঠক ভঙ্গ হইল, তখন এক প্রহর রাত্রি অতীত হইয়াছে। ন্যায়রত্ন তখন সন্ধ্যাহ্নিক শেষ করিয়া, একখানি কম্বলের আসনে বসিয়া সুমতির সহিত পরামর্শ করিতেছিলেন, ভবিষ্যতে তাঁহারা কোথায় যাইবেন, কি করিবেন, এই অকূল সংসার-সমুদ্রে কোথায় কূল পাইবেন, পিতা-পুত্রীতে তাহারই আলোচনা চলিতেছিল। তাঁহারা বাড়ীর ভিতরে ছিলেন, বাহিরের গোলমাল শুনিয়া, তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া রাইমণির নিকট জানিতে পারিয়াছিলেন, কি একটা বিষয়ের মীমাংসার জন্য বাহিরে গ্রামের লোকের বৈঠক বসিয়াছে ; কিন্তু অনধিকারচর্চ্চা মনে করিয়া ন্যায়রত্ন সে দিকে অগ্রসর হন নাই, বৈঠকের কারণ জানিবার জন্যও আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই।

বৈঠক ভাঙ্গিলে বলরাম প্রফুল্লচিত্তে ন্যায়রত্নের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, 'ঠাকুর, আপনার আহ্নিক টাহ্নিক শেষ হয়েছেন ত ? আমি আপনার কাছে এসে খোঁজ খবর নিতে পারি নি, বাইরে আমাদের একটা বৈঠক ছিল।'

ন্যায়রত্ন বলিলেন, 'হাঁ, তা শুনেছি, বৈঠকে বিস্তর লোক এসেছিল না ? সব কাজ শেষ হয়েছে ?'

বলরাম বলিল, 'হাঁ ঠাকুর, আপনার আশীর্ব্বাদে। আপনাকে ত আমরা ছাড়চিনে। যখন দয়া করে' পায়ের ধূলো দিয়েছেন, তখন এই গেরামেই আপনাকে থাকতে হচ্ছে। আমরা আপনার দাস, আমাদের ছেড়ে আপনি আবার কোথায় পথে পথে ঘুরতে যাবা ঠাকুর ! তা হবে না।'

ন্যায়রত্ন বলিলেন, 'আমাকে গ্রামে রাখ্‌বে ? কোথায় রাখবে ? আর আমি চিরকাল তোমার গলগ্রহ হয়ে থাক্‌ব, এ কি তুমি আমার কাছে প্রত্যাশা কর ?'

বলরাম বলিল, 'তাই যদি হবে, তবে আর আমাদের বৈঠক করা কেন ? আপনার বাসের কি বন্দোবস্ত হবে, তাই ঠিক করবার জন্যেই ত এই বৈঠক। তা বৈঠকে সব ঠিক হয়ে গিয়েছে ; এখন আপনি এ গাঁয়ে বাস করতে রাজী হলেই হয়। আপনি রাজী না হলে আপনার চরণ ধরে রাজী করাব।'

ন্যায়রত্ন তখনও সকল কথা ঠিক বুঝিতে পারিলেন না। বলরাম বৈঠকের সকল বিবরণ তাঁহার গোচর করিয়া তাঁহার সম্মতির অপেক্ষায় বসিয়া থাকিল।

বলরাম তাঁহাকে তাহাদের গ্রামে স্থায়িভাবে বসাইবার জন্য যে এই অল্প সময়ের মধ্যে এত কাণ্ড করিয়াছে—ইহা শুনিয়া ন্যায়রত্ন ও সুমতির বিস্ময়ের সীমা রহিল না। এই অশিক্ষিত মূর্খ চাষার হৃদয় কত উচ্চ, তাহার নিঃস্বার্থ পরোপকারের প্রবৃত্তি কি প্রবল, তাহার নিষ্ঠা ও ব্রাহ্মণের প্রতি ভক্তি কি অবিচল—ইহা বুঝিয়া ন্যায়রত্ন ও সুমতির কোমল হৃদয় তাহার প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধায় পূর্ণ হইল; তাঁহাদের মনে হইল—পৃথিবীতে এমন আপনার জন তাঁহাদের আর কেহই নাই। বলরামের সহিত কোনও কালে তাঁহার পরিচয় ছিল না, সে ভিন্নগ্রামবাসী, ভিন্ন জাতি, তথাপি সে এই গৃহহীন, নিরুপায়, অকূল পাথারে ভাসমান বৃদ্ধের অন্ধকারময় জীবনপথ আলোকিত করিবার জন্য সম্পূর্ণ অচিন্ত্যনীয় উপায়ে আলোকবর্ত্তিকা-হস্তে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে—ইহা মা জগদম্বারই লীলা। ইহা দয়াময় বিধাতার অভিপ্রায় মনে করিয়া ন্যায়রত্ন অশ্রুপূর্ণলোচনে বলরামের প্রস্তাবে সম্মতি দান করিলেন; এই নির্ব্বান্ধব স্থানে কতকগুলি চাষার মধ্যে জীবনের অবশিষ্ট কাল বাস করিতে হইবে ভাবিয়া সুমতি বড় বিষণ্ন হইয়া পড়িল। বিশেষতঃ, সে সত্যবালাকে এখনও ভুলিতে পারে নাই; এমন দিন ছিল না—যে দিন সে তাহার সখীর কথা মনে করিয়া দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ না করিত। সে জানিত, সেই ভাগ্যবতী তালুকদার-নন্দিনীর সহিত পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতাই তাহাদের বর্ত্তমান সর্ব্বনাশের মূল কারণ, তাহার নিষ্ঠুর পিতার নিদারুণ অত্যাচার উৎপীড়নেই তাহাদিগকে গৃহহীন হইয়া কলঙ্কের ডালি মাথায় লইয়া একবস্ত্রে গ্রাম হইতে নির্ব্বাসিত হইতে হইয়াছে; কিন্তু কুচক্রী পিতার কবল হইতে তাহাকে উদ্ধার করিবার জন্য সত্যবালা কি চেষ্টার ক্রটী করিয়াছে? এমন কি, তাহার মিথ্যা কলঙ্কমোচনের জন্য, মহা সম্ভ্রান্ত তালুকদারের কন্যা হইয়াও সে কাজি সাহেবের প্রকাশ্য দরবারে উপস্থিত হইতেও কুণ্ঠিত হয় নাই, এই সকল কথা স্মরণ করিয়া এক এক সময় সত্যবালার জন্য সুমতির বুকের ভিতর আনচান্ করিয়া উঠিত, উদ্বেলিত হৃদয়ের উচ্ছ্বাস প্রশমিত করিতে না পারিয়া সে অঞ্চলে চক্ষু মুছিত; অবশেষে মনকে এই বলিয়া প্রবোধ দিত যে, এ দুঃখ কষ্ট চিরস্থায়ী হইবে না, বাঞ্ছাকল্পতরু ভগবান এক দিন না এক দিন তাহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন; মৃত্যুর পূর্ব্বে অন্ততঃ একবারও তাহার প্রিয় সখীর দেখা পাইবে। কিন্তু এই বহুদূরবর্ত্তী পল্লীতে, কতকগুলি কৃষকের মধ্যে যদি জীবনের অবশিষ্ট কাল কাটিয়া যায়, তাহা হইলে এ জীবনে সত্যবালার সহিত তাহার সাক্ষাতের

আশা কোথায় ? দুঃখে কষ্টে সুমতির বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল ; কিন্তু পিতার মুখের দিকে চাহিয়া সে আত্মসংবরণ করিল। তিনি বলরামের আশ্রয়ে বাস করিয়া যদি সুখী হন, তবে তাহাতে অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়া তাঁহাকে ক্ষুব্ধ করিবে,—সে এমন মেয়ে নহে। পিতার সুখ শান্তির জন্য সে নিজের হৃৎপিণ্ড ছিঁড়িয়া দিতে পারিত। পিতাকে সেই গ্রামে বাস করিতে ইচ্ছুক দেখিয়া সুমতিও বলরামের প্রস্তাবের সমর্থন করিল। বলরাম হর্ষোৎফুল্লহৃদয়ে সেই রাত্রেই তাহার আত্মীয় প্রতিবেশীদিগকে এই সুসংবাদ জানাইয়া আসিল। নিষ্ঠাবান হিন্দু তাঁহার আরাধ্য দেবতার মূর্ত্তি মন্দিরমধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া যে আনন্দ লাভ করেন, আজ বলরামের ভক্তিপরিপ্লুত হৃদয়ও সেই আনন্দে পরিপূর্ণ।

* * * *

একটি শুভ দিন দেখিয়া ন্যায়রত্নের বাসগৃহের পত্তন হইল। গ্রামস্থ সকল লোক স্ব স্ব অঙ্গীকার অনুসারে এই নব গৃহের নির্ম্মাণে সাহায্য করিতে লাগিল। গ্রামের সমস্ত লোক একপ্রাণে যে কার্য্যে যোগদান করে, তাহা সুসম্পন্ন হইতে অধিক বিলম্ব হয় না। অল্প দিনের মধ্যেই নদীতীরে বলরামের লাখরাজ জমীতে ন্যায়রত্নের বাসের ঘর, পাকশালা, গোয়াল প্রভৃতি তিন চারিখানি ঘর এবং দুই তিনটী গোলা প্রস্তুত হইল। ন্যায়রত্ন দেখিলেন, তাঁহার স্বগ্রামে বাস্তু ভিটায় তাঁহার যে সকল ঘর ছিল, এই সকল ঘর তাহা অপেক্ষা ত নিকৃষ্ট নহেই, বরং অনেকাংশে উৎকৃষ্ট। তাঁহার বাড়ী ছিল ব্রাহ্মণপণ্ডিত অধ্যাপকের বাড়ীর মত, আর এ বাড়ী হইল পল্লীগ্রামের অবস্থাপন্ন চাষী গৃহস্থের বাড়ীর মত। এই বাড়ীর দিকে চাহিয়া দেখিতে দেখিতে পিতৃ-পিতামহের পবিত্রস্মৃতিমণ্ডিত বাল্য-যৌবন-বার্দ্ধক্যের লীলানিকেতন স্বগ্রামের সেই জীর্ণ বাড়ীখানির কথা মনে পড়িত, আর তিনি অশ্রু সংবরণ করিতে পারিতেন না। নূতন কি কখন পুরাতনের মায়াকে হৃদয় হইতে নির্ব্বাসিত করিতে পারে ?

কিন্তু আর ফিরিবার উপায় নাই ; ন্যায়রত্ন ভাবিলেন, যদি তিনি কর্ত্তব্য পথ স্থির করিতে না পারিয়া ভ্রমক্রমে বিপথে পদার্পণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে এই ভুলকেই প্রাণপণে আঁকড়িয়া ধরিয়া এই জীবন-সন্ধ্যায় আবার নূতন করিয়া দোকান খুলিতে হইবে। তবে তাহাই হউক, ইহাই বোধ হয় বিধিলিপি। 'যথা নিযুক্তোঽস্মি, তথা করোমি'—এই মহাবাক্য স্মরণ করিয়া ন্যায়রত্ন

চন্দ্র তারা শুদ্ধ দেখিয়া শুভ দিনে গৃহপ্রবেশ করিলেন। তাঁহার গৃহপ্রবেশের দিন গ্রামে যেন মহোৎসব আরম্ভ হইল। বলরাম সে দিন ক্ষেতের কাজ বন্ধ রাখিয়া গ্রামবাসীদের সহিত গৃহপ্রবেশোৎসবে যোগদান করিল। এমন কি, সরলহৃদয়া কৃষকবধূরাও সেই আনন্দে বঞ্চিত হইল না। ন্যায়রত্নের গৃহদ্বারে কদলীতরু শ্রেণীবদ্ধভাবে রোপিত হইল; আম্রশাখা সহ পূর্ণ ঘট সংস্থাপিত হইল। অবশেষে গৃহপ্রবেশের সময় এক দল কৃষক-বালক নববস্ত্র পরিধান করিয়া গলায় এক এক গাছা ফুলের মালা ঝুলাইয়া ন্যায়রত্নকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল। কৃষকবধূরা একত্র সমবেত হইয়া শঙ্খধ্বনি দ্বারা মঙ্গল সূচনা করিতে লাগিল, যেন আজ গ্রামে গ্রাম্য বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা হইতেছে। পুরুষেরা করতাল মৃদঙ্গ কাঁশি প্রভৃতি লইয়া মহোৎসাহে 'নগর-সঙ্কীর্ত্তনে' বাহির হইল। আর এক দল বালক 'গাব্‌গুবাগুব্' (গোপীযন্ত্র) ও খঞ্জনী বাজাইতে বাজাইতে পথে পথে গান গাহিয়া চলিল,—

'আস্যে এক রসিক পাগোল
বাদালে গোল নদ্যার মাঝে দ্যাখ্‌সে তোরা।
পাগোলের সঙ্গে যাবো, পাগোল হবো,
হেরবো রসের নব গোরা!'

সমস্ত দিন গ্রামবাসীদের আনন্দোৎসব চলিল। বলরাম ঘোষ পূর্ব্ব দিন গ্রামস্থ লোকের নিকট হইতে প্রচুরপরিমাণ চাউল সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল। উৎসবান্তে সায়ংকালে তাহা গ্রামস্থ দুঃখী কাঙ্গালীদের বিতরণ করা হইল।

ক্রমশঃ।

শ্রীজীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

প্রাচীন ভারতে লিপিব্যবহার।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ ভারতীয় লিপিমালার ব্যবহার সম্বন্ধে অনেক ভ্রান্ত মত পোষণ করিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা কতকগুলি অযৌক্তিক প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, গ্রীকগণের আগমনের পূর্ব্বে ভারতে লিপি ব্যবহৃত হইত না, এবং ভারতীয় বর্ণমালা গ্রীক বর্ণমালার অনুকরণের ফল। আমরা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে দেখিব, এই মত কত দূর সমীচীন ও গ্রাহ্য।

পণ্ডিতপ্রবর মোক্ষমূলরের মতে, পাণিনির সময়ে ভারতে লিপি ব্যবহৃত হইত না। অধ্যাপক মূলর বলেন যে, পাণিনি খ্রীষ্টের পূর্ব্বে চতুর্থ শতাব্দীতে জন্মিয়াছিলেন, এবং তাঁহার জগদ্বিখ্যাত ব্যাকরণের রচনা করিয়াছিলেন ; অর্থাৎ, তাঁহার মতানুসারে বলিতে হইবে যে, প্লেটোর মৃত্যুর পরে, এবং অ্যারিষ্টোটলের জীবদ্দশায় ভারতে সভ্যতার এই অত্যাবশ্যক অঙ্গটি অপরিজ্ঞাত ছিল। ডাক্তার বর্টলিঙ্কও এই মতাবলম্বী। তিনি বলেন যে, ভারতের প্রাচীন বৈজ্ঞানিক সাহিত্য একটা প্রকাণ্ড প্রতারণা ও পাগ্‌লামী বই আর কিছুই নহে। দুঃখের বিষয় এই যে,ভারতবাসীর নৈতিক ও মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে যে সব পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্যক্তির এইরূপ ধারণা, আমরা তাঁহাদের তথাকথিত ঐতিহাসিক গবেষণার ফল দ্বিরুক্তি না করিয়া অভ্রান্ত সত্যরূপে গ্রহণ করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করি। মূলর বলেন যে, সূত্ররচনার কালে লিপি-ব্যবহার প্রচলিত থাকিলে বৈদিক মন্ত্র ও ব্রাহ্মণসমূহ নিশ্চয়ই লিপিবদ্ধ হইত। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই যে, ঐ সময় পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ ও বৈদিক সাহিত্য স্মৃতিপরম্পরায় চলিয়া আসিতেছিল। অতএব পাণিনি এবং বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুত্থানের পূর্ব্বে সাহিত্যক্ষেত্রে লিপি-ব্যবহার ত হয়ই নাই ; এমন কি, লিখিবার পদ্ধতি ও বর্ণমালা সম্বন্ধে ভারতবাসিগণ অজ্ঞ ছিলেন। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই যে, পাণিনির ব্যাকরণে লিপিকার শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা দেখিয়া বোধ হয়, বহু শতাব্দী পূর্ব্বে গান্ধার-নিবাসী ঋষিকল্প ব্যাকরণ-প্রণেতা আধুনিক যুগের বিদ্যা-বুদ্ধি-গর্ব্বদৃপ্ত মূলর-প্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের হঠকারিতা ও অবিমৃশ্যকারিতার কথা দৈব শক্তি ও অমানুষিক কল্পনার সাহায্যে পরিজ্ঞাত হইয়া আত্মরক্ষার বর্ম্মস্বরূপ এই শব্দটির প্রয়োগ করিয়াছিলেন। সে যাহাই হউক, এই একটিমাত্র শব্দ বাদ দিলেও, পাণিনির লিপিব্যবহার সম্বন্ধে আরও যথেষ্ট প্রমাণ আছে। পাণিনির সূত্রের আকারের দিকে লক্ষ্য করিলেও বেশ উপলব্ধি হয় যে, বর্ণমালার সাহায্য ব্যতিরেকে ঐরূপ সূত্রের রচনা সম্ভবপর নহে। সহৃদয় অধ্যাপক গোল্ডষ্টুকার সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, পাণিনি খ্রীষ্টের পূর্ব্বে নবম কিংবা দশম শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। তাঁহার যুক্তি ও প্রমাণ সমীচীন বলিয়া আমরা গ্রহণ করিতে পারি। তিনি দেখাইয়াছেন যে, সূত্র, গ্রন্থ, পত্র, কাণ্ড, বর্ণ প্রভৃতি শব্দ ভারতে লিপি-ব্যবহারের প্রমাণ। এই বিষয় বিস্তারিতরূপে জানিতে ইচ্ছা করিলে আমরা পাঠককে তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ Panini : His place in Sanskrit Literature পড়িতে অনুরোধ করি। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে,

আবৃত্তির সৌকর্য্যার্থ ভারতীয় গ্রন্থকারগণ সূত্র প্রচলিত করিয়াছিলেন। সত্য বটে, শ্রুতি ও স্মৃতির সাহায্যে অতি প্রাচীন কাল হইতে শাস্ত্র অধিগত হইত, এবং এই মুদ্রাযন্ত্র ও সুলভ-পুস্তক-প্রচারের কালেও চতুষ্পাঠীর ছাত্রগণ অবাধে ভীতিপ্রদ বৃহদাকার পুস্তকসমূহ কণ্ঠস্থ করিতেছেন—এখনও 'অভ্যাসঃ সর্ব্বশাস্ত্রাণাং বোধাদপি গরীয়সী' মহাবাক্য ভারতীয় ছাত্রের মূলমন্ত্র—তথাপি প্রাচীন কালে শিক্ষার্থী গুরুমুখে শাস্ত্রাদি অভ্যাস করিতেন বলিয়া আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না যে, ভারতে লিপি-ব্যবহার অপরিজ্ঞাত ছিল। ভারতীয় শিক্ষার্থী তাঁহার ক্ষুরধার স্মৃতিশক্তির সাহায্যে দুরূহ জটিল বিষয়গুলিও তাঁহার মানসপটে অঙ্কিত করিয়া রাখিতেন, এবং শাস্ত্রবিশেষের গূঢ় অংশ এখনও অধ্যাপকের স্বমুখে শ্রবণ করিয়া শিক্ষা করেন। তাই মনে হয়, স্মৃতিশক্তির সাহায্যের জন্য এবং কাগজ প্রভৃতি লিখিবার উপকরণের অভাব উপলব্ধি করিয়া প্রাচীন ঋষিগণ জটিল তত্ত্বগুলিকে গুছাইয়া স্বল্পাক্ষরে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবার জন্য সূত্র রচনায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। মূলর মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বের ১৬৪৫ শ্লোক ও কুমারিলের বার্ত্তিক উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, তৎতৎকালে বেদ লিপিবদ্ধ হয় নাই। মহাভারতে কথিত আছে, যে ব্যক্তি লিখিত বেদ অধ্যয়ন করে, কিংবা শূদ্রের নিকট বেদ পাঠ করে, তাহার জ্ঞান বৃথা। ইহাতে সপ্রমাণ হয় না যে, বেদ লিপিবদ্ধ হয় নাই, বরং ইহাই প্রমাণিত হয় যে, বেদ তাহার পূর্ব্বেই লিপিবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। মহাভারত ও মীমাংসা বার্ত্তিকের এই অংশের রচনার পূর্ব্বে স্মৃতিকার যাজ্ঞবল্ক্য তিন উচ্চ বর্ণকে লিখিত বেদমন্ত্র রক্ষা করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

সুপ্রসিদ্ধ কোলব্রুক বেদাঙ্গ জ্যোতিষ হইতে সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, খ্রীষ্টের পূর্ব্বে চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে বেদ-সংকলন সম্পন্ন হইয়াছিল। অতএব বৈদিক মন্ত্র উহার বহুশতাব্দীপূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল, ইহা স্বীকার করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক তাঁহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণা দ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, ৪০০০ পূঃ খ্রীঃ হইতে ২৫০০ পূঃ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বৈদিক সভ্যতা সম্পূর্ণ বিকাশ লাভ করিয়াছিল। এই যুগেই ঋগ্বেদের বহু সূক্ত প্রণীত হইয়াছিল। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে বেদের অপৌরুষেয়ত্ব স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই, কিন্তু অনন্ত রত্নের আকর, আর্য্য হিন্দুগণের উচ্চ সভ্যতার প্রতিকৃতি বেদকে কৃষকের গান বলিয়া অভিহিত করাও ঔদ্ধত্য ও ভ্রান্ত বুদ্ধির পরিচায়ক। বেদকে ইতিহাস আখ্যা না দিলেও,

ইহা যে আর্য্য হিন্দুগণের পুরাবৃত্তগঠনোপযোগী উপাদান যুগযুগান্তর বক্ষে ধারণ করিয়া লোকলোচনের সমক্ষে স্থাপন করিয়াছে, তাহা কেহ স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। বেদে ধারাবাহিক ঘটনাবলী নিবদ্ধ না থাকিলেও, অতীতের অন্ধতমসাচ্ছন্ন যুগে রাজন্যবর্গের, এবং ধর্ম্ম, সামাজিক আচার ব্যবহার ও জনসাধারণের অবস্থায় উজ্জ্বল চিত্র প্রতিফলিত হইয়াছে। আমাদের বিশ্বাস, এই প্রাচীন বৈদিক যুগেও লিপি-ব্যবহার অপরিজ্ঞাত ছিল না।

মূলর বলিয়াছেন যে, সহস্রাধিক বৈদিক মন্ত্র রচিত হইল, কিন্তু কোনও স্থানে পুস্তক, মসী, কাগজ প্রভৃতি লিখিবার উপকরণের কথা বলা হইল না। অতএব বৈদিক যুগে লিখিবার পদ্ধতি আর্য্যদিগের অধিগত ছিল না। মূলরের এই যুক্তি ও গবেষণা পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মুখেই শোভা পায়। বৈদিক ঋষিগণ কাগজ কলম ও বর্ণমালার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিবার জন্য তাঁহাদের অপূর্ব্ব গীতি রচনা করেন নাই। যে বৈদিক মন্ত্রাবলী বর্ণবৈচিত্র্যময়ী প্রকৃতির মুক্ত রূপ উদ্ঘাটন করিয়াছিল, যাহা তাঁহাদের সরল প্রাণের উদাত্ত ভাবের অভিব্যক্তি, যাহা যোগীর মন্দারমালা ও জ্ঞানীর পারিজাত-কণ্ঠহার—যাহা ভক্তহৃদয়ের স্নিগ্ধ-চন্দনলেপ—যাহাতে উদ্দাম কল্পনার চাঞ্চল্য ও উদ্দীপনা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে শুষ্ক রসহীন লেখনী-মসী-কাগজের অন্বেষণ করা, আর জ্যোৎস্না-পুলকিত মধুর যামিনীতে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের বিকাশের জন্য আক্ষেপ করা, একই কথা। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণই স্বীকার করিয়াছেন যে, বৈদিক যুগে হিন্দু সভ্যতা উন্নতির উচ্চশিখরে উঠিয়াছিল। হিন্দুর যশঃসূর্য্য ভারতীয় গগনে উজ্জ্বল কিরণজাল বিস্তার করিয়াছিল। বৈদিক আর্য্যজাতি বিবিধ ললিত কলায়, শিল্পে ও বিজ্ঞানে উন্নতি করিয়াছিলেন। তাঁহারা স্বর্ণের অলঙ্কার, বর্ম্ম, আত্মরক্ষার অস্ত্র-শস্ত্র ও বহুবিধ ধাতব পদার্থের ব্যবহার জানিতেন। সমরপ্রণালী, রথনির্ম্মাণ ও তাহার ব্যবহার, সূচীকর্ম্ম, রোগ-প্রতিষেধক ঔষধ ও বহুবিধ গাছ-গাছড়া হইতে ঔষধ-প্রস্তুত-করণ-প্রণালী, চিকিৎসা বিদ্যা, পশুচিকিৎসা, সময়ের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ বিভাগ, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, উত্তরাধিকারসূত্রে সম্পত্তিগ্রহণ, তুলাদণ্ড ও ওজনের ব্যবস্থা, ক্রয়-বিক্রয়ের নিয়মাবলী, গোধন, ধান্যধন প্রভৃতি দ্বারা আদান-প্রদানের ব্যবস্থা প্রভৃতির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যাঁহাদের মধ্যে এইরূপ উচ্চাঙ্গের সভ্যতা বিকাশ লাভ করিয়াছিল, তাঁহারা নিশ্চয়ই হৃদয়ের ভাব কথায় লিপিবদ্ধ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন,

যদিও লিপির কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না, তথাপি অপরাপর জটিল বিষয়ের ও উচ্চ সভ্যতার অঙ্গসমূহের সন্তোষজনক বিধিব্যবস্থা দর্শন করিয়া আমরা নিঃসন্দেহে ন্যায়তঃ ধরিয়া লইতে পারি যে, পাণিনির সময়ে ত দূরের কথা, বৈদিক যুগেও কোনও না কোনও প্রকারের লিপি-প্রণালী ভারতে প্রচলিত ছিল।

শ্রীহরিপদ ঘোষাল।

অযোগ্য।

৪

অতি সুখ মানুষের অদৃষ্টে সহে না—মনুরও সহিল না। মনু যখন বাপের বাড়ী যাইবার জন্য জেদ ধরিল, অতুলের প্রথমেই মনে হইল,সে হয় ত শশধরের বিচ্ছেদেই ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। কথাটা যখন মনে উঠিল, সে আর তাহাকে মন হইতে নামাইবার চেষ্টামাত্রও করিল না। কিছু দিন হইতেই সে মনুর পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া আসিতেছে। মনু যেন কিছু মনমরা, আর খুব কৃশ হইয়া গিয়াছে। মনুর বাধা নিষেধ না মানিয়াই অতুল ডাক্তারকে ডাকিয়া আনিল। ডাক্তার যথাবিধি পরীক্ষান্তে কহিলেন, 'নাঃ, রোগ কিছু নেই, মেয়েরা মাথা-ঝাড়া দেবার সময় অমন রোগা হয়, বেশ ত দিন না—দিন কতক বাপের বাড়ী পাঠিয়ে, মনের খুশীতে সেরে যাবেন।'

অতুলের মনে হইল, 'সত্যই কি তাই? স্বভাবের ক্রিয়াতেই মনু রোগা হইয়া যাইতেছে? কিন্তু ডাক্তার ত তাহার মানসিক পীড়ারও ইঙ্গিত দিয়াছেন, সেখানে মনের কিসে এত সুখ—আর অতুলের সঙ্গই বা তাহার এত দুঃখের কেন? অতুলের প্রাণঢালা ভালবাসা, এত যত্ন সোহাগ, ইহাতেও মনুর ক্ষোভ মিটিল না, হায় অকৃতজ্ঞা! মুখে সে বলিল, 'বেশ ত, তাই হবে, মনু বাপের বাড়ীই যেও, আমি তোমার কোথাকার কে? এই নির্ব্বান্ধবপুরে একা থাক, তা হো'ক, আমার সবই চল্‌বে।' মনু সজল-কৃতজ্ঞ-নেত্রে স্বামীর পানে চাহিল, স্বামীর কষ্ট হইবে, সেও তাহা বুঝিতেছিল, কিন্তু একবার মা বাবাকে দেখিয়া না আসিলে সেও যে আর তিষ্ঠিয়া থাকিতে পারে না। তবু জোর করিয়া চিত্ত দমন করিয়া সে কহিল, 'তবে এখন থাক—ছুটীটুটি পেলে তখন আমায় নিয়ে যেও।' নিঃশ্বাস ফেলিয়া অতুল কহিল, 'তোমার খুসী।' পর দিন

আহারান্তে অতুল পানের ডিবা হাতে লইয়া বাহিরে যাইতেছিল। মনু তখন রান্নাঘরে কি একটা কাজে ব্যস্ত ছিল, স্বামীকে গমনোদ্যত দেখিয়া কাজ ফেলিয়া তাড়াতাড়ি কাছে আসিয়া হাসিমুখে কহিল, 'শশ সন্দেশ খাওয়াতে লিখেছে, পাশ হয়েছে বলে, আমি তাকে আস্‌তে লিখেছিলুম—এখন ত তার লম্বা ছুটীও আছে।'

মনু আপনি শশধরকে আসিবার জন্য নিমন্ত্রণপত্র না দিয়া যদি স্বামীর অনুমতি চাহিত, অথবা তাঁহাকেই অনুরোধ করিত, তবে ফল কিরূপ হইত বলা যায় না, কিন্তু সে যে উপযাচিকা হইয়া স্বামীর বিনানুমতিতেই তাহাকে আসিবার অনুরোধ পাঠাইল, ইহাতে অতুল মনে ব্যথা পাইল। অসতর্ক পথিক পথে চলিতে চলিতে সহসা অজ্ঞাত গহ্বরে পদক্ষেপ করিয়াই যেমন ভয়ে শিহরিয়া উঠে, তেমনই করিয়া শিহরিয়া সে মুখ ফিরাইল, জড়িতস্বরে কহিল, 'তাকে আস্‌তে বলেছ, কেন—?' মনু স্বামীর ভাব দেখিয়া মুখে কাপড় চাপিয়া হাসিতেছিল, কহিল, 'কত দিন তাকে দেখিনি বল ত—এক যুগ হয়ে গেল।' অতুল অন্য দিকে চাহিয়া কহিল, 'তাকে তুমি বরাবরই খুব—খুব ভালবাস্‌তে না মনু?' স্বামীর প্রশ্নের কূটার্থ না বুঝিয়া তেমনই সরল হাসি হাসিয়া মনু জবাব দিল, 'বাস্‌ব না—বাঃ!' অতুল নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, 'সেও তোমায় খুব ভালবাসে বোধ হয়?' মনু অসঙ্কোচে উত্তর দিল, 'বাস্‌বে না?'

শশধর আসিলে অতুলের সরকারী কাজ সহসা এমনই অসঙ্গত রূপে বাড়িয়া উঠিল যে, প্রায়ই আর সে বাড়ী আসিয়া স্নানাহার করিতেও সময় করিয়া লইতে পারে না। অতিথির যত্ন আদর ত পরের কথা, ভাল করিয়া শশধরের সহিত দুইটা কথা কহিতেও তাহার সময় কুলায় না। দৈবাৎ কোনও দিন অত্যন্ত আকস্মিক ও সম্পূর্ণ অতর্কিত অবস্থায় তাহাদের হাসি গল্পের মধ্যে আসিয়া পড়িলে হয় মাথাব্যথা, নয় অন্য কোনও শারীরিক অসুস্থতার দোহাই দিয়া শুইয়া পড়ে। বাড়ী ঢুকিবার সময় যাহা দেখিবার ভয়ে শঙ্কিত হইয়া থাকিত, তাহা না দেখিয়া রুদ্ধশ্বাসটা সহজ হইয়া আসিলেও তৃপ্তি পাইত না। শশধরকে সে যেন নখী শৃঙ্গীর উদাহরণে শত-হস্ত দূরে এড়াইয়া চলিত। কখনও কলহের সুরে অকারণে তাহাকে এমন একটা কঠিন কথা বলিয়া বসিত যে, তাহার অর্থ-বিশ্লেষণে অসমর্থ শশধর ও মনু বিস্ময়ের সহিত ব্যথাও অনুভব করিত। স্বামীর খিট্‌খিটে মেজাজ ও শারীরিক পরিবর্ত্তনে তাঁহার স্বাস্থ্যহানির আশঙ্কায় মনুর মন ভিতরে ভিতরে উদ্‌বিগ্ন হইয়া উঠিলেও বাহিরে তাহাদের মজলিসে হাসি

গল্প, সাহিত্যালোচনা, কাব্যব্যাখ্যা পুরাদমেই চলিতে থাকে। মনু মনে করে, অতিরিক্ত পরিশ্রমে স্বামীর শরীর মন হয় ত ভাল থাকিতেছে না, কাজের ভিড় কমিলেই সারিয়া উঠিবেন। ক্রমে শশধরের ছুটীর কাল ফুরাইয়া গেলে, সে বাড়ী চলিয়া গেল; যাইবার সময় মনুকে সঙ্গে লইয়া যাইবার জন্য অতুলের অনুমতি চাহিবে কি না, মনুর কাছে প্রসঙ্গ তুলিলে, মনু মনের ব্যথা চাপিয়া কহিল, 'এখন থাক্ ভাই, দেখ্ছ ত—যা ওঁর শরীরের অবস্থা।'

শশধর চলিয়া গেলে, অতুলের মনের বোঝা অনেকখানি নামিয়া কাজের বোঝা হাল্কা করিয়া দিলেও, তাহার চোখের তারায় যে ছায়াচিত্র আঁকিয়া দিয়া গেল, তাহার রঙ কিন্তু তেমনই উজ্জ্বল রঙ্গে রাঙ্গা হইয়াই রহিল। মনুর সঙ্গে সুখে স্বেচ্ছায় সে যে দূরত্ব গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা ফিরাইয়া লইতে তাহার আর প্রবৃত্তি হইল না। লোকে সবুজ চশ্মা চোখে দিলে পৃথিবীর বর্ণ সবুজ দেখে। সন্দেহের সবুজ কাচ চোখে দিয়া অতুলও মনুর সকল কাজে ব্যবহারের ভিতর দিয়া নিজের অনুকূল ধারণারই প্রমাণ পাইতেছিল। শশধরের আগমনে তাহার বাধা-বন্ধহীন যে আনন্দের উচ্ছ্বাস কারণে অকারণে অবিরত ঝরিয়া পড়িত, এখন ত তাহার কোনও চিহ্নই আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। অতুল কেবল ভাবিয়া দেখিত না যে, তাহারই অকাল-গাম্ভীর্য্যে দিশাহারা হইয়া মনু একেবারেই চুপ হইয়া গিয়াছে। অতুলের সহসা দূরত্বভাব ও গম্ভীর মুখ তাহাকে যেন হাঁফাইয়া তুলিতেছিল।

আত্মীয়হীন দূর প্রবাসে আবাল্যের সঙ্গী স্নেহময় ভাইটিকে কাছে পাইয়া এই একটি মাস মনুর বড় সুখেই কাটিয়াছিল। তাহার এই অনাবিল আনন্দ যে অজ্ঞাতে স্বামীর মনে কতখানি বিষ ঢালিয়া দিতেছিল, কেমন করিয়াই বা সে তাহার সংবাদ জানিবে।

সকাল বেলা কাটা সুপারীগুলি ডালায় করিয়া মনু রোদে শুখাইতে দিতেছিল। অতুল কাছে আসিয়া সহসা জিজ্ঞাসা করিল, 'শশধর চলে যাওয়ায় তোমার বোধ হয় খুবই কষ্ট হয়েছে?' অনেক দিনের পর স্বামীকে তাহার জন্য ভাবিতে দেখিয়া মনুর অভিমানের ব্যথা মুহূর্ত্তে জুড়াইয়া গেল, সে হাসিয়া কহিল, 'সত্যি বাবু, সে কিন্তু মানুষকে খুব আমোদে রাখতে পারে। তার হাসির আলোয় এক মাস যে কত শীঘ্র কেটে গেল, চলে গিয়ে সব যেন ফাঁকা ঠেকছে, নয়?' কথাটি সত্য। শশধর থাকিতে অতুল আরও দূরে সরিয়া গেলেও, নিজেদের হাসি খেলায় মত্ত থাকায় অতুলের আচরণ লক্ষ্য করিবার মনু

অবকাশ পায় নাই। তাই তাহার নিরানন্দ গৃহবাস এতই অন্ধকার অনুমিত হইতেছিল। অতুলের মনে হইল, ভাগ্যবান্ শশধর! তাই কেহ না হইয়াও সেই মনুর সর্ব্বস্ব। মনুর হৃদয়-রাজ্যে তাহারই রাজাসন। কিন্তু কি হেয়া, কি নির্লজ্জা এই মনু! স্বামীর মুখের উপর একটা অনাত্মীয় যুবকের সম্বন্ধে এতখানি প্রশংসা করিতে সঙ্কোচও উহার কি এতটুকু হয় না? সংসারবিরাগী মহাপুরুষ সত্য কথাই কহিয়া গিয়াছেন, 'অসার—অসার! নারীচিত্তের ন্যায় অসার হেয় পদার্থ বুঝি জগতে আর দ্বিতীয় নাই!'

আপনাকে বারবার ধিক্কার দিয়া সে মনে করিতে চাহিল,চিরদিনই সে প্রতারিত হইয়া আসিয়াছে। মনু তাহাকে কখনও ভালবাসে নাই—এখনও বাসে না। তাহাকে ধনী জানিয়া মৌখিক স্নেহ দেখাইয়া ভুলাইয়াছিল মাত্র, টান তাহার ষোল আনাই ছিল ঐ শশধরের প্রতি। সত্যই সে মনুর অযোগ্য স্বামী! কিন্তু এ অযোগ্যতা মনুর দুর্ভাগ্যের দিক হইতে নহে—এ দুর্ভাগ্য তাহারই। মনুর ভাগ্য সংশোধন করিতে গিয়া, নিজের ভাগ্যকে সে নিজের হাতেই গড়িয়া তুলিয়াছে। এ ভুল শুধরাইবার কোনও উপায় যদি আজ তাহার আয়ত্ত থাকিত! কখনও মনে হয়, মনুকে তাহার মা বাপের কাছে পাঠাইয়া দিয়া সে নিজে কোথাও কোনও দূর দেশে বিবাগিবেশে চলিয়া যাইবে। কিন্তু তখনই আবার মনুর অবাধ স্বেচ্ছাচারিতার স্বাধীনতা স্মরণ হইলেই সে সংকল্প বদল করিতে হয়। সে কাজ, কর্ম্ম, পড়াশোনা, কিছুতেই যেন মন দিতে পারে না। মনুর বিষণ্ণ মুখ দেখিলে, তাহার অন্তরের বিদ্বেষবহ্নি প্রবলভাবে জ্বলিয়া উঠে, মনে হয় এ বিষণ্ণতা শশধরেরই বিচ্ছেদ বেদনার পূর্ণ মূর্ত্তি। হাসিতেও বিরক্ত হয়, তাহার বুকে এই অগ্নিদাহ, মনু হাসে কি বলিয়া! কালামুখী!

সে দিন হাতে কোনও কাজ ছিল না। দিন কাটাইবার উপায়স্বরূপ অতুল শোবার ঘরে খাটের উপর একখানি নভেল হাতে করিয়া চুপ করিয়া শুইয়া ছিল। বইয়ের পাতা এখন পর্য্যন্ত খোলাই হয় নাই,—খুলিবার ইচ্ছাও করিতেছিল না। নীচে মাটীতে বসিয়া মনু পান সাজিতেছিল। একা ঘরে স্বামী স্ত্রী, অথচ কেহ কাহারও সহিত কথা কহিতেছিল না। বাহিরে অবিশ্রান্ত বারিপাত হইতেছিল। খোলা জানালা দিয়া বৃষ্টির ছাট মনুর গায়ে মুখে আসিয়া লাগিতেছিল। জলের হাওয়া শুধু ঘর নয়, ঘরের মানুষ দু'টির মন পর্য্যন্ত যেন স্যাঁতাইয়া তুলিতেছিল। স্থান, কাল ও পাত্র হিসাবে যেখানে কাব্য রচিত হইতে পারিত, অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় সেখানে সম্পূর্ণ নীরস গদ্যের অভিনয় চলিতেছিল।

অতুল বইখানি রাখিয়া দিয়া চাহিয়া দেখিল, মনু হাতের কাজ ফেলিয়া, জানালার বাহিরে শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। অতুল দেখিল, কি বেদনাভরা সে চোখ দুটি, আর কি ম্লান বিষাদকাতর সে মুখখানি। নিটোল গণ্ডের স্বাস্থ্যের সে লালিমা মুছিয়া লইয়া, ভাসা চোখের তলে কালীর প্রলেপ কে লেপিয়া দিল রে? স্ত্রীর মুখের পানে চাহিয়া চাহিয়া ব্যথায় তাহার দুই চোখে জল ভরিয়া আসিয়াছিল, কিন্তু কি সান্ত্বনা সে ইহাকে দিতে পারে? এই যে শব্দহীন গভীর শোক, তরুণীর সারা দেহ মন ঘেরিয়া রহিয়াছে, সে কাহার বিরহে! ঐ অর্থহীন শূন্য দৃষ্টি সীমা হারাইয়া কোন্ অসীমে কাহার ছবি ধ্যান করিতেছে? সে কি অতুলের অজ্ঞাত? অতুল ডাকিল, 'মনু!' চমকিয়া মুখ ফিরাইয়া মনু কহিল, 'কি?' 'সত্যি কথা বল্‌বে একটা, যা জিজ্ঞেস করব?' মনু স্বামীর মুখে বিষণ্ণ দৃষ্টি স্থির করিয়া শান্তস্বরে কহিল, 'মিথ্যে ত কখনও বলি নি তোমার কাছে!' 'বেশ'—বলিয়া সঙ্কোচ কাটাইতে ইতস্ততঃ করিয়া অতুল কহিল, 'শশ নাকি বিয়ে করবে না বলেছে?' মনু তেমনই উদাস দৃষ্টি ফিরাইয়া স্বামীর পানে চাহিল, কহিল, 'মা ত তাই লিখেছেন।' 'কেন করবে না জান কিছু?'—'কি করে জান্‌ব? পড়া শেষ না হলে করবে না, এই ত বলে—শুনি।' অতুল শ্লেষপূর্ণস্বরে কহিল, 'সত্যি জান না, কার ধ্যানে সে নবীন সন্ন্যাসী হতে চাইছে?' মনু শান্তভাবে জবাব দিল, 'আমি ত জ্যোতিষ শিখিনি যে, কারু মনের কথা জান্‌তে পারব?' 'কেন, মনের কথা কেউ বলেনি নাকি? আমি শিখেছি, জ্যোতিষ, সবার মনের কথা বলে দিতে পারি, বল্‌ব?' মনু এইবার হাসিমুখে কহিল, 'বল না, সত্যি শিখেছ! আচ্ছা, কি তার মনের কথা, তাই বল আগে। তা হ'লেও ত উপায় করা যায়?' অতুল কহিল, 'তা আর হয় না গো, হয় না। যে বিদ্যুতের আলোয় চোখ হারিয়েছে, তাকে কি আর পিদীপের আলোয় ভোলাতে পার্‌বে?' মনুর কাজ সারা হইয়াছিল, পানের সাজগুলি যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া, গুটিচারেক পান একটি ডিবার খোলে ভরিয়া, অতুলের হাতের কাছে আগাইয়া দিয়া মৃদু হাসিয়া কহিল, 'বিদ্যুৎটি কোথায়? সত্যিকার, না কল্পনার?' অতুল দীর্ঘশ্বাসের সহিত কহিল, 'সত্যিকারই, তার বাড়া ভাতে ছাই দিয়ে, তোমায় বিয়ে করে' আমি ভাল করি নি মনু—এখন তা হাতে হাতেই বুঝছি। তার সঙ্গে বিয়ে হ'লে তোমরাও সুখী হতে, আমিও বেঁচে যেতুম। বড় অসময়েই এ খবর জান্‌তে পারলুম—এখন আর শোধবার পথ নাই।'

কথার আরম্ভেই মনু বুঝিয়াছিল, স্বামী রঙ্গ করিতেছেন। স্বামীর এই সব

খোঁচা দেওয়া মন্তব্যগুলি এ পর্য্যন্ত সে পল্লীগ্রামসুলভ রসিকতা বলিয়াই মানিয়া আসিয়াছে; আজও তাহাই মনে করিল, রাগ করিয়া কহিল, 'ছিঃ, কি যে তোমাদের তামাসা, যখন তখন কেন ও সব ছাই ভস্ম কথা বল? ও আমার একটুও যদি ভাল লাগে!' 'সত্যি লাগে না? কি জানি—মানুষ কি চায়,—যা পেলুম, না,চেয়ে যা পাবার নয়? বুঝ্‌তে পারি না—?' বলিয়া প্রবল নিঃশ্বাসটাকে চাপিয়া ফেলিয়া অতুল ঘরের বাহির হইয়া গেলে মনু অপ্রসন্নচিত্তে গৃহস্থালীর কাজকর্ম্মে মনোযোগ দিবার চেষ্টা করিল।

অতুলের আকস্মিক পরিবর্ত্তন মনু অনেকদিন হইতেই লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিল। শশ চলিয়া গেলে কিছু দিন তাই তাহার বড় ফাঁকা ঠেকিয়াছিল। স্বামীকে আগের মত সে আর সর্ব্বদা কাছে পায় না। খবর পায়—বাড়ীতেই আছেন, বাহিরেই বেশীর ভাগ কাটান। 'রান্না ভাল হয় না' এই অজুহাতে পাতের ভাত বেন্নন যেমন তেমনই পড়িয়া থাকে। খাটে ছারপোকার উপদ্রব, তুলার গদীতে গরম লাগে, তাই মাটীর মেঝের, অথবা একখানা মাদুর পাতিয়া শুইয়া থাকেন; মনু কাছে থাকিতে চাহিলে বারণ করেন, তাহাতে নাকি ঘুমের ব্যাঘাত হয়। মনু কত দিন মাঝরাত্রে ঘুম ভাঙ্গিয়া তাঁহাকে জানালায় মাথা রাখিয়া অন্ধকারের পানে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছে, কি হইয়াছে জিজ্ঞাসা করিলে হয় বলেন, 'কিছু না' নয় জবাব দেন না। মনু কোনও কথা কহিলে অকারণে বিরক্ত হন, না কহিলে রাগ করেন। অভিমানিনী মনু মনের ব্যথা নীরবে মনেই চাপিয়া রাখে, ভাবিয়া পায় না—স্বামী কি গুণে তাহাকে মাথায় তুলিয়াছিলেন, আর কোন অপরাধেই বা পায়ে ঠেলিতেছেন। কথায় কথায় আগেকার সে সব আদর সোহাগের পাঠ ত একেবারেই উঠিয়া গিয়াছে। মানুষ যে নিজের দুঃখ সাধ করিয়া নিজেই গঠন করে, সংসারজ্ঞানে অনভিজ্ঞা বালিকা মনু কেমন করিয়াই বা তাহার সংবাদ জানিবে? জানিলে, স্বামীর সুখের জন্য যত কষ্টই হউক, স্বামীর অপ্রীতিকর কার্য্য হইতে সে এখনই হাসিমুখে লক্ষ যোজন দূরে সরিয়া থাকিত। না জানিয়া সে যে নির্ব্বোধের মত বারবার শশধরের প্রসঙ্গ তুলিয়াই তাহার ক্ষতস্থলে সূচী বিদ্ধ করে তাহা অনুমান করিতেও পারে না।

'মনু বেড়াতে যাবে কোথাও পশ্চিম টশ্চিম?' বলিয়া অতুল ঘরে ঢুকিয়া পোষাক খুলিতে লাগিল। দালানে বঁটি পাতিয়া বসিয়া মনু স্বামীর জন্য একটি গাছ-পাকা পেঁপে কাটিয়া রেকাবীতে সাজাইয়া রাখিতেছিল। ধ

গাছটি তাহার নিজের হাতে পোতা, তাই ইহার ফলটিও মনুর কাছে অত্যন্ত মূল্যবান্। নূতন গাছের নূতন ফল, ভগবান্‌কে নিবেদন করিয়া তবে অপরকে খাইতে দিতে হয়, মনুর মার কাছে ইহা দেখা ছিল ! ভগবান্‌কে নিবেদন করিবার মন্ত্র তন্ত্র ত মনুর জানা নাই, তাই পরমভক্তিভাবে সে তাহার প্রত্যক্ষ-দেবতার জন্তই তাহা গুছাইয়া রাখিতেছিল। অতুলের কথায় বিস্মিত হইয়া সে মুখ তুলিল, অতুল ঘরের অন্য দিকে থাকায় খোলা দরজা দিয়া তাহাকে স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল না, চোখ ফিরাইয়া লইয়া কহিল, 'কেন, পশ্চিম যাবে ?' 'এম্‌নি, দিন কতক বেড়িয়ে আসা যেত। যাবে না তা হলে—?' স্বামীর শারীরিক অবস্থা স্মরণ করিয়া মনু কহিল, 'যাব না,—বাঃ—ছুটী পেয়েছ ?' 'পাই নি—পাব শীঘ্রই, পেলেই বেরিয়ে পড়্‌ব তখনি, তুমি সব গুছিয়ে রেখ।'

এমন করিয়া সহজ সুরে সহজ ভাবে অতুল অনেক দিন কথা কহে নাই, তাই মনু খুসী হইয়া তাড়াতাড়ি কাজ সারিয়া উঠিয়া পড়িল। ফলের রেকাবীখানি ঘরে টেবিলের উপর রাখিয়া, স্বামীর চাপ্‌কান খুলিবার সাহায্য করিতে করিতে কহিল, 'কোথায় আগে যাবে ? কাশী আর বৃন্দাবন আমার খুব দেখ্‌তে ইচ্ছে করে। শশ বল্‌ছিল বৃন্দাবনে—' অতুল জামার উপর হইতে মনুর হাতখানি একটু ঠেলিয়া দিয়া তাড়াতাড়ি নিজেই জামা খুলিয়া মুখ হাত ধুইতে বাহিরে চলিয়া গেল, মনু বিষণ্ণমুখে তাহারই গমনপথের পানে চাহিয়া রহিল।

অতুলের ছুটী মঞ্জুরীর খবর আসিবার পূর্ব্বেই রেবতীনাথের আকস্মিক মৃত্যুসংবাদ আসিল। অত্যন্ত অকস্মাৎ হার্টফেল করিয়া তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে, মনুই তাঁহার একমাত্র সন্তান—চতুর্থী শ্রাদ্ধের অধিকারিণী—শশধর এ ক্ষেত্রেও তাঁহার কেহ নহে। মনুকে খবর না জানাইয়াই অতুল তাহাকে লইয়া দেশে ফিরিল।

ক্রমশঃ।

শ্রীইন্দিরা দেবী।

রাণী বিশ্বেশ্বরী।

পৌষ মাস, শীত পড়িয়াছে। বৈকালে ফোঁটা কয়েক বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, শীত বাড়িয়াছে। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল, বাতাস বহিতে লাগিল। শীতে বসিয়া থাকিতে না পারিয়া সকাল সকাল দুটি খাইয়া শুইয়া পড়িলাম। কতক্ষণ

শুইয়াছি কে জানে; দেখি এক নূতন সহরের চৌমাথায় দাঁড়াইয়া আছি। জ্যোৎস্না রাত্রি; রাস্তার দুই পাশে আলোও জ্বলিতেছে; তবু বড় বড় দোকানের ছায়ায় আলো তেমন খোলে নাই। তেমন শহর কখনও দেখি নাই। মণিকার ও স্বর্ণকারের বড় বড় দোকান, শাল-দোশালার দোকান; বোধ হইল এত ধন একত্র কলিকাতাতেও দেখি নাই। পথে লোক-জন চলিতেছে। তাহাদের মাথায় টুপী, ও কাপড় চোপড়ের ভঙ্গি দেখিয়া বোধ হইল, পশ্চিম দেশ হইবে। এক জনকে সুধাইলাম,

'মশায়, এদেশের নাম কি?'

লোকটি খানিকক্ষণ আমায় আপাদমস্তক দেখিয়া জিজ্ঞাসিল,

'আপ্, কাঁহাকে রহনেবালে হ্যায়?'

'কটক।'

'ক্যা—চাটাক্?'

আমি মনে মনে তাহার শ্রবণ-যন্ত্রের প্রশংসা করিয়া ধীরে ধীরে বলিলাম,

'ক-ট-ক।'

'য কৌন্ মুলুক হ্যায়?'

মনে হইল, বলি, মগের মুলুক। কিন্তু লোকটির বেশভূষা ভদ্রলোকের। বোধ হয় বাল্যকালের বিদ্যালয়ের 'ভূগোল-বিবরণ' ভুলিয়া গিয়াছে। নইলে, কটক নাম শোনে নাই! এত বড় শহর, দীর্ঘে ছ মাইল, প্রস্থে দেড় মাইল; এক পাশে মহানদী, অন্য পাশে কাঠ-জড়ী নদী; পঞ্চাশ হাজার লোকের বাস; এসব কিছু শোনে নাই! ওড়িষ্যা দেশটা শুনিয়াছে কি না, কে জানে।

'আমার নিবাস ওড়িষ্যা।'

'জগন্নাথ-জীকো মুলুক?'

আমি মাথা নাড়িয়া হাঁ জানাইয়া বলিলাম, 'আমার মুলুক ত জানিলেন; আপনার মুলুকের নাম কি?'

'আপ্নে দিল্লী শহর দেখা নহিঁ? রাজধানী হ্যায়।'

লোকটি চলিয়া গেল। শহর দেখা দূরে থাক, আমি দিল্লীর লাড্ডুও চোখে দেখি নাই। কিন্তু প্রাচীন গৌরব মনে পড়িতে লাগিল। কোন্ পুরাকালে সাড়ে চারি হাজার বছর পূর্বে, হস্তিনাপুরে কৌরব-রাজধানী ছিল; ইন্দ্রপ্রস্থে পাণ্ডবকুলতিলক যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞ হইয়াছিল, সে

বিভবের সে ঐশ্বর্য্যের তুলনা নাই। কিন্তু পরস্পরের ঈর্ষা-দ্বেষে মাত্র আঠার দিনের যুদ্ধে চল্লিশ লক্ষ সেনার প্রাণ লইয়া কুরুক্ষেত্র শ্মশানভূমিতে পরিণত হইয়াছিল। কত কাল পরে মুগল বাদ্‌শাহ সে শ্মশান-স্তূপে সিংহাসন স্থাপন করেন। ইঁহাদেরও ঐশ্বর্য্যের সীমা ছিল না। এখনও শা-জেহান বাদ্‌শাহের বিস্তীর্ণ প্রাসাদ অতীত বিভবের সাক্ষী হইয়া আছে। তাঁহার জমা-মস্‌জিদ্‌ ভারতে অদ্বিতীয়। কালা মস্‌জিদ ও কুতব-মীনার আছে বটে; কিন্তু সমৃদ্ধির ভগ্নস্তূপ অধিক। পাশের কালিন্দী কাল-তনয়া হইয়া যুগ-যুগান্তরের উত্থান-পতনের অভিনয় দেখিয়া আসিতেছে।

কিন্তু এত সব দেখিবার ভাবিবার সময় কই? দুই চারিটা উদ্যান দেখিতে না দেখিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম। আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ প্রায় মাথার উপরে উঠিয়াছে; বুঝিলাম রাত্রি প্রায় বারটা। এক উদ্যানের চত্বরে বিশ্রামের অভিপ্রায় করিতেছি, দেখি এক প্রখর আলোকচ্ছটা ঊর্ধ্বদিগে নির্গত হইতেছে, চাঁদের আলো মিটি-মিটি করিতেছে। নিকটে গিয়া দেখি একটা বাপী আলোতে ভরা! একি নূতন রাজধানীর আলো-ঘর?

বাপীর ভিতরে তাকাইয়াছি, প্রখর সূর্য্যের মতন কি বোধ হইল, চোখে আঁধার দেখিলাম, পা খসিয়া গেল, বাপীর ভিতরে পড়িয়া গেলাম, ভাগ্যে ভাগ্যে মাথা ঘুরিয়া পড়ি নাই। নিমেষের মধ্যে এক দীর্ঘ সুড়ঙ্গের সে পারে গিয়াছি, মাথাটা মাটিতে লাগিয়াছে, পা দুখানা শূন্যে ঝুলিতেছে। তাড়াতাড়ি ডিগ-বাজি খাইয়া মাটিতে পা দিয়া দাঁড়াইলাম। কিন্তু ফাঁড়া এখনও কাটে নাই। মাথাটা নীচের দিকে ঝুলিতে লাগিল। আশ্চর্য্যের কথা, সূর্য্য মাথার নীচে। চাহিয়া দেখি দেশের গাছগুলা নীচের দিকে ডাল মেলিয়া ঝুলিয়া আছে। গগনস্পর্শী পঞ্চাশ-তলা ষাইট-তলা লোহার অট্টালিকা সেইরূপ শূন্যে লম্বিত রহিয়াছে। সে দেশের লোকগুলাও বিস্তীর্ণ রাজপথে আমারই মতন মাথা নীচে রাখিয়া স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইতেছে। অদ্ভুত দেশ বটে; রক্ষা, লোকগুলাকে ইংরেজ ইংরেজ বোধ হইল। এক জনকে জিজ্ঞাসিলাম,

'মহাশয়, আপনাদের দেশটির নাম কি?' লোকটি ভদ্র, তথাপি আমার আপাদমস্তক কেন নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, বুঝিলাম না। নিজের দেহের দিকে তাকাইয়া দেখি পরণে ধুতি ও গায়ে ছোট জামা আছে, অধঃপতনের সময় খসিয়া পড়ে নাই। তিনি আমার কথার উত্তর না দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনার নিবাস?'

দিল্লীতে ঘণ্টা কয়েক আগে নিবাস বলিতে গিয়া কি বিপদে পড়িয়াছিলাম! ভাবিলাম, 'কটক' বলা হইবে না। একাএক 'নিবাস ওড়িষ্যা' বলিয়া ফেলিয়া তাহার মুখের দিকে, সত্য কথা বলিতে কি, একটু সগর্বে, তাকাইয়া রহিলাম। কিন্তু কি আশ্চর্য, লোকটি 'ভূগোল-বিবরণ' ভুলিয়া গিয়াছে, ওড়িষ্যা যেন আকাশে, নামও কখনও শোনে নাই! এত বড় একটা দেশ, যাহার এক পাশে পাহাড়, আর পাশে সাগর, যাহাতে তিনটা জেলা আঠারটা রাজ্য আছে, যাহার জনসংখ্যা এক কোটি; বলে কি না 'ওড়িষ্যা কোথায়?' ম্লেচ্ছকে জগন্নাথের দেশ বলা মিছে; কি করি, বলিলাম, 'ভারতবর্ষে।' শুনিয়া সাহেব যেন আবার আকাশ হইতে পড়িলেন। তখন মনে হইল, সাহেব আমাদের দেশকে বলে, 'ইণ্ডিয়া'। অগত্যা তাহাই বলিতে হইল। জানি না, তিনি আমায় কোন্ 'ইণ্ডিয়ান' মনে করিলেন। লোকটি কিন্তু ভদ্র ও বিনয়ী; জিজ্ঞাসিলেন,

'আপনি বুঝি এদেশে নূতন আসিয়াছেন? দেশটি আমেরিকা।'

কি দুর্ঘটনায় আসিয়া পড়িয়াছি, তিনি জানিতেন না।

'রাজার নাম কি?'

'আমাদের রাজা-টাজা নাই।'

'রাজা নাই, রাজ্য চলে কিসে?'

'আমরা রাজ্য বলি না, বলি এস্‌টেট্‌স্।'

'সে একই কথা।'

সাহেব দ্রুতপদে কোথায় যাইতেছিলেন, আমায় 'শুভ পরাহ্ণ' বলিয়া দৌড়াইয়া চলিয়া গেলেন। দেখি, কেবল তিনি নহেন, রাজপথের যাবতীয় নরনারী, এ মুখে সে মুখে, উর্ধ্বশ্বাসে ছুটিতেছে। আমেরিকার 'রাজ্যযুক্তি'র নাম শুনিয়াছিলাম, একটু শ্রদ্ধাও করিতাম। কিন্তু লোকগুলা বালক, না উন্মত্ত, বুঝিতে পারিলাম না।

দেখিতে দেখিতে মাথার নীচে দিয়া সূর্য্য অদৃশ্য হইলেন, অমনি শত শত তাড়িত-দীপ দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। দূরে দেখি, অট্টালিকার উপরে এক অদ্ভুত কাণ্ড। চাঁদের মতন কি একটা দেখা যাইতেছে। তখন মনে পড়িল, পূর্ব্বকালে এই দেশে দানব বাস করিত, যাহাদের পরাক্রমে ইন্দ্র চন্দ্র বরুণ কম্পিত হইতেন। নিকটে মেক্‌সিকো দেশে ময়-দানবের শিল্প-কীর্ত্তি এখনও 'ময়-পুরী' নামে খ্যাত আছে। যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞ-সভা ময়ের নির্ম্মিত।

তাহার স্ফটিক-দর্পণে রাজা দুর্যোধনও বিভ্রান্ত হইয়াছিলেন। আকাশে যেটা দেখিতেছি, সেটা বা দ্বিতীয় চন্দ্র হইবে। বিজ্ঞানবলে আমেরিকা কি না করিতেছে। এক জনকে সুধাইলাম,

'মহাশয়, অই যে দূরে রজত-থাল দেখা যাইতেছে, সেটা বুঝি আপনাদেরই গড়া?' লোকটি আকারে প্রকারে শিষ্ট বোধ হইয়াছিল। কিন্তু যে ভাবে আমায় পুনঃ পুনঃ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল, তাহাতে বিরক্ত হইতে লাগিলাম।

'ক্ষমা করুন, আপনি কি বলিতেছিলেন?' মাথা আর মুণ্ড! কত সতর্ক হইয়া, কেমন ঘুরাইয়া, বিজ্ঞতা করিয়া কথাটা বলিয়াছিলাম! হয় ত দেশের লোকগুলা কালা। রাত দিন কলের ঘড়ঘড়ানি শুনিলে আমরাও কালা হইয়া পড়িতাম। সভ্য হওয়া অপেক্ষা তাহার ধাক্কা সামলানা কঠিন। আমাদের দেশে একা শিবু-ঠাকুর পারিয়াছিলেন।

'বলি, ওটা কি দ্বিতীয় চন্দ্র?'

লোকটি আর একবার ক্ষমা চাহিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। বুঝিলাম সে দেশের লোকের কথা কহিবারও সময় নাই। দিল্লী হইতে এই দেশ মাত্র আট হাজার মাইল। কিন্তু ব্যবহারে কত ভিন্ন। যে যাহাই বলুক, শিষ্টতায় প্রাচ্যের নিকটে পাশ্চাত্য দাঁড়াইতে পারে না।

কৃত্রিম চাঁদ কি না, দেখিয়াই আসি না। যেমন মনে হওয়া, অমনই হু হু শব্দে যেন উড়িতে লাগিলাম। প্রথমে মনে হইল যেন 'এরোপেলেন' বিমানে চড়িয়াছি। কিন্তু কোথাও কিছু দেখিতে পাইলাম না। একটু পরে বুঝিলাম, মেঘ-স্তর ভেদ করিয়া যাইতেছি। আর শব্দ শুনিতে পাইলাম না। শীতে থর্ থর্ করিতে লাগিলাম, শ্বাসরোধের উপক্রম হইল। কিন্তু দেখি, কোথায় বা রজত-থাল, কোথায় বা চাঁদ! একটা পাহাড়ে দেশে রোদ পড়িয়া দৃষ্টিবিভ্রম ঘটাইয়াছিল! উচা উচা গিরি, পাশে পাশে বিশাল গহ্বর, দীর্ঘ বিবর,—এমন দেশ ত দেখি নাই! আরও আশ্চর্য, জন-মানব নাই, পশু পক্ষী নাই, গাছপালা পর্যন্ত নাই! কিন্তু কি দারুণ রোদ, গা পুড়িয়া যাইতে লাগিল। পাহাড়ের ছায়ায় গেলাম; কি বিপদ! এমন দারুণ শীতও দেখি নাই! দেশের নামটা জানিতে পারিলে সব বুঝিতে পারিতাম। যেমনই মনে হওয়া, অমনই শোনা,—'পথিক তুমি কি খুজিতেছ?'

আমি এদিকে সেদিকে তাকাইলাম, কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। লোকটি যে-ই হউক, আমার দেহের বর্ণ ও পরিধান নিরীক্ষণ করিতেছে না, ইহাতে স্বস্তি বোধ করিলাম। অদৃশ্য প্রশ্নকারকের উদ্দেশে বলিলাম,

'আমি খুঁজি নাই কিছু। জিজ্ঞাসি এ দেশের নাম কি?'

'চন্দ্রদেশ।'

'এ দেশের রাজা কে?'

'রাজা নাই, রাণী আছেন।'

'আচ্ছা, তাহাই হউক, রাণীর নাম কি?'

'রাণী বিশ্বেশ্বরী।'

শুনিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। নামটি শোনা শোনা বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু 'চন্দ্রদেশ' মনে করিতে পারিলাম না। পূর্বকালে বঙ্গভূমিতে এক 'চন্দ্রদ্বীপ' ছিল।

'মহাশয়, বলি, চন্দ্রদ্বীপকে কি চন্দ্রদেশ বলিতেছেন?'

'দ্বীপও বলিতে পারেন, চারিদিকে আকাশ-সমুদ্র। আপনার নিবাস?'

লোকটি বাঙ্গালা বোঝে,

'আমার নিবাস বঙ্গদেশ।'

'বঙ্গদেশ?'

'কথায় বুঝিতেছি আপনি বাঙ্গালী; বঙ্গদেশ চেনেন না? ভারতবর্ষের পূর্বপ্রান্তের বঙ্গদেশ।'

'ভারতবর্ষের?'

লোকটি বোধ হয় বহুকাল বিদেশে প্রবাসী হইয়া দেশের নামটাও ভুলিয়া গিয়াছে।

'জম্বুদ্বীপের ভারতবর্ষ।'

'জম্বুদ্বীপ কোথায়?'

মনে হইল একবার বলি, জাম গাছের তলায়।

'সাগর-বেষ্টিত জম্বুদ্বীপও চেনেন না? বলি, পৃথিবীর নাম শুনিয়াছেন?'

'ওঃ! আপনার নিবাস পৃথিবীতে! এতক্ষণ বলেন নাই কেন? আপনাকে নমস্কার। আমাদের মাতৃদেশ-নিবাসী।'

আমি আশ্চর্য হইয়া গেলাম। জাপানী বঙ্গদেশকে গুরু দেশ বলে। ইনি কিন্তু পৃথিবীকে মাতৃ-দেশ বলিতেছেন।

'আপনি কি মাতুলালয় চেনেন?'

'চিনি বই কি। অই যে দেখা যাইতেছে।'

আমি পেছু ফিরিয়া দেখি, চন্দ্র অপেক্ষা চতুর্গুণ বৃহৎ এক রজত-থাল

আকাশে দীপ্তি পাইতেছে। তাহাতেও কলঙ্ক আছে, কিন্তু অল্প। বার আনা অতিশয় উজ্জ্বল, যেন দর্পণে রবিকর প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। দেখিয়া বিস্ময় জন্মিল। কিন্তু ভাবিলাম, এমন দেশে কে না মামাবাড়ী করিতে চাহিবে।

'বলি, কি সূত্রে মাতৃভূমি বলিতেছেন?'

'যে সূত্রে আপনারা আমাদের দেশকে মাতুলালয় বলেন?'

'সে ত মুখের কথা! এই সম্বন্ধ?'

'আপনারা মুখে বলেন, আমরা কাজে করি। আমরা মাতৃদেশকে নিরন্তর প্রদক্ষিণ করিতেছি।'

'কবে হইতে?'

'যবে মাতৃ-কুক্ষি হইতে আমাদের দেশের জন্ম হইয়াছে।'

'সে কবে?'

'জানি না।'

'কেন প্রদক্ষিণ করিতেছেন?'

'মায়ের আজ্ঞায়।'

মনে মনে ভাবিলাম, লোকটি শিষ্ট, মাতৃভক্ত। আমারও ত মাতৃভূমি আছে, প্রদক্ষিণ দূরে থাক, চেয়েও দেখি নাই।

কিন্তু দেশটা কিছু নয়। রাণীই বা কেমন, এমন অদ্ভুত প্রজা লইয়া রাজ্য করেন? এমন সময় দেখি, এক গিরিশৃঙ্গে অপরূপকান্তি অতিসৌম্যা কে বসিয়া আছেন। সুধাইলাম,

'তুমি একাকী এই মরুদেশে কি করিতেছ?'

কে যেন উত্তর করিল, 'আমি রাণী, দেশ পালন করিতেছি।'

'তা কর। আমি নির্বাতে ও তৃষ্ণায় কাতর হইয়া পড়িয়াছি, শীতেও দাঁড়াইতে পারিতেছি না। কোথায় একটু বাতাস, জল ও আগুন পাই, বলিতে পার?'

তিনি অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া দূরে একটা তারা দেখাইয়া দিলেন।

আমি সেই দিকে চলিতে লাগিলাম। পথ আর ফুরায় না। কিন্তু যত নিকট হইতে লাগিলাম, তারাটি বাড়িয়া বাড়িয়া পৃথিবীর দশ বার গুণ বৃহৎ হইয়া পড়িল। উত্তাপ বোধ করিতে লাগিলাম। দেখি, যেমন ভীষণ বাত্যা, তেমনই গগনব্যাপিনী মেঘমালা ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছে। কিন্তু কি আশ্চর্য, চন্দ্র দেশের রাণী মেঘে বসিয়া দোল খাইতেছেন!

'তোমাকে চন্দ্রদেশে দেখিয়া আসিলাম। এখানে কখন আসিলে?'

কে যেন বলিল, 'আমি চিরকাল এখানে আছি।'

কথাটা বড় বিশ্বাস হইল না। হয় ত বাদিয়ার মেয়ে, কুহক জানে। যে মেয়ে নির্বাত নির্জ্জন নির্জ্জীব দেশের গিরিশৃঙ্গ আসন করিতে পারে, সে ঝঞ্ঝা ও মেঘে দোল-খেলা করিবে, আশ্চর্য কি। যাহা হউক, আমার শীত গিয়াছে। প্রচুর বাঁপে তৃষ্ণা গিয়াছে, ভীষণ পবনে শ্বাস-প্রশ্বাসেরও কষ্ট নাই। এক স্থানে দেখি, বিশাল অগ্নি রক্তবর্ণ হইয়া জ্বলিতেছে। অগ্নিকুণ্ডটি কত যোজন কে জানে। আশ্চর্য হইয়া ভাবিতেছি, শুনিলাম, 'পথিক, তুমি কি চাও?'

'আমি চাই না কিছু। বলি, অই আগুনটা কেন?'

'যজ্ঞের অগ্নি।'

'কে যজ্ঞ করেন?'

'বৃহস্পতি।'

বৃহস্পতি ত সুর-গুরু। আপনাদের দেশের নাম কি?'

'বৃহস্পতি।'

'আমাদের ঋষির নামে বুঝি আপনারা দেশের নাম রাখিয়াছেন? তা, নামটি মন্দ হয় নাই, দেশটি বৃহৎ বটে, দেশের তেজও বৃহৎ বটে।'

'তোমার নিবাস?'

'আমার নিবাস পৃথিবী।'

'পৃথিবী?'

'আজ্ঞে হাঁ। পৃথিবী বুঝি চেনেন না? যে পৃথিবীকে চন্দ্র ভক্তিভরে নিরন্তর প্রদক্ষিণ করিতেছে।'

'কয়টি চন্দ্র বলিলে?'

'কয়টি কি? একশ্চন্দ্রস্তমো হন্তি।' বলিয়া মনে হইল, চন্দ্রটি একবার দেখাইয়া দিই। কিন্তু পেছু ফিরিয়া দেখি, চন্দ্র-টন্দ্র কিছুই নাই!

'চিন্তিত কেন?'

'চিন্তিত নই, বলি আপনাদের চন্দ্র আছে?'

'হাঁ, গোটা আষ্টেক আছে।'

দেখিলাম সত্যই ত। চারিটা ছোট। ভাগ্যে আমাদের আটটা নাই! থাকিলে গ্রহগণনায় আমাদের পাঁজি ভরিয়া যাইত, যাত্রিক দিন পাওয়া যাইত না।

'মহাশয়, আপনি গুরু বৃহস্পতির দেশে থাকেন, অথচ সপ্ত-সাগরা সপ্ত-দ্বীপা পৃথিবীর নাম শোনেন নাই?'

'বোধ হয়, অইটা?'

এই বলিয়া অতি ক্ষুদ্র, প্রায় অদৃশ্য, একটা তারা দেখাইলেন। দেখিয়া আমার গর্ব গেল, অভিমানে কান্না পাইতে লাগিল। তথাপি,

'বলি, আপনাদের দেশটি স্থির ত? না চন্দ্রের মতন ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রাণান্ত?'

অদৃশ্য পুরুষ সঙ্কেত করিলেন, আমায় কে যেন একটা তারার দিকে টানিয়া লইতে লাগিল। দেখি, তারা নয়, আমাদের সূর্যের মতন কি এক প্রদীপ্ত থালা; থালা নয়, জ্যোতির্ময় এক বিশাল চক্র; চক্র নয়, অগ্নিময় এক বিপুল পিণ্ড। তাহার কিরণচ্ছটা গগন ভেদ করিয়াছে, লোহিত লোল জিহ্বা দিগ্‌দিগন্তরে লক্‌-লক্‌ করিতেছে, জ্বালাময় বাষ্প প্রচণ্ডবেগে ঘূর্ণিত হইতেছে। কিন্তু এ কি? তপ্তকাঞ্চনবর্ণা, বিদ্যুৎপ্রভা, মহিমময়ী সেই নারী স্বচ্ছন্দে হরিপৃষ্ঠে বসিয়া আছেন! তাঁহার পাদাঙ্গুষ্ঠে দীর্ঘ রশ্মি, রশ্মির প্রান্তে কতকগুলা পিণ্ড বদ্ধ রহিয়াছে, এবং তিনি, বালিকার ন্যায়, সূত্রবদ্ধ লোষ্ট্র ঘূর্ণনের ন্যায়, সেই বিপুল পিণ্ডগুলা অঙ্গুষ্ঠসঞ্চালন দ্বারা ঘুরাইতেছেন। আমি খেলা দেখিতেছি, কে যেন বলিল, 'পান্থ, তুমি কি দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়াছ?'

'দিগ্‌ভ্রান্ত! আমি যে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি। বলিতে পারেন, আপনাদের দেশের নাম কি?'

'সূর্য-দেশ।'

'উনি, বুঝি, আপনাদের দেশের রাণী?'

'হাঁ, রাণী বিশ্বেশ্বরী! প্রণাম কর।'

কি জানি কেন, সাবিত্রী স্মরণ হইল।

'বলি, পিণ্ডগুলা কি আপনাদেরই দেশের মাটি?'

'তা বই আর কি।'

মনে পড়িল, আমরা যে বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল 'ক্ষুদ্রক', বৃহস্পতি, শনি, ইয়ুরেন, নেপচুন নামে নয়টা গ্রহ গণি, সেগুলাই রশ্মিতে বাঁধা হইয়া সূর্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে। এক রশ্মিতে নয়, সব রশ্মি সমান লম্বা নয়। 'ক্ষুদ্রক' একটা পিণ্ড নয়, অগণ্য; শউল মাছের ঝাঁকের মতন পাশে পাশে থাকিয়া ছুটিতেছে। হায়, পৃথ্বী, তোমায় পৃথুলা বলিয়া জানিতাম! তাহার দশা

দেখিয়া, কি জানি কেন, দীর্ঘনিশ্বাস বহির্গত হইল। এই মাটিটুকুর তরে, তাহাও সবটুকু নয়; একটু, অতি একটু'র তরে, এত মারা-মারি হানা-হানি হইয়া গেল!

আশে পাশে দেখি, পুঞ্জে পুঞ্জে উল্কা উঠিতেছে, প'ড়িতেছে; কোনটা ভীষণনিনাদে বিদীর্ণ হইতেছে। কোনটা ছিন্ন ভিন্ন, চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া ধূলির আকারে আকাশ ব্যাপ্তি করিয়াছে। পুঞ্জে পুঞ্জে ধূমকেতু পুচ্ছ বিস্তার করিয়া ভয়ঙ্করবেগে ধাবিত হইতেছে। আমার চোখ বুজিয়া আসিল, মনে হইতে লাগিল, সে দেশ ছাড়িয়া চলিয়াছি; কত পথ চলিয়াছি, পথের তবু শেষ নাই। পরে তাপ অনুভব করিলাম, চোথ মেলিয়া দেখি, আর এক বিশাল সূর্যের সম্মুখীন হইয়াছি। এ আবার কি?

'হে বিদেশী, তুমি কোথায় চলিয়াছ?'

শব্দ শুনিয়া, বিশেষতঃ 'বিদেশী' ডাকে চৈতন্য হইল।

'তা ত জানি না। বোধ হয় দেশ-পর্যটনে। বলি, আপনাদের দেশের নাম কি?'

'কিন্নরী দেশ। তোমার নিবাস?'

'পর্যটকের আবার নিবাস কি? সম্প্রতি সূর্যদেশ হইতে আসিতেছি।'

'কোন্ সূর্য-দেশ?'

লোকটি বলে কি?

'জবা-সঙ্কাশ সহস্রাংশু দিবাকর সূর্য। বুঝিয়াছেন?'

'কই, এ নাম ত শুনি নাই। কোথায়?'

'না শোনা আশ্চর্য নয়। এদেশে বিদ্যালয় আছে কি, 'ভূগোল-বিবরণ' পড়া হয় কি? হইলে জানিতেন, জগতে সূর্য এক, দ্বিতীয় নাস্তি। আমরা এক তারার নাম 'কিন্নরী' রাখিয়াছি। আপনারা, বুঝি, সে নামটা লইয়াছেন? তা, রাণীর নাম কি?'

'রাণী বিশ্বেশ্বরী।'

'বিশ্বেশ্বরী? বলেন কি, তাঁর রাজ্য হইতেই ত আসিতেছি।'

এই কথা বলিতে না বলিতে দেখি, সেই দূর, অতিদূর দেশে, সূর্যদেশের সেই নিরুপমা সস্নেহে সর্বদিক নিরীক্ষণ করিতেছেন। সাহসে আমার বুক ভরিয়া গেল; আশ্বাসে বলিলাম, 'মা, তুমি এখানে, অথচ আমায় বলে বিদেশী?'

এখন আর ভয় নাই, স্বচ্ছন্দে এ তারা, সে তারা দেখিতে লাগিলাম; নীল, শুক্ল, পীত, লোহিত, ক্ষুদ্র, বৃহৎ, অতি বৃহৎ। কোটী কোটী প্রদীপ্ত, কোটী কোটী তমোবৃত। পৃথিবী হইতে এ সব দেখিতে পাইতাম না, অন্ধকার দেখার বিষয় নয়। কিন্তু কে এ বামা? একটা তারা লইয়া আর একটার দিকে ভীমবেগে নিক্ষেপ করিতেছে, দুইটা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া আকাশে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিকীর্ণ করিতেছে! এ কে চণ্ডী, দুইটা তারা ঠুকিয়া দিতেছে, একটা হইয়া যাইতেছে, দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে, নিবিয়া যাইতেছে। যে দিকে তাকাই, সে দিকেই সেই রণ-রঙ্গিণী। কখনও নীরদবর্ণা শ্যামা, কখনও হসিতবদনা, কখনও ভীমা। ত্রাসে কাঁপিতে লাগিলাম, বুক্ ধড়াস্ ধড়াস্ করিতে লাগিল। ভয়ে পলাইয়া গেলাম। দেখি, গৃহিনী যেমন যষ্টি দ্বারা দুগ্ধ আবর্তন করেন, এক বর্ষীয়সী দিগন্তব্যাপী 'নভস্ত' আবর্তিত করিতেছেন। শ্বেত ফেনপুঞ্জ বলয়াকারে ভ্রমণ করিতেছে, অধোগত ঊর্ধ্বগত হইতেছে, আকুঞ্চিত প্রসারিত হইতেছে। সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসিলাম, 'এ কি মা, কি করিতেছ?'

'সং-হা-র দ্বারা নূতন জগৎ গড়িতেছি।'

আমার মাথা ঘুরিতে লাগিল, মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলাম। কতক্ষণ পরে, মনে নাই, দেখি এক বিস্তীর্ণ সাগরে পাথরের এক দ্বীপ ভাসিতেছে। দ্বীপের দুই পাশের দুই বাহু ছিন্ন হইল, দ্বীপ ত্রিকোণ হইল। উত্তরদিকে মুহুর্মুহুঃ ভীষণ নাদ ও প্রচণ্ড ভূ-কম্প হইতে লাগিল, সাগর ভেদ করিয়া এক উচ্চ পর্বতমালা উত্থিত হইল। মনে হইল যেন চিনি, যেন দেখিয়াছি। কত কাল গেল, কত বৃষ্টি বাত্যা বহিল, কত পাথর ক্ষয় পাইল, কত নদী বহিল। দেখি, এক ধাত্রী অণু নিরীক্ষণ করিতেছেন, যেখানে যেটি মানায়, সেখানে সেটি সাজাইয়া সাজাইয়া তৃণ, গুল্ম, পশু পক্ষী, মানুষও গড়িলেন। নিকটে এক বালিকা অণুকে কন্দুক করিয়া উৎক্ষেপ করিতেছে, লুফিয়া ধরিতেছে। এক নয়, দুই নয় শত নয়, কোটী নয়। আহা কি কান্তি, কি মুক্তাফলের লাবণ্য সর্বাঙ্গে মূর্চ্ছিত হইতেছে। কি প্রসন্না, কি মুগ্ধা, কি অভিরামা। মনে হইতে লাগিল, কত কালের চেনা জানা হাতে মানুষ-করা আমার বিজয়া কন্যা ক্রীড়া করিতেছে।

'মা, তোমায় এত খেলা আসে? মহতের খেলাতেও সাধ মিটিল না, অণুর কন্দুক লইয়া খেলা?'

মায়ের মুখমণ্ডলে স্মিতরেখা দেখিতে পাইলাম। ধন-ধান্যে, যোগ-ক্ষেমে ভারত ভরিয়া উঠিল। পুরাতন ঋষির স্তব শুনিতে পাইলাম,

হে বিশ্বেশ্বরি, তুমি বিশ্বাত্মিকা, সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার-কারিণী। তুমিই জগৎ ধারণ করিতেছ, পালন করিতেছ। তুমিই জগৎ-প্রতিষ্ঠা; অতিসৌম্যা, অতি-রুদ্রা। তুমিই অখিল জগতের মা, তুমিই ধাত্রী, তুমিই শক্তি। প্রসন্ন হও।

কে যেন বলিল, 'মা ভৈঃ। আমি মা, এত কাছে, দেখিতে পাইতেছ না?' *

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

ড্রেস রিহার্সেল।

১

কলেজের শুভ্র সৌধাবলীর অনতিদূরে 'গুরু ট্রেনিং স্কুল', এবং ট্রেনিং স্কুলের সন্নিকটেই কলেজের ছাত্রদিগের হোষ্টেল্। গুরুগণের আচার ব্যবহার 'প্রাইমারী' পাঠশালার উপযোগী, অর্থাৎ সেকালের। কলেজের ছাত্রদিগের 'মেজাজ' 'সেকেণ্ডারী', অর্থাৎ একালের। প্রথমে যখন ট্রেনিং স্কুল স্থাপিত হয়, তখন কলেজের ছাত্রগণ তাহাদিগের ভবিষ্যযুগের প্রতিবাসিগণের শুভাগমন বিশেষ মনোযোগপূর্ব্বক লক্ষ্য করে নাই। কচিৎ দুই এক জন ছাত্র, তাঁহা-দিগের বৈকালের জলযোগের ব্যবস্থা কি রকম, তাহা লুক্কায়িতভাবে দেখিতে গিয়াছিল, কিন্তু রন্ধনশালার দ্বার সর্ব্বদাই রুদ্ধ! তবে তাঁহারা আহার করেন কোথায়? কথাটা সোজা। গুরুগণের মধ্যে জাতিবিচার ও জাতি-রক্ষা কত দূর সম্ভব, সে সম্বন্ধে পরস্পরের ঘোরতর মতভেদ হওয়াতে তাঁহারা অনেকেই ধর্ম্মশালায়, এবং কেহ কেহ বাজারে গিয়া লুচি আহার করিয়া আসি-তেন। কেহ কেহ কদাচিৎ বলিতেন, 'অতি দুঃখের জীবন আমাদের!' তাহাতে কাহারও কাহারও চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইত। ইহাতে বেশ প্রতীয়মান হইত যে, তাঁহাদিগের মধ্যে একটা একতা ছিল।

গুরু ট্রেনিং কি? কি করিয়া প্রাইমারী স্কুলের গুরুকার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিতে হয়, তাহার শিক্ষা। ভারতবর্ষে যে জাতীয় জীবন অঙ্কুরিত হইয়াছে, তাহা বর্দ্ধিত করিতে হইলে, গুরু ও নারী, উভয়েরই ট্রেনিং নিতান্ত আবশ্যক। গুরু 'ব্রহ্ম'। নারী ব্রহ্ম না হইলেও অন্ততঃ তাহার অর্দ্ধেক।—

---

* গত বৎসর মাঘ মাসে Ravenshaw College Extension Lecture.

নারী ভবিষ্যদ্বংশের জননী। গুরু ভবিষ্যদ্বংশের জ্ঞানদাতা। উভয়েরই শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক অনুশীলনের উপর জাতীয় জীবন প্রতিষ্ঠিত।

শারীরিক ব্যায়াম গুরুদিগের পক্ষে রুচিকর না হইলেও তাহার দিকে কর্তৃপক্ষদিগের অতিশয় প্রবল দৃষ্টি ছিল। প্রথমতঃ ডাণ্ডা, গুলি, ড্রিল প্রভৃতি কতকগুলি ব্যায়ামে সকলে অভ্যস্ত হইয়া গেলে, বাৎসরিক রিপোর্টে প্রকাশ পাইল যে, প্রত্যেকে ওজনে প্রায় দশ সের কমিয়া গিয়াছে। ইহাতে জেলার ইনস্পেক্টরের কৈফিয়ৎ তলব হইলে তিনি বুঝাইয়া দিলেন যে, ব্যায়ামের সঙ্গে সঙ্গে খাদ্য না জুটিলে শরীর শীর্ণ হইয়া যায়। যে তল্লাটে ট্রেনিং স্কুল, সেখানে দুগ্ধ দুষ্প্রাপ্য। গাভীকুল ক্রম-আবর্ত্তনে এক প্রকার পরিবর্ত্তিত দুগ্ধহীন কঙ্কাল-বিশিষ্ট পশুর আকারে পরিণত হইতেছে। যদি ভগবান এই সকল জীবকে আবর্ত্তনচক্রে না ফেলিয়া দিয়া পূর্ব্বাবস্থাতেই রাখিতেন, তবে কোনও গোল বাধিত না, এবং গুরুগণের দেহেরও কোনও পরিবর্ত্তন ঘটিত না। কিন্তু ক্রম-বিকাশ (Evolution) অনিবার্য্য। ক্রমবিকাশ যেমন অনিবার্য্য, জীবন-সংগ্রামও সেই রকম অনিবার্য্য। নিকটস্থ খাল, বিল ও পুষ্করিণীতে যাহা কিছু মৎস্য ছিল, তাহা কলেজের অধ্যাপকগণ ও ছাত্রগণ যেন তেন প্রকারেণ সংগ্রহ করিয়া উদরসাৎ করিতেন। দুগ্ধ ও মৎস্য এইরূপে দুষ্প্রাপ্য হওয়াতে গুরুগণ স্বতঃই অনাহারে শীর্ণকায়।

ইনস্পেক্টরের রিপোর্টের মর্ম্ম কর্তৃপক্ষগণ স্বীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার ফলে যে মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে গুরুগণ কিছু ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িলেন। অর্থাৎ, মৎস্য ও দুগ্ধের অভাবে একমাত্র পুষ্টিকর পদার্থ চীনা-বাদাম, এবং অরহর ও ছোলার দাইল। এগুলি হয় তাঁহারা চাষ করাইয়া বা নিজে চাষ করিয়া লউন, এবং এক বৎসরের মধ্যে দেহের লুপ্ত দশ সের (মাধ্যাকর্ষণের বল) পুনরুদ্ধার না করিতে পারিলে তাঁহাদিগের বেতনবৃদ্ধি হওয়া অসম্ভব। ইত্যাদি।—

২

গুরুগণের গুরু রমানাথ বলিলেন, 'ইহার অন্যবিধ উপায় আছে। চাষ করিয়াই যে মাধ্যাকর্ষণের প্রতাপ বর্দ্ধিত করিতে হইবে, এমন কোনও কথা নাই। অনেক কৃষক চাষ করিয়া এবং অপর্য্যাপ্ত আহার করিয়াও শীর্ণকায়। আমার দিকে তাকাইয়া দেখ! আমি ওজনে ২ মন ১৭ সের। অথচ আমি পরিমিত আহার করি। তাহার কারণ কি? আমি পূর্ব্বে যাত্রার দলে বৃন্দা

সাজিতাম। মনের আনন্দে আমার কলেবর বর্দ্ধিত হইয়াছিল। ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে যে, অভিনয় দেহবৃদ্ধির উপযোগী একটা মহৎ প্রণালী। কিন্তু ট্রেনিং স্কুল সেকালের যাত্রা-অভিনয়ের পক্ষে অনুপযোগী। বরং ট্রেনিং স্কুলের মাল মশলা লইয়া লুক্কায়িতভাবে মধ্যে মধ্যে 'এমেটিয়র কনসার্ট' ও ড্রেস-রিহার্সেল প্রভৃতি অভিনয়ের উপক্রমণিকাগুলি অভ্যস্ত করিয়া রাখিলে অল্প দিনের মধ্যেই কলেজের ছাত্রবৃন্দ এবং 'এন্‌লাইটেন্‌ড্' ভদ্রলোকবর্গের বিস্ময় উৎপাদন করা যাইতে পারে।'

এই সকল মাল মশলার মধ্যে ট্রেনিং স্কুলে কতকগুলি বিশেষ উপযোগী পদার্থ ছিল।

১। গ্লোব (Globe) ইহা রমানাথের মতে 'গোলাকার গহ্বর', এবং তাহার আবরণে ভূমণ্ডলের সাগর, উপসাগর, মহাসাগর, গিরিশ্রেণী, মহাপ্রদেশ, নদ, নদী প্রভৃতি অঙ্কিত। এই গোলাকার গহ্বরের সাহায্যে ভূগোল-বিজ্ঞানের অনুশীলন যত দূর না হউক, 'তবলা-বিজ্ঞানের' অনেকটা উন্নতি হওয়া সম্ভব।

২। 'কিট' (Kit) অর্থাৎ থলিয়া। 'ড্রেস্' প্রভৃতি রক্ষা করিবার উপযোগী।

৩। মানচিত্র। (Map) ইহা দ্বারা 'পটক্ষেপণ' হওয়া সম্ভব।

৪। বোর্ড। (Board) ইহা সারি সারি দুই পার্শ্বে স্থাপন করিয়া গর্ভাঙ্ক-দৃশ্যগুলি অঙ্কিত করিলে চলিতে পারে।

৫। টেব্‌ল (Table)। উচ্চ হইলেও প্লাটফর্মের উপযোগী।

৬। পশুদিগের ছবি, এবং 'সত্যং বদ' প্রভৃতি অঙ্কিত পেষ্টবোর্ড। রঙ্গালয়ের শোভা উৎপাদনকারী।

৭। পেণ্ট (Paint)। শ্যামল, হরিত, ধূসর, কালো এবং সাদা কয়েকটি রঙ্গ। এগুলি 'ওভর্সিয়র বাবু' কর্তৃক আনীত হইয়া ট্রেনিং স্কুল সম্প্রতি 'পেণ্ট' করা হইয়াছিল, এবং যাহা অবশিষ্ট ছিল, তাহা অভিনেতৃবর্গের মুখে স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করা সম্ভব।

এইরূপে অনেকগুলি সৎপরামর্শ দিয়া গুরু রমানাথ বলিলেন, 'এখন দেখা যাউক, কোন্ অভিনয় প্রশস্ত।'

অনেক বাক্‌বিতণ্ডার পর স্থির হইল যে, বীররসই সকলের হৃদয়াকর্ষক, এবং বীররসের মধ্যে 'পুলিস ফোর্সে'র ভাবই মনোহারী। কিন্তু একটা বাধা এই যে, 'ইউনিফর্ম' (পুলিসের সাজ) নহিলে অভিনয় অসম্ভব।

গুরু রমানাথ বলিলেন, 'তাহার জন্য কোনও ভাবনা নাই। আমার সঙ্গে ডিভিসনল্ ইন্‌স্‌পেক্‌টর বাবুর বিশেষ সখ্য আছে। অনুরোধ করিলে তিনি অন্ততঃ ছয় জন কনষ্টেবলের পোষাক (এবং হয় ত এক জন জমাদারের পোষাকও) এই অভিনব অভিনয়ের জন্য ছাড়িয়া দিতে পারিবেন।'

সকলেই প্রফুল্লচিত্ত হইয়া গুরু রমানাথের এই বিরাট কল্পনা ও উদ্যোগের জন্য ধন্যবাদ দিলেন, এবং সেই রাত্রি হইতেই ড্রেস্‌-রিহার্সেলের যোগাড় আরম্ভ হইল।

রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত নানাবিধ বিকট শব্দের বাহুল্য শ্রবণ করিয়া কলেজ-হোষ্টেলের সুপারিন্‌টেনডেণ্ট অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় নিদ্রোত্থিত হইয়া 'আই, এ' ক্লাশের ছাত্র রঘুনাথকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এখানে কোনও 'স্যাল-ভেশন্ আর্ম্মি' দল আছে?'

রঘুনাথ রাত্রি জাগিয়া গ্রীক ইতিহাস পাঠ করিতেছিল।

'কেন বলুন ত?'

অধ্যাপক। ঐ বিকট শব্দগুলি কিসের?

রঘু। বোধ হয় ট্রেনিং স্কুলের গুরুদের।

অধ্যাপক। অর্থ কি?

রঘু। উঁহারা বোধ হয় অনেক রাত্রিতে ভাত রাঁধিয়া খান।

অধ্যাপক। এ সম্বন্ধে আমি কর্ত্তৃপক্ষগণকে রিপোর্ট করিব।

৩

কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষগণকে রিপোর্ট করিবার পূর্ব্বেই ড্রেস্‌-রিহার্সেল খুব অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছিল। গুরুগণের মধ্যে ছয় জন গুরু অতিশয় দীর্ঘকায়; তাঁহারা পোষাকগুলি বাছিয়া লইয়া পরিধান করিতেছিলেন, এবং একখানি ক্ষুদ্র দর্পণ সম্মুখে রাখিয়া যত দূর সম্ভব স্বীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি লক্ষ্য করিতেছিলেন। গুরু রমানাথ হেড কনেষ্টবলের 'পার্ট' গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার দেহের আয়তন অধিকতর বর্দ্ধিত করিবার অভিপ্রায়ে ইউনিফর্মের মধ্যে ক্ষুদ্র দুইটি বালিশ বক্ষঃস্থলে সংস্থাপিত করিয়াছিলেন।

প্রায় সন্ধ্যা। 'হল' নামক কামরার মধ্যে একটা মোমবাতি জ্বলিতেছিল। এমন সময় একটি লোক বাহির হইতে বাতায়নের পার্শ্বে তাহার বৃহৎ চক্ষুর্দ্বয় সংলগ্ন করাতে, রমানাথ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন 'কেও'?

রমানাথ উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, 'বাহির যাও, নিকল্ যাও, জহান্নুম্ যাও। তুম্ কউন্?'

আগন্তুক। আমি ভরসা সিং কনষ্টেবল। দারোগা বাবু আপনাদিগকে 'ড্রিল' শিখাইবার নিমিত্ত পাঠাইয়াছেন।

রমানাথ। তবে এস।

ভরসা সিং 'হলে' প্রবেশ করিলে রমানাথ বলিলেন, 'তোমরা চোর ধরিবার সময় যে রকম মার্চ কর, এবং ধরিলে তাহাকে কি করিয়া থানায় লইয়া যাও, তাহা শিখাইয়া দাও।'

ভরসা সিং। এটা খুব সহজ। আপনারা সারি হইয়া দাঁড়ান।

গুরুগণ সারি দিয়া দাঁড়াইলে ভরসা সিং 'রাইট্ লেফ্ট, হল্ট্ ফ্রন্ট্' প্রভৃতি বিকৃতভাবে উচ্চারণ করিয়া, এবং 'টেন্সন্' (attention) নামক মন্ত্র দ্বারা তাঁহাদিগকে উত্তেজিত করিয়া, এবং সেই সঙ্গে পদবিক্ষেপের প্রণালী বিশদভাবে বুঝাইয়া দিয়া, অবশেষে বলিল, 'চমৎকার হইয়াছে।'

রমানাথ। কিন্তু এখনও চোর ধরিবার প্রণালী আমাদের শিক্ষা করা হয় নাই।

ভরসা সিং। পুলিস লাইনে হাজ্রীর সময় হইয়া গিয়াছে। তবে মোটের মাথায় আমি বুঝাইয়া দিতে পারি। চোর ধরিবার প্রণালীর নাম 'বী মার্চ', অর্থাৎ গুন্ গুন্ শব্দে চোরকে ঘিরিয়া ফেলিতে হইবে।

রমানাথ। চুরী করিবার সময়?

ভরসা সিং (স্মিতমুখে)। চুরী করিবার সময় পুলিস সেখানে থাকিবে কি প্রকারে? চোর গৃহস্থের বাটী হইতে বাহির হইবার কালেই গ্রেপ্তার করিবার প্রশস্ত সময়।

ভরসা সিং চলিয়া গেলে গুরুমণ্ডলীর মধ্যে কয়েকটী ওস্তাদ লোক বেহালা, তবলা ও কাঁসি প্রভৃতি দ্বারা 'ঐক্যতান বাদনে'র সৃষ্টি করিলেন, এবং তাহার শব্দে হোষ্টেলের ছাত্রগণ উৎকণ্ঠিত হইয়া অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়ের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, 'আবার সেই স্যাল্ভেসন্ আর্মি'র শব্দ!'

চট্টোপাধ্যায়। আমি শীঘ্র রিপোর্ট করিব।

রিপোর্ট করার ফল কত দূর দাঁড়াইবে, তাহাতে সন্দিহান হইয়া কয়েক জন ছাত্র একত্র হইয়া পরামর্শ করিল যে যথার্থ ব্যাপারটা কি, তাহা দেখিয়া আসিবে, এবং সেই অভিপ্রায়ে দল বাঁধিয়া অন্ধকারে ট্রেনিং স্কুলের রন্ধনশালার পশ্চাৎ হইতে ড্রেস-রিহার্সেল-রুমের এক পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল।

তখন 'ঐক্যতান বাদন' চলিতেছিল, এবং গুরুগণ পুলিসবেশে এক লাইনে দাঁড়াইয়া 'রাইট্ লেফ্ট্' প্রভৃতি প্রণালীর অনুসরণ করিতেছিলেন।

আগন্তুক ছাত্রগণ নির্ব্বাক হইয়া দেখিতেছিল। প্রথমে তাহারা অন্ধকারে কিছুই বুঝিতে পারে নাই। কিন্তু যখন রমানাথ বাবুর বিখ্যাত দেহের খানিকটা অংশ দীপালোকে উদ্দীপ্ত হইয়া তাহাদিগের নয়নগোচর হইল, তখন রঘুনাথ উচ্চৈঃস্বরে বলিল, 'এন্‌কোর্!'

রমানাথ। কে রে?

এক জন গুরু। চোর।

রমানাথ। চীৎকার করিও না। 'বী-মার্চে চল'। রাইট্ লেফ্ট্, রাইট্ লেফ্ট্।

ছাত্রমণ্ডলী এক-লম্ফে পগার পার হইয়া বিস্তীর্ণ মাঠের মধ্যে চলিয়া গেল।

৪

অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় সমাজতত্ত্ববিদ্। তিনি মনে করিতেন, সমাজ বৃক্ষের মত। বহু শাখা প্রশাখা হইলেও একটি। এবং সেই শাখা প্রশাখার মধ্যে নানাবিধ পশুপক্ষীর বাস। কেহ কেহ স্থায়িভাবে সমাজবৃক্ষে ঘর বাঁধে, যেমন কাঠবিড়ালী। কেহ কেহ অল্পদিনের জন্য বৃক্ষের ফল আহরণ করিয়া চলিয়া যায়, যেমন শাখামৃগ। তাহাদিগের মধ্যে দলপতি কে, তাহার নির্ণয় হওয়া অসম্ভব। তবে এটা ঠিক যে, মানুষ সমাজ বাঁধে না, সমাজ মানুষকে বাঁধে। পশু দলবদ্ধ হয় না। 'দলের' ভাব পশুদিগকে একত্র করে।

তাঁহার মতে, নারীর সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়াই পুরুষ বিবাহ করে, এবং বিবাহ করিলে পুত্র কন্যা হয় বলিয়াই লোকে অস্থির হইয়া পড়ে, এবং চাকুরী আছে বলিয়াই লোকে চাকুরীর চেষ্টা করে।

তবে সমাজটা কি? আমি তুমি ইচ্ছা করিলে কল্পনায় একটা সমাজ গঠন করিতে পারি, কিন্তু সেটা বেশী দিনের জন্য নয়।

যদি সমাজ এক দিকে দৌড়ায়, আমি তুমি রুদ্ধ করিতে পারি না। সমাজ যাহা চাহিবে, তাহার সৃষ্টি পূর্ব্বে না হইলে, সমাজ নিশ্চলভাবে থাকিবে। চৌর্য্য-বস্তুর সৃষ্টি পূর্ব্বে না হইলে চোর চুরী করিত না।

অতএব, সৃষ্ট পদার্থের উপর তাঁহার বিশেষরূপ অনাস্থা ছিল। কেবল একটা জিনিস তিনি পছন্দ করিতেন—তাহা 'পকেট্-ওয়াচ্'। সেই ঘড়িটী তিনি সর্ব্বদা যত্নপূর্ব্বক দেওয়ালে ঝুলাইয়া রাখিতেন, এবং মধ্যে মধ্যে ঠিক চলে

কি না, তাহা পরীক্ষা করিতেন। সেদিন সন্ধ্যাকালে তিনি সেই ঘড়িটী যথা-স্থানে রাখিয়া বহির্ভাগে পাইচারী করিতেছিলেন।

গুরুগণ রঘুনাথের পশ্চাতে ধাবমান হইয়া তাহার কোনও সন্ধান পাইলেন না। মাঠের এক জন কৃষককে জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল, 'উহাদের মধ্যে প্রধান ছোকরা রঘুনাথ, সে কলেজের ছাত্র। ট্রেনিং স্কুলের পুষ্করিণীর মাছ ধরিয়া খায়। তাহারা হোষ্টেলে চলিয়া গিয়াছে।'

ইহাতে দলপতি রমানাথের ধারণা হইল যে, রঘুনাথই চুরী করিতে আসিয়াছিল, এবং সেই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি গুরুগণকে আজ্ঞা করিলেন, 'হোষ্টেলে মার্চ করিয়া চোর ধর।'

মনোবিজ্ঞানের একটি গূঢ়তত্ত্ব এই যে, কোনও ধারণা দৃঢ় হইলে হস্ত পদও তাহার বশবর্ত্তী হইয়া চলিতে থাকে। যেমন ভয় পাইলে লোকে দৌড়িয়া পলায়। বীরভাব মনে উদিত হইলে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্বতঃই বীরভাবে সঞ্চালিত হয়। ইহার বিরুদ্ধমত ইহাই যে, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বীরভাবে সঞ্চালিত হইলে, মনে বীরভাব উদিত হয়। যাহারা দৌড়িয়া পলায়, তাহারা সেই গতিশক্তির বলেই ভীত হয়। আমরা কোনও মত আপাততঃ গ্রহণ করিব না। হয় ত চোরকে গ্রেপ্তার করিবার সঙ্কল্প মনে উদিত হইয়াছিল বলিয়াই, কিংবা 'বী মার্চে'র গতি ড্রেস-রিহার্সেল দ্বারা পরিপক্ক হইয়াছিল বলিয়াই, গুরুগণ গুণ্ গুণ্ শব্দে অন্ধকার ভেদ করিয়া হোষ্টেলের পশ্চাৎভাগে উপনীত হইলেন।

সেই সময় একটা লোক প্রোফেসার চট্টোপাধ্যায়ের শয়নগৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া আমবাগানের মধ্যে লুক্কায়িতভাবে যাইতেছিল। গুরু রমানাথ সদলে তাহাকে চক্ষের নিমিষে ঘিরিয়া ফেলিলেন। লোকটা যোড়করে ক্ষমা প্রার্থনা করিল।

রমানাথ। তোর নাম কি?

চোর। গোবর্দ্ধন।

রমানাথ। মিথ্যা কথা! তোর নাম রঘুনাথ।

চোর। (সভয়ে) হুজুর যদি বলেন, তবে তাই। আমার কেহই নাই। দুর্ভিক্ষের পীড়নে চুরী করেছি। ঘড়ীটি আপনি ফিরিয়া লউন।

রমানাথ। সব মিথ্যা কথা! তুই 'এন্‌কোর্' বলেছিলি কেন?

চোর কোনও উত্তর প্রদান না করাতে রমানাথ হুকুম দিলেন, 'ইহাকে [illegible] চল।'

তখন কন্‌ষ্টেবল-ড্রেসধারী গুরুগণ চোরকে ব্যাগে পুরিয়া কলেজে লইয়া গেলেন।

৫

কলেজের বারান্দায় চোর ব্যাগের মধ্যে আনীত হইলে একটা হুলস্থুল ব্যাপার ঘটিয়া উঠিল। গুরু রমানাথ এবং তদীয় দলকে কলেজের ছাত্রগণ পুলিস বলিয়াই মনে করিয়াছিল, এবং পুলিসের আবির্ভাবে তাহারা ব্যস্ত হইয়া পড়িল। প্রফেসার চট্টোপাধ্যায় সম্মুখীন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ব্যাপারখানা কি ?'

রমানাথ। আপনার এক জন ছাত্রের চুরী অভ্যাস আছে। সেই গুরু ট্রেনিং স্কুলে চুরী করিতে গিয়াছিল, এবং সেখানে সুযোগ না পাইয়া এই হোষ্টেলেই একটা ঘড়ী চুরী করিয়াছে।

চট্টোপাধ্যায়। অসম্ভব। তাহার নাম কি ?

রমানাথ। রঘুনাথ।

চট্টোপাধ্যায়। আরও অসম্ভব। আমি ইহা শপথ করিয়া বলিতে পারি। চোর কোথায় ?

রমানাথ। ঐ ব্যাগের মধ্যে।

হঠাৎ ব্যাগ খুলিলে যদি রঘুনাথ বাহির হইয়া পড়ে, তবে অত্যন্ত লজ্জাকর ব্যাপার হইয়া পড়িবে, ইহা মনে করিয়া ছাত্রবৃন্দ ব্যাগ খুলিতে রাজি ছিল না; কিন্তু চোর ব্যাগের অভ্যন্তর হইতেই বলিল, 'আমি রঘুনাথ নহি কর্ত্তা, আমি গোবর্দ্ধন—দাগী চোর—আমার বায়ুরোধ হইয়া প্রাণবায়ু বাহির হয় যে, ব্যাগের মুখ খুলিয়া দিতে আজ্ঞা হয়।'

এমন সময় রঘুনাথ স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং ছাত্রগণের মুখ পরিষ্কার হইয়া গেল। তাহারা উৎসাহিত হইয়া বলিল, 'চোরকে বাহির কর'—

চোর বাস্তবিকই গোবর্দ্ধন ! দাগী চোর। অনাহার-প্রপীড়িত মুখমণ্ডল। তাহার বিনীত ভাব দেখিয়া সকলেরই মনে করুণার উদ্রেক হইল।

রমানাথ। তুমি চুরী করিলে কেন ?

গোবর্দ্ধন। অন্য কোনও কর্ম্ম না থাকাতে চুরী করিয়াছি। নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া থাকা অসম্ভব।

চট্টোপাধ্যায়। (ঘড়ী নিরীক্ষণ করতঃ) এটা আমারই ঘড়ী দেখছি ! তোমার ঘরে ঢুকিবার প্রবৃত্তি হইল কেন ?

গোবর্দ্ধন। কর্ম্ম যত অসাধ্য হয়, ততই তাহাতে প্রবৃত্তি জন্মে।

চট্টোপাধ্যায়। বি, এ ক্লাসের কোনও দর্শনশাস্ত্রের ছাত্র থাক, তবে নোট-বুকে টুকিয়া লও। এটা Comparitive Psychologyর একটা সমস্যা।

বিপিন নামক ছাত্র টুকিতে লাগিল।

রমানাথ। কিন্তু তুমি পরের দ্রব্য বলিয়া এটা জানিতে?

গোবর্দ্ধন। নিশ্চয়।

চট্টোপাধ্যায়। দণ্ড হইবে, তাহাও জান?

গোবর্দ্ধন। তাহাও জানি। কোনও কর্ম্ম করিলেই সংসারে তাহার দণ্ড আছে। সাধু কর্ম্ম করিলে অসাধু লোকে তাহাকে দণ্ডিত করে। অসাধু কর্ম্ম করিলে সাধু লোকে তাহাকে দণ্ডিত করে। সুতরাং সাধু ও অসাধু কর্ম্মের কোনও প্রভেদ নাই।

রমানাথ। তোমার ধর্ম্মজ্ঞান আছে ত?

গোবর্দ্ধন। তা আছে বৈ কি? তবে আত্মরক্ষাই প্রধান ধর্ম্ম, এবং চুরী আত্মরক্ষার একটা প্রশস্ত উপায়।

চোরের এই উক্তির সমর্থন করিতে গিয়া চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন যে, সৃষ্ট পদার্থ না হইলে লোক চুরী করিত না, সুতরাং যখন পদার্থের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার সঙ্গে চুরীরও সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু গুরু রমানাথ বলিলেন যে, চুরীর ভাব ও অধর্ম্মের ভাব আসে কেন? একই পদার্থের জন্য ভাবের মধ্যে দ্বন্দ্ব কেন?

অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় কি ভাবিতেছিলেন, তাহাতে তাঁহার নয়ন অশ্রুসিক্ত হইল। তাহাতে রমানাথের চক্ষুও জলে ভরিয়া গেল। রমানাথ বলিল, 'চোরকে ছাড়িয়া দাও।'

এই অপূর্ব্ব বদান্যতা প্রকাশ করাতে চট্টোপাধ্যায় ও রমানাথের মধ্যে, এবং কলেজ এবং ট্রেনিং স্কুলের ছাত্রদিগের মধ্যে সখ্য সঞ্চারিত হইয়াছিল, এবং ড্রেস-রিহার্সেলের ইতিহাস পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিদিত হইয়া পুলিস ও কলেজের কর্তৃপক্ষগণ গুরুগণকে যথাবিধি ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছিলেন।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

চৌকিদার।

১

তারাচাঁদ মালিকের ছেলে গোরাচাঁদ মালিক চার টাকা মাহিনার চৌকিদারী পদ পাইয়া যে দিন মাথায় নীল পাগড়ী, কোমরে বেঙ্গল পুলিসের তকমা বাঁধিয়া লাঠী ঘাড়ে বাহির হইল, সে দিন পাড়ার মেয়ে পুরুষ গোরার মায়ের সুখসৌভাগ্যের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিল না। আহা, গোরার মা তিন বছরের এই ছেলেটীকে লইয়া বিধবা হইয়াছিল। তার পর সে কত কষ্টে, কত দুঃখে যে ছেলেটীকে মানুষ করিয়াছে, তাহা জানিতে কাহারও বাকী নাই। আজ সেই ছেলে চাকরী পাইয়াছে; যেমন তেমন চাকরী নয়, সরকারী চাকরী, পুলিসের কাজ। কত বড় পদ, কত মান! উহার একটা ডাকে দেশের ছোট বড় সকল লোককে তটস্থ হইতে হইবে। আহা, গোরার মার কি কপাল!

কিন্তু গোরার মার এই শুভাদৃষ্ট সকলেরই যে আনন্দদায়ক হইল,তাহা নহে; পাড়ার আর যাহারা এই সম্মানিত পদের প্রার্থী হইয়াছিল, তাহারা হতাশ হইয়া গোরার উপর ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া উঠিল, এবং চৌকিদারী কাজের মত নিকৃষ্ট কাজ যে আর নাই, ইহাই প্রকাশ করিয়া আপনাদের অকৃতকার্য্যতাজনিত মনস্তাপ দূরীভূত করিবার প্রয়াস পাইল।

তাহারা এইরূপে আপনাদের মনঃক্ষোভ কথঞ্চিৎ নিবারণ করিলেও এক জন কিন্তু কিছুতেই আপনার অকৃতকার্য্যতা-জন্য ক্ষোভ দূর করিতে পারিলেন না। তিনি গ্রামের গণ্য মান্য ব্যক্তি তারকনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। কি অর্থে, কি জ্ঞানে, কি মানে, চাটুয্যে মহাশয়ের সমকক্ষ গ্রামে আর কেহ ছিল না। বল্লাল সেনের প্রদত্ত কুলগৌরব বহু পুরুষ পূর্ব্বে হারাইয়া গেলেও তিনি আপনাকে কুলীন বলিয়া গর্ব্ব প্রকাশ করিতে ছাড়িতেন না। হাতে পয়সাও কিছু ছিল; রাত দুপুরে হাত পাতিলে তিনি দুই এক শত টাকা গুণিয়া দিতে পারিতেন। তাহা ছাড়া মামলা মোকদ্দমায় পরামর্শ দেওয়া, ঘরোয়া বিবাদের নিষ্পত্তি করা, শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াকর্ম্মে কর্ত্তৃত্ব করা তাঁহার নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্যের মধ্যে পরিগণিত ছিল। তাঁহার দীর্ঘ শিখা, ঊর্দ্ধ ত্রিপুণ্ড্র, কণ্ঠালম্বিত রুদ্রাক্ষের মালা, মুখে অবিরাম তারা ব্রহ্মময়ী ধ্বনিতে লোকের চিত্ত আপনা হইতেই ভক্তিভরে নত হইয়া পড়িত।

এ হেন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় স্বীয় ভৃত্য নফরের পিতা গোবর্দ্ধন সর্দ্দারকে আশা দিয়া রাখিয়াছিলেন যে, পূব-পাড়ার চৌকিদারী পদটা তাহাকেই প্রদান করিবেন। গোবর্দ্ধনও জানিত যে, চাটুয্যে মশায় চেষ্টা করিলে চৌকিদারী কেন, দারোগাগিরি পর্য্যন্ত করিয়া দিতে পারেন। এই দৃঢ় বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া সে আজ এক বৎসর স্বীয় পুত্রকে কেবল পেটভাতায় চাটুয্যে মশায়ের ঘরে রাখিয়া দিয়াছিল, এবং চৌকিদারীটা পাইলে এই এক বৎসরের বেতনের দশ গুণ যে পোষাইয়া যাইবে, ইহাও হিসাব করিয়া রাখিয়াছিল।

তাহার লোকসান নিশ্চয়ই পোষাইয়া যাইত, যদি থানার বড় দারোগা প্রবীণ যজ্ঞেশ্বর দত্ত হঠাৎ বদলী হইয়া না যাইত, এবং তাহার স্থলে এক বি. এ. পাশ নবীন ছোকরা আসিয়া না বসিত। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই নবীন ছোকরার সহিত আলাপ করিবার জন্য দুই চারিবার থানায় যাতায়াত করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার যাতায়াতই সার হইল; তাঁহার শিখা, ত্রিপুণ্ড্র, রুদ্রাক্ষমালা, কিছুই কার্য্যকর হইল না। নূতন দারোগার কৃপায় গোরাচাঁদই চাকরী পাইল।

গোবর্দ্ধন আসিয়া বলিল, 'বাবাঠাকুর, রমেশ মিত্তির নফরাকে বছরে দশ গণ্ডা টাকা মাইনে দিতে চাইচে, আপনি কি বল?'

চাটুয্যে মশায়ের বলিবার আর কিছু ছিল না; সুতরাং নফরের আশা ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে দ্বিতীয় চাকরের অনুসন্ধান করিতে হইল, এবং আপনার এই ক্ষতির জন্য গোরাচাঁদকেই দায়ী করিয়া তাহার উপর প্রতিশোধ-গ্রহণের অবসর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেটা তাঁহার মনের ভিতরেই চাপা রহিল।

গোরা যে দিন প্রথম চৌকিদারীর চাপরাস আঁটিয়া লাঠী ঘাড়ে থানায় হাজিরা দিতে চলিল, সে দিন চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া চাটুয্যে মহাশয় ডাকিয়া বলিলেন, 'কি হে গোরাচাঁদ, থানায় চলেছ?'

গোরাচাঁদ হাত জড় করিয়া সবিনয়ে বলিল, 'এজ্ঞে খুড়োঠাকুর।'

গম্ভীরভাবে মস্তক সঞ্চালন করিতে করিতে চাটুয্যে মশায় বলিলেন, 'বেশ, বেশ। আমাদের এ দিকটায় একটু নজর রেখ হে।'

গোরাচাঁদ বলিল, 'তা রাখবো বৈ কি খুড়োঠাকুর, আমি তো আপনকারদের গোলাম।'

সহাস্যে চাটুয্যে মহাশয় বলিলেন, 'দারোগা বাবুর তোমার উপর খুব নেকনজর আছে, না?'

গোরাচাঁদ একটু হাসিয়া উত্তর করিল, 'আপনকার চরণের আশীর্ব্বাদে তা একটু আছে খুড়ো ঠাকুর।'

চাটুয্যে মহাশয় গম্ভীরভাবে বলিলেন, 'তবে আর তোমাকে পায় কে? কিন্তু বেশ সাবধানে কাজ কর্ম্ম করবে। পুলিসের চাকরী, বুঝলে কি না। কত হাঙ্গাম ফ্যাসাদ আছে। বদনা বেটা ঐ ভয়েই তো পেছিয়ে গেল।'

বদন যে স্বেচ্ছায় পশ্চাৎপদ হয় নাই, ইহা জানিলেও গোরাচাঁদ সে কথার উল্লেখ না করিয়া একটু গর্ব্বিতভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, 'তা বৈ কি খুড়ো ঠাকুর, এ সব কি যার তার কাজ।'

বলিয়া সে আর একটা প্রণাম ঠুকিয়া থানার অভিমুখে প্রস্থান করিল। তাহার দিকে ক্রূর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া চাটুয্যে মহাশয় মনে মনে বলিলেন, 'রহ বেটা, তুমি কত বড় বীর, তা বুঝে নেব।'

২

গোরা প্রথম মাসের মাহিনা পাইলে গোরার মা ষোল আনা ভাঙ্গিয়া ঠাকুর দেবতার পূজা দিল, এবং পাঁঠা কাটিয়া পাড়ার জ্ঞাতিকুটুম্বদিগকে খাওয়াইয়া দিল। তার পর গোরার মাথায় এক গণ্ডূষ জল দিবার জন্য চেষ্টিত হইল। বেশী চেষ্টা করিতে হইল না। গ্রামেই বদন সর্দ্দারের একটি মেয়ে ছিল। মেয়েটী বড়, দেখিলেও মন্দ নয়। এই মেয়েটীকে বৌ করিবার জন্য অনেক আগে হইতেই গোরার মার আশা ছিল। কিন্তু তখন সে আশা পূর্ণ করিবার উপায় ছিল না, কাজেই বুড়ী মনের আশা মনেই চাপিয়া রাখিয়াছিল। এখন সুযোগ বুঝিয়া সে এক দিন বদনের স্ত্রীর কাছে কথাটা পাড়িল। স্ত্রীর কাছে শুনিয়া বদন সানন্দে এই প্রস্তাবে সম্মতি দান করিল। এখন গোরা মালিক যে-সে লোক নয়, সরকারের চাকর, পুলিসের লোক!

কথাবার্ত্তা পাকা হইয়া গেলে গোরার মা আট ভরিতে আট গাছা রূপার চুড়ী গড়াইতে দিল; পাঁচ গাঁয়ের কুটুম্ব নিমন্ত্রণ করিল, এবং এক দল ঢোল সানায়ের বাজনা করিবে কি না, তাহার পরামর্শ করিতে লাগিল। গোরা বলিল, 'বাজনায় কাজ নাই। আমার বাপ দাদারা কখনও বাজনা বাজিয়ে বিয়ে করে নি।'

গোরার মা রাগিয়া বলিল, 'তোর কোন্ বাপ দাদা সরকারের চাকরী ক'রেছে রে?'

গোরা বলিল, 'চাকরী করলেই কি বাজনা বাজিয়ে বিয়ে করতে হয়?'

মা বলিল, 'হাঁ হয়। না হ'লেও আমার সাধ হ'য়েছে, আমি ক'রবো। কত দুঃখে তোকে মানুষ করেছি, তা তুই জানিস্ ?'

মাতার এই ইচ্ছার উপরে গোরা আর কিছু বলিতে পারিল না। সে হৃষ্টচিত্তে বিবাহের উদ্যোগে প্রবৃত্ত হইল।

সে দিন গোরাচাঁদ সকালে উঠিয়াই ঘোষপুরে কুটুম্ব-নিমন্ত্রণে যাইবার উদ্যোগ করিতেছিল, এমন সময় খবর পাইল, ছোট দারোগা গ্রামে আসিয়াছেন। গোরাচাঁদ নিমন্ত্রণ ফেলিয়া তাড়াতাড়ি লাঠী পাগড়ী লইয়া দারোগা বাবুর নিকট উপস্থিত হইল। কিন্তু দারোগা বাবু এমন ভাবে তাহার অভ্যর্থনা করিলেন,যাহাতে গোরা হতবুদ্ধি না হইয়া থাকিতে পারিল না। গ্রামের লোকের সমক্ষে দারোগা বাবু তাহার উপর এমন সকল কটূক্তি প্রয়োগ করিলেন, যাহার প্রত্যুক্তি করিতে বাগ্দীর ছেলে গোরাচাঁদও লজ্জা বোধ করিল। গোরা লজ্জায় অপমানে যেন মাটীর সঙ্গে মিশিয়া গেল।

পরিশেষে গোরাচাঁদ দারোগা বাবুর ক্রোধের কারণ অবগত হইল। চাটুয্যে মহাশয়ের প্রজা চিন্তামণি মাইতি থানায় গিয়া এজাহার দিয়াছে, পরশু রাত্রে তাহার খড়ের গাদা হইতে তিন পণ খড় চুরী গিয়াছে। চিন্তামণি চোর ধরাইয়া দিয়াছিল, কিন্তু চৌকিদার ঘুষ খাইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছে। এই অভিযোগের তদন্তের জন্যই ছোট দারোগা উপস্থিত হইয়াছেন।

তদন্তে খড়-চুরী প্রমাণিত হইল, কিন্তু গোরা যে ঘুষ লইয়া চোরকে ছাড়িয়া দিয়াছে, ইহার প্রমাণ কেহই দিতে পারিল না। অগত্যা দারোগা বাবু গোরাকে আর কতকগুলো গালাগালি দিয়াই ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলেন। এই ঘটনায় গোরাচাঁদের যাহা খরচ হইল, তাহা তাহার এক মাসের বেতনের অধিক।

গোরা নীরবে এই ক্ষতি সহ্য করিলেও গোরার মা চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। যে তাহার নিরীহ ছেলের এমন অনিষ্ট করিয়াছে, গলা ছাড়িয়া তাহাকে অভিসম্পাত দিতে লাগিল। গোরা বহুকষ্টে মাতাকে শান্ত করিয়া কুটুম্ব নিমন্ত্রণ করিতে চলিল।

কিন্তু নিমন্ত্রণই সার হইল। বিবাহের তিন চারি দিন পূর্ব্বে বদন আসিয়া জানাইল যে, সে গোরার হাতে মেয়ে দিতে পারিবে না; দিলে তাহাকে বাসত্যাগ করিতে হইবে। চাটুয্যে মশায়ের জমীর উপর ঘর বাঁধিয়া সে বাস করিতেছে; গোরাকে মেয়ে দিলে চাটুয্যে মশায় তাহাকে ঘর ভাঙ্গিয়া তাড়া-

ইয়া দিবেন। তা ছাড়া তাঁহার কাছে সাড়ে পাঁচ গণ্ডা টাকা দেনা আছে; সেটাও কড়ায় গণ্ডায় আদায় না করিয়া ছাড়িবেন না।

সর্ব্বনাশ! বিবাহের সব ঠিক, কুটুম্ব-নিমন্ত্রণ পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে। এমন সময় বদন যে এরূপে পিছাইয়া দাঁড়াইবে, ইহা কে জানিত? গোরার মা গিয়া চাটুয্যে মহাশয়ের পায়ে আছাড় খাইয়া পড়িল, এবং অনেক অনুনয়, বিনয়, কাঁদা কাটা করিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার চেষ্টা করিল। চাটুয্যে মশায় কিন্তু কিছুতেই টলিলেন না। তিনি বেশ স্পষ্টভাবে জানাইয়া দিলেন যে, তাহার ছেলে যখন ঘোড়া ডিঙ্গাইয়া ঘাস খাইতে পারিয়াছে, এবং বাগ্দীর ছেলে হইয়া দশ জনের কাছে ব্রাহ্মণের মাথা হেঁট করিয়া দিয়াছে, তখন দায়ে পড়িয়া তাঁহাকে অনুরোধ করিতে আসা বৃথা। ঘোর কলি হইলেও এখনও বামুনে বাগ্দীতে অনেক তফাৎ আছে। ছোট লোকের স্পর্দ্ধা যদি এরূপে বাড়িতে দেওয়া যায়, তবে কালে ভদ্রলোককে দেশে বাস করিতে হইবে না। কিন্তু ভগবানের ন্যায়বিচার আছে। তাঁহার বিচারে মানীর মান চিরকাল অটুট থাকিবে, এবং যে হতভাগ্য সে সম্মান নষ্ট করিতে যাইবে, তাহাকে পদে পদে বিপন্ন হইতে হইবে।

প্রসন্নতার পরিবর্ত্তে ব্রাহ্মণের অভিসম্পাত লইয়া গোরার মা কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিয়া গেল। গোরা নিজে কুটুম্ব নিমন্ত্রণ করিয়া আসিয়াছিল, নিজেই গিয়া বারণ করিয়া আসিল। গোরার মা লজ্জায় কয় দিন ঘরের বাহির হইল না।

গোরা তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল, 'কেন বল্ তো মা, তুই এতটা বাড়া-বাড়ি করিস্? বিয়ে হ'লো না—তাতে হয়েছে কি?'

মা বলিল, 'আমার মাথা যে কাটা গেল রে গোরা। তোদের কর্ত্তা ঐ বদন সর্দ্দারকে জাতে তুলেছিল, আজ কি না সে তোকে মেয়ে দিলে না!'

গোরা বলিল, 'সে দিলে না ঐ বামুনের ভয়ে।'

মা বলিল, 'তুই যদি বামুনকে জব্দ করতে পারিস্ গোরা, তবেই আমার মনের দুখ্যু যাবে, তোকে পেটে ধরা সাথক হবে।'

গোরা একটু হাসিয়া বলিল, 'বামুনকে জব্দ কত্তে কতক্ষণ লাগে মা? তবে বামুন, ঐ যা ভয়।'

মা রাগিয়া বলিল, 'রেখে দে তোর বামুন। মিনি দোষে বামুন আমার মুখের উপর তোকে কটু কটু ক'রে শাপ মন্যিগুলো দিতে লাগলেন। আমার এমন ইচ্ছা হ'লো গোরা—'

গোরা হাসিয়া বলিল, 'তুই বেটী যেন পাগল! আমি দোষে থাকি, আমাকে শাপ মন্যি লাগবে, নয় তো আমার ভয় কি ?'

মা বলিল, 'তবু তো ওগুলো শুনতে মন্দ।'

৩

চাটুয্যে মহাশয়ের একটা গুপ্ত ব্যবসায় ছিল; তিনি সময়ে সময়ে গোপনে চোরাই মাল খরিদ করিতেন। কাজটা গুপ্ত হইলেও খুব গোপনেই যে চলিত, তাহা নহে; গ্রামের অনেকেই তাঁহার এই গুপ্ত ব্যবসায়ের রহস্য অবগত ছিল। কিন্তু জানিলেও কেহ কখনও ইহা লইয়া গোলযোগ বাধায় নাই; ব্রাহ্মণকে বিপন্ন করিতে অনেকের সাহসে কুলাইত না। তা ছাড়া পূর্ব্বতন দারোগা যজ্ঞেশ্বর দত্ত চাটুয্যে মহাশয়ের মন্ত্রশিষ্য ছিল। সুতরাং এ সম্বন্ধে কেহ কোনও উচ্চবাচ্য করিত না।

তার পর পুরাতন দারোগা বদলী হইয়া গেলে এবং তাহার স্থলে নূতন দারোগা আসিয়া বসিলে চাটুয্যে মহাশয় যখন কিছুতেই তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠতা করিতে পারিলেন না, তখন তিনি খুব সাবধানেই ব্যবসায় চালাইতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার সাবধানতা সম্পূর্ণ নিষ্ফল হইল। হঠাৎ এক দিন দল বল সহিত পুলিস আসিয়া তাঁহার বাড়ী ঘেরাও করিল। চাটুয্যে মহাশয় প্রমাদ গণিলেন। আগের দিন দুই চারিখানা সোনার গহনা খরিদ করিয়াছিলেন; সেগুলাকে সরাইবার অবসর পাইলেন না। গহনাগুলা বাড়ী হইতে বাহির হইলে আর রক্ষা নাই। তারা, এ কি করিলে মা! উঃ, কোন্ পাষণ্ড বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের এই সর্ব্বনাশ করিল ? ইহা নিশ্চয়ই গোরা বেটার কাজ। ব্রাহ্মণকে এইরূপ বিপন্ন করার পাপে ভগবান্ কি তাহার মাথায় বজ্রাঘাত করিবেন না!

কিন্তু আপাততঃ আকাশের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে গোরাচাঁদের মাথায় বাজ পড়িবার কোনও সম্ভাবনা দেখা যাইতেছিল না; সুতরাং সম্প্রতি নিজের মাথায় যে বাজটা পড়িবার উপক্রম হইয়াছে, তাহারই প্রতীকারের উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। গহনা কয়খানা কোনরূপে বাড়ীর বাহির করিতে পারিলে হয়; তার পর পুকুরের জলে ফেলিয়া দিলেই নিশ্চিন্ত। কিন্তু সদর খিড়কী দুই দরজাতেই লালপাগড়ীর পাহারা। রান্নাঘরের পাশে পশ্চিম দিকের ছোট প্রাচীরটা খুব নীচু ছিল। 'যা করেন মা দুর্গা' বলিয়া চাটুয্যে মহাশয় গহনাগুলা নেকড়ায় বাঁধিয়া লইলেন, এবং প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া বাহিরে পড়িলেন।

'খুড়ো ঠাকুর !' কি সর্ব্বনাশ, এখানেও যে পাহারা! পাহারায় যে-সে লোক নাই, স্বয়ং গোরাচাঁদ লম্বা লাঠী ঘাড়ে দণ্ডায়মান। একটা হিন্দুস্থানী মিন্দুস্থানী থাকিলেও যাহা হয় দেখা যাইত, দুই একটা টাকা হাতে গুঁজিয়া দিলে ছাড়িতে পারিত, কিন্তু গোরা বেটা দশটা টাকা পাইলেও ছাড়িবে না। সে শুধু চাকরীর খাতিরে আসে নাই, প্রতিহিংসা লইতে আসিয়াছে। চাটুয্যে মহাশয় থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন।

গোরা অগ্রসর হইয়া মৃদুগম্ভীরকণ্ঠে বলিল, 'পাঁচীল টপ্‌কে কোথায় যাচ্ছো খুড়ো ঠাকুর ?'

চাটুয্যে মহাশয় নিরুত্তরে শুষ্কমুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। গোরা আর একটু কাছে সরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'বামাল সরাবার চেষ্টায় আছ বোধ হয় ?'

চাটুয্যে মহাশয় তাহার হাত দুইটা জড়াইয়া ধরিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, 'আমার মান ইজ্জত আজ সব তোর হাতে গোরা। তুই আমাকে রাখ্‌তে হয় রাখ, মারতে হয় মার্।'

কয়েক বিন্দু অশ্রু টপ্ টপ্ করিয়া গোরার হাতের উপর পড়িল। গোরা মুখখানাকে বিকৃত করিয়া হাত ছাড়াইয়া লইল। চাটুয্যে মহাশয় তাহার মুখের উপর সকাতর দৃষ্টি স্থাপন করিয়া অশ্রুগদগদকণ্ঠে ডাকিলেন, 'বাবা গোরা!'

গোরা একবার তাঁহার অশ্রুকাতর মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিল, তার পর দৃষ্টি ফিরাইয়া হাতের লাঠীটা মাটীতে ঠুকিতে ঠুকিতে বলিল, 'তাই তো খুড়োঠাকুর !'

চাটুয্যে মহাশয় বলিলেন, তাই তো নয় গোরা। আমার উপর তোর রাগ থাকে, তোর হাতে লাঠী আছে—'

ভ্রূভঙ্গী করিয়া গোরা জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমার হাতে ওটা কি ? বামাল বুঝি ?'

বলিয়াই সে চাটুয্যে মহাশয়ের হাত হইতে গহনার পুঁটুলীটা ছিনাইয়া লইল; এবং তাঁহাকে ঠেলিয়া দিয়া বলিল, 'শীগ্‌গির পাঁচীল ডিঙ্গিয়ে বাড়ীর ভিতর যাও।'

চাটুয্যে মহাশয় কম্পিতপদে তাড়াতাড়ি প্রাচীরে উঠিতে গিয়া পড়িয়া গেলেন। গোরা তাঁহাকে শূন্যে তুলিয়া প্রাচীরের উপর উঠাইয়া দিলে তিনি তথা হইতে সহজেই ভিতরে নামিলেন।

গোরা গহনার পুঁটুলীটা হাতে লইয়া ভাবিতে লাগিল। কোথায় এগুলা রাখা যায়? পুলিস বাড়ীর আশে পাশে বন ঝোপ ওলোট পালোট করিয়া দেখিবে; পুকুরে জাল নামাইয়া নীচের পাঁক পর্য্যন্ত তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিবে। যে কোনও জায়গা হইতে বাহির হইলেই বামুনের আর রক্ষা নাই। গোরা চারি দিকে একবার সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া নেকড়া-সমেত গহনাগুলা কোমরে জড়াইল; তার পর তাহার উপরে কাপড়টা ফেরতা দিয়া পরিল, এবং তাহার উপর চাপরাস আঁটিয়া লাঠী হাতে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

পুলিস ঘর বাড়ী আতি পাতি করিয়া খুঁজিল; বাক্স সিন্দুক খুলিয়া ভাঙ্গিয়া অন্বেষণ করিল; বন বাদাড় উলটিয়া পালটাইয়া দেখিল; পুকুরে জাল নামাইল; কিন্তু বামাল মিলিল না! সুতরাং তাহাদিগকে হতাশচিত্তে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইল। তাহারা চলিয়া গেলে চাটুয্যে মহাশয় সমবেত প্রতিবেশীদিগকে বেশ মিষ্ট ভাষায় জানাইয়া দিলেন যে, কলিতে ধার্ম্মিককে এইরূপ নিগ্রহ ভোগ করিতে হয়, ইহা যুগধর্ম্মের ফল। কিন্তু যে পাষণ্ড তাঁহাকে এইরূপে অপমানিত করিল, ব্রহ্মণ্যদেব তাহার বিচার করিবেন।

ধার্ম্মিক চাটুয্যে মহাশয়ের এই অকারণ নিগ্রহে প্রতিবেশীরা দুঃখ প্রকাশ করিতে করিতে প্রস্থান করিল।

৪

দারোগা বাবুকে থানায় পঁহুছাইয়া দিয়া গোরা যখন ফিরিয়া আসিল, তখন রাত্রি হইয়াছে। সে ঘরে আসিয়া কাপড় ছাড়িতে যাইতেই কোমর হইতে গহনার পুঁটুলীটা ঝণাৎ করিয়া পড়িয়া গেল। সে শব্দে চমকিত হইয়া মা জিজ্ঞাসা করিল, 'এ সব কি রে গোরা?'

গোরা বলিল, 'ওগুলো খুড়োঠাকুরের মান ইজ্জৎ।'

বলিয়া সে মায়ের কাছে গহনার বৃত্তান্ত বর্ণন করিল। শুনিয়া মা বলিল, 'তুই আবার বামুনকে বাঁচালি রে গোরা?'

গোরা একটু হাসিয়া উত্তর করিল, 'আমি কি সাধ করে বাঁচিয়েছি মা? বামুনের যে কাতরানি, তা দেখলে তোর বাবাকেও বাঁচা'তে হ'তো।'

মা ভ্রূকুটী করিয়া বলিল, 'ইঃ, আমার বাবা ভৈরব সর্দ্দার অমন কত বামুনের মাথা ফাটিয়েছে।'

'ভারী বীরের কাজ করেছে' বলিয়া গোরা পাগড়ী গুছাইতে ব্যস্ত হইল। মা গহনার পুঁটুলীটা হাতে লইয়া বলিল, 'কিন্তু এ পরের খুন ঘরে আনলি কেন?'

গোরা বলিল, 'আজ রাতটা থাক্, কাল সকালে দিয়ে আসবো।'

গোরার মা একটা কাণা-ভাঙ্গা মাটীর কলসীর ভিতর পুঁটুলীটা তুলিয়া রাখিল।

সকালে ঘুম হইতে উঠিয়া গোরা দেখিল, চাটুয্যে মশায় কাঁধে চাদর ফেলিয়া দ্রুতপদে কোথায় চলিয়াছেন। গোরা তাঁহার সম্মুখীন হইয়া বলিল, 'তোমার জিনিসগুলো নিয়ে যাও খুড়োঠাকুর।'

চাটুয্যে মহাশয় সহাস্যে বলিলেন, 'এখন থাক্ গোরাচাঁদ, সন্ধ্যার পর চুপি চুপি নিয়ে যাব। তোকে কি অবিশ্বাস আছে? কাল তুই আমার যে উপকার করেছিস্ গোরা, তা জীবনে ভুলবো না।'

গোরা কপালে হাত ঠেকাইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল।

চাটুয্যে মহাশয় দুই পদ অগ্রসর হইয়া সহসা ফিরিয়া বলিলেন, 'হ্যাঁ দেখ গোরাচাঁদ, বদন বেটা যাই বলুক, তোমার সঙ্গেই ওর মেয়েটার বিয়ে দিতে হবে। আমি কেষ্টনগরে যাচ্ছি, ফিরে এসে আজই কথাটা পাড়ব।'

গোরা একটু লজ্জার হাসি হাসিল। চাটুয্যে মহাশয় দ্রুতপদে স্বকার্য্যে প্রস্থান করিলেন। গোরা তামাক সাজিয়া আম গাছের তলায় বসিয়া ধীরে ধীরে তামাক টানিতে লাগিল। সকালের ঠাণ্ডা বাতাস ঝির্ ঝির্ করিয়া বহিয়া যাইতেছিল। রাস্তার ও পাশের জঙ্গল হইতে কাঠমল্লিকার মিষ্ট গন্ধ বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছিল। পাশের গাছটায় বসিয়া একটা কোকিল উচ্চ-কণ্ঠে প্রভাত-গগন প্রতিধ্বনিত করিতেছিল। গোরা তামাক টানিতে টানিতে গুণ্ গুণ্ করিয়া গান ধরিল—

'ঘোমটা খোলো, বদন তোলো,
কথা কও বৌ, মাথা খাও।
কাছে এসে মুচ্‌কে হেসে কেনে বল সরে যাও।'

সেই দিন মধ্যাহ্নকালে পুলিস আসিয়া যখন গোরার ভাঙ্গা ঘরখানা ঘিরিয়া ফেলিল, তখন গ্রামসুদ্ধ লোক তামাসা দেখিতে ছুটিয়া আসিল। তার পর গোরার ঘর হইতে ঘোষপুরের হাজরাদের বাড়ীর ডাকাতীর গহনা বাহির হইলে লোকের আর বিস্ময়ের সীমা রহিল না। প্রাচীন তারক ঘোষ তাহা-দের বিস্ময়-অপনোদনার্থ বলিলেন, 'এ তো জানা কথা। চৌকিদারের সঙ্গে যোগ সাজোস না থাকলে কি চুরী ডাকাতী হ'তে পারে?'

গোরার মা কাঁদিয়া মাথা কুটিয়া অনর্থ করিতে লাগিল। গোরা কিন্তু

একটুও কাতরতা প্রকাশ করিল না, বা আপনার নির্দ্দোষতা সম্বন্ধে একটী কথাও বলিল না। শুধু মাকে বুঝাইয়া বলিল, 'কাঁদিস্ কেন মা? মানুষ পরের তরে জান দেয়, আমি না হয় দু' বছর জেল খেটে এলাম। দু' চার বছর জেল খাটলে কি তোর ছেলে মরে যাবে?'

চাটুয্যে মহাশয় বড় দারোগাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'দেখ্লেন শ্যাম বাবু, ও বেটাকে ছেলেবেলা থেকে জানি ব'লেই গোবর্দ্ধনকে চৌকিদার কর্তে চেয়েছিলাম।'

ছোট দারোগা যাদব ঘোষ মাথা নাড়িয়া বলিলেন, 'এই জন্যই বলে—বৃদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্যং।'

পুলিস বামাল সমেত গোরাকে চালান দিল। চাটুয্যে মহাশয় বাড়ী ফিরিতে ফিরিতে সঙ্গীদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'ছোঁড়া পুলিসের কাজ পেয়েছে ব'লে মদগর্ব্বেই মারা গেল। বামুন দেখলে প্রণাম পর্য্যন্ত কর্তো না।'

তারক ঘোষ উত্তর করিলেন, 'পাপের ফল হাতে হাতেই ফলেছে চাটুয্যে মশায়। শাস্ত্রেই আছে—ধর্ম্মের জয়—অধর্ম্মের পর।'

শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

প্রাচীন ভারতের বাণিজ্য-নীতি।

আজ কাল ইউরোপে রাষ্ট্রনীতি লইয়া যে আলোচনা হইতেছে, তাহাতে দুই দলের সৃষ্টি হইয়াছে। এক দল বলিতেছে যে, প্রজাসাধারণের সব বিষয়ে আত্মকর্তৃত্ব থাকা আবশ্যক—সরকার কেবল শান্তিরক্ষা করিবেন, এবং এক জন অপরের অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করিতেছে কি না, দেখিবেন। আর এক দল চাহে যে, সরকার সব কার্য্যই নিজ হস্তে লউন—ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য কেবল অনিষ্টের মূল। ইঁহাদের মতে, জনসাধারণ লইয়াই যখন রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে, তখন রাষ্ট্রের পরিচালকগণ জনসাধারণের ভৃত্যরূপে যাবতীয় আবশ্যক কর্ম্ম সম্পাদন করুন,—তাহা হইলে অনেক বিষয়ে সুবিধা হইবে; যথা,—রেলওয়ে বিভিন্ন কোম্পানীর সম্পত্তি না হইয়া রাষ্ট্রের সম্পত্তি হউক—সরকার ইহাদিগের পরিচালনার ভার লইবেন। এই মতাবলম্বিগণ অনেক বিষয়ে তাঁহাদের স্বাধীন অধিকার ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত আছেন, এবং সর্ব্বসাধারণের হিতের জন্য তাঁহাদের অধিকারে সরকারকে হস্তক্ষেপ করিতে দিতে প্রস্তুত

আছেন—যথা, আমার যে রকম ইচ্ছা বাড়ী তৈয়ারী করিবার যে অধিকার আছে, তাহা ত্যাগ করিয়া সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য সরকার কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতি মতে বাড়ী তৈয়ারী করিব।

অতএব, সরকার সর্ব্ববিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন—রাস্তা ঘাট নির্ম্মাণ ও রক্ষা, বিদ্যা-শিক্ষার ব্যবস্থা, শান্তিরক্ষা, শিল্প-বাণিজ্য-বৃদ্ধির উপায় উদ্ভাবন ও অবলম্বন করিবেন।

বিগত যুদ্ধের পর ইংলণ্ডে এই নীতির চূড়ান্ত হইয়া গিয়াছে—পূর্ব্বের অবাধ বাণিজ্য উঠিয়া গিয়াছে। এখন অধিকাংশ পণ্যকে শুল্ক দিতে হয়; কয়লার খনিগুলি ও সমস্ত রেলওয়ে-লাইনগুলি জাতীয় সম্পত্তি হইবে কি না, আলোচনা চলিতেছে। কিছু কাল খাদ্যদ্রব্য পর্য্যন্ত সরকারী কর্ত্তৃত্বের সীমার মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিল—যে কেহ যে কোনও জিনিস যত ইচ্ছা আহার করিতে পারিতেন না।

বিংশ শতাব্দীর ইংলণ্ডের এই নীতি সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতে অবলম্বিত হইয়াছিল। সেই নীতির ফলে সেই সময় পূর্ব্বখণ্ডে ভারতবর্ষ বাণিজ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল। ভারতীয় পোত বহু দূর দেশ হইতে পণ্য আনয়ন করিত, এবং নানা স্থানে ভারতীয় পণ্য সরবরাহ করিত।

ভারতবর্ষে স্বর্ণভূমি (ব্রহ্মদেশ) হইতে কালেয়ক (এক প্রকার চন্দন কাষ্ঠ), চীন দেশ হইতে চীনপট্ট (বস্ত্রবিশেষ), পারসমুদ্র (সিংহল) হইতে মণি-মুক্তাদি, কার্দ্দম (পারস্য) হইতে হীরক আনীত হইত। মহাশীলক্ত জাতক হইতে জানা যায় যে, পূর্ব্বে তুরস্কের সহিত বাণিজ্য চলিত। সে দেশ হইতে বিলাসদ্রব্যাদি আসিত, যথা,—গন্ধ চতুর্ব্বিধ, কুঙ্কুম, যবন পুষ্প (Franken Scence) তগরক (সুগন্ধ চূর্ণ), এবং তুরস্ক (Turkey)।

সামুদ্রিক বাণিজ্যের জন্য এই চারি প্রকার পোত ব্যবহৃত হইত;—

(১) সংযাত্য নাবঃ—এই বৃহদায়তন পোতগুলিকে পত্তনে আসিবামাত্র শুল্ক দিতে হইত। (২) প্রবহণ; (৩) শঙ্খ-মুক্ত-গ্রাহিণঃ নাবঃ। এইগুলি সাধারণতঃ সিংহলে গিয়া মুক্তা সংগ্রহ করিত। শুক্রাচার্য্য বলেন যে, সিংহলবাসিগণ অতিশয় ধূর্ত্ত, ইহারা সময় সময় নকল মুক্তা বিক্রয় করিয়া প্রবঞ্চনা করিত। (৪) মহানাবঃ—এই নৌকাগুলি প্রশস্ত নদী বা অগভীর সমুদ্রের বিশেষ উপযোগী।

বাণিজ্য ব্যাপারের সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন—পণ্যাধ্যক্ষ। তিনি অনুসন্ধান

দ্বারা নির্ণয় করিতেন যে, কোন দ্রব্য কখন কি পরিমাণে আদৃত হয়, জনসাধারণ কি মূল্যে সেই সকল দ্রব্য ক্রয় করিতে প্রস্তুত আছে। ইহার পর তিনি যে যে স্থানে ঐ দ্রব্য সকল সুলভে প্রচুরপরিমাণে পাওয়া যায়, তাহার সন্ধান লইতেন। এই সন্ধান তিনি বিদেশী বণিকদিগের নিকট হইতে লইতেন, বা এই উদ্দেশ্যে দেশ বিদেশে কর্ম্মচারী প্রেরণ করিতেন। আজ কালও বাণিজ্যবিষয়ক সংবাদ প্রেরণ করিবার নিমিত্ত সব দেশে কর্ম্মচারী (Consul) নিযুক্ত করা হয়।

ইহার পর তিনি বণিকদিগকে পণ্য আনয়ন করিতে বলিতেন। সেই পণ্য বিক্রয়ার্থ বিভিন্ন নগরে প্রেরিত হইত। যাহাতে বণিকগণ অত্যধিক লাভ করিতে না পারে, পণ্যাধ্যক্ষ সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতেন, পট্টনে বিদেশ হইতে পণ্য লইয়া পোত আসিলে, কোনও বণিক সমস্ত পণ্যই সত্যকার (বায়না) করিয়া বিক্রয় করিতে পারিতেন, এবং লভ্যাংশ (Brokerage) পাইতেন। ইহা আধুনিক ব্যবসায়-প্রথার অনুরূপ। (চুল্লশ্রেষ্ঠিজাতক)

বিক্রয়ের সময় সর্ব্বপ্রকার পণ্যের জন্যই বাণিজ্য-শুল্ক দিতে হইত। এই শুল্ক পণ্যের ওজনের সাধারণতঃ বিশ ভাগের এক ভাগের অধিক হইত না। ইহা রাজার প্রাপ্য।

বিদেশ হইতে আনীত পণ্যে অপেক্ষাকৃত অল্প শুল্ক দিতে হইত। ইহা দ্বারা বিদেশী বণিককে উৎসাহিত করা হইত। ইহা ব্যতীত ইহারা আরও অনেক বিষয়ে অনুগ্রহ লাভ করিত—ঋণের জন্য ইহাদিগকে অভিযুক্ত করা যাইত না। ইহাকে ভারত-ইতিহাসে অবাধ বাণিজ্যের সূত্রপাত বলা যাইতে পারে। বর্ত্তমান সময়ে এই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্বাণিজ্য-বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে Preferential Tariff নামক একটী প্রস্তাবের আলোচনা চলিতেছে; যদি এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হয়, তাহা হইলে ভারতীয় পণ্য ক্যানেডায় ক্যানেডিয় পণ্য ভারতে বিনা শুল্কে বা ন্যূন শুল্কে বিক্রীত হইতে পারিবে।

রাজকীয় শিল্পশালা, কৃষিক্ষেত্রজাত দ্রব্য প্রথমে রাজকীয় পণ্যবেশনে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হইত। তথায় পণ্যাধ্যক্ষ ইহার মূল্য নির্দ্ধারিত করিতেন। কিছু কাল পরে এই মূল্য দিয়াও যদি জনসাধারণ ঐ দ্রব্য ক্রয় করিত, তাহা হইলে মূল্য ক্রমশঃই বর্দ্ধিত করা হইত; কারণ, রাজকীয় শিল্পশালা ব্যতীত অপর কোথাও সেই দ্রব্য প্রস্তুত হইত না, সুতরাং জনসাধারণ যে কোনও মূল্যে উহা ক্রয় করিতে বাধ্য। এই নীতি বর্ত্তমান যুগের Law of Monopolyর অনুরূপ।

কোনও পণ্য বিদেশে বিক্রয়ার্থ প্রেরণ করিবার পূর্ব্বে পণ্যাধ্যক্ষ সংবাদ লইতেন যে শুল্ক, বার্ত্তানি, অতিবাহিকা (গমনাগমনের খরচ), তার-দেয় (নদীপারের ব্যয়) ইত্যাদি বাবদ কি ব্যয় হইবে। তাহার পর ঐ ব্যয় বাদ দিয়া প্রেরিত পণ্যের বিনিময়ে যে পণ্য আনা আবশ্যক, তাহাতে কোনও লাভ থাকিবে কি না ? যদি ঐ নির্দ্দিষ্ট দ্রব্য আনয়ন করা লাভজনক বোধ না হইত, তাহা হইলে কি দ্রব্য আনিলে সুবিধা হইবে, তিনি তাহা স্থির করিতেন।

প্রাচীন হিন্দুগণ বুঝিতেন যে, লাভ আন্তরাষ্ট্রিক বাণিজ্যের ভিত্তি। আদান-প্রদানের ফলে যদি কিছু উদ্বৃত্ত না হয়, তাহা হইলে সে বাণিজ্য চলিতে পারে না। যে দেশে যে দ্রব্য অপেক্ষাকৃত সুলভ মূল্যে উৎপাদিত হয়, সেই দেশ সেই দ্রব্য অন্য কোনও দেশে প্রেরণ করিয়া সেই দেশের সুলভ দ্রব্য, (যাহা প্রথম দেশে সুলভে জন্মে না) আনয়ন করা যাইতে পারে। ইহাই বর্ত্তমান যুগের Theory of Comparative Costs.

কোনও দ্রব্যের মূল্যনির্দ্ধারণকালে পূর্ব্বে এই দুইটী বিষয়ে দৃষ্টি রাখা হইত :—(১) সুলভাসুলভ—অর্থাৎ দ্রব্য-উৎপাদনের সুবিধা বা অসুবিধা ; (২) অগুণতাগুণ-সংশ্রয়—দ্রব্যটী কি পরিমাণে আমাদের অভাব নিবারণ করিতে পারে। যদি কোনও দ্রব্য প্রস্তুতকরণ আয়াসসাধ্য হয়, তাহা হইলে তাহার মূল্য অধিক হইবে। যদি কোনও দ্রব্য আমাদের পক্ষে অত্যাবশ্যক হয়—যথা, চাউল, বা বস্ত্র—তাহা হইলে আমরা ইহার জন্য অধিক মূল্য দিতে প্রস্তুত আছি। সুতরাং কোনও বস্তুর মূল্য তাহার নির্ম্মাণে ব্যয়িত পরিশ্রমের পরিমাপক। বিক্রেতা এই পরিশ্রমের পরিমাণ অনুসারে মূল্য স্থির করিবেন। এই মূল্যের কমে তিনি বিক্রয় করিবেন না—ইহাই তাঁহার Cost of production। দ্রব্যটী যে পরিমাণে ক্রেতার অভাব দূর করিতে পারে, তদনুসারে ক্রেতা মূল্য দিতে প্রস্তুত—তাহার অধিক নহে, ইহাই তাহার Margin of Satisfaction। সাধারণতঃ এই দুই সীমার মধ্যে ক্রেতা বিক্রেতার আগ্রহ অনুসারে মূল্য স্থিরীকৃত হয়। ইহাই পাশ্চাত্য অর্থবিজ্ঞানের মূল্য-নিরূপণের নিয়ম। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, প্রাচীন হিন্দুগণও ঠিক এই পদ্ধতিতে দ্রব্যাদির মূল্য নিরূপণ করিতেন।

স্থলপথে যে পণ্যাদি রাজ্যের মধ্যে আসিত, সে সম্বন্ধে রাজবিধি অন্যরূপ ছিল। রাজ্যের মধ্যে আনয়ন করিলেই, অন্তপাল বার্ত্তানি-(পথকর)-স্বরূপ

কিছু আদায় করিতেন। প্রত্যেক পণ্যদ্রব্যের উপর বণিকের নামাঙ্কিত মুদ্রা অঙ্কিত করিতে হইত (অভিজ্ঞান-মুদ্রা)। রাজধানীর প্রান্তে শুল্কাধ্যক্ষ অবস্থান করিতেন। যখন বণিকগণ পণ্যসম্ভার লইয়া তথায় উপস্থিত হইতেন, শুল্কাধ্যক্ষের ভৃত্যগণ বণিকের নাম ধাম ও পণ্যের পরিমাণ জিজ্ঞাসা করিয়া লিপিবদ্ধ করিত, এবং প্রকৃত অভিজ্ঞানমুদ্রা অঙ্কিত আছে কি না, দেখিত। যাহাদের মুদ্রা অঙ্কিত হয় নাই, তাহারা দণ্ডস্বরূপ দ্বিগুণ শুল্ক দিত। এক জন বণিক অপর কোনও বণিকের মুদ্রা নিজের পণ্যদ্রব্যের উপর অঙ্কিত করিতে পারিত না, বা নকল মুদ্রা ব্যবহার করিত না; করিলে ৮ আট গুণ শুল্ক দণ্ড দিতে হইত। এই নিয়ম আধুনিক Trade markর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

তৎপরে পণ্যগুলি ওজন করা হইত। তখন বণিকগণ সেই স্থানে চীৎকার করিয়া তিনবার দ্রব্যের মূল্য ও ওজন জানাইয়া ক্রেতা আহ্বান করিত, এবং উচিত মূল্য পাইলে বিক্রয় করিতে হইত। যদি অত্যধিক মূল্যে বিক্রয় হয়, তাহা হইলে দণ্ডস্বরূপ এই মূল্যের অর্দ্ধাংশ রাজা লইতেন।

কতকগুলি দ্রব্যের জন্য শুল্ক দিতে হইত না; যথা, বিবাহে লব্ধ দ্রব্যাদি, যাগযজ্ঞাদির উপকরণ, গো-দান ইত্যাদি। যদি কেহ কতক দ্রব্য প্রকাশ্যে ও কতক দ্রব্য গোপনে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিত, তাহা হইলে সে দণ্ডিত হইত, এবং সমস্ত দ্রব্যের জন্য তাহাকে শুল্ক দিতে হইত।

সে সময়ে কেহ অবাধে শস্ত্র, বর্ম্ম, রথাদি যুদ্ধের উপকরণ রাজ্যের মধ্যে আনিতে পারিত না। ধরা পড়িলে এই সকল দ্রব্যাদি রাজা গ্রহণ করিতেন, এবং অপরাধী দণ্ডিত হইত। এ বিষয়েও সামরিক উপকরণের আগম সম্বন্ধে যে নিয়ম বর্ত্তমান ভারতে প্রচলিত, তাহার সহিত যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে।

কোনও বণিক যদি তাহার পুরাতন, অবিক্রীত দ্রব্যাদি অল্প মূল্যে বিক্রয় করিতে ইচ্ছা করিত, তাহা হইলে পণ্যাধ্যক্ষ তাহার ওজন পরীক্ষা করিয়া মূল্য স্থির করিয়া দিতেন। প্রবঞ্চিত করিবার চেষ্টা করিলে বণিক দণ্ডার্হ হইত। যদি কোনও বণিক কোনও দ্রব্য নিকৃষ্ট দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত করিয়া (ভেজাল দিয়া) বিক্রয়ের চেষ্টা করিত, তাহা হইলে সে সমুচিত শাস্তি পাইত। যদি কয়েকটী বণিক দলবদ্ধ হইয়া কোনও দ্রব্য অধিকপরিমাণে ক্রয় করিয়া রাখিত, এবং পরে সেই দ্রব্য অত্যধিক মূল্যে বিক্রয় করিত, তাহা হইলে, সেই দ্রব্য রাজকোষে গৃহীত হইত, এবং সেই বণিক দণ্ডিত হইত। আজ কালের এই Pro-

fiteeringর যুগে প্রাচীন হিন্দুদিগের এই ব্যবস্থা কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিতে পারে।

স্থলপথে দস্যুভীতি থাকিলে, বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে রাজা সর্ব্বদাই বণিকদিগকে রক্ষা করিতে প্রস্তুত থাকিতেন।

অপন্নক জাতক হইতে জানা যায় যে, বহুসংখ্যক বণিক একত্রিত হইয়া আবেদন করিলে রাজা ইহাদের রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত প্রহরী (Convoy) প্রেরণ করিতেন। বণিকগণ পথে জলকষ্টনিবারণের জন্য জলপূর্ণ ভাণ্ড লইত। আবশ্যক হইলে পথিমধ্যে স্কন্ধাবারে বিশ্রাম করিত, এবং সশস্ত্র প্রহরিগণ দস্যুভয় নিবারণ করিত। বাণিজ্যার্থ মরুপ্রদেশ অতিক্রম করিতে হইলে, রাজা এক জন স্থলনিয়ামক (Guide) প্রেরণ করিতেন। সে নক্ষত্র দেখিয়া দিক্ নির্ণয় করিত। (বন্ন পথ জাতক)

প্রাচীন বাণিজ্য-বিধির এই বৃত্তান্ত হইতে বেশ বুঝা যায় যে, হিন্দুরা কেবল পারমার্থিক উন্নতি লইয়া ব্যস্ত ছিলেন না, সাংসারিক বিষয়েও তাঁহারা চিন্তাশীল ছিলেন; সে বিষয়েও যে ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, বিংশ শতাব্দীর অর্থবিজ্ঞান ক্ষীণভাবে তাহার প্রতিধ্বনি করিতেছে মাত্র। তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত রাষ্ট্রকর্তৃত্ব-নীতি পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে শতাব্দীর পর শতাব্দী নানা রূপ ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। প্রাচীন Greeceএ Plato ইঁহার নাম Communism দিয়াছিলেন। মধ্যযুগের চিন্তাস্রোতেও ইহার প্রভাব সুস্পষ্ট ছিল—তাহার দৃষ্টান্ত Campanella, More প্রভৃতি। বর্ত্তমান সময়ে ইহা State Interference নামে কীর্ত্তিত হইয়া Bolshevism নীতির মেরুদণ্ডস্বরূপ হইয়াছে।

শ্রীভূপতিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

মোসলেম ভারত। প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা; বৈশাখ।—নূতন সচিত্র মাসিক পত্র। বাঙ্গালা সাহিত্যে সুপ্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত মোজাম্মেল হক এই পত্রের সম্পাদক। মোসলেম ভারত রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি মূলমন্ত্রের মত পত্রশীর্ষে উদ্ধৃত করিয়াছেন,—'মানব-সংসারে জ্ঞানালোকের দিয়ালি-উৎসব চলিতেছে। প্রত্যেক জাতি আপনার আলোটিকে বড় করিয়া জ্বালাইলে তবে সকলে মিলিয়া এই উৎসব সমাধা হইবে।' বিশ্বের মুসলমান আপনার আলোটিকে বড় করিয়া জ্বালিবার চেষ্টা করিতেছেন, আপনাদের স্বাতন্ত্র্য ও স্বার্থ রক্ষা করিবার

চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। বিশ্বে মুসলমানের এই প্রচেষ্টা 'pan-islamism' *অভিধানে আখ্যাত হইয়াছে। বাঙ্গালার নব-জাগরণে, স্বদেশীর যুগে বাঙ্গালী মুসলমান ক্ষুদ্র স্বার্থের মোহে মুগ্ধ ছিলেন। এখন সে মোহ ঘুচিয়াছে। বাঙ্গালার মুসলমান জাগিয়াছেন। এখন বাঙ্গালী মুসলমান নব-ভাবে উদ্বুদ্ধ, নূতন আশায় অনুপ্রাণিত, জাতীয়-জীবন-গঠনে অগ্রসর। স্বদেশী যুগের ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া বাঙ্গালী মুসলমানের জীবনে আজ সুস্পষ্ট। সমগ্র বিশ্বের ভাব-বিগ্রহে যে নবজীবনের স্পন্দন সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, ভারতের মুসলমান, বাঙ্গালার মুসলমান মর্ম্মে মর্ম্মে সেই স্পন্দন-বেদনা অনুভব করিতেছেন। হিন্দুর মত বাঙ্গালার মুসলমানও বুঝিয়াছেন, আমরা সর্ব্বাগ্রে ভারতবাসী, তাহার পর হিন্দু বা মুসলমান, বৌদ্ধ বা খ্রীষ্টান। বাঙ্গালার মুসলমান এখন উপলব্ধি করিয়াছেন,—বাঙ্গালাই তাঁহাদের জন্মভূমি। তাঁহারা আদৌ বাঙ্গালী, তাহার পর মুসলমান। বাঙ্গালা হিন্দু ও মুসলমান, উভয়েরই মাতৃভূমি। আমাদের দেশধর্ম্ম এক। স্বদেশী যুগের ভেদনীতি সূর্য্যোদয়ে কুজ্ঝটিকার মত অন্তর্হিত হইতেছে। বাঙ্গালা ভাষাই যে জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে বাঙ্গালীর—বঙ্গবাসী হিন্দু-মুসলমানের মাতৃভাষা, মুসলমান এই সহজ ও স্বাভাবিক সত্য উপলব্ধি করিয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষী সংঘ-বদ্ধ মুসলমান-সমাজের শক্তি ও প্রতিভায় পুষ্ট হইতেছে। বাঙ্গালা ভাষার সাধনায় বাঙ্গালী মুসলমান অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। অল্প দিনের মধ্যে মুসলমান লেখকগণ মাতৃভাষার সাধনায় যেরূপ সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। 'মোসলেম ভারত' তাহার প্রমাণ। মুসলমান-প্রবর্ত্তিত মাসিক সাহিত্যে আর একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় আছে। হিন্দু ও মুসলমান দেশমাতার দুই সন্তান। জীবনের সকল ক্ষেত্রে তাঁহাদের স্বার্থ অভিন্ন। বাঙ্গালার সাহিত্যেও এই অভেদের প্রতিষ্ঠা দেখিতেছি। মুসলমানের মাতৃভাষার সাধনায় হিন্দু তাঁহার সহযোগী। ইহাও যুগ-ধর্ম্মের অভিব্যক্তি—সুলক্ষণ। 'মোসলেম ভারতে'র প্রথমে কবিতায় 'মঙ্গলাচরণ'। তাহার পর 'আমাদের কথা'। সম্পাদক লিখিয়াছেন,—'বর্ত্তমানে "আমাদের সাহিত্যিক সমাজ" বলিলে কেবল মুসলমান সমাজকেই বুঝাইবে না, পরন্তু বঙ্গদেশবাসী বঙ্গভাষাভাষী হিন্দু-মুসলমান মানবসজ্বকেই বুঝাইবে। হউক হিন্দুর ধর্ম্ম ভিন্ন আর মুসলমানের ধর্ম্ম অন্য, কিন্তু জন্মভূমিগত এবং ভাষাগত হিসাবে হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই এক—উভয়েই একই প্রকৃতির নিয়ম-নিগড়ে নিবদ্ধ। পূর্ব্বে বাঙ্গালী মুসলমানগণ বঙ্গভাষায় কথাবার্ত্তা ও কার-কারবার করিলেও বঙ্গভাষাকে আয়ত্ত করিয়া তাহাকে নিজের সম্পদ করিয়া তুলিবার জন্য আদৌ মনোযোগী ছিলেন না; বরং বাঙ্গালা ভাষাকে একটু ঘৃণার চক্ষেই দেখিতেন। কিন্তু আজ-কাল সে ভাব আর নাই—সে ভ্রম এখন সকলের ঘুচিয়াছে। আজ মুসলমানগণ বঙ্গভাষাকে মাতৃভাষা বলিয়া সাদরে বরণ করিয়া লইয়াছেন, এমন কি অন্দরমহলের ভিতরেও বঙ্গভাষার স্বর্ণ সিংহাসন সুপ্রতিষ্ঠিত। * * * আমাদের মনে হয়, যদি কোন দিন বঙ্গ-জননীর যুগল সন্তান হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে স্থায়ী সম্মিলন সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে এই বাঙ্গলা সাহিত্যের মহামিলনের ক্ষেত্রেই তাহার আশা করা যাইতে পারে।' হিন্দু-মুসলমানের এই আশা সফল হউক, সার্থক হউক। হিন্দু-মুসলমানের 'স্থায়ী সম্মিলন' এখন আর 'কথার কথা' নয়, 'সম্ভবপর' নয়। তাহা সম্ভাবনার সীমা অতি-

ক্রম করিয়া অবশ্যম্ভাবী বাস্তবের অধিকারে প্রবেশ করিয়াছে। উভয় জাতির মাতৃভাষায় এই মহামিলনের মহামন্ত্র—বীজমন্ত্র যাঁহারা রচনা করিতেছেন, তাঁহাদের সাধনা সফল হউক। রবীন্দ্রনাথের 'গান' আমরা উদ্ধৃত করিলাম।

'তীরে কি আর আসবে না তোর তরী?
ঢেউ দেখে তুই মরিস্ ডরে,
সেই লাজেতেই মরি।
চেয়ে ঝড়ের মেঘের পানে
শান্তি যে তোর নাইরে প্রাণে,
কাণ্ডারী তোর হাস্‌চে-বসে'
ডান হাতে হা'ল ধরি।

'মিথ্যা স্বপন তোর—
এম্‌নি করে জড়িয়েছে রে,
ঘুচ্‌ল না তার ঘোর,
প্রভাত আসে তোমার পানে
আলোর রথে আশার গানে,
সে খবর কি দেয়নি কানে
আঁধার বিভাবরী?'

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের 'ফকীরের ধর্ম্ম' সুলিখিত প্রবন্ধ। সুফী-ধর্ম্মের বিবৃতি। ধর্ম্মের উচ্চ স্তরে মিলনের একটা ক্ষেত্র আছে। ধর্ম্মের নিম্নস্তর সামাজিক, উচ্চ স্তর আধ্যাত্মিক। সেই আধ্যাত্মিক স্তরেই অভেদের লীলা। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, বহু সাধকের জীবনে আমরা এই অভেদের লীলা দেখিতে পাই। প্রাচ্য দেশে, প্রাচ্য ধর্ম্মে, ধর্ম্মের যাহা শেষ স্তর, তাহাই বেদান্ত, তাহাই বেদের—জ্ঞানের শিরোভাগ। জ্ঞানের মত ভক্তিও দেশ-কালের অতীত। মুসলমান ও হিন্দুর সামাজিক বিন্যাসে ও প্রাত্যহিক জীবনের ধর্ম্মে আমরা যে বৈশিষ্ট্য ও প্রভেদ দেখিতে পাই, উভয় জাতির দার্শনিক তত্ত্বে, সাধনার ধর্ম্মে, বেদান্তে ও ভক্তি-বাদে সেই প্রভেদ আছে কি না, সেই উচ্চ স্তরে অভেদ সুপ্রতিষ্ঠিত কি না, তাহার গবেষণা ও অনুশীলন করিবার সময় আসিয়াছে। হিন্দু ও মুসলমান, উভয় জাতির সাধকের জীবনে সমদর্শিতা ও ভেদবুদ্ধি-রাহিত্যের লীলা দেখিয়া অজ্ঞ আমাদের মনে হয়, উভয় জাতির সাধনার ধর্ম্মে সমন্বয়ের একটা ক্ষেত্র আছে। প্রবুদ্ধ-ভারত—হিন্দু-মুসলমানের সমন্বয়ে গঠিত নব-ভারত, স্বাবলম্বনে প্রতিষ্ঠিত ও আত্মানুসন্ধানে অগ্রসর মুক্ত-ভারত নিশ্চয়ই আমাদের মহামিলনের এই পবিত্র ক্ষেত্রের—মানবতার এই পুণ্য ক্ষেত্রের আবিষ্কার করিবে। তখন আর হিন্দু-মুসলমানের জীবন ছুঁৎ-মার্গে নির্ভর করিবে না, রাজনীতির শৃঙ্খল দিয়া হিন্দু-মুসলমানকে বাঁধিয়া, এবং স্বার্থের রসায়ন দিয়া উভয় জাতিকে গলাইয়া, 'ভারতবাসী' জাতি গড়িবার কোনও প্রয়োজন থাকিবে না। শ্রীমতী হেমলতা দেবীর 'যাত্রা' নামক কবিতাটি পড়িয়া আমরা তৃপ্ত হইয়াছি। ভাবটি মনোজ্ঞ, ভাষা ও ছন্দও তাহার উপযোগী। সহজ সত্যটুকু বেশ হৃদয়গ্রাহী। অধ্যাপক মুহম্মদ শহীদুল্লাহ 'ভারতের সাধারণ ভাষা'র সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—'ভারতের "সাধারণ ভাষা" হইবার পক্ষে উর্দ্দুর দাবী অগ্রগণ্য, তার পর বাঙ্গালা, তার পর হিন্দী।' আমাদের মনে হয়, আপাততঃ হিন্দীই ভারতের 'সাধারণ ভাষা'র স্থান অধিকার করিবে। গত দিল্লী-কংগ্রেসে আমরা তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখিয়া আসিয়াছি। উর্দ্দু ও হিন্দীর আর একটি সমস্যা আছে। হিন্দী সংস্কৃত ও উর্দ্দু আরবী হইয়া উঠিতেছে। হিন্দী ও উর্দ্দু ভাষার সাধারণ ও সহজ প্রকৃতিকে সংস্কৃত ও আরবী গ্রাস করিতেছে, বিকৃত করিতেছে। ফলে উভয় ভাষার 'সাধারণতা'ই নষ্ট হইতেছে। এই সমস্যার সমাধান কি?

শ্রীযুত কাজী আবদুল ওদুদের 'সাহিত্যিকের সাধনা' সুচিন্তিত, সুলিখিত, সারগর্ভ প্রবন্ধ। 'উৎকর্ষতা' প্রভৃতি বর্জ্জনীয়। 'মোসলেম ভারতে'র কবিতা-ভাগ্যের আমরা প্রশংসা করিতে পারিলাম না। আশা করি, 'মোসলেম ভারত' বাঙ্গালীর সাহচর্য্য, সাহায্য ও সহানুভূতি লাভ করিবে।

আঙুর।—'ছেলে মেয়েদের জন্য সচিত্র মাসিকপত্র'। প্রথম বর্ষ, প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা ; বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ। শ্রীযুত মোহম্মদ শহীদুল্লাহ এই নূতন পত্রের সম্পাদক। প্রসঙ্গ-ক্রমে একটা কথা বলি, মহম্মদের বানান কি ? 'মোসলেম ভারতে' এক জন লেখক 'মুহম্মদ' স্বাক্ষর করিয়াছেন। শহীদুল্লাহ সাহেব 'মোহম্মদ' লিখিয়াছেন। আমরা কোন্‌টা অবলম্বন করিব ? বৈশাখে রবীন্দ্রনাথের একটি 'কথিকা' আছে। আমরা উদ্ধৃত করিলাম, কারণ, ছেলে মেয়েরা এ রূপকের রস ভোগ করিতে পারিবে না ; পক্ষান্তরে,ইহা তাহাদের মা-বাপদের পক্ষে অত্যন্ত সুপথ্য। তাই আজ উল্টা-রথের দিন রবীন্দ্রনাথের 'রথযাত্রা' বহু প্রচারের জন্য আবার ছাপিয়া দিলাম,—

রথযাত্রার দিন কাছে।

তাই রাণী রাজাকে বল্‌লে, 'চল, রথ দেখ্‌তে যাই।'

রাজা বল্‌লে, 'আচ্ছা।'

ঘোড়াশাল থেকে ঘোড়া বেরুল; হাতিশাল থেকে হাতি। দাস দাসী দলে দলে পিছে পিছে যায়।

কেবল বাকি রইল এক জন। রাজ-বাড়ীর ঝাঁটার কাটি কুড়িয়ে আনা তার কাজ।

সর্দ্দার এসে দয়া করে তাকে বল্‌লে, 'ওরে তুই যাবি ত আয়।'

সে হাত জোড় করে বল্‌লে, 'আমার যাওয়া ঘট্‌বে না।'

রাজার কানে কথা উঠ্‌ল, সবাই সঙ্গে যায়, কেবল সেই দুঃখীটা যায় না।

রাজা দয়া করে মন্ত্রীকে বল্‌লে, 'ওকেও ডেকে নিয়ো।'

রাস্তার ধারে তার বাড়ি। হাতি যখন সেখানে পৌঁছল মন্ত্রী তাকে ডেকে বল্‌লে, 'ওরে দুঃখী, ঠাকুর দেখ্‌বি চল্।'

সে হাত জোড় করে বল্‌লে, 'কত চলব ? ঠাকুরের দুয়োর পর্য্যন্ত পৌঁছই এমন সাধ্য কি আমার আছে।'

মন্ত্রী বল্‌লে, 'ভয় কি রে তোর, রাজার সঙ্গে চল্‌বি।'

সে বল্‌লে, 'সর্ব্বনাশ। রাজার পথ কি আমার পথ ?'

মন্ত্রী বল্‌লে, 'তবে তোর উপায় ? তোর ভাগ্যে কি রথযাত্রা দেখা হবে না ?'

সে বল্‌লে, 'হবে বই কি। ঠাকুর রথে করেই ত আমার দুয়ারে আসেন।'

মন্ত্রী হেসে উঠ্‌ল, বল্‌লে, 'কোথাকার পাগল। তোর দুয়ারে রথের চিহ্ন কই রে !'

দুঃখী বল্‌লে, 'তাঁর রথের ত চিহ্ন পড়ে না।'

মন্ত্রী বল্‌লে, 'কেন বল্ ত ?'

দুঃখী বল্‌লে, 'তিনি আসেন পুষ্পক রথে।'

মন্ত্রী বল্‌লে, 'কই রে সেই রথ ?'

দুঃখী হাত বাড়িয়ে দিলে, বল্‌লে 'এই যে !'

তার দুয়ারের দুই পাশে দুটি সূর্য্যমুখী ফুটে আছে।'

বৈশাখে 'গুটী পোকার বিভিন্ন অবস্থা'র সুরঞ্জিত ছবিখানি উল্লেখযোগ্য। 'তসরের গুটী পোকা ও তাহার প্রজাপতি' সুলিখিত। 'ইয়ুনুস নবী' প্রভৃতি কয়েকটি রচনাও মন্দ নহে। কিন্তু 'আঙুর' এখনও কাঁচা। মুসলমান-সমাজে প্রাচীন উপকথাগুলির কিরূপ পরিবর্ত্তন বা বিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, আশা করি, গল্প-সূত্রে আমরা তাহার পরিচয় পাইব। 'পিঠে গাছ' ত দেখিতেছি মুসলমান প্রতিবেশ-প্রভাব অতিক্রম করিয়া স্বীয় রূপ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। 'প্রথম সংখ্যা অপেক্ষা দ্বিতীয় সংখ্যা একটু নীচু হইয়া গিয়াছে। অধিকাংশ ছবিই ভাল নহে। ছবি, বিশেষতঃ শিশুপাঠ্য সাহিত্যের ছবি দেশে দুর্লভ বটে, কিন্তু এ ক্ষেত্রে 'নেই মামার চেয়ে কাণা মামা ভাল' এই প্রবচন প্রশস্ত নহে। আশা করি, উপর্যুক্ত মালী শহীদুল্লাহ সাহেবের পাটে এই আঙুরের ক্ষেতে ভবিষ্যতে থোলো থোলো রসাল ও সুমিষ্ট আঙুর ফলিবে।

নারায়ণ। জ্যৈষ্ঠ।—শ্রীমান বারীন্দ্রকুমার ঘোষ 'নারায়ণে'র পূজারী হইয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে কামের শিককাবাবে নারায়ণের নৈবেদ্য হইয়া গিয়াছে। লক্ষণ দেখিয়া বোধ হয়, বারীন্দ্র বেলপাতা-গঙ্গাজলের ব্যবস্থা করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। সুখের বিষয় এই, নারায়ণ-মন্দিরের বিভীষিকা 'দেবেন্দ্রনাথ' অন্তর্হিত হইয়াছেন। প্রথমেই অরবিন্দের কিশোর বয়সের ছবি আছে। 'নারায়ণ' এ বয়সের ছবি দেখাইলে আমরা প্রীত হইব। যাঁহাকে নিত্য দেখিতাম, তাঁহাকে যে অনেক দিক দেখি নাই। 'আর্য্যে' মানস-রূপ দেখি, তাহারও সবটা দেখিবার ত শক্তি নাই। শ্রীমতী প্রফুল্লময়ী দেবীর 'চাতক' কবিতা। বারীন্দ্র নিজে কবি, তিনি নির্ব্বাচন করিয়াছেন; সম্ভবতঃ 'কবিতা' আছে, তবে দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা তাহা ধরিতে পারিলাম না। ইহাতে ভাল কথা আছে, কিন্তু তাহা কবিতার রূপ লাভ করিয়াছে, এমন ত মনে হয় না। শ্রীহেমন্তকুমার সরকারের 'বাঙলা ভাষার বনিয়াদে' আমরা বাঙ্গালীর—বিশেষতঃ বিশেষবিৎ শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। লেখক কতকগুলি প্রচলিত শব্দের তালিকা দিয়া উপসংহারে বলিয়াছেন,—'এই সকল শব্দের মধ্যে হয় তো অনেক বর্ণচোরা শব্দ আছে। আর্য্য ও দ্রাবিড় ভাষায় পণ্ডিত এরূপ ভাষাতত্ত্ববিদের চেষ্টায় তাহার স্বরূপ নির্দ্ধারিত হইতে পারে। তবে উপরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গবাচক শব্দ, বা খোকাখুকি, ছেলেপিলে, গাছ, ঠাকুর প্রভৃতির মত সর্ব্বদা ব্যবহৃত শব্দগুলি যখন অন্‌আর্য্য ভাষার, তখন বাঙলা ভাষার আদি শব্দসমষ্টি যে অন্‌আর্য্যই ছিল তাহা বলা যাইতে পারে। আর পূর্ব্বেই বাক্যবিন্যাসরীতি এবং উচ্চারণের কথা আলোচনা করিয়া দেখানো হইয়াছে, সেখানেও অন্‌-আর্য্য ভাষার ছাপ কতখানি রহিয়াছে। এই সকল সূত্র ধরিয়া আরো অনেক অনুসন্ধান করিতে হইবে—বৃথা গর্ব্ব এবং অন্ধ সংস্কার পরিহার করিয়া সত্যনির্দ্ধারণে যত্নবান্ হইতে হইবে, তবেই বাঙলা ভাষার বনিয়াদ কি তাহা নিঃসন্দেহ ভাবে বুঝিতে পারিব।' আমরা অনধিকারী, মতামত-প্রকাশে অক্ষম। এই সকল মৌলিক আলোচনার সূচনা দেখিয়া আমাদের কেবল আনন্দিত ও আশান্বিত হইবার অধিকার আছে।—কিন্তু সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করি, 'মুণ্ড' কি অনার্য্য শব্দ? শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর 'স্বয়ংবৃত' তত্ত্বের কবিতা। 'শিল্প-কলার কথা' উল্লেখযোগ্য। শ্রীবিপিনচন্দ্র পালের 'পত্র ও চিত্র' উপভোগ্য। বারীন্দ্রের 'দ্বীপান্তরের কথা' আমরা সাগ্রহে পাঠ করিয়াছি। শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিশ্ব-

মানবের একতা' সুচিন্তিত নিবন্ধ। উপসংহারে উপেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন,—'জগতে যত আধারে ভাগবতী শক্তি প্রকাশিত হইতেছে, মানুষই তাহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ আধার। পূর্ণভাবে সেই শক্তি আপনার মধ্যে বিকশিত করিয়া, জগতে ভাগবতরাজ্যস্থাপনই মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য। এ তত্ত্ব উপলব্ধি করিলেই মানুষে মানুষে ভেদ ও বিরোধ তিরোহিত হইতে পারে ; ব্যষ্টি ও সমষ্টির দ্বন্দ্বের চূড়ান্ত মীমাংসা তখনই সম্ভবপর। বিশ্বরাষ্ট্র গড়িবার ঐ একমাত্র পন্থা।' বিশ্বরাষ্ট্র বোধ হয় আপাততঃ স্বপ্নই থাকিবে।—'নারায়ণে'র নূতন পূজারীর পূজা-পদ্ধতিতে সাত্ত্বিকতা ও ভক্তির লক্ষণ প্রকটিত হইতেছে। প্রবন্ধাবলীতেও যেন একটা সুরেরই 'আভাষ' শুনিতেছি। আত্মদর্শন, আত্মবিশ্লেষণ ও আত্মসাধনার অনুকূল ও প্রতিকূল সমস্যাসমূহের আলোচনা নূতন সহকারী সম্পাদকের উদ্দিষ্ট বলিয়া মনে হইতেছে। বারীন্দ্র নূতন পথের যাত্রী। আমরা বলি, 'শিবাস্তে পন্থানঃ!' তোমার জীবনের অভিজ্ঞতা অল্প নয়। বাঙ্গালার —শুধু বাঙ্গালার কেন?—ভারতের চিন্তারাজ্যে, আত্মরক্ষার প্রচেষ্টায় গত যুগে যে বিবর্ত্ত দেখিয়াছিলাম, বারীন্দ্র! তুমি সেই বিবর্ত্তের 'ব্রহ্মা' ছিলে। তুমি কর্ম্মক্ষেত্রে বঙ্গদেশদুর্ল্লভ, অনন্যসাধারণ, অতুলনীয়, অনুপম, অপূর্ব্ব শক্তি, ত্যাগ ও গঠনপটুতা ও পরিচালন-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছিলে। সু কি কু জানি না, শুভ কি অশুভ বলিতে পারি না, তোমাদের কর্ম্ম-জীবনের অভিব্যক্তি ও শক্তি বাঙ্গালীকে নবজীবন দান করিয়াছে। তোমরা বাঙ্গালার ভাব-জগতের হাওয়া বদলাইয়া দিয়াছিলে। তোমাদের ত্যাগে বাঙ্গালী ধন্য হইয়াছে, বাঙ্গালী জীবন-মরণের মূল্য বুঝিয়াছে। আমাদের বর্ত্তমান জীবনই যে মৃত্যু, এবং মৃত্যুও যে জীবন হইতে পারে, তোমাদের গত কর্ম্মজীবনে তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। বাঙ্গালীর জীবনে সে আদর্শ নিশ্চয়ই নিষ্ফল হইবে না। তুমি অসি ফেলিয়া বাঁশী ধরিলে! আশা করি, কামনা করি, তোমার ত্যাগে, সাধনায়, শক্তিতে বাঙ্গালা সাহিত্যের মরা গাঙ্গে আবার বান ডাকিবে। বাঙ্গালী আবার কোটীকণ্ঠে গাইয়া উঠিবে,

'এ যৌবন-জলতরঙ্গ রোধিবে কে?
হরে, মুরারে! হরে, মুরারে!'

তোমার পূর্ব্ব ব্রত হয় ত অনধিকারী বাঙ্গালী সাধারণের অনধিগম্য ছিল। আশা করি, তুমি বাঙ্গালীকে তোমার নূতন ব্রতের অধিকারী করিয়া মুক্তির পথে প্রবর্ত্তিত করিতে পারিবে। এক দধীচির অস্থিদানে ষষ্টিসহস্র সগরসন্তানের মুক্তি হইয়াছিল। বাঙ্গালার যে সকল বালগোপাল দেশের মুক্তির জন্য আত্মদান করিয়াছেন, তাহা কি ব্যর্থ হইতে পারে? আমাদের সকল কর্ম্মে সেই আত্মবিসর্জ্জন প্রেরণা দান করুক।

সাহিত্যে স্বাস্থ্যরক্ষা।

৪

বিধবার প্রেমে পড়া সম্বন্ধে আর একখানি নবেলের সমালোচনা করিয়া, এই অধ্যায় শেষ করিব। এই পুস্তকখানিকে অন্ত শ্রেণীর নবেলের type মনে করা যাইতে পারে। অর্থাৎ, ইহাতে আর্টের অত্যন্ত অভাব, কেবল নবেল লিখিতে হইবে বলিয়া নবেল লেখা। এই নবেলের নাম "কর্ম্মের পথে"—ইহার লেখক শ্রীযুক্ত হরিদাস হালদার, বঙ্গ-সাহিত্যে অপরিচিত নহেন। তিনি তাঁহার "গোবর গণেশের গবেষণা" লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন। অর্থাৎ, মৃতপ্রায় হিন্দু সমাজের পৃষ্ঠে বিদ্রূপের কশাঘাত করিয়া ডাক্তার রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি সংস্কারকগণের হাততালি লাভ করিয়াছেন। তবে সেই পুস্তকখানিতে অনেক ভাল কথাও আছে। কিন্তু 'ভাই হাততালি' লোককে যে মাটী করে, ৺ সাহিত্যাচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার তাহা দেখাইয়া দিয়াছেন। এই গ্রন্থকারও সেই 'ভাই হাততালি'র পরামর্শে, বোধ হয়, সমাজ-সংস্কারের অভিপ্রায়ে এই উপন্যাসখানি লিখিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, তাঁহার এই চেষ্টা ব্যর্থ হইবে। তিনি ইহাতে আগাগোড়া পাপের চিত্র অঙ্কিত করিয়া পাঠক-পাঠিকার মনে একটা represion অর্থাৎ বীভৎস রসের সঞ্চার করিয়াছেন। কৃষ্ণনগরের সরকারী উকীল রাধাবল্লভ বাবু নিতান্ত লম্পট স্বভাবের লোক। তিনি হেমাঙ্গিনী নাম্নী একটি বালবিধবার রূপে মত্ত হইয়া তাহার ভাই নন্দলালকে মুহুরীগিরি চাকুরী দিলেন, এবং নানা প্রকারে তাহাকে ফুসলাইবার চেষ্টা করিলেন। গোলাপ নামে এক পানওয়ালীর সহিত রাধাবল্লভের খুব ভাব। লেখক এমনই কাণ্ডজ্ঞানবর্জ্জিত যে, কৃষ্ণনগরের গবর্মেণ্ট প্লীডারকে বার-লাইব্রেরীতে বসাইয়া তাহার সঙ্গে প্রেমালাপ করাইতেছেন। যাহা হউক, রাধাবল্লভ বাবু এই গোলাপের দ্বারা হেমাঙ্গিনীর সতীত্বনাশের অনেক চেষ্টা করিয়া যখন অকৃতকার্য্য হইলেন, তখন দারোগার সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিয়া হেমাঙ্গিনীর ভাই নন্দলালকে এক স্বদেশী মোকদ্দমার আসামী করিয়া দিলেন। নন্দলালের জেল হইল, কিন্তু হেমাঙ্গিনী চতুরতা করিয়া এক দিন রাধাবল্লভের বাড়ীতে গিয়া নন্দলালকে আপীলে খালাস করাইল। পরে নন্দ-

লাল হেমাঙ্গিনীকে লইয়া কৃষ্ণনগর পরিত্যাগ করিল, এবং কলিকাতার সন্নিহিত কামারহাটীতে এক চটের কলে চাকুরী লইয়া সেখানে বাস করিতে লাগিল। সুরেশ নামে নন্দলালের এক জন অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল। সেই এই উপন্যাসের নায়ক। কিন্তু নায়িকা হেমাঙ্গিনী নহে—হেমাঙ্গিনী আগাগোড়া তাহার চরিত্র ঠিক রাখিয়াছে, এবং পাপচরিত্রবহুল এই উপন্যাসে তাহার চরিত্র নিবিড় অন্ধকারে আলোকরশ্মির ন্যায় জ্বল্ জ্বল্ করিতেছে। বাগবাজারের কাশীনাথ নামে এক লম্পটস্বভাব ধনী জমীদারের প্রথম পক্ষের স্ত্রী পারুল নামে একটি শিশু কন্যা রাখিয়া মারা গেলে, তিনি সুলোচনাকে বিবাহ করেন। যেমন স্বামী, তাহার তেমন স্ত্রী। সুলোচনাও তাহাদের এক কর্ম্মচারীর সঙ্গে ভ্রষ্টা। সেই প্রথম পক্ষের কন্যাটীর নাম পারুল। অতি অল্প বয়সে তাহার বিবাহ হয়, এবং বিবাহের পরেই সে বিধবা হইল। সে যখন যৌবনে পদার্পণ করিল, তখন সেই বা তাহার পিতা ও বিমাতার দৃষ্টান্তের অনুসরণ না করিবে কেন? কামারহাটীর নিকট এঁড়েদহে কাশী বাবুর এক বাগানবাড়ীতে সে তাহার পিসীর সঙ্গে গিয়া প্রায়ই থাকিত, এবং তাহার প্রস্ফুটিত রূপ আরও ফুটাইবার জন্য সাজ গোজ করিয়া বাগানে বেড়াইত। পারুল কোনও দিনই বৈধব্যোপ-যোগী সংযম করিতে শেখে নাই, আর তাহার পিতৃভবনও সংযমশিক্ষার উপযুক্ত ক্ষেত্র ছিল না। এই অবস্থায় এক দিন সুরেশের সঙ্গে হঠাৎ তাহার দেখা হইল, আর অমনই 'পদার্থ-বিজ্ঞানের বিপরীত-বিদ্যুতাক্রান্ত দুইটি বস্তুর ন্যায় এই যুবক যুবতীর চোখে চোখে মিলন হইল।' এই কথা বলিয়া, পাছে কেহ মনে করেন, গ্রন্থকারের পদার্থ-বিজ্ঞান তত বেশী পড়া নাই, সেই ভয়ে তিনি আবার বলিতেছেন, 'এই "চোখোচোখিই" বিদ্যুতের স্ফুলিঙ্গ বা স্পার্ক।' পদার্থ-বিজ্ঞানে তাঁহার বিদ্যা কম কি না, জানি না, কিন্তু প্রেম-বিজ্ঞানে তাঁহার বিদ্যা নিতান্তই বেশী, তাই তিনি বলিতেছেন,—উভয়ের চোখোচোখি হওয়ায় 'সুরেশ লজ্জায় চক্ষু ফিরাইল—পারুল কিন্তু একাধিক বার তাহার প্রতি অতৃপ্ত দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। পুরুষ রমণীর প্রথম প্রেমদৃষ্টির সময় পুরুষ লজ্জিত হয়, কিন্তু রমণী সাহসের পরিচয় দেয়।' তোমরা সকলে জানিয়া রাখ, ইহাই গোবর গণেশের 'love's philosophy.'

যাহা হউক, লেখক সুরেশকে যেরূপ এক জন আদর্শ সুশিক্ষিত স্বদেশ-প্রাণ যুবক বলিয়া চিত্রিত করিয়াছেন, তাহার পক্ষে এরূপ একটি অপরিচিত যুবতী দেখিয়া কি করা উচিত? লেখকের সে কাণ্ডজ্ঞান মোটেই নাই।

তিনি শুনিয়াছেন, প্রথম দর্শনেই প্রেম হয়, তাহার দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিবার সময় থাকে না। তাই পারুল কুমারী, সধবা কি বিধবা, তাহার জাতি কুল কি, এ সব না জানিয়াও সুরেশ তাহার প্রেমে পড়িল। গ্রন্থকার অবশ্য সুরেশের জন্য (অথবা নিজের জন্য) পাঠকের নিকট ক্ষমা চাহিয়াছেন। তাঁহার অজুহাত এই—'কিন্তু প্রেমের তড়িত স্পর্শে হৃদয় আপনি স্পন্দিত হয়, দৃষ্টি বল্গা-বিচ্যুত অশ্বের ন্যায় স্বতঃই ধাবিত হয়। এ কার্য্যে ভাল মন্দ, ন্যায়ান্যায়, বৈধাবৈধের তর্ক চলে না।' কেন চলে না? সুরেশ না Science কোর্সে বি. এ. পাশ করিয়া দেশের হিতের জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে চাহে? তাহার যদি এতটুকু চিত্তসংযমের ক্ষমতা না থাকে, সে যদি এত দূর ন্যায়ান্যায়-হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য হয়, তবে তাহার শিক্ষার মূল্য কি?

অনেক নায়ক নায়িকা ত প্রেমে পড়ে—তাহাদের প্রেম মনে মনে থাকে—বাহিরে প্রকাশ পাইলেও ভোগ-লালসার বশবর্ত্তী হয় না। 'চোখের বালি'র বিনোদিনী পর্য্যন্ত এক দিনের তরেও মহেন্দ্র বা বিহারীর প্রতি লালসাসক্ত হয় নাই। কিন্তু এই গ্রন্থকার আমাদের সমাজ-সংস্কার করিবার প্রয়াসী। ইংরেজী শিক্ষার প্রথম যুগে হিন্দু কলেজের ছাত্রেরা যেমন অত্যন্ত উৎসাহের সহিত মদ্য ও গোমাংস ভক্ষণ করিতেন, এবং প্রতিবেশীর বাড়ীতে গরুর হাড় ফেলিয়া নিজেদের reforming zealএর পরিচয় দিতেন, এই লেখকটির zealও সেইরূপ। তাঁহার এই নায়ক নায়িকা প্রথম দর্শনের পরে পরস্পর মিলনের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল—সুরেশ তাহাকে প্রেমপূর্ণ এক কবিতা লিখিয়া পাঠাইল—কিন্তু পারুল লেখা পড়া জানে না, সে তাহা বুঝিতে না পারিয়া মানভরে ফিরাইয়া দিল—পরে সেই বাগানে এক দিন সন্ধ্যার পরে উভয়ের মিলন হইল—তখন পারুল বলিল, 'তা হলে তুমি আমাকে ভালবাস?' সুরেশ বলিল, 'নিশ্চয়ই! আমি তোমার জন্য পাগল হয়েছি।' এই কথা বলিয়া সুরেশ পারুলের মুখ চুম্বন করিল; পারুল তাহার গলা জড়াইয়া ধরিল। পরে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, 'সুরেশ ও পারুল দুই দিন নিশাযোগে এই লতাকুঞ্জে মিলিত হইয়াছিল। মিলনানন্দের দীর্ঘকালও তাহাদের নিকট ক্ষণস্থায়ী মুহূর্ত্তমাত্র বলিয়া মনে হইত।'...সুরেশ ও পারুল প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, তাহারা নিদ্রা গিয়া পরস্পরকে স্বপ্নে দেখিবে। তাহারা সে প্রতিজ্ঞা পালন করিত। সুরেশ ভাবিত, 'পারুলের প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের উপর তাহার সম্পূর্ণ দখল আছে—এ সকল তাহারই সম্পত্তি, তাহারই ঐশ্বর্য্য।'

পাঠক মনে রাখিবেন, এখন পর্য্যন্ত ইহাদের বিবাহ হয় নাই। বিবাহ করিবার পরে, স্ত্রীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উপর এইরূপ অধিকার ত সকল স্বামীরই হইয়া থাকে। তাহা হইলে আর সংস্কারের প্রয়োজন কি? লেখক ইহারও একটা কৈফিয়ৎ দিতে ভুলেন নাই। তিনি বলেন, ইহা অতি পবিত্র 'অতি-প্রিয় অনাবিল প্রেম, আর এই অতীন্দ্রিয় অনাবিল প্রেমের স্রোত কানায় কানায় ভরিয়া উঠিলেও সংযমের বেলাভূমি অতিক্রম করে না। ইন্দ্রিয় চির দিনই অতীন্দ্রিয়ের দাসত্ব করিয়া থাকে।' অর্থাৎ, যে প্রেমে আত্মহারা হইয়া সুরেশ পারুলের প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উপর তাহার দখল সাব্যস্ত করিল, তাহাতেও সংযমের সীমা অতিক্রান্ত হইল না, আর তাহাও অতীন্দ্রিয় পবিত্র প্রেম! আসল কথা এই, লেখক বৈষ্ণব কবিতায় পড়িয়াছেন—'প্রতি অঙ্গ তরে কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর', আবার আধুনিক কবিদের লেখায় অতীন্দ্রিয় প্রেমের কথাও পড়িয়াছেন। নায়ক-নায়িকার প্রেমের গভীরতা ও পবিত্রতা দেখাইবার জন্য তাঁহার এই পড়া কথা যদি এক জায়গায় না খাটাইতে পারিলেন, তবে তাঁহার উপন্যাস লেখার সার্থকতা কি? তাঁহার গবেষণারই বা সার্থকতা কোথায়? তবে ইহা গোবর গণেশের গবেষণা হইতে পারে, ইহা কবির আর্ট নহে। কারণ, পড়া কথা বা শোনা কথা নকল করিয়া গেলে আর্ট হয় না; art is a feeling.

যাহা হউক, যুবক-যুবতীর লালসাদীপ্ত 'অনাবিল অতীন্দ্রিয় প্রেম' নামে কথিত এই নিতান্ত gross love অর্থাৎ কামের চিত্র লইয়া আর অধিক নাড়াচাড়া করিব না। সুরেশ সেই দুই রাত্রি লতাকুঞ্জে পারুলের সহিত যাপন করিবার পরে, হঠাৎ পারুল তাহাকে সংবাদ না দিয়া কলিকাতায় চলিয়া গেল। তখন সুরেশ তাহার বিরহে পাগল হইয়া ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল। সে কাশী বাবুর কলিকাতার ঠিকানা জানিত না। তিন মাস পরে পারুল, প্রাণের আবেগে, প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ ও শিশুশিক্ষা পড়িয়া, তাহাদের এক মালীর হাতে একখানা ক্ষুদ্র চিঠি হেমাঙ্গিনীর বাসায় পাঠাইয়া দিল। সেই হিজিবিজি লেখা খোলা চিঠি হেমাঙ্গিনীর হাতে পড়িল। তিনি এক দিন বাগবাজারে মদনমোহন দেখিতে গিয়া পারুলকে তাহাদের বাড়ীতে দেখিয়া আসিলেন। এ দিকে সুরেশ সন্ন্যাসী হইবে বলিয়া হেমাঙ্গিনীকে চিঠি লিখিয়াছিল। কিন্তু পাঁচুমামার উপদেশ শুনিয়া সে সঙ্কল্প ত্যাগ করিল। গ্রন্থকার তাঁহার সমাজ-সংস্কার ও স্বদেশী বক্তৃতা দিবার

জন্য পঞ্চানন ওরফে পাঁচু মামা নামক এক প্রবীণ ব্যক্তিকে ভাড়া করিয়া আনিয়াছেন, অর্থাৎ গ্রন্থের মধ্যে জোর করিয়া বসাইয়াছেন। সুরেশ তাঁহার এক জন চেলা। এই পাঁচু মামা ও হেমাঙ্গিনী ঘটকালি করিয়া পারুলের সঙ্গে সুরেশের বিবাহ দিলেন। তখন কাশীবাবুর মৃত্যু হইয়াছিল; তাঁহার বিধবা স্ত্রী সুলোচনার পারুলের উপর কোনও অধিকার ছিল না। পারুলের পিসী বিবাহে সম্মতি দিয়া কাশী চলিয়া গেলেন। তবে এ বিবাহটা নিতান্ত লৌকিক ব্যাপার; গ্রন্থকারের মতে, আসল বিবাহ 'সেই বাগানবাটীতে এক প্রকার গোপনেই সমাধা হইয়াছিল।' আমরাও বলি, 'ঠিক কথা।' এই নবেলের নবেলত্ব এখানেই একরূপ শেষ হইল। ইহার পরে সুরেশ দেশের উন্নতির জন্য নানা কাজ আরম্ভ করিল; তাহার মধ্যে এঁড়েদহের সেই বাগান-বাড়ীতে ঔষধ প্রস্তুতের এক কারখানা খুলিল। এ দিকে সুলোচনা তাঁহার ভগিনীপতি কৃষ্ণনগরের উকীল সেই রাধাবল্লভ বাবুর পরামর্শে সুরেশ ও পারুলকে কাশীবাবুর বিষয় হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য এক ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিল। তখন দেশে এনার্কিষ্টদের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। সুরেশকে এই এনার্কিষ্টদলের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া একটা মিথ্যা মোকদ্দমার সৃষ্টি করা হইল। কিন্তু সুরেশের কিছু হইল না। গ্রন্থের এই অংশে কোনও নবেলত্ব নাই, ইহা যেন এনার্কিষ্ট মামলার ইতিহাস। তবে গ্রন্থের শেষ ভাগে অনেক বীভৎস ব্যাপার সংশ্লিষ্ট হইয়াছে। এক জন এনার্কিষ্টের হাতে রাধাবল্লভের পাপময় জীবনের অবসান হইল। আর সুলোচনা তাহার বাড়ীর সরকার রসিকের প্রেমে পড়িয়া যে কাণ্ড করিয়া বসিল, তাহাতে তাহারও মৃত্যু হইল। কিন্তু তাহাদের সেই প্রেম 'অতীন্দ্রিয় প্রেম' কি না, সে সম্বন্ধে লেখক কোনও গবেষণা করেন নাই। আমরাও তাঁহাকে এখানেই ছুটী দিতেছি। তাঁহার পুস্তকের দ্বারা সমাজসংস্কার হউক, আর না হউক, তাহা যে যুবক-যুবতী চিত্তে লালসার ইন্ধন যোগাইতে সমর্থ হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এত অধিক পাপচিত্রের সহিত ঘনিষ্ঠতা দ্বারা পাঠক-পাঠিকার মনে পাপের প্রতি ঘৃণা কমিয়া যাইবে, তাহার আশ্চর্য্য কি?

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ।

ইটালী।

মধু, 'যার মধুধ্বনি', ইটালীতে অবস্থানকালে বাঙ্গালায় চতুর্দ্দশপদী কবিতারচনা প্রবর্ত্তন করেন। তিনি লিখিয়াছেন—

'ইটালী বিখ্যাত দেশ কাব্যের কানন,
বহুবিধ পিক যেথা গাহে কুতূহলে।'

ইটালীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের কথা অনেক শুনিয়াছি। কিন্তু ইটালীর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়কালে তাহার যে রূপ প্রত্যক্ষ করিলাম, তাহাতে, নিরাশ না হইলেও হতাশ হইতে হয়। ৫ই অক্টোবর শনিবার অপরাহ্নে যখন ইটালীতে উপনীত হইলাম, তখন বৃষ্টি হইতেছে; রাস্তায় কর্দ্দম—আটাল মাটীর কাদা যেন জুতা আটকাইয়া ধরে। আমাদের বাল্যকালে ফেরী-ফাণ্ডের রাস্তা জিলা-বোর্ডের হাতে যাইয়া সংস্কৃত ও বিস্তৃত হইবার পূর্ব্বে যশোহর জিলার যে রাস্তা' যশোহর হইতে চৌগাছায় গিয়াছে, তাহার এক স্থানের নাম ছিল জগহাটী। তথায় আটাল মাটীতে বর্ষার সময় যে কাদা হইত, তাহাতে পথ অতিক্রম করা এত কষ্টকর হইত যে, লোক বলিত—

'দুই পা, এক লাঠী,
তবে যা'বে জগহাটী।'

লাঠীতে ভর না দিয়া কেবল দুই পায়ে পথ চলা যেন অসম্ভব। ট্যারণ্টোয় নামিয়া রাস্তার অবস্থা দেখিয়া আমার সেই কথা মনে পড়িল।

আমরা সৈনিক বিভাগের আপিসে যাইলে এক জন কর্ম্মচারী আমাদের সব ব্যবস্থা করিবার ভার পাইলেন। জানা গেল, পর দিন সন্ধ্যা সাড়ে ছয়-টার পূর্ব্বে আমরা রওনা হইতে পারিব না। সেই সময় দ্রুতগামী ট্রেণ রোমের অভিমুখে রওনা হইবে। আমাদের দেশে যে দ্রুতগামী গাড়ীকে মেল বলে, এ দেশে তাহাকে বলে "র্যাপিড"। তাহাতেই আমাদিগের যাইবার ব্যবস্থা হইবে। সৈনিক কর্ম্মচারীটি সঙ্গে করিয়া আমাদিগকে আমাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট ঘরে লইয়া গেলেন—Rest Camp—37 B.। দীর্ঘ ঘর, গুদামের বা হাঁসপাতালের মত; দুই পার্শ্বে লোহার খাট পাতা, মধ্যে পথ, প্রায় ৮০খানি খাট। গৃহপ্রাচীর প্রস্তরে রচিত; আজ কাল কলিকাতার বাড়ীর জন্য বোম্বাই হইতে যে শাদাটে নরম পোরবন্দরের পাথর আমদানী হয়, সেই জাতীয় পাথর। তাহাতেই ইংরাজের সমর-বিভাগ এই স্থানে বহু গৃহ নির্ম্মাণ

করিয়াছেন; এমন কি, বায়স্কোপের জন্য গৃহও নির্ম্মিত হইয়াছে। শুনিলাম, সেই জন্যই জমীদার বলিয়াছেন, ইহারা যখন বায়স্কোপের বাড়ীও করিয়াছে, তখন যুদ্ধের পরও আড্ডা উঠাইবে না।

আমাদিগকে ঘর দেখাইয়া দিয়া কর্ম্মচারীটি আমাদিগকে মেস-রুমে চা পান করাইতে লইয়া গেলেন। রাত্রিতে কাদা ভাঙ্গিয়া অন্ধকারে আর আহার করিতে আসিব না, সঙ্কল্প করিয়া, আমি চার সঙ্গেই রাত্রির আহারের কাজ সারিয়া লইলাম। আমার পক্ষে এ 'ত্যাগস্বীকার' যে কত অসাধারণ, তাহা সকলে অবশ্য বুঝিতে পারিবেন না।

চা পান শেষ করিয়া আমাদের ঘরে ফিরিয়া আসিলাম। ঘরটি শূন্য ছিল। আসিয়া দেখিলাম, আমাদের কয় জনের জন্য গদী ও তিনখানা করিয়া কম্বল লইয়া কয় জন সৈনিক উপস্থিত রহিয়াছে—শয্যা রচনা করিয়া দিবে।

আমাদের জিনিসগুলি জাহাজ হইতে আনিয়া আফিসের গুদামে তোলা হইয়াছিল—পর দিন প্রভাত ব্যতীত পাওয়া যাইবে না। কাজেই যিনি যে বেশে ছিলেন, তাঁহাকে সেই বেশেই রাত্রি কাটাইতে হইবে। আমি হ্যাণ্ড-ব্যাগে একটা ঘুমাইবার পোষাক রাখিতাম—কাজেই আমার কোনও অসুবিধা হইল না। ঘরে জলের কোনও ব্যবস্থা ছিল না। অনেক চেষ্টায় কয় ঘটী (জগ্) জল সংগ্রহ করা গেল।

এক জন সৈনিক কর্ম্মচারী আসিয়া বলিলেন, রাত্রিকালে সেই বড় ঘরে শীতে আমাদের কষ্ট হইবার সম্ভাবনা। তিনি ঘর গরম রাখিবার জন্য একটা ষ্টোভ দিবার ব্যবস্থা করিলেন। কয় জন মিস্ত্রী আসিয়া ঘরের ছাদে ছিদ্র করিয়া গেল—সেই ছিদ্রপথে ষ্টোভের চিমনী উঠিল। ষ্টোভ বসাইবার ঠকাঠক—খটাখট শব্দ যদি থামিল, তবে আর এক উৎপাত আরম্ভ হইল। প্যাকিং-বাক্সের কাঠ ও পীচ দিয়া আগুন জ্বালা হইল। চিমনী দিয়া ধূম বাহির হইয়া গেল বটে, কিন্তু আলকাতরা জ্বালানর গন্ধে বা দুর্গন্ধে ঘর পূর্ণ হইয়া রহিল।

রাত্রিতে আমি, আয়াঙ্গার মহাশয়, এবং অনুচরদিগের মধ্যে দুই জন আর আহার করিতে গেলাম না। যাঁহারা যাইলেন, তাঁহারা বৃষ্টিতে ভিজিয়া ফিরিলেন—মিষ্টার গ্যাণ্ডরুক ত ভিজিয়া শেষে 'ব্রাণ্ডি-হট্' পানের ব্যবস্থা করিলেন।

আমরা যে যাহার শয্যায় শয়ন করিয়া কম্বল মুড়ি দিয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম। তখনও বাহিরে বৃষ্টি হইতেছে—আকাশ মেঘাচ্ছন্ন।

প্রভাতে যখন ঘুম ভাঙ্গিল, তখন বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে। শয্যায় শয়ন করিয়া আছি, এমন সময় কয় জন ইংরাজ সৈনিক ঘরে প্রবেশ করিল, এবং সাফ করিবার জন্য জুতাগুলি লইয়া গেল। আমরা উঠিয়া পড়িলাম।

তাহার পর আমাদিগকে চা দিবার ব্যবস্থা করিতে এক জন কর্ম্মচারী আসিলেন। গত রাত্রিতে সার (এখন লর্ড) সত্যেন্দ্র সিংহের আসিবার কথা ছিল। তিনি সমর-পরিষদের অধিবেশন সারিয়া ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন—আমাদের জাহাজের সঙ্গে যে কৈশর-ই-হিন্দ জাহাজ আসিয়াছে, তাহাতে ফিরিয়া যাইবেন। তাঁহার সন্ধান লইয়া জানিলাম, তিনি রাত্রিতে ট্রেণ হইতে নামিয়া সরাসরি ষ্টীমারে উঠিয়াছিলেন; জাহাজ এখনই ছাড়িয়া দিবে। কাজেই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইল না।

কর্ম্মচারী, আমাদের চা পান শেষ হইলে, আমাদিগকে প্রধান সৈনিক কর্ম্মচারীর কাছে লইয়া গেলেন—জেনারল আমাদিগের জন্য অপেক্ষা করিতে-ছিলেন। আমাদের কোনও অসুবিধা হইয়াছে কি না জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি বলিলেন, যাহাতে পথে আমাদের কোনও অসুবিধা না হয়, সে জন্য তিনি সব বড় বড় ষ্টেশনে কর্ম্মচারীদিগকে (R. T. O.) টেলিগ্রাফ করিয়া দিবেন। সর্ব্বদা সৈনিকদিগের গতায়াতের জন্য সব বড় ষ্টেশনেই এই কর্ম্মচারী রাখিতে হইয়াছে। তাহার পর জেনারল এক জন কর্ম্মচারীকে আমাদিগকে সেনা-নিবাসের চারি দিক দেখাইয়া আনিতে বলিলেন।

সেনানিবাসটি বৃহৎ—সব রকমের সব ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে। প্রথমে আমরা সেনানায়কের প্রধান অফিসে গেলাম। দ্বিতল গৃহ—প্রস্তরে গঠিত। ইহা স্থানীয় জমীদারের গৃহ ছিল—বড় বড় প্রাঙ্গণ, বাড়ীতেই গির্জ্জা—প্রজারা প্রার্থনার জন্য তথায় আসিত, গোলাঘর, রক্ষীদিগের গৃহ ইত্যাদি। গৃহসংলগ্ন উদ্যানে ঝাউ ও অলিভ (জলপাই) গাছ। গৃহটি প্রায় চারি শত বৎসর পূর্ব্বের। এই গৃহ দেখিয়া সে কালের ইটালীর ধনীদিগের বাসব্যবস্থা বুঝা যায়। জমীদার প্রজাপরিবেষ্টিত হইয়া গ্রামেই বাস করিতেন; প্রজারা তাঁহার সম্পদে সুখী হইত—বিপদে সাহায্য করিত—প্রয়োজন হইলে আশ্রয় ও সাহায্য পাইত। সকল দেশেই সে কালে জমীদার-প্রজায় এই স্নেহ শ্রদ্ধার সুমধুর সম্বন্ধ ছিল। জমীদার গ্রামে থাকিলে প্রজার দুঃখ বুঝেন—যে অসুবিধা উভয়েরই, তাহা উভয়ের সমবেত চেষ্টায় দূর হয়। পূর্ব্বে সেই জন্যই জমীদারের অর্থে ও প্রজার শ্রমে পুষ্করিণী খনিত হইত, পথ রচিত হইত, সেতু নির্ম্মিত হইত। তাই তখন

গ্রামগুলি শ্রীভ্রষ্ট হয় নাই। আমাদের দেশেও এই ব্যবস্থা ছিল। এখনও গ্রামে গ্রামে বারোয়ারী পূজায় জমীদারের নামে 'সঙ্কল্প' করিতে হয়। সে কেবল সে কালের সম্বন্ধের শেষ নিদর্শন। কেন না, এখন জমীদার বিদেশ-বাসী, প্রজা নায়েব গোমস্তার হস্তে সমর্পিত—জমীদার ও প্রজা উভয়ের মধ্যে প্রজাস্বত্ববিষয়ক আইন মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে।

এই স্থানে পূর্ব্বে ম্যালেরিয়া ছিল। কিন্তু সামরিক প্রয়োজনে জলনিকাশের ও পানীয় জল সরবরাহের সুব্যবস্থা হওয়ায় এখন আর ম্যালেরিয়া নাই। শুনিয়া আমাদের দেশের কথা মনে পড়িল। ম্যালেরিয়া দূর করা অসম্ভব নহে। কিন্তু আমাদের দেশে এই বিষম ব্যাধি দূর করিবার জন্য কি চেষ্টা হইয়াছে? এক বাঙ্গালা দেশেই বৎসর বৎসর সাড়ে তিন লক্ষ হইতে চারি লক্ষ লোক ম্যালেরিয়ায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়। যাহারা বাঁচিয়া থাকে, তাহারা জীবন্মৃত অবস্থায় জীবন যাপন করে। ম্যালেরিয়ায় বঙ্গদেশে অনেক স্থানে মৃত্যুর হার বাড়িতেছে, জন্মের হার কমিতেছে। সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ, বাঙ্গালীর দারিদ্র্যের এবং অন্য অনেক প্রকার দুর্দ্দশার জন্য ম্যালেরিয়াই প্রধানতঃ দায়ী। বাঙ্গালীর উৎসাহের ও উদ্যমের অভাবের কারণ সন্ধান করিতে হইলেও ম্যালেরিয়ার কথা বিবেচনা করিয়া দেখিতে হয়। এই ত অবস্থা—কিন্তু এই অবস্থার প্রতীকারের কি উপায় অবলম্বিত হইয়াছে? যে দেশে মানুষের জীবনের মূল্য আছে, সে দেশে সে জীবন রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টাও স্বাভাবিক। কিন্তু আমাদের দেশে আমরা কি মানুষ বলিয়া বিবেচিত হই?

সাড়ে ছয়টায় ট্রেণ। কিন্তু সহর দেখিব বলিয়া আমরা অপরাহ্নে আহারের পরই শিবির হইতে যাত্রা করিব। সেইরূপ বন্দোবস্ত হইয়া গেল। বাসায় ফিরিয়া আমরা গুদাম হইতে আমাদের বাক্স প্রভৃতি আনাইলাম—সেগুলিতে যে কাদা লাগিয়াছিল, তাহার চিহ্ন তাহাদের বাক্স-জীবনে বোধ হয় কখনও দূর হইবে না!

বেলা দুইটার সময় মোটর-লরীতে মাল তুলিয়া দিয়া আমরা শিবির ত্যাগ করিলাম।

সহরটি ছোট—পুরাতন—খুব সুন্দর বলা যায় না। রাস্তা পাথরের ইট দিয়া বাঁধান। অধিকাংশ বাড়ীই পাথরের। এক একটা রাস্তা অপ্রশস্ত, তাহার দুই দিকে উচ্চ ত্রিতল বাড়ী। এ দেশে এক এক পরিবার এক একটা বাড়ী অধিকার করিয়া থাকে না। আমাদের দেশে সাধারণতঃ

প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ী স্বতন্ত্র। এখন বড় বড় সহরে কেবল স্থানে স্থানে সে নিয়মের ব্যতিক্রম লক্ষিত হয়। কিন্তু ব্যতিক্রম নিয়ম নহে—নিয়মের বিপরীত। সাধারণ দরিদ্র লোক যে বড় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, এমন মনে হয় না। জানালায় ময়লা কাপড়—দুই চারিটা জানালার বাহিরে কার্ণিশের উপর টবে ফুলের গাছ—'ফ্লক্স' বা 'ডালিয়া' ফুটিয়াছে। কোনও কোনও টবে লঙ্কা গাছ—লঙ্কা ফলিয়াছে। এ আমাদের বাঙ্গালার ছোট ছোট সরু লঙ্কা নহে, ভারতবর্ষে সিমলা পাহাড়ে যে রকম বড় বড়—প্রায় বেগুনের মত লঙ্কা তরকারী রূপে ব্যবহৃত হয়, তাহাই। পাকিবার পূর্ব্বে সবুজ—পাকিবার সময় পীত—পাকিলে গাঢ় লোহিত। গাছ যেন ফলের ভারে নত হইয়া পড়িয়াছে—ফল গাছ আলো করিয়া আছে। বাজারে এই লঙ্কা ও বেগুন প্রভৃতি তরকারী দেখিলাম।

পথে একটি স্থানে আমরা সৈনিক কর্ম্মচারীর কার্য্যালয়ে যাইয়া যাত্রার জন্য বিশেষ অনুমতি-পত্রের ব্যবস্থা করিলাম। তিনিও পথে বড় বড় ষ্টেশনে কর্ম্মচারীদিগকে (R. T. O.) টেলিগ্রাফ করিয়া দিবেন, বলিলেন। সেই কার্য্যালয়ে ইটালীর সরকার কর্তৃক প্রকাশিত যুদ্ধের ইতিহাস দেখিলাম। পুস্তকখানি বহু উৎকৃষ্ট চিত্রে সুশোভিত—খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে। ইটালী, ফ্রান্স, ইংলণ্ড—সব দেশেই যুদ্ধের ইতিহাস প্রকাশিত হইয়াছে; জার্ম্মাণীতেও হইয়াছে। কিন্তু কোনটাই সম্পূর্ণ হইতে পারে না। বিশেষতঃ, সমরের সাময়িক উত্তেজনার মধ্যে লিখিত ইতিহাসে জাতির মনের ভাব প্রতিফলিত হইয়া সত্যকে যে রঞ্জিত করে নাই, এমনও মনে হয় না। যুদ্ধের পর যখন ঐতিহাসিক একদেশদর্শিতা পরিহার করিয়া সব দেশে লিখিত ইতিহাস হইতে সযত্নে সত্য সংগ্রহ করিবেন, তখনই এই যুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস লিখিত হইবে—তখনই যুযুধান জাতি সকলের দোষ গুণ প্রকৃতরূপে ভাগ করিয়া দেওয়া সম্ভব হইবে।

রাজপথে যে সব স্ত্রী পুরুষ গতায়াত করিতেছে, তাহাদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত মলিন বর্ণের লোকও অনেক দেখিতে পাওয়া গেল। যুরোপে সাধারণতঃ লোক উজ্জ্বল গৌর বর্ণ; কিন্তু ইটালীর এই অংশেও স্পেনে অপেক্ষাকৃত মলিনবর্ণ লোকেরও অভাব নাই। এই স্থানের লোকের চুল কটা নহে—কাল, চক্ষুও কৃষ্ণতার। স্ত্রীলোকের মাথায় রঙ্গিণ রুমাল—চিবুকের নিম্নে গির দিয়া বাঁধা। রাজপথে যে সব ইতর শ্রেণীর বালক বালিকা ছিন্ন-মলিন-বসনে

খেলা করিতেছিল, তাহারা আয়াঙ্গার মহাশয়ের পাগড়ী দেখিয়া কৌতুকে করতালি দিতে লাগিল—কয়টি বালক তাঁহার গাড়ী লক্ষ্য করিয়া কাদাও ছুড়িয়াছিল। ঘোড়ার গাড়ীতেও পথের দূরত্বজ্ঞাপক 'মিটার' বসান, এবং পথ উচ্চাবচ বলিয়া 'ব্রেক' লাগান।

সহরের রাজপথ ও গৃহগুলি যেমনই কেন হউক না, তাহার সৌন্দর্য্যের অক্ষয় ভাণ্ডার আছে,—তাহা সমুদ্র। যে স্থানে সমুদ্রের জল আসিয়া সহরের পোস্তা-বাঁধান অংশে আঘাত করিতেছে, সে স্থানে সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। চন্দ্রালোক আর সমুদ্র যাহাকে স্পর্শ করে, তাহাকেই সৌন্দর্য্যশ্রী প্রদান করে। সমুদ্রের ধারে রাস্তায় রেলিং দেওয়া—তাহাতে বড় বড় জাল শুকাইতেছে।

এই রাস্তায় ছপ্পরের নিম্নে বসিয়া পশারিণীরা আপেল, পীচ, আঙ্গুর প্রভৃতি ফল বিক্রয় করিতেছে। দেখিলাম, যে পশারিণীর রূপ যৌবনের গর্ব্ব যত অধিক, তাহার দোকানে ফলের দামও তত অধিক। আমরা এক দোকানে ফল দর করিয়া আর দোকানে আসিয়া দেখিলাম, দর বেশী। দোকানে এক জন ইংরাজী-জানা ইটালীয়ান সৈনিক দাঁড়াইয়াছিল; সে আমাদিগকে দোকানীর কথা বুঝাইয়া দিতেছিল। তাহাকে সে কথা বলিলে সে তাহা দোকানীকে বুঝাইয়া দিল। পশারিণী সুন্দরী যুবতী। সে কোনও উত্তর দিল না—কেবল আমাদের দিকে চাহিয়া হাসিল—হাসিতে তাহার পূর্ণ গণ্ডে টোল পড়িল—নয়নে কৌতুক যেন উছলিয়া উঠিল। দেখিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহে'র সেই 'রসিকা পানওয়ালী'র কথা মনে পড়িল। পণ্যের সঙ্গে বিক্রেত্রীর হাসি 'ফাউ'য়ের জন্য জিনিসের দাম চড়া। এ দেশে স্ত্রী পুরুষে একটু হাসিঠাট্টা দোষের নহে। তবে দোষের নহে বলিয়াই সময় সময় শোভন ও অশোভনের মধ্যে সীমারেখাটি অতিক্রান্ত হয়।

ফল কিনিয়া আমরা ষ্টেশনের দিকে চলিলাম। পথে পালে পালে গরু যাইতেছে—দেখিতে পাইলাম। বৃহদাকার—পুষ্টাঙ্গ গবী—দেখিলে চক্ষু জুড়ায়।

ষ্টেশনে আসিয়া দেখিলাম, আমাদের মাল আসিয়াছে; এক জন সৈনিক প্রত্যেক বাক্সে সূতা জড়াইয়া সূতার মুখে সীসের 'সিল' করিয়া দিতেছে। সে বলিল, ইটালীতে রেলে বাক্স পেটরা হইতে মাল চুরী হয় বলিয়া বিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যক।

রাত্রিতে ঘুমাইবার জন্য আমরা 'স্লীপার' গাড়ীর টিকিট কিনিলাম। ভারতবর্ষে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীরা পূর্ব্বে সংবাদ দিলেই রাত্রিকালে

ঘুমাইবার জন্য একখানা করিয়া বেঞ্চ পাইয়া থাকেন। এ দেশে তাহা নহে —প্রত্যেক যাত্রীকে প্রতি রাত্রির জন্য প্রায় ১০৲ টাকা দিতে হয়। তবে তাহাতেই রেল কোম্পানী পরিষ্কার বিছানা, বালিশ ও কম্বল দিয়া থাকেন। স্নানের জন্য তোয়ালেও পাওয়া যায়। বসিবার বেঞ্চের নিম্নে বিছানা বালিশ থাকে—রাত্রিকালে পৃষ্ঠের দিকের হেলান দিবার গদিটা টানিয়া তুলিলে, উপরে ও নিম্নে দুই জনের শুইবার ব্যবস্থা হয়।

টিকিট কিনিয়া মাল রোমে পাঠাইবার উপদেশ দিয়া, ট্রেণ আসিতে বিলম্ব আছে বলিয়া আমরা আবার সহর দেখিতে বাহির হইলাম। কিন্তু বৃষ্টি আরম্ভ হওয়ায় শীঘ্রই ফিরিয়া আসিতে হইল।

পান করিবার জন্য জলের সন্ধান করিলে জানিলাম, জল দুষ্প্রাপ্য—মদ্য সুলভ। এ দেশে টাটকা মদ পিপায় ভরিয়া গাড়ী করিয়া লইয়া যাইতে সর্ব্বদাই দেখা যায়। ষ্টেশনে সেরূপ অনেক প্রকার মদ্য ছিল। এ মদ্যে সুরাসারের ভাগ অতি অল্প বলিয়া অত্যধিকপরিমাণে পান না করিলে মত্ততার সম্ভাবনা নাই। দামও অতি অল্প—বিদেশে শুল্কের জন্যই মদ্যের দাম চড়ে। ষ্টেশনে একটা আহার্য্যের দোকান ছিল; তাহাতে রুটী, মাছ ও জল পাইলাম। রাত্রির আহার তাহাতেই সারিয়া লইয়া যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলাম।

এই ষ্টেশনে আর একটি ব্যাপার দেখিলাম। কয় জন স্ত্রীলোক রেলগাড়ী সাফ করা, ধৌত করা—এই সব কাজ করিতেছে। কিন্তু তখন এই মহাযুদ্ধে য়ুরোপের মহিলাদিগের কার্য্যের স্বরূপ বুঝিতে পারি নাই। বুঝিতে পারি নাই মহিলাদিগের সাহায্য না পাইলে মিত্রশক্তিসমূহ জার্ম্মাণীকে পরাভূত করিতে পারিত না। যত দেখিয়াছি, ততই বিস্ময়ে ও শ্রদ্ধায় অভিভূত হইয়াছি। এই যুদ্ধের সময় য়ুরোপে মহিলারা যে কাজ করিয়াছেন, তাহা স্মরণীয়। ভবিষ্যতে তাহার ফল কি হইবে—তাহাতে সমাজে বিপ্লব হইবে কি না, তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু বর্ত্তমানে যাহা দেখিয়াছি, তাহাতে বুঝিয়াছি, মহিলাদিগের এই যে সাগ্রহ দেশসেবা—ইহা জাতির পক্ষে অমূল্য সম্পদ। আমাদের দেশেও দেশের জন্য মহিলাদিগের স্বার্থত্যাগের ও আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থায় সেই ভাব আবার স্ফুরিত হইতে পারে কি না, বলিতে পারি না। তবে জড়বাদ-দীক্ষিত—বিলাসবিড়ম্বিত য়ুরোপে যদি তাহার বিকাশ সম্ভব হইয়া থাকে, তবে বোধ হয়, ভারতেও তাহার প্রকাশ অসম্ভব হইবে না। আমাদের দেশে স্বদেশী আন্দোলনের সময়—যখন

ভাবের তরঙ্গ আমাদের পরিবারের শক্তিকেন্দ্র অন্তঃপুর স্পর্শ করিতে পাইয়াছিল, তখন মহিলাদিগের মধ্যে যে আগ্রহ, যে উৎসাহ, যে ত্যাগ দেখিয়াছিলাম, তাহা মনে করিলে আশার অবকাশ থাকে ; মনে হয়, জাতি যে দিন দেশাত্মবোধে নবজাগরণের চাঞ্চল্য অনুভব করিবে,সে দিন জাতির শক্তিরূপিণী মহিলাদিগের মধ্যে দেশসেবায় আগ্রহের ত্রুটী লক্ষিত হইবে না।

ট্রেণ আসিলে আমরা আমাদের নির্দ্দিষ্ট কামরা খুঁজিয়া লইলাম। ষ্টেশনে উপস্থিত ইংরাজ সৈনিক কর্ম্মচারী আমাদিগকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া বিদায় লইলেন। সন্ধ্যা প্রায় সাড়ে ছয়টার সময় ট্রেণ ছাড়িয়া দিল। তখন মেঘাচ্ছন্ন আকাশে দিবালোক নিবিয়া গিয়াছে—রাত্রির অন্ধকার চারি দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে। গাড়ীতে বসিয়া বাহিরে প্রকৃতির দৃশ্য আর বহুক্ষণ দেখিতে পাওয়া গেল না।

রাত্রি নয়টার সময় ভৃত্য আসিয়া এক এক কামরায় দুই জনের জন্য বিছানা পাতিয়া দিয়া গেল।

প্রভাতে যখন নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন দেখিলাম, দেশের রূপ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে—ট্রেণের দুই পার্শ্বে কেবল দ্রাক্ষাক্ষেত্র। যে স্থানে পাহাড়, সে স্থানে পাহাড়ের গাত্র কাটিয়া তাহার উপর থাকে থাকে আঙ্গুরের ক্ষেত্র রচিত হইয়াছে। ক্ষেত্রে কত স্ত্রী পুরুষ কাজ করিতেছে— লতা মাচায় তুলিয়া দিতেছে —পক্ব ফল তুলিয়া ঝুড়ীতে ফেলিতেছে—ঝুড়ী বহিয়া লইয়া যাইতেছে—নিম্নে রাস্তায় ঘোড়ার বা খচ্চরের গাড়ীতে বোঝাই দিতেছে। ইটালী দরিদ্র দেশ—পথে দেখিতে পাওয়া যায়, আমাদের দেশেরই মত মেয়েরা নদীতে কাপড় কাচিতেছে, নদী হইতে পানীয় জল সংগ্রহ করিয়া লইয়া যাইতেছে। এ দেশেও কৃষকদিগের ঘোড়ার বা খচ্চরের গাড়ী আছে। আর আমাদের দেশে? আমাদের দেশে কৃষক উদয়াস্ত পরিশ্রম করিয়াও দুই বেলা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না—তাহার পরিশ্রমের ফল মহাজনের সুদ ও জমীদারের খাজনা দিতেই প্রায় সব যায়, মহাজন 'দেড়া পালি'তে অর্থাৎ শতকরা ৫০৲ টাকা সুদে তাহাকে ধান ধার দেয়—কৃষকের খাইবার ধান বা বীজ-ধানও থাকে না, মহাজনের গোলা পূর্ণ হয়। আজ কাল দেশের নানা স্থানে সমবায়-সমিতি গঠিত হইতেছে। কিন্তু তাহাতেও যে আশানুরূপ ফল ফলিতেছে, এমন মনে হয় না। আয়ার্লণ্ডে যে ভাবে কাজ হইয়াছে, এবং হইতেছে, দেশের লোকের চেষ্টায় সেই ভাবে কাজ হইলে, বোধ হয়, ফল ভাল হইবে। গাড়ীতে পিপা পিপা মদ বাহিত হইতেছে।

আকাশ রবিকরে উজ্জ্বল—দ্রাক্ষাক্ষেত্রে রবির স্বর্ণকিরণ ছড়াইয়া পড়িয়াছে —কাল ও সাদা দুই জাতীয় আঙ্গুর গুচ্ছে গুচ্ছে ফলিয়া আছে। ক্ষেত্রে কৃষি-কার্য্যের জন্য গরু ব্যবহৃত হইতেছে। গরুগুলি বৃহদাকার—অপর্য্যাপ্ত আহারে শীর্ণ, ক্ষুদ্রকায় বাঙ্গালার গরুর মত নহে। জীবমাত্রই পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপযোগী হয়—বাঙ্গালার গবাদি পশু দেখিলেই দেশের অবস্থা বুঝিতে পারা যায়।

ষ্টেশনে বসিয়া খাইবার ঘর নাই—ঘরে খাবার ও ফল বিক্রয় হয়; আর প্ল্যাটফর্ম্মেই ছোট, বড়, মাঝারী কাগজের ঠোঙ্গায় মাছ, মাংস, রুটী ও একটা ছোট বোতলে মদ বিক্রয় হয়। দামও কম। সেগুলির মধ্যে ভাজা বড় বড় চিংড়িমাছ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ষ্টেশনে চা দুষ্প্রাপ্য। কোকো পাওয়া যায়। পীচ, পেয়ার, আঙ্গুর, ফিগ প্রভৃতি ফলও বিক্রীত হয়। মাঠে অলিভ গাছ। বড় বড় ষ্টেশনে কর্ম্মচারীরা আসিয়া আমাদের খোঁজ লইতে লাগিলেন। ট্রেণে গাড়ীতে মাছির বাহুল্য।

মধ্যাহ্নে আমরা রোমে উপনীত হইলাম, এবং গ্রাণ্ড কণ্টিনেণ্টাল হোটেলে আহারাদি করিয়া সহর দেখিয়া রাত্রি সাড়ে নয়টার গাড়ীতে আবার রওনা হইলাম।

প্রভাতে যে দৃশ্য নয়নগোচর হইল, তাহা আমি জীবনে কখনও বিস্মৃত হইতে পারিব না। একটা পাহাড়ের মধ্য দিয়া সুড়ঙ্গ করা হইয়াছে, সুড়ঙ্গের বাহিরে আসিয়াই রেল লাইন একেবারে সমুদ্রের ধার দিয়া চলিল—দেখিলে মনে হয়, তরঙ্গের জলোচ্ছ্বাস বুঝি গাড়ীর মধ্যে আসিবে। স্থানে স্থানে লাইন একেবারে সমুদ্রকূলে—স্থানে স্থানে লাইন ও জল উভয়ের মধ্যে বেলাবালুবিস্তার। বেলাবালুর উপর কোথাও কোথাও দুই একখানি নৌকা। কোথাও পর্ব্বত কাটিয়া লাইন পাতা—লাইনের দুই পার্শ্বে পর্ব্বতপ্রাচীর। কোথাও সুড়ঙ্গ—সুড়ঙ্গের পর সুড়ঙ্গ। বেলা সাড়ে দশটার সময় আমরা জেনোয়ায় পঁহুছিলাম, R. T. O. আসিয়া আমাদের সন্ধান লইয়া গেলেন।

স্থানে স্থানে ক্ষেত্র ও গো-চর দৃষ্ট হইতে লাগিল। হাঁস, মুরগী অধিক দেখিতে পাইলাম না। গোচরে গরু ও ভেড়াই অধিক—ফ্রান্সের সীমান্তে উপনীত হইবার পূর্ব্বে ছাগও অধিক দেখিতে পাই নাই। ক্ষেত্রে টোমাটো, লাউ ও কুমড়া ফলিয়াছে। দেখিলাম, ক্ষেত্রে সার দিবার ব্যবস্থা আছে। এই স্থান হইতে তুঁত গাছ দৃষ্ট হইতে লাগিল। আর কিছু দূর অগ্রসর হইলে পপ্‌লারও দেখিতে পাইলাম। তুঁত গাছের পাতায় রেশমের কীট পুষ্ট হয়।

দেখিলাম, এ দেশে লোক যে গাছ রোপণ করে, সেও সৌন্দর্য্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া; যেখানে সেখানে যেমন তেমন করিয়া গাছ পুতে নাই।

ট্রেণ হইতে দেখিয়া মনে হয়, এ দেশে অধিক পাখীও নাই।

সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার সময় মোদেনে পঁহুছিলাম। ইহা ফরাসী সীমান্তে অবস্থিত। এই স্থানে যাত্রীদিগের দ্রব্যাদি দেখা হয়। আমাদের ছাড় দেখিয়া আমরা বৃটিশ সরকারের নিমন্ত্রণে যাইতেছি বলিয়া আমাদের বাক্স ব্যাগ খুলা হইল না। মোদেনের একটু আগেই একটি বিরাট সুড়ঙ্গ—প্রায় ৮ মাইল দীর্ঘ—বিস্তারে ২৫ ফিট সাড়ে তিন ইঞ্চ, এবং উচ্চে ২৪ ফিট হইতে সাড়ে পঁচিশ ফিট। প্রায় দেড় কোটী টাকা ব্যয়ে ১৩ বৎসর ৩ মাসে এই সুড়ঙ্গ গঠন শেষ হয়। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে সুড়ঙ্গে ট্রেণ চলিতে আরম্ভ হয়।

ইটালীতে আমরা বিদ্যুতের শক্তিতে বড় বড় ট্রেণ চালিত হইতে দেখিয়াছিলাম। ছোট ছোট ট্রেণ প্রায় সবই বিদ্যুতের দ্বারা চালিত—স্থানে স্থানে বড় বড় ট্রেণ হইতে এঞ্জিন খুলিয়া লইয়া বিদ্যুৎ ব্যবহার করা হয়। ইহাতে অনেক সুবিধা—এঞ্জিনের হাঙ্গামা কমিলে ট্রেণের সংখ্যা বাড়ান যায়। কলিকাতার কাছে—অন্ততঃ ৫০ মাইল পর্য্যন্ত লোকাল ট্রেণগুলি যদি এইরূপে চালাইবার ব্যবস্থা হয়, তবে যাত্রীদিগের অনেক অসুবিধা দূর হয়, ঘন ঘন ট্রেণ পাওয়া যায়—লোক গ্রামে বাস করিয়া অনায়াসে কলিকাতায় কাজ করিয়া যাইতে পারে। তাহাতে যে লোকের স্বাস্থ্যেরও উন্নতি হয়, তাহা বলা বাহুল্য। সংপ্রতি কলিকাতার কাছে বিদ্যুতের শক্তিতে ট্রেণ চালাইবার প্রস্তাব হইয়াছে বটে, কিন্তু সে প্রস্তাবের কি হইবে, বলিতে পারি না।

মোদেনে ঘড়ী এক ঘণ্টা পিছাইয়া লইতে হয়।

মোদেনে এক জন ইংরাজ সৈনিক কর্ম্মচারী আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনারা ভারতবর্ষ হইতে আসিতেছেন?' আমি বলিলাম, 'হাঁ।' তিনি বলিলেন, 'কেন বিলাতে যাইতেছেন—জিজ্ঞাসা করিতে পারি?' আমি বলিলাম, 'আমরা ভারতের সংবাদপত্রের প্রতিনিধি—সংবাদ সরবরাহ বিভাগের নিমন্ত্রণে যাইতেছি।' তিনি বলিলেন, 'আপনাদের মধ্যে যিনি রাজপুত্র, তিনিও কি সংবাদপত্র-সেবক?' আমি বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া বলিলাম, 'সে কি? আমরা সবাই যে ভবঘুরে।' তিনি অদূরে দণ্ডায়মান আয়াঙ্গার মহাশয়ের পরিচারক দোরাস্বামীকে দেখাইয়া দিলেন। দোরাস্বামীর পাগড়ীতে জরীর পাড় ছিল, তাই তিনি তাহাকে রাজপুত্র বলিয়া মনে করিয়াছিলেন!

মোদেনে ষ্টেশনে আহারের ব্যবস্থা খুব ভাল মনে হইল।

রাত্রি সাড়ে আটটার পর ট্রেণ ছাড়িল।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর পত্র।

স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের সঙ্গে আমার অনেকবার পত্রালাপ হইয়াছিল; তন্মধ্যে কেবল তিনখানি চিঠি খুঁজিয়া পাওয়া গেল, অপরগুলি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এই তিনখানিই প্রকাশিত করিয়া স্বর্গীয় মহাত্মার স্মৃতির উদ্দেশে দুই একটি কথা বলিয়া কৃতার্থম্মন্য হইতেছি।

যে চিঠির উত্তরে রামেন্দ্র বাবু ১ম পত্রখানি লিখিয়াছিলেন, তাহাই বোধ হয় তাঁহার নিকটে আমার প্রথম চিঠি। তখন পর্য্যন্ত তাঁহার সঙ্গে আমার দেখাও হয় নাই—সাহিত্য-পরিষদেও কোনও প্রবন্ধ পাঠাই নাই। অর্থাৎ, আমি নিতান্তই অপরিচিত ছিলাম, এবং ভয়ে ভয়ে তাঁহার কাছে পরিষৎ-সংক্রান্ত কয়েকটি বিষয় জানাইয়াছিলাম। বিষয়গুলি কি ছিল, তাহা পত্র-পাঠেই ব্যক্ত হইবে, এ স্থলে তাহার উল্লেখ বাহুল্যমাত্র। পত্রখানি হইতে পরিষদের প্রথম অবস্থার না হউক, মধ্য অবস্থার অনেক কথা জানা যাইবে। কিন্তু রামেন্দ্রসুন্দর যে কি গুণে 'অজাতশত্রু' ছিলেন—তাঁহার আমায়িকতায় বিরুদ্ধ সমালোচকও কিরূপে বশীকৃত হইতেন, তাহাই বিশেষ ভাবে লক্ষিত হইবে; এবং সেই জন্য এই ক্ষুদ্রের প্রতি তিনি যে সকল প্রশংসা-বাক্য ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা বাদ দেওয়া সমুচিত হইলেও, অব্যাহত রাখা গেল। নিতান্ত নগণ্যকেও যিনি এইরূপে বাড়াইয়া 'আপনার' করিয়া লইতে পারেন, তিনিই প্রকৃত মহাত্মা।

১ম পত্র।

শ্রীশ্রীহরি

৬ উইলিয়ম লেন

২৪শে মাঘ [১৩১২] *

সবিনয় নিবেদন

শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ মহাশয়ের ১০ই মাঘ তারিখের পত্রের উত্তর দিতে যে বিলম্ব ঘটিল, তজ্জন্য ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন। শয্যাগত অবস্থাতে বাসায় বসিয়া পত্রের উত্তর দিতেছি, এখনও কার্য্যালয়ে যাইতে পারি না।

* [ ] মধ্যে যাহা দেখা যাইবে, তাহা মূল পত্রে ছিল না—বোধসৌকর্য্যের জন্য সন্নিবিষ্ট হইল।

দূর মফস্বল হইতে আপনি যে পরিষদের কার্য্যে এরূপ শ্রদ্ধা ও আগ্রহ দেখাইয়াছেন ও কার্য্যের শৃঙ্খলা-স্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছেন, তজ্জন্য আপনাকে ধন্যবাদ দেওয়া পূর্ব্বে কর্ত্তব্য বোধ করিতেছি। মফস্বলের সভ্যগণের নিকট হইতে এরূপ প্রস্তাব ও চিঠিপত্র পাইলে আমরা বড়ই উৎসাহিত হই। তাঁহাদের ঔদাসীন্যই আমাদিগকে ব্যথিত করে।

পত্রিকা-প্রকাশে ও কার্য্যবিবরণী-প্রকাশে অযথা বিলম্বের জন্য যে অনুযোগ করিয়াছেন, প্রথমে তাহার কৈফিয়ৎ দিতেছি।

পরিষদের নিজের ছাপাখানা নাই, পত্রিকার সম্পাদক ও লেখকগণকে কোন পারিশ্রমিক দিবার ক্ষমতা নাই; সর্ব্বতোভাবে তাঁহাদের অনুগ্রহে নির্ভর করিয়া চলিতে হয়।

সম্পাদক মহাশয়ও নানা কার্য্যে ব্যস্ত; এরূপ অবস্থায় [পত্রিকার] বিলম্বে প্রকাশ অনিবার্য্য। অনেক সময়ে প্রকাশযোগ্য প্রবন্ধের অভাবে প্রকাশে বিলম্ব ঘটে। পরিষৎ-পত্রিকায় সকল শ্রেণীর প্রবন্ধ বাহির হয় না। উহাতে ভাষাতত্ত্ব, সাহিত্যের ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব প্রভৃতি বিশিষ্ট প্রবন্ধই বাহির হইয়া থাকে; দুর্ভাগ্যক্রমে ঐ শ্রেণীর প্রবন্ধের লেখক বিরল; কাজেই বিলম্ব অনিবার্য্য। পরিষৎ-পত্রিকা স্থূলতঃ Journal of the Asiatic Societyর অনুরূপ; মৌলিক অনুসন্ধানমূলক কাজের প্রবন্ধ ভিন্ন অন্য প্রবন্ধ উহাতে স্থান দেওয়ার নিয়ম নাই।

পরিষদের মাসিক অধিবেশনে নানাজাতীয় প্রবন্ধ পঠিত ও আলোচিত হয়; পত্রিকার ক্ষেত্র তদপেক্ষা সংকীর্ণ; ঐ সকল প্রবন্ধ অন্য হিসাবে মূল্যবান্ ও কৌতুককর ও শিক্ষাপ্রদ হইলেও পত্রিকার উপযোগী বলিয়া বিবেচিত হয় না। আবার লেখকেরা পূর্ব্ব হইতে অন্য মাসিকপত্রে প্রকাশের জন্য প্রতিশ্রুত থাকিলে উঁহাদিগকে বাধ্য করা যায় না। এ বিষয়ে লেখকদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিতে গেলে প্রবন্ধ আদৌ না জুটিতে পারে। সেই জন্য অধিবেশনে পঠিত অনেক প্রবন্ধ অন্য পত্রিকায় বাহির হয় [পরিষৎ] পত্রিকায় বাহির হয় না।

এই সকল অনিবার্য্য কারণে পত্রিকা যথাসময়ে প্রকাশ হয় না। তথাপি পরিষৎ আজি বার বৎসর কাল প্রতি বর্ষে চারিখানি পত্রিকা ও কোন কোন বৎসর অতিরিক্ত সংখ্যা পর্য্যন্ত বাহির করিয়া আসিয়াছেন। এ বিষয়ে পরিষদের এ পর্য্যন্ত ত্রুটী হয় নাই। অত বড় Asiatic Societyও তাঁহাদের

Journal যথাসময়ে বাহির করিতে পারেন না, ও প্রবন্ধাভাবে কোন কোন বৎসর চারি সংখ্যার স্থলে দুই সংখ্যা মাত্র প্রকাশ করিয়া নিরস্ত হইতে বাধ্য হইয়াছেন। অবস্থা-বিবেচনায় এ বিষয়ে ক্ষমা করিবেন।

এ বৎসর দ্বিতীয় সংখ্যা পত্রিকা প্রকাশে বহু বিলম্বের বিশেষ কারণ আছে। স্বদেশী আন্দোলনে পরিষৎ-সম্পর্কীয় সকলেই (যাঁহারা পরিষদের জন্য পরিশ্রম করেন তাঁহাদেরই কথা বলিতেছি) ব্যস্ত থাকা অন্যতর কারণ। ভবিষ্যতে এত বিলম্ব ঘটিবে না। তৃতীয় সংখ্যা শীঘ্রই প্রকাশ হইবে।

কার্য্যবিবরণী-প্রকাশেরও বিলম্বের কারণ আছে। আমি সম্পাদকতা-গ্রহণের পূর্ব্বে এক বৎসরের অধিক কাল কার্য্যবিবরণী অপ্রকাশিত ছিল। গত বৎসর সেই বাকির জের শেষ করিয়া ১৩১১ সালের মাঘ পর্য্যন্ত বাহির করিয়াছিলাম। এ বৎসর দ্বিতীয় সংখ্যায় ১৮ই ভাদ্র পর্য্যন্ত বাহির করিয়াছি। তার পর আর সম্ভব হয় নাই। কোন মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পরবর্ত্তী অধিবেশনে অনুমোদিত (confirmed) না হইলে উহা প্রকাশযোগ্য হয় না। ১৮ই ভাদ্রের স্থগিত অধিবেশন ১লা আশ্বিনে ঘটে। তার পর পূজার ছুটী উপলক্ষে এক মাসের অধিবেশন বাদ থাকে। অগ্রহায়ণ মাসে ঐ ১লা আশ্বিনের অধিবেশন অনুমোদিত হইয়াছিল। তখন পত্রিকার কাপি ছাপাখানায়। ছাপাখানার ঝঞ্ঝাটে উহা প্রকাশে আরও বিলম্ব হইল।

বিলম্বে নিমন্ত্রণপত্র প্রাপ্তির সম্বন্ধে যে অনুযোগ করিয়াছেন, তাহার ক্রটী স্বীকার্য্য কিন্তু নিবারণ কঠিন। কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির নির্দ্দেশে মাসিক অধিবেশনের কার্য্য স্থির হয়, সম্পাদকের ইহাতে কর্ত্তৃত্ব নাই। ঐ সমিতি অনেক সময় সপ্তাহমাত্র পূর্ব্বে কার্য্য নির্দ্দেশ করেন। তৎপরে চিঠি ছাপাইয়া বিলি করিতে গেলে কাজেই মফস্বলে পৌঁছিতে বিলম্ব হয়। সপ্তাহের বেশী সময় লইতে গেলে আবার মাসের মধ্যে অধিবেশন ঘটে না ; কাঃ নিঃ সমিতি পূর্ব্বে আহ্বান করিলে কোরম (quorum) হয় না।

মফস্বলের সভ্যদিগকে নিমন্ত্রণপত্র পাঠানটা কেবল form মাত্র, তাঁহারা যে কেহ সভায় আসিবেন, তাহার আশা থাকে না। কাজেই এ বিষয়ে ক্রটীতে বিশেষ ক্ষতি হয় না।

মফস্বলবাসী সভ্যেরা অবশ্য অনুযোগ করিতে পারেন, আমরা অধিবেশনে উপস্থিত হইতে পারি না, সময়ে নিমন্ত্রণ পর্য্যন্ত পাই না, আমাদের তবে পরিষদের প্রতি আকর্ষণ থাকিবে কিরূপে? কথাটা সত্য। একমাত্র পরিষৎ-

পত্রিকা ও প্রাচীন গ্রন্থ লইয়া আমরা মফস্বলের সভ্যদের অনুগ্রহপ্রার্থী হই। বৎসরে অন্ততঃ চারি সংখ্যা পত্রিকা ও বিনামূল্যে প্রকাশিতব্য প্রাচীন গ্রন্থের বিনিময়ে আমরা মফস্বলের সভ্যদের শ্রদ্ধা ও দয়া ভিক্ষা করি। কিন্তু মফস্বলের অধিকাংশ সভ্য যেরূপ নির্দ্দয়, তাহা একবার কার্য্যালয়ে আসিয়া বাকি চাঁদার খাতা দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন, এবং তাঁহাদের এই নিষ্ঠুরতা সত্ত্বেও যে পরিষৎ বার বৎসর কাল জীবন ধারণ করিয়া এতগুলি পত্রিকা ও এতগুলি প্রাচীন গ্রন্থ প্রকাশে ও সভ্যগণের হস্তে সমর্পণে সমর্থ হইয়াছে, ইহাতেই বিস্মিত হইবেন। সভ্যের অনুগ্রহেই পরিষদের জীবন। অধিকাংশ সভ্য যদি উদাসীন না হইয়া মহাশয়ের মত পরিষদের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হন, ও দেয় চাঁদাটি অন্ততঃ বৎসরমধ্যে প্রেরণ করেন, ছয় সাত বৎসর বাকী না রাখেন, তাহা হইলে পরিষদের বর্ত্তমান সমস্ত ত্রুটী নিবারিত হইতে পারে। পরিষদের নানা ত্রুটী, সে বিষয়ে সংশয় নাই। জনকয়েক লোক মাত্র আপনাদের সময় ও শক্তি অর্পণ করিয়া পরিষদের সেবায় নিযুক্ত আছেন, তাঁহাদের আন্তরিক যত্নে ও পরিশ্রমেই পরিষৎ যৎকিঞ্চিৎ সফলতা লাভ করিয়াছে। সাধারণ সভ্যগণের দয়ার মাত্রা আরও বৃদ্ধি না পাইলে ইহা অপেক্ষা অধিক আশা করিতে পারেন না।

পত্রিকার কলেবর বৃদ্ধি করিবার ইচ্ছা আমাদের অনেক দিন হইতেই আছে। কেবল অর্থাভাবে ও প্রবন্ধাভাবে তাহা ঘটিতেছে না। উহা মাসিকে পরিণত করিবার সময় উপস্থিত হয় নাই, মাসিকে পরিণত করিলে উহা অন্যান্য মাসিকের দশা পাইবে। আপনি পরিষদের হিতার্থে যে প্রস্তাবের অবতারণা করিয়াছেন, তাহা সমস্তই যৌক্তিক বলিয়া স্বীকার করি। কিন্তু পরিষদের বর্ত্তমান অবস্থায় ও বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি দেশের লোকের বর্ত্তমান ঔদাসীন্য সত্ত্বে আমরা কেবল আপনাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়াই নিরস্ত হইতে বাধ্য হইব। আপনার মহৎ সঙ্কল্প সিদ্ধিতে পরিণতির ভরসা করি না।

আপনার মত আরো সভ্য বিধাতা আমাদিগকে দিন, ক্রমে সকল ত্রুটী নিরাকরণে সমর্থ হইব।

বিনীত

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

পরিষৎ-সম্পাদক।

এই চিঠিখানি পাইয়া যে পরিষৎসংক্রান্ত আরও দু' একটি বিষয়ে মধ্যে

মধ্যে ত্রিবেদী মহাশয়কে—তখন তাঁহার দক্ষিণহস্তস্বরূপ ৺ব্যোমকেশ মুস্তোফী মহাশয়কে * চিঠি দিতে উৎসাহিত হইয়াছিলাম, এ কথা বলাই বাহুল্য। সেগুলির উত্তর যখন হাতে নাই, তখন ঐ সকলের বিষয়ীভূত কথার উল্লেখ বা আলোচনা এ স্থলে করিব না। তবে একটি বিষয়ের উল্লেখ প্রয়োজনীয় মনে করিতেছি। ৺রামেন্দ্রবাবু প্রকারান্তরে পরিষৎকে "এসিয়াটিক সোসাইটী"র সঙ্গে তুলনা করিয়াছিলেন। আমি তাই লিখিয়াছিলাম যে, এসিয়াটিক সোসাইটীর সভ্য হইয়া লোকে নিজকে যেরূপ গৌরবান্বিত মনে করে—কেহ কেহ যেমন (তদানীং) "M. A. S. B." লিখিয়া শ্লাঘ্যম্মন্য হয়, পরিষদের সভ্য হওয়াটাও যাহাতে তাদৃশ গৌরবজনক হয়, তাহার বিধান করা কর্ত্তব্য। তদর্থে প্রস্তাব করিয়াছিলাম যে, পরিষদের সভ্য হইবার জন্য আবেদনের বা প্রস্তাবের সময়ে দেখাইতে হইবে যে, মনোনেতব্য সভ্য বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যে লব্ধপ্রবেশ এবং এই ভাষায় দু' একটি সারবান্ প্রবন্ধ লিখিয়া সভ্য হইবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়াছেন। অপিচ, এইরূপে নির্ব্বাচিত সভ্যগণ যেন একটি উপাধি-পত্র (ডিপ্লোমা) প্রাপ্ত হন—ঐ উপাধিটি "পারিষদ" অথবা 'সাহিত্যবিশারদ' বা এতাদৃশ একটা কিছু হউক, এইরূপও প্রস্তাব করিয়াছিলাম। উত্তর কি পাইয়াছিলাম, স্মরণ নাই। তখনও পরিষদের ঐরূপ করিবার ক্ষমতা হয় নাই, ঈদৃশ ভাবের কথাই বোধ হয় উত্তরে ছিল।

সে যাহা হউক, ১৩১৫ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে রাজসাহীতে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনে ৺রামেন্দ্র বাবুর সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় হয়। পত্রাদি হইতে তাঁহার সম্বন্ধে যেরূপ ধারণা জন্মিয়াছিল, সাক্ষাৎকার আলাপ পরিচয়ে তাহা যে কেবল বদ্ধমূল হইয়াছিল, এরূপ নহে ; বরং ঐ মানুষটি যে দৃষ্টিতে পক্ককেশ স্থবির, কর্ম্মে উৎসাহী যুবক, এবং ব্যবহারে সরলপ্রাণ শিশু, এইরূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম। এক দিকে গুরুগম্ভীর পণ্ডিত, অন্য দিকে সরস, সদালাপী সামাজিক, এমন ব্যক্তি শ্রদ্ধা ও আদরের পাত্র না হইয়া যান না। ফলতঃ ত্রিবেদী মহাশয়ের ন্যায় লোক আজ কাল অতি বিরল।

অতঃপর কলিকাতায় কার্য্যোপলক্ষে গেলে রামেন্দ্র বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎকার না করিয়া আসিতাম না। ইহাতে চিঠি লিখিবার প্রয়োজনীয়তা অনেকটা

---

* ঐ আর একটি সোনার মানুষ। অতীব পরিতাপের বিষয় যে, ৺ব্যোমকেশ বাবুর একখানিও চিঠি আমার কাগজপত্র মধ্যে পাওয়া গেল না। হায় রে, "প্রাণ দিয়া" খাটিবার লোক এমনটি তো আর দেখি না। ইঁহার কথা স্মরণ হইলে আজও চক্ষে জল আইসে।

কমিয়া যায়, আলাপপ্রসঙ্গেই নানা বিষয়ের আলোচনা হইত। কিন্তু যখন মহাকবি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের অভিনন্দন লইয়া কলিকাতার পত্রিকাদিতে আলোচনা হয়, তখন প্রকৃত ব্যাপারটা কি জানিবার জন্য, এবং যাহা অভিনব অথচ সর্ব্ববাদিসম্মত নহে, তাহাতে প্রবৃত্ত না হওয়াই উচিত ছিল, এইরূপ লিখি। তদুত্তরে '২য় পত্র'খানি পাই।

২য় পত্র।

১২ পার্শিবাগান লেন, কলিকাতা
২০শে মাঘ, ১৩১৮।

সবিনয় নমস্কার নিবেদন

আপনার পত্র পাইয়া আনন্দলাভ করিলাম। (রবীন্দ্র-সম্বর্দ্ধনার বিবরণ সংবাদপত্রে বাহির হইয়াছে, তৎসহিত অভিনন্দনপত্রখানিও প্রকাশিত হইয়াছে। এই পত্রপাঠে দেখিবেন, রবীন্দ্র বাবুর পঞ্চাশ বর্ষ বয়স পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে তাঁহার বহু বৎসরের সাহিত্যসেবার উপলক্ষ করিয়া [পরিষৎ] দীর্ঘায়ু কামনা করিয়াছেন মাত্র ; কোনরূপ রাজ্যে বা সাম্রাজ্যে অভিষেক করেন নাই, কোনরূপ পদবী দেন নাই, বা সাহিত্যক্ষেত্রে অন্যের সহিত তুলনা করিয়া তাঁহার স্থাননির্দ্দেশের বা পদবীপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন নাই।) রবীন্দ্র বাবুর সাহিত্যক্ষেত্রে স্থান লইয়া মতভেদ আছে ও চিরকাল থাকিবে ; সাহিত্য-পরিষৎ সে বিষয়ে কোনরূপ মত প্রকাশ করিয়া ধৃষ্টতা দেখাইবেন না, বা দেখান নাই। তবে তিনি বহু বৎসর সাহিত্যের উপকার করিয়াছেন, সেই উপকারের পরিমাণও সামান্য নহে, এ বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই ; কাজেই একটা উপলক্ষ পাইয়া তাঁহার প্রতি কিঞ্চিৎ সম্মান প্রদর্শন করায় পরিষদের কোনরূপ অপরাধ হইয়াছে বলা উচিত নহে। অন্যান্য সাহিত্য-সেবক ও সাহিত্য-অনুগ্রাহকগণকেও পরিষৎ এইরূপে যথাযোগ্য ও যথাসাধ্য সম্মান-প্রদর্শনে চিরকাল প্রস্তুত আছেন ও থাকিবেন। তাহার নজিরও আছে। বহুদিন পূর্ব্বে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষতা-প্রাপ্তি উপলক্ষে তাঁহার সম্মানার্থ বিশেষ উৎসব হইয়াছিল। পরিষদের সভাপতি সারদাচরণ মিত্র হাইকোর্টের বিচারপতির পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিলে তাঁহাকে অভিনন্দন দেওয়া হইয়াছিল। পরিষদের শৈশবে বিদেশী পণ্ডিত বেণ্ডাল সাহেব পরিষদে উপস্থিত হইলে তাঁহার সম্মানার্থ উৎসব অনুষ্ঠান হয়। সেবার পরিষদের স্থাপনকর্ত্তা ৺রমেশচন্দ্র দত্ত কলিকাতা আসিলে

তাঁহার সম্বর্দ্ধনার ব্যবস্থা হয়। সম্প্রতি বিশ্বকোষ-গ্রন্থ-সমাপ্তি উপলক্ষে বিশ্ব-কোষ-সম্পাদক নগেন্দ্র বাবুর প্রতি সম্মানপ্রদর্শনের প্রস্তাব উপস্থিত আছে। পূর্ব্বতন 'সাহিত্যরথী'দিগেরও সম্মানার্থ পরিষৎ যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। ৺কালীপ্রসন্ন ঘোষ কলিকাতা আসিলে পরিষৎ তাঁহার যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করেন। বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রভৃতির জীবদ্দশায় পরিষৎ তাঁহাদের প্রতি যথোচিত সম্মান দেখাইবার অবসর পান নাই; কেন না, বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্রের জীবদ্দশায় পরিষদের অস্তিত্ব ছিল না— হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের জীবদ্দশায় পরিষদের তাদৃশ সামর্থ্য ছিল না। তথাপি হেমচন্দ্রের শেষ বয়সে অর্থকষ্টনিবারণের জন্য পরিষৎ যথোচিত চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার মর্ম্মরমূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন ও বার্ষিক বৃত্তি স্থাপন করিয়াছেন। ৺নবীনচন্দ্রের মর্ম্মরমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা পরিষৎ-মন্দিরে শীঘ্র হইবে। বিদ্যাসাগরের বহু যত্নের লাইব্রেরিটি যখন নিলামে চড়িয়া বাঙ্গালীর দুই গালে চূণ কালি মাখাইবার উপক্রম করিয়াছিল, পরিষৎ তখন মাঝে পড়িয়া ঐ লাইব্রেরিটি রক্ষা করিয়াছেন, ও উহা পরিষৎ-মন্দিরে সযত্নে রক্ষিত হইয়া বিদ্যাসাগরের জীবন্ত মূর্ত্তিস্বরূপে সাধারণের সম্মুখে রহিয়াছে।

অতএব, রবীন্দ্রনাথের প্রতি সবিশেষ পক্ষপাত করিয়া সাহিত্য-পরিষৎ একটা অপূর্ব্ব অন্যায় কাজ করিয়াছেন, তাহা বলা চলে না।

অপিচ এই অনুষ্ঠানে পরিষদের এক পয়সা ব্যয় করিতে হয় নাই। বঙ্গের মান্যগণ্য কতিপয় ব্যক্তি একটি সম্বর্দ্ধনার কমিটি স্থাপন করিয়া কয়েক সহস্র টাকা চাঁদা তুলিয়াছিলেন। এই চাঁদা সর্ব্বসাধারণের নিকট তোলা হয় নাই; তাঁহাদের নিজেরাই ও বন্ধুবান্ধবদের নিকট তোলা হয়। পরিষৎকে বাঙ্গালা শিক্ষিত-সমাজের মুখপাত্র করিয়া তাঁহারা পরিষৎকে এই অনুষ্ঠানের ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। পরিষৎ সেই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা উচিত বোধ করেন নাই। সেই সংগৃহীত অর্থের কিয়দংশমাত্র এই অনুষ্ঠানে ব্যয় করা হইয়াছে। অবশিষ্ট অংশ সাহিত্যের কোনরূপ স্থায়ী উপকারের জন্য পরিষদের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। এখনও হিসাব শেষ হয় নাই; সম্ভবতঃ অন্যূন সাত হাজার টাকা এইরূপে সাহিত্যের স্থায়ী উপকারার্থ পরিষদের হস্তে ন্যস্ত হইবে। পরিষদের হিতৈষীমাত্রই এই সংবাদ পাইলে আনন্দিত হইবেন সন্দেহমাত্র নাই।

আমাদের কতিপয় শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু কেন যে কলিকাতায় থাকিয়াও ও সমুদয়

তথ্য জানিয়াও এই কবি-সম্বর্দ্ধনা ব্যাপারে এতটা আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহা আমাদের বোধগম্য নহে। মফস্বলবাসীরা দূরে থাকেন, সকল তথ্য জানিতে পারেন না; তাঁহাদের মনে নানারূপ আশঙ্কা হওয়া সঙ্গত বটে, কিন্তু যাঁহারা কলিকাতায় আছেন ও অন্তরঙ্গরূপে আমাদের সহিত কাজ করেন, তাঁহারা যে কেন এইরূপ অমূলক আশঙ্কা ও অভিযোগ করেন, বুঝি না।

হুগলীর সাহিত্য-সম্মিলনে আপনার সাক্ষাৎ পাইব, এই আশাতে আছি। তখন অনেক কথা বুঝাইবার ও জানাইবার অবসর পাইব। আমরা যথাসাধ্য কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া যাইতেছি—তবে বুদ্ধির দোষে, বিবেচনার দোষে, সামর্থ্যের অভাবে, অবকাশের অভাবে আমাদের নানা ত্রুটী, নানা অপরাধ ঘটিয়া থাকে ও ঘটিতে পারে। এবং যেখানে বহুমতাবলম্বী বহু লোকের সঙ্গে একযোগে কাজ করিতে হয়, সেখানে কোন কাজই সর্ব্ববাদিসম্মত হয় না। এই সকল বিবেচনা করিয়া আমাদের ত্রুটী ও অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। যেখানে ত্রুটী দেখিবেন, সেখানে আমাদের চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিবেন। আপনাদের মত বন্ধুর পরামর্শ ও উপদেশ আমরা সর্ব্বদা শিরোধার্য্য করিব। তথাপি ত্রুটী পদে পদে ঘটিবে। দেশের অবস্থা বুঝিয়া তাহা ক্ষমা করিবেন ও সহিয়া লইবেন।

প্রদর্শনী উপলক্ষে পরিষদের কার্য্যালয় এক মাসের উপর এক রকম বন্ধ আছে। আপনার প্রেরিত পুস্তকগুলির কোন সন্ধান লইতে বা ব্যবস্থা করিতে পারি নাই। আমি নিজে অসুস্থ হইয়া এক মাস কলিকাতার বাহিরে ছিলাম। সম্প্রতি ফিরিয়াছি।

আপনার কুশলপ্রার্থী

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

কিছুদিন পরেই চুঁচুড়ায় সাহিত্য-সম্মিলন উপলক্ষে দেখা হয়—তখন এই বিষয়ে আরও আলাপ হইয়াছিল, এবং অতঃপর আর ঐ সম্বন্ধে কোনও আলোচনা হয় নাই। চুঁচুড়ার পরে চট্টগ্রামে সাহিত্য-সম্মিলন হয়—তার পর কলিকাতায় হয়। কলিকাতার সাহিত্য-সম্মিলনে কে সভাপতি হইবেন, এ বিষয়ে একটু কল্পনা জল্পনা ইত্যাদি হয়। আমিও এক জনের নাম রামেন্দ্র বাবুর নিকটে লিখিয়া পাঠাইয়াছিলাম—ইনি শ্রীযুক্ত মৌলবী আব্দুল করিম বি. এ. (অধুনা পেন্সন্‌প্রাপ্ত) স্কুল-ইন্‌স্পেক্‌টার। সে সময়ে উচ্চশিক্ষিত মোসলমানগণ কদাচিৎ কেহ বঙ্গভাষার চর্চ্চা করিতেন—তখন মৌলবী আব্দুল করিম

সাহেব মৌলিক গবেষণা পূর্ব্বক "নব্যভারতে" খলিফাদের ইতিবৃত্ত লিখিয়াছিলেন। বাঙ্গালা, ইংরেজী ও উর্দ্দুতে স্কুলপাঠ্য অনেক গ্রন্থ লিখিয়াও যশস্বী হইয়াছেন। সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতি হইবার যোগ্যতা অবশ্য কেবল এইটুকুতে হয় না—কিন্তু তিনি মাতৃভাষার উপকারার্থ একটা অতি মহৎ কাজ করিয়াছেন, সে জন্য বাঙ্গালী জাতির তাঁহার নিকটে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। ভূতপূর্ব্ব পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম গবর্মেণ্টের তদানীন্তন কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ সংকল্প করেন যে, পূর্ব্ববঙ্গে মোসলমানগণের "ভর্ণাকুলার" ভাবে উর্দ্দু চালাইতে হইবে। মৌলবী আব্দুল করিম তখন উপরওয়ালাদের প্রিয়পাত্র ছিলেন, এবং তাঁহারা আশা করিয়াছিলেন যে, তাঁহার ন্যায় সুদক্ষ মোসলমান কর্ম্মচারী তাঁহাদের সমর্থন করিবেন। কিন্তু মৌলবী সাহেব কেবল যে তাঁহাদের রায়ে রায় দেন নাই, এমন নহে, পরন্তু বঙ্গভাষাই বাঙ্গালী মোসলমানগণের যে মাতৃভাষা অর্থাৎ "ভর্ণাকুলার", তাহা সাতিশয় যোগ্যতাসহকারে প্রবল যুক্তি তর্ক দ্বারা এরূপ ভাবে প্রমাণিত করেন যে, ইহাতেই ন্যায়পরায়ণ কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ ঐ সংকল্পের অসারতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া উহা বর্জ্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু উর্দ্ধতন ব্যক্তিগণের মধ্যে দু এক জন নাকি মৌলবী সাহেবের উপরে জাতক্রোধ হইয়া পড়েন, এবং শুনা গিয়াছে, প্রধানতঃ তাহারই ফলে তাঁহাকে অনেক বিড়ম্বনাও ভোগ করিতে হইয়াছিল। এযাবৎ কোনও মোসলমান সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতি-পদে বৃত হন নাই, অথচ বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ঈদৃশ উপকারী ব্যক্তিকে * সভাপতি পদে নিযুক্ত করিয়া সম্মাননা করা উচিত, আমি এই অভিপ্রায় বিজ্ঞাপিত করিয়া-

---

* মৌলবী আবদুল করিম সাহেব সম্বন্ধে এ স্থলে আরও কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা আবশ্যক মনে করিতেছি। কলিকাতা সাহিত্য-সম্মিলনের কিয়দ্দিবস পরেই শিলচরে সাহিত্য-সম্মিলন হয়, তাহাতে মৌলবী সাহেবকে সভাপতি-পদ-গ্রহণার্থ অনুরোধ করা হয়—এবং অল্প দিন হইল শ্রীহট্টের সাহিত্য-সম্মিলনেও নাকি তিনি অধিনায়কত্ব করিতে অনুরুদ্ধ হইয়াছিলেন—কিন্তু শারীরিক অসুস্থতা ও কার্য্যান্তরে আবদ্ধতা হেতু তিনি সভাপতির পদ গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হন নাই। ইদানীং মোসলমান সভাসমিতির বহু স্থলেই তাঁহাকে সভাধিনায়কত্ব করিতে দেখা যাইতেছে। তিনি 'আঞ্জুমান ওলামায়ে বাঙ্গালা'র সংস্থাপক; তাহা হইতে 'আল এসলাম' নামক বাঙ্গালা মাসিকপত্র প্রধানতঃ তাঁহারই অর্থসাহায্যে প্রকাশিত হইতেছে। মোসলমান সাহিত্য-সমিতিরও তিনি এক জন পৃষ্ঠপোষক। কিঞ্চিদূন লক্ষ টাকার সম্পত্তি তিনি মোসলমান সমাজে শিক্ষাবিস্তারকল্পে উৎসর্গ করিয়া অসামান্য বদান্যতা প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি নীরব কর্ম্মবীর—তাই সাধারণ্যে এ সকল কথা প্রায় অবিদিত বলিয়াই এ স্থলে উল্লেখযোগ্য বিবেচিত হইল।

ছিলাম। তদুত্তরে তিনি '৩য় পত্র'খানি লিখেন। তখন কবিবর্য্য রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ্ পাইয়াছেন। এই ব্যাপার উপলক্ষ্য করিয়াই পুনশ্চ "রবীন্দ্র-সংবর্দ্ধনা"র সম্বন্ধে কয়েকটি কথা অবান্তরভাবে এই পত্রেও লিখিয়াছিলেন।

৩য় পত্র।

১২ পার্শিবাগান লেন

৫ অগ্রহায়ণ ১৩২০।

প্রীতিসহিত নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন

আপনার পত্র পাইয়া আনন্দলাভ করিলাম। আমি গত বৎসরের তুলনায় অনেকটা ভাল আছি; কিন্তু আর কোন কাজে লাগিব এরূপ ভরসা নাই। কাজ করিবার ক্ষমতাও নাই। কালেজ [এ] একবার করিয়া যাই—জীবিকার জন্য—ক্লাস্ পড়াইতে পারি না। এইরূপ করিয়া যতদিন চলে।

সাহিত্য-পরিষদ সম্পর্কেও থাকিতে পারি না। কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতিতে নামটা আছে, কিন্তু এতাবৎ যাইতে পারি নাই। কোন বিতর্ক বিতণ্ডার মধ্যে গেলেই মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা উপস্থিত হয়। সাহিত্য-সম্মিলনের কোন ব্যবস্থায় বা গণ্ডগোলে যোগ দিতে পারিব না বা দিব না, এবং যতদূর পারি, মত প্রকাশও করিব না। সভাপতি-নির্ব্বাচনে যেমন গণ্ডগোল প্রতিবার হইয়া থাকে, এবারও সেইরূপ হইবার সম্ভব। অনেক নামই প্রস্তাবিত হইয়াছে শুনিতেছি; শেষ পর্য্যন্ত কি হইবে জানি না।

আপনার প্রস্তাবিত শ্রীযুক্ত আব্দুল করিম আমার পরিচিত বন্ধু; প্রেসি-ডেন্সী কলেজে ৪ বৎসর এক সঙ্গে পড়িয়াছি, অতএব সতীর্থ; তার পরেও তাঁহার সহিত বহুবার দেখা শুনা হইয়াছে। তবে সভাপতিনির্ব্বাচন যাঁহাদের হাতে পড়িবে, অথবা বাঙ্গালা সাহিত্যসেবীদের মধ্যে যাঁহারা সাহিত্য-সম্মিলনে যোগ দেন বা যোগ দিবেন, তাঁহাদের অধিকাংশের নিকট তাঁহার নাম তেমন পরিচিত বটে কি না সন্দেহ। পরিচয় দিয়া যাঁহার নাম প্রস্তাব করিতে হইবে, তাঁহাকে একবারে সভাপতি-পদে বরণের আশা বড়ই দুরাশা। —র * সহিত তাঁহার মনোমালিন্যের যে হেতু উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে বাঙ্গালা সাহিত্যের উপর দাবি আছে; কিন্তু সে কথা প্রকাশ্য ভাবে সাধারণের সম্মুখে উল্লেখ করিবার যো নাই। সম্মিলন ব্যবস্থা ব্যাপারে অনেক কর্ম্মচারী লিপ্ত আছেন;

* চিহ্নিত স্থলে একটি শব্দ নানা কারণে পরিত্যক্ত হইল।

তাঁহারা বরং ইহাতে ভয় পাইয়া যাইবেন। বিপিন বাবুকে * আপনার অনুরোধ জানাইয়াছি। তিনি সম্ভবতঃ আপনাকে চিঠি লিখিবেন।

[রবীন্দ্রবাবুকে যদি সে সময়ে সম্বর্দ্ধনা করা না হইত, এবং আজি বিলাতের সার্টিফিকেট দেখিয়া আমরাও সম্মান দেখাইতে উপস্থিত হইতাম, তাহা হইলে লোকে বলিত না কি যে, আমরা স্বদেশী হইয়াও দেশের এত বড় লোকটাকে আদর করিলাম না বা চিনিলাম না ; আর আজ সাহেবি সার্টিফিকেট্ দেখিবা-মাত্র অমনি জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলাম। তাহা হইলে বাঙ্গালা দেশের মুখখানা কতটুকু হইত ? একেই ত কথা আছে বিলাতি প্রশংসাপত্র না দেখিলে আমাদের নিজের শাস্ত্রেও ভক্তি হয় না। ইহার পর বিদেশের সম্মান দেখিয়া স্বদেশীকে সম্মান করিতে প্রবৃত্ত হইলে নিদারুণ লজ্জায় পড়িতে হইত না কি ? আমি ত বোধ করি বিলাত যাইবার পূর্ব্বে যে কোন একটা উপলক্ষ করিয়া রবীন্দ্রবাবুর প্রতি যে আদর দেখান হইয়াছিল, তাহাতে দেশের মুখরক্ষা হইয়াছে। আপনার কুশল প্রার্থনা করিয়া ইতি করিলাম।

ভবদীয়

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।]

উপসংহার।

ইহার পর রামেন্দ্রবাবুর স্বহস্তাঙ্কিত কোনও চিঠি পাই নাই—তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎকারও আর একবারমাত্র হইয়াছিল। ১৩২২ অব্দে যখন, বামনের চাঁদ ধরিবার আকাঙ্ক্ষার মত, আমারও বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলোপদের জন্য অভিলাষ হইয়াছিল, তখন পূজ্যপাদ ৺গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে নমিনেট্ করিতে অস্বীকৃত হইলে, সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি অথবা সম্পাদক, এই দুই জনের মধ্যে কাহারও দ্বারা 'নমিনেটেড্' হইবার বাসনা হইয়াছিল। তাই সম্পাদক রামেন্দ্রবাবুর নিকটেই প্রথমে গিয়াছিলাম। তিনিও স্বীকৃত ছিলেন —কিন্তু রিপন কলেজের কেহ যদি দাঁড়ান, তবে তাঁহার দাবী অগ্রগণ্য, এ কথাও বলিয়াছিলেন ; তাই সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়েরও শরণাপন্ন হই—এবং তিনিই পরিশেষে 'নমিনেট্' করিয়াছিলেন। এই শেষ দেখা হইয়াছিল, কেন না, ইহার পর কতবার চেষ্টা করিয়াছি, রামেন্দ্র

* ইনি ত্রিবেদী মহাশয়ের অন্তরঙ্গ বান্ধব অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত ;— তিনি যে পত্র দিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্মপ্রকাশ এ স্থলে অপ্রাসঙ্গিক। নানা কারণে এ বিষয়ের সমধিক আলোচনা অনুচিত মনে করিতেছি।

বাবুকে বাসায় পাই নাই—স্বাস্থ্যলাভের আশায় স্থানান্তরে গিয়াছেন, এরূপ সংবাদ পাইতাম।

যাহা হউক, জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ত্রিবেদী মহাশয় সাহিত্য-পরিষদের সঙ্গে যোগ রাখিয়াছিলেন—মৃত্যুর এক মাস পূর্ব্বে তাঁহার নিকটে আমার শেষ চিঠি ছিল সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশয়িতব্য একটি প্রবন্ধ * বিষয়ে; তিনি তাহাতে একটি মন্তব্য যুড়িয়া দিবেন, এই প্রস্তাব ছিল। এই চিঠির উত্তর অন্যের হাতে দেওয়াইয়াছিলেন—প্রস্তাবিত মন্তব্য দিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। কিন্তু হায়, ঐটুকু করিবার অবকাশ তিনি আর পান নাই। কিয়দ্দিন পরেই সংবাদ পাইলাম, বঙ্গসাহিত্যাকাশের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক চিরতরে অস্তমিত হইয়াছে—বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের আলম্বনস্তম্ভ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে—বিশ্ববিদ্যালয়ের মহার্হ রত্ন হারাইয়া গিয়াছে—আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ধরাধাম পরিত্যাগ করিয়া পরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

শ্রীপদ্মনাথ দেবশর্ম্মা।

ট্রিভ্যাণ্ড্রম্। (Trivandrum).

ছেলেবেলা ভূগোল-পাঠের সময় পড়িয়াছিলাম, ভারতের দক্ষিণে একটি দেশী রাজ্য আছে, তাহার রাজধানীর নাম ট্রিভ্যান্‌ড্রম্। কিন্তু এই খটমট শব্দটি ভারতবর্ষীয় কোনও ভাষা-মূলক কিংবা ইউরোপীয় ভাষামূলক; বুঝিতে পারি নাই। পরে একবার ঐ সকল দেশে বেড়াইতে গিয়া বুঝিতে পারিলাম যে, আমাদের ইউরোপবাসী রাজার দেশের লোকেরা ভারতের ভাষায় শব্দটি উচ্চারণ করিতে না পারিয়া ঐরূপ খটমট শব্দের গঠন করিয়াছেন। শব্দটি ভারতীয় ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হইবে, তিরু অনন্তপুরম্ (Tiru anantapuram)। তামিল ও মলায়ালি ভাষায় তিরু শব্দের অর্থ পবিত্র, শ্রী। নগরের নাম অনন্তপুরম্, কেন না, নগরে মহাবিষ্ণু অনন্ত (শেষ নাগের) শয্যাতে শয়ান আছেন।

একদিন ত্রিবাঙ্কুরবাসী ভক্ত বিল্বমঙ্গল † আপন কুটীরে পূজার উপকরণ সাজাইয়া চক্ষু মুদিয়া শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করিতেছিলেন। তিনি ধ্যানস্থ হইলেই কোনও বালক আসিয়া তাঁহাকে বিরক্ত করিতে লাগিল; কখনও তাঁহার লম্বা শিখা ধরিয়া টান দেয়, কখনও তাঁহার

---

* প্রবন্ধের নাম 'সমতটের পূর্ব্বে'; সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩২৬, ১ম সংখ্যা। ইহার ইংরেজী মর্ম্মানুবাদ বিলাতের রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটী কর্ত্তৃক সমাদৃত হইয়াছে, এইটুকুই সম্পাদকীয় মন্তব্য-রূপে বিজ্ঞাপিত হইবার কথা ছিল।

† ইনি 'কর্ণামৃতে'র কবি, বঙ্গবিশ্রুতকীর্ত্তি, বিল্বমঙ্গল ঠাকুর নহেন। তিনি মহারাষ্ট্রীয়।

কোণাকুণি উল্টাইয়া দেয়, কখনও ঠেলা মারিয়া ধ্যান ভাঙ্গাইয়া দেয়। তিনি কোনও দুষ্ট গ্রামবাসী বালক ভাবিয়া বকিয়া তাড়াইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু চোখ খুলিলেন না। যদি বা কখনও চোখ খুলিলেন, তিনি শিশুকে দেখিতে পাইলেন না; ভাবিলেন, বালক কোথায় লুকাইয়াছে। আবার ধ্যান করিতে বসিতেই উপদ্রব আরম্ভ হইল। মানুষ যত বড় তাপসই হউক না কেন, তাহার সহিষ্ণুতার একটা সীমা আছে। একবার বালককে বাম হাতের কাছে কি খুটখাট করিতে শুনিয়া বিল্বমঙ্গল এমন ঠেলা মারিলেন যে, বালক পড়িয়া গেল, এবং তিনি চোখ না খুলিয়াই রাগ করিয়া বলিলেন, 'দূর হ।'

তখন শুনিতে পাইলেন, বালক বলিতেছে, 'তুমি যাহাকে ধ্যান করিতেছ, সেই আমি তোমার ধ্যানে আকৃষ্ট হইয়া আসিয়াছিলাম,এখন তুমি তাড়াইলে; আমি চলিলাম; যদি আমাকে দেখিতে চাও, তবে অনন্তঙ্কদুতে আমার দেখা পাইবে।' বিল্বমঙ্গল তাড়াতাড়ি চক্ষু মেলিয়া দেখিলেন, কুটীর শূন্য, কেহ নাই! কিন্তু বেশ বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি তাঁহার হৃদয়ের দেবতাকে নিকটে পাইয়াও তাঁহার ছলনা বুঝিতে পারেন নাই। অনন্তঙ্কদু (Anantaukadu) কি জিনিস ও কোথায়, তিনি জানিতেন না। তাঁহার ধ্যানের বস্তু শ্রীভগবানকে কোথায় পাইবেন,বুঝিতে না পারিয়া মনে মনে বড় কষ্ট পাইতে লাগিলেন। এমন সময়ে দূরে একটি এমন শব্দ পাইলেন, যেন নূপুর পায়ে দিয়া কোনও শিশু পলাইতেছে। তিনি সেই শব্দের অনুসরণ করিলেন। মধ্যে মধ্যে বালিতে ধ্বজবজ্রাঙ্কুশের চিহ্ন স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছিলেন। তিনি শব্দ ও পদচিহ্নের অনুসরণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু অনন্তঙ্কদু কি জিনিস ও কোন্ দিকে, তাহা না জানাতে পদে পদে দাঁড়াইতে বাধ্য হইতেছিলেন, আবার নূপুরশব্দ পাইলে অগ্রসর হইতে-ছিলেন। এইরূপে আহারনিদ্রা ভুলিয়া চার পাঁচ দিন রাত্রি শব্দের অনুসরণ করিলেন। একদিন শুনিলেন, এক কুটীরে একটি স্ত্রীলোক তাহার পুত্রকে শাসন করিতেছে,এবং বলিতেছে, 'এইবার কাঁদিলে তোকে অনন্তঙ্কদুতে ফেলিয়া আসিব।' এই কথা শুনিয়া বিল্বমঙ্গল ঐ স্ত্রীলোকের কাছে জানিয়া লইলেন যে, নিকটের গভীর বড় বনকে অনন্তঙ্কদু বলে। তিনি সেই বনের পথ ধরিলেন। এক স্থানে চারি দিকে নূপুরশব্দ শুনিতে পাইয়া ভাবিতে লাগি-লেন, এইবার কোথায় যাই। দেখিলেন, হঠাৎ বিনা কারণে একটি গগনচুম্বী বৃক্ষ কাত হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি ভাবিলেন, ইহা দৈববলে পড়িয়াছে, এইখানেই ঠাকুর দর্শন দিবেন। এই বিশ্বাসে চারি দিকে অন্বেষণ করিতে করিতে গভীর বনে অনন্তশয্যাশায়ী প্রকাণ্ড ভগবানের মূর্ত্তির কেবল নাভির কাছের অল্প অংশ দেখিতে পাইয়া আনন্দে পুলকিত হইলেন। এই মূর্ত্তি পূজা করিয়া ও প্রণাম করিয়া তাঁহার তৃপ্তি হইল না; কেন না, তিনি পরিক্রমণ করিতে পারিতেছিলেন না। মূর্ত্তি প্রায় ১৪।১৫ মাইল স্থান জুড়িয়া শুইয়াছিল। তিনি ঠাকুরকে বলিলেন, 'আমার কেবল স্তব ও প্রণাম করিয়া তৃপ্তি হইতেছে না। আপনার এত বড় বিগ্রহ পরিক্রমণ করিবার ক্ষমতা আমার নাই, অতএব হে ভক্তের ভগবান, আমার পূজা গ্রহণ করিবার জন্য শরীর সঙ্কুচিত কর।' ভগবান ভক্তের কথা ঠেলিতে পারিলেন না, শরীর সঙ্কুচিত করিয়া ৮।১০ হাত মাত্র করিলেন। তখন বিল্বমঙ্গল মনের সাধ মিটাইয়া পরিক্রমণ ও পূজা করিলেন।

শ্রী

ভগবান অদৃশ্য হইলে বিল্বমঙ্গল ভাবিতে লাগিলেন, এত বড় গাছটা ভাঙ্গিয়া পড়িল কেন ইহার অবশ্য কোনও উদ্দেশ্য আছে। মনে হইল ভগবানের যে মূর্ত্তি এইমাত্র দেখিলাম, এই গাছের কাঠ দিয়া সেইরূপ গড়িয়া স্থাপন করাই ভগবানের আজ্ঞা। তখন পতিত গাছের গুঁড়ির সেইরূপ মূর্ত্তি গড়িয়া স্থাপন করিলেন। বিগ্রহ অনন্তনাগের শয্যায় শায়ী মহাবিষ্ণু, মাথার উপর নাগের সহস্র ফণা, নাভি হইতে কমল উঠিয়া তাহাতে ব্রহ্মার উৎপত্তি।

দেশের রাজা সংবাদ পাইয়া বিগ্রহের মন্দির করিয়া দিলেন, এবং স্থানের নাম অনন্তপুরম্ বা তিরু অনন্তপুরম্ রাখিলেন। মন্দিরের সেবার জন্য কয়েকখানি গ্রাম দিলেন। ঐ বিগ্রহ অনন্তপদ্মনাভ বলিয়া ও চারি দিকের দেশ পদ্মনাভ-ক্ষেত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ হইল। সেই পর্য্যন্ত ত্রিবাঙ্কুরের রাজা ও প্রজা উভয়ে পদ্মনাভ স্বামীর ভক্ত।

এক শত সত্তর বৎসর হইল (১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে) তখনকার রাজা—মার্ত্তণ্ড বর্ম্মা কুলশেখর পেরুমল—আপনার সমস্ত রাজ্যই ঠাকুরকে অর্পণ করিয়া স্বয়ং ঠাকুরের প্রতিনিধি-রূপে প্রজা-পালন করিতেন। সেই পর্য্যন্ত রাজাদের উপাধি 'পদ্মনাভ-দাস' ও রাজ্য দেবোত্তর সম্পত্তি।

শ্রীঅমৃতলাল শীল।

সহযোগী সাহিত্য।

প্রাচীন ভারতের রাজ্যশাসন ও রক্ষণ-প্রণালী।

The Quarterly Journal of Mythic Societyর পত্রে চাণক্যের 'অর্থশাস্ত্রে'র সম্পাদক শ্যামশাস্ত্রী মহাশয় 'The Brahman Hierocracy and the Body politic' নাম দিয়া প্রাচীন ভারতের রাজ্যশাসন ও রক্ষণ-প্রণালী সম্বন্ধে একটী সুন্দর প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। আমরা সেই প্রবন্ধ হইতে তাঁহার বক্তব্যগুলির সারাংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

ভারতবর্ষে আসিবার পূর্ব্বে আর্য্যরা যখন সবাই এক যায়গায় ছিলেন, তখন তাঁহাদের সামাজিক আচার ব্যবহার, ধর্ম্মের বিধিনিষেধ, রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি একই ছিল। সবাই ঐ সকল মানিয়া চলিতেন। তার পর যখন তাঁহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িয়া পূর্ব্ব পশ্চিম, উত্তর দক্ষিণে ভিন্ন ভিন্ন দেশে রওনা হইলেন, তখনও ইন্দো-ইউরোপীয়ানগণের বিভিন্ন শাখা গ্রীক, রোমান প্রভৃতির আচার ও নীতি প্রভৃতির কোনও পার্থক্য ছিল না।

ভারতবর্ষে প্রথম যখন তাঁহারা পদার্পণ করিলেন, তখনও তাঁহাদের মধ্যে রাজতন্ত্র শাসন-প্রণালী প্রচলিত ছিল না। তবে তাঁহাদের মধ্যে শাসন সংরক্ষণ হইত কিরূপে? এক একটী দলের (tribe) গোষ্ঠীপতি ছিলেন সেই সেই দলের শাসক ও সংরক্ষক। গ্রীক ও রোমকদের মধ্যেও ঠিক এই প্রথাই দেখিতে পাওয়া যায়। আত্মরক্ষার্থ যুদ্ধকালে পরস্পরের সাহায্য ও শান্তির সময় পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতাই তখনকার পরস্পরের যোগসূত্র ও শাসন-সংরক্ষণ তন্ত্র ছিল। গোষ্ঠীতন্ত্র (tribal) বা পিতৃ-তন্ত্র (patriarchal) শাসন-প্রথাই তখনকার গবর্মেণ্ট ছিল।

তার পর ধীরে ধীরে গোষ্ঠীতন্ত্র, পিতৃতন্ত্র শাসনপ্রণালী পরিবর্ত্তিত হইয়া রাজতন্ত্র শাসন-প্রণালীতে পরিণত হইল। কিন্তু তাই বলিয়া একেবারে তখনই বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্র শাসন-প্রণালী প্রবর্ত্তিত হয় নাই। তখন যিনি রাজা হইতেন, তাঁহাকে ভোটের জোরে রাজা হইতে হইত। এইরূপে যিনি রাজা নির্ব্বাচিত হইতেন, তাঁহার হাতে কি সকল ক্ষমতাই একেবারে ছাড়িয়া দেওয়া হইত? না—শুধু কতকগুলি বিষয়ের উপর এই নির্ব্বাচিত রাজার ক্ষমতা নিবদ্ধ থাকিত। তিনি রাজকর আদায় করাইতেন; তিনি এক দল স্থায়ী সৈন্য নিজের কর্তৃত্বাধীনে রাখিতেন, তাহাদের সাহায্যে শত্রুর আক্রমণ ও দস্যুর অত্যাচার হইতে দেশকে রক্ষা করিতেন।

বৈদিক যুগে রাজারা ভূমির কর নির্দ্ধারণ করিয়া দিতেন, কর আদায়ও করিতেন। কর মুদ্রা অথবা ক্ষেত্রজাত শস্যে দেওয়া যাইত। ইহা ব্যতীত অপর রাজ্য লুণ্ঠতরাজ করিয়া যাহা কিছু সংগৃহীত হইত, তাহাও প্রজাদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিতেন। (অথর্ব্ববেদ)।

অথর্ব্ববেদে 'রাজকৃতা' শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, তখন দেশে এরূপ এক দল লোক থাকিত, তাঁহারাই রাজ-নির্ব্বাচন করিতেন। ইঁহারা ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণদের যেমন রাজাকে নির্ব্বাচন করিবার ও অভিষেক করিবার ক্ষমতা ছিল, সেইরূপ রাজাকে অভিশাপ দিয়া তাঁহার অনিষ্টসাধন করিতেও তাঁহারা অদ্বিতীয় ছিলেন। অথর্ব্ববেদ হইতেই জানা যায়, ব্রাহ্মণেরা রাজার কোনও কার্য্যকে অত্যাচার বলিয়া মনে করিলে, যাহাতে রাজার মাথায় বজ্রপাত হইয়া তাঁহার সর্ব্বনাশ হয়, সেই প্রার্থনা করিতেছেন।

কোনও নির্ব্বাসিত রাজাকে ব্রাহ্মণরা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিলে আর মতান্তর ছিল না। উহাই সবাইকে মানিয়া লইতে হইত।

অন্যান্য দেশের কার্য্য ছাড়া রাজার নির্ব্বাচন, নির্ব্বাসন ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কার্য্যও সাধারণ সমিতিতে সম্পাদিত হইত। এই জনসাধারণের সমিতিতে পুরোহিতদের কথাই ছিল প্রধান। অর্থাৎ, তাঁহাদের কথানুসারে কাজ হইত। রাজা সর্ব্বপ্রধান ছিলেন না—সমিতিই ছিল সর্ব্বপ্রধান—রাজাকে সমিতির আদেশ মান্য করিয়া চলিতে হইত। অবশ্য এ কথা স্বীকার করিতে হইবে, ব্রাহ্মণরাই সমিতিতে প্রধান ছিলেন। খুব সম্ভব, যুদ্ধ, সন্ধি, ন্যায়, চুক্তি প্রভৃতিও সমিতিতে আলোচনার পর ধার্য্য হইত।

লেখক আলোচনা করিয়া বলিতেছেন, ব্রাহ্মণদের উপর রাজার কোনও রূপ আধিপত্য ছিল না; ব্যবসায়ী ও চাষীদের উপরই তাঁহার অধিক কর্ত্তৃত্ব ছিল।

কারণ, ঋক, যজু ও অথর্ব্ববেদে রাজাকে 'বিস্পতি' বা 'বিবম্পতি' বলা হইয়াছে; অর্থাৎ, ব্যবসায়ী ও চাষীদের কর্ত্তা। কোথায়ও রাজাকে 'ব্রাহ্মণপতি' বলিয়া অভিহিত করা হয় নাই। রাজার ব্রাহ্মণদের উপর কোনও কর্তৃত্ব ছিল না। যজুর্ব্বেদেও ইহার প্রমাণ আছে যে, ব্রাহ্মণরা নির্ব্বাচিত রাজার আধিপত্য স্বীকার করিতেন না। যজুর্ব্বেদে পাওয়া যাইতেছে,

'হে ভারতগণ, ইনি তোমাদের রাজা; আমাদের ব্রাহ্মণদের রাজা সোম।'

লেখক বলিতে চান যে, এই যে ব্রাহ্মণদের রাজার উপর কর্তৃত্ব, ইহা ইন্দো-ইউরোপীয়ান স্বভাবের ফল। তৎকালীন আর্য্যরা যে ইউরোপ অথবা উত্তর মেরু হইতে আসিয়াছিলেন,

ইহা তাহার একটী প্রমাণ। কারণ, রোমান ও গ্রীকদের মধ্যেও দেখা গিয়াছে, পুরোহিত জাতি রাজাদের উপর কোনও কোনও বিষয়ে কর্ত্তৃত্ব করিতেন।

লেখক ইহার পর কি করিয়া নির্ব্বাচিত রাজার স্থানে বংশানুক্রমিক রাজার উদ্ভব হইল, সেই পরিচয় দিয়াছেন। প্রবন্ধের শেষে তিনি কহিতেছেন,—

চাণক্য বংশানুক্রমিক স্বেচ্ছাচারী রাজাই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। তাই বলিয়া বৈদিক যুগের নির্ব্বাচিত রাজা ও বংশানুক্রমিক রাজার মধ্যে কোন্‌টী বেশী দিন স্থায়ী হইয়াছিল, সে কথা তিনি অজ্ঞাত ছিলেন না। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম, কর্ম্ম, বিদ্যা রক্ষা করিতে হইলে ব্রাহ্মণ মন্ত্রী থাকা দরকার, ইহাও চাণক্যের মত ছিল। কারণ, বৌদ্ধধর্ম্মের সংঘাতে লোকের মনে ভ্রাতৃভাব জাগিয়া উঠিতেছিল; ব্রাহ্মণ চাণক্য ও রাজা দেখিলেন, ইহা তাঁহাদের পক্ষে কল্যাণকর নয়; যদি রাজা নির্ব্বাচিত হইল, মন্ত্রী ব্রাহ্মণ না রহিল, তবে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মই বা রক্ষা পাইবে কি করিয়া, রাজার স্বেচ্ছাচারিতাই বা থাকে কি করিয়া। সেই জন্য রাজার সহিত ধর্ম্মের সম্পর্ক যোগ করিয়া দেওয়া হইল, এবং ব্রাহ্মণগণ মন্ত্রীর আসন দখল করিয়া লইলেন। চাণক্যের জয়জয়কার পড়িয়া গেল।

শ্রীনলিনীমোহন রায় চৌধুরী।

অযোগ্য।

৫

প্রায় এক বৎসর পরে মনু তাহার আ-বাল্যের সুখময় শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া আসিল। কিন্তু এ কি! গৃহের সে শ্রী কোথায় গেল? তাহাকে দেখিয়া লোকেই বা কেন এমন করিয়া মুখ ফিরাইতেছে! কানাকানি করিয়া উহারা ঐ যে কাহার কথা বলিতেছে না? কে কাহাকে দেখিতে চাহিয়াছিল? মনুর সহিত তাহার পিতার নাম কেন লোকে এমন মৃদুস্বরে উচ্চারণ করিতেছে? ভয়ে সংশয়ে মনুর পা যে আর চলিতে চাহিতেছিল না। 'মনু, এখন আর কা'রে দেখ্‌তে এলি মা?' বলিয়া বিধবাবেশিনী বিন্ধ্যবাসিনী দালানের প্রান্ত হইতে কাঁদিয়া উঠিতেই, মনু মুহূর্ত্তমাত্র মার পানে চাহিয়া, তাঁহার পায়ের কাছে 'বাবা গো!'—বলিয়া আছাড় খাইয়া পড়িয়া গেল। শশধর তাড়াতাড়ি কাছে আসিয়া তুলিতে গিয়া দেখে, সে মূর্চ্ছিতা হইয়াছে।

শ্রাদ্ধশান্তি যথানিয়মে চুকিয়া গেলে, অতুল চলিয়া গেল। এমন অবস্থায় মনুকে সঙ্গে লইবার কথা ইচ্ছা থাকিলেও মুখে বলিতে পারিল না। রেবতীনাথ দানপত্র করিয়া—শশধরকে তাঁহার বসতবাড়ী এবং অন্যান্য সম্পত্তিরও কতক দিয়া গিয়াছেন। বাকী অংশ বিন্ধ্যবাসিনীর অবর্ত্তমানে মনু পাইবে,

এখন তাহার কিছুই নয় শুনিয়া মনু নিভৃতে ভক্তিপূর্ণচিত্তে উদ্দেশে পিতৃচরণে বার বার প্রণাম করিল। 'এই ঠিক করেছ বাবা! তোমার স্নেহ—আমার জন্য কত নিশ্চিন্ত তুমি হতে পেরেছিলে, এই থেকেই তা আমি বেশী করে বুঝ্তে পাচ্চি। তোমার আদর্শের কাছে উনিও তবে নীচে পড়ে থাকেন নি!' উইল শুনিয়া অতুলের রাগ শশধরের উপর শত গুণ বাড়িয়া গেল। বিন্ধ্যবাসিনী স্বামীর কার্য্যে ভাল মন্দ কোনও কথাই কহিলেন না। পাড়ার লোক সকলেই বলিল, 'রেবতীনাথ তাঁহার যোগ্য কার্য্যই করিয়াছেন, মনুর অভাব কি, সে ত রাজা শ্বশুরের বৌ,—স্বামী পুলিসের সবইনস্পেক্টর—সে ত জজ ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছাকাছি। লাট সাহেবকেও তাহাকে মানিয়া চলিতে হয়। মোটরে আলো না থাকায় পুলিস না কি সে দিন লাট সাহেবকে হাজতে লইয়া গিয়াছিল, প্রত্যক্ষদর্শীর মুখে এমন কথাও তাঁহারা শুনিয়াছেন!' শশধরের স্বভাবগুণে বন্ধুর অভাব না থাকিলেও, অদৃষ্টবৈগুণ্যে অতুলকে সে বন্ধুশ্রেণীতে গ্রহণ করিতে পারিল না।

শোক চির দিন মানুষের উপর পূর্ণ অধিকার স্থাপন করিতে পারে না। মনু ও বিন্ধ্যবাসিনী ক্রমে অনেকটা প্রকৃতিস্থা হইলেন। অতুল মনুকে লইয়া যাইতে আসিলে, বিন্ধ্যবাসিনী কহিলেন, 'সংসারসুখ ত ঢের দেখ্লুম, এইবার তোমরা আমায় বিশ্বনাথের পায়ের তলায় রেখে এস অতুল। বাড়ীতে আমি আর এক দণ্ডও টিক্তে পারব না।' মনু নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'বাবা চলে গেলেন, তুমিও কাশী যাবে, মা—শশ তবে কার কাছে দাঁড়াবে? ওর দিকেও ত তোমায় চাইতে হবে এখনও?' শশধর ও অতুল কাছেই ছিল, মনুর কথায় শশধর তাহার পানে কৃতজ্ঞদৃষ্টিতে চাহিতেই অতুল বিরক্তভাবে কহিল, 'এ তোমার অন্যায় আব্দার, ওর কি হবে ব'লে মা কি তাঁর পরকালের কাজও করবেন না নাকি, ও ত আর কচিখোকাটি নয়, নিজের ব্যবস্থা নিজেই করে নিতে পারবে খুব।' মনু লজ্জিত, অপ্রতিভভাবে কহিল, 'মাকে ত আমি কাশী যেতে বারণ কচ্চি না, তবে আর দিন কতক থেকে শশর বিয়ে-টিয়ে দিয়ে ওকে সংসারী করে' রেখে গেলেই বেশ্ হোত।'

অতুল জিজ্ঞাসুভাবে শশধরের দিকে চাহিলে, শশধর নতমুখে উঠানের একটা আগাছা পা দিয়া উপ্ড়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। বিন্ধ্যবাসিনী দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, 'তা আর ও করলে কই, বাবু ত কতবারই ঐ কথা ওকে বলেছিলেন যে, এইবার তুমি বে-থা করে' সংসারী হও—আমরা দেখে

চক্ষু সার্থক্ করি। তা ও সে কথা শুন্‌লে কই, আর দিন কতক থাক্— পড়াটা শেষ হো'ক, এম্‌নি করে টাল দিয়ে দিয়েই না কাটালে এতদিন,— যাঁর সাধ তিনি ত চলে গেছেন, আমার যখন হাত পা ছিল, তখন সবই সম্ভব ছিল। এখন তোমরা ওকে দেখ শুন, বিয়ের সময় খবর দিও, দু দশ দিনের জন্য আস্‌ব তখন—আমায় আর কেন জড়াও বাছা ?'

মনু শশর পানে চাহিয়া দেখিল। কি গভীর শোকের ছায়া তাহার মুখে লেপিয়া রহিয়াছে। উইল শুনিয়া পর্য্যন্ত একেই ত সে সকলের কাছে অপরাধীর মত সঙ্কুচিত হইয়া রহিয়াছে, তাহার উপর মাও তাহাকে ত্যাগ করিতে চাহিতেছেন। অনাথ, ওরে অনাথ ! সত্যই আজ্ তোর কেউ নাই রে, যিনি ছিলেন, তিনি চলিয়া গিয়াছেন। মনুর মনে হইল, মা শশকে ফেলিতে পারিলেন,বাবা হইলে পারিতেন না। শশধর মুখ তুলিয়া না চাহিলেও তাহার চোখের তারায় কাহার চিরপ্রসন্ন চিরস্নেহময় মূর্ত্তি ফুটিয়া রহিয়াছে, ঐ নির্ব্বাক বেদনাভরা হৃদয়খানি এ মুহূর্ত্তেও কাহাকে স্মরণ করিতেছে, সে কি মনু জানে না ? সমবেদনার জলভরা দু'টি কালো চোখ—তাই ভাষাহীন সান্ত্বনায় শশধরের মৌন নত মুখের উপরেই বদ্ধ হইয়া রহিল। মনুর সে পবিত্র দৃষ্টির অর্থ কলুষিতচিত্ত অতুল কেমন করিয়াই বা অনুভব করিবে, তাই সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বাহিরে চলিয়া গেল। অতুল চলিয়া গেলে শশধর আস্তে আস্তে বিন্ধ্যবাসিনীর পায়ের তলায় বসিয়া পড়িয়া রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, 'যেখানে থাক্‌লে তুমি শান্তি পাবে, সেইখানেই তুমি চল মা ! আমার জন্যে তোমায় কিছু ভাব্‌তে হবে না,—আমি— সে এক রকম করে চালিয়ে নেব। এই পরীক্ষাটা হয়ে গেলেই আমারও ত ছুটী।'

তখনও চন্দ্রোদয় হয় নাই। সন্ধ্যার অন্ধকারে সর্ব্বাঙ্গে কালো কাপড় ঢাকা দিয়া যে অন্ধকার মনুষ্যমূর্ত্তি মনুর শোবার ঘরের জানালার নীচে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, হয় ত সে মনে করিয়াছিল, সত্যই সে নিজকে লোকচক্ষুর অদৃশ্য রাখিতে পারিয়াছে। কিন্তু তাহার অনুমান ভ্রান্ত। অতুল তখন বারাণ্ডায় ইজিচেয়ারে পড়িয়া পড়িয়া নীরস সন্ধ্যা নীরবেই যাপন করিতেছিল। মনুর ঘরের একটা জানালার খোলা পাখীর ভিতর দিয়া অল্প একটুখানি আলোর রেখা বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছিল ; তাহার চোখে এ দৃশ্য অদৃশ্য রহিল না। চোর আসিয়াছে মনে করিয়া সবেমাত্র সে মনে মনে উঠি-উঠি করিতেছিল— এমন সময় বস্ত্রাবৃত মূর্ত্তি মুখ ফিরাইতেই পলকের মধ্যে অতুল চিনিল, সে

শশধর। বিজাতীয় ঘৃণা ও দারুণ বিদ্বেষে মুহূর্ত্তে অতুলের দেহ মন যেন পাথরে পরিণত হইয়া গেল। যখন সংজ্ঞা বোধ হইল, সে অনুভব করিল, মূর্ত্তি সরিয়া গিয়াছে।

মাতালের মত টলিতে টলিতে অস্থিরচরণে অতুল অনেক রাত্রে ঘরে ঢুকিল, মনে করিল, মনু এতক্ষণ ঘুমাইয়া থাকিবে। মনু তখনও ঘুমায় নাই, প্রদীপের কাছে ঝুঁকিয়া বসিয়া অত্যন্ত মনোযোগ দিয়া সে তখন একখানি অপূর্ব্ব গোয়েন্দা-কাহিনীর উপসংহারভাগ পড়িতেছিল। গল্পের অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনাবলীর কতকটা সামঞ্জস্য হইয়া আসিয়াছে, এইবার শেষ অধ্যায়টি হইলেই সকল ঘটনার মীমাংসা হইয়া যাইবে। তাই কৌতূহলে বিস্ময়ে আনন্দে তাহার চিত্ত পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, স্বামী ঘরে আসিয়াছেন জানিতে পারিয়াও সে মুখ ফিরাইল না, পাছে গল্পটার রসভঙ্গ হইয়া যায়। নির্য্যাতিতা নায়িকার দুঃখে, এবং অসমসাহসিক নায়কপ্রবরের বীরত্বে মহত্ত্বে সম্ভ্রমে তাহার চোখে তখন জলও ভরিয়া আসিয়াছিল, মুখ তুলিলে পাছে অতুল তাহা দেখিয়া ফেলে, এবং গল্প পড়িয়া কান্না দেখিয়া হাসে, সে ভয়ও বিলক্ষণ ছিল।

ঘরে ঢুকিয়া কি একটা বলিতে গিয়া অতুল থামিয়া গেল। পাশের ছোট চোর-কুঠারী ঘরটার ছিটের পর্দ্দা অল্প অল্প দুলিতেছিল। ঘরে জানালা দরজা বন্ধ, কৈ বাতাস ত কোথাও নাই? অতুলের ওষ্ঠপ্রান্তে ঘৃণার তীক্ষ্ণ হাসি ও চোখে বিদ্বেষের তীব্র দাহ যুগপৎ ফুটিয়া উঠিল। স্ত্রীর সহিত কথা কহিতে ঘৃণায় তাহার সর্ব্বাঙ্গ কুঞ্চিত হইয়া উঠিতেছিল। মনে হইল, ঘর ছাড়িয়া এখনই ছুটিয়া বাহির হইয়া যায়। কিন্তু গেল না। ক্রোধে রুদ্ধবাক্ হইয়া চুপ করিয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া টেবিলের উপর হইতে একখানি 'গীতা' তুলিয়া লইল। অতুল জানিত, প্রত্যহ স্নানের পর এই বইখানি মনু অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত এক অধ্যায় করিয়া পাঠ করে। বইখানি রেবতীনাথের। তাই তাহার এত শ্রদ্ধার জিনিস। বইখানি হাতে লইয়া এখানে সেখানে পাতা উল্টাইয়া অতুল কহিল, 'মনু, ও ঘরে কে?' 'কোন্ ঘরে?' বলিয়া মনু স্বামীর দৃষ্টির অনুসরণে ছোট ঘরটির দিকে অবজ্ঞাভরে বারেক চাহিয়াই মুখ ফিরাইয়া লইল। কহিল, 'কেউ ত নয়! ও সিন্দুকের ভেতর আবার মানুষ থাকবে কে?' 'কেউ না? সত্যি বল্‌ছ—কেউ না? আচ্ছা দেখি!' বলিয়া অতুল অগ্রসর হইতেই মনু বাধা দিবার ভাবে তাড়াতাড়ি কহিল, 'না গো না, কেউ না—এই ত একটুখানি আগেই [illegible] গেছ্‌লুম ওখানে। দিন রাত চোর চোর করে' তোমার মাথায়

কেবল চোর ডাকাতই ঘুরছে।' বলিয়া একটুখানি হাসিয়া মনু পুস্তক-পৃষ্ঠায় মন দিল। মনু সত্য কথাই বলিয়াছিল, এই বহিখানি আনিবার জন্যই সে কিছু পূর্ব্বে ঐ ঘরটার ভিতর গিয়াছিল ; আর তাড়াতাড়ি চলিয়া আসায় কতকগুলি কাঁচের বাসন মাটীতে নামাইয়া রাখিয়া আসিয়াছিল, তাহার ভয় হইতেছিল, অতুল ঘরে গিয়া অন্ধকারে এখনি সেগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিবে, নহে ত অগোছাল বলিয়া তাহাকে তিরস্কারও করিতে পারে। অতুল দেখিল, মনুর স্বরে ঈষৎ যেন জড়তা, চোখেও ভয়ের আভাস, তবে? সে হাতের গীতাখানি মনুর কোলের উপর ফেলিয়া দিয়া কহিল, 'এই বার বল দেখি, ও ঘরে কেউ নেই,—কেউ ছিল না?' 'না গো, না গো, না।' 'ওমা, কি কল্লাম—গীতা ছুঁয়ে কেন তুমি আমায় দিব্যি করালে? দেখ না, কেউ আছে কি না—আমার ত ভয় নেই, যত ভয় কেবল তোমার।' বলিয়া মনু রাগ করিয়া সাধের উপন্যাস-খানি ফেলিয়া দিয়া, গীতাখানি মাথায় ঠেকাইয়া যথাস্থানে রাখিয়া, বিছানায় শুইয়া পড়িল। অভিমানে তাহার চোখে জলও ঝরিতেছিল। এ কি অনা-চারী তামাসা? এ সব মনুর একটুও যদি ভাল লাগে।

অতুল ছুটী পাইয়াছিল, পর দিন সকালেই তাহারা পশ্চিমে যাত্রা করিল। পশ্চিমের জল-হাওয়া ও প্রাকৃতিক দৃশ্যের অভিনবত্বে হয় ত মনুর দিন বেশ ভালই কাটিতে পারিত, কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা ঘটিল না। এখানে আসিয়াও স্বামীর জন্য তাহার ভাবনার সীমা ছিল না। অতুলের অটুট স্বাস্থ্য দিন দিন যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল ; শরীর কৃশ, মলিন, বার্দ্ধক্যজীর্ণের মত দেখাইতেছিল। নিয়মিত কাজের তাড়া না থাকায় সময়ে স্নানাহারও হয় না, মন সদাই অপ্রসন্ন, বাহিরে বাহিরে অনাবশ্যক ঘুরিয়া বেড়ায়। মনু চিকিৎসার কথা তুলিলে হাসিয়া উড়াইয়া দেয়। বিদেশে অপরিচিত স্থলে মনু কর্ত্তব্য ভাবিয়া পায় না।

সকাল বেলা সম্মুখে তেলের শিশি রাখিয়া মনু স্নানের জন্য চুলের বিনুনি খুলিতেছিল। অতুল আসিয়া কহিল, 'শুনেছ—তোমার শশধরের কীর্ত্তি?' মনু বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল, কহিল, 'কি করেছে, শুনিনি ত কিছু?'

'শোন নি?—তিনি যে আজ কাল পয়সার স্বাদ পেয়ে পয়সা চিনেছেন খুব, ডাকাতী দলে ধরা পড়েছেন—কাগজে লিখেছে।' মনু ব্যাকুলভাবে বাধা দিয়া কাতরস্বরে কহিল, 'ওগো! না না, ও সব মিছে কথা, সে তা কক্ষণই পারে না। কে তার সঙ্গে শত্রুতা সেধেছে।' অতুল কহিল, 'কেন পারে না মনু? তুমি

তাকে যা মনে কর, সে তা নয়, ভাজা মাছখানি উল্টে খেতে সে বেশ জানে।' মনু তেমনি ব্যাকুলভাবে কহিল, 'ওগো, বাবা যে নেই, কেউ যে তার নেই আর, তুমি তাকে অবিশ্বাস কোর না,—দয়া কর তাকে, বিনা দোষে তার দণ্ড হ'তে দিও না।' মনুর চোখে শ্রাবণের জলধারা ঝরিতে শুরু হইয়াছিল। অতুলের আবার মনে হইল, 'ভাগ্যবান্ শশধর!' মনের কথা সে গোপন করিল না, শিকারী যেমন করিয়া তাহার পদানত শিকারের পানে তাকায়, তেমনই করিয়া মনুর যন্ত্রণাকাতর অশ্রুধৌত মুখের পানে চাহিয়া চাহিয়া সহজ সুরেই সে জবাব দিল, 'কে নেই তা'র মনু?—তুমি যখন তার রয়েছ? বল ত, তা'র সঙ্গে নিজের অদৃষ্ট আমি বদ্‌লে নিতে রাজী আছি। নেব কি তাই?' এমন অবস্থায় ব্যঙ্গ বিদ্রূপ কিছু সম্ভবে না। মনু স্বামীর মহানুভবতায় আনন্দে গর্ব্বে তত দুঃখের মধ্যেও সুখানুভব করিল, সত্যই সে ভাগ্যবতী,—এমন স্বামীর স্ত্রী সে! মুখে শুধু ব্যাকুল অনুনয়ে কহিল, 'ওগো, না না, নিজকে না জড়িয়ে তাকে বাঁচাবার যদি কোনও পথ থাকে, তাই কর,—এ কথা শুন্‌লে মা আর বাঁচ্‌বেন না, পয়সার জন্যে কিছু ভেব না—সর্ব্বস্ব দিয়েও যদি তাকে ফিরে পাই, তাই কর। নিশ্চয় জেন,—ভগবানও জানছেন, সে নির্দ্দোষ।' একটা আর্ত্তনাদের মত অতুলের মুখ হইতে বাহির হইল, 'কিন্তু আর ত তা'র ফেরবার পথ নেই মনু; আগুনে যে পড়েছে, তা'কে যে পুড়্‌তেই হবে।' 'বিচার হবে না? নির্দ্দোষীও সাজা পা'বে?—এ যে ইংরাজ রাজত্ব, এখানে ত নির্দ্দোষীর দণ্ড হয় না শুনেছিলুম,—তবে কেন তুমি আমায় ভয় দেখাচ্ছ? যেমন করে হো'ক, তাকে রক্ষা কর।' 'এত?' অতুলের ক্ষণজাত দুর্ব্বলতা আবার/ ঈর্ষ্যার তাড়নায় লুপ্ত হইয়া গেল। গম্ভীরমুখে সে, কহিল, 'সর্ব্বস্ব পণ করে'ও আর তাকে ফিরে পাবে না মনু,—সে আশা ভুলে যাও।' 'তবে কি এম্‌নি করে অনাথের মত সে ভেসে যাবে, কেউ তার মুখ চাবে না, তাকে বাঁচাবে না, রাজাও না, আত্মীয় বন্ধু—জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট—কেউ না, ওগো বাবা গো—তোমার শশকে তুমি দেখ—' বলিয়া বিদ্ধ পক্ষিণীর মত মনু মাটীতে পড়িয়া লুটাইতে লাগিল; দেখিয়া অতুল পরমনিশ্চিন্তমুখে ঘর হইতে আস্তে আস্তে বাহির হইয়া গেল।

অতুল মনুকে সত্য কথা বলে নাই। সেই দিন সকাল বেলা সে শশধরের একখানা চিঠি পাইয়াছিল। শশধর লিখিয়াছিল, 'হঠাৎ একটা বড় অর্ডার-সাপ্লায়ের কাজ পাইয়া সে বোম্বে চলিয়া আসিয়াছে। মনুকে, বা কাশীতে

মাকে, এ খবর দিতে সাহস করে নাই, কি জানি, এত দূরে আসায় তাঁহারা যদি আবার কান্নাকাটী করেন। আসিবার আগে অতুলের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিবার ইচ্ছা ছিল, গিয়াও ছিল সেই জন্য গোপনভাবে, কিন্তু বাহিরে চাকর বলিল, বাবু বাহিরে গিয়াছেন, কখন ফিরিবেন বলিয়া যান নাই। মনুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাকে কাঁদাইতে ইচ্ছা না থাকায় লুকাইয়া বাহির হইতেই তাহাকে দেখিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। অতুলও যেন তাহার কথা মনুর কাছে বা মার কাছে কিছু না বলে—সে নিজে ফিরিয়াই সব কথা জানাইবে। তাঁহারা যেমন শশর বিষয়ে নিশ্চিন্ত আছেন, তাই থাকুন, ইহাই তাহার অনুরোধ।'

শশধরের সারল্যপূর্ণ চিঠিখানি পড়িয়া অতুলের মনের অন্ধকার যেন অনেকখানি কমিয়া আসিতেছিল। তবু মাতাল যেমন হাজার বার 'মদ খাইব না' প্রতিজ্ঞা করিয়াও সংকল্প রাখিতে পারে না—অতুলেরও যেন সেই দশা ধরিয়াছিল। মনুকে অকারণে আর দুঃখ দিবে না বলিয়া মনে মনে স্থিরসংকল্প হইয়াও এমন একটা গভীরতম আঘাত তাহাকে দিয়া বসিল—যাহার কোনও প্রয়োজনই ছিল না। স্বামীর কথায় মনুর কখনও কোনও অবিশ্বাস ছিল না; আজও সে পূর্ণ বিশ্বাসেই শশধরের দুরবস্থার ইতিহাসও গ্রহণ করিল। অতুল বলিল, শশধরের খবর লইবার জন্য সে তাহার সমস্ত শক্তিই প্রয়োগ করিয়াছে, তাহার কোনও সংবাদই নাই। পুলিসের চোখে ধূলা দিয়া সে কোথায় লুকাইয়া আছে। শুনিয়া মনুর চোখের জল বাড়িল মাত্র। এর বেশী কোনও ক্ষমতাই ত তাহার হাতে নাই। অতুল মানা করিয়াছিল, তাই কাশীতে মাকেও সে কোনও কথা জানাইল না।

মনু কহিল, 'বেড়ান ত হোল, এইবার ফিরে চল। মাগো, দেশে দেশে এমন করে ঘুরে বেড়ান কি ভাল লাগে?' মনুর মনে হইতেছিল রাজদ্বারে অপরাধী শশধর যদি কখনও মনুর আশ্রয় চাহিতে আসে, সে ত তাহাদের এখানকার ঠিকানা জানে না। তাই বাড়ী ফিরিবার জন্য তাহার এত আগ্রহ। অতুল মাথা নীচু করিয়া ছুরী দিয়া একটা পেনসীলের মুখ সরু করিতেছিল। মুখ না তুলিয়াই কহিল, 'সত্যি বলছ সেখানে তোমার ভাল লাগে,—লাগবে আর?' 'কি জানি—হয় ত লাগ্‌বে না, এখন মনে হচ্ছে বদল পেলে বুঝি থাকতে পারা যাবে—শশ—সব মনটাই যে সে খালি করে দিয়ে গেল।'

মনুর কণ্ঠস্বরে বেদনা যেন ঝরিয়া পড়িতেছিল। অতুল কথা না কহিয়া

ছুরীখানা ফেলিয়া রাখিয়া উঠিয়া জানালার ধারে গিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার মুখখানা অত্যন্ত বিবর্ণ দেখাইতেছিল। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘামও ফুটিয়া উঠিয়াছিল। এমন ভাব ইদানীং প্রায়ই তাহার মধ্যে মধ্যে হয়। মনু কাছে আসিয়া স্বামীর ঠাণ্ডা হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে তুলিয়া লইয়া স্নেহপূর্ণ-স্বরে কহিল, 'আজও তেম্‌নি অসুখ বোধ করছ? কেন তুমি আমায় লুকচ্ছ, কেন বল না তোমার কি কষ্ট হচ্ছে?' অতুল একটা যন্ত্রণা-ব্যঞ্জক দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া মনুর হাত হইতে নিজের হাত ছাড়াইয়া লইল, ধীরে কম্পিতস্বরে ডাকিল, 'মনু!' 'বল, কি বল্‌বে, বল না কেন? অনেক দিন থেকেই মনে হয়, কি যেন তুমি বল্‌তে চাইছ; সত্যি কি তাই?' বলিয়া মনু কাতর অনুনয়ের দৃষ্টিতে অতুলের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। অতুল কহিল, 'বলব—না বল্লে পাগল হয়ে যাব, কিন্তু আজ থাক্।'

পশ্চিম হইতে ফিরিবার সময় বাড়ীর কাছাকাছি গাড়ী আসিলে ঝুঁকিয়া মুখ বাহির করিয়া দেখিতে দেখিতে মনু কহিল, 'দেখ—দেখ বাড়ীটা এই দু'মাসে কত বদ্‌লে গিয়েছে। আচ্ছা, আমার সেই ছোট ঘরটা কি হোল, তার দোর ত দেখ্‌তে পাচ্ছি না, ওখানে পাঁচীল হোল কেন?' অতুল চাহিয়া দেখিল, সত্য। দরজাটি বন্ধ করিয়া সেখানে প্রাচীর ব্যবধান করা আছে। বাড়ীওয়ালা বাড়ীটি মেরামত করাইতেছিলেন, সম্ভবতঃ ইহা তাঁহারই মতলব; হয় ত অন্য দিক দিয়া নূতন পথও কিছু হইয়া থাকিতে পারে। মনুর সহিত অসরলভাবে কথা কহাই তাহার অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল, তাই নিজের অনুমানের বিষয় না জানাইয়া সে কহিল, 'আমরা সে দিন যখন চলে গেলুম, জমাদারকে বলে গেছলুম, ঐখানে একটা পাঁচিল গেঁথে দিতে। জমাদার যে হুকুম মেনেছিল, তা সে লিখেছিল; সে কিন্তু সারারাত একটা চাপা গোঙানীর শব্দ দু'দিন দু'রাত যেন শুনেছিল। হয় ত কোনও অপরাধী (তার বিশ্বাস) ওখানে এসে লুকিয়েছিল, বা তারা না দেখে দেয়াল গেঁথে—' 'মনু মনু—স্থির হও, তুমি ত গীতা ছুঁয়ে বলেছিলে—নিজে দেখেছ ও ঘরে কেউ ছিল না, তোমার কথা যে বিশ্বাস করেছিলুম—'

'ওগো মা!—' বলিয়া ঘাড় গুঁজিয়া সংজ্ঞাহীনা মনু গাড়ীর আসন হইতে মুখ থুবড়িয়া নীচে পড়িয়া গেল।

৬

বাড়ী ফিরিবার পর জ্ঞানে অজ্ঞানে মনুর এক সপ্তাহ কাটিয়া গিয়াছে। ডাক্তারবরা তাহার জীবনের আশা ছাড়িয়া দিয়াছেন। রোগ অন্য কিছু নহে,

কেবল দুর্ব্বলতা, আর দীর্ঘকালব্যাপী মূর্চ্ছা। সে কাহারও সহিত একটিও কথা কহে নাই, চোখ মেলিয়া তাকায় নাই। অতুলের নাম শুনিলেই তাহার মূর্চ্ছা বাড়িতেছিল, ভয়ে সে কাছে যাইতেও সাহস করে নাই। এখন তাহার সত্য কথাই কি মনু আর বিশ্বাস করিবে। 'ঐ বাঘ, ঐ বাঘ' বলিয়া মনুকে ভয় দেখাইতে দেখাইতে এখন যে সত্যকার বাঘই আসিয়া পঁহুছিল। মনু দুই হাত দিয়া মুখ ঢাকিয়া রহিল, মা তাহার মুখের হাত ছাড়াইতে গিয়া দেখেন, সে কাঠের মত শক্ত হইয়া গিয়াছে।

মূর্চ্ছা ভাঙ্গিলে সাত দিনের পর মনু প্রথমে মার সহিত কথা কহিল, বলিল, 'মা তোমার পায়ের ধূলা আমার মাথায় দাও—আর আশীর্ব্বাদ কর, যদি জন্মান্তর হয়—মেয়ে-জন্ম যেন আর হয় না।' মা কাঁদিয়া কহিলেন, 'এ সব কথা তুই কারে বল্‌ছিস্ মনু, আমার পাষাণ প্রাণ, তাই এত স'য়েও এখনও বেরয় নি, পরের ছেলেটাকে মানুষ কল্লুম—সেও—' দাঁত দিয়া জোর করিয়া ঠোঁট চাপিয়াও মনু নিজেকে সসংজ্ঞ রাখিতে পারিল না। 'ওগো—মা!' বলিয়া আবার সে মূর্চ্ছা গেল।

নিভিবার পূর্ব্বে তৈলহীন দীপও একবার উজ্জ্বল হইয়া উঠে। অস্ত যাইবার পূর্ব্বে সন্ধ্যা সূর্য্যের রাঙ্গা আলো বড় সুন্দর দেখায়। মনুর জীবন-দীপটিও নিভিবার আগে তেমনই ক্ষণিক উজ্জ্বলতা দিতেছে কি না, সে দিন বাড়ীর লোকে তাহাই চুপিচুপি বলাবলি করিতেছিল। সে দিন অন্য দিনের অপেক্ষা মনুকে অনেকটা ভালই দেখাইতেছিল। মূর্চ্ছাও নাকি হয় নাই। মার সঙ্গেও কয়েকটি কথা কহিয়াছিল। বিকালে অতুল একবার তাহাকে দেখিতে আসিতে চাহিলে, বিন্ধ্যবাসিনী উঠিয়া বাহিরে গেলেন। অপরাধীর ভাবে অতুল মৃদুপদসঞ্চারে ধীরে ধীরে তাহার বিছানার কাছে আসিয়া মাটীতে বসিতে গেলে, মনু ইঙ্গিতে তাহাকে কাছে বসিতে দেখাইয়া দিল। মনে হইতেছিল, যেন যুগান্তরের পর আবার তাহারা পরস্পরের কাছে আসিয়াছে। মাঝখানে যে গভীর গর্জ্জনশীল উন্মত্ত উত্তাল সাগরের ব্যবধান, এখনও তাহার সীমা তাহারা খুঁজিয়া পায় নাই। কত দিনের পর সাক্ষাৎ—তাও আবার এক জন চিরবিদায় লইতে ও অপরে দিতে আসিয়াছে। তবু দু'জনের চক্ষুই অশ্রুহীন। দু'জনেই নির্ব্বাক। অনেকক্ষণের পর স্বামীর নত মুখের পানে চাহিয়া মনুই প্রথমে কথা কহিল, বলিল, 'বল, কিছু বলবার থাকে যদি, সময় হয় ত নেইও বেশী আমার—' অতুল এবার মুখ তুলিয়া

মনুর পানে চাহিয়া দেখিল। তাহার শীর্ণ পাণ্ডুমুখে যন্ত্রণার যে গভীর চিহ্ন আঁকিয়া গিয়াছিল, তাহা চোখে পড়িতেই মনু স্বামীর অমানুষিক অপরাধের বিষয়ও যেন ক্ষণকালের জন্য ভুলিয়া গেল। অশ্রুবদ্ধ গাঢ়স্বরে কহিল, 'সন্দেহই যদি করেছিলে,জান্‌তে দাওনি কেন? মার পেটে না জন্মালেও শশ আমার ভাই। চির দিনই তাকে ভাই বলে জেনেছিলুম—ঈশ্বর জানেন, সেও আমায় তা ছাড়া এক মুহূর্ত্তের জন্যেও অন্য জানেনি। তুমি যখন আমায় গীতা ছুঁয়ে দিব্যি করালে, তখন স্বপ্নেও আমি জানতুম না যে,দুর্ভাগা ভাই আমার তখন এই রাক্ষসীর আশ্রয় চাইতে এসেই লুকিয়ে আছে। স্বামীর কাছে এমন সময় মিথ্যে বল্‌ব না, সত্যই আমি তার কথা জানতুম না, জানলে লুকিয়ে নয়, দেখিয়েই তাকে আশ্রয় দিতুম। যিনি সব দেখ্‌ছেন, তিনিও দেখ্‌তে পেতেন আমার সব অপরাধ। এখন বুঝ্‌ছি, আমিই তাকে মেরে ফেল্লুম। বাবার পায়ের তলায় বস্‌বার অধিকারটুকুও আমি এখান থেকে হারিয়ে চল্লুম।'

দুর্ব্বল শরীরে মনের উত্তেজনায় মনু ক্লান্ত হইয়া চুপ করিল। অতুল এতক্ষণ স্থির হইয়া তাহার কথা শুনিতেছিল। এইবার মুখ তুলিয়া চাহিল, চাহিয়া শিহরিয়া উঠিল। সেই মনু, তাহার আদরের স্বর্ণলতা এই হইয়া-গিয়াছে? আর এ,—এ তাহার নিজেরই কীর্ত্তি! অতুলের চোখ দিয়া এইবার জল পড়িতেছিল, কহিল, 'ভগবান্ জানেন—শশধরের কোনও ক্ষতিই আমি করিনি মনু—তোমাকেই মেরে ফেল্লুম। তোমায় শাস্তি দোব বলে' মিথ্যে গল্প বানিয়ে বলেছিলুম, তোমার কষ্ট দেখে, উদ্দেশ্যসিদ্ধির আনন্দে দিশাহারা হয়ে তোমার কি কচ্ছি, তা ভেবেও দেখিনি। শশকে চোরের মত লুকিয়ে আসতে যেন দেখেছিলুম—তার কৈফিয়ৎ সেই দিয়েছে, বোম্বায়ে বড় কাজ একটা পেয়ে সে চলে গেছে, তোমাদের কষ্ট হবে দূরে গেলে, তাই জানায়নি, আমাকেও জানাতে মানা করেছিল। লুকিয়ে দেখা করতে এসেছিল, দেখা হয় নি, পাছে সে দূরে যাচ্ছে বলে' মনে দুঃখ পাও, তাই সে লুকিয়ে চলে গেছল, আর আমি—সেই মনেই কত বড় আঘাত দিতেও পেরেছিলুম—স্ত্রীহত্যাকারী, বন্ধুদ্রোহী রাক্ষসের কাছ থেকে চলে যাচ্ছ, ভালই কচ্ছ মনু—মাপ্ চাইবার অধিকার রাখিনি আমি, চাইবও না তা, শুধু বলে যাও – আমায় বিশ্বাস করে' গেলে।'

সূর্য্যালোক সরিয়া গিয়া ঘরে অন্ধকার দেখা দিয়াছিল। দাসী বাতীর

সেজ জ্বালিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া গেলে, অতুল চাহিয়া দেখিল, মনুর গণ্ড বহিয়া ধারায় ধারায় চোখের জল গড়াইয়া পড়িতেছে। স্বামীর পায়ের উপর নিজের শীর্ণ হাতখানি রাখিয়া অশ্রুবিজড়িত-ক্ষীণস্বরে সে কহিল, 'চিরদিন তোমায় বিশ্বাস করে' এত বড় মিথ্যে—এমন কাজ তুমি করতে পার বলে'—জানি না, কেমন করেই বিশ্বাস করেছিলুম। ভগবান তার উচিত সাজাই দিয়েছেন। ঐ গোয়েন্দাদের আর বাদশাহী আমলের খুনোখুনীর গল্প পড়েই হয় ত এমন ভুলও আমার মাথায় সত্যি বলে ঢুকে গেছল। তোমায় আমি মাপ্ করব কি? সত্যি ত তুমি কোনও অপরাধ কর নি, কিন্তু আমি যে—'

অতুল আস্তে আস্তে তাহার শীর্ণ হাতখানি একবার নিজের হাতে স্পর্শ করিয়া মৃদুস্বরে কহিল, 'সে কি? আমি মাপ্ করতে পারব না মনু—সে যে আমার আরও লজ্জার জিনিস। তুমি ত আমার কথা বলেই বিশ্বাস করেছিলে।'

মনু ও অতুলের অনুমান সার্থক হইল না। মনুর স্বামীর কছে বিদায়-গ্রহণটা আপাততঃ বাজে খরচের তালিকাতেই গিয়া পড়িল। মনুর আর মূর্চ্ছাও হইল না, এবং দিনের পর দিন সে বেশ সুস্থ হইয়াই উঠিতে লাগিল। অতুল ও বিন্ধ্যবাসিনীর মুখে আবার হাসি ফুটিল। কর্ত্তা গৃহিণীর পরিবর্ত্তনে বাড়ীর আশ্রিত লোকেরাও আবার স্বচ্ছন্দভাবে কথাবার্ত্তা, চলা ফেরা করিতে সাহসী হইল।

মাকে ডাকিয়া মনু কহিল, 'শশকে আন্‌তে গিয়েছেন, কাল ভাই-ফোঁটা। আজ থেকে তুমি খাবার-টাবারের যোগাড় কর মা। আমিও বসে বসে গড়ে-ট'ড়ে দেব।' বিন্ধ্যবাসিনী সস্নেহ অনুযোগের দৃষ্টিতে মেয়ের পানে চাহিয়া কহিলেন, 'তুমি শুধু দেহটা ঠিক রাখ বাছা, তাহলেই আমার ঢের সাহায্য হবে, যা ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে, অতুলের পানে চাইলে চোখের জল ধরে' রাখা দায় মনে হোত,—মেয়ে ত চল্লই, পরের বাছাও বুঝি যায় বা!'

৬

ঘরের মেজের কার্পেটের আসন বিছাইয়া বিন্ধ্যবাসিনী শশধরের জন্য জলযোগের নানা সামগ্রী সাজাইয়া দিলে, শশধর হাসিয়া কহিল, 'মনু, তুই শুয়ে শুয়েই আমায় ফোঁটা পরিয়ে দে রে, সেই আমার রাজটীকা হবে, তোর উঠে বসায় আমার ভয় হয়, এখুনি মূর্চ্ছা যাবি হয় ত।' মনু আপত্তির

স্বরে কহিল, 'না, তা হবে না।' অগত্যা মা তাহাকে ধরিয়া নামাইয়া দিলেন। শশধর নূতন কাপড় ফুলের মালা পরিয়া আসনে বসিলে, মনু তাহার ললাটে চন্দনের ফোঁটা পরাইয়া নত হইয়া পা ছুঁইয়া প্রণাম করিল। শশধর বোম্বাই হইতে আনীত, একখানি মূল্যবান রেশমী শাড়ী মনুর হাতে দিয়া তাহার মাথার চুলে হাত রাখিয়া স্নেহপূর্ণগাঢ়স্বরে কহিল, 'চিরসুখী হও মনু। অতুল সে দিন যখন পাগলের মত গিয়ে দাঁড়াল, তাকে দেখে আমার ত ভয়ই হয়েছিল যে, তুই না ভাল হলে ওর কি হবে।' মনু সলজ্জ স্মিতমুখে—কাপড়খানি খুলিয়া দেখিতে দেখিতে কহিল, 'তুমি না এলে ভারী কষ্ট হোত কিন্তু আমার, তোমায় ফোঁটা দিইনি, এমন একটি ভাইদ্বিতীয়াও বোধ হয় যায়নি আমার। আন্‌তে না গেলে তুমি কিন্তু আস্‌তে না?' 'বিলক্ষণ! আমি ত আস্‌ব বলে বাঁধা-ছাঁদা করে' তৈরী হয়েই বসেছিলুম—তখন না অতুল গেল। আমি বুঝি ফোঁটার লোভ ছাড়্‌তে পারি—হ্যাঁ মা?' বলিয়া বিন্ধ্যবাসিনীর দিকে চাহিলে, বিন্ধ্যবাসিনী হাসিয়া কহিলেন, 'তা মিথ্যে বলেনি শশ,—তুই ত জানিস না মনু, বাবু যখন তোর সঙ্গে ওর বে দিতে চাইলেন,—ছেলের সে কি কান্না! বলে "ভগবানও আমায় যা দিতে পারেন নি—তোম্‌রা তা দিয়েছিলে, আমার 'মা', 'পিতে', 'বোন' সব দিয়ে আবার কেন কেড়ে নিতে চাইছ মা, এ আমি কখনও হতে দেব না। আমায় পরের ছেলে করে দিয়ে বোন্‌টিকে যে কেড়ে নেবে, সে আমি কিছুতেই সইতে পার্‌ব না। ওর হাতের ফোঁটা না পর্‌লে বছর বছর আমার আয়ু কমে যাবে।" ওর কান্না শুনে—তবে না তাঁর মত বদ্‌লাল।' মনুর সগর্ব্ব অশ্রুসজল দৃষ্টি অনিচ্ছাতেও একবার স্বামীর মুখে ঘুরিয়া না আসিয়া পারিল না।

অতুল অনতিদূরে একটা খোলা জানালার ধারে চেয়ারে বসিয়া রাস্তার দিকে চাহিয়াছিল। চোখ ফিরাইতেই তাহার লজ্জিত বেদনাতুর দৃষ্টির সহিত মনুর দৃষ্টি মিলিয়া গেল। সে আস্তে আস্তে তাহাদের কাছে আসিয়া বিন্ধ্যবাসিনীর পা ছুঁইয়া কহিল, 'জীবনের সব ভুল, সব অপরাধ ক্ষমা করে' আজকের দিনে—আমায় আবার নূতন জন্ম পাবার অবসর দিতে পারবে কি ভাই?' শশধর শশব্যস্তে আসন ছাড়িয়া উঠিয়া অতুলের সহিত কোলাকুলি করিয়া কহিল, 'তোমার অপরাধ! বিলক্ষণ! তোমার ধার যে প্রাণ দিলেও আমার শোধ্‌বার নয় অতুল। বরং জেনে না জেনে আমিই যদি তোমার কাছে কোনও অপরাধ কখনও করে থাকি, তুমিই আমায় মাপ্‌ কোর অতুল—মনুর দাদার

জন্যে তা যে তোমায় করতেই হবে। তোম্‌রা ছাড়া আমার আর ত কেউ নেই ভাই।'

মনু ও বিন্ধ্যবাসিনীর চোখ দিয়া আনন্দের অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছিল। স্বামীর পায়ের তলায় পড়িয়া নিজের জন্য আবার ক্ষমা চাহিবার লোভটুকু মনু মনে মনেই সংবরণ করিল। অতুল তাহাকে ধরিয়া আস্তে আস্তে বিছানায় শোয়াইয়া দিয়া, চাদরখানি ভাল করিয়া গায়ে ঢাকা দিবার সময় শশও বিন্ধ্য-বাসিনীর কান বাঁচাইয়া মৃদুস্বরে কহিল, 'তোমার কাছেও আজকের দিনে আমার ঐ ভিক্ষা মনু! তর্কভূষণ ম'শায়ের ভবিষ্যদ্বাণী ত আমি পুরিয়ে দিয়েছি, এইবার আমার তোমার যোগ্য হবার—' স্বামীর হাতখানি ঠেলিয়া দিয়া মৃদু তর্জ্জনের সুরে মনু কহিল, 'যাও—ভারী কি না আমি—'

সমাপ্ত।

শ্রীইন্দিরা দেবী।

ফরাসী রণাঙ্গনের কথা।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

ফরাসী বড় সুখপ্রিয়; উত্তম খাদ্য, সুপেয় পানীয় ও পরিপাটী পরিচ্ছদ তাহার নিত্য-প্রয়োজনীয়; স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যের প্রতি তাহার বিশেষ লক্ষ্য। ষোড়শীর চকিতচঞ্চল পদক্ষেপে যে ভাব নৃত্য করে, পৃথিবীতে বাঁচিয়া আছে, ইহা বুঝিবার জন্য ফরাসী জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তে সেই সজীব ভাবে অনুপ্রাণিত হইতে চায়। ইহা নিতান্ত দেহসর্ব্বস্ব—মানুষকে বড় জোর প্রাণ পর্য্যন্ত ঠেলিয়া তুলিতে পারে। যাহা কিছু দেহসর্ব্বস্ব, তাহাই পরিত্যাজ্য, এমন কোনও কথা নাই; পরন্তু স্থূলের মধ্যে ভাগবদ্‌বিধান প্রকট করিতে ইহাই বিশিষ্ট যন্ত্র। রক্ত-মাংসের যে সৌন্দর্য্য, সে রক্তমাংস বলিয়া নয়, তাহার অন্তরালে আর একটা জিনিস আছে—বাহিরের দিক দিয়া তাহা পাওয়া যায় না—সে পাওয়ার পথ কিঞ্চিৎ নিগূঢ়। ধূলা-মলিন পৃথিবী প্রাণময়ী; কারণ, উপরের সহিত তাহার সংযোগ আছে। বিভ্রান্ত মানুষের নিকট এই তৃতীয় সরল পথটী উন্মুক্ত হইলেই দৈবী সম্পদ আপনি নামিয়া আসিবে। মানুষের বুদ্ধি থাকিতে পারে, অর্থ থাকিতে পারে, প্রতিপত্তিও থাকিতে পারে; কিন্তু তাহা মানুষকে জীবনের পথে এক পদও আগাইয়া দিবে না, যদি না থাকে কর্ম্মৈষণার অনাবিল

উৎস, ভগবদ্‌নির্দ্দিষ্ট মূর্ত্ত ইচ্ছা। মানুষ ভোগ করিতে চায়, কিন্তু অঙ্গারের জ্বলন্ত স্পর্শে জর্জ্জরিত হইয়া প্রত্যাহত হয়। সে মনে করে, এরূপ না হইলে —শ্মশানকাষ্ঠে তাহার সৎকার করিলেও তাহার ভস্মরাশি পৃথিবীর হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হা হা করিয়া বেড়াইবে। মনুষ্যজন্ম যখন গ্রহণ করিয়াছি, তখন ভোগ নিশ্চয় করিব, তবে ভোগ উপভোগ হইয়া এমন জর্জ্জরিত—এমন হীন-প্রভ করিবে কেন? গিলটীকরা মেকী জিনিসে শুধু বালক ভুলিতে পারে, মানুষ হইয়া তাহাতে প্রলুব্ধ হইব কেন? প্রকৃতই যে মানুষ, সে যে ভোগ চায়, তাহা মানুষকেই স্ফুট হইতে স্ফুটতর করিয়া জীবনবিকাশ স্পষ্ট করিয়া তুলে। সে ভোগ ভাগবত ভোগ—তাহাও আপনার অন্তরাত্মাকে অনন্ত-ধারায় চরিতার্থ করিতে জানে।

ফ্রান্সের প্রাচুর্য্যের মধ্যে আমাদের দিন কাটিতেছিল—হঠাৎ এক দিন দেখি, আমরা কপর্দ্দকহীন! আমরা ধার্ম্মিক দেশের লোক বলিয়া সাধারণের ধারণা; কিন্তু আমাদের ধর্ম্ম এমন বলে না যে, না খাইয়া মরিতে হইবে; কাজেই আমাদের কর্ম্মের চেষ্টায় বাহির হওয়া বড় বিচিত্র নয়। Shell-factoryতে বলাইয়ের কাজ জুটিল; আর আমি একটী 'রেষ্টুরান্তে'র রান্নাঘরে সহকারী 'বালক' হইলাম। পেটের চেষ্টায় বাহির হইয়া রান্নাঘরে কাজ আরম্ভ করা বিশেষ ক্ষতিজনক হইবে না, এ প্রতীতি আমার বরাবর ছিল। বাস্তব ক্ষেত্রে আমার ধারণার কিঞ্চিৎ সার্থকতা উপলব্ধি হইল। ইংরাজী ও ফরাসী উভয় ভাষাই কিছু কিছু জানা ছিল; কিছু দিন যাইতে না যাইতে সেই দোকানেই দ্বিভাষীর কার্য্য জুটিল; বিশেষতঃ, আমেরিকান সৈন্য সে সময় ফ্রান্সে আসিয়া উপস্থিত হয়—বেশ ফুটফুটে, যেমন পরিচ্ছন্ন, তেমনই পরিপাটী; আর সকল দিকে কেমন, তাহা বলিতে না পারিলেও, তাহাদের হাতটান ছিল না। পয়সার দিক দিয়া অবস্থা স্বচ্ছল হওয়ায় আর কিছুর অভাব রহিল না: সময়েরও অভাব নাই,—বই কিনি, কাগজ কিনি, Operaয় যাই, আশে পাশের দেশ পরিদর্শন করিয়া বেড়াই।

একটীর পর আর একটী দিন দিব্য সুখে কাটিতেছিল। তখন জুলাই মাস; ১৬ই তারিখ; আমাদের Australian জাহাজে রওনা হইতে হইল। প্রাতে নয়টায় জাহাজে চড়িয়াও দুই দিনের জন্য সমুদ্রযাত্রা বন্ধ রহিল। আত্মরক্ষার জন্য জলের ভিতরে 'মাইন' ও 'নেট্' দিয়া যে দুর্ভেদ্য ব্যূহ রচিত হইয়াছিল, আমাদের তাহার মধ্যে আটক থাকিতে হইল। দশ মাইলের মধ্যে 'সব্-

মেরিন' আছে, ইহা সঙ্কেতে জ্ঞাপন করিবার জন্য জাহাজে রক্তনিশান তুলিয়া দেওয়া হইল। তৃতীয় দিন রাত্রে আমাদের যাত্রা সুরু হইল—মাথার উপর রাত্রি গাঢ় হইয়া ঘনাইয়া আসিল; কিন্তু আমাদের আমোদ আহ্লাদ স্থগিত রহিল না,—খাদ্যে উদরপূর্ত্তি, খেলাধূলায় মনের স্ফূর্ত্তি, আর গানে প্রাণের তৃপ্তি মিটাইতে চার চারিটি দিন কাটিয়া গেল। আমাদের সঙ্গে চারিটী Destroyer, একটী Crusier ও চারিটী Convoy জাহাজ আমাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য যাইতেছিল। চোরা সব্‌মেরিনের মৃত্যু-কবল হইতে আত্মরক্ষা করিতে সকল জাহাজের পক্ষেই তখনকার দিনে জলপথের দুই একটী তোজ্‌-পুরী পালোয়ান সঙ্গে লওয়া অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছিল। এরূপ সতর্ক হইলেই যে নিস্তার, তাহাও কেহ নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারিত না।

পঞ্চম দিন।—রাত্রের আহার শেষ হইয়াছে। জাহাজের এক ধারে বসিয়া আছি। কচিৎ জল দেখা যাইতেছে। তখন বেলা প্রায় সাড়ে পাঁচটা। সে দিন আমার কেমন-কেমন মনে হইতেছিল—কাগজপত্র ইত্যাদি যা কিছু সংগ্রহ করিয়াছিলাম, সে সব একবার পর্য্যবেক্ষণ করিলাম; প্রিয় জনের 'ফটো' একটীবার চুম্বন করিলাম। যদি সমুদ্র হইতে স্থলে উঠা না ঘটে, তবে ছবির সঙ্গেই শেষ দেখা হউক্। বলাই নিকটে ছিল, বলিলাম, 'আমরা তিন তিনবার ভূমধ্যসাগর পারাপার করিয়াছি,—প্রত্যেক বারই U বোটের কটাক্ষপাত এড়িয়েছি, এবার সন্দেহ হয়, পাছে অকূল পাথারে নাস্তা-নাবুদ হই।' প্রত্যুত্তরে বলাই বলিল, 'তিনবার যে বাঁচ্‌তে পারে, চতুর্থ বারেও সে নিঃসন্দেহ বাঁচবে।' শেষে কিন্তু আমার পোড়ামুখের কথাই সত্য হইল। দূরে দিকচক্রবালে এক টুকরা ছিন্ন মেঘের মত কি দেখা গেল। আমার দৃষ্টি কিছু দূর বেশী যাইত। মেঘের মত ঝাপ্‌সা আবছায়া দুইটী Destroyer। কিছু নিকটে আসিতে, তাহারা যে জাপ রণতরীর অন্তর্ভুক্ত, তাহা বুঝা গেল। ক্রমে নিকটে আসিতে ডেস্‌ট্রয়ারে ডেস্‌ট্রয়ারে ঘন ঘন সঙ্কেত হইতে লাগিল। জাপানীরা এত কাছে আসিল যে, তাহাদের নাক্ চোখ্ দেখিতে পাইলাম। হঠাৎ কিছু ফাটার বিকট শব্দ কর্ণপটাহ প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল—সম্মুখে চাহিয়া দেখি, রসদের একটী জাহাজ 'টর্পেডোড্' হইয়াছে। পুঞ্জে পুঞ্জে মেঘ-স্তরের মত ধূম উদ্গীর্ণ হইতেছে—উত্তাল তরঙ্গ কৃষ্ণকায় জাহাজের আশ-পাশে ঘাত প্রতিঘাত করিতেছে; আকণ্ঠ-নিমগ্ন হইয়া জাহাজটী অথৈ জলে প্রাণরক্ষার শেষ চেষ্টা করিতেছে; একটী ...

U বোটের কি এতই দুঃসাহস হইবে যে, আবার উঠিয়া আর একটীকে 'টর্পেডো' করিবে? চকিতে এ ভাবনা আমার মাথায় গিয়াছে—তিন সেকেণ্ডও হয় নাই—আমাদের জাহাজ পুরোভাগে আহত হইল। ঘন স্তূপীকৃত ধূম-রাশি চতুর্দ্দিক অন্ধকার করিল—জাহাজ ফাটায় দুই একটা ছিন্ন লৌহ টুকরা মাথার উপর দিয়া ছিটকাইয়া গেল। অপ্রত্যাশিত ধাক্কা সজোরে লাগায় পরস্পর মাথা-ঠোকাঠুকি হইল—কেবিনের লোকেরা আর একটু রসানুভব করিয়া মাথা-ফাটাফাটি করিল—চুলীর নিকটে যাহারা ছিল, তাহারা সকলে হয় জীবন্ত পুড়িয়াছিল, না হয় মারাত্মকরূপে আহত হইয়াছিল। এই জীবন-মরণ যুদ্ধে, যাহার যেমন প্রাণ, সে তেমন অনুভব করিল। আমার তখন সুবুদ্ধি আসায় হাতের নিকট যে রেলিং ছিল, তা' ধরিয়া ফেলি, এবং একটী বিপদ থেকে রক্ষা পাই। Bridgeএর উপর দাঁড়াইয়াছিলাম; মুহূর্ত্তমধ্যে লাফাইয়া নামিলাম। বলাই সিগার লইতে বলিল; প্রত্যুত্তর করিলাম, 'না।' প্রথম হুইসিল পড়াতে Raftএর পাশে দাঁড়াইলাম; দ্বিতীয় ধ্বনি হওয়ায় র‍্যাফ্‌ট ও বোট দ্রুত সমুদ্রে নামাইয়া দিলাম। স্ত্রীলোকেরা সকলেই আগে যাইবার জন্য দড়ি ও মই দিয়া ব্যস্ত হইয়া ঝটিতি নামিবার প্রয়াস পাইলেন; আমরা স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া এ বিষয়ে তাঁহাদের যথেষ্ট সাহায্য করি.—ছোট শিশুদের কোলে করিয়া যে কোনও প্রকারে অবতরণ করিয়া নৌকায় তুলিয়া দি। সাধ্যমত রমণী ও শিশুদের যতটুকু নিরাপদ করা সম্ভব ছিল, আমরা ততটুকু করিলাম। তখন আদেশ হইল, 'জাহাজ ত্যাগ করিয়া আত্মরক্ষা কর।' আমি সাহসে ভর করিয়া অটুট অবিকম্পিত হইলাম—বিপদের সময় নিজের এমন ধৈর্য্য ও স্থৈর্য্য দেখিয়া নিজেই আমি আশ্চর্য্য হই। ভাগবতী ইচ্ছা মানুষকে যন্ত্র করিয়া স্বঈরিত পথে কেমন করিয়া পরিচালিত করে, মানুষ তাহা সহজে বুঝে না—যদি বুঝিত, তাহা হইলে আত্মপ্রতিষ্ঠ হইয়া দিব্য শক্তিতে সে ইচ্ছা মূর্ত্ত করিয়া তুলিত।

এক জনের পর আর এক জন বেশ শৃঙ্খলার সহিত দ্রুত জাহাজ ত্যাগ করিতেছিলাম—আমারও নামিবার পালা আসিবে; মুহূর্ত্ত সময়টুকু বৃথা নষ্ট না করিয়া একটা সিগার ধরাইলাম। বলাইয়ের স্কন্ধে হাত দিয়া বলিলাম, 'চোরা বোট বড় চতুর এবং কৌশলময়।' কথা কহিতে কহিতে দেখি, যে র‍্যাফ্‌ট্‌ আমাদের অবলম্বন ছিল, তাহা নিমেষে রজ্জু হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় কোথায় ভাসিয়া গেল!

দূর উঠিয়াছে, দেখিলাম। মুখে কথা নাই,—স্থিরপদক্ষেপে রজ্জু ধরিয়া অপর একটী 'র‍্যাফটে' অবতীর্ণ হইতে গেলাম; তখন মনে পড়িল, আমার সংগৃহীত কাগজপত্র ইত্যাদি; আবার উপরে উঠিলাম; সযত্নে সে অমূল্য সম্পদ জামার জেবে ভরিয়া নিরাপদ করিলাম; আসিয়া দেখি, পূর্ব্ব অবলম্বন আর জন কয়েককে আশ্রয় দিয়াছে; দড়ির সাহায্যে ভিন্ন 'র‍্যাফটে' নামিলাম। সৈনিকদের অনেকেই সন্তরণপটু নহে; ঘাত-প্রতিঘাতে বিক্ষিপ্ত হওয়ায় একটী র‍্যাফট্ একাধিক জনের আশ্রয়স্থান হইল। অনেকে হাবু ডুবু খাইয়া নিকটে যাহা পাইল, তাহাই অবলম্বন করিল; ইহার ফলে এক এক র‍্যাফটে ১০ জনের স্থানে ২০ জন উঠিল। বিপদে পড়ায় মজ্জনোন্মুখ জনের চিত্ত চঞ্চল—প্রতিঘাতে কাষ্ঠাবলম্বন অধিকতর চঞ্চল—তরঙ্গের পর তরঙ্গের উত্তাল নৃত্যে বারিধি আরও চঞ্চল, এমন অবস্থায় ভুল ভ্রান্তিও যে কিঞ্চিৎ বিচিত্র হইবে, তাহা নিঃসন্দেহ। এক জন যুবক ডেক্ হইতে জলে লাফাইতে গিয়া আমাদের র‍্যাফ্টের উপর হঠাৎ পড়িল,—আমরা সকলে ত্বরিতবেগে র‍্যাফটের অপর দিকে গেলাম, যাহাতে উহা একেবারে নিমজ্জিত না হয়; কিন্তু ভার সামলাইতে গিয়া ভারের গুরুত্ব এত হইল যে, যুগপৎ 'সামাল! সামাল!' রব উঠিল। র‍্যাফট্ উল্টাইয়া আমায় চিৎপাত করিয়া দিল; বুকের উপর কে যেন জগদ্দল পাথর বসাইল। শীঘ্রই ভাসিয়া বাহির হইলাম; কিন্তু পড়িলাম বড় সঙ্কটাপন্ন অবস্থায়,—তরঙ্গভঙ্গের বিচ্ছুরিত স্পর্শে একেবারে জাহাজের চাকার নিকট। বলাই সুবিধা পাইয়া সাঁতার কাটিয়া দূরে গিয়াছে। আমায় ডাকিল; কিন্তু আমার যাইবার উপায় ছিল না, ঠিক জাহাজের চাকার নিকট তরঙ্গ সবেগে আছাড় খাইয়া পড়িতেছিল; দুই বার সাঁতার দিয়া সরিয়া যাইবার চেষ্টা করিলাম—দুই বারই যত্ন বিফল হইল। ব্যর্থকাম হইয়াও ভগ্নোদ্যম হই নাই; বিশেষতঃ ঠেকিয়া শিখিয়াছি, বিপদের সময় মাথা ঠাণ্ডা রাখিলে জয় অবশ্যম্ভাবী। খুব ধৈর্য্যের সহিত জাহাজের গা ধরিয়া ধরিয়া জাহাজের মাঝামাঝি স্থলে গেলাম। জাহাজের চাকার তলায় পড়িবার আর কোনও সম্ভাবনা নাই দেখিয়া জাহাজের গায়ে ধাক্কা মারিয়া দ্রুতবেগে জলে কিয়ৎ দূরে ঝাঁপাইয়া পড়িলাম। বলাই আমার প্রতীক্ষা করিতেছিল—অচিরে তাহার নিকটে গেলাম, দ্রুত সন্তরণে মজ্জনোন্মুখ জাহাজ হইতে সরিয়া গেলাম; কারণ, জাহাজ ডুবিলে ঘূর্ণমান জলরাশি নিকটে যাহা কিছু পায়, তাহা টানিয়া লয়। এই ঘূর্ণী চক্র হইতে আত্মরক্ষা করিতেই দূরে সরিয়া যাওয়া।

ইহার বৈচিত্র্য এই যে, ঘূর্ণী চক্র বিস্তার করিয়া দূরবর্ত্তী কোনও কিছুর উপরও আপনার শক্তি প্রয়োগ করে।

এক ঘণ্টা অতিবাহিত হইল; আমরা ডুবিলাম না। ভূমধ্যসাগর জলের উপরেই আমাদের আশ্রয় দিয়াছে—জলের ভিতরে ত আর ডাকে নাই। চতুর্দ্দিক নিশ্চিহ্ন—ধূ ধূ জলরাশি—চাহিলেও দৃষ্টিপথে কিছু পতিত হয় না। তবু আশায় আশায় রহিলাম; জানি না, সে কাহার আশা। চাহিয়া দেখি, দূরে একটী ছোট 'ক্রুইযার' আসিতেছে। আমরাও কিঞ্চিৎ আগাইয়া গেলাম। আমাদের লক্ষ্য করিয়া গুপ্ত শত্রু আর একটী টর্পেডো ছুড়িল—লক্ষ্যভ্রষ্ট হইল। জাহাজে লাগিল না; এবং আমরা র‍্যাফটে থাকায় অক্ষতভাবে অব্যাহতি পাইলাম। তবে Destroyerকে উদ্দেশ্য করিয়া যে দ্বিতীয় টর্পেডো নিক্ষিপ্ত হয়, তাহা উহার পশ্চাৎ ভাগের নিকটে ফাটিয়া কিছু ক্ষতি করে। ক্ষতির মাত্রা যাহাতে না বাড়ে, তজ্জন্য শান্ত্রীর মত পাহারায় নিযুক্ত জাহাজ Convoy জাহাজ ঘেরিয়া ফেলিল, এবং চক্রের পরিধি ক্রমে বিস্তৃত করিল। যে সব লোক জলে ভাসিয়া প্রতি মুহূর্ত্তে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িতেছিল, তাহারা সকলে ইহার মধ্যে আটক পড়িল। বিপাকে প্রাণ হারাইবার বিশেষ সম্ভাবনা আর রহিল না। 'ক্রুইযার' ধীরে নিকটে আসিয়া রজ্জু ঝুলাইয়া দিল। আমরা সমুদ্রকবল, বা মৃত্যুকবল, কিংবা উভয় কবল হইতে সে যাত্রা রক্ষা পাইলাম।

আমাদের অবস্থা কিঞ্চিৎ গুরুতর,—জাহাজের হাঁসপাতাল আমাদের উপযুক্ত আশ্রয়স্থান। নিজের দিক দিয়া বলিতে গেলে আমি বেশ অসুস্থ বোধ করিতেছিলাম; র‍্যাফট্ উল্টাইয়া আছাড় মারিলে সমুদ্রের নোনা জল কিছু পান করি। অনেকবার বমন করিয়া জলটুকু সব উদ্গার করিলাম—অধিকন্তু সুদ হিসাবে আরও কিছু বেশী দিতে হইল। এমনই নিঃস্ব হইয়া সমুদ্রের জুলুম হইতে নিস্তার পাইলাম। শূন্য উদর এ ক্ষেত্রে মনের দিব্য সোয়াস্তি আনিয়া দিল। সহযোদ্ধা এক জন নাবিকের নিকট হইতে একটি সিগারেট লইলাম; ডেকে আসিয়া ধূমায়মান সিগারেট যে তৃপ্তি দেয়, তাহাই উপভোগ করিলাম; সম্মুখে দেখি, নিমগ্নপ্রায় জাহাজে আগুন ধরিয়াছে —ঘন ঘন munition ফাটায় বিকট শব্দ হইতেছে; কোমলহৃদয় রমণীগণ তাহাতেই আর্ত্তনাদ করিতেছে—ভয়, পাছে পুনরায়, কোনও অঘটন ঘটে। তাহাদিগকে আশ্বস্ত করিবার জন্য বলিলাম, "আগুন লাগিয়া আমাদেরই

'শেল' ফাটায় এরূপ গগনভেদী রব উঠিতেছে—ইহাতে ভয়ের কারণ বিশেষ নাই।' এত বলাতেও তাহাদের ক্রন্দন থামিতে চায় না।

টর্পেডোর আঘাতে জাহাজ দ্বিধা হইয়াছে—পুরোভাগে প্রায় ১৫ গজ উড়িয়া গিয়াছে। কামান ছিল; তাহার কোনও চিহ্ন নাই। সে স্থানে যাহারা ছিল, চক্ষুর পলকে তাহারা অতল জলে তলাইয়া গিয়াছে—ঘূর্ণ্যমান জলতরঙ্গ মুখব্যাদান করিয়া তাহাদিগকে জীবন্ত গ্রাস করিয়াছে। জাহাজের মাস্তুলে পেরেক দিয়া একটী তক্তা আঁটিয়া দেওয়া হয়; তাহাতে ক্ষোদিত করিয়া লেখা, 'এইখানে Australian জাহাজ নিমজ্জিত,—মাল্টার নিকট * * * ল্যাটিচিউড্ * * * লঙ্গিচিউডে টর্পেডোড্ হয়—কাপ্তানের নাম * *।' জাহাজ আকণ্ঠ নিমগ্ন হইয়াও ইতস্ততঃ বেগে সঞ্চরিত হইতেছিল; আশে পাশে ক্ষুদ্র তরণীর বিপদ-আশঙ্কায় নিজেদের 'ডেস্‌ট্রয়ার' উহাকে টর্পেডো করিল। কাণাভরা কলসীর মত ভগ্ন জাহাজ ত্বরিৎ ডুবিল।

রাত্রি নয়টা; পুনরায় সমুদ্রযাত্রা আরম্ভ হইল। রাত্রের আহার সাদা-সিধে—কিছু বিস্কুট, রক্ষিত মাংস, আর চকলেট। যে যেখানে ছিল, এবং যেমন অবস্থায় ছিল, তাহাকে ঠিক তেমনই অবস্থায় নিশা যাপন করিতে হইল। পুরুষ এবং রমণীর বিশেষ কোনও পার্থক্য রহিল না; কেহ অর্দ্ধাবৃত, কেহ অনাবৃত—ক্ষুদ্র শিশুর মত প্রকৃতির কোলে আশ্রয় লইয়া রজনী কাটাইয়া দিল। সে অবস্থায় দুর্ভাগ্যের কথা না ভাবিলেও কিছু আসিয়া যায় না; তবে সৌভাগ্য এইটুকু, এরূপ আশ্রয় যারা পাইয়াছিল, তাদের কেহ প্রাণে মারা যায় নাই, এই ভীষণ রজনীও প্রভাত হইল। বেলা এগারটা, মাল্টার তীরভূমি দৃষ্ট হইল। যাত্রীদের হর্ষোল্লাস আমার বড় প্রাণস্পর্শী বলিয়া মনে হইল। আমরা সমুদ্র-সৈকতে অবতীর্ণ হইলাম। মাল্টাবাসীর সাদর অভ্যর্থনা আমাদের অধিকার উৎফুল্ল করিল, আমাদের আকার ইঙ্গিতে তাহারা বুঝিয়াছিল, আমাদের মাথার উপর দিয়া একটী ঝঞ্ঝা বহিয়া গিয়াছে।

তখন বেলা দ্বিপ্রহর। রৌদ্রের উত্তাপ বড় বেশী। মাটীতে পা ফেলিবার উপায় নাই; ফেলিলেই পুড়িয়া যায়। সর্ব্ব শরীর ঘর্ম্মাক্ত; কেশ ধূসরবর্ণ, নয়নের দৃষ্টি ভীতিপ্রদ। পরস্পর পরস্পরের দিকে চাহিয়া দেখি, আর হাসি। এ বড় বিচিত্র কৌতুক। ঝড় ঝাপটা সহিতে হইয়াছে—তাহার উপর আহার নাই; নিদ্রা নাই। এরূপ হওয়া আশ্চর্য্য নয়। অনেক দিন ক্ষৌরকার্য্য হইয়া উঠে নাই; সকলে বড় দাড়ি গোঁফের শোভায় ভবিষ্যুক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

এই দৃশ্য আমাদের ভার্দ্দুন যুদ্ধের গৌরব-দিনের কথা স্মরণ করাইয়া দিল। সৈনিক ও অফিসার উভয়কে ক্রমাগত অনেক দিন যুদ্ধ করিতে হয়; যুদ্ধ-শেষে ছুটীর অবসর পাইয়া প্যারিসে প্রত্যাবর্ত্তন করে—সকলের লম্বা লম্বা দাড়ি গোঁফ গজাইয়া যায়। প্যারিসের ফুটফুটে লোকেরা আমাদের 'দেড়ে' আখ্যা দিয়াছিল! এ নাম গৌরবসূচক; কারণ, তখনকার দিনে সেই সব ফরাসী সৈন্যেরই দাড়ি গজাইয়াছিল, যাহারা প্রাণের মমতা তুচ্ছ করিয়া বীরোদ্যমে ১৯১৪-১৫-১৬-১৭-১৮ চারি বৎসর শত্রুর বীভৎস অত্যাচার বুক পাতিয়া সহ্য করিয়াছিল। ইহাদের পদরেণু বুকে ধরিয়া ফ্রান্স আজও যে ফ্রান্স হইয়া বাঁচিয়া আছে, এ কথা জগতের কাছে বলিতে পারিতেছে। ফরাসীর মুখে শুনিয়াছি, 'কোনও দুর্জ্জেয় শক্তি নিজ ঈপ্সা-সিদ্ধির জন্য পর্ণ-কুটীরোদ্ভূত জন কয়েক সামান্য সামান্য লোককে কি এক অপূর্ব্ব গৌরবে নির্ম্মম-ভাবে গৌরবান্বিত করিয়াছে।'

আমরা Cilemaয় সেণ্ট জর্জ্জ ব্যারাকে উঠিলাম। বাহিরে মানুষের সামনে আসিবার উপায় নাই। আমাদের যে পরিচ্ছদ ছিল, তাহা না থাকার মধ্যে। অর্দ্ধাবৃত হইয়া বহির্গত হওয়া রীতিসঙ্গত নাও হইতে পারে। ছোট খাট রকমের কৌতুকে দিনগুলি বেশ কাটিয়া গেল। আমরা আসিলে প্রথমে থাকিবার ব্যবস্থা হয়, সঙ্গে সঙ্গে আহারেরও ব্যবস্থা হইল। টেবিলে বসিয়া খাইলাম; এক টুকরা রুটী, এক কাপ্ চা, মাখম্, আর জ্যাম্ টেবিলের শোভা করিল। চারিটার সময় পুনরায় মাংস, পনীর, এবং শুকান মাছ জুটিল। যাহারা খাওয়ায়, ধর্ম্মতঃ তাহাদের সুখ্যাতি করা আমার স্বভাব, এবং সাধারণতঃ তাহারা ভাল লোকও হয়। এ ক্ষেত্রেও আমরা ইংরাজের আয়োজন ও দক্ষতার প্রশংসা করিলাম। রাত্রি প্রভাত হইল; আটটা বাজে নাই; প্রাতরাশ শেষ হইল। দুপুর বেলায় দিবা ভোজন হইল—মাংস, চা, মাখম, এবং আলু ছিল। খুব আগ্রহের সহিত, নিজের পেট, এ কথা স্মরণ রাখিয়া খাদ্য গলাধঃ-করণ করিলাম। দিনের আসল খাওয়ায় রুটী নাই, ঝোল নাই, যাহা ব্যতীত ফরাসীর মুখশুদ্ধি হয় না। তাহা না পাওয়ায় সমস্ত কেমন অসদৃশ ঠেকিল। এরূপ কেমন করিয়া ঘটিতে পারে, তাহা ভাবিয়া পাইলাম না। তখন মনে হইল, বোধ হয় রুটীর অভাব হইয়াছে। সান্ধ্য ভোজনে এক টুকরা রুটী, চা, এবং শুকান মৎস্য আসিল; ফরাসী সৈন্য আহ্লাদে আটখানা হইল,—আমার ভয় হইল, মাত্রা চড়িলে পাছে কেহ নয়খানা হয়! কেহ চীৎকার

করিয়া উঠিল, 'হা অদৃষ্ট! ভগা বেটার মনে শেষে এই ছিল! পোড়া দেশে খাওয়ায় বিপর্য্যয় ঘটবে, ইহা যে স্বপ্নেরও অগোচর।' আমাদের উদ্ভট হর্ষ-কোলাহলে ইংরাজ আশ্চর্য্য হইল; হইবারও কথা। আমাদের অফিসাররা ব্যাপার কি, তাহা বিশদ ভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন—খাদ্য আমাদের কিছু কমতি হইতেছে না, ইহা প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পাইলেন। চতুর ইংরাজ সহজে ওরূপ কিছু বুঝিতে চাহিল না। শেষে আসল কথা প্রকাশ হইয়া পড়িল —রুটী এবং ঝোলের অভাব। এই ঘটনার পর হইতে কপির ঝোলের সহিত নিত্য রুটী পাইতাম। আমাদের পেট ভরিয়া খাওয়া লইয়া বিষয়; কিন্তু ইংরাজ আশ্চর্য্য হইত, মানুষের পেটে এতও ধরে!

ক্রমশঃ।

শ্রীহারাধন বক্সী।

ন্যায়রত্নের নিয়তি

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

ন্যায়রত্নের নবগৃহ-প্রবেশের পর ছয় মাস অতীত হইয়াছে। তাঁহার নূতন ঘর-বাড়ী হইয়াছে. নদীতীরবর্ত্তী পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন বাসভবনের অঙ্গনে সংস্থাপিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোলাগুলি বিবিধ শস্যে—ধান-খন্দে পরিপূর্ণ, গ্রামবাসীরা স্ব-স্ব-ক্ষেত্রোৎপন্ন শস্যরাশি আনন্দের সহিত তাঁহাকে উপহার প্রদান করিয়া তাঁহার সংবৎসরের ভরণপোষণের উপায় করিয়া দিয়াছে। তাঁহার আর কোনও অভাব নাই; কি করিয়া সংসার চলিবে, এ চিন্তায় আর তাঁহাকে ব্যাকুল হইতে হয় না। গ্রামের সমগ্র প্রজামণ্ডলী স্বেচ্ছায় যাঁহার সেবার ভার গ্রহণ করিয়াছে, উদরান্ন-সংগ্রহের জন্য তাঁহার চেষ্টা করিবার আবশ্যকতা কি?

ন্যায়রত্ন সংসার-চিন্তার ভার হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলেও মহত্তর চিন্তায় তাঁহার জীবন-সন্ধ্যা অতিবাহিত হইতে লাগিল। গ্রামের সমস্ত লোককে তিনি তাঁহার স্বকীয় পরিবারভুক্ত মনে করিতেন, তাহাদের কল্যাণচিন্তাই যেন তাঁহার জপ তপ হইয়া উঠিল। তিনি ক্ষুদ্র রামদেবপুর গ্রামের জন-সাধারণের অভিভাবকের স্থান অধিকার করিলেন।

ন্যায়রত্ন প্রতিদিন অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনপূর্ব্বক পর্য্যায়ক্রমে এক এক পাড়ায় বেড়াইতে যাইতেন। এক এক দিন এক এক গৃহস্থের বাড়ীতে গিয়া বসিতেন, এবং তাহার কুশলবার্ত্তা, অভাব অভিযোগ প্রভৃতির কথা জিজ্ঞাসা করিতেন; তিনি যে দিন যাহার গৃহে পদার্পণ করিতেন, সে সে দিন যেন হাতে স্বর্গ পাইত, যেন তাহার গৃহে ইষ্টদেবতা আসিয়াছেন। গৃহস্থের বালকবালিকাগণ হইতে কুলবধূরা পর্য্যন্ত তাঁহার সম্মুখে আসিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিত, এবং তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া ভক্তিভরে আগ্রহসহকারে তাঁহার মধুর উপদেশ শ্রবণ করিত। ন্যায়রত্ন যদি শুনিতে পাইতেন, কাহারও ঘরে খাদ্যসামগ্রী নাই, বা গরুর অভাবে কাহারও জমীতে চাষ হইতেছে না, কিংবা বীজের অভাবে জমীতে সে বীজ বপন করিতে পারিতেছে না, তাহা হইলে তিনি স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া গ্রামের লোকের নিকট 'পড়্তা' করিয়া তাহার অভাব দূর করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন। গ্রামের জনসাধারণ তাঁহাকে এতই ভক্তি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস করিত যে, তাঁহার কোনও চেষ্টাই প্রায় বিফল হইত না। কোনও কারণে গ্রামে কোনও বিবাদ বা দলাদলি বাধিলে ন্যায়রত্ন পাঁচ জনকে সঙ্গে লইয়া সেই বিবাদ বিসংবাদ মিটাইয়া দিতেন। সকলেই তাঁহাকে হিতৈষী সুহৃদ মনে করিত, সুতরাং তাঁহার নিরপেক্ষতায় কেহ সন্দেহ করিত না। ক্ষুদ্র গ্রাম, গ্রামের অধিবাসীদের অধিকাংশই চাষী গৃহস্থ বা সাধারণ শ্রমজীবী, গ্রামে কোনও কবিরাজ ছিল না; কোনও পরিবারে কেহ পীড়িত হইলে গৃহস্বামী 'ঠাকুর রক্ষা কর' বলিয়া ন্যায়রত্নের শরণাপন্ন হইত। ন্যায়রত্ন সেই সংবাদ শুনিয়া স্থির থাকিতে পারিতেন না, তিনি রোগীকে দেখিতে যাইতেন, দুই বেলা তাহার শয্যাপ্রান্তে বসিয়া তাহার গায়ে হাত বুলাইতেন, ঝাড়িয়া দিতেন, 'জলপড়া' খাওয়াইতেন, সাহস ভরসা দিতেন, এবং মিষ্ট বাক্যে তাহাকে আশ্বস্ত করিতেন, গৃহে আসিয়া তাহার মঙ্গলকামনায় শান্তি স্বস্ত্যয়ন করিতেন। ন্যায়রত্নের শুভ ইচ্ছায় ও শান্তি-স্বস্ত্যয়নের প্রভাবে অনেক রোগী আরোগ্য-লাভ করিত। অনেক প্রকার মুষ্টিযোগ ও গাছ গাছড়ার ঔষধও তাঁহার জানা ছিল, সেই সকল ঔষধের ব্যবস্থা করিয়াও তিনি অনেক রোগীকে নিরাময় করিয়া তুলিতেন। বস্তুতঃ কিছু দিনের মধ্যেই গ্রামবাসীরা বুঝিতে পারিল—ন্যায়রত্ন তাহাদের আশ্রিত নহেন, তাহারাই তাঁহার আশ্রিত। তিনি যেন সেই গ্রামের জীবন্ত বাস্তু-দেবতা।

ক্রমে ন্যায়রত্নের অনাবিল নিঃস্বার্থ জনহিতৈষা রামদেবপুর গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মনে সংক্রামিত হইয়া পড়িল। সকলেরই যেন তিনি নিতান্ত আপনার জন। তাঁহার সন্তোষবিধানের জন্য তাহাদের কি আগ্রহ! তিনি গ্রামের সর্ব্বসাধারণের 'দাদাঠাকুর'। বালক, যুবক, বৃদ্ধ, সকলেরই তাঁহার প্রতি কি গভীর ভক্তি ও বিশ্বাস! বৃদ্ধেরা ভক্তিভরে তাঁহার নিকট ধর্ম্মোপদেশ গ্রহণ করে; যুবকেরা তাঁহার সৎপরামর্শে পরিচালিত হয়; বালকেরা অসঙ্কোচে তাঁহার সহিত খেলা করে। কেহ তাঁহাকে ভয় করে না, অথচ 'দাদাঠাকুর শুনে কি মনে করবেন, হয় ত মনে ব্যথা পাবেন'—ভাবিয়া কেহ কোনও অন্যায় কর্ম্ম করিতে বা কাহারও অপকার করিতে সাহস করে না। কুলবধূরা তাঁহাকে লজ্জা করে না, তিনিও অসঙ্কোচে তাহাদের সহিত আলাপ করেন; সকলের অন্তঃপুরেই তাঁহার অবারিত গতি। তাঁহার উপর গ্রামস্থ সকলেরই সমান অধিকার।

সারা দিন মাঠের কাজ করিয়া কৃষকেরা অপরাহ্নকালে গৃহে ফিরিয়া আসে। কিন্তু সন্ধ্যার পর আর তাহাদের ঘরে মন বসে না, ন্যায়রত্নের প্রভাব চুম্বকের লৌহাকর্ষণের ন্যায় তাহাদের নির্ভরশীল সরল হৃদয় তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট করে। সন্ধ্যার পর ন্যায়রত্নের বাড়ীতে 'বৈঠক' বসে। ন্যায়রত্ন তাহাদিগকে সম্মুখে বসাইয়া রামায়ণ মহাভারত ও পুরণাদির গল্প বলেন। গল্পচ্ছলে তাহাদিগকে কত হিতোপদেশ প্রদান করেন, আমোদের সঙ্গে তাহারা শিক্ষালাভ করে। এইরূপে ন্যায়রত্ন ধীরে ধীরে গ্রামবাসীদের মানুষ করিয়া তুলিতে লাগিলেন।

এই প্রকার কর্ম্মবৈচিত্র্যের ভিতর দিয়া ন্যায়রত্নের দিনগুলি বেশ সুখ-শান্তিতেই অতিবাহিত হইতে লাগিল; কিন্তু সুমতির অবস্থা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। জলের মাছ ডাঙ্গায় তুলিলে তাহার অবস্থা যেরূপ শোচনীয় হয়, এই গ্রামে বাস করিতে আরম্ভ করিয়া সুমতির অবস্থাও সেইরূপ শোচনীয় হইয়া উঠিল; অন্ন-বস্ত্রের অভাব দূর হইলেই যে মানুষ সুখী হয়, সুমতির এ ধারণা দূর হইয়াছে। তাহার পিতা গ্রামবাসীদের সহিত মিলিয়া বেশ সুখ শান্তিতে কালযাপন করিতেছেন; তাঁহার অভাব নাই, উদ্বেগ নাই, তাঁহার জন্য সুমতির আর কোনও চিন্তা নাই; তথাপি সুমতির মনে সুখ নাই। তাহার হৃদয় কি অশান্তি ও অতৃপ্তিতে পূর্ণ, তাহা সে বুঝিতে পারে না; কিন্তু সর্ব্বক্ষণ তাহার মনে হয়, কি যেন একটা অভাব শ্মশানচারী প্রেতের ন্যায় তাহার

সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতেছে! যতক্ষণ সে গৃহকার্য্যে রত থাকে, বা বৃদ্ধ পিতার সেবা করে, ততক্ষণ সে ভালই থাকে। গৃহকার্য্যের অবসানে নির্জ্জন কুটীরের এক প্রান্তে যখন সে বিশ্রাম করিতে বসে, তখন শত চিন্তার তরঙ্গাঘাতে তাহার হৃদয় আলোড়িত ও অধীর হইয়া উঠে; তাহার মনে হয়, তাহার হৃদয় বর্ষার মেঘাচ্ছন্ন নৈশাকাশের ন্যায় অন্ধকারপূর্ণ; এই বিপুল বিশ্বে সে একাকী, নিতান্ত একাকী! তাহার নিজের কোনও কাজ নাই; তাহার প্রাণের কথা বলিবার মানুষ নাই; তাহার অবসরযাপনের কোনও উপলক্ষ্যও নাই। গ্রামস্থ রমণীগণের সহিত সে অসঙ্কোচে মিশিতে পারে না, তাহাদের কাহারও সহিত সে চিন্তার আদান-প্রদান করিতে পারে না; যেন বাহিরের শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ ভরা আলোকাধারা বসুন্ধরা ও তাহার মধ্যে কি এক দুর্ভেদ্য বিরাট প্রাচীর মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে! - সেই বাধা অতিক্রম করিয়া বাহিরে আসিয়া মুক্তির আনন্দ উপভোগ করা তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। এই সচ্ছলতা ও নিরুদ্বেগ স্বচ্ছন্দতার মধ্যেও কি অভাব ও অপূর্ণতার হাহাকার নিত্য তাহার শূন্য হৃদয় হইতে উত্থিত হইয়া শূন্যে বিলীন হইত, তাহা সে বুঝিতে না পারিলেও সর্ব্বদা তাহার মনে হইত, তাহারা পরের ঘরে বাস করিতেছে, পরের অন্নে প্রতিপালিত হইতেছে, পরের অনুগ্রহে জীবনধারণ করিতেছে। কিন্তু পরপ্রত্যাশী হইয়া এ ভাবে তাহারা কত দিন কাটাইবে, গ্রামবাসিগণের দয়ার ঋণ কিরূপে পরিশোধ করিবে? এমন অনর্দ্দিষ্ট অনিশ্চিত ভাবে জীবনযাপনের শেষ ফল কি? এই নির্ব্বাসনের অবসান কোথায়? তাহার পিতার জীবনের সন্ধ্যা সমাগতপ্রায়, ঘোর অন্ধকারময়ী-বিভাবরীসমাগমের আর ত অধিক বিলম্ব নাই; অকূল জীবন-সমুদ্রে ভাসিতে ভাসিতে সে কোথায় গিয়া কূল পাইবে? পিতার অবর্ত্তমানে সে কোথায় কাহার আশ্রয় লাভ করিবে? এই সকল চিন্তায় সে অধীর হইয়া উঠিত। কিন্তু সে কোনও মীমাংসায় উপনীত হইতে পারিত না। পাছে পিতা মনে বেদনা পান, তাহার মানসিক চাঞ্চল্যের পরিচয় পাইয়া তাঁহার শান্তির ব্যাঘাত হয়, এই ভয়ে সে এ সকল কথা তাঁহার নিকট প্রকাশ করিত না; নিজের দুঃখ, বেদনা, অশান্তি বুকের ভিতর পুরিয়া রাখিত। যাহার বর্ত্তমানে কোনও সুখ নাই, ভবিষ্যতের কোনও আশা নাই, অতীতের স্মৃতিই বুঝি তাহার একমাত্র সম্বল। তাই সুমতি অতীত স্মৃতির সমাধি-বক্ষে ধরিয়া, গত-জীবনের বেদনাভরা সুখস্মৃতির আলোচনা করিয়া, সুখহীন, বৈচিত্র্য-

বিরহিত, একক জীবনের দুঃসহ দিনগুলি অতি কষ্টে অতিবাহিত করিতে লাগিল। এমন সময় ন্যায়রত্ন এক দিন পীড়িত হইয়া শয্যা গ্রহণ করিলেন।

সুমতি সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া দিবারাত্রি পিতার শয্যাপ্রান্তে বসিয়া থাকে, তাঁহাকে বাতাস করে, গায়ে হাত বুলায়, তাঁহার পা টিপিয়া দেয়। কোনও দিন তাঁহার জ্বরত্যাগ হইলে সে আশা করে, আজ হয় ত বাবার আর জ্বর আসিবে না। সে একমনে ভগবানের নিকট পিতার আরোগ্য কামনা করে। কিন্তু তাহার কামনা পূর্ণ হয় না, জ্বর ছাড়িয়া ন্যায়রত্নের আবার জ্বর আসে। জ্বরের প্রদাহে তিনি সময়ে সময়ে অস্থির হইয়া উঠেন, সুমতি নীরবে অশ্রু ত্যাগ করে, আর দয়াময় হরিকে ডাকে।

এইরূপে এক সপ্তাহ অতীত হইল, জ্বর ত আরোগ্য হইলই না, শেষে জ্বরের উপর জ্বর আসিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে কাশি দেখা দিল, এবং বুকে পিঠে এমন বেদনা হইল যে, ন্যায়রত্ন নিঃশ্বাস ফেলিতেও অসহ্য কষ্ট বোধ করিতে লাগিলেন।

সেই দিন পিতার অবস্থা দেখিয়া সুমতির বড় ভয় হইল। রাত্রেই রোগের বৃদ্ধি। ন্যায়রত্ন রোগের যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছেন। গভীর রাত্রি, চরাচর সুষুপ্ত। কোনও দিকে জনপ্রাণীর সাড়া শব্দ নাই। নদীতীরে—ন্যায়রত্নের বাসগৃহের অদূরে কয়েকটি ঝাউগাছ ছিল, উদ্দাম নৈশ বায়ুপ্রবাহে তাহাদের শাখা প্রশাখা সঞ্চালিত হইয়া সন্ সন্ শব্দ করিতেছিল, যেন তাহা কোনও অবশ্যম্ভাবী অমঙ্গলের পূর্ব্বাভাস। সহসা নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া শৃগালের দল নদীতীরে—নদীর অপর পারে ঐকতানিক সঙ্গীতালাপে যামিনীর তৃতীয় যামের আগমনবার্ত্তা ঘোষণা করিল। কিন্তু এই গভীর রাত্রেও সুমতির চক্ষে নিদ্রা নাই, সে নিদ্রাহীননেত্রে অক্লান্তভাবে পিতার পরিচর্য্যা করিতেছে, সাশ্রুনয়নে পিতার যন্ত্রণাকাতর মুখের দিকে চাহিয়া ভাবিতেছে, 'বাবা যদি এ যাত্রা রক্ষা না পান, তবে আমার দশা কি হইবে? আমার আর কে আছে? গ্রামে আত্মীয় স্বজন কেহ নাই, একটি ব্রাহ্মণ নাই, একাকিনী আমি কি করিব? বাবার অভাবে কোথায় গিয়া দাঁড়াইব? একা এখানেই বা কাহার ভরসায় থাকিব, কিরূপেই বা থাকিব?'

পিতা যদি এ যাত্রা রক্ষা না পান—এই কথা মনে হইতেই সুমতি অস্থির হইয়া উঠিল, তাহার বুকের ভিতর কাঁপিতে লাগিল, হৃদয় অবসাদে আচ্ছন্ন হইল; পিতাকে পাখা দিয়া বাতাস করিতে করিতে সে কতক্ষণ নীরবে কাঁদিল, তাহা সে বুঝিতে পারিল না।

ঘরের কোণে তৈলাক্ত দীপগাছার উপর একটা মাটীর প্রদীপ মিট্‌-মিট্‌ করিয়া জ্বলিতেছিল ; তেলের অভাবে তাহা নির্ব্বাপিতপ্রায় হইয়াছে দেখিয়া সুমতি উঠিয়া গিয়া ভাঁড় হইতে দুই পলা তেল তুলিয়া প্রদীপে ঢালিয়া দিল, দীপশিখা পুনর্ব্বার উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সুমতি ভাবিল, এরূপ তেল সে কোথায় পাইবে—যাহার সাহায্যে তাহার পিতার নির্ব্বাপিতপ্রায় জীবন-দীপও মুহূর্ত্তে এমনই উজ্জ্বল হইয়া উঠিতে পারে !

গ্রামে চিকিৎসক নাই ; এক সপ্তাহ ন্যায়রত্ন রোগে ভুগিতেছেন, এ পর্য্যন্ত তাঁহার চিকিৎসার কোনও ব্যবস্থা হয় নাই। গ্রামের লোক রোগে আক্রান্ত হইলে ন্যায়রত্নের মুষ্টিযোগে ও চেষ্টায় যত্নে আরোগ্য লাভ করে, তাঁহার চিকিৎসা কে করিবে ? সুমতির মনে হইল, বিচক্ষণ বৈদ্য দ্বারা চিকিৎসা করাইলে এখনও তাঁহার জীবনরক্ষা হইতে পারে। তৈল যেমন দীপরশ্মি উজ্জ্বল করিল, কবিরাজের যথাযোগ্য ঔষধে তাঁহার জীবন-দীপও সেইরূপ উজ্জ্বল হইতে পারে। কিন্তু গ্রামে বৈদ্য নাই, গ্রামান্তর হইতে কে বৈদ্য ডাকিয়া আনিবে ? কিরূপে তাহার পিতার প্রাণরক্ষা হইবে ?

সুমতি দ্বার খুলিতেই শীতল প্রাতঃসমীরণের একটা 'ঝাপ্‌টা' তাহার চোখে-মুখে লাগিল। সে বাহিরে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল, পূর্ব্ব দিক ফরসা হইয়া আসিতেছে। পূর্ব্বাকাশের বহু ঊর্দ্ধে একটি প্রকাণ্ড তারা ঝক্‌ঝক্‌ করিতেছে; নদীতীরবর্ত্তী শাখাবহুল বটবৃক্ষের পল্লবসংলগ্ন নিভৃত নীড়ে বসিয়া একটা 'কুল্য' (দেশী ঈগল) দীর্ণ কণ্ঠের দীর্ঘ ধ্বনি দ্বারা নিশাবসানের সম্ভাবনা-বার্ত্তা সুপ্ত চরাচরে বিঘোষিত করিতেছে। সুমতি প্রভাতের প্রতীক্ষায় ঘরের দাওয়ায় বসিয়া রহিল। রোগযন্ত্রণায় সমস্ত রাত্রি ছট্‌ফট্‌ করিয়া রাত্রিশেষে ন্যায়রত্ন তন্দ্রামগ্ন হইয়াছিলেন।

তন্দ্রাঘোরে ন্যায়রত্ন স্বপ্ন দেখিলেন ; কিন্তু তাহা দুঃস্বপ্ন নহে, সে স্বপ্ন বড় মধুর, বড় উজ্জ্বল। ন্যায়রত্ন দেখিলেন, তাঁহার ব্রাহ্মণী কল্যাণী কত কাল পরে তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছেন, কিন্তু তিনি পঞ্চভূতাত্মক দেহ লইয়া আসেন নাই, তাঁহার ছায়াদেহ হইতে কি অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ নিঃসৃত হইয়া সেই কক্ষ আলোকিত করিয়াছে, কি এক স্বর্গীয় সৌরভে সেই কুটীর আমোদিত হইতেছে, যেন তাঁহার অদূরে শত পারিজাত প্রস্ফুটিত হইয়াছে। ন্যায়রত্নের বাহ্য ইন্দ্রিয় সুপ্ত, কিন্তু তাঁহার অন্তরেন্দ্রিয় প্রস্ফুটিত, তাঁহার কণ্ঠ নীরব, কিন্তু তিনি বাক্যের অতীত স্বরে কল্যাণীকে বলিলেন, 'কল্যাণি, অনেক দিন তোমাকে দেখি নাই, তুমি কেমন আছ ?'

জ্যোতির্ম্ময়ী রমণী শান্তস্বরে বলিলেন, 'বেশ আছি, সুখেই আছি। তুমি বড় কষ্ট পাইতেছ দেখিয়া তোমাকে একটি কথা বলিতে আসিয়াছি। তোমাকে শীঘ্রই তোমার ঐ জীর্ণ বাস পরিত্যাগ করিয়া আসিতে হইবে। তুমি প্রস্তুত হও। আমি আর এক দিন আসিব,—সেই দিন তুমি আমার সঙ্গে যাইবে।'

ন্যায়রত্ন আর কি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু শরৎসন্ধ্যায় যেমন করিয়া বৃক্ষচূড়াবলম্বী উজ্জ্বল তপনকিরণ মুহূর্ত্তে অদৃশ্য হয়—সেই ভাবে সেই জ্যোতির্ম্ময়ী নারীমূর্ত্তি চক্ষুর নিমিষে অদৃশ্য হইল।

ন্যায়রত্ন স্বপ্নঘোরে ডাকিলেন, 'কল্যাণি! কল্যাণি!' তাঁহার জড়িত কণ্ঠ যেন সহসা বাক্‌শক্তি লাভ করিয়া সুপ্ত চেতনার মধ্যেই এই অস্ফুট ধ্বনি উচ্চারণ করিল!

সে স্বর সুমতির কর্ণে প্রবেশ করিল, তাহার পিতা কি নিদ্রাভঙ্গে তাহাকে ডাকিয়াছেন? সুমতি ব্যগ্রভাবে গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহার পিতার শিয়রে আসিয়া দাঁড়াইল, উজ্জ্বল দীপালোকে দেখিল, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছে, ঘর্ম্মধারায় তিনি প্লাবিত হইয়াছেন। সুমতি সাবধানে তাঁহার মস্তক স্পর্শ করিয়া ডাকিল, 'বাবা! বাবা!'

ন্যায়রত্ন নিরুত্তর। তাঁহার চেতনা বিলুপ্ত। সুমতি তাঁহার মুখে হাত দিয়া দেখিল, দাঁত লাগিয়াছে। সুমতি চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিল, কিন্তু সে নির্ব্বোধ বালিকার ন্যায় ব্যাকুলভাবে কাঁদিয়া অনর্থক সময় নষ্ট করিল না; ক্রমাগত দুঃখ কষ্টের কঠোর আঘাত সহ্য করিয়া তাহার হৃদয় ঘাতসহ হইয়া উঠিয়াছিল। এই তরুণ বয়সে ভাগ্যচক্রের পরিবর্ত্তনে সে অনেক সহ্য করিয়াছে, এখনও কত সহ্য করিতে হইবে, তাহা সে জানিত। সুমতি মন সংযত করিয়া তাঁহার চোখে মুখে জল দিয়া ঘন ঘন পাখার বাতাস করিতে লাগিল। একান্তমনে জগজ্জননীকে ডাকিয়া বলিল, 'মা জগদম্বা, রক্ষা কর।'

এইরূপ শুশ্রূষায় অনেকক্ষণ পরে ন্যায়রত্নের চেতনাসঞ্চার হইল। তখন প্রভাত হইয়াছে।

সুমতি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, 'বাবা, কেমন বোধ হচ্ছে?'

ন্যায়রত্ন ক্লান্তস্বরে বলিলেন, 'কে, সুমতি! আমার বোধ হচ্ছিল—' ন্যায়রত্ন কথা শেষ না করিয়াই নীরব হইলেন। তাঁহার মুদিত নয়নের প্রান্তে এক বিন্দু অশ্রু দেখা দিল; কিন্তু সুমতি অল্প কাল পূর্ব্বে তাঁহার চোখে মুখে জল দিয়াছিল, সে তাহা ধরিতে পারিল না।

সুমতি পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিল, 'ঘুম আস্‌ছে বাবা ?'

ন্যায়রত্ন কোনও উত্তর দিলেন না। সুমতি মনে করিল, তাঁহার ঘুম আসিয়াছে; সে আর তাঁহাকে ডাকিল না। বস্তুতঃ ন্যায়রত্ন তখন জাগিয়াছিলেন, কিন্তু তখনও তাঁহার দুর্ব্বল মস্তিষ্ক হইতে স্বপ্নের প্রভাব বিলুপ্ত হয় নাই, তিনি সেই অদ্ভুত স্বপ্নের কথাই ভাবিতেছিলেন. তাঁহার মনে হইল, এ স্বপ্ন অমূলক নহে, ইহা বিধাতার ইঙ্গিত, তাঁহার দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে!

সুমতি নিঃশব্দে বাহিরে গেল, বাহির হইতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া সে ব্যগ্রভাবে বলরাম ঘোষের বাড়ীতে উপস্থিত হইল।

বলরাম তখন তাহার ঘরের 'পিঁড়া'য় বসিয়া একটা ডাবা হুঁকায় ধূমপান করিতেছিল। তাহার রাখাল কৃষাণেরা বহু পূর্ব্বে শয্যাত্যাগ করিয়া স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, কেহ গো দোহন করিতেছিল, কেহ গরুকে জাব মাখিয়া দিতেছিল, কেহ বিচিলী চুরাইতেছিল। স্ত্রীলোকেরা পুরুষদের নিদ্রাভঙ্গের পূর্ব্বেই উঠিয়া কেহ ধান ভানিতেছিল, কেহ চিঁড়া কুটিতেছিল, কেহ বাড়ীর আঙ্গিনায় ছড়া ঝাঁট দিতেছিল।

এইরূপ প্রত্যূষে সুমতিকে ব্যগ্রভাবে আসিতে দেখিয়া বলরাম বিস্মিত হইল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে একটু ভয়ও হইল। সে জানিত, 'বাবা ঠাকুর' 'শক্ত কাহিল'। বলরাম তাড়াতাড়ি হাত হইতে হুঁকা নামাইয়া সুমতিকে জিজ্ঞাসা করিল, 'দিদি ঠাক্‌রুণ, রাত পোয়াতে না পোয়াতে উঠে এসেছেন যে! বাবাঠাকুরের 'আবস্তা' ভাল ত ?'

সুমতি ক্রন্দমানকণ্ঠে বলিল, 'আর ভাল! বলাই দাদা, কাল রাত্রে বাবা ত ফুরিয়েই গিয়াছিলেন।'

বলরাম কপালে দুই চোখ তুলিয়া সবিস্ময়ে বলিল, 'আ সব্বোনাশ! তুমি বুলছো কি, দিদি ঠাক্‌রুণ! কাল সাঁজের ব্যালা তাঁকে দেখ্যা আলাম্। তিনি কইলেন ভালই আছেন, আর এক আত্তিরের মদ্দি তিনি ফুইরিয়ে যাবার মতোন হয়েলেন ?'

সুমতি বলিল, 'হাঁ বলাই দাদা, শেষ রাত্রে হঠাৎ তাঁর দাঁত লেগে একেবারে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন; একে রাত্রিকাল, তার উপর আমি একা স্ত্রীলোক, কি যে করি, কিছুই ভেবে স্থির করতে পারি নে, বাবার চোখে মুখে জল দিই, পাখা করি, দাঁতি ছাড়িয়ে দিই, তার পর তিনি একটু সুস্থ হয়ে ঘুমুলেন। রাত্রে একবারও চোখের পাতা বুঁজতে পারি নি, সমস্ত রাত্রি

ব'সে কাটিয়েছি। ভোর হ'তে না হ'তে তোমার কাছে আস্‌ছি। কি করবো বলাই দাদা! কোথায় যাব? কি করে বাবা এ যাত্রা রক্ষা পাবেন? তুমিই আমার বল বুদ্ধি ভরসা, বাবা যাতে রক্ষা পান—তার একটা উপায় কর। আমার যে আর তিন কুলে কেউ নেই বলাই দাদা!'

সুমতি অঞ্চলে চক্ষু ঢাকিয়া নিঃশব্দে রোদন করিতে লাগিল।

বলরাম সুমতির কথা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইল, সে তাহাকে সান্ত্বনা-দানের অভিপ্রায়ে বলিল, 'কেঁদ না দিদিঠাকৃরুণ! বাবাঠাকুরের আবস্তা ছাখে যদি তুমি এ্যামোন ধারা অসামাল হয়্যা পড়ো, তাহলি তাঁর 'তাওং' করবা ক্যামোন্ করো্যে। আমরা তামান্ গাঁ-ভার লোক বাবাঠাকুরকে বাপ্ দাদার মতোন ছিদ্দা ভক্তি করি, আমরা থাকৃতে তোমার ভাব্‌নাতা কি? গাঁ-শুদ্দ লোক যার ভাই ভাইপো, তার আবার চিন্তে? তবে কথাডা কি জানো দিদিঠাকৃরুণ! বাবা ঠাকুরের ঐ ক্যামোন্ এক 'জিজ্', তিনি ওসুদ খাবে না। ওসুদ পত্তোর না খেলে কি ব্যায়রাম সারে? গরু যে গরু, ব্যায়রাম হ'লে তাকেও আমরা 'দেগে' দিই।'

সুমতি অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া বলিল, 'বলাই দাদা, ওটা তোমার বুঝ্‌বার ভুল; বাবা যে ঔষধ খাবেন না, এ কথা কোন দিনও বলেন নি। তিনি ঔষধ যে খাবেন, তেমন কবিরাজ কোথায়? তোমাদের এ অঞ্চলে কি ভাল কবিরাজ আছে? তিনি হাতুড়ে বৈদ্যের ঔষধ ব্যবহার করতেই নারাজ, বলেন, হাতুড়ের ঔষধ খাওয়া মহাপাপ। প্রাণ গেলেও তিনি কোন হাতুড়ে বৈদ্যের ঔষধ খাবেন না।'

বলরাম চিন্তিতভাবে বলিল, 'তবেই ত ফ্যারে ফেল্‌লে দিদি ঠাকৃরুণ! আমাদের এ তল্লাটের মদ্দি হরি নাপ্‌তির মতোন ডাক্‌সাইটে কব্‌রেজ্ আর এট্টাও নেই। তাকেই ত ডাক্‌তে চেয়েলাম, তা বাবাঠাকুর না করলেন। ক্রেমেই ত বাড়াবাড়ি হয়ে উঠ্‌ছে, বল ত তাকে ডেকে আনি।'

সুমতি মাথা নাড়িয়া বলিল, 'না বলাই দাদা! তাকে ডেকে কাজ নাই! বাবা সেই নাপ্তের ওষুধ খাবেন না; তাকে ডাকার কথা শুন্‌লেই তিনি হয় ত রেগে উঠ্‌বেন। যে কবিরাজের উপর রোগীর শ্রদ্ধা না থাকে, তার ঔষধে কোনও ফল হয় না। আশ-পাশের কোনও গ্রামে কি কোনও ভাল বৈদ্য নেই?'

বলরাম ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিল, 'হাঁ, আমাদের পাশের গাঁয়েই এক

জন বদ্দির বাড়ী। বদ্দির নাম সাম সেন। মস্ত কব্রেজ, কেটে জোড়া দিতে পারে, আর তার বিদ্যের 'সোমোর' নেই, পাড়াগেঁয়ে গরীব লোকে ত আর এত বড় কব্রেজকে পৃতিপালন করতে পারে না, তাই সাম সেন সহরে কব্রেজি করে। শুনেছি তিনি পূজার সময় বাড়ী এসেছে, আজও বাড়ীতেই আছে, বল ত তেনাকেই একবার ডাকি, তবে তেনার খাঁই বড্ড। বেশী ট্যাকা নৈলে রা কাড়েন না।'

সুমতি ব্যগ্রভাবে বলিল, 'বলাই দাদা, তুমি আমাদের অবস্থা ত সকলই জান। আমাদের নগদ টাকাকড়ি কিছুই নেই, তবে আমরা তাঁর খাঁই কি করে মিটাবো? দাদা, এক দিন তুমিই বাবার প্রাণদান করেছ, এত দিন তুমিই আমাদের বজায় রেখেছ, আমার বল বুদ্ধি ভরসা সবই তুমি—তুমি যদি দয়া করে এ দুর্দ্দিনে—'

নিরক্ষর অসভ্য চাষা বলরাম ঘোষ আত্মপ্রশংসা-শ্রবণে অত্যন্ত বিব্রত হইয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, 'আরে ও কি কথা কও দিদি ঠাক্রুণ! আমি তোমাদের এমন কি 'উগ্গোর' (উপকার) করিছি যে, সেই তুশ্চ্ কথা তুলে দশ মুখে বল্তে লাগ্লে? আমাদের বাপ্ দাদাদের বেস্তর পুণ্যি ছিল, তাই বাবাঠাকুরের নাগাল পেয়েছি, তাঁকে এই চাষার গাঁয়ে বসাতে পেরেছি। তাঁর ধার শোধ দেওয়া কি আমাগোর মতোন্ নোকের সাধ্যি? তুমি হুকুম দিলেই কব্রেজ মশাইকে নিয়ে আস্তে পারি; না হয় বাবা ঠাকুরের চিকিচ্ছেয় আমার এক গোলা ধানই যাবে। বদ্যিকে দুদ্ খেতে না হয় একটা গাই বাছুর দেব; এর বেশী সে আর কি দাবী করবে?'

সুমতি বলিল, 'তবে দাদা, তুমি কবিরাজ মশায়ের খোঁজে শীঘ্র যাও, এই বেলাতেই যাতে তিনি আসেন, তা করা চাই।'

বলরাম উঠিয়া তাহার রাখাল কৃষাণদের ডাকিল। তাহারা তাহার সম্মুখে আসিলে সে প্রত্যেককে নির্দ্দিষ্ট কার্য্যের ভার দিয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল, এবং কোমরে একখানি ময়লা চাদর জড়াইয়া তালপাতার ছাতি ও তৈলপক্ক বাঁশের লাঠী লইয়া গ্রামান্তরে যাত্রা করিল।

সুমতি বলরামকে কবিরাজের সন্ধানে পাঠাইয়া তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরিয়া আসিল। একে উপর্য্যুপরি কয়েক রাত্রি জাগরণ, তাহার উপর এই দুশ্চিন্তা, তাহার শারীরিক ও মানসিক অবস্থা তখন কিরূপ শোচনীয়, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব; চিন্তাকুলচিত্তে সে গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিল, তাহার

পিতার তখনও নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই ; সে তাঁহার নিদ্রার ব্যাঘাত না করিয়া ধীরে ধীরে গৃহকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইল।

সংসারের কাজ শেষ হইলে সুমতি এক জন প্রতিবেশিনীর গৃহে উপস্থিত হইয়া তাহাকে কবিরাজ শ্যাম সেনের কথা জিজ্ঞাসা করিল ; কবিরাজের বাড়ী কোন্ গ্রামে, সেই গ্রাম রামদেবপুর হইতে কত দূর, এ সকল কথা বলরামকে জিজ্ঞাসা করিতে ভুলিয়াছিল বলিয়াই সুমতি প্রতিবেশিনীকে এ সকল কথা জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু সেই বর্ষীয়সী গোপকন্যা তাহার কোনও প্রশ্নেরই উত্তর দিতে পারিল না। তখন সুমতি বাড়ী ফিরিয়া বৈদ্যের আগমনপ্রতীক্ষায় পথের দিকে চাহিয়া রহিল। কোনও কাজেই তাহার মন বসিল না।

প্রায় মধ্যাহ্নকালে বলরাম এক পা ধূলা লইয়া ঘর্ম্মাক্তকলেবরে কবিরাজ সহ ন্যায়রত্নের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইল। সুমতি কবিরাজকে দেখিয়াই ঘরের ভিতর গিয়া তাহার পিতাকে বলিল, 'বলাই দাদা তোমার জন্যে কবিরাজ নিয়ে এসেছে ; কবিরাজ মশায়কে ডেকে আনি ?'

ন্যায়রত্নের নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল, তিনি চক্ষু মুদিয়া স্থিরভাবে পড়িয়াছিলেন, সুমতির কথা শুনিয়া চক্ষু মেলিয়া সুমতির মুখের দিকে চাহিলেন, ক্ষীণস্বরে বলিলেন, 'কোন্ কবিরাজ মা! সেই নাপ্‌তে বেটা আমার চিকিৎসা করতে এসেছে ?'

সুমতি হাতুড়ে নাপিতের প্রতি তাহার পিতার অশ্রদ্ধার কথা জানিত, সে তাঁহাকে আশ্বস্ত করিবার জন্য বলিল, 'নাপিত কেন ? সেই নাপিত ভিন্ন কি দেশে আর কবিরাজ নাই বাবা ? ইনি সহরের খুব বড় কবিরাজ, পাশের কোন্ গ্রামে বাড়ী, নাম শ্যাম সেন।'

সুমতির কথা শেষ না হইতেই বলাই দ্বারপ্রান্ত হইতে ডাকিল, 'দিদি ঠাক্‌রুণ!'

সুমতি বাহিরে আসিয়া কবিরাজ মহাশয়কে গৃহে প্রবেশ করিতে অনুরোধ করিল। কবিরাজ ন্যায়রত্নকে অভিবাদনপূর্ব্বক ন্যায়রত্নের শয্যাপ্রান্তে উপ-বেশন করিলেন ; তাহার পর গম্ভীরভাবে তাঁহার হাত ধরিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নাড়ী দেখিলেন, এবং ন্যায়রত্নকে তাঁহার রোগ সম্বন্ধে ধীরে ধীরে কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

কবিরাজ প্রৌঢ়বয়স্ক, ধীরপ্রকৃতি এবং সুচিকিৎসক। আয়ুর্ব্বেদে তাঁহার গভীর জ্ঞান ছিল ; বর্ত্তমান কালের উপাধিব্যাধিমণ্ডিত বাক্যবাগীশ

ধন্বন্তরীগণের ন্যায় তিনি চরক সুশ্রুতের কতকগুলি শ্লোক আবৃত্তি করিয়া ন্যায়রত্নের নিকট স্বীয় বিদ্যাবত্তার পরিচয় প্রদান না করিলেও কবিরাজী চিকিৎসা সম্বন্ধে তিনি ন্যায়রত্নের সহিত এরূপ দুই চারিটি কথার আলোচনা করিলেন, যাহা শুনিয়া ন্যায়রত্ন সহজেই বুঝিতে পারিলেন, কবিরাজ মহাশয়ের বেশ পড়াশুনা আছে,—যথেষ্ট অভিজ্ঞতাও আছে। বিশেষতঃ এই কবিরাজটি যাঁহার ছাত্র, তিনি রাঢ় দেশের এক জন বিখ্যাত কবিরাজ, ন্যায়রত্ন তাঁহাকে চিনিতেন, এবং ধন্বন্তরী-কল্প কবিরাজ বলিয়া তাঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন। এরূপ কবিরাজের উপযুক্ত ছাত্রের দ্বারা চিকিৎসা করাইতে ন্যায়রত্নের আপত্তি হইল না।

কবিরাজ মহাশয় বলরাম ঘোষের নিকট শুনিয়াছিলেন, তাহাদের 'বাবাঠাকুর' পরম ধার্ম্মিক ও মহাপণ্ডিত ব্যক্তি; তিনি প্রথমে মনে করিয়াছিলেন, ন্যায়রত্ন 'গয়লার পুরুত' কি 'গুরুঠাকুর', কি সেই শ্রেণীর কোনও ব্রাহ্মণ হইবেন, কিন্তু ন্যায়রত্নের সহিত অল্প দুই চারিটি আলাপ করিয়াই তাঁহার ধারণা হইল, সত্যই তিনি সুপণ্ডিত, শাস্ত্রজ্ঞ ও ভক্ত সাধক। কবিরাজ মহাশয় তাঁহার উত্তরীয়প্রান্ত হইতে ঔষধের পুঁটুলি খুলিয়া লোহিত ও কৃষ্ণবর্ণ দুইটি বড়ী ও একটি পাচনের ব্যবস্থা দিয়া ন্যায়রত্নের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। তাঁহার দর্শনী সম্বন্ধে তিনি ন্যায়রত্ন বা সুমতিকে কোনও কথা বলিলেন না, বলরাম ঘোষের সহিত তাহার কোনও বন্দোবস্ত হইয়াছে কি না, তাহাও তাঁহারা জানিতে পারিলেন না।

সুমতি বলরামকে নিভৃতে ডাকিয়া সে কথা জিজ্ঞাসা করিলে বলরাম বলিল, 'সে খোঁজে তোমার দরকারডা কি দিদি ঠাকুরুণ! সে যা করতে হয়, আমি করবো। এখন ওসুদ পত্তোর খাওয়ানো যাতে দস্তুর মতোন হয়—তুমি তাই কর। বাবাঠাকুরকে বাঁচানো চাই দিদি!'

সুমতি বলিল, 'মা জগদম্বা যদি মুখ তুলে চান, তবেই বাবা রক্ষা পাবেন, কিন্তু বলাই দাদা, তোমার ঋণ আমরা কখনও শোধ দিতে পারব না।'

'আমাদের দেনা পাওনা এ জন্মে শোধ হবে না দিদি!' বলিয়া বলরাম বহির্দ্বারে কবিরাজের অনুসরণ করিল। সুমতিও তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া লজ্জা ত্যাগ করিয়া সজলনেত্রে কাতরভাবে কবিরাজকে বলিল, 'কবিরাজ মশায়! কি রকম বুঝছেন? আমার বাবা এ যাত্রা রক্ষা পাবেন ত?'

কবিরাজ গম্ভীরভাবে বলিলেন, 'দেখ মা, এই সবেমাত্র চিকিৎসা আরম্ভ

হ'লো, ফলাফলের কথা এখনই কি করে বল্‌ছি? তবে চিকিৎসাটা আরও পূর্ব্বে আরম্ভ হওয়া উচিত ছিল। গোড়ায় আদৌ চিকিৎসা হয় নি। প্রাচীন বয়স, শরীরে কিছু নাই, বড়ই দুর্ব্বল হয়ে পড়েছেন; রোগও কিছু কঠিনই হয়েছে। তুমি খুব সাবধানে ওঁর শুশ্রূষা কর, নিয়ম মত ঔষধ পথ্য দাও। চিকিৎসার সময় অতীত হয়েছে, এ কথা বলিনে; তবে চেষ্টামাত্র আমাদের সাধ্য, পরমায়ু দেওয়ার মালিক আমরা নহি, সুতরাং রক্ষা পাওয়া না পাওয়া এখন ভগবানের হাত।'

সুমতি বুঝিল, তাহার পিতার জীবনরক্ষা সম্বন্ধে কবিরাজেরও সন্দেহ হইয়াছে; তিনি কোনও আশা ভরসা দিতে পারিলেন না। সুমতি দশ দিক অন্ধকার দেখিল, তাহার মাথা ঘুরিয়া গেল; সে আড়ষ্ট-দেহে সেইখানেই বসিয়া পড়িল।

এই সময় এক জন ভিখারী কিঞ্চিৎ ভিক্ষার আশায় বলরাম ঘোষের গৃহদ্বারে আসিয়া গোপীযন্ত্র বাজাইয়া গান ধরিল,—

'মা মা ব'লে আর ডাক্‌বো না,
তারা, দিয়েছ, দিতেছ কত যন্ত্রণা!'

শ্রীজীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

নন্দনে আশীর্ব্বাদ।

কি শ্যামল রস-ভরা সাধের ভুবন,
ছায়া-মাখা বনরাজি মধুর কেমন,
হরষ সাগর হ'য়ে ঘিরে বসুধায়
দিন নাই রাত নাই শুধু গান গায়।
মৃত্তিকা পরশ তরে দূরের কল্লোল
তীর্থের আশায় আসে তুলিয়া হিল্লোল;
পরশি লুটায়ে পড়ে বসুধার পায়
সেই বসুধার শিশু! পেয়েছি তোমায়।
বিশ্ব-সৌন্দর্য্যের মাঝে পশেছে আমর
কর্ম্মে ধর্ম্মে জ্ঞানে শুধু পিপাসা দুর্জ্জয়,
আবৃত্তি করিছে স্বার্থ আপন সংহিতা,
নরচিত্তে জ্বালাইছে রাবণের চিতা।
এসেছ কবির ঘরে, কবির মতন
দীনভাবে এক পাশে থেক রে রতন!

শ্রীবেণোয়ারীলাল গোস্বামী।

অপরাধী।

১

বাদলের মা গোবর কুড়াইয়া, কুলা ধুচুনী বেচিয়া অনেক কষ্টে বাদলকে মানুষ করিল বটে, কিন্তু যতক্ষণ না ছেলের মাথায় এক গণ্ডূষ জল দিতে পারিল, ততক্ষণ সে আপনার এত পরিশ্রম, এত কষ্টকে সার্থক বলিয়া মনে করিতে পারিল না, এবং পাছে সেই ঈপ্সিত জলগণ্ডূষ প্রদানের পূর্ব্বেই তাহাকে পরলোকে গিয়া ছেলের কাছেই এক গণ্ডূষ জলের প্রার্থী হইতে হয়, এই আশঙ্কায় দিন দিন কাতর হইয়া পড়িতেছিল।

মায়ের মত ছেলের যদি আগ্রহ থাকিত, তাহা হইলে মা এতদিন নিশ্চিন্ত হইয়া পরপারে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতে পারিত। কিন্তু মায়ের সব চেয়ে দুঃখের বিষয় হইল, ছেলেটা মানুষ হইয়াও মানুষ হইল না, সংসারের উপর তাহার একটুও আগ্রহ দেখা গেল না। গান গায়িয়া, যাত্রা শুনিয়া, কীর্ত্তনে গৌর গৌর বলিয়া নাচিয়া বেড়াইতে পাইলে সে আর কোনও দিকেই ফিরিয়া চাহিত না। অথচ সে বেতের কাজ এমন শিখিয়াছিল যে, কাজে গেলেই বারো গণ্ডা পয়সা লইয়া ঘরে ঢুকিত। সুতরাং বাদল যদি পাঁচটা মাস মন দিয়া কাজ করিত, তবে বাদলের মার আজ চিন্তা কি? কবে সে ছেলের বিবাহ দিয়া আজ যোগ্য বউ লইয়া ঘরকন্না করিত। যাহারা বাদলের সমবয়স্ক, অথচ বাদল অপেক্ষা কম মজুরী পায়, তাহারা আজ ছেলের বাপ, বাদল কিন্তু এখনও আইবুড়ো। সকলই অদৃষ্ট!

বাদল যদি মাসের মধ্যে পনরটা দিনও কাজ করিত, তাহা হইলেও ভাবনা ছিল না। কিন্তু সে দশটা দিনও কাজে যাইত কি না সন্দেহ। কাজে যাইবার পক্ষে কতকগুলা বাধা ছিল। দুই চারি ক্রোশের মধ্যে কোথাও যাত্রা হইলে এবং তাহার আসরে যন্ত্র পড়া হইতে আরম্ভ করিয়া সংএর শেষ পর্য্যন্ত না শুনিলে বাদলের আদৌ তৃপ্তি হইত না। কোথাও কীর্ত্তন হইলে বা অষ্টমপ্রহর, চব্বিশ প্রহর হইতেছে শুনিলে বাদল হাতের কাজ ফেলিয়া সেখানে ছুটিয়া যাইত। ব্রাহ্মণ শূদ্র যে কোনও জাতির মড়া মরিয়াছে শুনিলে বিনা আহ্বানেই তথায় উপস্থিত হইত, এবং যতক্ষণ না চিতা নিবিত, ততক্ষণ সে স্থান ত্যাগ করিত না। এই সকল বাধার জন্য বাদল মাসের অধিকাংশ দিনই কাজে যাইতে পারিত না।

বাদলের সব চেয়ে আকর্ষণের বস্তু ছিল কীর্ত্তন। খোলের শব্দ কানে গেলে মেঘগর্জ্জনশ্রবণে মত্ত শিখীর ন্যায় বাদল হাতের কাজ ফেলিয়া ছুটিয়া যাইত। খোলের বাজনার তালে তালে তাহার অন্তরটা যেন তালে তালে নাচিতে থাকিত; হৃদয়ের আবেগে স্থির থাকিতে না পারিয়া কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে গায়িতে থাকিত—

'নিতাই এনেছে নাম হরিবোল হরিবোল!'

গায়িতে গায়িতে তাহার কণ্ঠস্বর গাঢ়, নেত্রপল্লব আর্দ্র হইয়া আসিত; হাত দুইটা উপরে তুলিয়া, ভাবস্তিমিত দৃষ্টি ঊর্দ্ধে স্থাপন করিয়া বাহ্যজ্ঞানশূন্য-ভাবে প্রেমপুলকিতকণ্ঠে নাচিয়া নাচিয়া গায়িত—

'নিতাই এনেছে নাম হরিবোল হরিবোল!'

তাহার এই অস্বাভাবিক ভাবাবেশদর্শনে অনেক মুণ্ডিতমস্তক স্ফীতোদর বাবাজী এই ডোমের ছেলেটার দিকে ঈর্ষ্যাপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিত। অনেকে বলিত, 'বেটার সব ভণ্ডামী।' নিতান্ত বুদ্ধিমানেরা স্থির করিত, রেধো ডোমের বেটা বাদলা ডোম পাকা চোর না হইয়া যায় না।

বুদ্ধিমান বা নির্ব্বোধ যে যাহাই মনে করুক, বাদলা কিন্তু আপনার কাজের ক্ষতি করিয়া সংকীর্ত্তনে নাচিয়া বেড়াইত, এবং তজ্জন্য মাতার ও অন্তরঙ্গ কুটুম্বগণের তিরস্কার অকাতরে সহ্য করিত।

২

'বাদলা, ওরে হতভাগা!'

সকাল হইতে দুপুর পর্য্যন্ত কীর্ত্তনে নাচিয়া আসিয়া বাদলা তেল মাখিতে বসিয়াছিল। তেলের ভাঁড়ে তেলও বেশী ছিল না, যেটুকু ছিল, তাহাই মুছিয়া উষ্ণ মস্তিষ্কটাকে কোনওরূপে তৈলসিক্ত করিতেছিল; এমন সময় মাতার কঠোর আহ্বানে বিরক্ত হইয়া সে একটু রাগতভাবে উত্তর দিল, 'কেনে?'

মা বলিল, 'আজ না কাজে যাবি বলেছিলি?'

গম্ভীরভাবে বাদল উত্তর করিল, 'যাচ্ছিলুম তো। রাস্তায় যেতে যেতে নিতে বললে, বীরু পোদ্দারের বাড়ীতে এক জন বাবাজী এয়েছে, খুব ভাল নাম গায়।'

মা। তাই বুঝি সেখানে ছুটে গিয়েছিলি?

বাদল। তোমার ঐ এক কথা। ছুটে যাব কেনে? মনে করলুম,

বাবাজীকে একবার দেখে যাই। গিয়ে দেখি, কেত্তন আরম্ভ হয়েছে। বাবাজী গান ধরেছে—'নিতাই শমনদমন নাম এনেছে, ভয় দূরে গিয়েছে।'

মা। আর তুইও অমনি তার সঙ্গে গলা জুড়ে দিলি?

বাদল। দূর, আমি গাইতে যাব কেনে? গানটা বড় মিষ্টি লাগলো, তা বলি একটু শুনে যাই। শুনতে শুনতে দেখি, পহরখানেক বেলা হয়ে গিয়েছে। বাবাজী কি চমৎকার গায়! মা, তুই যদি শুনতিস্—

মা রাগে তর্জ্জন করিয়া বলিল, 'আমি শুনলে তার মাথায় সাত ঘা খ্যাঙরার বাড়ি বসিয়ে দিতাম।'

দন্তে জিহ্বা দংশন করিয়া বাদল বলিল, 'ছিঃ মা, বোষ্টম বাবাজীকে এমন সব কথা বলতে আছে? ওতে যে তোর পাপ হয়।'

মুখভঙ্গী করিয়া মা বলিল, 'ওঃ, পাপ হয়! আমি ডোমের মেয়ে, আমার আবার পাপ পুণ্যি কি রে!'

ডোমের মেয়ের পাপ পুণ্য নাই শুনিয়া বাদল যেন অবাক্ হইয়া মায়ের মুখের দিকে চাহিল। মা রোষতীব্রকণ্ঠে বলিল, 'তোর বাপ ঠাকুরদাদা চুরী ডাকাতী ক'রে, মানুষের মাথা ফাটিয়ে মরে গেল, আর তুই এয়েছিস আমাকে পাপ পুণ্যির ভয় দেখাতে। ভারী আমার দত্যিকুলের পেল্লাদ কি না।'

ঈষৎ হাসিয়া বাদল বলিল, 'আমাকেও কি চুরী ডাকাতী করতে বলিস্ মা?'

ক্ষোভগম্ভীরস্বরে মা বলিল, 'কপাল আমার, তুই সে সব বড় বড় কাজ করবি! তা হ'লে আজ আমার ভাবনা কি? তুই কি জানবি, এক এক রাতে তোর বাপ কত সোনা রূপোর গয়না, কত ভাল ভাল কাপড় এনে হাজির কত্তো। বল্‌তো; আহ্লাদী, রাতারাতি প'রে সাধ মিটিয়ে নে। সে এক একখানা কাপড় গয়নার দাম কত!'

বাদল আশ্চর্য্যান্বিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল, 'সে সব কাপড় গয়না কি হলো মা?'

মা বলিল, 'হবে আর কি! রাতটা থাকতো, সকাল হলেই ভাঁড়ারীর ঘরে চলে যেতো।'

বাদল। তোদের কি লাভ থাকতো?

মা। লাভ থাকবে না কেনে? এক সের সোনার গয়না দিলে নগদ পাঁচ গণ্ডা টাকা পাওয়া যেতো। রূপোর সের ছিল বুঝি তিন টাকা। এক রাত ঘুরে এসে তোর বাপ এক মাস পায়ের ওপর পা দিয়ে খেতো।

ভ্রূকুটী করিয়া বাদল বলিল, 'আমাকেও কি তাই কত্তে বলিস ?'

একটু অপ্রতিভভাবে মা বলিল, 'তা বলবো কেনে। তবে গতর খাটিয়ে এনে খা। তা নয়, তোর কেবল হরিবোল হরিবোল !'

সহাস্যে বাদল বলিল, 'শুন্‌তে তোর বড্‌ড মন্দ লাগে, না ?'

মা বলিল, 'মন্দ না লাগুক, লোকে যে নিন্দে করে। বলে, ডোমের ছেলে, তার আবার এত হরিনাম কেনে ?'

গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া বাদল বলিল, 'বটে !'

মা বলিল, 'আর হরিনাম ক'রে বেড়ালেই বা তোর চলবে কেনে ? পেট আছে, বাইশ বছরের থুবড়ো হলি, তোকে বিয়ে কত্তে হবে। তুই কি বোষ্টমের ছেলে যে, জয় রাধে বললেই ভিক্ষে পাবি ? বুড়ো বয়সে আমি তোর রোজগার বসে খাব, তা নয়। এখনও আমাকে খেটে তোকে খাওয়াতে হচ্ছে। কুলো ধুচুনী ঘাড়ে ক'রে রোদে পুড়ে জলে ভিজে আমাকে বাজারে যেতে হয়, পাঁচ জনে আমার মুখ পুড়িয়ে দেয়। বলে, হ্যাদে বাদলের মা, তোর এখনও এ ভোগান্তি কেনে ?'

মায়ের কথায় বাদল লজ্জা অনুভব করিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তার পর আস্তে আস্তে উঠিয়া গামছা কাঁধে ফেলিয়া স্নান করিতে চলিল।

মায়ের কথায় বাদলের মনে আঘাত লাগিয়াছিল। এ জন্য খুব বিষণ্ণভাবে ভাবিতে ভাবিতে চলিল। কতক দূর গিয়া মনের এই বিষণ্ণতা দূর করিবার অভিপ্রায়ে গুন্‌গুন্‌ করিয়া গান ধরিল—

'হরিনাম বিনে আর কি ধন আছে সংসারে,
বল্‌ মাধাই মধুর স্বরে।'

৩

বাদল মায়ের কাছে প্রতিজ্ঞা করিল, অতঃপর সে আর বাজে কাজে ঘুরিয়া বেড়াইবে না, মনোযোগসহকারে অর্থোপার্জ্জন করিয়া মাতার অভিলাষ পূর্ণ করিবে। মায়ের আহ্লাদের সীমা রহিল না; সে ছেলেকে শুধু আশীর্ব্বাদ করিয়াই ক্ষান্ত হইল না, ইহাতে ভবিষ্যতে সে কত সুখী হইবে, এবং পাঁচ জনের এক জন হইয়া থাকিতে পারিবে, তাহা ব্যক্ত করিয়া বাদলকে উৎসাহিত করিতে লাগিল। মায়ের কথায় বাদলও ভবিষ্যতের আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

পর দিন সকালে উঠিয়া বাদল কাজে যাইতেছিল। তাঁতিপাড়া ছাড়াইয়া

সবেমাত্র বামুনপাড়ায় ঢুকিয়াছে, এমন সময় পশ্চাৎ হইতে কে ডাকিল, 'বাদল!'

পিছনে ডাক শুনিয়া বাদল বিরক্তভাবে ফিরিয়া চাহিতেই দেখিল, হরিশ হালদার। বিরক্তি সত্ত্বেও বাদল কপালে হাত ঠেকাইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। হালদার মহাশয় তাহার নিকটস্থ হইয়া খুব জোরে আশীর্ব্বাদবাক্য উচ্চারণ-পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সকালেই কোথায় চলেছ হে?'

বাদল উত্তর দিল, 'কাজে যাচ্ছি।'

'ওঃ, কাজে যাচ্ছো' বলিয়া হালদার মহাশয় মুখখানা একটু বিকৃত করিলেন। বাদল জিজ্ঞাসা করিল, 'কেনে গা বাবাঠাকুর?'

হালদার মহাশয় বলিলেন, 'একটু কাজ ছিল বাপু, যদি কত্তে পাত্তে, বড়ই উপকার হ'তো।'

বাদল। কাজটা কি?

হালদার। আর কিছু নয়, মেজো ছেলেটার অসুখ, গুপীগঞ্জ থেকে ওষুধ আনতে হবে। আমার আবার ঘোষেদের বাড়ীতে তুলসীর বরাত আছে। বড় ছেলেটা গেলে তার ইস্কুল কামাই হয়। তাই বলছিলাম—তা যখন কাজে যাচ্ছো—

বাদল একটু ভাবিয়া বলিল, 'তাই তো বাবাঠাকুর, না গেলে রোজটা মারা যায়।'

প্রফুল্লহাস্যসহকারে হালদার মহাশয় বলিলেন, 'ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ থাকলে অমন কত রোজ পেয়ে যাবে। তা হ'লে দাঁড়াও, শিশি আর ওষুধের দাম এনে দিই।'

বাদলের উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই হালদার মহাশয় দ্রুতপদে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং অনতিবিলম্বে শিশি ও পয়সা আনিয়া বাদলের হাতে দিয়া বলিলেন, 'আট আনা ওষুধের দাম। পয়সা আট গণ্ডা বেশ ক'রে বেঁধে নাও। ঘরে মুড়ী বাড়ন্ত, নয় তো এক মুঠো দিতাম, রাস্তায় জল খেতে। তা দু' কোশ রাস্তা বৈ তো না, ফিরতে কত বেলাই বা হবে।'

পয়সাগুলা গুণিয়া কাপড়ের খুঁটে বাঁধিতে বাঁধিতে বাদল বলিল, 'নদীপারের দু'টো পয়সা চাই না?'

হালদার মহাশয় বলিলেন, 'ব্রাহ্মণের কাছে তো পয়সা নেয় না। আমার কাজে যাচ্ছো বললে তোমাকেও হয় ত ছেড়ে দেবে। যদি নেহাৎ না ছাড়ে,

তুমিই পয়সা দিও। খুচরো পয়সা আর নাই, সকাল বেলা আবার কোথায় সিকি ভাঙ্গাতে যাব। তা হ'লে বাড়ীতে ওষুধটা দিয়ে যাবে। আমার আবার বেলা হ'য়ে যায়, চললাম।'

হালদার মহাশয় বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া পড়িলেন। বাদল গুপীগঞ্জের পথ ধরিয়া গাহিতে গাহিতে চলিল—

'নিতাই চলিতে চলিতে চলিতে চলিতে
বলিতে বলিতে যায়,
এ নাম বিনা মূল্যে দিব, জগত মাতাব,
কে নিবি তোরা আয়।'

৪

'বাদল!'

ঔষধ লইয়া বাদল ফিরিয়া আসিতেছিল। নদী পার হইয়া সবেমাত্র মাঠের রাস্তা ধরিয়াছে, এমন সময় পশ্চাৎ হইতে প্রতিবেশী বেজো সর্দ্দারের মেয়ে হারাণী ডাকিল, 'বাদল!'

বাদল থমকিয়া দাঁড়াইল, এবং পশ্চাতে ফিরিয়া একটু হর্ষস্ফীতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, 'কে? হারাণী!'

হারাণী মৃদুহাস্যসহকারে বলিল, 'তবু ভাল, চিনতে পেরেছিস্। আমি তো সেই নদীর পাড় থেকে চেল্লাচ্ছি; আমার গলা ফেটে গেল, তোর আর খেয়াল নাই। আজ কাল তুই কালা হয়েছিস্ না কি?'

'একটু'! বলিয়া বাদল হাসিল; জিজ্ঞাসা করিল, 'কোথায় গিয়েছিলি?'

হারাণী উত্তর করিল, 'চুলোয়। রঙ্গপুরের হাটে গিয়েছিলাম।'

'কেন, গড়ন বেচতে?'

'তা নয় তো কি রূপ দেখাতে?'

'কি জানি।'

'কি জানি কি? সত্যি কথা বল্ দেখি, দেখাবার মত রূপ আমার আছে কি না?'

'না।'

ভ্রূভঙ্গী করিয়া হারাণী বলিল, 'তুই দেখছি কানাও হ'য়েছিস।'

সহাস্যে বাদল বলিল, 'তোর রূপের জেল্লায়।'

কৃত্রিম কোপে ওষ্ঠাধর স্ফুরিত করিয়া হারাণী বলিল, 'তোর তো খুব রূপ আছে! আমাকে একটু ধার দিবি?'

'ধার নিলে ধার শুধতে হয় জানিস তো?'

'সব খাতক কি মহাজনের ধার শুধতে পারে?'

'না পারলে নাতক করে ধরে নিয়ে যায়।'

রাস্তায় চলিতে চলিতেই কথা হইতেছিল। কথাটা বলিয়া বাদল পিছনে ফিরিয়া চাহিল। হারাণীও তাহার মুখের উপর হাস্যোজ্জ্বল কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া বলিল, 'আমাকেও না হয় তাই ধরে নিয়ে যাবি।'

বাদল মৃদু হাসিল, এবং মুখ ফিরাইয়া পুনরায় পথ অতিবাহন করিতে লাগিল। যাইতে যাইতে হারাণী বলিল, 'বড্ড তেষ্টা পেয়েছে, একটু জল খেতে হবে।'

সামনেই একটা পুকুর ছিল। উভয়ে পুকুর পাড়ে উঠিয়া একটা বটগাছের ছায়ায় বসিল। হারাণীর আঁচলে এক মুঠা মুড়ি মুড়কী বাঁধা ছিল। তাহা খুলিতে খুলিতে বাদলকে জিজ্ঞাসা করিল, 'তোর জল খাওয়া হ'য়েছে?'

বাদল বলিল, 'না, ঘরে গিয়েই জল খাব।'

'এখানে খেতে দোষ আছে?'

'দোষ আর কি? কিন্তু তোর তো ঐ পুঁজি।'

'তা হোক, বেঁটে খেলে এঁটে যায়।'

বলিয়া হারাণী মুড়ি মুড়কীর অর্দ্ধাংশ বাদলের কোঁচার খুঁটে দিয়া অর্দ্ধেক নিজে লইল, এবং একটু ঘুরিয়া বসিয়া তাহার সদ্ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইল। মুড়ী চিবাইতে চিবাইতে বাদল জিজ্ঞাসা করিল, 'তোর সাঙ্গার কি হলো?'

হারাণী যেন একটু উপেক্ষার সহিত উত্তর দিল, 'হবে।'

বাদল বলিল, 'হয়ে গেলে তবু তোর হাটে যাওয়া আসার কষ্ট থাকে না।'

ম্লান হাসি হাসিয়া হারাণী বলিল, ঢেঁকীকে সগ্গে গেলেও ধান ভানতে হয়, জানিস তো?'

বাদল। কেন, তিনে তো বেশ দু' পয়সা রোজগার করে?

হারাণী। কিন্তু সে দু' পয়সা ঘরে আসে না, শুঁড়ীর দোকানেই দিয়ে আসে।

বাদল। তা বটে। বেহদ্দ মাতাল। তা এই মাতালকেই তো পছন্দ করেছিস?

হারাণী। কাজেই। তোর মত সাধু পুরুষ কোথায় খুঁজে পাব বল।

বাদল। খুঁজে দেখেছিলি কি?

হারাণী। তা দেখি নি সত্যি।

মুড়ী শেষ করিয়া বাদল পুকুরে নামিয়া আঁজলা ভরিয়া জল খাইল। তার পর হারাণীর দিকে চাহিয়া আরামসূচক একটা শব্দ করিয়া বলিল, 'বড্ডই তেষ্টা লেগেছেল হারাণী, ভাগ্যিস্ তুই মুড়ী ক'টা দিলি। তোর পুণ্যি হবে কিন্তু।'

ঈষৎ হাসিয়া হারাণী বলিল, 'তা আর হবে না? দু'কুর বেলা এমন আস্ত বোষ্টমের সেবা নিয়েছি।'

বলিয়া হারাণী হাসিতে হাসিতে গিয়া পুকুরে নামিল। বাদল গাছের ছায়ার বসিয়া কোঁচার খুঁট দোলাইয়া বাতাস খাইতে লাগিল। আশে পাশে সম্মুখে পশ্চাতে রৌদ্রদগ্ধ নির্জ্জন প্রান্তর। শুধু মাথার উপর বটগাছের সবুজ পাতাগুলা বাতাসে সর্‌সর্ শব্দ করিতেছিল; পাতার আড়ে লুকাইয়া একটা কোকিল মাঝে মাঝে ডাকিতেছিল—কু-উ, কু-উ।

হারাণী জল খাইয়া, মাথায় জল দিয়া, ভিজা আঁচলে মুখ মুছিতে মুছিতে আসিয়া পাশে বসিল। বাদল বলিল, 'আজ রোদটা বড্ড চড়া।'

হারাণী বলিল, 'আমি তো একটু না জিরিয়ে উঠছি না। তুই ততক্ষণ একটা গান ধর্।'

'এই ঠিক দু'কুর বেলা গান!'

'ওঃ, ভারী তো গায়েন, তার আবার দু'কুর সাঁজের বিচার। গাইবি তো গা।'

বাদল একটু হাসিয়া ধীরে ধীরে গান ধরিল—

'তোরা চাঁদ নিবি তো আয়।
চাঁদ দাও ব'লে কত না কেঁদেছিস্,
আজ চাঁদের ছড়াছড়ি কাটোয়ায়।'

মধুর সুরতরঙ্গে প্রান্তর প্লাবিত করিয়া বাদল গায়িতে গায়িতে চলিল। হারাণী মুগ্ধ-বিহ্বল-চিত্তে তাহার অনুসরণ করিল।

এইরূপে এক জন তন্ময়ভাবে গান গায়িতে গায়িতে, আর এক জন তাহা মুগ্ধচিত্তে শুনিতে শুনিতে কখন্ যে মাঠ পার হইল, এবং গ্রামের ভিতর ঢুকিয়া গ্রামবাসীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল, তাহা উভয়ের মধ্যে কেহই জানিতে পারিল না। হালদার মহাশয়ের সক্রোধ তিরস্কারে বাদলের প্রথম চৈতন্য হইল।

হালদার মহাশয় তাহার সম্মুখবর্ত্তী হইয়া ক্রোধপরুষকণ্ঠে বলিলেন, 'তোর তো আচ্ছা আক্কেল! হুঁকুর গড়িয়ে যায়, রুগী এখনও ওষুধ পেলে না; আর তুই স্বচ্ছন্দে ইয়ারকি দিয়ে গলা হেঁকে আসছিস্।'

হালদার মহাশয় হারাণীর দিকে রোষপূর্ণ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিলেন। বাদল তাড়াতাড়ি ঔষধের শিশি বাহির করিয়া তাঁহার হাতে দিতে গেল। হালদার মহাশয় ব্যস্ততার সহিত পশ্চাৎপদ হইয়া ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন, 'মর বেটা, ঐখানে শিশিটা রাখ্। এক্ষুণি ছুঁয়ে দিয়ে নাইয়েছিলি যে!'

বাদল লজ্জিতভাবে শিশিটা মাটীতে রাখিয়া একটা প্রণাম ঠুকিয়া গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইল। হারাণী তাহার পশ্চাৎ চলিল। হালদার মহাশয় তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

৫

হালদার মহাশয়ের বেগার খাটিতে গিয়া বাদল সে দিন শুধু যে রোজটাই হারাইল; তাহা নহে; মনটাকেও সেই নির্জ্জন মাঠের মাঝে কোথায় যেন হারাইয়া আসিল। সে দিন সে কোনও কাজেই মন দিতে পারিল না; শুধু সেই রৌদ্রদগ্ধ নির্জ্জন প্রান্তর, আর তাহার মধ্যে সবুজ পাতায় ভরা বটগাছটার ছবি মনের ভিতর জাগিতে লাগিল। বাদল বিরক্ত হইয়া সন্ধ্যার পর গৌরদাস বাবাজীর আখড়ায় উপস্থিত হইল। আখড়ায় সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইল। খোল বাজিল, করতাল বাজিল, তাহার সঙ্গে হরিনামের মধুর সুর উত্থিত হইয়া সান্ধ্য গগন প্লাবিত করিতে লাগিল। কিন্তু আজ আর সে সুরে বাদলের প্রাণ তালে তালে নাচিয়া উঠিল না; কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে উঠিয়া আসিল।

হারাণীর ঘরের পাশ দিয়া আসিবার সময় সে একবার থমকিয়া দাঁড়াইল। ঘরে তখনও আলো জ্বলিতেছিল। আলোর সামনে বসিয়া হারাণী চুপড়ী বুনিতেছিল; বাদলের ইচ্ছা হইল একবার ডাকে—হারাণী! কিন্তু সে তৎক্ষণাৎ আপনাকে সামলাইয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। প্রস্থানকালে বুঝি একটু জোরে পা পড়িল। সে শব্দে চমকিত হইয়া হারাণী ডাকিল, 'কে গা?'

বাদল কোনও উত্তর না দিয়াই ছুটিয়া পলাইল। পিছনে কে হা-হা শব্দে হাসিয়া উঠিল। বাদল চিনিতে পারিল, সে তিনু, চিনিলেও সে কোনও উত্তর দিল না।

ঘরে আসিয়া বাদল মাকে বলিল, 'শিগ্‌গির বিয়ের চেষ্টা দেখ্‌ মা। আমি যেখান থেকে হোক, টাকার যোগাড় কচ্ছি।'

মা আহ্লাদের হাসি হাসিয়া বলিল, 'টাকার যোগাড় তোকে কত্তে হবে না বাপ, আমিই কচ্ছি। তুই শুধবার চেষ্টা দেখ।'

পাড়ায় রাষ্ট হইল, হারাণীর সহিত বাদলের অবৈধ প্রণয় জন্মিয়াছে। শুনিয়া সকলে হারাণীকে তিরস্কার করিতে লাগিল। তিনু আসিয়া তাহাকে কড়া কড়া কথা শুনাইয়া দিল; উত্তরে হারাণী তাহাকে গালি দিল। নেশার ঝোঁকে তিনু তাহাকে দুই চারি ঘা প্রহার দিয়া গেল।

হারাণী কাঁদিতে কাঁদিতে গিয়া গ্রামের পাঁচ জন ভদ্রলোকের কাছে নালিশ করিল। ভদ্রলোকেরা বিচার করিয়া দেখিলেন, দোষটা হারাণীর। তাহার যখন এক জনের সহিত বিবাহের কথাবার্ত্তা হইতেছে, তখন অপরের সহিত গুপ্ত প্রণয়ে আবদ্ধ হওয়া সামাজিক রীতিবিরুদ্ধ। হারাণী কিন্তু এই গুপ্ত প্রণয়ের কথা অস্বীকার করিল। কিন্তু তাহাতে কোনও ফল হইল না; হালদার মহাশয় সপ্রমাণ করিয়া দিলেন, এ বিষয়ে তিনি প্রধান সাক্ষী; সে দিন তাঁহারই ছেলের ঔষধ আনিতে গিয়া বাদল হারাণীর সহিত যে কাণ্ডটা করিয়া আসিয়াছে, তাহা অবক্তব্য। তাঁহার হাতে শাসনদণ্ড নাই, তাই রক্ষা, নতুবা সেই দণ্ডেই তিনি এই পাপিষ্ঠ ও পাপিষ্ঠাকে গ্রামবহির্ভূত করিয়া দিতেন।

ইহাতে কাহারও অবিশ্বাসের কারণ ছিল না। কেন না, অতিভক্তি যে চোরের লক্ষণ, ইহা সর্ব্বজনবিদিত মহাজন-বাক্য। সুতরাং ডোমের ছেলে বাদল যখন গৌরপ্রেমে এতটা মত্ত হইয়াছে, তখন তাহার দ্বারা যে কোনও দুষ্কার্য্য সাধিত হওয়া কিছুমাত্র অসম্ভব নহে।

বিচারে আসামী তিনুরই জয়লাভ হইল। হারাণী কাঁদিতে কাঁদিতে ঘরে ফিরিল।

বাদলের অপরাধ প্রমাণিত হইলেও তাহাকে কেহ দণ্ডিত করিতে পারিল না। কিন্তু সেই দিন হইতে বাদল যেন কেমন হইয়া গেল। সে আর কীর্ত্তনের আখড়ায় যাইত না, খোলের শব্দে তাহার প্রাণ আর তেমন নাচিয়া উঠিত না, যাত্রার ঢোল বাজিয়া থামিয়া গেলেও সে আর আসরের ধারেও যাইত না। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত নীরবে কাজ লইয়াই ব্যস্ত থাকিত। এই একটা মাসে সে বেতের কাজ এমন সুন্দর করিল যে, তেমন পূর্ব্বে বা পরে আর কখনও করিতে পারে নাই।

৬

শ্রাবণের সন্ধ্যায় ঝির-ঝির করিয়া বৃষ্টিধারা ঝরিতেছিল; জমাট মেঘে সমগ্র আকাশটা ছাইয়া ছিল। সে মেঘে বিদ্যুৎ ছিল না, গর্জ্জন ছিল না; শুধু স্তব্ধ ধূসর মেঘটা ঝির-ঝির বৃষ্টিধারায় বর্ষার সন্ধ্যাটাকে গম্ভীর করিয়া তুলিয়াছিল।

বাদল চুপ করিয়া বসিয়া প্রকৃতির এই গম্ভীর মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিতেছিল। তাহার বিবাহের সব ঠিক হইয়াছে। কাল বিবাহ; আজ সকালে সে গোকুল দত্তের হাতচিঠায় সহি দিয়া সাড়ে সাত গণ্ডা টাকা লইয়া আসিয়াছে। পাঁচ কুটুম্বের নিমন্ত্রণ হইয়াছে। সব ঠিক, কিন্তু বাদলের মনে যেন সুখ নাই; তাহার উদাস প্রাণের মধ্যে যেন একটা কিসের অভাব জাগিয়া উঠিতেছে। বাদল চুপ করিয়া বসিয়া সেই অভাবটা কোথায়, তাহাই খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল।

গৌরদাস বাবাজীর আখড়ায় খোল বাজিয়া উঠিল। খোলের শব্দ কানে যাইতেই বাদলের প্রাণটা যেন চঞ্চল হইয়া উঠিল। আজ প্রায় এক মাস সে আখড়ায় যায় নাই। এক দিন গিয়াছিল, কিন্তু বাবাজী তাহাকে অপরাধী জ্ঞানে তিরস্কার করিয়াছিলেন। হায়, যে স্থান সংসারের সার সত্য হরিনামের আশ্রয়, সেখানেও সত্যের আদর নাই? অন্তরে গভীর ক্ষোভ ও দুঃখ লইয়া বাদল সেই যে আখড়া ত্যাগ করিয়াছিল, তদবধি আর সেখানে যায় নাই। হরিনামও বোধ হয় সেই অবধি করে নাই। উঃ, এক দিন সে এই হরিনাম লইয়া কি উন্মত্তই হইয়াছিল! নিজের কাজ পর্য্যন্ত হারাইতে বসিয়াছিল। হরিনাম কি তাহাদের মত নীচ জাতির জন্য নয়? ক্ষণিকের পাপে পাপী যে, তাহার জন্য নয়? তবে যে নিতাই প্রভু মহাপাপী জগাই মাধাইকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, তাহা মিথ্যা; যবন হরিদাস নামের গুণে উদ্ধার লাভ করিয়াছিল, সে কথা গল্পমাত্র? দূর হউক, ডোমের ছেলে আমি, বেত বুনিয়া খাইব, এত সত্য-মিথ্যার বিচারে আমার দরকার কি?

'বাদল!'

চমকিতভাবে বাদল বলিয়া উঠিল, 'কে? হারাণী?'

দাবার উপর উঠিয়া হারাণী বলিল, 'আমি চল্‌লাম।'

বিস্ময়জড়িতকণ্ঠে বাদল জিজ্ঞাসা করিল, 'কোথায় যাবি?'

'চুলোয়। আমার আর কোথায় যাবার জায়গা আছে?'

'কেন যাবি?'

'ন্যাকা সাজিস্ নে। গাঁশুদ্ধ লোক যাকে দেখে ঘেন্না করে, সে কি সুখে গাঁয়ে থাকবে?'

একটু ভাবিয়া বাদল জিজ্ঞাসা করিল, 'একা যাবি?'

'সঙ্গী কোথায় পাব?'

বাদল নিরুত্তরে নতমস্তকে বসিয়া রহিল। 'তবে চললুম' বলিয়া হারাণী উঠানে নামিল। বাদল মুখ তুলিয়া বলিল, 'দাঁড়া।'

হারাণী দাঁড়াইল। বাদল উঠিয়া উঠানে নামিয়া বলিল, 'চল্।'

হারাণী বিস্ময়বিস্ফারিতদৃষ্টিতে বাদলের মুখের দিকে চাহিল। বাদল তাহা লক্ষ্য না করিয়া বলিল, 'একবার হরি বলতে পারবি?'

'পারবো।'

'আচ্ছা, বল্ হরিবোল।'

হারাণী বলিল, 'হরিবোল।'

বাদল বলিল, 'ভাল ক'রে গলা ছেড়ে বল্, হরিবোল, হরিবোল!'

হরিধ্বনিতে স্তব্ধ কুটীর প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে উভয়ে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। মা ছুটিয়া আসিয়া বলিল, 'বাদল, ওরে বাদল, কোথায় যাস্ রে?'

বাদল উত্তর দিল না; গলা ছাড়িয়া গান ধরিল—

'নিতাই শমনদমন নাম এনেছে, ভয় দূরে গিয়েছে।'

মা চীৎকার করিয়া ডাকিল, 'বাদল, ওরে বাদল!'

বাদল দুই হাত ঊর্দ্ধে তুলিয়া গায়িতে গায়িতে বলিল—

'নিতাই চলিতে চলিতে ঢলিতে ঢলিতে
বলিতে বলিতে যায়;
এ নাম বিনামূল্যে দিব, জগত মাতাব,
কে নিবি তোরা আয়।'

গায়িতে গায়িতে উভয়ে সন্ধ্যার অন্ধকারে মিলাইয়া গেল। অন্ধকারময় স্তব্ধ পল্লীপথে শুধু প্রতিধ্বনি উঠিতে লাগিল—'তোরা আয় আয় আয়।'

শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

প্রবাসী। আষাঢ়—শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়ের 'কোন্ পথে' চিন্তাশীল বৈজ্ঞানিকের বঙ্গধারা-বিশ্লেষণ। লেখকের অন্তর্দৃষ্টি ও দূরদৃষ্টি আছে। তিনি বাঙ্গালার সমাজের নানা ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আমাদের জাতির জীবনযাত্রা ও ভাব-সাধনার অসামঞ্জস্য দেখাইয়া দিয়াছেন, অতীতের সহিত তুলনায় বর্ত্তমানের সমালোচনা করিয়া ভবিষ্যতের পথ নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। দাবা খেলায় সকল চাল খেলোয়াড়দিগের চোখে পড়ে না; কিন্তু যাহারা খেলা দেখে, তাহারা 'উপর-চাল' বলিয়া দিতে পারে। যোগেশবাবু পবিত্র বিদ্যাপীঠের নিভৃত মন্দিরে আসন করিয়া, জনতার কোলাহল হইতে দূরে থাকিয়া, সকল সংঘর্ষের অতীত হইয়া বাঙ্গালার বর্ত্তমান অবস্থা ও ব্যবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন, এবং নিরপেক্ষভাবে উভয় পক্ষের খেলা দেখিয়া অনেকগুলি 'উপর-চাল' বলিয়া দিয়াছেন। যাঁহারা দেশে দাবার ছক্ পাতিয়া 'বল' টিপিতেছেন, তাঁহারা সে 'চাল' গ্রহণ করিবেন কি না, বলিতে পারি না। কিন্তু আমরা যদি যোগেশবাবুর ইঙ্গিত গ্রহণ করি, তাঁহার কথাগুলি ভাবিয়া দেখি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই উপকৃত হইব। রচনাটির একটি বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে কোথাও বিরাগের কষ নাই, বিদ্বেষের ঝাঁঝ নাই, উপদেশক-সুলভ গর্ব্বের গরিমা ও গুরুগিরির শাসন নাই; বঙ্গ-সমাজের জরীপে লেখক শুধু সত্যের অনুসারী, কোনও পক্ষের গোঁড়ামী তাঁহার উপদেশকে পক্ষপাত-দোষে দুষ্ট করেন নাই। জাতির দুর্দ্দশা দেখিয়া প্রাজ্ঞ দেশভক্ত ব্যথিত হইয়াছেন, তাহার কারণ-নির্ণয়ে ও প্রতীকারের উপায়-চিন্তায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এবং ভূয়োদর্শন, চিন্তা-শক্তি ও প্রজ্ঞার সাহায্যে যাহা উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহা সমবেদনায় স্নিগ্ধ করিয়া দেশবাসীর গোচর করিয়াছেন। এই জন্য 'হিতং মনোহারি চ দুর্ল্লভং বচঃ' যোগেশচন্দ্রের হিতোপদেশের পক্ষে ব্যর্থ হইয়াছে।—আমরা শ্রেয়ের পথ ত্যাগ করিয়া প্রেয়ের পথে চলিয়াছি; অন্ততঃ আমাদের পথ মুক্তির পথ নহে, কে তাহা অস্বীকার করিবে? শ্রীউপেন্দ্রনাথ বলের 'ভারতের বিদেশী বাণিজ্য ও মুদ্রা-বিনিময়' উল্লেখযোগ্য নিবন্ধ। বাঙ্গালা ভাষায়, শুধু ভাষায় কেন, দেশেও বটে, এ সকল বিষয়ের আলোচনা নাই বলিলেও চলে। লেখক সেই নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতার অধিকারী হইয়াছেন। জটিল বিষয় সহজ করিয়া বুঝাইবার ক্ষমতা লেখক-মণ্ডলে বড় বিরল। লেখকের সে ক্ষমতা আছে। আশা করি, তিনি যে সূচনা করিলেন, তাহার ধারা অক্ষুণ্ণ থাকিবে। শ্রীতমসকুমার মল্লিকের 'কাকা-মশাই' সহজ-ভাষায় লেখা চলন-সই সবুজ-গল্প। শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিকের 'ধূমকেতু' মানক-ধূমকেতুর পরিচয়; ইহাও সবুজ কাব্যির ফিকে-সবুজ ভাষায় লেখা। রবীন্দ্রনাথ আমাদের কাব্যের ভাষায় যে কুবেরের ঐশ্বর্য্য দান করিয়াছিলেন, তাঁহার গেরুয়া-ধারী 'গীতা-ঞ্জলি'র বৈরাগ্যের আকস্মিক প্লাবনে সে মণি-মাণিকগুলি কি সত্যই ভাসিয়া গেল? যে

কবিতা হাসিলে মাণিক পড়িত, এবং কাঁদিলে মুক্তা ঝরিত, এখন সে কবিতার দন্তরুচিকৌমুদী দেখিয়া চোখে জল আসে; তাহাকে 'অশ্রুজলৈর্ব্রাতলমভিষিঞ্চন্' কাঁদিতে দেখিলে হাসি পায়। বাঙ্গালা কবিতার আধুনিক 'রীতি' দেখিয়া মদনবিয়োগবিধুরা রতির কথাই মনে পড়ে—

'বিললাপ বিকীর্ণমূর্দ্ধজা বসুধালিঙ্গনধূসরস্তনী।'

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্তের 'উতল বরিষণে' বর্ষার ছবি বেশ ফুটিয়াছে। শ্রীমুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সমাজ-সংস্কার' প্রবন্ধে অসবর্ণ-বিবাহ প্রভৃতির সমর্থন আছে। বিদ্যাসাগরের 'বহুবিবাহ'-সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন,—যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি, তাহা ঋষিদের মতবিরুদ্ধ হইলেও করিব; যাহা অকর্ত্তব্য, তাহা ঋষিদের অনুমোদিত হইলেও বর্জ্জন করিব। বঙ্কিমচন্দ্র ১২৮০ সালের 'বঙ্গদর্শনে'র দ্বিতীয় খণ্ডে আষাঢ়-সংখ্যায় লিখিয়াছিলেন,—'যাহা লোকাচারবিরুদ্ধ তাহা শাস্ত্রসম্মত হইলে প্রচলিত হইবে না। বিদ্যাসাগর পূর্ব্বে একবার বিধবা-বিবাহের শাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করিয়াছেন; প্রমাণ সম্বন্ধে কৃতকার্য্যও হইয়াছেন; অনেকেই তাঁহার মতাবলম্বী; কিন্তু কয় জন, স্বেচ্ছাপূর্ব্বক, বিধবা-বিবাহের শাস্ত্রীয়তা বা অনুষ্ঠেয়তা অনুভূত করিয়া আপন পরিবারস্থা বিধবাদিগের পুনরায় বিবাহ দিয়াছেন?'—সাতচল্লিশ বৎসর পরেও বাঙ্গালা দেশে এই প্রশ্নের যথেষ্ট অবকাশ বিদ্যমান, ইহা কি আমাদের অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক নহে? আমরা জীবনের প্রভাতে বাঙ্গালা দেশে বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ, রাসবিহারী, রামতনু, শিবনাথ প্রভৃতি এক শ্রেণীর সংস্কারক দেখিয়াছিলাম। তাঁহারা যেরূপ সংস্কার চাহিতেন, জীবনে তাহার অনুবর্ত্তী হইতেন। জীবনের অপরাহ্ণে আমরা আর এক শ্রেণীর সংস্কারক দেখিতেছি, ইঁহারা সংস্কারের মুরলী বাজান বটে, কিন্তু নিজেরা কোনও সংস্কারের ধার ধারেন না! তাঁহারা যাহা বলেন, তোমরা তাহা শিরোধার্য্য কর! তাঁহারা পেটেলের বিলের সমর্থন করেন, কিন্তু সবর্ণেই—নিজের থাকেই ছেলে-মেয়ের বিয়ে দেন! আমরা জানি, এমন কপটাচারে সংস্কার হয় না; এবং বুঝিয়াছি, এই শ্রেণীর সংস্কারের 'সংস্কার'ও আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। প্রবন্ধটিতে একটি বিশিষ্টতা দেখিলাম। যদি শাস্ত্রের দোহাই দিয়াই সমাজের সংস্কার করিতে হয়, তাহা হইলে শাস্ত্রের অনুশাসন মানিয়া শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট পথেই চলিতে হয়। এই শ্রুতি-স্মৃতি-শাসিত দেশে তিনি মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের দোহাই দিয়াছেন। 'মহানির্ব্বাণ' বাঙ্গালীর মাথার মণি। কিন্তু তন্ত্র কি স্মৃতির মত প্রামাণ্য? সকল তন্ত্রের সকল অনুশাসন মানিয়া বর্ত্তমান বাঙ্গালার সংস্কারে সংস্কারকগণ প্রস্তুত কি না? উপসংহারে বলি,—'যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরে জনাঃ' ইহা সারসত্য। 'সংস্কারক'গণ গৃহে সংস্কারের প্রতিষ্ঠা করুন—'উপদেশ অপেক্ষা আদর্শ বড়', সমাজের পক্ষেই ইহা বিশেষভাবে খাটে। বর্ণাশ্রমধর্ম্মের ক্রীতদাসের মুখে যখন জাতিভেদের নিন্দা ও একাকারের প্রশংসা ও পেটেলের 'পেটেলী' শুনি, তখন দ্বিজেন্দ্রলালের সেই গান মনে পড়ে—'হাসি রাখতে পারে কোন—!' জহুরীর 'হীরার ইতিহাস' সুখপাঠ্য। শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্রের 'সোঁদাল ফুল' কষ্টকল্পনার বৃন্তে ফুটি-ফুটি করিয়াও ফুটিতে পারে নাই। 'পঞ্চশস্য' বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ। শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্রের 'সাধুসঙ্গ' তুলসীদাসের অনুবাদ,—মনোজ্ঞ। কিন্তু ছাপার ভুলে 'কমল-অঙ্গ' 'কমল-অক্ষ' হইয়া গিয়াছে। চারু

বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দেশের কথা' যেমন হইয়া থাকে, এবং যেমন হইতে হয়। 'বিবিধ প্রসঙ্গ' কাজের কথায় পূর্ণ—প্রত্যেক বাঙ্গালীর অবশ্যপাঠ্য।

প্রতিভা। আষাঢ়।—শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র গুহের 'বেদান্তের সার্ব্বভৌমিক আদর্শ' সুরচিত নিবন্ধ। শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরীর 'মতিঝিল' একটি কবিতা—নিতান্ত মামুলী। শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘটকের 'ছোটো লেখা' সবুজ-ভাষার রচনা—ইহার 'রস'ও সুতরাং 'সবজে'। শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিকের 'প্রতিধ্বনি'তে ধ্বনিও নাই, প্রতিধ্বনিও নাই। ইহাতে একটি নূতন 'তথ্য' আছে। মনোমোহন বসু 'প্রণয়-পরীক্ষা'য় বলিয়া গিয়াছেন,—প্রতিধ্বনি পর্ব্বতের কন্যা, তিনি মুঙ্গেরের পীর-পাহাড়ের কন্যাকে নাটকে টানিয়া আনিয়াছিলেন। আমরাও বাঁকীপুরের গোল-ঘরের কন্যা প্রতিধ্বনির সহিত আলাপ করিয়া আসিয়াছি। কুমুদবাবু লিখিয়াছেন,—'কানন দেবীর কন্যা তুমি স্বাধীন ললনা।' শ্রীযোগেশচন্দ্র রক্ষিতের 'ঢাকার সঙ্গীতচর্চ্চা' উল্লেখ-যোগ্য। শ্রীভক্তিসুধা রায়ের 'কল্যাণ-পরশ' নব-গীতাঞ্জলির একটি ফুল। কবি লিখিয়াছেন,—'ধন্য করিলে জীবন আমার স্নিগ্ধ মধুর পরশ দানে।' বাস্তবিক, শুকদেব-নারদাদির জন্য দুঃখ হয়। কিছু কাল পূর্ব্বে ধরাধামে অবতীর্ণ হইবার পাপে ইঁহাদিগকে এই 'পরশে'র জন্য কত তপস্যাই না করিতে হইয়াছে! কিন্তু এখন কলম লইয়া বসিলেই 'তাঁহার', এমন কি, অরূপ ব্রহ্মেরও 'পরশ' পাওয়া যায়! ভগবান বেচারা সর্ব্বদাই তটস্থ—কখন কোন সবুজ ডালে বসিয়া কে ডাকে, ঠিক নাই! এই চাটগাঁ, এই মালদা, এই বীরভূম, এই দিল্লী, 'পরশে'র বোঝা ও 'আশীষ লক্ষ ধারা'র মশক ঘাড়ে করিয়া ভগবানকে আশমানের পথে নিরন্তর ছুটাছুটী করিতে হইতেছে! এমন সুদিনে আবির্ভূত হইয়াও পাহাড়ী বাবা, রামকৃষ্ণদেব, ত্রৈলঙ্গস্বামী, ভাস্করানন্দ, বারদীর ব্রহ্মচারী, গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণ, বিবেকানন্দ প্রভৃতি সাধনায় ও ধ্যান-ধারণায় জীবন মাটী করিলেন কেন, কবিতা লিখিয়া সহজ পথে ইষ্টলাভ করিলেন না কেন, তাহা আমরা বাস্তবিকই বুঝিয়া উঠিতে পারি না। 'যত মত, তত পথ' বটে, কিন্তু কবিতার পথই যে রেল-পথ, একখানা থার্ড-ক্লাসের টিকিট কিনিয়া অনায়াসে লক্ষো যাওয়া যায়, এ সহজ সত্যটা এ দেশে কোনও কেশব সেন বা দয়ানন্দ প্রচার করিলেন না কেন? কবীর, দাদু, নানক, তুলসী, তুকারাম, রামপ্রসাদ প্রভৃতি ছন্দেই সিদ্ধ হইয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালা দেশে কবিরা তাহার সন্ধান পাইয়াছেন। আধ্যাত্মিক কবিতা লেখ, এবং স্বর্গে যাও। মামুলী রথে ত কুলাইবে না। এরো-প্লেনে স্বর্গের টিকিটের দাম কত? শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের সঙ্কলিত 'ঠাকুরমার কথা' সুখপাঠ্য। নাতির ছায়ায় ঠাকুরমা আচ্ছন্ন না হন। ঠাকুরমার ভাষায় কোটেশন দিয়া 'পোড়া পেটের লাগিয়া' সংযোগ করিয়া লাভ কি? 'জ্ঞান-পিপাসা' ও 'তর্ক-যুদ্ধের আকাঙ্ক্ষা' কি ঠাকুরমার ভাষা? তাহা হইলে ঠাকুরমা আমাদের contemporary হইয়া পড়েন। শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য 'পঞ্চচামর ছন্দের অনুসরণে' যে কবিতা লিখিয়াছেন, তাহার নাম 'হতাশা!' নামেও যা, কামেও তা।—'হতাশা'র আরম্ভ—

'জীবন জীবন আঁধার জীবন,
জীবন জমাট আঁধার আঁধার!'

বিস্ময়ের চিহ্নটি কবির নিজস্ব, কিন্তু বড়ই অব্যর্থ। বাস্তবিক, ভাব সংক্রামক। ছুটি চরণ পড়িয়াই আমাদেরও মনে হইতেছে—'জীবন জীবন আঁধার জীবন', তাহাও কাব্যি পড়িয়াই শেষ হইয়া আসিল। কবি অজ্ঞাতসারে পঙ্ক-চামর ভিন্ন আর একটি ছন্দেরও অনুসরণ করিয়াছেন—যথা, 'হাসেন, হোসেন! হাসেন, হোসেন!' ইহা ইসলামিক 'বক্ষোবিমর্দ্দি-চ্ছন্দঃ'।

ভারতী। আষাঢ়।—শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'নোয়ার কিস্তি'র দ্বিতীয় কিস্তি পড়িলাম, কিছু বুঝিতে পারিলাম না। শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'অবতার' খিওফিল গতিয়ের মূল ফরাসী হইতে অনূদিত,—ক্রমশঃ-প্রকাশ্য। শ্রীপ্রসাদদাস রায়ের 'চয়নে' স্বপ্ন-তথ্য, যমক-রহস্য, ভবিষ্যতের সপ্তম আশ্চর্য্য ও হাতকড়ির রাজা আছে। সপ্তম আশ্চর্য্য ভিন্ন অবশিষ্ট কয়টি ছেলের হাতে দিবার মোয়া। শ্রীনরেন্দ্র দেব 'লেখাপড়া-জানা কুকুরে'র পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীফকিরচাঁদ দত্তের 'মনের মিল' মৌলিক প্রবন্ধ। প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য, —'মিলন-বিষয়ে গ্রহদিগের মানব-জীবনের উপর প্রভাব' আছে। লেখক জ্যোতিষের সাহায্যে উদাহরণ দিয়া তাঁহার বক্তব্য বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার আশা,—'ইহার বৈজ্ঞানিক আলোচনায় আরও অনেক গোপন তথ্য আবিষ্কৃত হইবে।' শ্রীপাঁচুলাল ঘোষের 'বোঝা' মামুলী গল্প—পাদপূরণের মত যাহা মাসিকের গল্প যোগাইবার প্রতিশ্রুতি ও প্রয়োজন পূর্ণ করে। শ্রীমোহিতলাল মজুমদারের 'মৃত্যু-বিভীষিকা' কবিতায় লিখিত প্রহেলিকা। শ্রীহেমেন্দ্র-কুমার রায়ের 'আদর্শ সৌন্দর্য্যে' বিলাতী রূপের ব্যাখ্যা ও বিলাতী রূপের ছবি আছে। 'ভারতী'র 'জ্যাঠা মহাশয়' হেমেন্দ্রকুমার প্রবন্ধের গৌরচন্দ্রিকায় জ্যাঠামী করিয়াছেন,—'আজ আমরা এমন গুটিকতক কথা বলিতে চাই,—যা অত্যন্ত হাল্‌কা এবং নিতান্ত পল্‌কা! আমরা হইতেছি প্রথম শ্রেণীর গম্ভীর জাতি, কাজেই "তাম্রশাসন" প্রভৃতির সাহায্য না লইলে, আমাদের পাঠকদের বিদ্রোহিতাকে শাসন করা যায় না। অতএব এই লেখাটিকে কেউ যে "ভারতীর প্রবন্ধগৌরব" বলিয়া মনে করিবেন, সে দুরাশা আমরা মোটেই রাখি না।' জ্যাঠামহাশয় দুরাশা না করিয়া নিরাশার বেদনাকেই নির্ব্বাসিত করিয়াছেন। 'আদর্শ সৌন্দর্য্য' বাস্তবিকই 'ভারতী'র প্রবন্ধ-গৌরব নয়। কারণ, ইহা ধার-করা; কারণ, ইহা পরের মুখে ঝাল-খাওয়া; কারণ, ফ্যানচাটা কোনও সাহিত্যের বা কোনও মাসিকেরই 'গৌরব' হইতে পারে না। 'ভারতী'ই আজ কাল কতকটা 'হাল্‌কা' ও 'পল্‌কা' হইয়াছে; তাহাতে কোনও ক্ষতি নাই। লঘু সাহিত্যেরও প্রয়োজন আছে। বাঙ্গালা দেশে 'popular' কাগজের অভাব আছে।—যাহা সহজে ও অনায়াসে চিত্তবিনোদ করিতে পারে, অনাবিল আনন্দ দান করিয়া 'তাম্রশাসনে'র বিভীষিকা হইতে সামাজিকের বিরলপ্রাপ্ত অবসরটুকু সুখে যাপন করিবার অবকাশ দিতে পারে, 'অত্যন্ত গম্ভীর জাতি'র পক্ষেও তাহার প্রয়োজন আছে। কিন্তু কোনও নকল-নবীশ দাগা বুলাইয়া সে প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে পারিবে না। ভারতের রূপ, বাঙ্গালার রূপ, ভারতের সৌন্দর্য্য, বাঙ্গালার সৌন্দর্য্য আমাদের সৌন্দর্য্যরসিক জ্যেষ্ঠতাতের চোখে পড়ে না। নিম্নশ্রেণীর বিলাতী মাসিকের উচ্ছিষ্টই তাঁহার একমাত্র ভরসা। সেই উচ্ছিষ্ট-পরি-

বোধনের পূর্ব্বে আবার এত দম্ভ-পূর্ণ ভণিতা!—'ভারতী'র মত পত্রের পক্ষে ইহাই 'অত্যন্ত হাল্কা এবং নিতান্ত পল্‌কা' বলিয়া মনে হয়। এ যেন থিয়েটারে দর্শক ডাকিবার জন্য ক্রিয়াদীর অভিনয়! 'নিখুঁত সুন্দর কোন পুরুষ বা নারী আজ পর্য্যন্ত' দুর্ভাগা লেখকের চোখে পড়ে নাই'! নাচার! আমরা 'অত্যন্ত গম্ভীর জাতি', তাই বোধ হয় এখনও বাঁচিয়া আছি! সৌন্দর্য্য-রসের বোল্‌তা জ্যাঠামহাশয়ের বোধ করি কই-মাছের প্রাণ, সহজে বাহির হইতে চায় না, তাই কোনও মতে দুধের স্বাদ ঘোলে মিটাইয়া তিনি এই 'নিখুঁত-সুন্দর-সুন্দরী'-হীন দেশে টিকিয়া আছেন! আমরা বলি, আপনার জাতির মধ্যে যে সৌন্দর্য্য দেখিতে পায় না, সে 'রাতকাণা' ও 'রঙ্গকাণা'র মত নিশ্চয়ই 'সৌন্দর্য্য-কাণা'।

অনু, তুর্বশ ও যদু।

ঋগ্বেদের যুগে অনু, তুর্বশ ও যদু নামে তিন ব্যক্তি অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ছিলেন। কণ্ববংশীয় ঋষিগণ ইঁহাদিগের যজ্ঞ করিতেন, দেখা যায়। এই তিন বংশের মধ্যে কিরূপ সম্বন্ধ ছিল, যদিও বেদ হইতে তাহা জানা যায় না, তবে ইঁহাদের কোনও যজ্ঞ একই ঋষিদিগের দ্বারা একই স্থানে সাধিত হইয়াছিল বলিয়া, উঁহারা এক-বংশীয় ছিলেন, অনুমান করি।

কণ্বপুত্র বৎস ঋষি তুর্বশ যদুদিগের একটী যজ্ঞে নিম্নলিখিত রূপ স্তব পাঠ করেন। তিনি বলিতেছেন, 'হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদিগকে কক্ষীবান্ এবং ব্যশ্বঋষি, তোমাদিগকে দীর্ঘতমা যেমন তুষ্ট করিয়াছেন, যেমন বেনের পুত্র পৃথী যজ্ঞগৃহ সকলে (তুষ্ট করিয়াছেন), সেইরূপ এই স্তব তুষ্ট করুক।' (১) 'হে অশ্বিদ্বয়! অবশ্য আগমন কর; তোমাদের জন্য এই হব্য সকল রক্ষিত আছে। তুর্বশ যদুর মধ্যে এই সকল সোম ও কণ্বদিগের মধ্যে এই সকল (সোম) তোমাদিগকে প্রদত্ত হইয়াছে।' (২) বৎস ঋষি এই স্তবে যে সকল ঋষির নাম উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহারাও সম্ভবতঃ এই যজ্ঞে ব্রতী ছিলেন। কারণ, উঁহারা যে সম-সাময়িক, তাহা অন্য স্তবের দ্বারা সপ্রমাণ করা যায়।

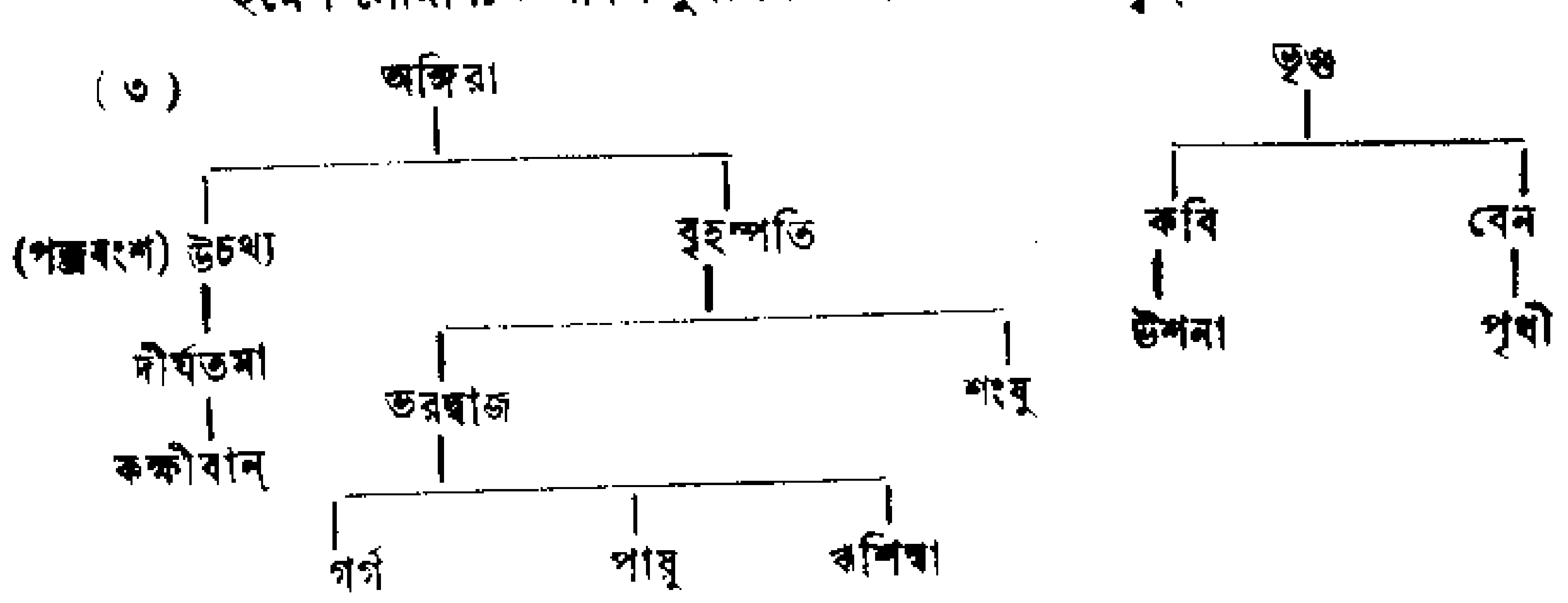
ঋগ্বেদ হইতে জানা যায় যে, পজ্র-বংশীয় উচথ্যের পুত্র অন্ধ দীর্ঘতমা এবং দীর্ঘতমার পুত্র কক্ষীবান। সেইরূপ ভৃগুর দুই পুত্র, কবি ও বেন। কবির পুত্র উশনা, এবং বেনের পুত্র পৃথী। (৩) ব্যশ্ব ঋষি অঙ্গিরাবংশীয় ছিলেন।

---

(১) যৎ। বাং। কক্ষীবান্। উত। যৎ। ব্যশ্বঃ। ঋষিঃ। যৎ। বাং। দীর্ঘতমাঃ। জুহাব। পৃথী। যৎ। বাং। বৈন্যঃ। সদনেষু। এব। ইৎ। অতঃ। অশ্বিনা। চেতয়েথাম্॥—৮।৯।১০

(২) আ। নূনং। যাতং। অশ্বিনা। ইমা। হব্যানি। বাং। হিতা। ইমে। সোমাসঃ। অধি। তুর্বশে। যদৌ। ইমে। কণ্বেষু। বাম্। অথ॥—৮।৯।১৪

(৩)



উদ্ধৃত ঋকে দেখা যাইতেছে যে, কণ্ববংশীয়দিগের যজ্ঞ, তুর্বশ ও যদুদিগের যজ্ঞের সহিত একত্র সম্পন্ন হইত। ইহাতে তুর্বশ যদুগণ সম্ভবতঃ কণ্ব ঋষির সহিত কোনও প্রকারে সম্বন্ধবিশিষ্ট ছিলেন, মনে করা যাইতে পারে।

বোধ হয়, কণ্বগণ তুর্বশ যদুদিগের দেশে বাস করিতেন। আমরা 'বৈবস্বত মনু' প্রবন্ধে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি যে, 'পরাবান্' নামক দেশে মনুর রাজধানী ছিল। তিনি নমুচিকে বধ করিয়া বোধ হয় এই স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন। (১) পরাবান্ অর্থে দূরদেশও বুঝায়। সে অর্থ গ্রহণ করিলে, মনুর রাজ্য ঋগ্বেদের অনেক ঋষির বাসস্থান হইতে দূরে ছিল, মনে করিতে হইবে। ইহাও দেখা যাইতেছে যে, মনুও এক জন দাসের রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন। অতএব মানব-ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠার সহিত মানবধর্ম্মাবলম্বিগণ নানা দেশের জয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। পণি, দাস, দস্যু, বৃত্র প্রভৃতি জাতি তখন স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেছিল। ইহাদিগের রাজ্য জয় করাই মানবদিগের প্রধান কার্য্য ছিল।

অনেক ঋষি তুর্বশ যদুকে 'পরাবান্' হইতে আনয়নের জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন। ইহাঁদের মধ্যে ঘোরপুত্র কণ্ব ও ভরদ্বাজ-ভ্রাতা শংযুর নাম উল্লেখযোগ্য। (২) ইহা হইতে আমরা অনুমান করিতে পারি যে, তুর্বশ যদুগণ মনুর রাজধানীর অধিবাসী ছিলেন, বা উঁহার নিকটবর্ত্তী কোনও দেশে বাস করিতেন। এক জন ঋষি বলিয়াছেন, 'হে নাসত্যদ্বয়! যদি তোমরা পরাবানে

(১) অত্র। দাসস্য। নমুচেঃ। শিরঃ। যৎ। অবর্ত্তয়ঃ। মনবে। গাতুং। ইচ্ছন্॥—৫।৩০।৭
[বভ্রু ঋষি]

(হে ইন্দ্র!) এই (দানব-যুদ্ধে) যখন মনুর নিমিত্ত সুখ ইচ্ছা করিয়া দাস নমুচির মস্তক চূর্ণ করিয়াছিলে।

নম্যা। যৎ। ইন্দ্র। সখ্যা। পরাবতি। নিবর্হয়ঃ। নমুচিং। নাম। মায়িনম্॥—১।৫৩।৭
[আঙ্গিরস সব্য ঋষি]

হে ইন্দ্র! যখন শত্রু-নত-কারী (বজ্রের) সহায় দ্বারা পরাবানে নমুচি-নামক মায়াবীকে বধ করিয়াছিলে।

(২) অগ্নিনা। তুর্বশং। যদুং। পরাবতঃ। উগ্রদেবম্। হবামহে।
[ঘোরপুত্র কণ্ব]—১।৩৬।১৮

আমরা তুর্বশ, যদু, উগ্রদেবকে পরাবান্ হইতে অগ্নি দ্বারা আহ্বান করি।

যঃ। আ। অনয়ৎ। পরাবতঃ। সুনীতি। তুর্বশং। যদুম্॥—৬।৪৫।১ [শংযু ঋষি]

যিনি (অর্থাৎ ইন্দ্র) তুর্বশ যদুকে পরাবান্ হইতে সুখে আনিয়াছেন।

থাক, বা তুর্বশের দেশে থাক।' (১) ইহাতে মনে হয়, তুর্বশের দেশ পরাবানের সন্নিহিত ছিল।

কণ্বপুত্র দেবাতিথি, অঙ্গিরাবংশীয় প্রিয়মেধগণ ও পজ্রবংশীয় এক ঋষি (সম্ভবতঃ কক্ষীবান) তুর্বশ যদুদিগের একটী যজ্ঞ করিয়াছিলেন। এই যজ্ঞে তাঁহারা যে স্তব পাঠ করেন, তাহা হইতে আমরা অবগত হই যে, তাঁহারা অত্যন্ত বিপদে পড়িয়াছেন। (২) প্রথম ঋকে ঋষিগণ ইন্দ্রকে এইরূপে আহ্বান করিতেছেন:—হে ইন্দ্র! পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, বা দক্ষিণ, যেখানে (তুমি) ঋত্বিকদিগের দ্বারা আহূত হইয়াছ, হে শ্রেষ্ঠ! হে প্রশর্ধ! (সেই স্থান হইতে) অনুর পুত্রের নিমিত্ত, তুর্বশের নিমিত্ত (আমাদিগের) ঋত্বিকদিগের দ্বারা আহূত হইয়া (আইস)। ৭ম ঋকে ঋষিগণ বলিতেছেন:—তোমার প্রচণ্ড শক্তির বন্ধুত্ব থাকিলে (আমরা) ভয় করি না, শ্রান্ত হইব না। প্রার্থিত-বস্তু-প্রদানকারী তোমার কৃতকর্ম্ম মহৎ ও স্তবার্হ। তোমার (প্রসাদে) যেন তুর্বশ ও যদুকে জীবিত দেখি। এই ঋক হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, তুর্বশ যদু এমন বিপদে পড়িয়াছেন যে, তাঁহাদের জীবনসংশয় হইয়াছে। কিন্তু সে বিপদ কিসের জন্য? ১৬শ ঋকে দেখিতেছি, ঋষি বলিতেছেন:—হে পূষা! (বাহুস্থিত) নাপিতের ক্ষুরের মত আমাদিগকে তীক্ষ্ণ কর। হে বিমোচন! রায় (অর্থাৎ রাজ্য বা ঐশ্বর্য্য) দাও। তব সম্বন্ধীয় গাভীধন যাহা তুমি মর্ত্ত্যকে প্রেরণ কর, তাহা আমাদিগের সুখলভ্য (হউক)। এই ঋক্ হইতে বুঝা যাইতেছে যে, অনুর পুত্র, তুর্বশ ও যদু কোনও স্থানে গোজয়ের যুদ্ধে গমন করিয়াছেন। সেই যুদ্ধে তাঁহারা বিপদে পড়িয়াছেন। সম্ভবতঃ তাঁহাদের রাজা কুরুঙ্গ এই যুদ্ধে বা যুদ্ধকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই জন্য তাঁহার শ্রাদ্ধবাসরে এই স্তব রচিত হইয়া পঠিত হইয়াছিল। ঋষিগণ এই শ্রাদ্ধে যে দান প্রাপ্ত হন, তাহাও ঋক্‌বদ্ধ করিয়াছেন। (৩)

---

(১) যৎ। নাসত্যা। পরাবতি। যৎ। বা। স্থঃ। অধি। তুর্বশে॥—১।৪৭।৭

(২) যৎ। ইন্দ্র। প্রাক্। অপাক্। উদক্। ন্যক্। বা। হূয়সে। নৃভিঃ।
সিম্। পুরু। নৃসূতঃ। অসি। আনবে। অসি। প্রশর্ধ। তুর্বশে॥—৮।৪।১
মা। ভেম। মা। শ্রমিষ্ম। উগ্রস্য। সখ্যে। তব।
মহৎ। তে। বৃষ্ণঃ। অভিচক্ষ্যং। কৃতং। পশ্যেম। তুর্বশং। যদুম্॥—৮।৪।৭
সং। নঃ। শিশীহি। ভুরিজোঃ ইব। ক্ষুরম্। রাস্ব। রায়ঃ। বিমোচন।
ত্বে। তৎ। নঃ। সুবেদং। উস্রিয়ম্। বসু। যং। ত্বং। হিনোষি। মর্ত্যম্॥—৮।৪।১৬

(৩) স্থূরং। রাধঃ। শত অশ্বং। কুরুঙ্গস্য। দিবিষ্টিষু।
রাজ্ঞঃ। ত্বেষস্য। রাতিষু। তুর্বশেষু। অমনমহি॥—৮।৪।১৯

এখানেও দেখা যাইতেছে, কণ্ব-পুত্র তুর্বশ যদুদিগের যজ্ঞ করিয়াছিলেন। এই যজ্ঞে পজ্রবংশীয় ঋষি কক্ষীবানও উপস্থিত ছিলেন। ঋগ্বেদে দেখিতে পাই, তুর্বশ সুদাসের বিরুদ্ধে পরুষ্ণী-যুদ্ধে আগমন করিয়াছিলেন। সেই যুদ্ধে যদুর নাম দেখিতে পাই না, কিন্তু অমুর পুত্রের নাম প্রাপ্ত হই। বোধ হয়, এই যুদ্ধের পূর্ব্বেই যদু মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। অতএব উল্লিখিত যজ্ঞ পরুষ্ণী-যুদ্ধের সময় সম্পন্ন হয় নাই। ইহা আমাদিগকে আর এক যুদ্ধের সন্ধান প্রদান করিতেছে। কিন্তু ঐ যুদ্ধে তুর্বশ যদু পরাভূত হওয়ায়, উহার বিজয়-যজ্ঞ সম্ভব ছিল না। আমরা 'সম্রাট অভ্যাবর্ত্তী' প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে, বৃচীবান ও বরশিখদিগকে জয় করিয়া সম্রাট একটী যজ্ঞ করেন। এই বিজয়-যজ্ঞে ভরদ্বাজ ঋষি একটী স্তব রচনা করিয়া পাঠ করেন। ঐ স্তবে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সম্রাটের মিত্র সৃঞ্জয় তুর্বশ প্রাপ্ত হন। আমরা ঐ প্রবন্ধে এই ঘটনার অর্থ এইরূপ অনুমান করিয়াছি যে, তুর্বশ যদু সম্রাট অভ্যাবর্ত্তী দ্বারা বৃচীবান ও বরশিখদিগের গোহরণ করিতে প্রেরিত হইয়া পরাভূত হন, এবং উঁহাদের মধ্যে তুর্বশ বন্দীকৃত হইয়াছিলেন। পরে বৃচীবান্‌গণ জয়ে উৎফুল্ল হইয়া সম্রাট অভ্যাবর্ত্তীর যজ্ঞ নষ্ট করিতে আগমন করে। কিন্তু সৃঞ্জয় উহাদিগকে পরাভূত করিয়া তুর্বশকে উদ্ধার করেন। এই কার্য্যের জন্য সম্রাট সৃঞ্জয়কে তুর্বশ প্রদান করেন, অনুমান করিয়াছি।

তুর্বশ যদু যেমন সম্রাট অভ্যাবর্ত্তীর আদেশবাহী সেনাপতি ছিলেন, সেইরূপ তাঁহারা পূরুবংশীয়দিগেরও যুদ্ধের সেনাপতিরূপে নিযুক্ত হইতেন, দেখিতে পাই। পুরুকুৎস কর্ত্তৃক শরৎদাসের সাতপুর জয়ের পর পূরুগণ একটী পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করেন। ঐ যজ্ঞে ভরদ্বাজ, কণ্বপুত্র সোভরি, ভৃগুবংশীয় জমদগ্নি, অত্রি, অগস্ত্য, গোতম প্রভৃতি ঋষিগণ হোতা ছিলেন। ভরদ্বাজ ও অগস্ত্য ঋষি এই যজ্ঞের নিমিত্ত দুইটী স্তোত্র রচনা করিয়া পাঠ করেন। এই পঠিত স্তোত্রদ্বয়ের অন্তর্গত দুইটী ঋক্ নিম্নে উদ্ধার করা গেল। ইহাদের মধ্যে একটী অক্ষরে অক্ষরে মিলে। (১) অপরটী যদিও অক্ষরে

সৌভাগ্যবান্ রাজা কুরুঙ্গের স্বর্গগমন হেতু দান সকলের মধ্যে, তুর্বশদিগের মধ্যে প্রভূত ধন ও শত অশ্ব পাইয়াছি।

(১) ত্বং। ধুনিঃ। ইন্দ্র। ধুনিমতীঃ। ঋণোঃ। অপঃ। সীরাঃ। ন। স্রবন্তীঃ।
প্র। যৎ। সমুদ্রং। অতি। শূর। পর্ষি। পারয়। তুর্বশং। যদুং। স্বস্তি॥
ভরদ্বাজ ৬।২০।১২ ; অগস্ত্য, ১।১৭৪।৯

অক্ষরে মিলে না, তথাপি উহাদের মধ্যেও বেশ মিল দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম ঋকে তুর্বশ যদুকে সমুদ্রপার হইতে উদ্ধারের প্রার্থনা রহিয়াছে। দ্বিতীয় ঋকে পুরু-রাজ পুরুকুৎসের সাত পুর জয়ের উল্লেখ আছে। পুরু-রাজের যজ্ঞে তুর্বশ যদুর রক্ষার জন্য প্রার্থনা থাকায় (১) তাঁহারা যে পুরু-রাজের মিত্রস্থানীয়, তাহাতে সন্দেহ থাকে না। তাঁহারা সমুদ্রপারে গমন করিয়াছেন; ইন্দ্র তাঁহাদিগকে সমুদ্র পার করিয়া সুমঙ্গলে আনয়ন করুন, এই প্রার্থনা। কিন্তু সমুদ্রপারে গমন করিবার তাঁহাদের কি কারণ ছিল? তাঁহারা সমুদ্রপারে কোন্ দেশে এবং কিরূপে গমন করিয়াছিলেন, তাহাও জিজ্ঞাস্য হইতে পারে। এ সম্বন্ধে বেদ হইতে কোনও উত্তর প্রাপ্ত হই নাই। আমরা অনুমান করি যে, তুর্বশ যদু, শরৎদাসের সাত পুর জয়ে পুরু-রাজের সেনাপতির কার্য্য করিয়াছিলেন। সেই জন্য পুরুদিগের যজ্ঞে তাঁহা-দের মঙ্গল-প্রার্থনা হইয়াছিল। উদাহরণস্বরূপ দেখান যাইতে পারে যে, সম্রাট অভ্যাবর্ত্তীর যজ্ঞে সৃঞ্জয়ের নাম ও সৃঞ্জয়ের যজ্ঞে দিবোদাসের নাম আমরা প্রাপ্ত হই। এই দুই স্থলে সৃঞ্জয় বৃচীবানদিগকে এবং দিবোদাস শম্বরকে জয় করেন। অতএব কোনও যুদ্ধ-বিজয়-যজ্ঞে রাজা ও তাঁহার সেনাপতির নামোল্লেখ সেকালের প্রথা ছিল বলিয়া মনে হয়। আমাদের এই অনু-মান সত্য হইলে, তুর্বশ যদু পুরুরাজের সেনাপতি ছিলেন।

হে ইন্দ্র! নদীদিগের মত প্রবহমান, তরঙ্গযুক্ত জল সকলকে (শত্রুদিগের) কম্পয়িতা তুমি বাহির করিয়াছ; হে শূর! যখন সমুদ্র অতিক্রম করিয়া উত্তীর্ণ হও (তখন) তুর্বশ যদুকে সুমঙ্গলে পার কর।

(১) সনেম। তে। অবসা। নব্যঃ। ইন্দ্র। প্র। পুরবঃ। স্তবন্তে। এনা। যজ্ঞৈঃ।
সপ্ত। যৎ। পুরঃ। শর্ম। শারদীঃ। দর্‌ৎ। হন্। দাসীঃ। পুরুকুৎসায়। শিক্ষন্॥
—ভরদ্বাজ ৬।২০।১০

হে ইন্দ্র! তোমার রক্ষার সহিত (আমরা) নবতর ধন ভজনা করি। পুরুগণ এই সকল যজ্ঞের দ্বারা স্তব করিতেছে। কারণ, পুরুকুৎসকে দিবার জন্য সাত পুর ও শর্ম বিদীর্ণ করিয়াছ, শারদী দাসী (প্রজাকে) বধ করিয়াছ।

দনঃ। বিশঃ। ইন্দ্র। মৃধ্রবাচঃ। সপ্ত। যৎ। পুরঃ। শর্ম। শারদীঃ। দর্‌ৎ।
ঋণোঃ। অপঃ। অনবদ্য। অর্ণাঃ। যূনে। বৃত্রং। পুরুকুৎসায়। রন্ধীঃ॥
—অগস্ত্য; ১।১৭৪।২

হে ইন্দ্র! মিথ্যাবাক্যযুক্ত শারদী বিশকে দমন করিয়াছ যখন (তাহাদের) সপ্তপুর বিদীর্ণ করিয়াছ। হে অনিন্দনীয়! গমনশীল জল প্রবাহিত করিয়াছ। যুবক পুরুকুৎসের জন্য বৃত্রকে বধ করিয়াছ।

আমরা ইহাও অনুমান করি যে, শরৎদাসের সাত পুর জয় করিতে সমুদ্র-যাত্রা করিতে হইয়াছিল। কারণ, শরৎদাসের রাজ্য নর্ম্মদা ও তাপ্তীর মধ্যে বর্ত্তমান সাতপুর পর্ব্বতে অবস্থিত ছিল। সাত পুর জয় হইবার পর, তুর্বশ যদু কোনও কারণবশতঃ সেই স্থানে অবস্থান করেন, এবং পুরুকুৎস দেশে আসিয়া যজ্ঞ করেন। এই যজ্ঞে তাঁহাদের যে মঙ্গল-প্রার্থনা রহিয়াছে, তাহাতে সমুদ্রপার হইতে ফিরিবার কথা জানা যায়। ঋগ্বেদে এই সমুদ্র-যাত্রার ও পূর্ব্বে আর এক সমুদ্রযাত্রারও উল্লেখ আছে। অগস্ত্য ঋষি বলিয়াছেন,—তুগ্রপুত্র ভুজ্যুকে অশ্বিদ্বয় সমুদ্রে 'প্লব' নামক নৌকা দ্বারা রক্ষা করিয়াছিলেন। (১) দীর্ঘতমার পুত্র কক্ষীবান্ ঋষিও সমুদ্র হইতে তুগ্র-পুত্রের উদ্ধারের বর্ণনা করিয়াছেন। (২) এই সকল বিবরণ হইতে জানা যায়, সেকালে সমুদ্রগামী নৌকায় শত দাঁড় ও পক্ষ (অর্থাৎ পাল) থাকিত। ঐ সকল নৌকাকে প্লব, পতঙ্গ, নাব বলা হইত। সমুদ্রকে ঋষিগণ কৃষ্ণবর্ণ, হস্তগ্রাহ্য-দ্রব্য-বর্জ্জিত ও ভূমিশূন্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই সকল বিবরণ

---

(১) যুবং। এতং। চক্রথুঃ। সিন্ধুষু। প্লবং। আত্মন্বন্তং। পক্ষিণং। তৌগ্র্যায়। কম্।
যেন। দেবত্রা। মনসা। নিঃ উহথুঃ। সুপপ্তনি। পেতথুঃ। ক্ষোদসঃ। মহঃ॥—১।১৮২।৫

(হে অশ্বিদ্বয় !) দৃঢ়, পক্ষযুক্ত, সুখকর, সিন্ধু সকলে প্রসিদ্ধ, 'প্লব' তুগ্র-পুত্রের নিমিত্ত তোমরা করিয়াছিলে। যে দিব্য অনুগ্রহ দ্বারা, হে শোভন-পতনদ্বয় ! নামিয়াছিলে (ও) মহাসমুদ্র হইতে (তাহাকে) বহন করিয়াছিলে।

অববিদ্ধং। তৌগ্র্যং। অপ্সু। অন্তঃ। অনারম্ভণে। তমসি। প্রবিদ্ধম্।
চতস্রঃ। নাবঃ। জঠলস্য। জুষ্টাঃ। উৎ। অশ্বিভ্যাং। ইষিতাঃ। পারয়ন্তি॥—১।১৮২।৬

অবলম্বনরহিত, কৃষ্ণবর্ণ (সমুদ্রে), জল সকলের মধ্যে নিক্ষিপ্ত তুগ্রপুত্রকে অশ্বিদ্বয় দ্বারা প্রেরিত, উদকধারী (সমুদ্র) দ্বারা সেবিত চারিটী নৌকা তুলিয়াছিল।

(২) তিস্রঃ। ক্ষপঃ। ত্রিঃ। অহা। অতিব্রজৎভিঃ। নাসত্যা। ভুজ্যুং। উহথুঃ। পতঙ্গৈঃ।
সমুদ্রস্য। ধন্বন্। আর্দ্রস্য। পারে। ত্রিভিঃ। রথৈঃ। শতপদ্ভিঃ। ষট্ অশ্বৈঃ॥—১।১১৬।৪

হে নাসত্যদ্বয় ! তোমরা তিন রাত্রি, তিন দিন দ্রুতগামী 'পতঙ্গ' সকলের দ্বারা ভুজ্যুকে বহন করিয়াছিলে। জলপূর্ণ সমুদ্রের পারে, জলবর্জ্জিত দেশে, শতচক্রবিশিষ্ট ষট্অশ্বযুক্ত তিনটী রথের দ্বারা (বহন করিয়াছিলে)।

অনারম্ভণে। তৎ। অবীরয়েথাম্। অনাস্থানে। অগ্রভণে। সমুদ্রে।
যৎ। অশ্বিনৌ। উহথুঃ। ভুজ্যুং। অস্তম্।
শতঅরিত্রাম্। নাবং। আতস্থিবাং সম্॥—১।১১৬।৫

হে অশ্বিদ্বয় ! অবলম্বনহীন, ভূমিশূন্য, হস্তগ্রাহ্য বস্তুহীন, সমুদ্রে সেই (কার্য্য) করিয়াছ, যখন শত-দাঁড়যুক্ত নৌকায় স্থাপিত ভুজ্যুকে গৃহে আনয়ন করিয়াছিলে।

দেখিয়া মনে হয়, এই দুই ঋষি 'প্লবে'র সাহায্যে সমুদ্রে গমন করিয়াছিলেন। সে কালে সমুদ্রে যে অনেক নৌকা যাতায়াত করিত, তাহার নিদর্শন এই যে, ভুজ্যু সমুদ্রে নিমজ্জিত হইলে চারিটী নৌকা সেই সময়ে ঐ স্থান দিয়া গমনকালে তাঁহাকে উদ্ধার করে, এই সংবাদ। নৌকাদিগের এই আকস্মিক আগমন, দেবতাদিগের কৃপা ভিন্ন অন্য ভাবে ভাবা একালেও সম্ভব নয়। ঋষিগণ এই ঘটনা ঋক্‌বদ্ধ করিয়াছেন বলিয়া আমরা সে কালের সমুদ্র পথে গমনাগমনের সংবাদ জানিতে পারিতেছি। তুর্বশ, যদু ও পুরুকুৎস সে কালের শত-দাঁড়যুক্ত নৌকার সাহায্যে গুজরাটের উপকূল দিয়া নর্ম্মদাতীরে আগমন করিয়াছিলেন, ইহাই আমাদের যুক্তিযুক্ত অনুমান। কারণ, দেখান গিয়াছে, সমুদ্রযাত্রা অগস্ত্যের অজ্ঞাত ছিল না। তিনি ঋক্ রচনা করিয়া ইন্দ্রের নিকট এইরূপ প্রার্থনা করিয়াছেন যে, তুর্বশ যদুকে সুমঙ্গলে সমুদ্রপার হইতে আনয়ন করুন। অগস্ত্য ঋষি সমুদ্র শব্দের প্রকৃত অর্থ জানিয়া যদি আপন ঋকে সমুদ্র শব্দ ব্যবহার করেন, তবে উহার অর্থ সমুদ্রই বুঝায়; নদী বুঝাইতে পারে না।

তুর্বশ যদুগণকে যে ইন্দ্র সমুদ্র পার করিয়াছিলেন, তাহা বামদেব ঋষির এক ঋক্ হইতেও অবগত হওয়া যায়। (১) তিনি ইহাদিগকে 'অস্নাতারা' অর্থাৎ অনভিষিক্ত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, তাঁহারা পূরুবংশীয় ও মনুবংশীয় অভিষিক্ত রাজাদের অধীনে রাজত্ব করিতেন, এবং যখন আবশ্যক হইত, তাঁহারা ঐ সকল রাজবংশের যুদ্ধে সেনানায়ক-রূপে গমন করিতেন। ইহার উদাহরণ আমরা পরুষ্ণী-যুদ্ধে প্রাপ্ত হই। নিম্নে বসিষ্ঠের ঋক্ উদ্ধার করা গেল। (২)

উদ্ধৃত ঋকে বসিষ্ঠ ঋষি তুর্বশকে যক্ষু আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। সায়ণাচার্য্য ইহার অর্থ করেন,—'যজ্ঞকুশল'। আমরা অনুমান করি, ইনি যক্ষু নামক জাতির পুরোহিত ছিলেন। বৈদিক যুগে যক্ষু জাতির অস্তিত্ব আমরা বসিষ্ঠ

(১) উত। ত্যা। তুর্বশাযদূ। অস্নাতারা। শচীপতিঃ।
ইন্দ্রঃ। বিদ্বান্। অপারয়ৎ॥—৪।৩০।১৭

এবং সেই অনভিষিক্ত তুর্বশ যদুকে শচীপতি, বিদ্বান্, ইন্দ্র পার করিয়াছিলেন।

(২) পুরোড়াঃ। ইৎ। তুর্বশঃ। যক্ষুঃ। আসীৎ। রায়ে। মৎস্যাসঃ। নিশিতাঃ। অপীব।
শ্রুষ্টিং। চক্রুঃ। ভৃগবঃ। দ্রুহ্যবঃ। চ। সখা। সখায়ং। অতরৎ। বিষূচোঃ॥—৭।১৮।৬

যক্ষু তুর্বশ ধনলাভের নিমিত্ত (জলে) দলবদ্ধ মৎস্য সকলের (গমনের) মত অগ্রগামী হইয়াছিলেন। ভৃগু ও দ্রুহ্যগণ শীঘ্র পশ্চাৎ গমন করিয়াছিলেন। সখা (ইন্দ্র), সখা (সুদাসকে) নানা দিকের (আক্রমণ হইতে) রক্ষা করিয়াছিলেন।

ঋষির রচনা হইতেই জানিতে পারি। (১) এই যক্ষু জাতি বর্ত্তমান সীরদরিয়া নামক নদীর তীরে বাস করিত বলিয়া আমরা অনুমান করি। এই অনুমানের প্রথম কারণ, সীরদরিয়ার প্রাচীন নাম Jaxartes বা যক্ষতের্শ। এই নামে যক্ষু শব্দের ছায়া বর্ত্তমান। দ্বিতীয় কারণ, টড তাঁহার রাজস্থানের ইতিহাসে বলিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রগণ যুধিষ্ঠির ও বলদেবের সহিত জবুলি স্থানে গমন করিয়া গজনী নগর স্থাপন করেন, এবং সমরকন্দ পর্য্যন্ত দেশ ব্যাপিয়া নিবাস করেন। (২) শ্রীকৃষ্ণ যদুবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জীবিতাবস্থাতেও তুর্বশ যদুদিগের মূল বংশ আফগানিস্থান ও সমরকন্দে সীরদরিয়ার তীরে রাজত্ব করিতেছিলেন; নচেৎ ভারত হইতে বিতাড়িত হইয়া আফগানিস্থান ও তুর্কিস্থানে বাস ভারতবাসী যদুবংশীয়দিগের পক্ষে এত সহজ হইত না।

আমরা 'পুরুকুৎস ও ত্রসদস্যু' প্রবন্ধে দেখাইয়াছি, দিবোদাসের পুত্র স্বীয় পিতার শম্বরজয়ের স্তব রচনা করিয়াছিলেন। ঐ স্তবে শরৎদাসের সাত পুর জয়ের উল্লেখও আছে। (৩) শম্বরের পুর বৈলস্থানে অবস্থিত ছিল। ইহা যে 'ভীল'দিগের দেশ, তাহা ঐ প্রবন্ধে সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। শম্বর-জয়ের সহিত সাত পুর জয় একত্র উল্লিখিত হওয়ায়, আমরা অনুমান করি, উহাদের মধ্যে এক জন (শম্বর) বৈলস্থানে, অপর (শরৎ) মহাবৈলস্থানে বাস করিত। (৪)

আমরা অপর এক প্রবন্ধে সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি যে, পরুষ্ণী-যুদ্ধে ক্ষিতিগণ পশ্চিম হইতে আগমন করিয়াছিল। উহাদের মধ্যে তুর্বশ, দ্রুহ্যু, অনু ও পূরুগণের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। পূর্ব্বেই দেখান গিয়াছে, তুর্বশ যদু ও অনুদিগের মধ্যে সদ্ভাব ছিল। অঙ্গিরাবংশীয় কুৎস ঋষি একটী ঋকে (৫) বলিয়াছেন যে, 'হে ইন্দ্রাগ্নি! যদ্যপি যদু, তুর্বশ, দ্রুহ্যু, অনু (বা) পুরুদিগের

---

(১) অজাসঃ। চ। শিগ্রবঃ। যক্ষবঃ। চ। বলিং। শীর্ষাণি। জভ্রুঃ। অশ্ব্যানি।—৭।১৮।১৯
অজগণ, শিগ্রু গণ, যক্ষুগণ অশ্বের মস্তক সকল উপহার আহরণ (বা প্রদান) করিয়াছিল।

(২) But the sons of Crishna, who accompanied them (i.e. Yoodhishtira and Baladeva) after an intermediate halt in the further Do-ab of the five rivers, eventually left the Indus behind, and passed into Zabulisthan, founded Gajni, and peopled these countries even to Samarkand.—*Tod's Rajasthan, Vol I. p. 72.*

(৩) ১।১৩১।৪ (৪) ১।১৩১।১ ও ৩। (৫) ১।১০৮।৮

মধ্যে থাক, এই সকল স্থান হইতে, হে বৃষদ্বয়! এখানে আইস, অনন্তর সুত-সোম পান কর।' ঋগ্বেদের অন্যান্য স্থানেও এই পঞ্চ সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে। আমরা অনুমান করি ইহারাই পঞ্চ ক্ষিতি নামে ঋগ্বেদে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। ইহারা আফগানিস্থান ও উহার উত্তরবর্ত্তী সমরকন্দ দেশে বাস করিত। ইহাদের পশ্চিমে পার্থবদিগের বাস ছিল, তাহা 'সম্রাট অভ্যাবর্ত্তী' প্রবন্ধে প্রদর্শিত হইয়াছে। পার্থবদিগের পঞ্চ-মানুষী বিশদিগের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বোধ হয়, ক্ষিতিগণই উহাদের পঞ্চ-মানুষী বিশ ছিল, এবং পার্থব বংশই ইহাদের সম্রাট-বংশ।

শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়।

সাহিত্যে স্বাস্থ্যরক্ষা।

সধবার প্রেম—(বিবাহের পূর্ব্বে জাত)

বিধবার প্রেমে পড়া হিন্দু সমাজের আদর্শ অনুসারে ঘোরতর পাপ-কার্য্য। এই সকল পাপ-চিত্রের সংস্পর্শে আসিয়া কোনও কোনও হিন্দু বিধবা সংযম-ভ্রষ্ট হইতে পারেন, এই কারণে সমাজের পক্ষে এই সকলের চিত্রাঙ্কন নিতান্ত দূষণীয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু সধবা স্ত্রীর পরপুরুষের সহিত প্রেম করাটা সকল সমাজেই নিন্দনীয়, এবং তাহার চিত্রাঙ্কন সকল সমাজের পক্ষেই অনিষ্ট-জনক। বড়ই দুঃখের বিষয়, আমাদের অনেক উপন্যাসলেখক বিলাতী উপন্যাসকে আদর্শ করিয়া সধবার পরপুরুষের প্রতি প্রেমের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, এবং করিতেছেন।

সধবার পরপুরুষাসক্তি দুই প্রকারের হইতে পারে। প্রথমতঃ—কুমারী অবস্থায় এক জনকে ভালবাসিয়া পরে অন্য পুরুষের সঙ্গে বিবাহ হইলেও পূর্ব্ব প্রেম-ভাজনকে হৃদয়ে স্থান দেওয়া। দ্বিতীয়তঃ—এক জনের সঙ্গে বিবাহের পরে অন্য পুরুষকে ভালবাসা। ইহার মধ্যে প্রথমটিতে বরং আমরা অবস্থা-বিশেষে, সেই রমণীকে কৃপার পাত্র মনে করিয়া ক্ষমা করিতে পারি; কিন্তু দ্বিতীয়টিতে সেই রমণী কোনও অবস্থায়ই ক্ষমার যোগ্য নহে। কিন্তু যে সকল লেখকের আর্ট আছে, তাঁহারা এই দ্বিতীয়টিতেও পরপুরুষাসক্ত রমণীকে নানা প্রকার প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে ফেলিয়া তাহার প্রতি পাঠকের সমবেদনা

আকর্ষণ করেন। ইহাতে তাঁহাদের আর্টের সার্থকতা হয়, সন্দেহ নাই; কিন্তু সমাজের হিসাবে তাহা অত্যন্ত দূষণীয়।

বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথমে তাঁহার শৈবলিনী-চরিত্রে, প্রথম শ্রেণীর প্রেমের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। তাঁহার আর্টের গুণে এই বুড়া বয়সেও 'শৈবলিনী সৈ' পড়িতে পড়িতে আমাদের চোখে জল আসে। প্রতাপ ও শৈবলিনীর বাল্যকালের গভীর প্রণয় টেনিসনের এনক-আর্ডেন (Enoch arden) কে স্মরণ করাইয়া দেয়। শৈবলিনীর চন্দ্রশেখরের সঙ্গে, এবং প্রতাপের সুন্দরীর সঙ্গে বিবাহ হইলেও, উভয়ের মধ্যে সেই প্রেম রহিয়া গেল। শৈবলিনী তাহার দেবতুল্য স্বামীকে পাইয়াও সেই বাল্যকালের প্রেম ভুলিতে পারিল না। চন্দ্রশেখর বয়সে প্রবীণ,তিনি তাঁহার পুঁথি লইয়াই সর্ব্বদা মগ্ন থাকিতেন; তিনি শৈবলিনীকে আপনার করিয়া লইবার কোনও চেষ্টাই করেন নাই। হয় ত শৈবলিনী তাঁহার প্রেমের স্বাদ পাইলে, প্রতাপকে ভুলিতে পারিত। কিন্তু যখন গৃহে তাহার প্রেম-পিপাসা মিটিল না, তখন সে প্রতাপকে পাইবে, এই পাগলের খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া লরেন্স ফষ্টরের নৌকায় গিয়া উঠিল। গ্রন্থকার কিন্তু শৈবলিনীকে কখনও ফষ্টরের সহিত মিলিত হইতে দেন নাই। আবার, প্রতাপ শৈবলিনীকে ফষ্টরের কবল হইতে উদ্ধার করিবার পর, যখন প্রতাপের সহিত শৈবলিনীর সাক্ষাৎ হইল, তখনও বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছেন। শৈবলিনীর পাপ মানসিক পাপ; সেই পাপের জন্য শৈবলিনীর প্রতি আমাদের যথেষ্ট সমবেদনার উদ্রেক হয়। তাহা হইলেও গ্রন্থকার সেই পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য তুষানলের ব্যবস্থা করিয়াছেন। গ্রন্থের অধিকাংশ ভাগই সেই প্রায়শ্চিত্তের কথায় পরিপূর্ণ। ইহা দ্বারা পাঠকের মনে পাপীর প্রতি সহানুভূতি ও পাপের প্রতি বিতৃষ্ণা হয়। প্রতাপ শৈবলিনীর কল্যাণ-কামনায় যখন যুদ্ধক্ষেত্রে নিজের জীবন বিসর্জ্জন দিয়া আপনার মানসিক পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিল, তখন তাহা দেখিয়া হৃদয়ে উচ্চ ভাবের সঞ্চার হয়। এখানেই বঙ্কিমচন্দ্রের আর্টের সার্থকতা। তবুও প্রেমের মাদকতা এত বেশী যে, শৈবলিনীর কঠোর দণ্ড দেখিয়াও লোকের মনে পাপাসক্তি কমে না।, এবং শৈবলিনীর অনুকরণে পরপুরুষাসক্তি সমাজে চলিয়াছে, এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

স্যার রবীন্দ্রনাথের কোনও উপন্যাসে আমরা এই শ্রেণীর প্রেমের চিত্র পাই না। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁহার 'দেবদাসে' এই শ্রেণীর আর

একটি প্রেমচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। তাহা তাঁহার আর্টের গুণে নিতান্ত মর্ম্মস্পর্শী ও tragic হইয়াছে। যে নারী বিবাহের পরে পরপুরুষকে হৃদয়ের সহিত ভালবাসিতে থাকে, সে দ্বিচারিণী, সন্দেহ নাই। দ্বিচারিণী রমণী সকল সমাজেই নিন্দনীয়। কিন্তু লেখক পার্ব্বতীকে এরূপ অবস্থাপরম্পরার মধ্যে স্থাপন করিয়াছেন যে, তাহার প্রতি আমাদের রাগ হয় না, বরং তাহার দুরদৃষ্টের জন্য দুঃখ হয়। প্রতাপ-শৈবলিনী অথবা রমা-রমেশের ন্যায় পার্ব্বতী ও দেবদাস বাল্যকালে এক সঙ্গে খেলা করিত, এক পাঠশালায় পড়িত, এক সঙ্গে দুষ্টামী করিত। দেবদাস তাহার দুষ্টামীর জন্য পাঠশালা হইতে তাড়িত হইল; পার্ব্বতীও গুরুমহাশয়ের নামে মার-পিটের মিথ্যাভিযোগ উপস্থিত করিয়া পাঠশালায় যাওয়া বন্ধ করিল। কিন্তু দেবদাস অত্যন্ত গোঁয়ার; সে পার্ব্বতীকে অতি সামান্য কারণে নির্দ্দয়রূপে প্রহার করিত। তবুও পার্ব্বতী তাহাকে ভাল না বাসিয়া পারিত না। ক্রমে দেবদাস বড় হইল; তাহাকে বিদ্যাশিক্ষার জন্য কলিকাতায় পাঠান হইল। সেখানে গিয়া তাহার লেখাপড়ায় মনোযোগ হইল, এবং কলিকাতার সংসর্গে তাহার অনেক গ্রাম্যতা দোষ কাটিয়া গেল, সে সভা ভব্য বাবু হইল। সে প্রথম প্রথম পার্ব্বতীকে প্রায়ই পত্র লিখিত—ক্রমে তাহাও বন্ধ হইল। গ্রীষ্মের বন্ধে দেবদাস বাড়ীতে আসিয়া পার্ব্বতীদের বাড়ীতে গেল, কিন্তু পার্ব্বতীর সঙ্গে বেশী কথা কহিতে পারিল না, তাহার লজ্জা করিতে লাগিল। পার্ব্বতীর বয়স তের বছর হইয়াছে। পিতা মাতা তাহার বিবাহের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। পার্ব্বতী দেখিতে অত্যন্ত সুশ্রী, দেবদাসের পিতা খুব বড়লোক; পার্ব্বতীর মাতা দেবদাসের সঙ্গে পার্ব্বতীর বিবাহের প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু পার্ব্বতী 'বেচাকেনা ঘরের মেয়ে, তার ওপর আবার ঘরের পাশে কুটুম্ব, ছিঃ ছিঃ!'—এই কারণে দেবদাসের পিতার এ বিবাহে মত হইল না। পার্ব্বতীর পিতাও জেদ করিলেন, যত শীঘ্র হয় তিনি অন্য পাত্রের সঙ্গে মেয়ের বিবাহ দিবেন। তাঁহার মেয়ে ত কুৎসিত নয়, পাত্রের অভাব কি? কিন্তু তাঁহার এই সংকল্প শুনিয়া পার্ব্বতীর মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। ('বাজ' নহে!) সে তাহার সখী মনোরমাকে বলিল, 'আমি জানি আমার স্বামীর নাম দেবদাস......আমি দেবদাসকে জিজ্ঞাসা করিব, তিনি আমাকে বিবাহ করিবেন কি না?'—'বলিস্ কি? লজ্জা করবে না?' 'লজ্জা কি? তোমাকে বল্‌তে কি লজ্জা কল্লুম?' 'মনোদিদি, তুই মিছামিছি মাথায় সিন্দূর পরিস্। কাকে স্বামী বলে, তাই

জানিস্ নে। তিনি আমার স্বামী না হ'লে, আমার সমস্ত লজ্জা সরমের অতীত না হ'লে, আমি এমন করে মরতে বসতুম না। তা ছাড়া দিদি, মানুষ যখন মরতে বসে, তখন সে কি ভেবে দেখে, বিষটা তেতো কি মিষ্টি? তাঁর কাছে আমার কোনও লজ্জা নেই।' একটি ত্রয়োদশবর্ষীয়া পাড়া-গেঁয়ে মেয়ের মুখে এরূপ কথা নিতান্ত অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয় না কি? কিন্তু লেখক তাহার কৈফিয়ৎ দিয়াছেন, পার্ব্বতী অকালপক্ক বালিকা। তাহা হইলেও যেন কেমন কেমন লাগে। যাহা হউক, পার্ব্বতী যথার্থই এক দিন গভীর রাত্রে একাকিনী বাড়ী হইতে বাহির হইয়া দেবদাসদের বাড়ীর সদর-দরজায় দরোওয়ানদিগের ও অন্দরে দাসদাসীদিগের হাত এড়াইয়া দোতালায় দেবদাসের শয়নগৃহে গিয়া উপস্থিত হইল। দেবদাস হঠাৎ তাহাকে দেখিয়া বলিল, 'এমন কাজ করলে পারু! এত রাত্রে—ছি ছি, কাল মুখ দেখাবে কেমন কোরে?' পার্ব্বতী বলিল, 'আমার সে সাহস আছে।' পার্ব্বতী মনে মনে নিশ্চয় জানিত, দেবদাস তাহাকে বিবাহ করিয়া তাহার সমস্ত লজ্জা ঢাকিয়া দিবে। সে দেবদাসের পায়ের উপর মাথা রাখিয়া অবরুদ্ধস্বরে বলিয়া উঠিল, 'এইখানে একটু স্থান দেও দেবদা!' দেবদাস অল্পক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, 'বাপ মায়ের একেবারে অমত, তা জানো? —তবে আর কেন?' পার্ব্বতী তাহার পা-চাপিয়া ধরিয়া বসিয়া রহিল। পরে দেবদাস পার্ব্বতীকে সঙ্গে করিয়া বাড়ীতে রাখিতে গেল। পার্ব্বতী বলিল, 'যদি দুর্নাম রটে, হয় ত কতকটা উপায় হতে পারবে।'

এক ত্রয়োদশবর্ষীয়া বালিকার এইরূপ নির্লজ্জ ব্যবহার বাস্তব-জীবনে প্রায়ই দেখা যায় না। সাহিত্যেও ইহার একমাত্র তুলনা এই গ্রন্থকারের 'অরক্ষণীয়া'-চরিত্রে। মনোরমার সহিত কথোপকথনে গ্রন্থকার পার্ব্বতীর মুখ দিয়া যে কৈফিয়ৎ বাহির করিয়াছেন, তাহাও এই ত্রয়োদশবর্ষীয়া বালিকার মুখে শোভা পায় না, তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি। যাহা হউক, লেখকের বর্ণনার গুণে এই অসম্ভব ব্যবহারও হৃদয়স্পর্শী হইয়াছে।

ইহার পরে দেবদাস তাহার পিতার নিকট পার্ব্বতীর সহিত বিবাহের প্রস্তাব উপস্থিত করিল। পিতা ক্রোধ প্রকাশ করিলেন, জননী কাঁদিয়া আকুল হইলেন, দেবদাস তাহার তোড়-জোড় বাঁধিয়া কলিকাতায় চলিয়া গেল। সেখানে গিয়া এই মর্ম্মে পার্ব্বতীকে পত্র লিখিল—'তোমাকে সুখী করিতে গিয়া পিতা মাতাকে এত বড় আঘাত দিব, তাহা আমার দ্বারা

অসাধ্য, আর আমি যে তোমাকে বড় ভালবাসিতাম, তাহা আমার কোনও দিন মনে হয় নাই—আজও তোমার জন্য আমার অন্তরের মধ্যে নিরতিশয় ক্লেশ অনুভব করিতেছি না, শুধু এই আমার বড় দুঃখ, যে তুমি আমার জন্য কষ্ট পাইবে !'

এই শেষ কথাটা লিখিয়া দেবদাসের মনে অনুতাপ হইল। এই শেষ কথাটাই উভয়ের জীবনের কাল হইল। দেবদাসের স্বভাব এই যে, সে কোনও কাজই ভাবিয়া চিন্তিয়া করিতে পারে না, নিতান্ত ঝোঁকের বশবর্ত্তী হইয়া কাজ করে। সে পার্ব্বতীকে ঐ চিঠি লিখিয়া অনুতপ্তমনে কলিকাতা হইতে বাড়ী গেল। এ দিকে হাতিপোতার জমীদার ভুবনমোহন চৌধুরীর সঙ্গে পার্ব্বতীর বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে। ভুবন বাবু প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পরে প্রৌঢ় বয়সে পুনর্ব্বার বিবাহ করিতেছেন। বিবাহের কয়েক দিন পূর্ব্বে পার্ব্বতী দু-প্রহর বেলায় কলসী-কক্ষে বাঁধে জল আনিতে গিয়া দেখিল, দেবদাস এক ফুল গাছের আড়ালে ছিপ ফেলিয়া বসিয়া আছে। দেবদাস পার্ব্বতীকে কাছে ডাকিয়া বলিল, 'আমি এসেছি পারু !' পার্ব্বতী বলিল, 'কেন ?' 'তুমি আসতে লিখেছিলে, মনে নাই ?' 'না।' অবশেষে দেবদাস বলিল, 'আমি যেমন করিয়া পারি, মা বাপের মত করিব।'

পার্ব্বতী বলিল, 'তোমার মা বাপ আছেন, আমার নেই ?.......তোমাতে কিছুমাত্র আমার আস্থা নাই। আমি যাঁর কাছে যাচ্ছি, তিনি ধনবান, বুদ্ধিমান—শান্ত স্থির। তিনি ধার্ম্মিক। আমার মা-বাপ আমার মঙ্গল কামনা করেন; তাই তাঁরা তোমার মত এক জন অজ্ঞান, চঞ্চলচিত্ত, দুর্দ্দান্ত লোকের হাতে আমাকে কিছুতেই দিবেন না। তুমি পথ ছেড়ে দাও।' ইহার পরে উভয়ের ঝগড়া হইল। দেবদাস রাগে অপমানে ভীষণ হইয়া উঠিয়া বলিল, 'শোন পার্ব্বতী, অতটা রূপ থাকা ভাল নয়। অহঙ্কার বেড়ে যায়। দেখ্‌তে পাও না, চাঁদের অত রূপ বলেই তাতে কলঙ্কের কালো দাগ; পদ্ম অত সাদা বলেই তাতে কালো ভোমরা বসে থাকে। এস, তোমার মুখেও কিছু কলঙ্কের ছাপ দিয়ে দিই।' এই বলিয়া দৃঢ়মুষ্টিতে সেই ছিপের বাঁট ঘুরাইয়া পার্ব্বতীর মাথায় আঘাত করিল, সঙ্গে সঙ্গেই কপালের উপর বাম ভ্রূর নীচে পর্য্যন্ত চিরিয়া গেল। চক্ষের নিমিষে সমস্ত মুখ রক্তে ভাসিয়া গেল।

'দেবদা' কোরলে কি ?' বলিয়া পার্ব্বতী মাটীতে লুটাইয়া পড়িল। দেবদাস

তখন তাহার জামা ছিঁড়িয়া জলে ভিজাইয়া ক্ষতস্থান বাঁধিয়া দিল। পার্ব্বতী বলিল, 'দেবদা, কাউকে যেন বোলো না'—'মাপ কর আমাকে।' দেবদাস অবশেষে পার্ব্বতীর মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিল, 'তুমি ভালই করেছ। আমার কাছে তুমি হয় ত সুখ পেতে না, কিন্তু তোমার এই দেবদাদার অক্ষয় স্বর্গবাস ঘটুত।'

ইহার পরে চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে পার্ব্বতীর বিবাহ হইল, এবং সে স্বামীর গৃহে চলিয়া গেল। তাহার স্বামী এক জন সচ্চরিত্র, বিচক্ষণ, সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোক। বয়স চল্লিশের উপর। তাঁহার অনেকগুলি বড় বড় ছেলে মেয়ে। তিনি এই বয়সে বিবাহ করিয়া নিজেকে নিতান্ত অপরাধী জ্ঞান করিতেন। শয্যায় শুইতে আসিয়া প্রথম স্ত্রীর কথা মনে করিয়া চোখের জল মুছিতেন। তাঁহার রাজার সংসার। পার্ব্বতী অল্প দিনের মধ্যেই নিজের চরিত্রগুণে সেই ছেলে মেয়েদিগকে স্নেহে বশ করিয়া ফেলিল, এবং সংসারে রাজরাণীর মত প্রভুত্ব বিস্তার করিতে লাগিল।

এ দিকে দেবদাস কলিকাতায় গিয়া চুণীলাল নামক বিশৃঙ্খল-চরিত্র যুবকের সহিত মিশিয়া চন্দ্রমুখী নাম্নী এক বেশ্যার বাড়ীতে যাতায়াত আরম্ভ করিল, এবং মদ ধরিল। সেই চন্দ্রমুখীকে সে নিতান্ত ঘৃণার চক্ষে দেখিত, কিন্তু চন্দ্রমুখী তাহাকে ভালবাসিয়া ফেলিল। দেবদাসের পিতা মাতা তাহার বিবাহের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন, সে কিছুতেই বিবাহ করিল না। পরে পিতার মৃত্যু হইলে দেবদাস বাড়ীতে আসিল। পার্ব্বতীও তখন পিত্রালয়ে আসিয়াছিল। শ্রাদ্ধ শেষ হইলে সে দেবদাসের বিশ্বস্ত পুরাতন ভৃত্য ধর্ম্মদাসের নিকট তাহার চরিত্রকাহিনী সমস্ত অবগত হইল। তখন তাহার মনে হইল—'তাহার দেব দাদা এমন হইয়া যাইতেছে, এমন করিয়া নষ্ট হইতেছে, আর সে পরের সংসার ভাল করিবার জন্য বিব্রত! পরকে আপনার ভাবিয়া সে নিত্য অন্ন বিতরণ করিতেছে, আর তাহার সর্ব্বস্ব আজ অনাহারে মরিতেছে।' পার্ব্বতী সন্ধ্যার পরে দেবদাসের ঘরে গিয়া উপস্থিত হইল। দেবদাস বলিল, 'দু'জনে মিলে মিশে একটা ছেলে-মানুষি করে ফেলে—এই দেখ দেখি মাঝ থেকে কি গোলমাল হয়ে গেল। রাগ করে তুই যা ইচ্ছে তাই বললি, আমিও কপালের ওপরে ঐ দাগই দিয়ে দিলাম।' পার্ব্বতী বলিল, 'দেবদাদা, ঐ দাগই আমার সান্ত্বনা, ঐ আমার সম্বল।' অবশেষে পার্ব্বতী দেবদাসকে বলিল, 'প্রতিজ্ঞা কর, আর মদ

খাবে না।' দেবদাস কিছুতেই প্রতিজ্ঞা করিল না। পরে পার্ব্বতী মাটীতে লুটাইয়া পড়িয়া অনেক কান্না কাঁদিল। পরে বলিল, 'দেবদা, আমার যে বড় কষ্ট,—আমি যে মরে যাচ্ছি। কখনও তোমার সেবা করতে পেলাম না—আমার বাড়ী চল—আমার ছেলেবেলার সাধ—স্বর্গের ঠাকুর আমার এ সাধটী পূর্ণ করিয়া দাও—তার পরে মরি—তাতেও দুঃখ নাই।' দেবদাস তাহার পদপ্রান্ত স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিল—'আমাকে যত্ন করিলে যদি তোমার দুঃখ ঘুচে—আমি যাব।'

পার্ব্বতী স্বামিগৃহে ফিরিয়া গিয়া আবার তাহার সংসারধর্ম্মে মন দিল। বড় ছেলে মহেন্দ্রের বিবাহ দিয়া বৌ ঘরে আনিল। গরীব দুঃখীকে দান করিয়া, ঠাকুরবাড়ীর কাজ করিয়া, সাধু সন্ন্যাসীর সেবা করিয়া, অন্ধ খঞ্জের পরিচর্য্যা করিয়া তাহার দিন কাটিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে আর পাঁচ বৎসর অতীত হইল। তাহার কোনও সন্তান হইল না। পুত্রবধূ ঘরে আনার পর তাহার কাজ অনেকটা কমিয়াছে, এখন তাহার ভাবনা কিছু বাড়িয়াছে। সে নৈরাশ্যের ভাবনা। সে কখনও কাজ করিয়া, মিষ্ট কথাবার্ত্তা কহিয়া, পরোপকার, সেবা শুশ্রূষা করিয়া সময় কাটায়; আবার কখনও সব ভুলিয়া ধ্যানমগ্না যোগিনীর মতও থাকে। এই সময়ে হঠাৎ তাহার বাল্যসখী মনোরমার এক চিঠি পাইল,—'দেবদাস নিতান্ত উচ্ছন্ন গিয়াছে। সে প্রায়ই কলিকাতায় থাকে, বাড়ী আসে কেবল টাকা লইতে আর তাহার দাদার সঙ্গে ঝগড়া করিতে। এই সময়ের মধ্যেই নাকি তাহার অর্দ্ধেক বিষয় উড়াইয়া দিয়াছে। তাহার সে সোনার বর্ণ নাই, সে চেহারা নাই, দেখিলে ভয় হয়, ঘৃণা করে—' ইত্যাদি। এই চিঠি পাইয়া পার্ব্বতী দুইখানা পাল্কীতে বড় ছেলেকে সঙ্গে লইয়া পিত্রালয়ে রওনা হইল। কিন্তু সেখানে গিয়া দেবদাসের দেখা পাইল না। মনোরমা বলিল, 'পারু, দেবদাসকে দেখ্‌তে এসেছিলে?' পার্ব্বতী বলিল, 'না, সঙ্গে কোরে নিয়ে যাবার জন্য এসেছিলাম। এখানে তার আপনার লোক ত কেউ নেই।' মনোরমা অবাক হইয়া বলিল, 'বলিস্ কি? লজ্জা করতো না?' 'লজ্জা আবার কাকে? নিজের জিনিস নিজে নিয়ে যাব, তাতে লজ্জা কি?' 'ছিঃ ছিঃ— ও কি কথা? একটা সম্পর্ক পর্য্যন্ত নেই—অমন কথা মুখে এনো না।' পার্ব্বতী ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, 'মনোদিদি, জ্ঞান হওয়া পর্য্যন্ত যে কথা বুকের মাঝে বাসা করে আছে, এক আধ্‌বার তা' মুখ দিয়ে বার হয়ে পড়ে। তুমি বোন, তাই এ কথা শুন্‌লে।'

পার্ব্বতীর এই পরপুরুষের প্রেমে তন্ময়তা কাব্যের হিসাবে খুব মর্ম্মস্পর্শী। ইহা সেই ব্রজগোপীগণের লজ্জা ভয় বিসর্জ্জন দিয়া, পতিপুত্রাদি ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ধাবিত হওয়া স্মরণ করাইয়া দেয়। এক দিন চণ্ডীদাসও রামী রজকিনীর প্রতি এইরূপ প্রেমে উন্মত্ত হইয়া তাহাকে 'পিতা মাতা' প্রভৃতি সম্বোধন করিয়াছিলেন। কিন্তু এরূপ আরও কত স্ত্রীলোক সচরাচর দেখা যায়, যাহারা পতি পুত্র ত্যাগ করিয়া পরপুরুষের সহিত বাহির হইয়া যাইতেছে। তাহারা যে সমাজের কলঙ্ক, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। তাহাদের সেই প্রেমোন্মাদের সহিত পার্ব্বতীর এই প্রেমোন্মত্তার প্রভেদ কোথায়? এক প্রভেদ এই, তাহাদের প্রেমোন্মত্তার মানে কামোন্মত্ততা, পার্ব্বতীর প্রেম কামগন্ধহীন —তাহা রূপলালসা বা ভোগের লালসা অতিক্রম করিয়া সহজ স্নেহের পদবীতে উঠিয়াছে। লোকে পিতা মাতা ভ্রাতাকে যেরূপ সহজভাবে স্নেহ করে, পার্ব্বতীও দেবদাসকে সেইরূপ বাল্যকাল হইতে স্নেহ করিতে শিখিয়াছে। সেই জন্য পার্ব্বতী দেবদাসের পতনের কথা শুনিয়া মনে করিয়াছিল, 'তাহার দেব দাদা, এমন হইয়া যাইতেছে, এমন করিয়া নষ্ট হইতেছে, আর সে পরের সংসার ভাল করিবার জন্য বিব্রত!' পার্ব্বতী এখানে দেবদাসকে আপনার লোক ও স্বামীকে পর ভাবিতেছে। ইহা এক জন বিবাহিতা রমণীর মুখে নিতান্ত বিসদৃশ ও নিতান্ত বিগর্হিত শুনায়। কিন্তু যে এরূপ বলিতেছে, তাহার ইহাতে একটুও লজ্জা সরম নাই—কারণ, সে এই প্রেমের উন্মাদনায় লজ্জা ও ভয়ের সীমা অতিক্রম করিয়াছে। পার্ব্বতীর প্রেম কামগন্ধহীন, সহজাত স্নেহের ন্যায় নির্ম্মল, স্বার্থলেশশূন্য, স্বার্থ ত্যাগ করিয়া সেবা করিতে উন্মুখ।

ক্রমশঃ।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ।

ফরাসী রণাঙ্গনের কথা।

[পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।]

মালটায় ছাব্বিশ দিন কাটিল। মালটাবাসীর সংস্রবে আসিবার সুযোগ হয়। তাহারা ইংরাজীতেও কথাবার্ত্তা কহে; ফিনিশিয়ন তাহাদের মাতৃভাষা, এবং তাহাদের পূর্ব্বপুরুষ মাতৃভাষায় কথা কহিত। তাহাদের অতীত-গৌরব-কাহিনী শুনিলাম; তাহাদেরও সভ্যতা বলিয়া কিছু ছিল; রোমের অভ্যুদয়ের

পূর্ব্বে জগতের নিকট আপনাদিগকে সভ্য বলিয়া তাহারা প্রতিপন্ন করিতে পারিয়াছিল। সমুদ্রে জাহাজ মগ্ন হওয়ায় St. Paul মালটার উপকূলে কেমন ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাও শুনিলাম। মালটা অনেক দিন ধরিয়া পরাধীন। রোমান, গ্রীক, আরব, এবং স্পানিয়ার্ড, একে একে সকলেই এই দেশের উপর আপন আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। মালটা বর্ত্তমানে ইংরাজের অধীন। এইরূপ দৈব-দুর্ব্বিপাকে পড়িয়াও মাল্টা আপন স্বাতন্ত্র্যটুকু অক্ষুন্ন রাখিতে পারিয়াছে—অতীত গৌরবের কথা এখনও তাহার হৃদয় স্পর্শ করে; পুরাতনকে তাহারা তনু মন প্রাণ দিয়া আঁকড়াইয়া ধরিতে চায়। পূর্ব্বেও এই দ্বীপে হিন্দু সৈন্য অবতীর্ণ হয়; মাল্টাবাসী হিন্দু-চরিত্রের অতিশয় পক্ষপাতী। Cyprus অভিযানের সময় যে সকল হিন্দু সৈন্য আসে, তাহারা সেণ্ট জর্জ্জ হাঁসপাতালে ছিল। তাহারা উন্নত ব্যবহারে ও হিন্দুসুলভ চরিত্রের পরিচয়ে অন্তঃপাতী জনপদের লোকের চিত্তাকর্ষণ করিয়াছিল। অনেক পরিবারে তাহাদের প্রদত্ত চারুশিল্প সযত্নে রাখিয়া দিয়াছে; চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে যে সব রমণী জীবিত ছিলেন, তাঁহাদের মুখে হিন্দু সৈনিকের সুখ্যাতি ধরিত না। এখানে হিন্দু সৈন্তের সমাধি দেখিতে গেলাম; শ্রদ্ধার সহিত পুষ্প সাজাইয়া দিলাম। সঙ্গে যে সব রমণী ছিলেন, তাঁহাদের সহিত একযোগে মৃতসৈন্যের অন্তরাত্মার মঙ্গল কামনা করিলাম।

এক দিন সবে প্রত্যূষ,আমাদিগকে রওনা হইতে হইবে,সংবাদ পাইলাম। দূরে সমুদ্রে চাহিয়া দেখি, একটী অর্ণবযান কূলের দিকে আগাইয়া আসিতেছে; নাম Polinesian; এটা M.M. কোম্পানীর জাহাজ; বন্দরের দিকে ক্রমে আসিতে লাগিল, ১৫ মিঃও হয় নাই—পুনরায় বার্ত্তা আসিল, 'জাহাজ বন্দর হইতে পাঁচ শত গজ দূরে টর্পেডো হইয়াছে, এবং ডুবিতে ১০ মিনিটের বেশী সময় লাগে নাই।' অন্য জাহাজের প্রতীক্ষায় রহিলাম—প্রতীক্ষা করিয়া করিয়া এরূপ প্রতীক্ষা উৎকণ্ঠিত করিত না। নিমজ্জিত জাহাজের দুই এক জন গোলন্দাজ সৈন্যের সহিত কথা কহিবার সুযোগ হয়; তাহারা বলে, 'টর্পেডো কল-কারখানার ঘর দ্বিধা করে—এবং "বয়লার" ফাটিয়া যায়।' ইহার এক দিন পরে আমাদের একটী ডেস্‌ট্রয়ার যে চোরা-বোট এই নৃশংস আঘাত করে, তাহাকে ধরিয়া ফেলে। 'সবমেরিণে'র 'পেরিস্‌কোপ্' চল্লিশ গজ দূরে দেখিয়া তাহার উপর একটী 'বাস্‌কেট' বোমা ছোড়া হয়। এই বোমা বৃহদাকার, দেখিতে একটী বড় পিপে; রেলের উপর অবস্থিত—তলায় দুটী চক্র আছে, তাহার উপর ভর করিয়া

ইতস্ততঃ সরান যায়। ছুড়িবার সময় স্প্রিং কিংবা ওইরূপ অন্য কিছুর সাহায্যে সজোরে ছুড়িতে হয়। জলে পড়িয়া ভীষণ ঘূর্ণাবর্ত্তের সৃষ্টি করিল। চোরা জাহাজ আহত হইল না বটে, কিন্তু জলের উপর ভাসিয়া উঠিতে বাধ্য হইল। কাপ্তান ও তাঁহার লোকজন যুগপৎ ধৃত হইলেন। চোরাবোটও অবরোধ করা হইল। ইহা 'পলিনেসিয়ান' জাহাজ টর্পেডো করে। কতকগুলি জাহাজ তাহার নির্ম্মম আক্রমণে সমুদ্রজলতলগত হইয়াছে জিজ্ঞাসা করায়, তিনি বলেন, 'আমি যা করেছি, তাতে দেশে ফিরিলেই লক্ষপতি হব', এবং জলের বদলে স্থলে কাজ করবার ছয় মাস ছুটী পাব।'

দিন গুণিতে গুণিতে এক মাস হইল; আমাদের যাওয়া আর হয় না। শেষে এক দিন Oceania নামক জাহাজে চড়িলাম, কিন্তু প্রহরী-জাহাজের অভাবে সে দিন রওনা হওয়া হইল না। জাহাজ মার্সেল হইতে আসিয়াছে—বিস্ফোরকে বোঝাই। বন্দরে জাহাজে এক পক্ষ কাটিল—বৈচিত্র্যহীন জীবন; বিশেষ ভাল লাগিল না। প্রত্যহ লোক আসে; জাহাজ ডুবি হইয়াছে—চোরা-বোটের মরণ-কবল এড়ান দুঃসাধ্য; যাহারা আসিত, তাহারা কোনও রকমে প্রাণ বাঁচাইয়া রক্ষা পাইত। প্রাতরাশ সম্পন্ন হইয়াছে; প্রাতঃকাল; বন্দর হইতে জাহাজ নির্গত হইল। এক মাইল যায় নাই—চারি দিকে চারিটি 'পেরিস্কোপ' দৃষ্ট হইল, সহসা বজ্রপাতেও মানুষকে এত আশ্চর্য্য করে না। মুহূর্ত্তের জন্য কি করিতে হইবে কাপ্তান তাহার কিছু ঠিক করিতে পারিল না। পশ্চাতের 'সবমেরিণ' নিকটে ছিল—কাপ্তেন জাহাজ দক্ষিণে দ্রুত ফিরাইল—জাহাজের ৬ মিটার দূর দিয়া বিক্ষিপ্ত জলে ছুটিয়া গেল। ত্বরিতে জাহাজ সম্মুখে আগান হইল; এবং আত্মরক্ষার নিমিত্ত নির্ম্মিত net-workএর ভিতর প্রবেশ করিয়া আমরা নিরাপদ হইলাম—দুই ঘণ্টা যাবৎ সেখানে আমাদের অবস্থিতি হইল। পুনরায় যাত্রা সুরু হইল; এক ঘণ্টাও হয় নাই, উপকূল-সন্নিকটে প্রায় আটশত গজ দূরে ক্ষুদ্র শিশুর মস্তকের মত অস্পষ্ট কি দেখা গেল, চাহিয়া দেখিলে সহসা মনে হয়, কোনও শিশু network জলে ভাসাইয়া রাখিতে প্রয়াস পাইতেছে, আমাদের ভ্রান্তি শীঘ্র দূর হইল; প্রথমে যাহাকে শিশু-মস্তক বলিয়া প্রতীতি হয়, তাহা মস্তক নয়; জলের উপর প্রায় দুই ফিট উচ্চ চোরা বোটের একটি দণ্ড। তাহা নিশ্চল · ইতস্ততঃ একটুকুও সঞ্চলিত হয় না। এই কারণে ইহাকে 'সবমেরিন' বলিয়া কেহ মনে করে নাই। ইহার পাঁচ মিনিট পরে দাণ্ডাটি জলে ডুব দিল, এবং ফাৎনার মত কিছু দূরে গিয়া

আবার উঠিল। আসল ব্যাপার কিঞ্চিৎ গুরুতর বুঝিতে পারিয়া উল্‌টা দিকে ফিরিয়া net-work-এর ভিতর দ্রুত প্রবেশ করিলাম।

চারি দিন এই ভাবে কাটিল; সন্ধ্যার সময় আবার সমুদ্রে বাহির হওয়া গেল। এবার সঙ্গে আরও দু'টি জাহাজ ও ভোজপুরী-পালোয়ান-প্রতিম চারিটি ডেস্‌ট্রয়ার ছিল। তৃতীয় দিন প্রত্যূষে ফ্রেঞ্চ ডেসট্রয়ার তারবিহীন বার্ত্তা পাইল, ...স্থানে একটি জাহাজ টর্পেডো হইয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে এই ডেস্‌ট্রয়ার একটি সব্‌মেরিন ধরিয়াছিল। আহত জাহাজের সাহায্য করিতে ইহাকে দারদানেলিসের দিকে ছুটিতে হইল। আমরা যেমন যাইতেছিলাম, তেমনই চলিলাম; সারা দিন কোনও অঘটন ঘটিল না। বেলা ৩টা; আমরা ঘুমাইতেছিলাম। ডেকের উপর কম্বল খাটাইয়া তাঁবুর মত করি, গ্রীষ্মের উত্তাপ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য তাহার আওতায় শয়ন করি। চার চারিটা দিন তাস পিটিয়া কাটিয়াছে—ব্রিজ, হুইষ্ট, মনি, ৩০৪, ২৮ পিকেট ও রুসাইট—একে একে কত খেলাই খেলা হইল। কত আমোদ, কত কৌতুক! কারণ, জানিতাম, দুঃখ কাহাকে বলে তাহা না জানিলেও বিশেষ কোনও ক্ষতি নাই। দুঃখ নাই, কষ্ট নাই, তবু আমার কি দুঃখ, এই কথা অযথা নিয়ত ভাবিয়া অনেকে দুঃখ পায়! এ যেন অতি সতর্ক রাজকর্ম্মচারীর মনে অহরহঃ পীতাতঙ্ক, কিংবা ইউরোপের পীতাতঙ্ক। আমাদের প্রতি সর্ব্বদা 'লাইফ-বেল্‌ট' পরিয়া থাকিবার আদেশ ছিল; এমন কি, ঘুমাইবার সময়েও। ইহা ব্যতীত আমরা প্রত্যেক দুই ঘণ্টা করিয়া বিপদ হয় কি না তাহা দেখিবার জন্য প্রহরী থাকিতাম। বিপদের আশঙ্কা কেহ করে নাই—বিশেষভাবে সতর্কও কেহ থাকিত না। দিবসে আমরা এক ভাবে এক পথে চলিতাম—সাধারণতঃ ঘুরান পথ অবলম্বন করিয়া; রাত্রে আমাদের গতি আর এক ভাবের ছিল—সর্ব্বাপেক্ষা সোজা পথ ধরিয়া চলিতাম। অদ্য আমাদের ভাগ্যে বিষম বিপদ ছিল—আমরা পূর্ব্বে হইতে তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। সকলে নিদ্রামগ্ন—কি এক বিকট শব্দ শুনিয়া উত্থিত হইলাম। দক্ষিণ কান ডেকের উপর চাপিয়া শুইয়াছিলাম; লাফাইয়া উঠিয়া জাহাজের অতি পুরোভাগে উপস্থিত; ইচ্ছা, তেমন কিছু ঘটিলে সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িব। যে সকল অফিসরের উপর জাহাজ-পরিচালনার ভার ছিল, তাহারা বেল্ট পাড়িতেছে; অধরযুগল দৃঢ়বদ্ধ;—চক্ষুর্দ্বয় বিস্ফারিত; যেন কোটর হইতে বাহির হইয়া আসিতেছে। মুখে কথা নাই; যাহা করিবার, যন্ত্রের মত তাহা নিষ্পন্ন হইতেছে, যদিও দেখিলে তাহাদের ভীতিবিহ্বল বলিয়া প্রতীয়মান হয়। একটি ইংরাজ

ছিল—একটুও বিচলিত হয় নাই; তাহার আশ্চর্য্য ধৈর্য্য! ব্রিটিশ-চরিত্রের এইটাই বিশেষত্ব। ইংরাজ বিপদসূচক রক্তনিশান তুলিয়া দিতে ছুটিল। নিম্নে ডেকে পুরুষ, রমণী, শিশু, এবং সৈন্য, অফিসার সকলেই ভয়প্রযুক্ত ইতস্ততঃ দৌড়িতেছিল—উদ্দেশ্য র‍্যাফ্‌ট অবলম্বন করিবে। আমার বন্ধুরা ব্যাপার কি কেহ বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই। তাহারা ভাবিল, জার্ম্মাণ মস্তিষ্ক উদ্ভট নূতন বিপদের সৃষ্টি করিয়া আমাদিগকে বিব্রত করিতেছে। পূর্ব্বে এরূপ অবস্থায় পড়ায় ব্যাপার কি হইয়াছে বুঝিতে বিলম্ব হইল না; বিপদ কতখানি,তাহাও বুঝিলাম। দুই এক সেকেণ্ড পরে কিছু ফাটার বিকট শব্দ শোনা গেল; সহসা জাহাজের চোঙ্গ দিয়া অনর্গল ধূম নির্গত হইতে লাগিল। ইহা 'বয়লার' ফাটার শব্দ নয় উপলব্ধি করিয়া 'প্রভু, তুমি ধন্য' এ কথা বলিলাম; কারণ, তাহা যদি হইত, তাহা হইলে জাহাজ চূর্ণ হইয়া অতল জলে মিশাইয়া যাইত; পরন্তু যে সব বিস্ফোরক ছিল, তাহা অধিকতর মারাত্মক বিপদ ঘটাইত। এরূপ বিপদ ঘটিলেও ঘটিতে পারে, এ কথা স্মরণ থাকায়, কি হইলে কি করিতে হইবে, তাহা মনে মনে পূর্ব্বেই ঠিক করা হইল। যেমন দেখা যেমন শোনা, তদনুযায়ী বিচার করিয়া কাজ করা, এ অতি সোজা কথা; শুধু এইটুকু সতর্ক থাকা যে, নির্ব্বোধের মত অযথা যেন মারা না পড়ি। বড় ভগবৎ-করুণা—safety valve আটকাইয়া যন্ত্রের খানিকটা উড়িয়া যায়; 'বয়লার' অক্ষত ছিল। এই হেতু দুরূহ বিপদ সহজেই কাটিয়া গেল। প্রচুর বিস্ফোরক ছিল; তাহারও কোনও ক্ষতি হয় নাই। তখন উল্লসিতমনে অফিসারেরা আসিয়া করমর্দ্দন করিলেন। আসল ব্যাপার বিশেষ কিছু নয়, তা জানিবামাত্র convoy জাহাজ দুইটী ডেসট্রয়ার লইয়া চলিয়া গেল—আমাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য একটী রাখিল। চোরাবোট সে দিন কোনও গতিকে আমাদের লক্ষ্য করিলে সাত পীরের নাম আমাদিগকে সমুদ্রকবল হইতে রক্ষা করিতে পারিত না। আমরা যে শুধু টর্পেডোড্‌ হইতাম, তা নয়; 'মেসিনগানে'র গুলিতে বিদ্ধ হইয়া ছটফট্‌ করিয়া মরিতে হইত। কিন্তু কোনও অজানিত তৃতীয় হস্ত আমাদিগকে রক্ষা করিতেছিল—সে দিন আমাদের মরিবার দিন নয়। বার ঘণ্টা অপেক্ষার পর একটী ইংরাজ ডেসট্রয়ার আসিল; প্রহরীর সংখ্যা প্রথমে দ্বিগুণ, পরে ত্রিগুণ করা হইল। সন্ধ্যার সময় সহস্র চক্ষু দূর তরঙ্গ অনিমেষদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল, যদি কিছু দেখা যায়।

রাত্রি তিনটা; একটী ছোট ক্রুইজার উপস্থিত—আমাদের পথ দেখাইতে

দেখাইতে চলিল; জাহাজ অচল—টানিয়া লইতে হইল। সন্ধ্যা হয় হয়; আলেকজান্দ্রিয়ের তীরভূমি দৃষ্ট হইল; ক্রমে জাহাজ বিপুল বন্দরে প্রবেশ করিল। সেখানে দুই দিন থাকিতে হয়। জাহাজ বন্দরে ঢুকিলে সেই দিনই রজ্জু দিয়া জলে নামি,-এবং সন্তরণ দিয়া কূলে উঠি। শক্ত মাটীর উপর নিরাপদ পদক্ষেপ করিতে কি আনন্দ, স্বর্গসুখেরও তখন বোধ হয় ইহার সহিত তুলনা হইত না। দুই ঘন্টা পূর্ব্বে বলা যাইত না, কূলে উঠিতে পারিব কি না।—এ কথা ভাবিতেও সর্ব্বশরীর পুলকে চঞ্চল হইয়া উঠিল। রেলে চড়িয়া পর দিন পোর্টসেডে উপস্থিত। সেখান হইতে Paul le ghat জাহাজে স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলাম। ভারত সাগর শান্ত সমাহিত। এখানে বিপদ নাই, এবং বিপদের তেমন আশঙ্কাও নাই; দেশে ফিরিলাম—জলধি-সংপৃক্ত ভারতভূমি সাদরে আমায় ক্রোড়ে স্থান দিল; শুধু মাটী পর্ব্বত লইয়া দেশ নয়; সে জন্য মাতৃভূমির স্নেহকরস্পর্শ এত মধুর লাগিল। সে করস্পর্শ দৃঢ়মুষ্টিতে ধারণ করিতে আমিও হস্ত প্রসারণ করিয়া দিলাম; ভগবান, এ হস্ত যেন কখন ফিরাইতে না হয়, ভারতের আত্মার কত বড় ক্ষুধা, তা কি জানি না—সে ক্ষুধা আমারও ত।

উপসংহার।

যুদ্ধক্ষেত্র হইতে ফিরিয়াছি—যুদ্ধও শেষ হইয়াছে। কত ঘটনা—কত কথা, কত রকমে জীবনের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া আজ আমাকে এখানে আনিয়া ফেলিয়াছে। পিছনে চাহিলে মনে হয়—ওই দূরে ছোট ছোট ধুম্রাকৃতি পর্ব্বতমালা; শ্যামল বন প্রান্তর—দুর্গ পরিখারেখা—দেখিতে কত স্পষ্ট; সুরক্ষিত দুর্ভেদ্য ব্যূহ—জীবন-মৃত্যুর সন্ধি-পথ ওই আমাদের সীমান্তরাল, ওই কৃষ্ণ রক্তনিশান লক্ লক্ উড্ডীন—কার সগর্ব্ব পদস্পর্শে শ্যামল প্রান্তর ছিন্ন ভিন্ন—বন উপবন রক্তরঞ্জিত—গ্রাম পল্লী কলঙ্কিত; আমাদের কুটীর ধূলাশায়ী; তবু আমাদিগকে লজ্জা দিয়া কার সহস্র কণ্ঠের বজ্র-রব আকাশ মুখরিত করিয়া তুলিতেছে? বিজয়ী হইয়াও জয়-ভেরীর অপূর্ব্ব নিনাদ কর্ণপটহে প্রতিধ্বনিত হইতেছে না কেন? ঘুরিয়া ফিরিয়া মনে পড়িতেছে, ১৯১৮ খৃঃ জার্ম্মাণীর রুদ্র অভিযান;—আমরা আক্রান্ত, প্রতিহত, এবং পরাজিত; শত্রুর নিপীড়নে আমাদের কণ্ঠ-দেশ রুদ্ধ—সমগ্র রক্তস্রোতও যেন স্তব্ধ—ফ্রান্সের সকল সন্তান এক হইয়াও এ অমিত বেগ প্রতিরোধ করিতে অক্ষম। এক পদ এক পদ করিয়া পিছু হটিতেছি। আর কতদূর হটিব—এ যে প্যারিস, সৌন্দর্য্যবিলাসিনী, আজ আর

তোমায় রক্ষা করিব না; তোমায় রাখিতে গেলে ফ্রান্সের আত্মা,—ফ্রান্সের লক্ষ সন্তান রক্ষা পায় না। তোমায় রাখিতে গেলেই তোমায় রাখিতে পারিব, তারও কোনও সম্ভাবনা নাই; তুমি পৃথিবীতে অদ্বিতীয়—মানবের সুখতৃপ্তির নন্দনকানন, তাও জানি; কিন্তু আজ তোমারই উপর তাণ্ডব-নৃত্যের আয়োজন করিতেছি। ফ্রান্সকে বাঁচাইতে গেলে তিন রকমের পরিখা কাটিয়া যুদ্ধ করা যাইতে পারে। প্রথম স্তরের সীমান্তরাল নির্ম্মিত হইবে প্যারিসকে সম্মুখে রাখিয়া; ভূগর্ভ হইতে আকাশের শেষ উচ্চতা পর্য্যন্ত আমাদের রক্ত, মাংস, অস্থি, লৌহ, প্রস্তর দিয়া অনন্ত-বিস্তৃত—অনন্ত-দীর্ঘ এক মহাপ্রাচীর—এক মহা বর্ম্ম নির্ম্মাণ করিব। সেই সীমান্তে রক্তের নদী বহিবে—নরমুণ্ডের পর্ব্বত হইবে—কঙ্কালের অরণ্য মাংসের স্তূপ মাথা নাড়া দিয়া উঠিবে। তাহার পশ্চাতে দ্বিতীয় স্তরের পরিখা সেখানে আমি মুক্ত-কৃপাণ-হস্তে থাকিব—এই অরক্ষিত সীমান্তে প্রাণ দিতে—মহাজড়কে সচল করিতে বিদ্যুৎবেগে শত্রুব্যূহে ঝাঁপাইতে —তাহাদের মর্দ্দিত করিতে, দলিত করিতে—তাহাদের বিতাড়িত করিতে। যদি এ মহা ব্যূহও ভেদ হইয়া যায়—যদি এ মহা বর্ম্ম ছিন্ন হয়, তবে জানিব, ফ্রান্সের আর উপায় নাই। জানি না, বিধাতার মনে কি আছে, কিন্তু তখনও আমি মরিব না। আমি তখন লুকাইব সকলের অন্তরের অন্তরতলে—জীবনের নিভৃত কন্দরে। সেইখানে আমার তৃতীয় স্তরের পরিখা খনন করিব—নূতন গিরি, নূতন দুর্গ, নূতন প্রান্তর, নূতন অস্ত্র প্রস্তুত করিয়া এক মহাযুদ্ধ বাধাইয়া দিব। কঠোর তপস্যা করিব অন্তর হইতে বাহিরকে উদ্ধার করিতে—সে পরিখা হইতে কোন শত্রু আমায় বিতাড়িত করিবে? আর সময় আসিলে উল্লম্ফনে ঝঞ্ঝার মত, অগ্ন্যুদ্গমের মত সকলের সামনে বাহির হইব, আমার স্বরূপকে পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠিত করিব; নব প্রেরণায় মানবাত্মার বিজয়গীতি পৃথিবীতে ঘোষিত হইবে, তখন ফ্রান্সের সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা সত্য-রূপ লইয়া মানুষের নিকট মূর্ত্ত হইবে।

এই যে যুদ্ধ শেষ হইয়াছে—ইহা বাহিরের যুদ্ধ; একটা পৃথিবীকে যেন ধ্বংস করিয়া গেল। এই স্থূল যুদ্ধ রক্ত-মাংসের সহিত রক্ত-মাংসের—তাই গোলাগুলি ফাটিল, মেসিনগান ছুটিল। কিন্তু যে নূতন যুদ্ধ আরম্ভ হইল, তাহা হইবে মানস জগতে; এই যুদ্ধ করিতে মানুষ বুঝিবে তৃতীয় স্তরের পরিখাটা কি। কামান বোমা এখানে বড় কিছু করিতে পারিবে না—মানুষ Organisation করিবে, এবং আত্মা কি, তাহা না বুঝিলেও, তাহার আভাস পাইবে; এই

আশঙ্কা, এই প্রচেষ্টা—বস্তুসর্ব্বস্ব Economical সভ্যতার মূলে আঘাত করিবে, চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই এই কথা স্বতঃ মনে আসিবে—যুদ্ধের ঝিনি-ঝিনির ভিতর দিয়া কোন্ শক্তি আত্মপ্রকাশ করিতে চাহিতেছে? এবং আমরাই বা কোন্ শক্তির অঙ্গুলিসঙ্কেতে পরিচালিত হইব? হিরণ্ময়-দ্যুতি-বিভাসিত রত্ন-সিংহাসনে কোন্ দেবতার অভিষেক করিব?

শুধু মতবাদের যুদ্ধের কোনও মূল্য নাই—যদি তাহা আমাদের অন্তরের সত্য-ধারা পরিস্ফুট করিবার যত্ন না পায়। আমাদের মত—আমাদের বাসনা তাহার পিছনে যদি কিছু না থাকে, তবে মনুষ্যজীবন অর্থহীন ঘটনাস্তূপে পরিণত হইবে, এবং বাহিরের যাহা কিছু, তাহা আপনার মুহূর্ত্তের কার্য্য শেষ করিয়া নিশ্চিহ্ন হইবে। আজিকার যুগসন্ধিক্ষণে ইউরোপের একান্ত স্থূল সভ্যতার মৃত্যুডঙ্কা বাজিয়াছে—মানবের আত্মা সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া শ্মশানকাষ্ঠে তাহার সৎকার দেখিতেছে—এবং দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া হৃদয়ের রুদ্ধ বেদনার উপশম করিতেছে। সত্যযুগের নবপ্রভাতে সামঞ্জস্যের মঙ্গল-রাগিণী ধ্বনিত হইবে। বাহিরের যে উপায় অবলম্বন করিব, তাহার উপর তত্খানি নির্ভর করিয়া অন্তরের সত্য-ধারাটী যদি না ধরি, তাহা হইলে সবখানি পণ্ড হইতে পারে।

চতুর্দ্দিকে ধ্বংসস্তূপের উপর রুদ্রের উল্লাস-নৃত্যের পদচিহ্ন লক্ষিত হয়। ইহার ফলে অনেক মিথ্যা ধরা পড়িয়াছে, এবং মানুষের প্রাণে উন্নত-জীবন-লাভের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে; মুক্তি এবং ঐক্যের প্রতিষ্ঠা করিবার বলবতী ইচ্ছা হইয়াছে। কিন্তু ইহার ভবিষ্যৎ তিনটীর উপর নির্ভর করিতেছে—প্রথমতঃ, মুক্তি এবং ঐক্য স্পষ্ট করিয়া বুঝিব; দ্বিতীয়তঃ, জীবনে অকপটভাবে ইহার প্রতিষ্ঠা করিব; তৃতীয়তঃ, অন্তরের অন্তরদেশে ইহা উপলব্ধি করিব। ভবিষ্যতের সমস্ত নির্ম্মাণ এই আত্মোপলব্ধির তারতম্যের উপর নির্ভর করিবে। বাহিরের দিক দিয়া মানব জাতির যে ঐক্য-প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা, তাহা কোনও দিন সফল হইতে পারে না, পরস্পরের অন্তরের মধ্যে মিলনের রাগিণী যদি না খুঁজিয়া পাওয়া যায়। নিজের সুবিধার উপর ষোল আনা লোলুপ দৃষ্টি রাখিয়া শুধু বাহিরের শাসনতন্ত্র নির্ম্মাণ করিলে তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল হইবে বিপ্লব এবং এনার্কি। বাহিরের নিয়ম কানুনই বল, আর শাসনতন্ত্রই বল, তাহা কোনও দিন মানুষকে সংসারমুক্ত করিয়া পূর্ণ জীবন দিবে না—আমরা পরিপূর্ণতার মধ্যেও রুদ্ধ বেদনা চাই না; তাই ভবিষ্যৎকে শান্তিপ্রদ এবং নিরাপদ করিতে হইলে মানুষকে অন্তর হইতেই অন্তরতম পুরুষকে উপলব্ধি করিতে হইবে, এবং অন্তরের দৈব ঐশ্বর্য্য দিয়া বাহিরের সম্পদ গড়িয়া তুলিতে হইবে।

সমাপ্ত।

শ্রীহারাধন বক্সী।

দ্বিতীয় পক্ষ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

'হাঁ রে ভব!'

'কেন গা ছোড় দি?'

'আজ কাল কি সে সব কথা ভুলে গেছিস?'

'কি সব?'

'সেই সব গান—যাত্রার বক্তিমে।'

ভব হাসিয়া বলিল, 'সে সব এখনও তোমার মনে আছে ছোড় দি?'

ছোট বৌ বলিল, 'মনে নাই? তুই বলিস কি রে, তোর বক্তিমে শুনে ছ' জায়ে যে হেসে গড়াগড়ি দিয়েছি।'

গম্ভীরমুখে ভব বলিল, 'এখন কিন্তু তোমাকে একা হাসতে হবে, তা জান?'

ছোট বৌ একটা নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিল, 'সেই তরেই বুঝি আজ কাল চুপ ক'রে আছিস?'

'কতকটা তাই বটে' বলিয়া ভব মুখ টিপিয়া একটু হাসিল। ছোট বৌ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ম্লানহাস্যসহকারে বলিল, 'তা হোক, তুই একবার বক্তিমে কর্, নতুন বোয়ের শুন্‌তে সাধ গিয়েছে!'

ঈষৎ হাসিয়া ভব বলিল, 'সত্যি নাকি?'

ছোট বৌ বলিল, 'আমি কি মিছে বলছি রে? আমার কাছে শুনে ওর বড্ড শুনতে ইচ্ছে হ'য়েছে।'

বলিয়া সে অদূরে দণ্ডায়মানা মাতঙ্গিনীর দিকে সহাস্যে কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল। ভব বলিল, 'আচ্ছা, সন্ধ্যার পর শোনাব।'

ছোট বৌ বলিল, 'সন্ধ্যার পর কেন, এখনই একটু বল্ না।'

ভব মৃদু হাসিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং কাশিয়া গলা পরিষ্কার করিয়া লইয়া ঈষৎ নাকি সুরে বলিতে আরম্ভ করিল,—'সখি রে, প্রাণকান্তের অদর্শনে পঞ্চশর পঞ্চশরের আঘাতে আমার হৃদয়-কমলকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিতেছে, দুরন্ত বসন্তে বিরহের অনলে আমার তাপিত প্রাণ দাবানলে দগ্ধ হচ্ছে—'

ছোট বৌ হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল, এবং মাতঙ্গিনীকে একটা ঠেলা দিয়া বলিল, 'শুনছিস নতুন বৌ?'

মাতঙ্গিনী হাসিল না, কোনও কথাও বলিল না। ভব তাহার দিকে উৎফুল্ল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া উৎসাহসহকারে বলিতে লাগিল—'ঐ দেখ সখি, সুবিমল শশধরের বিমল কিরণে আমোদিনী কুমুদিনী প্রফুল্লবদনে কুমুদিনীকান্তের সহিত প্রেমালাপে নিমগ্ন হ'য়েছে, আর আমার হৃদয়নলিনী প্রাণনাথ-রূপ দিননাথের বিরহে বিমলিনী হ'য়ে—'

'ও কি, চলে যাস্ যে নতুন বৌ?'

মাতঙ্গিনী নিরুত্তরে ভবতারণের দিকে একটা সকোপ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া দ্রুতপদে সে স্থান ত্যাগ করিল। ছোট বৌ অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ভবতারণ অর্দ্ধসমাপ্ত বক্তৃতা শেষ না করিয়াই স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া পড়িল। ছোট বৌ একটু লজ্জিতভাবে বলিল, 'ওর রকমই ঐ। কখন্ যে কি মেজাজে থাকে, বলা যায় না।'

ম্লান হাসি হাসিয়া ভব বলিল, 'সে কথা ঠিক ছোড় দি।'

ছোট বৌ বলিল, 'তা যাক্, তুই আমাকে শোনা।'

'এখন থাক্' বলিয়া ভবতারণ কোঁচাটা ঝাড়িতে ঝাড়িতে সেখান হইতে চলিয়া আসিল। মাতঙ্গিনীর উপেক্ষাটা তাহাকে এমনই লজ্জার কশাঘাত করিয়াছিল যে, সে আর ছোট বোয়ের সম্মুখে পর্য্যন্ত থাকিতে পারিল না। কেবল ভবতারণ নহে, ছোট বৌ পর্য্যন্ত যেন অনেকটা লজ্জা অনুভব করিয়াছিল। যাহাকে শোনাইবার জন্য সে এতটা আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিল, সে যে এমন আকস্মিকভাবে চলিয়া গিয়া তাহার মাত্রাটাকে নিষ্ফল করিয়া দিল। ইহাতে মাতঙ্গিনীর উপর তাহার কতকটা রাগও যে না হইল, এমন নহে। সে স্থির করিল, এমন অবাধ্য একগুঁয়ে মেয়েটার সঙ্গে আর কথা পর্য্যন্ত কহিবে না।

মাতঙ্গিনীরও যে রাগ হয় নাই, তাহা নহে। সে ছোট বৌ ও ভব দুই জনের উপরেই খুব রাগিয়া উঠিয়াছিল। সে না হয় ভবর গান বা বক্তৃতা শুনিবার জন্য দিদির কাছে আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিল, কিন্তু ভবর কাছে সেই কথাটা প্রকাশ করা দিদির কি উচিত হইয়াছে? আর, সে শুনিতে চাহিয়াছে বলিয়াই ভব যে বিনা বাক্যব্যয়ে তাহার আগ্রহপূরণে উদ্যত হইবে, ইহাই বা কেমন কথা! সে যদি আকাশের চাঁদ ধরিতে চায়? চাহিলেই কি তাহার জন্য চাঁদ ধরিতে হইবে? কেন, সে কে? তাহাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য উহার এত আগ্রহ কেন? ভবতারণের এই অস্বাভাবিক আগ্রহটা মাতঙ্গিনীর যেন নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়াই মনে হইল। ইহার উপর সে যখন দেখিল যে, তাহার প্রসন্নতা-

টুকু লক্ষ্য করিবার জন্যই ভব উৎসুক হইয়া উঠিয়াছে, তখন সে আর সেখানে দাঁড়াইতে পারিল না। যেন নিতান্ত বিরক্তির সহিত সে স্থান ত্যাগ করিল।

ঘরে আসিয়া মাতঙ্গিনী দেখিল, বিশ্বনাথ দিবানিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া হুঁকা কলিকা লইয়া বসিয়াছেন। মাতঙ্গিনী তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া যাইতে উদ্যত হইলে বিশ্বনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এতক্ষণ কোথায় ছিলে নতুন বৌ?'

ঝঙ্কার দিয়া মাতঙ্গিনী উত্তর করিল, 'চুলোয়।'

বিশ্বনাথ মুখের কাছ হইতে হুঁকাটা সরাইয়া হাঁ করিয়া স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিলেন। তীব্রকণ্ঠে মাতঙ্গিনী বলিল, 'কোথায় ছিলে, কেন গিয়েছিলে, কি কচ্চো, দিন রাত এত কৈফিয়ৎ দিতে আমি পারবো না।'

মৃদু হাসিয়া বিশ্বনাথ বলিলেন, 'তুমি বড্ড রেগেছ নতুন বৌ, না?'

রাগে মুখ ঘুরাইয়া মাতঙ্গিনী বলিল, 'হাঁ, রেগেছি! রেগে তোমার কি কচ্চি বল তো?'

সহাস্যে বিশ্বনাথ বলিলেন, 'বুড়ো বামুনের উপর গায়ের ঝাল ঝাড়চো।'

মাতঙ্গিনী দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া স্বামীর মুখের উপর কঠোর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। বিশ্বনাথ নিঃশব্দে তামাক টানিতে লাগিলেন। মাতঙ্গিনী কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থানোদ্যত হইল। বিশ্বনাথ বলিলেন, 'পান একটা দিতে পার?'

'পারি' বলিয়া মাতঙ্গিনী দ্রুতপদে ঘরের ভিতর চলিয়া গেল। বিশ্বনাথ ঈষৎ-উচ্চ-কণ্ঠে বলিলেন, 'চুণ খয়ের বেশ সমান দিয়ে পান সাজবে। ভাত খাবার পর যে পানটা দিয়েছিলে—'

একটু জোর গলায় মাতঙ্গিনী জিজ্ঞাসা করিল, 'সেটা কি খারাপ হ'য়েছিল?'

বিশ্বনাথ উত্তর করিলেন, 'খুব ভাল হয় নি। চুণ একটু বেশী হ'য়েছিল। গালটা পুড়ে গিয়েছে।'

মাতঙ্গিনী রাগে পানের বাটার ঝন্ ঝন্ শব্দ করিতে করিতে পান সাজিতে লাগিল, এবং একটা পান সাজিয়া আনিয়া স্বামীর সম্মুখে ধরিল। বিশ্বনাথ পান লইবার জন্য হাত বাড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'বেশী চুণ হয় নি তো?'

কঠোরস্বরে মাতঙ্গিনী বলিল, 'আমি খেয়ে দেখি নি।'

বিশ্বনাথ বলিলেন, 'সে কিন্তু চমৎকার পান সাজতো। সেও তো খেয়ে দেখতো না, অথচ—'

মাতঙ্গিনীর রোষস্ফীত মুখের দিকে চাহিয়াই বিশ্বনাথ থামিয়া গেলেন। মাতঙ্গিনী পানটা উঠানে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া জোরে জোরে পা ফেলিতে ফেলিতে ঘরের ভিতর ঢুকিয়া পড়িল। নিজের উক্তিতে নিজে লজ্জা অনুভব করিয়া বিশ্বনাথ স্তব্ধভাবে হুঁকা হাতে বসিয়া রহিলেন।

এমন সময় শ্রীপতি ডাকিল, 'দাদা!'

বিশ্বনাথ মুখের কাছে হুঁকা ধরিয়া ফিরিয়া চাহিলেন।

শ্রীপতি বলিল, 'নীলু ঘোষের সঙ্গে একটা বন্দোবস্ত করলে হয় না, দাদা?'

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বিশ্বনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কিসের বন্দোবস্ত?'

'দেনার।'

'দেনা আছে, সুদ আসল দিতে হবে; না দিতে পারি, জমী জায়গা বেচে আদায় করবে। তার আবার বন্দোবস্তটা কি শুনি?'

'জমী জায়গা বেচে নেবে, সেটা কি দেখতে শুনতে ভাল?'

'দেখতে শুনতে ভাল কোন্‌টা?'

'নালিস দরবার হ'লে লোক-হাসাহাসি হবে। তার চাইতে একটা রফা-নিষ্পত্তি করলে ভাল হয় না?'

'খুব ভাল হয়। কিন্তু রফা-নিষ্পত্তিটা কি রকমে হবে? নীলু কি পাওনা ছেড়ে দেবে?'

'পাওনা কি কেউ কখনও ছাড়ে? তবে—'

'তবে আমি সুদ আসল সব ফেলে দিলেই মিটে যায়, এই তো?'

জ্যেষ্ঠের বিরক্তিপূর্ণ উক্তিতে শ্রীপতি মনে মনে বিরক্ত হইলেও বাহিরে তাহা প্রকাশ না করিয়া বেশ নম্রভাবেই বলিল, 'তা হ'লে তো সকল গোল চুকে যায় দাদা, কিন্তু সে উপায় তো নাই। কাজেই কতক টাকা দিয়ে একটা কিস্তীবন্দী করলে মন্দ হয় না।'

গম্ভীরভাবে বিশ্বনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কতক টাকাটা কত, তাই খুলে বল।'

শ্রীপতি বলিল, 'অন্ততঃ এক শো।'

বিশ্বনাথ বলিলেন, 'এক শো টাকা আমি পাব কোথায়?'

এ প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারিয়া শ্রীপতি চুপ করিয়া রহিল। রুক্ষস্বরে বিশ্বনাথ বলিলেন, 'তুমি বুঝি মনে কর, টাকা পুঁজি করে রেখে আমি দেনা দিচ্ছি না?'

শ্রীপতি এবার একটু রাগতভাবে বলিল, 'এমন মনে ক'রবার আমার কোনও দরকার নাই, দাদা।'

মুখ বিকৃত করিয়া বিশ্বনাথ বলিলেন, 'তবে দাদাকে শুধু উপদেশ দিয়ে বাহাদুরী নিতে এসেছ বুঝি?'

শ্রীপতি বলিল, 'আমি ভাল কথাই বলতে এসেছি, দাদা। তোমার নামে নালিশ হ'লে তাতে আমার মাথা উঁচু হবে না।'

বিশ্বনাথ বলিলেন, 'নীচুও হবে না। কেন না 'ভিন্ন ভাতে বাপ পড়সী।'

'তা হ'লে আমার অন্যায় হয়েছে দাদা।' বলিয়া শ্রীপতি উঠিয়া গেল। বিশ্বনাথ তাহার দিকে বক্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া হাতের হুঁকায় জোরে একটা টান দিলেন। কিন্তু কলিকার আগুন ও তামাক উভয়ই তখন নিঃশেষ হইয়াছিল, সুতরাং ধুম বাহির না হওয়ায় বিশ্বনাথ বিরক্তভাবে হুঁকাটা রাখিয়া উঠিয়া পড়িলেন, এবং গামছা কাঁধে ফেলিয়া বাহির হইবার উদ্যোগ করিলেন।

হঠাৎ মাতঙ্গিনী ঝড়ের মত সম্মুখে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'এখন আবার কোথায় যাচ্ছো?'

বিশ্বনাথ উত্তর করিলেন, 'বাইরে থেকে একটু ঘুরে আসি।'

'বাইরে গিয়ে কি হবে?'

'এখানে বসেই বা হবে কি?'

'ঠাকুরপোর সঙ্গে এতক্ষণ ঝগড়া করলে, আমার সঙ্গে খানিকটা ঝগড়া করবে না?'

বিশ্বনাথ হাসিয়া উঠিলেন; হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'ঠাকুরপোর সঙ্গে ঝগড়া করেছি বলে তোমার সঙ্গে ঝগড়া করতে পারি? তুমি হলে বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা।'

তীব্রকণ্ঠে মাতঙ্গিনী বলিল, 'শুধু বুড়ো নও, তোমার ভীমরথী হ'য়েছে।'

বিশ্বনাথ নীরবে মৃদু হাস্য করিলেন। মাতঙ্গিনী বলিল, 'ঠাকুরপো তোমাকে মন্দ কথা বলছিল কি?'

বিশ্বনাথ বলিলেন, 'খুব ভাল কথাও নয়।'

মুখখানাকে গম্ভীর করিয়া মাতঙ্গিনী বলিল, 'তোমার পক্ষে ভাল কথা নয় বটে, কিন্তু বুড়ো বয়সে দেনা ক'রে বিয়ে করেছ, সে দেনা কি শোধ করতে হবে না?'

সহসা যেন তীব্র কশাঘাতে বিশ্বনাথের মুখের হাসি নিবিয়া গেল।

মাতঙ্গিনী বলিল, 'তুমি শোধ করতে না চাইলেও মহাজন তো ছেড়ে দেবে না; শেষে ঢোল বাজিয়ে ঘর ভিটে বেচে নেবে। তার চাইতে ঠাকুরপো যা বল্‌ছিল, সে রকম করলে ক্ষতি কি?'

ম্লানমুখে বিশ্বনাথ বলিলেন, 'ক্ষতি কিছু নাই, কিন্তু এক শো টাকা পাব কোথায়?'

মাত। ঘরের ঘটী বাটী বেচে যোগাড় কর।

বিশ্ব। ঘটী বাটী বেচলে পঁচিশটা টাকাও হবে না।

মাত। না হয়, আমার তো দু' একখানা গয়না আছে, তাই বেচে দেনা শোধ কর।

বিশ্ব। তার পর?

মাত। তার পর—পার আবার দেবে।

বিশ্ব। সে আর ঘটে উঠবে না নতুন বৌ।

মাত। না ঘটে, নাই ঘটবে। গয়নার তরে আমি তোমার কাছে কাঁদ্‌তে যাব না।

বিশ্ব। কিন্তু আমি—আমি বুড়ো বয়সে বিয়ে ক'রে তোমাকে পথে বসিয়ে যাব?

রোষতীব্রকণ্ঠে মাতঙ্গিনী বলিল, 'আর মহাজনে ঘর ভিটে বেচে নিলে আমাকে অট্টালিকায় বসাবে।'

বিশ্বনাথ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া মস্তক নত করিলেন।

মাতঙ্গিনী নাসা কুঞ্চিত করিয়া বলিল, 'গয়নাও তো ভারী! পেতলের মত দু'গাছা বালা, আর প্যাতপেতে তাবিজ। চুড়ী—আজ কাল কি আর রূপোর কদর আছে? আমার তো পরতেই লজ্জা করে।'

ম্লানমুখে মস্তক সঞ্চালন করিতে করিতে বিশ্বনাথ বলিলেন, 'তবু অসময়ের সংস্থান। তুমি বুঝছো না নতুন বৌ, কাল যদি আমি চোখ বুঝি—'

বাধা দিয়া মাতঙ্গিনী বলিল, 'আমিই যে কাল চোখ বুজবো না, এমন কোনও লেখাপড়া আছে?'

একটু ভাবিয়া বিশ্বনাথ বলিলেন, 'তুমি ছেলেমানুষ, তোমার সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। মোদ্দা, তোমার গয়না বেচে দেনা শোধ করতে পারবো না। লোকে কি বলবে?'

'গায়ে ধুলো দেবে!' বলিয়া মাতঙ্গিনী স্বামীর মুখের উপর তীব্র কটাক্ষ

নিক্ষেপ করিল। বিশ্বনাথ আর একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া ধীর-মন্থর-পদে বাহিরে চলিয়া গেলেন। মাতঙ্গিনী দাঁতে দাঁতে চাপিয়া খুঁটিটা জড়াইয়া ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ফটিক আসিয়া ডাকিল, 'জেথি মা!'

মাতঙ্গিনী একবার তাহার দিকে চাহিয়াই দৃষ্টি ফিরাইয়া লইল। ফটিক এক পা এক পা করিয়া তাহার সম্মুখে আসিয়া আবদারের সুরে বলিল, 'কি কাব জেথি মা?'

জেঠী মা কিন্তু তাহার আবদারে কর্ণপাত করিল না দেখিয়া ফটিক তাহার কাপড় চাপিয়া ধরিয়া কাঁদ কাঁদ মুখে বলিল, 'কি কাবো জেথি মা, কিদে পেয়েতে।'

বিরক্তি-সহকারে 'আচ্ছা' বলিয়া মাতঙ্গিনী তাহার হাত হইতে কাপড় ছাড়াইয়া লইল, এবং রান্নাঘরের দাবা হইতে কলসীটা তুলিয়া লইয়া দ্রুতপদে খিড়কীর দিকে চলিয়া গেল। জেঠীমার এই অস্বাভাবিক উপেক্ষায় ব্যথিত হইয়া ফটিক কাঁদিয়া উঠিলেও মাতঙ্গিনী ফিরিয়া চাহিল না।

ক্রমশঃ।

শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

গায়ক পাখী—দয়েল।

দয়েল গায়ক পাখীগণের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ পাখী। ইহারা চড়ুই অপেক্ষা একটু বড়। বেশ মোটাসোটা গোলগাল গড়ন।

দয়েলের দেহের সমগ্র উপরিভাগ মিশ কালো। বুকের নীচের উপরের তৃতীয়াংশ কালো। নিম্নাংশ ধবধবে শাদা। লেজেরও উপর দিক কালো, তাহার দুই পার্শ্ব ও নিম্ন দিক শাদা। এই শাদা কালোর সংমিশ্রণে দয়েলকে বড়ই সুন্দর দেখায়। দয়েল লম্বে ৮।৯ ইঞ্চির বেশী হয় না। ইহার প্রত্যেক অঙ্গ দৃঢ়। দয়েলের ডানা দুটী ৫।৬ ইঞ্চি লম্বা, মজবুত। ইহারা অনেকক্ষণ উড়িতে পারে। ডানার পালকগুলি কালো, এবং অতি সুন্দররূপে সাজান। উভয় ডানারই মধ্যস্থলে কয়েকটি শাদা পালক আছে। তাহাতে ঐ কালোর উপর প্রায় আধ ইঞ্চি স্থান শাদা দেখায়। গাঢ় কৃষ্ণবর্ণের দুই পাশে দুইটী আধ ইঞ্চি প্রস্থ শাদা রেখা থাকায় পাখীর সৌন্দর্য্য খুব

বাড়িয়াছে। পাখা বিস্তার করিয়া উড়িবার সময় শাদা স্থানটী প্রায় দেড় ইঞ্চি হয়। দয়েল অনেক সময় পুচ্ছ নাচায়, বিস্তৃত করে, এবং পরস্পরে যুদ্ধ করিবার সময় লেজ বিস্তৃত করিয়াই আক্রমণ করে। তখন লেজের উভয় দিকের শাদা পালকগুলি বড়ই সুন্দর দেখায়।

দয়েলের ঠোঁট আধ ইঞ্চি লম্বা, সরু ও তীক্ষ্ণ। ঠোঁটের প্রান্তদ্বয় সামান্য ধারাল। ঠোঁটের উপরে নাকের দুটী ছিদ্র। ঠোঁটের ভিতর দিক্‌টাও ঈষৎ কালো; কিন্তু জিহ্বা লাল। মুখের ভিতরটাও লালাভ। পাখীর জিভে একটু বিশেষত্ব দেখা যায়। জিভের অগ্রভাগ সূক্ষ্ম, এবং পশ্চাদ্দিক দুই দিকেই একটু বিস্তৃত। দয়েলের গলা বেঁটে রকমের। পালকশূন্য কণ্ঠনালীর বেড় আধ ইঞ্চির বেশী নহে। দয়েলের পা দুটীও মেটে কালো, সরু, কিন্তু মজবুত। তিনটী আঙ্গুল সম্মুখভাগে, এবং একটী পিছন দিকে। প্রত্যেক আঙ্গুলে চারিটী পর্ব্ব আছে। এই জন্য ইহারা ডালে বসিতে পারে। প্রত্যেক আঙ্গুলের মাথায় ধানের মত বড় নখ আছে। নখগুলি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, ঈষৎ বাঁকানো।

দয়েল অনুচ্চ স্থানে, ঝোপে, গাছের ফাটালে বা কোটরে, বাঁশের সঙ্গে,কিংবা হাঁড়ির ভিতরে, বা দালানের ফাটালে বাসা তৈয়ার করে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খড় কুটা, ঘাস পাতা ইত্যাদি দিয়া ইহারা বাসা প্রস্তুত করে। বাসার মধ্যস্থলটী গর্ত্তের মত করিয়া তৈয়ার করে। এইখানে ডিম পাড়ে। ডিম পাড়িবার সময় হইলেই ইহাদের বাসা তৈয়ারের দরকার পড়ে। নতুবা 'যেন তেন প্রকারেণ' দিন গুজরান করাই পাখীর অভ্যাস। ঘর গৃহস্থালী সবই সন্তানের জন্য,—নহিলে পাখীর মত অনেক 'বুড়া বুড়ীই' এক রকম করিয়া দিন কাটাইয়া দিতে পারিত।

বর্ষাকাল পাখীর নিরানন্দের সময়। 'আষাঢ়স্য প্রথমদিবসে' মেঘদর্শনে নরনারীর বিরহব্যথা মাথা তুলিতে পারে, কিন্তু পাখীর তখন বড় দুর্দ্দিন। এ সময় তাহারা বিরহ-বিচ্ছেদের ভাবনা ভাবে না। 'খেয়ে,দেয়ে জীয়ে থাকা'র মতন এ সময় পাখীরা বাদলের বারিধারা মাথায় বহন করে। প্রায় সকল গায়ক পাখীরই এ সময় 'ডাক পড়িয়া' যায়। অর্থাৎ, বর্ষাগমে ইহাদের গান বন্ধ হয়। প্রকৃতির ব্যবস্থা। আমি কিন্তু কোকিলের কুহুধ্বনি বার মাসই শুনিয়াছি। বর্ষাকালে কম—মাঝে মাঝে দুই একটী কোকিলের গান শোনা যায়। দয়েল তখন আদৌ গান করে না। দয়েল, ঘুঘু, ময়না, শ্যামা, অলিরাজ, ভৃঙ্গরাজ প্রভৃতির সঙ্গীতচর্চ্চা বর্ষার দুই মাস ও শরৎ কালেরও পুরা একটা মাস বন্ধ থাকে। শরতের শেষ অংশ হইতেই পাখীর আনন্দের

দিন আসে। (১) বর্ষায় ইহাদের পালক একটু বিশ্রী হইয়া যায়; শরৎ কালের শেষে ও হেমন্ত কালে পাখীমাত্রই 'পালক বদলায়'। পুরাতন জীর্ণ খোলস ফেলিয়া দিয়া ইহারা নূতন পালকে সজ্জিত হয়। এই সময় পাখীর বর্ণ খুব চকচকে হয়। পাখীর মধুর সঙ্গীতে বনভূমি আনন্দময় হইয়া উঠে। বর্ষায় পাখীর ডাক বন্ধ হয়;—এই সময়ে তাহাদের 'গলা খুলিয়া' যায়। এই সময় পুং-পক্ষিগণের চাকচিক্যই বেশী বৃদ্ধি পায়। তাহারা যথাসম্ভব যত্নপূর্ব্বক আপনাদের দেহের প্রসাধনক্রিয়া সম্পন্ন করে, এবং সময়ে অসময়ে সঙ্গীত জুড়িয়া দেয়। কেবল নারী ভুলাইবার জন্য এই সকল বন্দোবস্ত। স্ত্রী পক্ষী ইহাদের স্বর-লালিত্যে ও দৈহিক সৌন্দর্য্য দর্শনে আকৃষ্ট হয়। যে সকল পক্ষী আগে হইতেই 'যোড়া মিল' করিয়া বসবাস করিতেছে, তাহাদের বাসা বানাইবার ধুম পড়িয়া যায়। খড় কুটা, কোমল পালক, বিবিধ শুকনা পাতা দিয়া পাখীরা বাসা তৈয়ার করিতে আরম্ভ করে। ভবিষ্যতে এইখানেই তাহাদিগকে ডিম পাড়িতে হইবে, তাই উপযোগী বাসা বানাইতে আরম্ভ করে। এই প্রচেষ্টা বিধাতার কি আশ্চর্য্য প্রেরণা! অগ্রহায়ণ, পৌষ মাসে কাক, চিল, শালিক প্রভৃতি পাখী বাসা তৈয়ার করিতে আরম্ভ করে। দেশে প্রবাদ আছে,—কাক সর্ব্বাগ্রে বাসা বানায়। ইহা সত্য নহে। (২)

পাখীর উদরের নিম্নভাগে একটী তৈলকোষ আছে। এখানে পর্য্যাপ্ত-পরিমাণ তৈল আছে। পাখীর এই তৈলাধার অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। পাখী প্রয়োজন অনুসারে ঐ স্থানটী ঠোঁট দিয়া চাপিয়া তৈল বাহির করে, এবং সর্ব্বাঙ্গে মাখাইয়া পাখী আপন সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে। এই তৈলকোষটীও 'দীনবন্ধু দাদার ভাণ্ড'—কলুবাড়ী ফরমাইস না দিয়াও ইহা সতত পূর্ণ থাকে। শীতের সময় তৈল বেশী না দিলে মানুষেরই চলে না—সুতরাং পাখীর কি করিয়া চলিবে? পাখীরা শীতের সময় বেশী করিয়া তেল মাখে, এবং স্নান করে। কখনও কখনও ধূলিতে গড়াগড়ি দিয়া ইহারা আনন্দ করে। এই 'ধূলট' সুধু আনন্দের জন্য নহে।

---

(১) অনেক দিন আগে আমার বিশ্বাস ছিল, শীতকালে পাখীরা শ্রীহীন হইয়া যায়, কিন্তু সে ধারণা পরে সংশোধন করিয়াছি। প্রয়োজনবোধে এ কথা এই স্থলে উল্লেখ করিলাম।

(২) 'বিহঙ্গমের কথা' প্রবন্ধে এ সকল বিষয়ের আলোচনা করিব।

পাখীরা এই ধূলটে গায়ে সাবান মাখার কাজ সারিয়া লয়। গায়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উকুন হইলে ধূলটের বেশী দরকার হয়। তা ছাড়াও ধূলা মাটীতে সর্ব্বাঙ্গ ভূষিত করিয়া পাখী নির্ম্মল জলে অনেকক্ষণ স্নান করে। ইহাতে শরীরের ময়লা কাটিয়া যায়।

স্ত্রী-দয়েল অগ্রহায়ণ হইতে ফাল্গুন, এমন কি, চৈত্র মাসেও গর্ভধারণ করিয়া থাকে। ইহারা আড়াই মাস তিন মাস গর্ভ ধারণ করে। একেবারে দুইটী হইতে চারিটী (পাঁচটীও কদাচিৎ) ডিম পাড়ে। ডিমগুলি নীলবর্ণ। দেশী কুলের চাইতে বড় নহে। গড়ন হাঁসের ডিমের মত। এক দিক একটু লম্বা, এবং সরু। ডিমের চোকলার ভিতর দিক নীলাভ শাদা। পাখী ১০।১৫ দিন ডিমে তা দিলে পর উদরসর্ব্বস্ব ছানা বাহির হয়। তা দেওয়ার কষ্ট অধিকাংশ সময় পক্ষিণীই সহ্য করে। স্বামী তখন তাহার আহার যোগাইতে যত্নের ক্রটী করে না, এবং নিকটে থাকিয়া পাহারা দিয়া থাকে। ছানা হইলে স্বামী স্ত্রী ছানাগুলির আহার সংগ্রহ করে। পোকা, ফড়িং প্রভৃতিই ইহাদের খাদ্য।

প্রথম প্রথম ছানাগুলির গায়ে হলুদ বর্ণ অতি কোমল ও ক্ষুদ্র পালক থাকে। সেগুলি মূল্যবান ধুনিত তুলার চেয়েও হালকা। ক্রমে দিন যায়, এবং পালকের বর্ণ পরিবর্ত্তিত হয়। হলদে রঙ্গের ঠোঁটগুলি ক্রমে ছাইএর মত রঙ্গ হয়। অবশেষে স্বাভাবিক বর্ণে পরিণত হইয়া যায়। শৈশবে পাখীর ডানা দু'টি ক্ষুদ্র ও পালকশূন্য থাকে। ক্রমে কোমল লোম, এবং ক্রমশঃ পালক জন্মে। ৮।৯ দিন পর্য্যন্ত চক্ষু ফোটে না। চক্ষুর উপর শাদা একখানি পাতলা পর্দ্দা থাকে। মাতা পিতা আহার্য্য লইয়া আসিবামাত্র ছানাগুলি ব্রহ্মাণ্ডগ্রাসী হাঁ করিয়া চিঁ চিঁ করিয়া ক্ষুধার পরিমাণ জানায়। আশ্চর্য্যের বিষয়, মাতা পিতা এক একবার সংগৃহীত খাদ্য পর্য্যায়ক্রমে এক একটি সন্তানকে দিয়া তাহাদিগকে শান্ত করিবার চেষ্টা করে।

প্রায় এক মাস বয়সে দয়েল ডানায় বল পায়, এবং বাসা হইতে মুখ বাড়াইয়া খাবার লয়। এ সময় কখনও কখনও পাখী বাসা হইতে পড়িয়া যায়। তখন পিতা মাতার দুঃখের সীমা থাকে না। দয়েল-মিথুন ভূপতিত শাবকটিকে পুনরায় বাসায় উঠাইবার জন্য বহু চেষ্টা করে। উভয়েই কাতরস্বরে চীৎকার করে। কিন্তু অনেক সময়ই ছানাটি বাজ, চিল, কাক প্রভৃতির উদরসাৎ হয়।

পাখীর শত্রু অনেক। ডিম হইতে উড়িবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অপর পাখী,

সাপ, নেউল প্রভৃতির ভয় থাকে। সুযোগ পাইলেই ঐ সকল শত্রু গিয়া ছানাগুলি খাইয়া ফেলে। ছানাগুলি উড়িতে শিখিলে কয়েক দিন পর্য্যন্ত মাতা পিতা ইহাদিগকে একডাল দুই ডাল করিয়া একই গাছে বেড়াইতে শিখায়। তার পর ডানার বলবৃদ্ধি হইলে একটু একটু করিয়া দূরে যাইতে অভ্যাস করে। এ সময় যাহাতে কোনও শিকারী পাখীর দৃষ্টিতে না পড়ে,সে জন্য প্রচুর সতর্কতা অবলম্বন করে। কখনও কখনও দেখা যায়, বিষধর সর্প পাখীর বাসায় গিয়া ধাড়ী বাচ্ছা সবগুলি শেষ করিয়া আরও শিকারের আশায় বাসার ভিতর বসিয়া থাকে। এই কার্য্যে কেউটে ও গোখরোই বেশী ওস্তাদ। অনেক সময় পাখীর ছানা আনিতে গিয়া মানুষও সাপের কামড়ে প্রাণ হারায়। আমারই এক জ্ঞাতি ঠাকুরদাদা টিয়া পাখীর ছানা পাড়িতে গিয়া একটি ৫॥০ হাত লম্বা কেউটে সাপ গলায় ধরিয়া বাহির করিয়াছিলেন। ভগবানের কৃপায় কেউটে তাঁহার কিছু করিতে পারে নাই, তিনি নির্ভীকভাবে সেই মহাভুজঙ্গমের গলা টিপিয়া ধরিলেন। সাপ তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ বেষ্টন করিলেও তিনি তাহাকে ছাড়েন নাই। পরে অন্যের চেষ্টায় সাপের জীবলীলার শেষ হইয়াছিল।

শাবক উড়িতে সমর্থ হইলেই দয়েল নিশ্চিন্তচিত্তে আনন্দ করিবার অবসর পায়। তখন তাহার আয়েস করিবার প্রচুর সুযোগ ঘটে, আর মধুর সঙ্গীতে সকলকে মুগ্ধ করে। দয়েল সময় সময় এত সুন্দর গান করে যে, আত্মহারা হইয়া শুনিতে হয়। ইহারা অতি প্রত্যূষে জাগিয়াই গান আরম্ভ করিয়া দেয়। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ইহাদের গানের সময়। প্রথম রাত্রিতে দয়েলের গান শুনি নাই। শেষরাত্রে জ্যোৎস্না থাকিলে কখনও কখনও ইহারা গান করে। বিপন্ন না হইলে অন্ধকার রাত্রিতে কোনরূপ শব্দই করে না। ইহাদের সাধারণ আওয়াজ গলা ভাঙ্গা টেঁ চেঁ মাত্র।

দয়েল সহজে পোষ মানে,এবং তখন পূরা মাত্রায় জ্ঞাতি-হিংসক হয়। প্রতিপালক অপর দয়েল দেখিবামাত্রে খাঁচার দরজা খুলিয়া দেয়, আর পালিত দয়েল তীরবেগে গিয়া সেই জ্ঞাতির উপর অতর্কিতে পতিত হয়। তার পর লড়াই লাগিয়া যায়। পালিত দয়েল ধূর্ত্ত। সে দুই পায়ে জ্ঞাতির দুই পা ছাঁদিয়া ধরে, এবং উভয়ে একত্র ঢিপ করিয়া মাটীতে পড়িয়া যায়। তখন শিকারী ইহাদিগকে ধরিয়া ফেলে। দয়েলের মাংস নাকি খুব তৈলাক্ত। এ দেশের নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা এ সকল পাখী খায়। কাক ব্যতীত অনেক পাখীই জ্ঞাতিহিংসায় পটু।

শিকারীরা নিম্ন লিখিত উপায়ে দয়েল ধরিয়া থাকে।

(১) পালিত পাখী দিয়া শিকার।

(২) কাম্‌তি দিয়া শিকার।—৮।১০ ইঞ্চি লম্বা একখানি সরু বাঁশের কাঠী। তাহার এক দিক ত্রিধা বিভক্ত। তিন অংশেই কাঁঠালে আঠা মাখান থাকে। মধ্যের কাঠীতে একটি ফড়িং বা উই পোকা আটকাইয়া দেওয়া হয়। ঐ পোকা পাখা উড়াইয়া মুক্ত হইবার জন্য ধড়্‌ফড়্‌ করিতে থাকে। দয়েল, বুলবুল (১) প্রভৃতি ফড়িং খাইতে আইসে, এবং আঠায় পাখা জড়াইয়া ভূতলে পড়ে। কাম্‌তি দিয়া শিকারীরা ছোট পাখী বংশ ধ্বংস করিতেছে।

(৩) পাটশোলা দিয়া খাঁচা তৈয়ারী করিয়া তাহার এক দিকে এক ক্ষুদ্র দরজা রাখা হয়। ভিতরে একটা আরসুলা বা কোনও পোকা ঝুলাইয়া রাখা হয়। উহার সহিত এক খণ্ড বাখারী সংলগ্ন থাকে। বাখারীর মাথায় এক সুতার দরজা বাঁধা হয়। ভিতরের পোকায় পাখী ঠোকর দিবামাত্র বাখারী সোজা হইয়া দাঁড়ায়, সঙ্গে সঙ্গে দরজাটি বন্ধ হয়, পাখী আটক পড়ে।

উষাগমে ও অপরাহ্নেই দয়েলের সঙ্গীত সর্ব্বাপেক্ষা মিষ্ট বোধ হয়। দয়েল আমাদের বাড়ীর আশে পাশেও বাসা করে। গভীর জঙ্গলে ইহাদের যাতায়াত যেন কম বলিয়া মনে হয়। সম্ভবতঃ শিকারী পাখীর অত্যাচারই ইহার কারণ। দেশ ক্রমশঃ আবাদ হইতেছে; সঙ্গে সঙ্গে পাখীকুল নির্ম্মূল হইতেছে। ছেলেবেলায় আমরা যত অধিকসংখ্যক ও বিবিধ রকমের পাখী দেখিয়াছি, এখন তাহাদের সিকিও নাই। সুধু 'গায়ক' পাখী নয়, কাক, ফিঙ্গা, মাছরাঙ্গা, কাঠঠোকরা প্রভৃতি বহুজাতীয় পক্ষীর সংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে। (২) পাখী-রক্ষার কি কোনও উপায় হয় না?

শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

সংগ্রহ।

'সে কাল এ কাল'।

'সে কাল এ কাল'—শ্রীচন্দ্রশেখর কর প্রণীত। পদ্যে লিখিত ক্ষুদ্র পুস্তিকা। মূল্য চারি আনা। কিন্তু গ্রন্থখানি দেশ-কাল-পাত্রের হিসাবে অমূল্য।

---

(১) বুলবুল সম্বন্ধে 'প্রতিভা'য় লিখিয়াছি।

(২) 'বনের বাউল' প্রবন্ধে আমরা কতিপয় 'অসঙ্গীতজ্ঞ' পাখীর সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

'সে কাল এ কালে'র রচনা সুন্দর। রচনার উদ্দেশ্য আরও সুন্দর। যে সদ্ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া সহৃদয় কর মহাশয় সে কালের সহিত এ কালের তুলনা করিয়া সে কালের পবিত্র স্মৃতির উদ্বোধন করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর।

গ্রন্থের পরিচয় দিবার পূর্ব্বে গ্রন্থকারের ছবি মনে পড়িতেছে। চন্দ্রশেখর বাবু এ কালের লোক, কিন্তু সে কালের ছাঁচে ঢালা। চন্দ্রশেখর কর নামে 'বাবু', কিন্তু মনে সেকেলে 'পণ্ডিত'। চন্দ্রশেখর বাবু এ কালের শিক্ষায় শিক্ষিত, কিন্তু সে কালের দীক্ষায় দীক্ষিত। তিনি ধর্ম্মভীরু, দেবদ্বিজে ভক্তিপরায়ণ, 'সেকেলে' হিন্দু। চন্দ্রশেখর বাবু হাকিম ছিলেন, কিন্তু চিরজীবন ধর্ম্মের, নীতির, শাস্ত্রের, সংস্কারের ও বাঙ্গালীর সামাজিক বিন্যাসের 'হুকুম' মানিয়া আসিয়াছেন। সে কাল তাঁহাকে এ কালে জীবিত রাখিয়াছে। এ কালেও তাঁহার জীবনের, তাঁহার সাহিত্যের অবলম্বন—সে কালের সুখস্মৃতি। তিনি সে কালের ভাবে ভোর। এ কালে চন্দ্রশেখর করের—গ্রাজুয়েট্, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট চন্দ্রশেখর করের আবির্ভাব, এবং তাঁহার সে কালের ভাবে ভোরপূর সাহিত্যের অভ্যুদয় anomaly বলিয়াই মনে হয়। anomaly বটে, কিন্তু ঈশ্বরের দান, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

চন্দ্রশেখর বাবু সে কালের উকীল, নজীর, পৌরাণিক ও ব্যাখ্যাতা। এ সমাজে চন্দ্রশেখর বাবুর উপযোগিতাও আছে, আবশ্যকতাও আছে। আমাদের সৌভাগ্য, নবভাবপ্লাবিত বঙ্গে চন্দ্রশেখর বাবু স্রোতে ভাসিয়া যান নাই। বিলাসিনী বঙ্গভামিনীদিগের 'ড্রেসিং-টেবিলে' সজ্জিত এ কালের 'বিশুদ্ধ' টপ্পা-সাহিত্যের সঙ্গে রোজ-পমেড-পাউডারের পার্শ্বে চন্দ্রশেখরের 'অনাথ বালক' ঠাঁই পায় না বটে, কিন্তু আমাদের সমাজে তাহার স্থানাভাব হইয়াছে, এমন কথাও বলা যায় না। চন্দ্রশেখর বাবুর সাহিত্য বহুপ্রচারিত না হউক, তাহা বহুল-সমাদৃত বটে। তাহার বিস্তৃতি অল্প, কিন্তু প্রভাব গভীর। ইহাই স্বাভাবিক। খাসা মোণ্ডা বাতাসার মত বিকাইতে পারে না। তাহার কারণ সুস্পষ্ট। খাসা মোণ্ডার স্থান স্বতন্ত্র। মানুষ গুণের আদর করে, কিন্তু অনেক সময়ে 'চটকে'র আদর গুণের ভাগ্যে ঘটে না। ইহাতে গুণের লাঘব হয় না; গুণগ্রাহীর অল্পতাই সূচিত হয়। চন্দ্রশেখর বাবুর গ্রন্থাবলী—বাঙ্গালীর নিজস্ব রত্নমঞ্জুষা—বাঙ্গালা দেশে সেরূপ সার্ব্বজনীন সমাদর লাভ করে নাই, ইহাতে জাতির মানসিক দৈন্যই সূচিত হয়। ইহাও—এই ঔষধে বিতৃষ্ণা, এই পথ্যে বিরাগ, এই অমৃতে অরুচিও এ কালের লক্ষণ। এই জন্যই এ কালকে—নানাবিধ উন্নতির আশাপ্রদ আভাসের আভায় সমুজ্জ্বল এ কালকেও ভয় করিতে হয়। অন্ততঃ আমরা ভয় করি। বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য প্রভৃতির অভ্যুদয়েই জাতির উপচয়। বাঙ্গালা সেই অভ্যুদয়ের অরুণাভায় উদ্ভাসিত—আশার কথা বটে। কিন্তু এই অভ্যুদয়ের ভিত্তি কি?

যে মনুষ্যত্ব জাতির ভিত্তি, সে মনুষ্যত্ব কি আমাদের বর্ত্তমান উন্নতির সহিত সমবেগে অগ্রসর হইতে পারিতেছে? অতীতের অবদান ও স্মৃতি জাতির নিঃশ্বাস ও প্রশ্বাস। সে অতীতের স্বরূপকে আমরা কি বর্ত্তমানের অবলম্বন করিয়াছি?

অতীতের সব ভাল, এবং বর্ত্তমানের সকলই মন্দ নহে। অতীতেও যুগ-ধর্ম্মের বিরোধী, অনুপযোগী, সুতরাং বর্জ্জনীয় বিষয়ের অভাব ছিল না। অতীতের পাপেই বর্ত্তমানের দুর্দ্দশা।

কিন্তু অতীতের পুণ্যেই বর্ত্তমানের জীবন ও সত্তা, তাহাও স্মরণীয়। অতীতকে অবলম্বন করিয়াই বর্ত্তমানের পারম্পর্য্য রক্ষিত হয়। পূর্ব্বপুরুষ অতীতের ভাব ও সংস্কারের আধার। আর, পূর্ব্বপুরুষের পরিণতিই উত্তর-পুরুষ। অতীতের উদ্বোধন জাতির উদ্বোধনের জন্যই আবশ্যক। বিজিত, পরতন্ত্র, দেশাত্মবোধহীন জাতির পক্ষে অতীতের শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন কেবল আবশ্যক নয়, অপরিহার্য্য।

এই জন্য আমরা 'সে কাল এ কাল' নামক ষোল পৃষ্ঠার পুস্তিকার প্রসঙ্গে ষোল কাহন কথার অবতারণায় কুণ্ঠিত নহি। বাঙ্গালায় 'বারো হাত কাঁকুড়ের তের হাত বীচি' লইয়াই ত অনেকে কারবার করেন। যাহা 'হিতং মনোহারি চ', তাহার প্রচারের জন্য আমরা সেই মহাজন-পন্থার পথিক হইয়াছি।

'সে কাল এ কালে' বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর ছবি আছে। সে কাল তাহার আলো; এ কাল তাহার ছায়া। আলোও সত্য, ছায়াও প্রত্যক্ষ। ছায়া বলিয়াই তাহা মায়া নহে। এ কাল সম্মুখে জাজ্বল্যমান। সে কাল তত্ত্বাব-ভাবুকের মনশ্চক্ষে দেদীপ্যমান। 'সে কাল'ও এ কালে'র প্রণেতা সে কালের পক্ষপাতী; ভক্ত। বোধ করি, দুইটী বিশেষণই পর্য্যাপ্ত হইল না। তিনি সে কালের উপাসক। চন্দ্রশেখর এই নব্য বঙ্গে নবভাবপ্রবুদ্ধ নবপথের পথিক নব্য বাঙ্গালীর সমবায়ে ও রুচির-লীলা-বিহ্বল নবসাহিত্যে এক জন সেকাল-পন্থী। তিনি পয়ারে সে কালের জন্য আক্ষেপ করিয়াছেন। ইহাই স্বাভাবিক।

সে কাল পয়ারেই আপনার ছবি রাখিয়া গিয়াছে। ত্রিপদী, ত্রোটক প্রভৃতি পয়ারের সাহচর্য্য করিয়াছে। কিন্তু পয়ারই বাঙ্গালীর অনুষ্টুপ। পয়ারই কাশীদাস, কৃত্তিবাস, কবি-কঙ্কণ, ঘনরাম প্রভৃতির ভাবের বাহন। সে কালে পয়ারই বাঙ্গালীর মানস-ভাবের মুকুর ছিল। পয়ারই বাঙ্গালীর প্রতিবিম্ব ধরিয়া রাখিয়াছে। সেকাল-পন্থী চন্দ্রশেখরও সে কালের স্মরণে পয়ারকেই বাহন করিয়াছেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ইহাই স্বাভাবিক। এ কালের পয়ারে অরুচি সেকাল-পন্থীতে থাকিতে পারে না। আবার

'পঞ্চশরে ভস্ম করে করেছ এ কি সন্ন্যাসী,
বিশ্ব মাঝে দিয়েছ তারে ছড়ায়ে!'

এই অতুলনীয় ছন্দের ঝঙ্কারেও চন্দ্রশেখরের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইত না। যে ছন্দে কৃত্তিবাস কাশীদাস বাঙ্গালীকে মনের অমৃত পরিবেশন করিয়াছিলেন, যে ছন্দে ঘনরাম লিখিয়াছিলেন,—

'ধূমসীর ধমকেতে ধূলো উড়ে যায়',

এবং যে ছন্দে কবিকঙ্কণ লিখিয়াছিলেন—

'তুমি খাও ঘটে জল, আমি খাই ভাঁড়ে',

সেই ছন্দই চন্দ্রশেখর বাবু বাছিয়া লইয়াছেন। নব-যুগের অনেক বরেণ্য কবি এ ছন্দকে বরণ করিয়া লইয়াছেন। প্রাচীন পয়ার নবীনের উপহাসে হাসিয়া থাকিবে, কিন্তু মরিয়া যায় নাই। জীবনীশক্তি ছিল, তাই বাঁচিয়া আছে, এবং নব-সাহিত্যেও আপনার প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। মেঘদূতের মন্দাক্রান্তায় যে সৌন্দর্য্য ফুটিয়াছে, 'বর্ষা এলায়েছে তার মেঘময়ী বেণী'তে পয়ার তাহারই কতকটা ধরিয়া রাখিয়াছে। নব্য বাঙ্গালার মহাকবির কাব্যে পয়ার উদাত্ত ভাবে জোর হইয়া ধ্বনিত করিয়াছে—

'মনে হয় সুখ অতি সহজ সরল !'

চন্দ্রশেখরের পয়ার সে পর্য্যায়ের আত্মবিস্মৃত ও বিবর্ত্তিত পয়ার নহে। তাহা বাঙ্গালীর জীবন-কথায় অত্যন্ত 'সেকেলে' পয়ার। আমাদের মনে হয়, এই জন্যই চন্দ্রশেখরের পয়ার সে কালের স্মরণে এত উপযোগী হইয়াছে।

এক জন সমালোচক চন্দ্রশেখরের এই পয়ার পড়িয়া বলিয়াছেন—'কৃত্তিবাসকে মনে পড়ে।' প্রশংসা বটে, কিন্তু ভিত্তিহীন। কৃত্তিবাস প্রধানতঃ পয়ারে রামায়ণ গান করিয়া পয়ারকে ও বাঙ্গালীকে ধন্য করিয়া গিয়াছেন সত্য, কিন্তু পরে তাঁহার পরবর্ত্তী কবিকঙ্কণের কাব্যে তাঁহার পয়ারেরও বিবর্ত্ত হইয়াছিল। কৃত্তিবাসে যাহার উন্মেষ, ভারতচন্দ্রে তাহার বিকাশ। কৃত্তিবাসের পয়ার ছন্দঃশাস্ত্রের নিগড়ে সর্ব্বত্র নিয়মিত নহে। তাহা কতকটা আদিম, সুতরাং আদিমতার চিহ্ন-বর্জ্জিত নহে। চন্দ্রশেখরের পয়ার কৃত্তিবাস ও ভারতচন্দ্রের মধ্যবর্ত্তী কবিগণের পয়ারের মত বিধয়ানুগত; তাহাতে স্বৈরাচার নাই। যাঁহারা সে কালের ভক্ত, চন্দ্রশেখরের পয়ার তাঁহাদিগকে তৃপ্ত করিতে পারিবে।

চন্দ্রশেখর বাবু সে কালের বড় কথার সহিত ছোট কথাও স্মরণ করিয়াছেন। আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সাহিত্য-সম্মিলনের অভিভাষণে ম্যালেরিয়া-প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়া এক শ্রেণীর উপহাস উপহার পাইয়াছিলেন; চন্দ্রশেখরের 'সে কাল এ কাল' তাঁহাদিগকে নাসিকা-কুঞ্চনের অবকাশ দিবে। ইহাও আমরা লাভ বলিয়া মনে করি। দেশ ম্যালেরিয়ায় মুমূর্ষু, এবং দিব্য-চক্ষে দেখিতেছি, সাহিত্যেও ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ বর্ত্তমান। কিন্তু এই ম্যালেরিয়াগ্রস্ত সাহিত্যেও ম্যালেরিয়ার উল্লেখ করিবার উপায় নাই! সে সাহিত্যে সর্ব্বত্র জোছনা, চাঁদিনী, পীরিতি, পিরিতি, কিন্তু তাহার ধাতু-প্রকৃতি ম্যালেরিয়ার বিষে জর্জ্জরিত। সে সাহিত্য কঙ্কাল-সার, জীবনীশক্তিশূন্য। ম্যালেরিয়ার জীর্ণ দেশের সাহিত্যেও কারণগুণে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ অবশ্যম্ভাবী। তথাপি সে সাহিত্যে যদি কেহ সিন্‌কোনার চাষ করে, নব্যবাঙ্গালী তাহাকে উপহাস করে। ইহাও এ কালের ধর্ম্ম। কিন্তু যাঁহারা দেশের কল্যাণ-কামনায় সে উপহাসকে শিরোধার্য্য করেন, তাঁহারা আমাদের নমস্য।

'সে কাল এ কাল' প্রাচীন যুগের 'কাব্যং রসাত্মকং বাক্যম্' এই লক্ষণে উপেত মহাকাব্য নহে; খণ্ডকাব্যও নহে। ইহা পয়ারে রচিত, সুকৌশলে কথিত 'তথ্যবিবৃতি'। সে তথ্য বাঙ্গালীর অবশ্যজ্ঞাতব্য। তাহা বার বার বাঙ্গালীকে শুনাইলে ভাল হয়। গদ্যে, পদ্যে, যেমন ভাবে ও ভাষায় হউক, আমরা বাঙ্গালীকে তাহা শুনাইতে চাহি। চন্দ্রশেখর বাবু তাহাই করিয়াছেন।

পূর্ব্বকালে গ্রাম্য কবিরা পয়ারে এইরূপ অনেক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতেন। চন্দ্রশেখর বাবু সেই পথের পথিক হইয়াছেন। কবিত্বের বিভায় বঙ্গ বিভাসিত করিবার জন্য 'সে কাল এ কালে'র সৃষ্টি হয় নাই। দরদী গ্রন্থকার সে কালের মামুলী প্রথায় বাঙ্গালীর শোচনীয় অবস্থান্তর চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন। এই পুস্তিকায় 'আদাবন্তে চ মধ্যে চ' তাহার প্রমাণ সুস্পষ্ট।

'সে কাল এ কালে' যদি কেহ কমলবিলাসী কবির কমনীয় কবিতার বা মেঘদূতের মেঘ-

মন্ত্রের আশা করেন, নিশ্চয়ই নিরাশ হইবেন। সে কালের পাঁচালীকার কবিরা এক ক্ষেত্রে যে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতেন, চন্দ্রশেখর বাবুও সেই পথে সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য পয়ারের রেখাপাতে এই ছবি আঁকিয়াছেন। তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে।

আমাদের সাহিত্য বড় বড় কথার পূর্ণ। কিন্তু সমাজে ছোট ছোট কথারও প্রয়োজন আছে। আপাততঃ আমাদের বড় বড় কথার শ্রীধর কথকেরা যাহাকে অত্যন্ত ছোট মনে করিয়া উপেক্ষা করিতেছেন, তাহা অনেক বড় কথা অপেক্ষাও বড়, ইহা স্মরণ করিবার সময় আসিয়াছে। সে সকল কথা অত্যন্ত ছোট বটে, কিন্তু তাহার সমষ্টিতেই জাতির ব্যষ্টি গঠিত হয়। আর সেই ব্যষ্টির সমষ্টিই জাতি, ইহা যেন আমরা কখনও বিস্মৃত না হই। ছায়ায় ঢাকা পাখীডাকা পল্লীবাটে গীতিকবিতার ঝঙ্কার আছে, কিন্তু পল্লীর দারিদ্র্য সুকোমল গীতি-কাব্য নহে, কঠোর 'ট্রাজিডী'। শুধু 'সোনার বাঙ্গালা'ই কবিত্বের একমাত্র উপজীব্য বা উদ্দীপক নহে। তাহাতে তথ্যেরও অধিকার আছে। আমরা তাহা ভুলিয়া যাইতেছি ; চন্দ্রশেখর—ঔপন্যাসিক চন্দ্রশেখর তাহা বিস্মৃত হন নাই। তিনি উপন্যাসে, প্রবন্ধে, এবং সেকেলে পয়ারে বাঙ্গালীকে তাহা স্মরণ করিবার জন্য উদ্বুদ্ধ করিতেছেন। 'সে কাল এ কাল' তাঁহার এই ব্রতের অন্যতম উপকরণ—'কুচো-নৈবেদ্য।' 'সে কাল এ কালে' যাহা বিবৃত হইয়াছে, চন্দ্রশেখরের সাহিত্য-সৃষ্টির তাহাই প্রাণ। 'সে কাল এ কাল' সেই ভাব-প্রবাহের একটী ক্ষুদ্র উর্ম্মি, কিন্তু উপেক্ষণীয় নহে।

(১) 'সে কালের পল্লীবাসী খেত দুধ ভাত,
অনেকে দুবেলা এবে পাতে নাক পাত।'—সে কাল এ কাল ; ৭ পৃষ্ঠা।

বাঙ্গালার কোনও কাব্যপ্রকাশে কোনও অলঙ্কারের উদাহরণস্বরূপ উদাহৃত না হউক, উদ্ধৃত দুই পংক্তির যুগল তথ্য অত্যন্ত সত্য। সে কালের সহিত এ কালের এই অনাদৃশ্যটুকু পয়ারের ভাষায় পল্লীবাসীর মনে যদি মুদ্রিত হইয়া যায়, তাহা হইলে জাতির লাভ আছে। সে কালের সহজলভ্য দুধ-ভাত কোথায় গেল? কেন গেল? এ কালে যাহারা দু'বেলা পাত পাতিতে পায় না, তাহাদের দুর্ভাগ্যের কারণ কি? এইরূপ জিজ্ঞাসাই জাতীয়-মুক্তির জননী।

(২) 'বেচিত না ভদ্রলোক বাগানের ফল,
খেত, আর বিলাইত দরিদ্রে সকল।
এবে যদি কেহ কারো পাড়ে দুটী কুল,
চোর বলি ধরি দিয়া করে হুলস্থুল।'

ইহাও অত্যন্ত সত্য। যে বাঙ্গালী বাগানের ফল লুটাইয়া দিত, সেই বাঙ্গালী কেন কুল চুরী করে, সেই বাঙ্গালী কেন কুল-চোরকে জেলে পাঠায়? এ প্রশ্ন উচ্চ-সাহিত্যের অঙ্গ না হইতে পারে, বাঙ্গালার খাস বিশ্বসাহিত্যেও তাহার স্থান না থাকিতে পারে, কিন্তু বাঙ্গালা দেশে এ প্রশ্নের যথেষ্ট অবকাশ আছে, ইহা ত অস্বীকার করিতে পারি না।

'সে কাল এ কাল' বর্ত্তমান যুগের পাঁচালী। পাঁচালী সর্ব্বসাধারণের সাহিত্য : সৌখীন সাহিত্য নহে। যাহা সৌখীন নয়, তাহাই যদি সাহিত্য না হয়, তাহা হইলে আমরা নাচার।

(৩) 'জলো দুধ খেয়ে মলো শিশু ছেলে যত,
[illegible] প্রাণ ওষ্ঠাগত।'

শিশু 'জলো' দুধ খাইয়া সত্যই মরে, অথচ সাজ-পোষাকের ব্যয়ে গৃহস্থের প্রাণ ওষ্ঠাগত,— সমাজগত এই দারুণ দুর্দ্দশা ত অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এ উক্তি কবিত্ব নয়, সহজ, সরল, খাঁটী সত্য। এই সত্য, এই পরস্পর-বিরোধী দুইটী সত্যকে এক সূত্রে গাঁথিয়া 'সে কাল এ কালে'র বাঁধনদার আমাদের বুদ্ধির উপর যে কটাক্ষ করিয়াছেন, আশা করি, আমরা তাহার মর্ম্ম বুঝিয়া লাভবান হইতে পারিব।

'সে কালের মুচী শুচি শ্রীকৃষ্ণে ভজিলে,
এ কালে মেথর মান্য পয়সা থাকিলে।'—১৩ পৃষ্ঠা।

ইহা রস-রচনায় Epigramatic; সে কালের সহিত এ কালের সমস্ত সুস্পষ্ট ও অস্পষ্ট প্রভেদের হস্তামলক। 'আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পশ্যতি' যে দেশের উপদেশ, সে দেশে 'পতিত জাতির উদ্ধার' করিবার জন্য চেষ্টা করিতে হইতেছে, ইহা সত্যই শোচনীয়। কিন্তু কাঞ্চনকৌলীন্য যে দরিদ্র মহাকুলীনকেও পতিত করিতেছে, সমৃদ্ধ অকুলীনকে কুলীন করিতেছে। মুচী শ্রীকৃষ্ণ বা পরব্রহ্ম, যাহাকেই হউক, এক জনকে ভজুক, শুচি হউক, তাহাকে মাথায় করিয়া রাখিব। কিন্তু 'অখণ্ডমণ্ডলাকার' স্বর্ণ-রজত সঞ্চয় করিয়া যে সকল মুচী কোনও দেবতাকে না ভজিয়াই সমাজে সিংহ হইয়া হুঙ্কারে দশ দিক প্রতিধ্বনিত করিতেছে, তাহাদের ক্রীতদাস হইয়া আমরা কি এ কালের সাম্যের গৌরব উজ্জ্বল করিতেছি? সে কাল যতই মন্দ হউক, তাহার অচল-আয়তনে 'ম্যামনে'র প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত করিয়া সেকেলে লোক এমন একনিষ্ঠভাবে তাহার উপাসনা করিত না।

'পূজা বিনা উপবাসী পৈতৃক ঠাকুর,
রুটী মাংস খায় সুখে পালিত কুকুর।'—১৫ পৃষ্ঠা।

কি মর্ম্মান্তিক। ইহাও অত্যুক্তি নহে। কঠোর সত্য। এক দিনের কথা মনে হইতেছে। কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটে কোনও মাসিকপত্রের কার্য্যালয়ে বসিয়া নবীন সম্পাদকের সঙ্গে গল্প করিতেছি। এক জন ঔপন্যাসিক—তিনি এখন বঙ্গে সুপ্রসিদ্ধ—সেই গরীবখানায় উপস্থিত হইলেন। সঙ্গে একটী খেঁকী কুকুর। আমাদের স্বদেশী কুকুর—'কালো কুচ্‌কুচে' রঙ; বেশ হৃষ্টপুষ্ট। কিন্তু খেঁকী কুকুর! প্রতিভাশালী ঔপন্যাসিকের পোষা, পেয়ারের কুকুর—দেশী ও খেঁকী! বিলাতী টেরিয়ার নহে, কলী নহে, শেফার্ড নহে, বুল নহে, স্প্যানিয়াল নহে, গ্রেহাউণ্ড নহে, জাপানী পুতুল নহে, চীনের চাউ নহে। এমন কি, নেপালের—ভুটানের ঝাঁকড়া-লোমওয়ালা 'কুত্তা'ও নহে। খাঁটী স্বদেশী খেঁকী কুকুর! গুপ্ত কবির—'বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া' মনে পড়িল। শুনিলাম, কুকুরটী মানুষের ভাড়া দিয়া সুদূর সাগরপারে গিয়াছিল, আবার প্রভুর সঙ্গে ফিরিয়া আসিয়াছে। সে এইরূপ যাতায়াত করে। শুনিলাম, সে প্রত্যহ দুইটাকার খাবার খায়; সন্দেশ, রসগোল্লা, গজা, খাজা; আবার চপ, কাট্‌লেট, কোপ্তা ইত্যাদিতেও তাহার অরুচি নাই। মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া শুনিলাম। নীতিশাস্ত্রে পড়িয়াছিলাম, কাহাকেও হিংসা করিতে নাই। 'বুকে হাত দিয়া' বলিতে পারি, তখন সেই প্রতিভাশালী ঔপন্যাসিকের সৌভাগ্যশালী কুকুরকে ঘুণাক্ষরেও হিংসা করি নাই।

তাহার পর সারমেয়-স্বামী বন্দাৎ করিয়া টেবিলের উপর একটা টাকা ফেলিয়া দিলেন।

সন্নিহিত হোটেল হইতে চপ, কাটলেট আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই খেঁকী কুকুর নীরবে নিশ্চিন্তচিত্তে এক টাকার চপ কাটলেট উদরস্থ করিল। আনন্দে একবারও লাঙ্গুল নাড়িল না। বুঝিলাম, এইরূপ ভোজেই সে অভ্যস্ত। তখন—তখন ত্রিকলাকাথ-বিনিন্দী চা পান করিতে করিতে সেই ভাগ্যবান কুকুরকে একটু হিংসা করিয়া ফেলিয়াছিলাম।

কুকুরের চপ-ভক্ষণ দেখিতে দেখিতে শুনিতেছিলাম, নিম্নে. রাজপথে কে কাতরকণ্ঠে হাঁকিতেছে—'দুঃখী কাণাকে একটী পয়সা দাও বাবা—দুঃখী কাণা—' ভাবিলাম.সে দুঃখী, অন্ধ, ভিখারী বটে, কিন্তু কোনও সৌখীন প্রভুর কুকুর নহে। সে কাহারও পালিত ও প্রিয় নহে সে শুধু দুঃখী, অন্ধ, ভিখারী। মানব-সমাজে এমন বিড়ম্বনার সংখ্যা হয় না। এ বিড়ম্বনা সার্ব্বভৌমিক। ইহা নিশ্চয়ই বঙ্গের নিজস্ব বা বাঙ্গালীর একচেটে নহে। কিন্তু কিছুদিন পূর্ব্বেও বাঙ্গালায় কুকুরেরও পেট ভরিত; ভিখারীও উপবাসী থাকিত না। পৈতৃক ঠাকুরের কথা আর না তুলিলেও চলে। অতএব, উল্লিখিত শ্লোকটী কবির কল্পনা বা পাঁচালীর জল্পনা নহে; খাঁটী সত্য, ধ্রুব সত্য, দ্বিজেন্দ্র বাবুর ভাষায় সার-সত্য, এবং আমার চাক্ষুষ সত্য। 'সেকেলে' চন্দ্রশেখর বাবু এই সত্য epirgramatic ভাষায় পয়ারে ব্যক্ত করিয়াছেন।

'সে কাল এ কালে' পূর্ব্বে যাহা ছিল, তাহারি পরিচয় আছে। তাহাকে নির্ব্বাসিত করিয়া পরে যাহা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহারও পরিচয় আছে। পল্লবিত ও পুষ্পিত ভাষায় কোমল-কান্ত পদাবলীতে কবিত্বের সৌরভ মাখাইয়া সে তালিকা রচিত হয় নাই সত্য, তাহা নবগীতিকাব্যের ধারা, রস ও রীতির অনুগামী নহে, তাহাও সত্য। কিন্তু তাহাতে বৈশিষ্ট্য আছে। সে বৈশিষ্ট্য এই যে, তাহা স্মৃতির উদ্দীপক, পৃচ্ছার প্রবর্ত্তক, চিন্তার জনক। তাহাতে রচয়িতার সহৃদয়তা ও জাতির প্রতি মমতার পরিচয় আছে। বৃন্তের উপর যেমন ফুল ফুটিয়া থাকে, 'সে কাল এ কালে'র শ্লোকের বৃন্তেও তেমনই চিন্তাশীল ভাবুকের মনোরম ভাবনার ফুল ফুটিয়া আছে। সে ফুলে মার পূজা চলিতে পারে। কবিত্বের যদি ঈশ্বর ভিন্ন অন্য অবলম্বন না থাকে, তাহা হইলে কবিত্ব কখনও এই সকল মর্ম্মান্তিক ও সাংঘাতিক তথ্যের আশ্রয় হইতে পারিবে না। কিন্তু যাহা আবশ্যক, সুষমাসৌরভে হীন হইলেও তাহা বরণীয়। 'হিতং মনোহারি চ দুর্লভং বচঃ।' কিন্তু সে কালের স্মরণ, এ কালের সহিত তাহার তুলনায় সমালোচন 'হিত'ও বটে, এবং দেশের কথা, মর্ম্মের কথা বলিয়া 'মনোহারী'ও বটে। 'সেকেলে' চন্দ্রশেখর বাঙ্গালীকে এই সকল কথা ভাবিবার অবকাশ দিয়া ধন্যবাদের ভাজন হইয়াছেন। সমাজের সকল স্তরের জন্যই সাহিত্য চাই। 'অনাথ বালকে'র রচয়িতা পাঁচালীছন্দে দেশের কথা গাইয়া দেশী লোক-সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। সোনার তরীর সহিত এই দেশী তাল-কাঠের ডোঙ্গা যদি বাঙ্গালীর ঘাটে লাগে, তাহা হইলে, বিশ্বসাহিত্য না হউক, বাঙ্গালী কল্যাণ লাভ করিবে। তথাকথিত 'ছোট কথা' আর না ভাবিলে নয়। তাই চন্দ্রশেখরের সে-কাল-ব্রতের এই অসম্পূর্ণ পরিচয় লিপিবদ্ধ করিলাম।

আমরা আদার ব্যাপারী। জাহাজের খবর রাখি না। এই উপলক্ষে আমি যাহা বলিলাম, তাহাও আমাদের সমশ্রেণীর ব্যাপারীদের জন্য; জাহাজে বোঝাই দিয়া ইয়ুরোপে পাঠাইবার জন্য নয়। ইহাই আমার কৈফিয়ৎ।

শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি। *

* প্রতিভা; শ্রাবণ; ১৩২৭।

হিপ্‌নটিজম্

(Hypnotism)

হিপ্‌নটিজম্‌কে কেহ কেহ 'সম্মোহন বিদ্যা' বলিয়া থাকেন। কিন্তু মোহ হইলে জ্ঞান থাকে না। হিপ্‌নটিজম হইলে জ্ঞান থাকিতে পারে। মোহ-সময়ে আত্মবোধ লুপ্ত হয়; কিন্তু হিপ্‌নটিজমে তাহার লোপ না হইতেও পারে। এই সকল ও অন্যান্য কারণে 'সম্মোহন বিদ্যা' কথাটা আমার ভাল লাগে না। আমি 'নিদ্রাভাণ' শব্দ ব্যবহার করিতে চাই।

হিপ্‌নটিজম্ আজি কালি অনেকে বুঝেন। হিপ্‌নটাইজ করা অনেকেই দেখিয়াছেন। কিন্তু উহাকে হয় ত ভেল্কীবাজি, হয় ত দুষ্টামী বিবেচনা করেন। বাজিকর এতদ্দেশে নানারূপ ভেল্কী বহু কাল দেখাইতেছে। হিপ্‌নটিজম্‌কেও তেমনই একটা ভেল্কী বলিয়া মনে হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। আমি এক দিন একটী প্রক্রিয়া দেখিয়াছিলাম, তাহা এই:—এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে চেয়ারে বসাইয়া হিপ্‌নটাইজ করিল। তৎপর সে তাহাকে সরবৎ খাইতে দিয়া বলিল, 'বড় তিত।' তৎক্ষণাৎ ঐ ব্যক্তি সরবৎ মুখে দিয়া 'তিত' বলিয়া মুখভঙ্গী করিয়া ফেলিয়া দিল। ইহার একটু পরে কতকগুলি ছেঁড়া কাগজ তাহার গায়ে ফেলিয়া দিয়া বলিল, 'তোমাকে বোল্‌তায় কামড়াইল।' সে তৎক্ষণাৎ যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং যন্ত্রণাসূচক ধ্বনি করিতে লাগিল। ইহার কিছু কাল পরে তাহাকে অজ্ঞান করিল, সে ব্যক্তি ঘুমন্তের মত শুইয়া রহিল। তখন তাহাকে বলিল, 'তুমি জাগিয়া উঠিয়া ১ হইতে ১০ পর্য্যন্ত গণনা কর।' বাস্তবিকও সে তাহাই করিল।

এই সকল দৃষ্টান্ত প্রথমে ভেল্কি বাজি বলিয়া বোধ হয়। অথবা দুই ব্যক্তি দুষ্টামী করিয়া পরস্পরের সহিত যোগে ঐরূপ করিতেছে বলিয়া বিশ্বাস জন্মে। কিন্তু আমরা নানাপ্রকারে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, দুষ্টামী বোধ হয় নাই। উহা ভেল্কীও নহে; সত্য ঘটনা। জগতের অন্য ঘটনার মত উহাও সত্য। অধিকাংশ স্থলেই সত্য।

যখন ইহা স্বীকার করিতেই হইল, তখন বুঝিবার চেষ্টাও করিতে হইবে। এ সকল মানসিক ঘটনা। দার্শনিকরা মনকে যাহা ভাবেন, বৈজ্ঞানিকেরা ঠিক তাহা ভাবেন না। মনের যেরূপ অর্থই গ্রহণ করি, এ সকল কার্য্যকে মানসিক অবস্থার ফল বলিতেই হইবে। মিষ্ট সরবতের তিক্ত আস্বাদ পাওয়া; কাগজের

টুকরা স্পর্শে যন্ত্রণা বোধ করা; অজ্ঞান অবস্থায় অন্যের আদেশ শ্রবণ করিয়া তদনুসারে গণনা করা; এ সকল যদি দুষ্টামী না হইল, তবে কি? তাহা বলা কঠিন। এ সকলকে বুঝিতে হইলে আমাদিগের জানা-ঘটনার সহিত মিলাইয়া বুঝিতে হইবে। যাহা সকলেই জানেন, এবং বুঝেন বলিয়া বিবেচনা করেন, তদ্রূপ ঘটনার সহিত এ সকলের সাদৃশ্য দেখাইয়া দিতে পারিলে একরূপ বুঝা যায়। এই প্রণালীতেই বুঝিবার চেষ্টা করা সহজ। নতুবা কারণ অনুসন্ধান করিতে যাওয়া বড়ই দুরূহ ব্যাপার। মনে করুন, এক ব্যক্তি হঠাৎ মারা গেল। ইহার কারণ অনুসন্ধান করা কঠিন। কেহ যদি জিজ্ঞাসা করে, ব্যক্তি কেন মারা গেল, তাহা হয় ত বলিতে পারিব না। কিন্তু যদি বলি, ঐরূপ অকস্মাৎ মৃত্যু অনেকের হইয়া থাকে; উহা সন্ন্যাস রোগ; তাহা হইলে, প্রশ্নকারীও তৃপ্ত হইল, আমিও ভাবিলাম যে, বিষয়টা আর দুর্ব্বোধ থাকিল না। ইহা কার্য্য-কারণ-নির্ণয় নহে; কিন্তু ইহাকেও একরূপ 'বুঝা' বলা যায়। বহু ব্যক্তি ঐরূপে মরে: এ ব্যক্তিরও তাহাই হইল। সুতরাং কথাটা ঐ ভাবে বুঝা গেল।

উপরের বর্ণিত হিপ্‌নটিজমের ঘটনা কয়েকটীর সহিত পূর্ব্ব-পরিজ্ঞাত ঘটনার এই ভাবে সাদৃশ্য দেখাইতে পারিলেও, উহাদিগকে 'বুঝা' যাইতে পারে। আমরা আপাততঃ এই উপায়েই বুঝিবার চেষ্টা করিব।

মানব-মনের একটা নিয়মই এই যে, সকল কথা বিচার করিয়া গ্রহণ করে না। যাহার উপর বিশ্বাস আছে, অথবা যাহার সংসর্গে সর্ব্বদা থাকে, কিংবা যাহাকে ভালবাসে, অথবা যে কথা পুনঃপুনঃ শুনে, তাহা মানব-মন বিনা বিচারেই গ্রহণ করে। আমাদিগের বিশ্বাসগুলির সমষ্টি করিলে দেখা যাইবে, তাহার অধিকাংশ বিনা বিচারে, বিনা প্রমাণে গৃহীত হইয়াছে। শিক্ষকের বাক্য, গুরু পুরোহিতের বাক্য মানব স্বতঃই বিশ্বাস করে। যাহাদিগের সংসর্গে থাকি, তাহাদিগের মতই হইয়া উঠি; অথচ সেইরূপ হইলে ভাল কি মন্দ হইব, তাহার প্রমাণও লই না, বিচারও করি না। বহু ব্যক্তি তাহাদিগের প্রণয়িনীর বাক্য শ্রবণমাত্রই বিশ্বাস করে। অসত্য কথাও যদি পুনঃপুনঃ উক্ত হয়, তবে তাহা অনেকে বিনা প্রমাণেই বিশ্বাস করিয়া থাকেন। 'বাঙ্গালী চিরদিনই ভীরু, কখনই সমরকুশল নহে, অতি অযোগ্য'—ইত্যাকার বিশ্বাস জন্মাইয়া দেওয়ায় যাহাদিগের স্বার্থ আছে, তাহারা পুনঃপুনঃ আমাদিগের কর্ণে ঐ কথা বলায় আমরা অনেকেই তাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেছি। অথচ এই জাতি

আর্য্যাবর্ত্তব্যাপী সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল; বহু যুদ্ধে পশ্চিমদেশীয়গণকে পরাজিত করিয়াছিল; সে দিনও পলাশীর যুদ্ধে বীরত্ব দেখাইয়াছে। যাহা হউক, বিনা প্রমাণে, বিনা বিচারে বহু বিষয় বিশ্বাস করা মনের একটা স্বভাব। বস্তুতঃ সমস্ত বিষয়েই প্রমাণ লইয়া বিশ্বাস করিতে হইলে সংসারযাত্রা প্রায় অসম্ভব হইয়া উঠিত।

এই কথা যদি একবার বুঝিয়া লই, তবে হিপ্‌নটিজম্ অনেকাংশে বুঝা যাইতে পারে। জাগরিত অবস্থায় আমাদিগের আত্মবোধ ও চৈতন্য যেরূপ থাকে, হিপ্‌নটিক অবস্থাতে ঠিক তদ্রূপ থাকে না; তথাপি চৈতন্য ও আত্মবোধ সকল সময়ে লুপ্ত হয় না। হিপ্‌নটিক অবস্থায় যখন মৃত্যু হয় না, তখন চৈতন্য থাকিবেই। কিন্তু আত্মবোধ গাঢ় হিপ্‌নটিক্ অবস্থায় বিশেষ থাকে না; অল্প হিপ্‌নটিক অবস্থায় আত্মবোধ থাকে। স্বপ্নে যেমন চৈতন্য ও আত্মবোধ উভয়ই থাকে, তদ্রূপ।

এক্ষণে বিবেচনা করুন, যে ব্যক্তি হিপনটাইজ করিতেছে, তাহার শক্তি ও কৌশল আমি বিশ্বাস করি। আমি অল্প হিপনটিক অবস্থায় সে বিশ্বাসের প্রতিকূল বিচার করিতে সমর্থ হই না। যেমন সম্পূর্ণ সচেতন অবস্থাতেও, যে স্থলে বিশ্বাস থাকে, সে স্থলে বিচার করিবার আবশ্যকতা থাকে না, তদ্রূপ হিপনটিক অবস্থাতেও বিচার করিবার অথবা প্রমাণ লইবার আবশ্যকতা থাকে না। যিনি হিপ্‌নটাইজ করিতেছেন, তাঁহার কথা কর্ণে প্রবেশ করিয়া মস্তিষ্কে নীত হয়। তৎপরে বিনা বিচারে বিশ্বাস আসিয়া উপস্থিত হয়। তখনই সরবৎকেও তিক্ত এবং কাগজের টুকরাকেও বোলতা বলিয়া ধারণা হয়। কারণ, বিশ্বাস আসিয়া উপস্থিত হইলে সকল ইন্দ্রিয়ই * অনেক সময় ঐ বিশ্বাসের উপযোগী অনুভূতি লাভ করে। শ্মশানে প্রেত থাকে, এই বিশ্বাসবশতঃ চক্ষু তদনুরূপ মূর্ত্তি দর্শন করে। আমি এক ব্যক্তিকে জানিতাম, তিনি কখনও ওল খাইতেন না। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, ওলে তাঁহার গলার মধ্যে প্রদাহ জন্মায়। এক দিবস তাঁহাকে আলুর ডালনা খাওয়াইবার পর এক জন বলিল যে, তিনি ওল খাইলেন। অমনই সেই কথায় বিশ্বাস করিয়া তাঁহার গলার প্রদাহ উপস্থিত হইল। আমার এক সাহিত্যিক বন্ধু আফিম্ খাইতেন, তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে খয়েরের বড়ীতে আফিংএর গন্ধ করিয়া খাইতে দিতেন। উদ্দেশ্য ছিল যে, ক্রমে স্বামীকে আফিং খাওয়া ছাড়াইবেন। এক দিন তাঁহার স্ত্রী ঐ বড়ী বন্ধ

* আমরা এ স্থলে চক্ষু কর্ণাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কথা বলিতেছি।

করিলে তিনি পুনঃপুনঃ বড়ী চাহিতে থাকিলেন। তখন তাঁহার স্ত্রী গুপ্ত কথা ব্যক্ত করিয়া ফেলিলেন। অমনই তিনি বলিয়া উঠিলেন 'আমি কি এত দিন আফিং খাই নাই?' এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহার পেট ফাঁপিয়া উঠিল। বিশ্বাসের এ শক্তি আছে। জাগরিত অবস্থায়ও আছে, হিপ্‌নটিক অবস্থাতেও আছে। সরবতের তিক্ত আস্বাদ, কাগজের টুকরাকে বোলতা জ্ঞান করা, এ সকল বিচারহীন বিশ্বাসের কর্ম্ম। ইহা হিপনটিক অবস্থার বিশেষত্ব নহে।

হিপনটিক অবস্থার আদেশ ঐ অবস্থা অবগত হইলেও প্রতিপালিত হয় কেন? উপরে যে ব্যক্তির কথা বলিয়াছি, তিনি ঐ অবস্থা হইতে জাগরিত হইয়া ১ হইতে ১০ গণনা করিলেন কেন? এ কথা বুঝা কঠিন। কিন্তু ইহার অনুরূপ ঘটনা নিদ্রাতেও দেখা যায়। আমি এক দিন রাত্রি ১২টার সময় নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম। কিন্তু শেষ রাত্রি ৩টার গাড়ীতে রেলওয়ে-যোগে অন্যত্র যাইব; এই চিন্তায় নিজেকেই নিজে আদেশ করিলাম, অর্থাৎ সংকল্প করিলাম যে,—৩টার আগে জাগিতে হইবে। তৎপরে ঘুমাইয়া পড়িলাম। আমার নিদ্রিত অবস্থায় মস্তিষ্ক এ আদেশ আমার অজ্ঞাতসারে প্রতিপালন করিল। বস্তুতঃই আমি ২॥০টা রাত্রির সময় জাগিয়া উঠিলাম এবং ৩টার গাড়ীতে চলিয়া গেলাম। পরীক্ষার কিছু পূর্ব্বে ছাত্রগণ ঈদৃশ ঘটনা অনেক বার দেখিয়াছেন; আমিও পাঠদ্দশায় এরূপ দেখিয়াছি, মনে হয়। উপরের উল্লিখিত ব্যক্তি হিপনটিক অবস্থায় যে আদেশ পাইয়াছিল, বিনা বিচারে তাহার মস্তিষ্ক সেই আদেশ সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিল। জাগরিত হইলে সেই আদেশের মত কর্ম্ম নিষ্পন্ন হইল। আমার ক্ষেত্রে মস্তিষ্ক নিদ্রিত অবস্থায় নিজের আদেশ প্রতিপালন করিল, ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রে তাহার মস্তিষ্ক অপরের আদেশ প্রতিপালন করিল, এইমাত্র প্রভেদ।

এই সকল উদাহরণ হইতে দেখা যাইতেছে যে, হিপনটিক্ অবস্থায় যে সকল কর্ম্ম আমরা ভেল্কী অথবা দুষ্টামী মনে করি, বাস্তবিক সকল ক্ষেত্রে তাহা নহে। আমরা প্রত্যহ যে সকল কর্ম্ম করি, সেই সকলের মধ্যে অনেক কর্ম্ম হিপনটিক অবস্থার অনুরূপ। নিদ্রিত অনিদ্রিত উভয় অবস্থাতেই আমরা এই সকলের অনুরূপ কর্ম্ম করিয়া থাকি।

বিনা বিচারে, শুধু বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া যখন আমরা কোনও বিষয় স্বীকার করিয়া লই, অথবা সত্য বলিয়া বিবেচনা করি, তখন মস্তিষ্ক পদার্থের কোনও কোনও কেন্দ্র ন্যূনাধিক ক্রিয়াহীন থাকে। এই ক্রিয়াহীন অবস্থা অথবা

দুর্ব্বলতা নানা কারণে উপস্থিত হয়। পূর্ব্বের বিশ্বাস,আশা, অভ্যাস, প্রেম, ভক্তি, বিদ্বেষ ইত্যাদি কারণে মস্তিষ্কের কেন্দ্রবিশেষের দুর্ব্বলতা অথবা ক্রিয়াহীনতা জন্মাইতে পারে; আমি পুনঃপুনঃ দেখিয়া অথবা শুনিয়া অথবা অন্য কোনও প্রকারে যে রূপ বিশ্বাস পোষণ করিতেছি, তাহার অনুকূল ঘটনা আমি বিনা বিচারে বিনা প্রমাণে স্বীকার করিয়া থাকি; তেমনই আমরা যাহা আগ্রহের সহিত আশা করি, তাহা অতি সহজেই বিশ্বাস করি। মস্তিষ্ক প্রমাণ চাহে না। প্রমাণ বিচার করিবার যোগ্য সবলতাও মস্তিষ্কের থাকে না। অভ্যাসের এই ফল। পুনঃপুনঃ অভ্যাসে মস্তিষ্ক ও স্নায়ু এরূপ ভাবাপন্ন হয় যে, বিচার-শক্তি থাকে না। এ সকলের বহু দৃষ্টান্ত বহু ব্যক্তি জ্ঞাত আছেন; সুতরাং উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। এইরূপে অনায়াসে উপলব্ধ হইবে যে, উপরে যে ছয়টি কারণের উল্লেখ করিয়াছি,তাহাদিগের মানসিক দুর্ব্বলতা অথবা অবসাদ জন্মাইবার শক্তি আছে। তাহারা মস্তিষ্কের এক অথবা একাধিক কেন্দ্রের দুর্ব্বলতা উৎপাদন করিয়া প্রমাণ অথবা বিচারের আবশ্যকতাই লুপ্ত করিয়া ফেলে।

ইহা মানসিক ফল। কিন্তু বিশ্বাসের দৈহিক ফলও অতিশয় আশ্চর্য্যজনক। উহা হিপ্‌নটিজমের অনুরূপ ত বটেই, পরন্তু তাহা অপেক্ষা কম আশ্চর্য্যজনক নহে। বিশ্বাসের ফলে অনেক রোগী রোগমুক্ত হয়, ইহা সকলেই জানেন। ঠিক এই কারণেই সময়বিশেষে স্নায়বিক দুর্ব্বলতা উৎপন্ন হয়, ইহাও অনেকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। নিকটস্থ গৃহে আগুন লাগিলে যদি এরূপ বিশ্বাস হয় যে, আমার গৃহও পুড়িয়া যাইতে পারে, তখন যে সকল গুরুভার বস্তু একা গৃহ হইতে বাহির করিতে পারি, অগ্নি নিবিয়া গেলে তাহা একা তুলিতেই পারি না। এই সকল দৈহিক পরিবর্ত্তন বিশ্বাস হইতে জাত হইয়া থাকে।

সুতরাং হিপনটিক অবস্থাতেও মস্তিষ্কে যে ভাব দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হয়, তাহাতে [উপযুক্ত বিশ্বাস জন্মিবার কোনও বাধা না থাকিলে] অনেক সময় দৈহিক পরিবর্ত্তন উৎপাদন করে। আমি দেখিয়াছি, হিপ্‌নটিক অবস্থায় এক জনের দক্ষিণ হস্ত হিপনটাইজারের আদেশক্রমে এরূপ শক্ত হইয়াছিল যে, আমরা টিপিয়া নরম করিতে পারি নাই; অথচ সেই ব্যক্তির তখন দৃশ্যতঃ বাহ্য-জ্ঞান না থাকাই বোধ হইয়াছিল। এ স্থলে হিপ্‌নটিক অবস্থাতেও যে পরিমাণ ক্রিয়া মস্তিষ্কমধ্যে হইতেছিল, তাহাতেই হিপনটাইজারের কথায় দৃঢ় বিশ্বাস জাত হইয়াছিল; এবং তাহারই ফলে দৈহিক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়া-

ছিল। হিপনটিক অবস্থাতেও মানুষ সকল সময় সম্পূর্ণ অচেতন হয় না। মস্তিষ্ক পদার্থের অনেক অংশ তখনও ক্রিয়াশীল থাকে।

মস্তিষ্ক পদার্থের তিনটী স্তর কল্পনা করিলে সকলের উপরের স্তরের ধূসর বর্ণের পদার্থগুলিই বিচারকার্য্যে ও চিন্তার কার্য্যে বিশেষভাবে আবশ্যক হয়। এই সর্ব্বোচ্চ স্তরই মানবকে মানব-নামের অধিকারী করিয়াছে। তাহার বুদ্ধি বিবেচনা ও উন্নত ভাব সকল এই ধূসরবর্ণের কোষগুলির কর্ম্ম। জাগরিত অবস্থায়ও যেমন, হিপনটিক অবস্থাতেও তেমনই; যে সকল স্থলে বিচার-বুদ্ধির গুরুতর হ্রস্বতা অথবা লোপ দেখা যায়, এবং বিনা বিচারে বিশ্বাস করিবার প্রবণতার অত্যন্ত বৃদ্ধি দেখা যায়, সেই সকল স্থলে অনুমান করিতে হয় যে, মস্তিষ্কের সর্ব্বোচ্চ স্তরের বহু কোষ ক্রিয়াহীন হইয়াছে, অথবা অধিকমাত্রায় দুর্ব্বল হইয়াছে। সকল কোষ ক্রিয়াহীন অথবা দুর্ব্বল নাও হইতে পারে। উপস্থিত বিষয়ের পক্ষে প্রয়োজনীয় কতিপয় কোষ অথবা কেন্দ্র ঐরূপ ভাবাপন্ন হইলেই সেই বিষয়ের বিচার-শক্তির হানি হইবে। সে সময়েও অন্যান্য কোষ অথবা কেন্দ্র সকল ক্রিয়াশীল থাকিতে পারে। যে মাননীয় বিচারপতি তীক্ষ্ণবুদ্ধিবলে প্রমাণাদির তন্ন তন্ন করিয়া আলোচনা করিয়া ন্যায়বিচার ও সত্য নির্ণয় করিয়া অশেষ ফল লাভ করিতেছেন, তিনিও প্রিয়তমা ভার্য্যার কথায় নিতান্ত অবিশ্বাস্য বিষয়ে বিশ্বাস করিয়া সহোদর ভ্রাতাকে পরিত্যাগ করিতে পারেন; পূর্ব্বপক্ষের পুত্রকন্যাকে নিদারুণ ক্লেশ দিতে পারেন; পূজনীয়া মাতৃদেবীর সহিত দুর্ব্যবহার করিতে পারেন। এরূপ দৃষ্টান্ত অনেকেই অবগত আছেন। ঈদৃশ স্থলে প্রণয়জনিত বিশ্বাস সেই তীক্ষ্ণধী বিচারপতির মস্তিষ্কের কতিপয় কেন্দ্রমাত্র ক্রিয়াহীন অথবা গুরুতরভাবে দুর্ব্বল করিয়াছিল; তাহাতেই তিনি নিতান্ত অবিশ্বাস্য কথাও বিনা প্রমাণে গ্রহণ করিয়াছিলেন। বাহ্যতঃ সকলেই দেখিতেছে, তাঁহার চৈতন্য ও আত্মবোধ পূর্ণমাত্রায় আছে; কিন্তু তাঁহার অভ্যন্তরভাগ বিবেচনা করিলে বুঝা যাইবে যে, ঐ উপস্থিত বিষয়ে তাঁহার চৈতন্য ও আত্মবোধের অনেক হ্রাস হইয়াছে। সুতরাং উহাদিগের অভাবে তাঁহাকে পূর্ব্ববৎ পূর্ণ অথবা অখণ্ডিত মানুষ বলা যায় না। তাঁহার চৈতন্য ও আত্মবোধ যে পরিমাণে লোপ পাইয়াছে, তিনিও সেই পরিমাণে চৈতন্যহীন ও আত্মবোধ-হীন [অর্থাৎ মৃতবৎ] হইয়াছেন। মৃতবৎ অথচ মৃত নহেন, চৈতন্যহীন অথচ, অচেতন নহেন। সুতরাং মস্তিষ্কের ঐ ধূসরবর্ণ কোষগুলির অতিমাত্র দুর্ব্বলতা-বশতঃ বিনা বিচারে ঐ উপস্থিত বিষয় জড়বৎ গ্রহণ করিলেন। এইরূপ অনেক

সময় হিপনটাইজড্ ব্যক্তিও পূর্ণ চৈতন্য হারাইয়া ফেলে। তখন তাহারও মস্তিষ্কের ঐ ধূসরবর্ণ স্তর দুর্ব্বলতা প্রাপ্ত হওয়ায় সেও বিনা বিচারে জড়বৎ [অর্থাৎ কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায়] ব্যবহার করে। ইহাকে অস্বাভাবিক, অথবা অপ্রাকৃত বলা যায় না। ইহা দৃশ্যতঃ সুস্থ ও জাগরিত [উপরের লিখিত বিচারপতির অথবা তদ্রূপ অবস্থাপন্ন অন্য] ব্যক্তির ব্যবহার হইতে অধিক বিভিন্ন নহে। অন্ততঃ তাহার অনুরূপ বলা যাইতে পারে।

এই ভাবেই আমরা সর্ব্বজনবিদিত স্বাভাবিক ও সুস্থ ব্যক্তিগণের ব্যবহারের সহিত হিপনটাইজড ব্যক্তির আচরণের সাদৃশ্য দেখিয়া ঐ আচরণ কতক পরিমাণে বুঝিতে সমর্থ হই। উহা তখন আর অস্বাভাবিক জ্ঞান হয় না, বরং স্বাভাবিক নিয়মের অধীন বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। হিপনটিজম্ বর্ত্তমান কালে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে আলোচিত হইতেছে; উহা শারীরবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের অন্তর্গত।

শ্রীশশধর রায়।

ন্যায়রত্নের নিয়তি।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

ন্যায়রত্নের চিকিৎসার জন্য কবিরাজের সহিত বলরামের কি বন্দোবস্ত হইয়াছিল, তাহা ন্যায়রত্ন বা সুমতি কোনও দিন জানিতে পারেন নাই, তবে কবিরাজ যে নিঃস্বার্থভাবে প্রত্যহ পদব্রজে দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া ভিন্ন গ্রামের এই নিঃস্ব রোগীর চিকিৎসা করিতে আসিতেন, ইহা সহসা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। কবিরাজ প্রতিদিনই ন্যায়রত্নকে দেখিতে আসিতেন; যে দিন সকালে আসিতে না পারিতেন, সে দিন অপরাহ্নে আসিতেন; সযত্নে তাঁহার রোগের অবস্থা পরীক্ষা করিতেন; ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা করিতেন; তাঁহার শয্যাপ্রান্তে বসিয়া আগ্রহসহকারে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতেন। কবিরাজ মহাশয় সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত, সাহিত্যরসজ্ঞ ও ভগবদ্ভক্ত ব্যক্তি; ন্যায়রত্নের সহিত কথাবার্ত্তায় কয়েক দিনেই তিনি ন্যায়রত্নের পাণ্ডিত্য, উদারতা, নিষ্ঠা ও গভীর ধর্ম্মভাবের পরিচয় পাইলেন; ন্যায়রত্নের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ভক্তিতে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইল। কোনও দিন কোনও কারণে তিনি ন্যায়রত্নকে দেখিতে আসিতে না পারিলে, সে দিনটি তাঁহার বৃথা গেল বলিয়া মনে করিতেন।

ন্যায়রত্ন তাঁহার পল্লী-ভবন হইতে নির্ব্বাসিত হইবার পর এ পর্য্যন্ত প্রাণ খুলিয়া কথা কহিবার লোক পান নাই। তাঁহার অন্তর্বেদনা বুঝিতে পারে, এবং সহানুভূতি প্রকাশ করে, এরূপ কোনও লোকের সহিত আত্মীয়তা স্থাপিত না হওয়ায় তাঁহার মনের সকল কথা মনের মধ্যেই গোপন ছিল; কবিরাজের সহিত তাঁহার আত্মীয়তা স্থাপিত হইলেও তিনি যে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে স্বীয় দুর্ভাগ্যের কাহিনী শুনাইবেন, ন্যায়রত্ন এরূপ প্রকৃতির লোক ছিলেন না। এক দিন অপরাহ্ণে কবিরাজ ন্যায়রত্নের শয্যাপ্রান্তে বসিয়া নানা প্রসঙ্গের আলোচনা করিতে করিতে বলিলেন, 'কয়েক দিন হইতে আপনাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিব মনে করিয়াও সঙ্কোচবশতঃ তাহা জিজ্ঞাসা করিতে পারি নাই, কিন্তু কথাটা জানিবার জন্য আমার বড়ই কৌতূহল হইয়াছে।'

ন্যায়রত্ন বলিলেন, 'এমন কি কথা কবিরাজ? তোমাকে গোপন করিতে হয়, এমন কথা আমার কিছুই নাই, তুমি অসঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করিতে পার।'

কবিরাজ বলিলেন, 'আপনার ন্যায় মহাপণ্ডিত শাস্ত্রজ্ঞ প্রাচীন ব্রাহ্মণ কন্যা সঙ্গে লইয়া এই সুদূর পল্লীতে কতকগুলি অশিক্ষিত নিরক্ষর চাষী গৃহস্থের মধ্যে অজ্ঞাতবাস করিতেছেন, ইহার কারণ কি, তাহা আমি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়াও স্থির করিতে পারি নাই।'

ন্যায়রত্ন দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, 'এই কথা?—দেখ কবিরাজ, আমি দৈব বিড়ম্বনায় আমার বাসগ্রাম ত্যাগ করিবার পর এই দীর্ঘ কালের মধ্যে এ কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করি নাই। যে কথা আমার নিজের কথা, যাহার সহিত সংসারের অন্য কোনও লোকের সুখ দুঃখের কোনও সংস্রব নাই, সেই তুচ্ছ ব্যক্তিগত কথার আলোচনা করিয়া অন্যের সময় নষ্ট করিবার আগ্রহও আমার নাই। তবে তুমি আমার হিতৈষী সুহৃদ, তুমি তাহা জানিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেছ বলিয়াই আজ তোমাকে আমার এই সুখ শান্তিহীন ব্যর্থ জীবনের কাহিনী বলিতেছি শোন—'

এইরূপ ভূমিকা করিয়া ন্যায়রত্ন তাঁহার পূর্ব্বকথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। প্রবলপ্রতাপ তালুকদার বিজয় দত্ত কাজি সাহেবের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহার ঘর বাড়ী ও যে কয়েক বিঘা লাখরাজ জমী ছিল, তাহা কাড়িয়া লইয়া মিথ্যা অভিযোগে তাঁহাকে গ্রাম হইতে বিতাড়িত করিয়াছে, এবং তিনি নিরাশ্রয়ভাবে একবস্ত্রে পথে পথে ঘুরিতে ঘুরিতে কিরূপে সদাশয় বলরামের আশ্রয় লাভ করিয়াছেন, তাহার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ কবিরাজের গোচর করিলেন। কবিরাজ

কৌতূহলপ্রদীপ্তহৃদয়ে নিস্তব্ধভাবে ন্যায়রত্নের ভাগ্যবিপর্য্যয়ের করুণ কাহিনী শ্রবণ করিলেন। সমস্ত ঘটনা তাঁহার উপন্যাসের ন্যায় অদ্ভুত বোধ হইল। সকল কথা শুনিয়া কবিরাজের হৃদয় সমবেদনায় পূর্ণ হইয়া উঠিল, তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, 'কি পৈশাচিক অত্যাচার! এই অত্যাচারের প্রতীকারের কি কোনও ব্যবস্থা হইতে পারে না?'

ন্যায়রত্ন বলিলেন, 'প্রতীকারের ব্যবস্থা আর কি হইবে? দরিদ্রের প্রতি সবলের অত্যাচারের প্রতীকার সহজ নহে। আমাদের দেশের দরিদ্রেরা প্রবলের শত অত্যাচার নীরবে সহ্য করিবার জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছে; তাহাই তাহাদের নিয়তি।'

কবিরাজ বলিলেন, 'কিন্তু এইরূপ নিশ্চেষ্টতা কি পুরুষকারের ব্যভিচার নহে? এই অত্যাচারের কথা নবাব বাহাদুরের গোচর করিলে কি কিছুই ফল পাওয়া যাইত না?'

ন্যায়রত্ন বলিলেন, 'আমার কর্ম্মফল আমি ভোগ করিলাম।'

কবিরাজ ঈষৎ উত্তেজিতস্বরে বলিলেন, 'বিলক্ষণ! এক জন অন্যায় অত্যাচার করিয়া আপনার সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইল, আপনার অপমান করিয়া, মিথ্যা কলঙ্কের ডালি আপনার মাথায় চাপাইয়া, আপনাকে বাসগ্রাম হইতে নির্ব্বাসিত করিল, আর আপনি কর্ম্মফল ভোগ করিলেন ভাবিয়া নিয়তির ঘাড়ে সকল দায়িত্ব চাপাইয়া নিশ্চিন্তমনে নির্ব্বাসনদণ্ড ভোগ করিতেছেন! অপূর্ব্ব যুক্তি বটে! কিন্তু আপনার এই যুক্তি মানিতে হইলে ত নরপিশাচেরা যথেচ্ছ অপরাধ করিয়া শাস্তি পায় না!'

ন্যায়রত্ন মৃদু হাসিয়া কবিরাজের মুখের দিকে প্রশান্তনয়নে চাহিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, 'এত ব্যস্ত হইয়া লাভ নাই কবিরাজ! তুমি স্থিরচিত্তে একটু ভাবিয়া বল দেখি, বাড়ী ঘর কি আমার? যদি আমার হইত তাহা হইলে তাহা আমারই থাকিত, কেহই তাহা আমার নিকট হইতে কাড়িয়া লইতে পারিত না।'

কবিরাজ বলিলেন, 'আপনি সংসারী; সংসারবিরাগী উদাসীন, যোগী তপস্বী নহেন; আপনি গার্হস্থ্যাশ্রমে আছেন, এখনও ঘর বাঁধিয়া সংসারে বাস করিতেছেন, অতএব সংসারীর মত কথা বলুন। বিজয় দত্ত তালুক বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছে, এই অধিকারে সে কি আপনার বাড়ী ঘর, আপনার পৈতৃক লাখেরাজ সম্পত্তি হইতে আপনাকে বঞ্চিত করিতে পারে?'

ন্যায়রত্ন বলিলেন, 'সংসারী সাজিয়া সংসারে বাস করিতেছি বলিয়া, যে সত্যের উপর সমস্ত সংসার নির্ভর করিতেছে, মোহের ঘোরে তাহা ত মিথ্যা বলিয়া উড়াইতে দিতে পারি না। তুমি যে অধিকারের কথা বলিতেছ, সে অধিকার তালুকদার বিজয়দত্তের নাই, তালুকদারের প্রজা আমারও নাই। বাড়ী বল, ঘর বল, বিষয় সম্পত্তি বল, আমার বলিতে এ সংসারে আমাদের কিছুই নাই। আমার পরিধানের এই বস্ত্র, আমার গাত্রের এই নামাবলীখানি, ইহাতে আমার কোনও অধিকার নাই। আমি নিজের কর্ম্মের দ্বারা যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া রাখিতেছি, আমার বলিতে সেই ক্ষেত্র আছে। আমার কর্ম্মফলে কেহ আমাকে বঞ্চিত করিতে পারিবে না,তদ্ভিন্ন আমার বলিতে আর কি আছে ? কিছুই নাই। মাঠের ক্ষুদ্র তৃণগাছটি হইতে জোত জমা, বিষয় সম্পত্তি, তালুক মুলুক সমস্তই মা জগদম্বার। আমরা তাঁহার 'রাখালী' বা জিম্মাদার। আমার ঘর, আমার বাড়ী, আমার জমীদারী, আমার রাজ্য—বলিয়া দীনতম প্রজা হইতে বহুবিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের অধীশ্বর পর্য্যন্ত সকলেই স্বার্থরক্ষায় ব্যস্ত, চারি দিকে কেবল আমার আমার রব ! কিন্তু মা যে দিন জবাব দিবেন—সে দিন এই আমার আমার ধ্বনি চির নীরব হইবে, ঘড় বাড়ী, বিষয় সম্পত্তি রাজ্য সমস্তই ফেলিয়া রাখিয়া কোথায় যাইতে হইবে জানি না, কিন্তু তিলার্দ্ধও বিলম্ব করিবার অবসর হইবে না ! সত্য যুগ হইতে একাল পর্য্যন্ত কত রাজার আবির্ভাব ও তিরোভাব হইয়াছে, কত মহাপরাক্রান্ত বাদশাহের উত্থান পতন হইয়াছে, কিন্তু রাজ্য যাঁহার—তাঁহারই আছে, কেবল হাতফের, কেবল 'রাখালী'র বদল হইয়াছে মাত্র। এই সনাতন সত্য তুমিও জান, আমিও জানি ; এমন কি, ঐ যে ভিখারী খঞ্জনী বাজাইয়া দেহতত্ত্বের গীন গাহিতেছে, সে-ও জানে। ঐ ভিক্ষুক মুখে বলিতেছে বটে—'মুদলে আঁখি, সকল ফাঁকি, মায়ায় বদ্ধ এ সংসার !'—কিন্তু ভিক্ষার ঝুলিটি সে অসার বলিয়া ত্যাগ করিতে পারে নাই। শুকদেব গোস্বামী ত্যাগীর আদর্শ হইয়াও কৌপীনখানি পাছে আগুনে পুড়িয়া যায়, এই আশঙ্কায় বিচলিত হইয়াছিলেন ! ত্যাগের আদর্শই ভারতের সনাতন আদর্শ। ভোগের ভিতর দিয়া ত্যাগের যে শিক্ষা, তাহাই প্রকৃত শিক্ষা ; এই জন্য পৌরাণিক যুগে জনক রাজা হইয়াও ঋষিত্ব লাভ করিয়াছিলেন, এবং ঐতিহাসিক যুগে কপিলবস্তুর রাজনন্দন সোনার সিংহাসনে পদাঘাত করিয়া যে পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহাই পৃথিবীর কোটী কোটী মানবের নিকট মোক্ষের পথ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে,কিন্তু তোতার মত কেবল 'বুলি আওড়াইয়া'

কোনও ফল নাই; হৃদয়ে আমরা যে সত্য উপলব্ধি করিব, কার্য্যে তাহা প্রয়োগ করিব, কথায় ও কার্য্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার চেষ্টা করিব। কিন্তু তুমি আমার কথা শুনিয়া এ কথা মনে করিও না যে, আমি সংসারের সকল লোককে ঘর বাড়ী বিষয় সম্পত্তি ত্যাগ করিয়া কৌপীন আঁটিয়া বনবাসী হইতে বলিতেছি। সংসারে থাকিয়া সংসারের নশ্বরতা ভুলিয়া ইহসর্ব্বস্ব হইলে আমাদের আত্মার অধঃপতন অনিবার্য্য'

ন্যায়রত্নের কথা শুনিয়া কবিরাজ নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া রহিলেন। এই মহতী বাণী দৈববাণীর ন্যায় তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিল। তিনি মনে মনে ন্যায়রত্নকে শতবার প্রণাম করিলেন, এবং তাঁহার ধর্ম্মভাব, উৎপীড়ককে ক্ষমা করিবার শক্তি, তাহার উদারতা ও আদর্শ চরিত্রের কথা চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন।

কবিরাজ প্রস্থান করিলে ন্যায়রত্ন সুমতিকে ডাকিলেন। তিনি রোগ-শয্যায় পতিত থাকিয়া কোনও দিন এত অধিক কথা বলেন নাই, কথায় কথায় তাঁহার ভাবের উৎস মুখ যেন খুলিয়া গিয়াছিল, তাই তিনি প্রাণের আবেগে কবিরাজকে এত কথা বলিতে পারিয়াছিলেন; কিন্তু ইহাতে তিনি অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন, সুমতি তাঁহার আহ্বানে তাঁহার শয্যাপ্রান্তে আসিয়া বসিলে তিনি চক্ষু মুদিয়া কিছুকাল নীরব রহিলেন। তাহা দেখিয়া সুমতি উৎকণ্ঠিতা হইয়া বলিল, 'বাবা, আমাকে ডেকেছো? এখন শরীর কেমন বুঝছো?'

ন্যায়রত্ন তাঁহার শীর্ণ হাতখানি ধীরে ধীরে তুলিয়া অবনতমুখী সুমতির মাথায় রাখিয়া মনে মনে তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, 'আমি কেমন আছি, তাই জিজ্ঞাসা করছো মা! সেই কথা বলতেই তোমাকে ডেকেছি। সুমতি, তুমি মনে কষ্ট পাবে ভেবে এত দিন বলি বলি করেও তোমাকে বলা হয় নি। কিন্তু আর তা না ব'লে থাকা যায় না। তোমার মা আমাকে ডেকেছেন, আমাকে শীঘ্রই তাঁর কাছে যেতে হবে। তাঁর ডাক শুনেছি, বুঝেছি—আমার আর বেশী বিলম্ব নেই।'

সুমতি পিতার কথা শুনিয়া অশ্রুসংবরণ করিতে পারিল না। সে বাষ্পরুদ্ধ-স্বরে বলিল, 'বাবা, তুমি ভিন্ন আমার আর কে আছে? তুমি আমাকে ফেলে গেলে আমি কার কাছে থাকবো?'

ন্যায়রত্ন কন্যাকে বিচলিত দেখিয়া কাতর হইলেন, তাহাকে সান্ত্বনা-দানের

জন্য বলিলেন, 'মা, আমার অভাবে তোমার কষ্ট হবে ভেবে কাঁদছো; কিন্তু কেঁদে ত নিয়তির গতিরোধ করা যায় না, মা! জন্ম হ'লেই মৃত্যুও হবে; জন্মের সঙ্গে মৃত্যুর নিত্য-সম্বন্ধ। কারও অল্প বয়সে মৃত্যু হয়, কেহ প্রাচীন বয়স পর্য্যন্ত বেঁচে থাকে, কিন্তু কাল পূর্ণ হ'লে কাহাকেও ধরে রাখবার উপায় নেই। আমার কাল পূর্ণ হয়েছে, শীঘ্রই আমাকে ইহলোক থেকে বিদায় নিতে হবে। তুমি কিছু দিনের জন্য সংসারে একা পড়বে, তোমার কিছু কষ্ট হবে, তা বুঝতে পারছি, কিন্তু সে কত দিনের জন্য? তার পর সেখানে তোমার মা গিয়েছেন, আমিও যাচ্ছি, সেইখানে তোমাকেও যেতে হবে। সেখানে আবার আমরা একত্র হব। এক সঙ্গে থাকব। তখন তোমাকে দুঃখ যন্ত্রণা কিছুই সহ্য করতে হ'বে না। তুমি দুঃখ করো না মা!'

কিন্তু সুমতি তাঁহার কথায় সান্ত্বনা লাভ করিতে পারিল না; তাহার মন বুঝিল না; সে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল, কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার পিতাকে বলিল, 'আমার দশা কি হবে বাবা! আমি যে তোমাকে ছাড়া আর কিছু জানিনে বাবা! এ সংসারে আর যে আমার কেহই নেই!'

ন্যায়রত্ন কিছু কাল নীরব থাকিয়া বলিলেন, 'আমাকে ভিন্ন তুমি আর কাহাকেও জান না, তা আমি জানি; কিন্তু তোমার ভয় কি? তোমার মা জগদম্বাই আছেন; বিপদে আপদে তাঁকেই প্রাণ ভরে ডেকো; কাতর-প্রাণে তাঁকে ডাকলে তিনিই তোমাকে রক্ষা করবেন।'

সুমতি বলিল, ''আমি মাকে জানিনে, আমি জানি তুমি বাবা, তুমিই মা। আমি ধর্ম্ম জানিনে অধর্ম্মও জানিনে; আমি জানি তুমি ধর্ম্ম, তুমিই স্বর্গ। আমি দেবতা জানিনে, আমি জানি তুমিই আমার জীবন্ত দেবতা। তোমার সেবা করতে হয়, তাই জানি। এত দিন তোমারই সেবা করে এসেছি। তুমি চলে গেলে আমি কার কাছে দাঁড়াব, কার সেবা করব?'

ন্যায়রত্নের হৃদয় কন্যার কথায় বিচলিত হইল। পুনর্ব্বার তিনি মায়া-মোহে আচ্ছন্ন হইলেন, বুঝিলেন, এই মায়া-পাশ ছিন্ন করা কত কঠিন। তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া দুই এক বিন্দু অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। তিনি কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে কি চিন্তা করিলেন, তাহার পর অতিকষ্টে শোকাবেগ সংবরণ করিয়া ধীর-স্বরে বলিলেন, 'দেখ মা, শোক দুঃখ ছায়ার মত সর্ব্বদা আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ফিরছে। পৃথিবীতে এমন লোক নেই, যাকে কখনও কোনও রকম শোক দুঃখ পেতে না হয়। এমন কোনও পরিবার নাই, যেখানে মৃত্যু এসে ভক্তি স্নেহের

পাত্রকে কেড়ে নিয়ে না গিয়েছে। দুঃখ দুর্দ্দিনে ভগবানের উপর আত্ম-সমর্পণ করা ভিন্ন শান্তিলাভের কোনই উপায় নাই মা! আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে, বেলা শেষ হ'লে, সূর্য্য পাটে বস্‌লে যেমন তাঁকে ধরে রাখা যায় না, সেই রকম আমার এই জীবন-সন্ধ্যায় আমাকে ধরে রাখা আমার এই জরাজীর্ণ দেহের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। আমাকে বিদায় দিতেই হবে। আমি তোমাকে একা এ সংসারে রেখে যাচ্ছি। তোমার কি দশা হবে, তা জানিনে; কিন্তু এ কথা মা স্থির জেনো যে, এখন যেমন তোমার কাছেই আছি, তোমাকে ছেড়ে গেলেও তেমনই তোমার কাছেই থাক্‌বো, কেবল আমার এই জড় দেহ তোমাকে ছেড়ে যাবে, তাই আমাকে তুমি দেখ্‌তে পাবে না, কিন্তু আমি তোমাকে সর্ব্বক্ষণই দেখতে পাব, এখন তুমি কোনও অপ্রীতিকর কাজ করলে যেমন আমি মনে বেদনা পাই, তখনও সেই রকম বেদনা পাব। আমার এই কথাগুলি মনে রেখে তুমি জীবনের পথে চল্‌বে।'

রোগের কোনও প্রতীকার হইল না। কবিরাজ পূর্ব্বে যেমন প্রতি দিন আসিতেছিলেন, সেইরূপ প্রতি দিন আসিয়া সযত্নে তাঁহার চিকিৎসা করিতেছিলেন, তাঁহার দীর্ঘ কালের অভিজ্ঞতালব্ধ সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ প্রয়োগে ন্যায়রত্নের রোগক্লান্ত জীর্ণ দেহে জীবনীশক্তি সঞ্চারিত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন; কিন্তু তাঁহার প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও রোগের উপশম না হইয়া প্রতিদিন তাহা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ক্রমে তাঁহার উত্থানশক্তি রহিত হইল; তাঁহার জীর্ণ দেহ যেন শয্যায় মিশিয়া গেল। সুমতির উদরে অন্ন নাই, নয়নে নিদ্রা নাই, সে দিবারাত্রি পিতার রোগ-শয্যায় বসিয়া অক্লান্তভাবে তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিল। কখনও দুধ, কখনও সরবৎ, কখনও একটু পেঁপে, কখনও বা এক টুকরা আক তাঁহার মুখে তুলিয়া দেয়। পিতা কিসে একটু সুস্থ থাকেন, তাহাই যেন তাহার একমাত্র চিন্তার বিষয় হইল। এই ভাবে কয়েক দিন অতিবাহিত হইল। ন্যায়রত্ন বুঝিলেন, তাঁহার জীবন-দীপ নির্ব্বাপিত হইতে আর অধিক বিলম্ব নাই; আসন্ন মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবার জন্য তিনি সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়া তাহার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

ক্রমশঃ।

শ্রীজীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

উৎকলে সূর্য্যপূজা।

সূর্য্য এক সময়ে আর্য্যদিগের প্রধান উপাস্য দেবতা ছিলেন। ভারতবর্ষে আসিবার পূর্ব্বে মধ্য-এসিয়ার সমতল ক্ষেত্রে আর্য্যদিগের আদিপুরুষগণ গললগ্নীকৃতবাসে সবিতার পূজা করিতেন। ঊষা নামে আর্য্যদিগের আর একটী দেবতা ছিলেন। অরুণোদয়ের সহিত পূর্ব্ব দিকে যে রক্তের ছটা ফুটিয়া উঠে, তাহাকে আর্য্যজাতির আদিপুরুষগণ ঊষা নামে অভিহিত করিতেন, এবং বোধ হয় সবিতার পরেই তাঁহার আসন ছিল। ভারতবর্ষে আসিয়াও আর্য্য জাতি আদিম দেবতা সবিতাকে ভুলেন নাই। যাঁহার হৃদয়-কন্দর হইতে পৃথিবী এবং গ্রহনিচয় উৎপন্ন হইয়াছে, যাঁহার মাধ্যাকর্ষণের বলে সৌরজগৎ চলিতেছে, সেই সবিতার পূজায় পৌত্তলিকতার লেশ নাই। যে অনন্ত শক্তি এবং অনন্তবীর্য্য সৌরজগৎকে নিয়ন্ত্রিত এবং পরিচালিত করিতেছে, তাহার উপমা নাই, তুলনা নাই, কেহই তাহার প্রতিভূস্বরূপ হইতে পারে না। সূর্য্য হইতেই বৃষ্টি হয়, এবং বৃষ্টি হইতেই শস্য তৃণ গুল্ম লতা বৃক্ষ এবং ওষধিনিচয়ের উৎপত্তি। সূর্য্য না থাকিলে নিবিড় অন্ধকারে উদ্ভিদ ও প্রাণিনিচয় মরিয়া যাইত। তাই সবিতার পূজা—শক্তি-পূজা। সবিতা প্রত্যক্ষ দেবতা। তাঁহার কিরণমালার উত্তাপ থাকিলেও সে উত্তাপে লোকের হিত ভিন্ন অহিত হয় না। তাই শক্তি পূজার প্রথম স্তরে যে ভয়জড়িত ভক্তি দেখা যায়, তাহা সবিতার উপাসনায় ছিল বলিয়া মনে হয় না। সূর্য্যের শক্তিনিচয় ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে কল্পনার বিকাশ আবশ্যক। সৌর জগতের দিকে চাহিয়া দেখিলে গ্রহ উপগ্রহ মণ্ডলীর আবর্ত্তন বুঝিতে যতটুকু বুদ্ধিমত্তার আবশ্যক হয়, তাহা একান্ত বর্ব্বর জাতির নাই। আর্য্যগণের সূর্য্যপূজা যে ভয়ত্রাণের কাকুতি মিনতি ছিল না, তাহার প্রমাণ ঋগ্বেদে রহিয়াছে। ঋগ্বেদ ভারতবর্ষে রচিত হয় নাই। মনীষীরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ঋগ্বেদে যে ঊষার বর্ণনা আছে, তাহা ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশে সম্ভবপর নয়। মেরুপ্রদেশে, যেখানে ছয় মাস দিন, এবং ছয় মাস রাত, সেখানে ঊষার ক্রম-প্রকাশের সহিত অন্ধকারের হ্রাস হয়, এবং বহু-কালব্যাপী ঊষালোক থাকে। সূর্য্য ফুটিয়াও ফুটেন না। মন্থরগতিতে সূর্য্যের রথ ধীরে ধীরে দিগ্বলয় অতিক্রম করিয়া আকাশে উঠিতে থাকে। মহাত্মা তিলক 'মেরুদেশে আর্য্যজাতি' নামক গ্রন্থে নানা যুক্তি দ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছেন

যে, ঋগ্বেদে যে ঊষার বর্ণনা আছে, তাহা মেরুপ্রদেশের সূর্য্যের ক্রমোত্থান ভিন্ন অন্য কিছুই হইতে পারে না। ঐ সকল যুক্তি তর্কের অবতারণা এ স্থানে অবান্তর হইবে। যদি আমরা মানিয়া লই যে, আর্য্য জাতি উত্তর মেরুর সন্নিকটে বসবাস করিবার সময় হইতে সূর্য্যের উপাসনা করিতেন, তাহা হইলে সূর্য্যপূজায় যে ভয়ের লেশমাত্র ছিল না, তাহা বেশ জোর করিয়া বলা যাইতে পারে। ছয় মাসব্যাপী অন্ধকার এবং শীতে জড়সড় হইয়া আর্য্যজাতির আদিপুরুষগণ একান্ত অনুরাগ এবং ভক্তির সহিত সূর্য্যোদয়ের প্রতীক্ষা করিতেন। আমার বোধ হয়, আর্য্যজাতির সূর্য্যপূজা যেরূপ আন্তরিক অনুরাগব্যঞ্জক, এরূপ অন্য কোনও দেবতার পূজা আদিম যুগে ছিল কি না সন্দেহ; কারণ, অন্য কোনও প্রাকৃতিক বিকাশের জন্য লোকে এত আকাঙ্ক্ষা এবং আগ্রহের সহিত পথ চাহিয়া বসিয়া থাকিত না। কত কাল ভারতবর্ষে সূর্য্যের পূজা অতি-প্রচলিত ছিল, তাহার কোনও প্রমাণ নাই। কি কারণে সূর্য্যের পূজা দেশ হইতে উঠিয়া যায়, তাহার কারণনির্দ্দেশও একান্ত দুরূহ।

বর্ত্তমান কালে প্রায় সকল পূজাতেই নবগ্রহের পূজা আছে। সেই সময় সূর্য্যের পূজা হইয়া থাকে। অর্থাৎ, উপদেবতা বলিয়া প্রায় সকল পূজায় সূর্য্যের পূজা হইয়া থাকে। কিন্তু প্রধান দেবতা বলিয়া সূর্য্যের পূজা আজ কাল আর দেখা যায় না। রামায়ণের সময় পর্য্যন্ত সবিতা যে প্রধান দেবতা বলিয়া গণ্য হইতেন, তাহার প্রমাণ আছে। শ্রীরামচন্দ্র রাবণবধের সময় আদিত্যহৃদয় দেবতার স্তব করিয়াছিলেন, বাল্মীকির রামায়ণে এ কথার উল্লেখ আছে। কৃত্তিবাসের রামায়ণে যে দেবীর পূজার উল্লেখ আছে, তাহা পরবর্ত্তী শাক্ত যুগে প্রক্ষিপ্ত হইয়া থাকিবে। কালিকা পুরাণের মতে, রাম রাবণবধের পর দুর্গার বিশেষ পূজা করিয়াছিলেন। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, বাল্মীকি-কথিত আদিত্যের উপাসনার সহিত দেবীপূজার কোনও বৈষম্য নাই। কারণ, বাল্মীকির মতে, রাম রাবণবধের পূর্ব্বে সূর্য্যের স্তব করিয়াছিলেন, এবং কালিকা পুরাণের মতে, রাবণবধের পর রাম দুর্গার পূজা করিয়াছিলেন। বাল্মীকি রামায়ণ পড়িলে আদিত্যের প্রসাদে রাম রাবণবধ করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। সুতরাং রামায়ণের সময় পর্য্যন্ত সূর্য্য যে আর্য্যদিগের প্রধান দেবতা ছিলেন, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। বাল্মীকির রামায়ণে দেখা যায় যে, সূর্য্য সূর্য্যবংশীয়দিগের আদিপুরুষ ছিলেন। যে সূর্য্যবংশের প্রতাপে ভারতভূমি এত কাল টলমল করিয়া আসিয়াছে, এবং যাহার বংশধরগণ আজিও

সামন্ত-রাজরূপে ভারতের দেশীয় রাজ্যনিচয় শাসন করিয়া আসিতেছেন, তাহার আদিপুরুষ সূর্য্য যে এক সময়ে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র পূজা পাইবেন, তাহাতে বিশেষ আশ্চর্য্য কি ?

বৈদিক যুগের অবসানে যখন নানা দেবদেবীর রূপ কল্পিত হইল, এবং তাঁহাদিগের পূজা বিধিবদ্ধ হইয়া দেশে প্রচারিত হইল, তখন হইতেই বোধ হয় সূর্য্যপূজার বহুল প্রচলন উঠিয়া যাইতে লাগিল। তবে লোকে রোগ শোক এবং দারিদ্র্য হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য রবিবার দিন সূর্য্যের মানসিক পূজা করিতেন। এইরূপ পূজার আজিও প্রচলন আছে। নিত্য নৈমিত্তিক পূজার বাঁধাবাঁধি নিয়ম এ পূজায় নাই। সূর্য্যের কবচ ধারণ করিলে কি হয়, তাহা ব্রহ্মযামল তন্ত্রে উল্লেখ আছে। সূর্য্যের কবচের মাহাত্ম্য শিব দুর্গাকে বলিতেছেন ;—'ইতি তে কথিতং দিব্যং ত্রিষু লোকেষু দুর্ল্লভম্। শ্রীপদং কান্তিদং নিত্যং ধনারোগ্যবিবর্দ্ধনম্। কুষ্ঠাদিরোগশমনং মহাব্যাধি-বিনাশনম্। ত্রিসন্ধ্যং যঃ পঠেন্নিত্যমরোগী বলবান্ ভবেৎ। বহুনা কিমি-হোক্তেন যদ্যন্মনসি বর্ত্ততে। তত্তৎ সর্ব্বং ভবত্যেব কবচস্য চ ধারণাৎ॥ ভূত-প্রেতপিশাচাশ্চ যক্ষগন্ধর্ব্বরাক্ষসাঃ। ব্রহ্মরাক্ষসবেতালা নৈব দ্রষ্টুমপি ক্ষমাঃ। দূরাদেব পলায়ন্তে তস্য সংকীর্ত্তনাদপি॥' সপ্তমী সংক্রান্তি এবং রবিবার সূর্য্য-পূজার পক্ষে প্রশস্ত। রোগ, শোক এবং দারিদ্র্য হইতে মুক্ত হইবার জন্য লোকে সূর্য্যপূজা করিয়া থাকে। সেরূপ পূজা বঙ্গদেশে এবং উড়িষ্যায় প্রচলিত আছে। তবে সর্ব্ব রোগের উপশমকর্ত্তা সূর্য্যদেবের পূজোপলক্ষে বঙ্গদেশে কুত্রাপি জাতীয় উৎসব বা সম্মিলন হয় না। আজিও উড়িষ্যায় সূর্য্য-পূজার দিনে একটী বৃহৎ উৎসব হইয়া থাকে। কোণার্কের কথা কে না জানেন ? যে মন্দিরের তক্ষণশিল্প আজিও বহু দূর দেশ হইতে কলাবিদ্যাবিশারদদিগকে উড়িষ্যায় আকৃষ্ট করিতেছে, তাহার খ্যাতি ভারতে সীমাবদ্ধ নয়। কৃষ্ণের পুত্র শাম্ব দুর্ব্বাসার শাপে কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হন, এবং তাঁহার পিতার পরামর্শে মিত্রবনে চন্দ্রভাগানদীতটে সূর্য্যের আরাধনা করিয়া স্বাস্থ্যলাভ করেন। ভবিষ্য পুরাণে এই উপাখ্যানের উল্লেখ আছে। শাম্বপুরাণ নামক উপপুরাণে এই আখ্যায়িকা সম্যক পরিস্ফুট হইয়াছে। কোণার্কের নিকটবর্ত্তী চন্দ্রভাগা নামে একটী স্বল্প-তোয়া নদী ছিল। বর্ত্তমান কালে তাহার স্রোত সাগর-সৈকত-বালুকায় নিবদ্ধ হইয়া লুপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছে। কেশরী রাজবংশীয় নরসিংহদেব এই নদীতীরে নয় শত শতাব্দীতে উড়িষ্যা রাজ্যের বার বৎসরের রাজস্ব ব্যয় করিয়া যে সূর্য্যের

মন্দির নির্ম্মাণ করেন, তাহার শিল্পকলা আজিও দেশবিদেশের শিল্পবিদদিগকে চমৎকৃত করিতেছে। উড়িষ্যায় যে পাঁচটি প্রধান ক্ষেত্র আছে, অর্কক্ষেত্র বা কোণার্ক তাহার মধ্যে অন্যতম। শিল্পকলার দিক দিয়া দেখিলে পুরীর মন্দির অপেক্ষা কোণার্কের মন্দির অনেক অংশে শ্রেষ্ঠ। যদি উড়িষ্যার তক্ষণশিল্পের চরম বিকাশ দেখিতে চান, তাহা হইলে কোণার্কের ভগ্নাবশেষের প্রস্তর স্তূপ এক একটী মূর্ত্তি বা মন্দিরগাত্রের প্রস্তরের ভগ্নাবশেষ খুঁজিয়া দেখুন। এই মন্দিরের সন্নিকটে চন্দ্রভাগাতীরে মাঘী সপ্তমীর দিনে এখনও বহু-সংখ্যক নরনারী সমবেত হইয়া সূর্য্যের উপাসনা করিয়া থাকেন। ব্রহ্মপুরাণ, কপিল-সংহিতা, প্রাচীমাহাত্ম্য, এবং মাদলা পাঞ্জীতে চন্দ্রভাগা-স্নানের ফল বিবৃত হইয়াছে। এক সময় সমবেত নরনারী চন্দ্রভাগায় স্নান করিয়া শুদ্ধ-চিত্তে, ঐকান্তিক নিষ্ঠার সহিত মন্দিরস্থিত সূর্য্য দেবতার উপাসনা করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিত। কিন্তু কালক্রমে কোণার্কের মন্দির ভগ্ন-স্তূপে পরিণত হইয়াছে, এবং সূর্য্য দেবতার চারু সিংহাসন এখন শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে। এখন লোকে মন্দিরপার্শ্বস্থিত নবগ্রহমূর্ত্তির পূজা করিয়া থাকে। সংবৎসর নির্জ্জনে অবহেলায় পড়িয়া থাকিয়া নবগ্রহমূর্ত্তিরা মাঘী সপ্তমীর দিন শত শত ভক্তের স্তুতিগানে মুখরিত প্রান্তরের দিকে নির্নিমেশনেত্রে চাহিয়া চাহিয়া যেন পূর্ব্বগরিমার স্পন্দনে প্রকৃতই উল্লসিত হন।

জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্॥
দিব্যশঙ্খতুষারাভং ক্ষীরোদার্ণবসম্ভবম্।
নমামি শশিনং ভক্ত্যা শম্ভোর্মুকুটভূষণম্॥

ইত্যাদি স্তোত্রপাঠে নির্জ্জন প্রান্তর মুখরিত হইয়া উঠে। পাঁচ সাত ঘণ্টা-ব্যাপী সমাগমে যে ভক্তির তরঙ্গ উঠে, অম্বুনিধি সংবৎসরে নানা তরঙ্গভঙ্গে সে তরঙ্গের অনুকরণ করিতে পারে না। জনসাধারণের বিশ্বাস, অর্কক্ষেত্রে মাঘী সপ্তমীতে স্নান এবং সূর্য্যোদয় দর্শন করিলে সর্ব্ব প্রকার পাপমুক্ত হওয়া যায়, এবং তাহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইয়া ধনে পুত্রে লক্ষ্মীলাভ হয়। মাঘী সপ্তমীতে অর্কক্ষেত্রে যে সূর্য্যপূজার বিধি আছে, তাহা কোণার্কে শিবপূজায় সমগ্র উড়িষ্যা দেশে, এমন কি গড়জাত মহলের অরণ্যসঙ্কুল প্রদেশেও ঐ দিন সূর্য্যের বিশেষ পূজা হইয়া থাকে। উড়িষ্যায় বিষ্ণু এবং শিবের পূজার যেরূপ অন্ন ভোগের ব্যবস্থা আছে, সূর্য্যপূজায়ও সেইরূপ অন্নভোগ হইয়া থাকে। সূর্য্যের কোনও

মূর্ত্তি পূজা দেখা যায় না। হরিদ্রাময় জল রাখিয়া সেই পাত্রটিকে একটি বেদীর উপর বসান হয়। সূর্য্যের যে প্রতিবিম্ব জলে প্রতিফলিত হয়, সেই প্রতিবিম্বকে উপলক্ষ্য করিয়া পূজা করা হয়। পরে খেচরান্ন এবং নানা প্রকার মিষ্টান্ন নিবেদন করা হয়। সূর্য্যের পূজায় মন্দার বা জবা ফুল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই বিশেষ পূজা করিলে শরীর নীরোগ হয়, এবং ধনাগমের পথ সুপ্রশস্ত হয়। উড়িষ্যায় মাঘী সপ্তমীতে যে সূর্য্যের বিশেষ পূজার প্রচলন আছে, তাহা অনেকেই জানেন না। তাঁহারা মনে করেন, উড়িষ্যার কোনও রাজা উৎকটব্যাধিমুক্ত হইয়া বা অন্য কোনও বিশেষ দায় হইতে উদ্ধার পাইয়া প্রতিশ্রুতির প্রতিদানস্বরূপ বহু অর্থব্যয়ে কোণার্কের মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। অথবা, কেশরীবংশে কোনও এক রাজা দৈবযোগে সূর্য্যোপাসক হইয়াছিলেন বলিয়া অর্ক-ক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। এরূপ ধারণা একান্ত ভ্রান্তিমূলক। কারণ, নিরবচ্ছিন্ন সূর্য্যোপাসক বা বিষ্ণুর উপাসক বলিয়া কোনও হিন্দু সম্প্রদায় ছিল না। যাজপুরের শক্তিক্ষেত্রে, দর্পণের গাণপত্য ক্ষেত্রে, পুরীর বৈষ্ণবক্ষেত্রে, ভুবনেশ্বরের শৈবক্ষেত্রে, এবং কোণার্কের সূর্য্যক্ষেত্রে অন্যান্য দেবদেবী বহু কাল হইতে পূজা পাইয়া আসিতেছেন। শৈবরাজগণ ভুবনেশ্বরের শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন বলিয়া তাঁহারা যে শক্তি কিংবা বিষ্ণুর অনাদর করিতেন, এরূপ নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। শ্রীযুত বিষণস্বরূপ তাঁহার 'কোণার্ক' নামক গ্রন্থে অর্কক্ষেত্রে যে সকল দেবদেবী পূজা পাইতেন, তাহার তালিকা দিয়াছেন। সূর্য্য এবং নবগ্রহ ভিন্ন মায়াদেবী, বামদেব, অষ্টশম্ভু, অষ্টচণ্ডী, এবং অরুণ অর্কক্ষেত্রে পূজিত হইতেন, এবং মাদলা পাঞ্জীতে তাঁহাদিগের ভোগের পরিমাণ পর্য্যন্ত উল্লিখিত আছে। অর্কক্ষেত্রে মাঘী সপ্তমীতে যে মেলা বসে, তাহা যদি সর্ব্বপ্রথমে রাজার আহ্বানে বসিয়া থাকে, তাহা হইলে প্রায় সমগ্র উড়িষ্যায় মাঘী সপ্তমীতে সূর্য্যের উৎসব কিরূপে এখনও চলিয়া আসিতে পারে, তাহার সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যায় না। আমার মনে হয়, শক্তি বিষ্ণু এবং শিবের উপাসনার সহিত বহু কাল হইতে সূর্য্যের উপাসনা এ দেশে চলিয়া আসিতেছে। যে সময় কোণার্কের মন্দির হয়, তখন সূর্য্য প্রধান দেবতা বলিয়া গণ্য হইতেন। সেই জন্যই নৃসিংহ দেব বহু ব্যয় করিয়া সূর্য্যের মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কালক্রমে সূর্য্যপূজার প্রচলন কমিয়া গিয়াছে। কিন্তু বঙ্গদেশে সূর্য্যপূজা যেরূপ লোপ পাইয়াছে, উড়িষ্যায় আজিও সেরূপ হয় নাই। পূর্ব্বের চালচলন এখনও উড়িষ্যার কোনও কোনও স্থানে রক্ষিত

হইয়াছে, তাই অনুসন্ধিৎসুর পক্ষে উড়িষ্যার বন জঙ্গলে অনেক লুপ্তরত্ন লুকায়িত রহিয়াছে। তাহাদিগের পুনরুদ্ধার করিলে ইতিহাসের ধারা প্রকাশিত হইবে। এবং সেই ধারার অবলম্বনে বঙ্গদেশের কেন, সমগ্র ভারতের পুর্ব্ব-গাথা গড়িয়া তোলা যাইতে পারে। মাঘী সপ্তমীতে যাঁহারা বিধিমত সূর্য্যের পূজা করিতে না পারেন, তাঁহারাও এক প্রকার উৎসব করিয়া থাকেন। প্রত্যূষে প্রাতঃস্নান করিয়া নদী কিংবা পুষ্করিণীর তীরে সাত মুষ্টি বালি দিয়া সাতটি ছোট ছোট মঞ্চ নির্ম্মাণ করিয়া তাহার উপর অপামার্গের শীর্ষ এবং নানা পুষ্প দিয়া সূর্য্যের উদ্দেশে পূজা করা হয়। সূর্য্যপূজার পর বাড়ী বাড়ী ভূরি ভোজনের আয়োজন হয়। মাঘী সপ্তমী উড়িষ্যায় বালকবালিকাদিগের একটী আনন্দের দিন।

পৌষ মাসের শুক্লাদশমীর দিন সূর্য্যের আর একটী বিশেষ পূজা হইয়া থাকে। এই পূজা উৎকলে প্রায় সমস্ত ব্রাহ্মণের বাড়ীতেই হইয়া থাকে। দিবা দ্বিপ্রহরের সময় হরিদ্রামিশ্রিত জলে সূর্য্যের যে প্রতিবিম্ব পড়ে, সেই প্রতিবিম্বের কোনও কোনও স্থানে পূজা হইয়া থাকে। আবার শালগ্রাম বা সূর্য্যনারায়ণকে বসাইয়া এই পূজা করিবারও বিধি আছে। সর্ষপ পুষ্প এই পূজার প্রধান উপাদান। পূজান্তে 'কাকরা', 'চকুলী' প্রভৃতি নানা প্রকার পিষ্টক, মিষ্টান্ন, এবং খিচুড়ী সূর্য্যদেবতাকে নিবেদন করা হয়। এই উৎসবের নাম শম্বর-দশমী। প্রবাদ আছে, শম্বর নামে এক অসুরকে সূর্য্য পরাস্ত করিয়া নিহত করেন। মৃত্যুকালে অসুর এই বর চাহিয়াছিল যে, বৎসরের মধ্যে একদিন সূর্য্যপূজার সহিত অসুরের নাম সংশ্লিষ্ট থাকে। তাই পৌষ মাসের শুক্লাদশমীর উৎসবের নাম শম্বর-দশমী। এই পূজায় শম্বরাসুরকে ভোগ দিবার ব্যবস্থা আছে। পুরাণে শম্বরাসুরের নাম আছে। কিন্তু সূর্য্য যে তাহাকে বধ করিয়াছিলেন, এ কথার উল্লেখ নাই। শ্রীকৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্ন বা মদন শম্বরাসুরের নিহন্তা হইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। শম্বরাসুর সে কথা জানিতে পারিয়া সূতিকাগৃহ হইতে প্রদ্যুম্নকে চুরী করিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করে। বিধির নির্ব্বন্ধে এক মৎস্য তাঁহাকে গিলিয়া ফেলে, এবং সেই মৎস্যের উদরে প্রদ্যুম্ন বাঁচিয়া থাকেন। পরে মৎস্য ধৃত হইয়া শম্বরের গৃহে নীত হয়। রতিদেবী মায়াবতী নামে অসুরের গৃহে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি মৎস্যোদরে পতিকে প্রাপ্ত হইয়া তাহাকে অতি যত্নে লালন পালন করেন, এবং সমস্ত আসুরিক মায়া শিক্ষা দেন। অনন্তর প্রদ্যুম্ন ষোড়শ বর্ষে পদার্পণ করিলে মায়াবতী তাঁহাকে তাবৎ বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করেন। তখন প্রদ্যুম্ন শম্বরের প্রাণনাশ করেন। অতএব

দেখা যাইতেছে, পৌরাণিক আখ্যানের সহিত লৌকিক প্রবাদের বিশেষ অমিল আছে। পূর্ব্বে বলিয়াছি, শ্রীকৃষ্ণ ও জাম্ববতীর পুত্র শাম্ব উৎকটরোগগ্রস্ত হইয়া সূর্য্যের প্রসাদে রোগমুক্ত হইয়াছিলেন। শ্রীশাম্বর পুরাণে রোগোপনয়ন-পরিচ্ছেদে ইহা স্পষ্ট লেখা আছে, যথা :—

এবমুক্ত্বা তু ভগবান্ ভাস্করো জগদীশ্বরঃ।
আমন্ত্র্য কৃষ্ণতনয়ং তত্রৈবান্তরধীয়তে॥
শাম্বোপি স্তবরাজেন স্তুত্বা সপ্তাশ্ববাহনম্।
পূতাত্মা নীরুজঃ শ্রীমাংস্তস্মাদ্রোগাদ্বিমুক্তবান্॥

আমার মনে হয়, লোকমুখে শাম্বদশমী—শম্বর-দশমী হইয়াছে। আর, লোকমত দেবাসুরের দ্বন্দ্বেই দেবতার শৌর্য্যবীর্য্যের প্রমাণ খুঁজিয়া থাকে। আর, শম্বরাসুরের নিহন্তা প্রদ্যুম্নের নাম অল্প লোকেই জানে, তাই উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে চাপাইয়া সূর্য্যপূজার সহিত শম্বরাসুরের বধ মিলাইয়া দিয়াছে।

রবিনারায়ণ বা সূর্য্যনারায়ণ ব্রত বলিয়া একটী ব্রত আছে। সধবা স্ত্রীলোকেরাই এই ব্রত করিয়া থাকেন। বৎসরের মধ্যে যে কোনও রবিবারে একাদশী পড়িলে এই ব্রত হয়। ব্রতের দিন সধবা স্ত্রীলোকেরা উপবাস করিয়া থাকেন। সূর্য্যাস্তের সময় পূজা আরম্ভ হয়। চাল ভাজা চূর্ণ করিয়া তাহার সহিত চিনি দধি সর এবং ছানা মিশ্রিত করিয়া সাতটী লাড়ু তৈয়ার করা হয়। এই সাতটী লাড়ু এবং অন্যান্য উপকরণ সূর্য্যকে নিবেদন করিয়া স্ত্রীলোকেরা অর্ঘ্য প্রদান করেন। পরে এই সাতটী লাড়ুর মধ্যে দুইটী লাড়ু খাইয়া তাঁহারা রাত কাটান। বাকী পাঁচটী লাড়ু নদী কিংবা পুষ্করিণীতে বিসর্জ্জন দিতে হয়। অন্যান্য মিষ্টান্ন ভোগ উপস্থিত দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে বিতরণ করা হয়। রবিনারায়ণ ব্রত করিলে সন্তান সন্ততির মঙ্গল হয়। রবিনারায়ণ ব্রত উৎকলের অনেক কুলললনা করিয়া থাকেন। আমি যতদূর জানি, বঙ্গদেশে এরূপ কোনও ব্রত নাই। নারায়ণ বা বিষ্ণুর পূজা বোধ হয় সূর্য্যপূজা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। তাহার প্রমাণ বিষ্ণুর ধ্যানে আছে। বিষ্ণুর ধ্যানে সূর্য্য-মণ্ডলবর্ত্তী পুরুষের উল্লেখ আছে।

ওঁ ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী নারায়ণঃ সরসিজাসনসন্নিবিষ্টঃ।
কেয়ূরবান্ কনককুণ্ডলবান্ কিরীটী হারী হিরণ্ময়বপুর্ধৃতশঙ্খচক্রঃ॥

সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী সূর্য্যদেবতা বোধ হয় কালক্রমে জগৎপালক নারায়ণ।

রূপে পরিচিত হন। প্রত্যেক পূজার প্রথমে গণেশের পূজা করিতে হয়। তার পর সূর্য্য প্রভৃতি দেবতার পূজা করিলে পূজক পূজার অধিকারী হন।

গণেশঞ্চ দিনেশঞ্চ বহ্নিং বিষ্ণুং শিবং শিবাং।
সম্পূজ্য দেবষট্কঞ্চ সোঽধিকারী চ পূজনে॥

সূর্য্যপূজা হইতে যে বিষ্ণুপূজার উৎপত্তি হইয়াছে, তাহার অনেক প্রমাণ আছে। সেই সকল প্রমাণ এখানে দেখাইবার আবশ্যক নাই। প্রত্যেক পূজার প্রথমে যে ছয়টী দেবতার পূজার বিধি আছে, তাঁহারাই বোধ হয় আর্য্যদিগের পুরাতন দেবতা। তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া কোনও পূজা সুসম্পন্ন হইতে পারে না। তবে যে সকল নূতন দেবতা আমাদিগের পূজা পাইতেছেন, তাঁহারাই এখন প্রধান হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। কিন্তু নূতনের উপাসনায় আমরা পুরাতনকে ভুলি নাই। আমাদিগের পূজাপদ্ধতিতেও বোধ হয় একটী ঐতিহাসিক ধারা আছে। আজ কাল আমরা সে ধারাটী ভুলিয়া যাইতেছি। কিন্তু হিন্দুর ধর্ম্মকর্ম্ম পরম্পরাবিহীন নয়। সকল বিষয়েই পুরাতনের সূত্র আছে। কোন কর্ম্মই বিচ্ছিন্ন বা অসংবদ্ধ নহে।

সূর্য্যের পূজা যে এক সময়ে উড়িষ্যায় অতিপ্রচলিত ছিল, তাহার আর একটী নিদর্শন আছে। এ দেশে শবর বলিয়া একটী জাতি আছে। তাহারা আচারে ব্যবহারে বর্ব্বর জাতির শ্রেণীভুক্ত। লোকে তাহাদিগের হাতে জল পর্য্যন্ত খায় না। কিন্তু এই বর্ব্বর জাতির মধ্যেও সূর্য্যপূজা বহু কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। শবরগণ আজ কাল চাষ করিয়া থাকে। কিন্তু মৃগয়া তাহাদিগের জাতিগত ব্যবসায়। আজিও বহুসংখ্যক শবর উড়িষ্যার বন জঙ্গলে মৃগয়ার দ্বারা জীবনধারণ করিতেছে। সাঁওতাল প্রভৃতি আদিম জাতির মত শবরগণ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং সত্যনিষ্ঠ। তাহারা মিথ্যাচার জানে না। লোক-দেখান হিসাবে কোনও কাজ করিতে পারে না। কোথা হইতে তাহারা সূর্য্যের পূজা শিক্ষা করে, তাহা বলা কঠিন; তবে আজ কাল সূর্য্যের পূজা ত সচরাচর দেখা যায় না। আর বনজঙ্গলে যে সকল শবর বাস করে, তাহারা এ দেশের উচ্চ জাতির সংস্পর্শে আসে না। কদাচিৎ গ্রামের ভিতরে আসে। আজ কাল যে সকল দেবতা সচরাচর পূজা পান, তাঁহাদিগকে শবরগণ মানে না। তবে শবরগণ কোথা হইতে সূর্য্যপূজা শিখিল? হয় ত সুদূর অতীতে উড়িষ্যায় সূর্য্যপূজার বিশেষ প্রচলন ছিল, এবং শবরগণ দেশব্যাপ্ত উপাসনার ছায়া অবলম্বন করিয়া নিজেদের ধর্ম্মজীবন গড়িয়া তুলিয়াছিল। অথবা জগৎপিতার

তেজঃস্বরূপ সূর্য্যকে শবরগণ আদিকাল হইতেই পূজা করিয়া আসিতেছে। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মমত উড়িষ্যায় প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, কিন্তু শবরকুল সে সকল ধর্ম্মমতের দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া পিতা প্রপিতামহের দেবতাকেই হৃদয়-সিংহাসনে জুড়িয়া রাখিয়াছে। পরে যাহা বলিব, তাহা হইতে দ্বিতীয় অনুমান যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয়। কোনও অনার্য্যজাতি যে ঋগ্বেদের আমলে সূর্য্যো-পাসনা করিত, তাহার প্রমাণ আমরা দেখিতে পাই না। মাঘ মাসের পূর্ণিমার দিন শবরগণ সূর্য্যের উৎসব করিয়া থাকে। ঐ দিন অতি প্রত্যুষে উঠিয়া স্ত্রী-পুরুষ, বালকবালিকা, সকলেই নিকটবর্ত্তী জঙ্গলে ফল মূল অন্বেষণ করিতে যায়, এবং সেই ফল মূলের কিয়দংশ খাইয়া সে দিন কাটায়। সন্ধ্যার সময় শবর-পল্লীর রাস্তার উপর কাষ্ঠের স্তূপে অগ্নি সংযোগ করিয়া একটী বৃহৎ অগ্নিস্তম্ভ করা হয়। সকাল বেলায় যে সকল ফল মূল আহরণ করা হইয়াছিল, তাহা ঐ অগ্নি-স্তম্ভে সূর্য্যের নামে সমর্পণ করা হয়। শবরগণ হাত ধরাধরি করিয়া বৃত্তাকারে সেই প্রজ্বলিত অগ্নিস্তম্ভের চারি দিকে নৃত্য করে,এবং সূর্য্যকে সত্য নিরঞ্জন নামে সম্ভাষণ করিয়া তাহাদিগের ভাষায় নানা স্তবস্তুতি করিতে থাকে। এই মাঘী পূর্ণিমার উৎসবই শবরদিগের প্রধান পূজা। শবরদিগের বিশ্বাস, মাঘী পূর্ণিমার দিন সূর্য্যের পূজা করিলে সংবৎসর বন্য ফল মূলের অপ্রতুল হয় না এবং শবরপল্লী মহামারী প্রভৃতি দৈব দুর্ব্বিপাক হইতে রক্ষা পায়। বাহ্য পূজা-বাহুল্য না থাকিলেও সূর্য্যের প্রতি শবরদিগের আন্তরিক ভক্তি ও অনুরাগের অনেক লক্ষণ দেখা যায়। সূর্য্য-গ্রহণের সময় শবরগণ অত্যন্ত ভীত এবং ব্যথিত হয়। যে সত্যনিরঞ্জন সূর্য্য শবরপল্লীর একমাত্র সহায়, তাঁহার রাহুগ্রাসপীড়ায় সমগ্র শবরপল্লী মর্ম্মাহত হয়। গ্রহণের সময় তাহারা কাজকর্ম্ম বন্ধ করিয়া একান্তমনে সূর্য্যের নিষ্কৃতি প্রার্থনা করে। গ্রীকদেশে এবং পূর্ব্ব কালের প্রায় সকল সমাজেই সূর্য্য-গ্রহণকে লোকে অমঙ্গলের পূর্ব্বলক্ষণ বলিয়া মনে করিত। শবরগণ সূর্য্য-গ্রহণকে অমঙ্গলের নিদর্শন বলিয়া মনে করে না। তাহাদিগের প্রিয়দেবতা শত্রুর করাল গ্রাসে কবলিত হইয়া মর্ম্মপীড়া পাইতেছেন, এই ধারণায় তাহারা শোকে দুঃখে অধীর হইয়া পড়ে। গ্রহণের সময় অনেক সরলহৃদয়া শবরনারী অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া থাকে। তাহাদিগের দুঃখ যে আন্তরিক, তাহাতে সন্দেহ নাই; কারণ, তাহারা সভ্যতার ছলাকলা জানে না। হাসেন হুসেনের জন্য শিয়া সম্প্রদায়ের ধনিগণ মহরমের সময় ভাড়া করিয়া ক্রন্দনকারী গায়কদিগকে শোভাযাত্রায় বাহির করেন। হাসেন হুসেনের জন্য মহরমের সময় যে

অশ্রুধারা বহে, তাহার তুলনায় শবরদিগের অশ্রুধারা কেমন স্বাভাবিক ও মর্ম্মস্পর্শী!

উড়িষ্যায় কন্দ নামক আর একটী অসভ্য জাতি আছে। উড়িষ্যায় কন্দমাল এবং অন্যান্য গড়জাতে এই জাতি দেখিতে পাওয়া যায়। গঞ্জামের অন্তর্গত ঘুমসর নামক স্থানে অনেক কন্দ আছে। এই কন্দজাতি কিছু দিন পূর্ব্বে বের পেন্নু বা পৃথ্বী দেবীর নিকট নরবলি দিত। ইংরাজরাজ বহু চেষ্টায় ও অর্থব্যয়ে নরবলি বন্ধ করিয়াছেন। এই কন্দজাতি বেল্ল পেন্নু ও সুণ্ডীপেন্নু নামে সূর্য্য চন্দ্রকে পূজা করিয়া থাকে। কন্দদিগের সমস্ত দেবদেবীর পূজায় বলিদানের প্রথা আছে। কিন্তু সূর্য্যচন্দ্রের কোনও বিশেষ পূজার বিধি নাই। সূর্য্য বা চন্দ্রমাকে প্রসন্ন করিবার জন্য কন্দগণ বলি প্রদান করে না। কিন্তু যে কোনও পূজা পার্ব্বণ বা উৎসবের পূর্ব্বে কন্দগণ প্রকাশ্যে সূর্য্যচন্দ্রমার স্তুতিবাদ করিয়া থাকে। হিন্দুর যে কোনও পূজারম্ভে যেরূপ সূর্য্যপূজার বিধি আছে, কন্দগণও সেইরূপ তাহাদিগের প্রত্যেক উৎসবে সূর্য্যের বন্দনা করিয়া থাকে।

'The sun and the moon are universally recognised as Deities by the Khonds, but no ceremonial worship is addressed to either. They are acknowledged by a simple reverence, which is paid to them when visible, upon every occasion of public solemnity whither religious or not.'—Lient Macpherson's Report upon the Khonds of the districts of Ganjam and Cuttack 1842.

সূর্য্যগ্রহণের দিন কন্দগণ পান ভোজন বন্ধ করে। দেবতার দুঃখে দুঃখিত হইয়া তাহারা সে দিন উৎসব বা সমারোহ করে না। কন্দগণ সূর্য্যকে সাক্ষী রাখিয়া সত্য গ্রহণ করে। এরূপ সত্যনিষ্ঠ জাতি আজ কাল একান্ত বিরল। লেফটেনেণ্ট ম্যাকফার্সন বলিয়াছেন যে, এমন কি, কন্দবালকগণও জাতীয় সত্য রক্ষা করিতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় না।

'In superiority to physical suffering the Khonds are surpassed by no people of whose manners that virtue has been the boast. In a period of suffering ranly paralelled, during which the people of Baramootah wasted for two months beneath famine, disease and the sword, no single Khond was found to falter in his devotion to the common cause and when at length the fathers of that tribe were betrayed and condemned to die with what admirable courage, what affecting resignation, what simple dignity, did they meet an ignominious fate on the sites of their ruined homesteads.'

সাঁওতালরা সবিতাকে সৃষ্টির আদি কারণ বলিয়া মনে করে। তাহারা সূর্য্যকে

সিং চান্দো এবং চন্দ্রকে নিন্দা চান্দো বলিয়া থাকে। সিং চান্দো এবং নিন্দা চান্দো সাঁওতালদিগের দেবতা। সাঁওতালেরা সৃষ্টি এবং প্রলয়ে বিশ্বাস করে। পূর্ব্বে [বোধ হয় সত্যযুগে] আকাশ পৃথিবীর অতি নিকটে ছিল। তখন ধানের শীষে চাল ফলিত, এবং শিমুল গাছে কাপড় ফলিত। পরিশ্রম করিয়া কায়ক্লেশে জীবনযাপন করিতে হইত না। কিন্তু লোকের অত্যাচারে যুগপরিবর্ত্তন হইল, এবং ঠাকুর জীবনযাত্রা কষ্টকর করিয়া তুলিলেন। তখন সিং চান্দো ও তাঁহার স্ত্রী নিন্দাচান্দো তাঁহাদিগের সন্তানসন্ততি তারাগণকে লইয়া আকাশের এক স্থানে বিরাজ করিতেন। দিবা রাত্রি তারা ও চন্দ্রমা সূর্য্যের কাছে দেখা যাইত। লোকে বাড়ীর সামনে ময়লা ও এঁটো পাতা ফেলিতে লাগিল। কোনও কোনও সাঁওতাল-রমণী গরুর সেবা করিয়া গোবর-হাত শিমুলগাছের কাপড়ে মুছিতে লাগিল। এই সকল দেখিয়া সিং চান্দো তুষের আবরণ দিয়া চাউকে ঢাকিলেন; এবং শিমুল গাছে কাপড় ফলা বন্ধ করিলেন। তাহাতেও লোকের চৈতন্য হইল না। এক দিন সিং চন্দো মহা ক্রুদ্ধ হইয়া তেজোমালা বিস্তার করিয়া জগৎ সংসার পুড়াইতে বসিলেন। তাঁহার স্ত্রী নিন্দাচান্দো অনেক মিনতি করিয়া একটী স্ত্রী এবং একটী পুরুষকে বাঁচাইলেন। তাহারাই বর্ত্তমান সাঁওতালদিগের আদি মিথুন। তাঁহাদিগের নাম পীলচু হারম ও পীলচু বুধি। সাঁওতালদিগের বিশ্বাস, সূর্য্য সমস্ত জীবের পাতা। তিনিই সকল জীবকে আহার দিয়া থাকেন। আর একটী মজার কথা বলিব। সাঁওতালরা পর-জন্মে বিশ্বাস করে। মৃত্যুর পর সুখ নাই। চান্দো দেবতা সদাসর্ব্বদা জীবাত্মা-দিগকে খাটাইয়া লন। যে সকল স্ত্রীলোকের পুত্রাদি হয় নাই, তাহাদিগকে পরজন্মে সমস্ত দিন খাটিতে হয়। কিন্তু যে সকল স্ত্রীলোক পুত্রাদি রাখিয়া গিয়াছে, তাহাদিগকে স্তন্যদান করিবার জন্য মাঝে মাঝে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ইহজন্মে যাহাদিগের দোক্তা পাতা খাওয়া অভ্যাস, তাহারাও কাজের মাঝে দোক্তা খাইবার জন্য অবসর পায়। কিন্তু ধূমপায়ীর অবসর নাই। মেয়ে মানুষ মরিলে চুরণী হয়। সেই সকল চুরণীর হাতে পড়িলে আর নিস্তার নাই। মেয়ে মানুষ মরিলে তাহাদিগের পায়ে লোহার শলাকা মারিয়া দেওয়া হয়। ঐরূপ শলাকা মারিয়া দিলে ভূত হইয়াও তাহারা অতি ধীরে চলাফেরা করে। দৈবযোগে কোনও লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইলে চুরণী তাহাকে দৌড়িয়া ধরিতে পারে না। [Legends and customary beliefs of the Santals, Folklore of the Santal Parganas by C. H. Bompas, page

401—17] চান্দো দেবতা ইহলোক এবং পরলোক আয়ত্ত করিয়া রাখিয়াছেন। তিনিই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্ত্তা, এবং জগতের মালিক।

উৎকলে একটী সন্ন্যাসী সম্প্রদায় আছে, তাহার নাম কুম্ভিপটুয়া, বা অলেখ-ধর্ম্মী। এই সম্প্রদায়ের সাধুরা কুম্ভি নামক বৃক্ষের ছাল বা পটুয়া পরিধান করেন বলিয়া তাঁহাদিগের নাম কুম্ভিপটুয়া হইয়াছে। তাঁহাদিগের সংখ্যা কত, তাহা নির্ণীত হয় নাই। তবে যত দূর জানা যায়, তাঁহাদিগের সংখ্যা খুব বেশী নয়। ঢেঙ্কানল নামক করদরাজ্যের অন্তর্গত জারিনা নামক স্থানে তাঁহাদিগের প্রধান আড্ডা। এই সম্প্রদায়ের একটী নিয়ম এই যে, প্রত্যেক ব্রহ্মমুহূর্ত্তে উঠিয়া স্নানাদিসমাপনান্তে সূর্য্যের স্তব করেন। সূর্য্যাস্তের পর এই সম্প্রদায়ভুক্ত কেহই পান ভোজন করেন না। এই সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসীরা হিন্দুর দেব দেবতার, এমন কি, জগন্নাথ মহাপ্রভুরও প্রসাদ গ্রহণ করেন না। কোনও গৃহস্থের বাটীতে ভিক্ষালব্ধ আহারীয় পাইলে রাস্তায় বাহির হইয়া তাহা ভক্ষণ করেন। সন্ন্যাসীদিগের মস্তকে তালপত্রের বড় পাখাকে ভাঁজ করিলে যেরূপ হয়, সেইরূপ এক প্রকার ছত্র থাকে, এবং হস্তে কমণ্ডলু ও বিশাল যষ্টি থাকে।

বেণী ঘড়ি রাত আউ স্নান করুথিবে।
উদে অস্ত রবিবিম্ব দর্শন করিবে॥
অস্তবেলে সেহি পরি দণ্ডমাত্র যাই।
নমস্কার করুথিবে অস্তগিরি ধ্যাই॥
অগ্নি দেবতাকু কিছি অল্পে মানুথিবে।
অন্য দেব দেবী কেহি কিছিন মানিবে॥—যশমতী মালিকা।

অনেকে বলেন, অলেখ ধর্ম্ম বৌদ্ধ ধর্ম্মের শাখামাত্র। বুদ্ধের জন্মের পূর্ব্বে সূর্য্য ও অগ্নিদেবের পূজার প্রচলন ছিল। ললিতবিস্তর নামক গ্রন্থে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। বৌদ্ধগণ হিন্দু দেবতার মধ্যে সূর্য্য এবং অগ্নিকে সমধিক ভক্তি করিতেন। বৌদ্ধভাবাপন্ন অলেখধর্ম্মীরাও সূর্য্য এবং অগ্নির উপাসনা করেন, অন্য কোনও দেবতাকে মানেন না। যশমতী মালিকায় অলেখ-সম্প্রদায়ের যে সকল নিয়মাবলী লিপিবদ্ধ আছে, তাহা বৌদ্ধসঙ্ঘের নিয়মাবলীর অনুরূপ।

স্বজাতি যে কুলধর্ম্ম সমস্ত ছাড়িবে।
হোমকর্ম্ম যাগ ক্রিয়া সকল ত্যজিবে॥
দারাসুত বিত্তব্রত ক্রিয়া ত্যাজ্য করি।
কুম্ভিপট পিন্ধি শিরে বিরে জটাধরি॥

জম্বুদ্বীপে মহিমাঙ্ক বীজ সে বুনিবে।
নিজ ব্রহ্ম গুরুপদে আনন্দ লভিবে॥
অনাকার মহিমা নামকু করি শিক্ষা।
নব শূদ্র ঘরে মাগি খেলুথিবে ভিক্ষা॥

তেলী তন্তী ভাট কেরা রজক কুলারক।
ব্রহ্ম ক্ষেত্রী চণ্ডাল যে অবুরিলা পিক ॥
এহি নব জাতি ঘরে ভিক্ষা ন ঘেনিবে।
অশুদ্ধ এমানে শাস্ত্রে লেখিয়ছি পূর্ব্বে ॥
এমানে অটন্তি অধা জন্মর জাতকি।
তেনু করি নব শূদ্রে বাছিরখিছন্তি ॥
নব শূদ্র অটন্তি প্রভুঙ্ক নিজ দাস।
তাঙ্ক ঘরে অন্নভিক্ষা ন লাগই দোষ ॥
মহা প্রকাতেজরে যে হই যাই ভস্ম।
শূদ্র ঘরে ভিক্ষা কলে নাহি তাঙ্ক দুষ্য ॥
নব শূদ্র ঘরে অন্ন ভিক্ষাকু ভুঞ্জিবে।
নগর বাহারে কাল নিদ্রাকু কাটিবে ॥
দিবসরে নিদ্রাকলে কাল করে বাস।
রাত্রে অন্নভোজন আহারে হয় দোষ ॥
প্রভুঙ্কর ভক্ত যে দিবসে ভুঞ্জিবে।
রাত্রে উপবনে যমকালকু জগিবে ॥
নিশি উজাগরে রহি ধুনি কি জানিবু।
পক্ষিণ প্রকৃতি তেবে পাংশ করিবু ॥
জপ নাহি তপ নাহি উদাসী ভাবরে।
একা মহিমাকু নাম জপিবু হৃদরে ॥

উড়িষ্যায় সূর্য্যপূজার যে সকল প্রমাণ পাইয়াছি, তাহা প্রবন্ধে লিখিলাম। তবে এ প্রবন্ধকে কোনওক্রমে সম্পূর্ণ বলা যাইতে পারে না। বর্ত্তমান সূর্য্য-পূজার বিধি, মন্ত্র ও উপকথা সংগ্রহ করিতে হইলে বহু পরিশ্রম আবশ্যক। এ কাজ কোনও ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা সম্ভবপর হইবে না। গবেষণার প্রসার বাড়াইতে হইলে লোকবল আবশ্যক।

শ্রীসতীন্দ্রনারায়ণ রায়।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

তত্ত্ববোধিনী। শ্রাবণ।—'তব নামে' সম্পাদক শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত একটি ব্রহ্মসঙ্গীত।—বিশেষত্ব নাই। ক্ষিতীন্দ্রবাবুর 'ব্রাহ্মসমাজের প্রয়োজন' সাম্প্রদায়িক সন্দর্ভ। শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্তের 'প্রার্থনা' 'তব নামে'র জুড়ীদার। শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ডাক্তার সার রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকরের 'পরমেশ্বর বিশ্বরক্ষকে'র ও 'ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী'র অনুবাদ দিয়াছেন। শ্বেতাশ্বতরের মারাঠী অনুবাদ ও তাহার ব্যাখ্যার অনুবাদ। শ্রীমন্মথনাথ ঘোষের 'পণ্ডিত প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী' নামক প্রবন্ধের নামকরণে মৌলিকতা আছে। প্রসন্নবাবুর 'পণ্ডিত' বিশেষণটি সম্পূর্ণ মৌলিক। প্রসন্নবাবু 'বিদ্বান' ছিলেন, তাঁহার 'পণ্ডা'রও অভাব ছিল না, তাহা কে অস্বীকার করিবে? মন্মথবাবু ও কি সেই অর্থে 'পণ্ডিত' ব্যবহার করিয়াছেন? অথবা সর্ব্বাধিকারী মহাশয় সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল হইয়াছিলেন বলিয়া অগত্যা তিনি 'পণ্ডিত' হইলেন? আমরা জানিতাম, তিনি ইংরেজীনবীশ ছিলেন। বাবু রসময় দত্তও কিছু কাল সংস্কৃত কলেজে কর্ত্তৃত্ব করিয়াছিলেন। তিনিও কি 'পণ্ডিত'? অথবা, মন্মথবাবু প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী মহোদয়ের এই অজ্ঞাতপূর্ব্ব পরিচয় দিবার জন্যই কলম ধরিয়াছেন? মন্মথবাবু খানিপুরের আমোল হইতে সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের পুর্ব্বপুরুষগণের 'কাহিনী' আরম্ভ করিয়াছেন। দশরথের অধস্তন দ্বাদশ পুরুষ [illegible] উড়িষ্যার দেওয়ান বা শাসনকর্ত্তা

নিযুক্ত হন। জীবনচরিত-কার এই অপূর্ব্ব ইতিহাসের ঐতিহাসিক প্রমাণগুলি উদ্ধৃত করিলেন না কেন? জাতির পক্ষে তাহা যে আবশ্যক। 'তত্ত্ববোধিনী'তে এবার 'Worship' নামক একটি ইংরেজী প্রবন্ধ উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহাও নূতন। অনুবাদ দিলে ভাল হইত না? 'বালগঙ্গাধর টিলক প্রণীত গীতা-রহস্য—সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ' চলিতেছে।

ভারতী। শ্রাবণ।—শ্রীবিমলাচরণ মৈত্রের 'রূপম্' নামক পত্রে প্রকাশিত, শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয় কর্ত্তৃক ইংরেজী ভাষায় রচিত 'বিষ্ণুবাহন গরুড়' নামক প্রবন্ধের অনুবাদ করিয়াছেন। শ্রীঅশীতিপর শর্ম্মা 'বিকর্ণ কি শঙ্কুকর্ণ' প্রবন্ধে যে রসের উদ্গার করিয়াছেন, তাহা ভদ্রসমাজের অযোগ্য। আমাদের তাহা ঘাঁটিবার প্রবৃত্তি নাই। পরের ধর্ম্মকে গালি দিতে নাই, সভ্য-সমাজে এই ধরণের একটা অনুশাসন ছিল। 'অশীতিপর শর্ম্মা' তাহাও ভুলিয়াছেন। এ যুগেও যাহারা অন্যের ধর্ম্মকে আক্রমণ করে, তাহারা কৃপার পাত্র। তাহাদের বেয়াদবীর উত্তর সম্মার্জ্জনী নয়, চাবুক নয়,—পাদুকা। 'অশীতিপর শর্ম্মা' লিখিয়াছেন,—'নবকুমার কোম্পানির এই একটা বিশেষ বাহাদুরির লক্ষণ সকলেই লক্ষ্য করে থাকবেন যে তাঁরা বয়োজ্যেষ্ঠের সম্মান করেন না, সত্যেরই নাকি সম্মান করে থাকেন।' বাপ-পিতামহ একটা প্রকাণ্ড সত্য, এবং সেই পরিচয়ে নিজের পরিচয়, আশা করি, 'নবকুমার কোম্পানীরা'ও তাহা অস্বীকার করিবেন না! কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই 'সত্যে'র দালালেরা ইতরের ভাষায় প্রতিপক্ষকে গালি দিবার সময় এই 'পরম সত্য'টাই গোপন করেন। কেহ অশীতিপর শর্ম্মা, কেহ গোস্বামী, ইত্যাদি খোলস পরেন। তাহাতে 'সত্য' কি বড় উজ্জ্বল হইয়া উঠে? যাহারা আপনার পরিচয়ের সত্যটুকু সূর্য্যালোকে প্রকাশ করিতে পারে, তাহারা হনুমানের পূজক হইলেও, 'সত্য' তাহাদিগের প্রতি অপ্রসন্ন হইবেন না। কিন্তু যাহারা অসত্য-পরিচয়ে বংশ হইতে সত্যকে চিরনির্ব্বাসিত করিতেও কুণ্ঠিত—সঙ্কুচিত—লজ্জিত হয় না, তাহারা উপনিষদের বরপুত্র হইলেও মিথ্যার দাস, এই 'সত্য'টাও ত কোনও মতে অস্বীকার করা যায় না। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেনের 'শিখের ইতিহাসে শিবাজী ও আফজল খাঁ' উল্লেখযোগ্য।

পল্লী-বাণী। শ্রাবণ।—প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীনিখিলনাথ রায় মহাশয় 'পল্লী-বাণী'র সম্পাদকতা গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু 'পল্লী-বাণী'তে তাহার কোনও লক্ষণই দেখিতে পাইতেছি না। এই সংখ্যায় সাতটি কবিতা, একটি গান, একুনে আটটি 'কাব্যি' ও দুইটি গল্প ও দুইটি উপন্যাস আছে। কবিতায় ও গল্পেই 'পল্লী-বাণী' নিঃশেষিত হইয়াছে। কোনও রচনাতেই বিশেষত্ব নাই। অধিকাংশই জঞ্জালের মত। যেন পল্লীর খাদ ভরাট করিবার জন্যই ছাপা হইয়াছে। একটি প্রবন্ধ আছে,—শ্রীযতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আমাদের পল্লীকথা'। প্রবন্ধটি পড়িয়া বাইবেল মনে পড়িল,—'আদিতে বাক্য ছিল, সেই বাক্যই ঈশ্বর হইল।' সমস্ত প্রবন্ধটিই বাক্য—'শতত্তালিযুক্তা জীর্ণতরী' আছে; 'বীচিবিভঙ্গের স্পর্শসুখ' আছে; কিন্তু জানিবার কথা বড় বড় বাক্যেই আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। 'পল্লী-বাণী' নিখিলবাবুকে বলিতে পারে,—

'উচল বলিয়া অচলে চড়িনু, পড়িনু অগাধ জলে।'

প্রাচীন বাঙ্গালায় ভূমিবিক্রয় প্রথা।

এই পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যায় 'প্রাচীন বাঙ্গালার কয়েকখানি ভূমিবিক্রয় দলীল' শীর্ষক এক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে খৃষ্টীয় পঞ্চম হইতে সপ্তম শতাব্দার মধ্যে উত্তরবঙ্গে ও পূর্ব্ববঙ্গে প্রচলিত ভূমিবিক্রয় দলীলের লিখন-প্রণালীর আদর্শ বা নমুনা প্রদত্ত হইয়াছে, এবং সেই নমুনার উদাহরণরূপে দশখানি প্রাচীন দলীলের সংক্ষিপ্ত বিবরণও প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা সেই লিপিদর্শক হইতে প্রাপ্ত তৎকাল-প্রচলিত ভূমিবিক্রয় প্রথার ও প্রসঙ্গ-লব্ধ অন্যান্য বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

প্রথম প্রবন্ধে উল্লিখিত ও আলোচিত শাসনগুলির মধ্যে 'ঘ'-চিহ্নিত তাম্র-শাসনখানি ব্যতীত অন্য নয়খানি শাসনকে আমরা 'ক্রীত-ভূমির দানপত্র' ('combined deed of purchase and gift') বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছি। তাহাতে কতকগুলি দলীলের (যথা ১নং, ৪নং, ক, খ ও গ তাম্রশাসন) যে সংক্ষিপ্তসার প্রদত্ত হইয়াছে তাহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, ভূমিক্রয়-প্রার্থিগণকে—রাজকর্ম্মচারীই হউন বা অন্য কেহই হউন, এমন কি স্বয়ং বিষয়পতিকেও ('গ'-শাসন দ্রষ্টব্য) এবং গ্রামিককেও ('ঘ'-শাসন দ্রষ্টব্য)—কেবল যে ভুক্তি বা বিষয়ের শাসনাধিকরণের সমক্ষেই ক্রয়-প্রার্থনা বিজ্ঞাপিত করিতে হইত তাহা নহে, তাঁহাদিগকে সঙ্গে সঙ্গে তত্তৎ স্থানের মহত্তরগণকে ও গ্রামের অষ্টকুলাধিকরণ, গ্রামিক, ও অন্যান্য প্রধান প্রধান কুটুম্বিগণের নিকটও ক্রয়-প্রার্থনা জানাইতে হইত। আবার অবশিষ্ট দলীলগুলিতে (যথা, ২—৩ নং ও ৫—৬ নং) দেখা যায় যে, ক্রেতাদিগকে কখনও কখনও স-সদস্য [জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যার ৮০ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য] বিষয়াধিষ্ঠানের (বিষয়ের রাজধানীর) রাজ্যশাসন-পরিষদের বা অধিকরণের নিকট অগ্রসর হইয়া ভূমিক্রয় প্রার্থনা বিজ্ঞাপিত করিতে হইত। এমন কি, 'ঘ'-চিহ্নিত তাম্রশাসন হইতেও দেখা যায় যে, তাম্রপট্ট-ধর্ম্মানুসারে বিনামূল্যে ভূমি পাইতে অভিলাষী হইয়া প্রার্থয়িতা ব্রাহ্মণকে বিষয়াধিকরণ সমক্ষে এবং তৎসঙ্গে বিষয়-মহত্তর ও অন্যান্য প্রধান প্রধান ব্যবহারিগণের নিকটও আবেদন করিতে হইয়াছিল। উল্লিখিত শাসন-দশকের মধ্যে পাঁচখানির কোনও কোনটিতে কোটিবর্ষ-বিষয়ের অধিষ্ঠানাধি-

করণের এবং অন্য কোনও কোনটিতে বারিকমণ্ডল-বিষয়ের অধিকরণের মোহর বা মুদ্রাসংযুক্ত দেখিতে পাইয়াছি। ইহাও লক্ষিত হইয়াছে যে, বিক্রীয়মান ভূমি কখনও ক্ষেত্রভূমি, কখনও খিল-ভূমি ছিল। এই সকল তথ্য হইতে সহজেই একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়—'এই বিক্রীত ভূমিখণ্ড সকলের মালিক বা স্বত্বাধিকারী কে বা কাহারা ছিলেন?' যদি উত্তরে এইরূপ মনে হয় যে, এইগুলি রাজার ভূমি; তাহা হইলে এই প্রসঙ্গে দ্বিতীয় প্রশ্নের উদয় হইবে—'কেন সরকারপক্ষ বা রাজপক্ষ প্রজাদিগের প্রতিনিধি বিষয়-মহত্তর, গ্রাম-মহত্তর ও অন্যান্য ব্যবহারিগণের এবং এমন কি কখনও কখনও সমগ্র প্রকৃতি-বর্গের অনুমতি বা অনুমোদন ব্যতিরেকে এই ভূমিখণ্ডগুলি বিক্রয় করিতে বা হস্তান্তর করিতে পারিতেন না? কেন গবমেণ্ট এই 'অপ্রদ', 'অপ্রহত' (অকৃষ্ট) জমীর হস্তান্তরকরণ ব্যাপারে সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিজের উপর লইতেন না?' এইরূপ প্রশ্নের এক ভাবে এই উত্তর দেওয়া যাইতে পারে যে, এই বিক্রীয়মান ভূমিখণ্ডগুলি কেবল সরকারের অধিকার-ভুক্ত ছিল না—সমগ্র গ্রামের বা গ্রামসমিতির অধিকারভুক্ত ছিল—কাজেই গ্রামের বা সমিতির প্রতিনিধিবর্গের সম্মতি ব্যতীত ইহাদের হস্তান্তরকরণের ব্যবস্থা হইতে পারিত না। রাজপক্ষ বা গ্রামবৃদ্ধগণ, কেহই পরস্পরের অনুমতি ও বিক্রয়-সম্পাদন-সময়ে পরস্পরের উপস্থিতি ছাড়া ভূমি বিক্রয় করিতে পারিতেন না। 'ক'-চিহ্নিত দলীলে স্পষ্ট উল্লিখিত পাওয়া যায় যে, এইরূপ বিক্রয়-ব্যাপারে ধর্ম্মানু-সারে মূল্যের ষষ্ঠ ভাগ মাত্র রাজার প্রাপ্য ['পরম-ভট্টারকপাদানামত্র ধর্ম্ম-ষড়্-ভাগলাভঃ'—১৩ পংক্তি] হইত। ইহা হইতে এইরূপ অনুমিত হইতে পারে যে, মূল্যের অবশিষ্ট পাঁচ ভাগ গ্রাম-সমিতির কোষগত হইত। তবে কি বিক্রীত ভূমিতে, রাজা ও প্রজা, উভয়ের স্বত্ব সংমিশ্রিত ছিল?

এই স্থলে অন্য একটি তর্ক উপস্থাপিত হইতে পারে যে, যে সকল ভূমিখণ্ডের বিক্রয়-ব্যাপারে বিক্রয়-লব্ধ মূল্যের ষষ্ঠাংশ মাত্র রাজকোষে জমা দিলে, দলীলে রাজানুমোদন রূপে রাজমুদ্রার লাঞ্ছন প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারিত, কেবল রাজাই তাহাদের সম্পূর্ণ মালিক এবং তিনি কেবল অর্থশাস্ত্রের ও স্মৃতিশাস্ত্রের নিয়মানুসারে ভূমিখণ্ডগুলির বিক্রয়-বিষয়ে প্রজাদিগের প্রতিনিধি মহত্তরগণের ও গ্রামসম্বন্ধীয় অন্যান্য কর্ম্মকর্ত্তাদের সম্মতি বা অনুমোদন গ্রহণ করিতেন, কারণ, সেই সকল শাস্ত্রে বিহিত আছে (১) যে, প্রতিবেশিজনের ও গ্রামবৃদ্ধ-

(১) কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রে' (দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৬৬ পৃঃ) উক্ত হইয়াছে—'সামন্ত-

গণের সাক্ষ্য ও বিচার লইয়া বাস্তুবিবাদের নির্ণয় করিতে হইবে। কিন্তু এরূপ তর্কের বল অত্যন্ত অধিক নহে, কারণ, এই প্রকার প্রথা যে সমস্ত ভূমিখণ্ড রাজার নিজ খাস-অধিকারে থাকিত, এবং যাহা তিনি সাধারণ ভাবে কোনও বিশেষ হেতু উপলক্ষ করিয়া ব্রাহ্মণাদিগকে দান করিতেন, সেই সমস্ত ভূমিখণ্ডের বিক্রয়-সম্বন্ধেই বিশেষভাবে প্রচলিত হইত বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। সেই প্রকার দানপত্রে (২) দেখা যায় যে, দানকারী রাজা প্রতিবেশিজনগণকে ও রাজানুজীবিগণকে বিজ্ঞাপিত করিতেছেন যে, তিনি অমুক অমুক স্থান বা গ্রাম, অমুক অমুক ব্রাহ্মণ বা অমুক সভা-সমিতিকে প্রদান করিতেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আদেশ প্রচার করিতেছেন যে, শাসন-সম্পাদন-সময় হইতে প্রদত্ত ভূমিসম্বন্ধে রাজপ্রাপ্য ভাগ, ভোগ, কর, হিরণ্য, প্রত্যায় প্রভৃতি প্রতিগ্রহীতাকে প্রদান করিতে হইবে। আরও এক কথা—উপরি উক্ত ভাবে তর্কে অগ্রসর হইলে, বিক্রীত ভূমির মূল্যের অবশিষ্ট পঞ্চ-ষষ্ঠ ভাগ কে পাইবেন, তাহা স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া কঠিন হইয়া পড়ে।

গ্রামসমিতি দ্বারা (village assemblies) গ্রামের শাসনকার্য্য পরিচালনা দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড় সভ্যতার এক প্রধান কথা। তাহাতে প্রজাতন্ত্রের মাহাত্ম্য উপলক্ষিত হইত। প্রাচীন সাহিত্য ও প্রত্নলিপি হইতে উত্তর ভারতে এইরূপ গ্রামসমিতি থাকা সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে কোনও উল্লেখ না পাওয়া গেলেও, আলোচ্য বিক্রয় দলীলগুলি হইতে উত্তর ভারতের গ্রাম-শাসন-বিষয়ে অনেক আভাস পাওয়া যাইতে পারে। অধ্যাপক আয়াঙ্গার তদীয় 'Ancient India' নামক গ্রন্থে (৩) এবং রাও বাহাদুর শ্রীযুক্ত কৃষ্ণশাস্ত্রি মহাশয় তদীয় 'Fiscal

---

প্রত্যয়ঃ বাস্তুবিবাদঃ'। মনুসংহিতায়ও (৮।২৬২) সমান ব্যবস্থা। যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতিতে (আচারাধ্যায়, ৯ম প্রকরণ, ১৫০—৫১ শ্লোকে), নারদ-স্মৃতিতে (S. B. E. Vol. XXXIII, Chap. XI, 12) এবং বৃহস্পতিস্মৃতিতে (ঐ, Chap. XIX, ৪) এই ব্যবস্থা আরও স্পষ্টতর ভাবে বর্ণিত আছে।

(২) এই প্রকার সাধারণ দানপত্রের মধ্যে ১৫৬ গুপ্তাব্দে (=৪৭৫—৭৬ খ্রীষ্টাব্দে) সম্পাদিত গুপ্তরাজগণের সামন্ত মহারাজ হস্তীর তাম্রশাসনখানি প্রাচীনতম বলিয়া বোধ হয় [Fleet—C. I. I., Vol. III, No. 21]। মহারাজ সংক্ষোভ, জয়নাথ, সর্ব্বনাথ প্রভৃতি সামন্তগণের রাজ্যসময়েরও এইরূপ তাম্রশাসন প্রাপ্ত হওয়া যায় [ঐ, Nos. 22—31]

(৩) Aiyanger—Ancient India, pp. 163 ইত্যাদি।

administration of the Early Cholas'—শীর্ষক প্রবন্ধে (৪) পরিষ্কার রূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, দক্ষিণাপথের গ্রামসমিতিসমূহের সভ্য ছিল গ্রাম-বৃদ্ধগণ (গ্রাম-মহত্তর) ও অন্যান্য নির্ব্বাচিত ব্যক্তিগণ, এবং সমিতির অধিবেশনে রাজার প্রতিনিধি, স্থানীয় কর্ম্মচারিগণ ও বিচার্য্যবিষয়ে সম্পর্কিত উভয় পক্ষের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত থাকিতেন। তাঁহারা আরও দেখাইয়াছেন যে, এই গ্রামসমিতি গ্রামদেবকুলসমূহের বা সমগ্র গ্রামের পক্ষ হইতে ভূমির ক্রয় বিক্রয় সম্পাদন করিতে পারিতেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বন্ধুবর ডাক্তার শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় তদীয় 'Corporate Life in Ancient India'—নামক গ্রন্থে (৫), গ্রামসমিতি, গ্রামিক বা গ্রমিণি (গ্রামপতি) এবং গ্রামবাসিগণের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, গ্রামের সর্ব্বপ্রকার কার্য্য গ্রামবাসিগণ দ্বারাই পরিচালিত হইত ('The essence of the institution was that the affairs of the village were transacted by the villagers themselves') কিন্তু এই সমস্ত বিষয়ে রাজার পক্ষে পর্য্যবেক্ষণ করার অধিকার ('ultimate right of supervision by the king') নষ্ট হইতে পারিত না। তাঁহার গ্রন্থের এক স্থানে (পৃঃ ৬৯) ডাক্তার মজুমদার লিখিয়াছেন যে, গ্রামসমিতিই নূতন পরিষ্কৃত ভূমিসহ সমস্ত গ্রামাধিকৃত ভূমির স্বত্বাধিকারী থাকিত এবং সমিতি কেবল রাজগ্রাহ্য সম্পূর্ণ কর দেওয়ার জন্য দায়ী। এমন কি, যদি কোনও ভূমিপতি তদীয় করাংশ দিতে অসমর্থ হইতেন তাহা হইলে তাঁহার ভূমি গ্রামসমিতির সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হইত এবং সমিতি সেই সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াও তাঁহার দেয় অর্থ আদায় করিয়া লইতে পারিতেন। রাজার সহিত গ্রামসমিতির কিরূপ সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল, তদ্বিষয়ে ডাক্তার মজুমদার লিখিয়াছেন যে, রাজপ্রাপ্য কর প্রদান করিতে পারিলেই গ্রামের সমস্ত ভূমির উপর স্বত্বাধিকার গ্রামসমিতি অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিতেন এবং তাহা হইলে গ্রামের আভ্যন্তরীণ সমস্ত কার্য্যেও গ্রামসমিতি নিজের প্রতিপত্তি অচল রাখিতে পারিতেন। রাজকীয় কর্ম্মচারিগণ কেবল মধ্যে মধ্যে গ্রামসমিতির হিসাব পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। অপর দিকে আবার গ্রামের সীমার মধ্যে অবস্থিত

(৪) Sir R. G. Bhandarkar Commemoration Vol. I. (Poona, 1917), pp. 223. ff.

(৫) Dr. R. C. Mojumdar—Corporate Life in Ancient India, pp. 37—85.

দেবকুল-সমূহের কার্য্যকারিগণের কোনরূপ অন্যায় ব্যবহার দেখিলে গ্রামসমিতি তাহা রাজগোচর করিতে পারিতেন। সমিতির অনেকগুলি নিয়ম রাজার অনুমতি-সাপেক্ষ থাকিত। একখানি প্রাচীন লিপিতে দেখা যায় যে, যাহারা রাজকর দিতে পারে নাই—রাজা গ্রামসমিতিকে তাহাদের ভূমি বিক্রয় করিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন। আবার ইহাও দেখা যায় যে, গ্রামের মর্য্যাদা সম্বন্ধে কোনরূপ রাজাদেশের প্রয়োজন হইলে তাহা লিপিবদ্ধ হইয়া পুস্তপালগণের দপ্তরে প্রেরিত হওয়ার পূর্ব্বে, গ্রামসমিতির অনুমোদন অপেক্ষা করিত। আলোচ্য ভূমিবিক্রয় দলালগুলির সম্পাদনকালের বহু পরে প্রবর্ত্তিত দাক্ষিণাত্যের গ্রামসমিতির কার্য্যকলাপ সমালোচনার ফলে বুঝা যায়, কেন উত্তরবঙ্গের ও পূর্ব্ববঙ্গের এই সকল প্রাচীন ভূমিবিক্রয় দলীলগুলিতে আমরা ভূমিক্রেতাকে রাজার ও শাসন-পরিষদের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামমহত্তর ও গ্রামসম্বন্ধীয় অন্যান্য কর্ম্মচারিদিগের নিকট ক্রয়ের আবেদন করিতে দেখিতে পাই, এবং কেন ভূমিবিক্রয় সম্বন্ধে গ্রামবৃদ্ধগণকে রাজার সহিত পক্ষ হইতে দেখিতে পাই। সুতরাং মনে করা যাইতে পারে যে, ভূমিবিক্রয়-লব্ধ মূল্যের এক-ষষ্ঠাংশ, রাজা 'রক্ষিতা' বলিয়া, তদীয় কোষে জমা হইত, এবং অবশিষ্ট পঞ্চ-ষষ্ঠাংশ সম্ভবতঃ গ্রামসমিতির কোষাগারে জমা থাকিত।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কুতুহলগর্ভ, প্রাচীন, শক্ত, অথচ তর্কবহুল প্রশ্নের উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রশ্নটি এই—প্রাচীন ভারতে ভূমির প্রথম স্বত্ব কাহাতে বর্ত্তিত—রাজাতে, কি, প্রজাতে? এই স্থানে এই প্রশ্নের উত্থাপন করার অবসর আছে, কারণ, আমরা আলোচ্য বিক্রয় দলীলগুলিতে এমন ভূমির বিক্রয়ের কথা উল্লিখিত পাই যাহা ইতিপূর্ব্বে কাহাকেও ভোগের জন্য দেওয়া হয় নাই ('অপ্রদ') এবং যে ভূমি হইতে রাজগ্রাহ্য করের বা আয়ের কোনও নির্দ্ধারণ হয় নাই ('সমুদয়-বাহ্য')। এই প্রকার অদত্তপূর্ব্ব ও অনির্দ্ধারিত রাজস্ব ভূমির বিক্রয়-প্রথাতে 'ভূমির প্রথম স্বত্বের অধিকারী কে?' এই প্রশ্নের মীমাংসার কোনরূপ সূত্র পাওয়ার আশা করা যাইতে পারে বলিয়া মনে হয়। আমাদের নিকট এইরূপ প্রতিভাত হয় যে, অতি প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে সমস্ত ভূমির স্বত্বাধিকার প্রজাতে পর্য্যস্ত ছিল। আমরা যে যুগের (৫-৭ম শতাব্দীর) কথা আলোচনা করিতেছি, সে সময়ে, হয় ত, ভূমির মালিকত্ব রাজাতেই ন্যস্ত বলিয়া লোকেরা মনে করিতে আরম্ভ করিয়া থাকিবে। এমন কি, যে প্রাচীনতর সময় হইতে ভারতবর্ষে রাজতন্ত্র প্রবর্ত্তিত হইতে আরব্ধ

হইয়াছিল, তখনও হয় ত, রাজা যে সমস্ত ভূমির উপর রাজত্ব বিস্তার করিতেন তাহার সর্ব্বাংশের প্রথম মালিক তিনি ছিলেন কি না, তাহাতে সন্দেহ উপস্থিত হয়। ভারতবর্ষে আর্য্যগণ রাজতন্ত্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে দুইটি মত পোষণ করিতেন,—(১) 'সমাসস্থিতির জন্য রাজার উৎপত্তি কল্পনা হইয়াছিল' এবং (২) 'রাজা সর্ব্বদেবময় ছিলেন, অতএব, তাঁহাকে মান্য না করিয়া উপায় নাই।' প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্র ও সাহিত্য হইতে দেখা যায় যে, এই উভয় মতেই রাজার শক্তি-সম্বন্ধে অনেকগুলি সীমা নির্দ্দিষ্ট ছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'কারমাইকেল প্রফেসার' অধ্যাপক ভাণ্ডারকার মহাশয় তদীয় 'Carmichæl Lectures' নামক গ্রন্থে (৬) এই বিষয়টি বিশদরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। সুতরাং যে ক্ষেত্রে রাজশক্তির এত সীমাবদ্ধতা দৃষ্ট হয়, সেখানে যে প্রাচীন ভারতবাসিগণ রাজাকে সকল ভূমির সর্ব্বময় মৌলিক স্বত্বাধিকারী বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন এইরূপ মনে হয় না। বহিঃশত্রু হইতে দেশ রক্ষা করেন বলিয়া রাজার কররূপে কিছু প্রাপ্য হওয়া উচিত, রাজস্ব প্রতিষ্ঠার ইহাই মূল কথা বলিয়া বিবেচিত হয়। প্রজাই ভূমির মালিক, কেবল প্রজা রক্ষা করেন বলিয়া রাজা কর প্রাপ্ত হইবেন। আমাদের আলোচ্য শাসনগুলিতে বর্ণিত ভূমি বিক্রয়ের সম্পাদন সময়ে রাজপ্রতিনিধির সঙ্গে সঙ্গে যে প্রজাপ্রতিনিধি-(মহত্তর) গণেরও সান্নিধ্য ও সম্মতি আবশ্যক হইত, সে প্রথার মূল খুঁজিতে হইলে, আমাদিগকে, সম্ভবতঃ, প্রাচীন কালে যে জমীর স্বত্ব প্রজাতে পর্য্যাপ্ত ভাবে পর্য্যস্ত থাকিত, সেই তথ্যেই উপনীত হইতে হয়। ভারতেতিহাসের আরও পরবর্ত্তী সময়ে, এমন কি, বাঙ্গালার পাল নরপাল ও সেন রাজগণের সময়েও, আমরা দেখিতে পাই যে, ব্রাহ্মণাদিকে তাম্রশাসন সম্পাদনপূর্ব্বক ভূমিদানকালে নৃপতিগণ 'মতমস্তু ভবতাম্' ('আপনাদের অভিমত হউক্') বলিয়া অতি সম্ভ্রমসহকারে সমগ্র প্রজাবর্গের অনুমতির অপেক্ষা করিতেন। এই প্রথাও কি ভূমির মৌলিক বা আদ্য স্বত্ব প্রজার, রাজার নহে—এই প্রাচীন তথ্যের সংস্মারক নহে? অধ্যাপক Macdonell ও অধ্যাপক Keith এই সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা এই প্রসঙ্গের আলোচনাতে তাহার উল্লেখ না করিয়া ক্ষান্ত হইতে পারি না। তাঁহাদের মতে (৭)—'ইংরেজ রাজ্যের মত

(৬) Professor D. R. Bhandarkar—Carmichæl Lectures, First Series, 1918, pp 114—139.

(৭) Macdonell and Keith—Vedic Index, Vol. II, p. 215.

'It is not denied that gradually the king came to be vaguely con-

ভারতবর্ষেও রাজা ভূমির স্বত্বাধিকারী বলিয়া ক্রমশঃ গৃহীত হইয়াছিল—এরূপ কথা অস্বীকার করা যায় না। 'আদিকাল হইতেই ভূমিতে রাজার স্বত্ব স্থির ছিল না'—খুব সম্ভবতঃ রাজার স্বত্বের ধারণা ক্রমশঃ বিকাশ লাভ করিয়াছিল।'

আলোচ্য লেখগুলিতে উল্লিখিত সরকারী ও বে-সরকারী এবং গ্রাম্য ও পৌর কর্ম্মচারিগণের মধ্যে কাহার কিরূপ নিয়োগ ও কার্য্য ছিল, সেই বিষয়ের সংক্ষিপ্ত অবতারণা করা যাইতেছে। উত্তরবঙ্গে পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির ও পূর্ব্ববঙ্গে নব্যাবকাশিকার ন্যায় বড় বড় প্রদেশের জন্য প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা থাকিত। তাঁহারা সার্ব্বভৌম সম্রাট কর্ত্তৃক প্রদেশ শাসন কার্য্যে নিযুক্ত হইতেন। মহারাজ, উপরিক, মহাপ্রতীহার প্রভৃতি তাঁহাদের উপাধি বা উপনাম ছিল। বর্ত্তমান সময়ের বিভাগীয় কমিশনারগণকে সেই যুগের প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাদের সহিত কথঞ্চিৎ তুলনা করা যাইতে পারে। আবার উত্তরবঙ্গে পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির অন্তর্গত কোটিবর্ষ ও পূর্ব্ববঙ্গে নব্যাবকাশিকা প্রদেশের অন্তর্গত বারকমণ্ডল প্রভৃতি বিষয়ের (জেলার) বিষয়পতিগণকে প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তারা বিষয় শাসন-কার্য্যে নিযুক্ত করিতেন। প্রায়ই তাঁহাদের উপাধি বা উপনাম থাকিত 'কুমারামাত্য'। বিষয়পতিগণের অধিকরণ বা কোর্ট অধিষ্ঠানে বা নগরে সংস্থাপিত থাকিত। এই বিষয়াধিকরণে একটি শাসন-পরিষৎ বা বোর্ড সংলগ্ন থাকিত। তাহাতে বণিক্, সার্থবাহ, কুলিক বা কারু, ও কায়স্থ বা লেখক-শ্রেণী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণ সদস্য থাকিতেন। অন্য এক শ্রেণীর কর্ম্মচারীর নাম প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে—তাঁহারা মহত্তর, গ্রামমহত্তর বা বিষয়মহত্তর বলিয়া আখ্যাত হইতেন। সমাজে তাঁহাদের প্রতিপত্তি প্রবল ছিল, গ্রাম বা বিষয়ের নানা প্রকার কার্য্যেই তাঁহাদের কোনও না কোনও ভাবে দায়িত্ব সংযুক্ত থাকিত। এই গ্রাম-বৃদ্ধ বা বিষয়-বৃদ্ধগণকে গ্রামসমিতিতে গ্রামবাসিগণের পক্ষে প্রতিনিধি বলিয়া মনে করা, বোধ হয়, অ-যুক্তিসহ হইবে না। রাজার নিকটও তাঁহাদের খ্যাতি ও সমাদর ছিল। রাজকীয় কার্য্যেও তাঁহাদের সহায়তা আবশ্যক হইত। অষ্টকুলাধিকরণ নামে পরিচিত আর এক শ্রেণীর কর্ম্ম-কর্ত্তার কথা উল্লিখিত পাওয়া গিয়াছে। তাঁহারা সম্ভবতঃ গ্রামসম্বন্ধীয় স্থানীয়

---

ceived—as the English king still is—as lord of all land in a proprietorial sense, but it is far more probable that such an idea was only a gradual development than it was primitive.'

কর্ম্মচারী ছিলেন। মনুসংহিতায় (৭।১১৯) আমরা 'কুলী' শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাই। তাহার ব্যাখ্যায় টীকাকার কুল্লূকভট্ট একটি পারিভাষিক অর্থ প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার মতে 'কুল'-শব্দ যে পরিমাণ ভূমি 'ষড্-গব হলদ্বয়' দ্বারা কৃষ্ট হইতে পারে, সে পরিমাণ ভূমিকে সূচিত করে। হয় ত, এই প্রকার অষ্ট কুলের তত্ত্বাবধানের জন্য যিনি নিযুক্ত থাকিতেন, তাঁহারই নাম ছিল 'অষ্টকুলাধিকরণ'। তার পর 'গ্রামিক' শব্দ। গ্রামের মধ্যে যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং গ্রামসমিতি যাঁহাকে নানা প্রকার শাসন-সম্বন্ধীয় ও সামরিক ক্ষমতা প্রদান করিতেন, তাঁহাকেই গ্রামিক, গ্রামণি, গ্রামক, গ্রামভোজ প্রভৃতি নাম দ্বারা পরিচিত পাওয়া যায়। মনুসংহিতায় (৭।১১৬-১১৮) উক্ত হইয়াছে যে, প্রত্যহ গ্রামবাসিগণের যাহা কিছু রাজপ্রদেয় ছিল—তাহা গ্রামিক বা গ্রাম-পতি ভোগ করিতে পারিবেন। গ্রামে চৌরাদি-দোষ উৎপন্ন হইলে গ্রাম-পতিকে স্বয়ং তাহার প্রতিবিধানের চেষ্টা করিতে হইত,—তাহা করিতে অসমর্থ হইলে তিনি 'দশী' বা দশ-গ্রামাধিপতির নিকট সেই বিষয় নিবেদন করিতেন। দলীলগুলিতে আরও এক শ্রেণীর লোকের নাম পাওয়া যাইতেছে। বিক্রীত ভূমির পরিমাপ-সময়ে ও দলীল-সম্পাদন-সময়ে মহত্তর ও অষ্টকুলাধি-করণগণের সহিত 'কুটুম্বীরা'ও কার্য্যপ্রত্যবেক্ষণের জন্য উপস্থিত থাকিতেন। যাহাদের 'কুটুম্ব' বা পরিবার (স্ত্রী-পুত্র-কন্যা প্রভৃতি) ভরণ করিতে হইত, তাঁহারাই 'কুটুম্বী' বলিয়া পরিচিত হইতেন। কোনও কোনও মনীষী পরবর্ত্তী কালের লেখ-সমূহে ব্যবহৃত এই শব্দটিকে কৃষক-শ্রেণীর অভিধায়ক বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এইরূপ ব্যাখ্যা আমাদের নিকট সমীচীন বলিয়া প্রতিভাত হয় না। সর্ব্বশেষে অন্য এক শ্রেণীর কর্ম্মচারীর কথা পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার নাম 'পুস্তপাল'। ভূমিবিক্রয়-সম্বন্ধে এই কর্ম্মচারীর কার্য্য অত্যন্ত গুরু ছিল বলিয়া বোধ হয়। পুস্ত বা পুস্তক রক্ষা করাই তাঁহার প্রধান কার্য্য ছিল। যাবতীয় ভূমির স্বত্ব-সম্বন্ধীয় দলীলাদি তাঁহার রক্ষাধীন থাকিত। কোন্ ভূমি কাহার স্বত্বাধিকারভুক্ত, তাহার পরিমাণ কত, তাহার চতুঃসীমা কত দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত, ইত্যাদি বিষয় সম্যক জানিতে হইলে পুস্তপালের শরণাপন্ন হইতে হইত। সম্ভবতঃ এই পুস্তপালগণ গ্রামসমিতির নিয়োগাধীন ছিলেন। পরবর্ত্তী কালের লেখসমূহে আমরা রাজ-পাদোপজীবী কর্ম্মকর্ত্তাদের মধ্যে মহাক্ষ-পটলিক-সংজ্ঞায় অভিহিত এক শ্রেণী কর্ম্মচারীর উল্লেখ দেখিতে পাই। তাঁহারাই অতিপূর্ব্বে পুস্তপাল-নামে কথিত হইতেন কি না তাহা

চিন্ত্য। আমরা প্রথম প্রবন্ধে (জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যায়) দেখাইয়াছি যে, পুস্তপালগণের অবধারণা ব্যতীত ভূমিবিক্রয় সংঘটিত হইতে পারিত না। ভূমি-ক্রয়-প্রার্থীর আবেদন সঙ্গত হইয়াছে কি না—তদ্বিষয়ে পুস্তপালকে সরকার ও মহত্তর প্রভৃতি কার্য্যপ্রত্যবেক্ষকদিগের সমীপে স্বমত উপস্থাপিত করিতে হইত। আলোচ্য ৫নং দলীলে দেখা যায় যে, ভূমিক্রয়প্রার্থী বিজ্ঞাপিত করিতেছেন যে, তিনি ইতিপূর্ব্বে একাদশ কুল্যবাপ পরিমিত ভূমি ক্রয় করিয়া দুইটি দেবতার উদ্দেশ্যে তাহা দান করিয়াছেন, এবং তিনি অন্য কার্য্যের জন্য পুনরায় আরও ভূমি ক্রয় করিবার ইচ্ছুক হইয়া আবেদন করিতেছেন। আবেদনে উল্লিখিত পূর্ব্ব দানের কথা সত্য কি না, তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া পুস্তপালকে বিজ্ঞাপিত করিতে হইয়াছিল। তাহা না হইলে প্রার্থীর নূতন আবেদন গ্রাহ্য হইবার উপায় থাকিত না।

আলোচ্য দলীলগুলিতে তিন প্রকার ভূমির বিক্রয়ের কথা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে; যথা, ক্ষেত্রভূমি, খিলভূমি ও বাস্তুভূমি। কর্ষণ-যোগ্য এবং কৃষ্যমাণ ভূমিকে ক্ষেত্রভূমি বলা যায়। অমরকোষে ও হলায়ুধের অভিধানে 'খিল' ও 'অপ্রহত' শব্দদ্বয় সমপর্য্যায়। ইহাদের অর্থ অকৃষ্টভূমি—যাহাতে হল-প্রঘাত হয় নাই। কিন্তু খিলভূমি যে অনুর্ব্বর বা কর্ষণযোগ্য নহে, এরূপ মনে করা সঙ্গত নয়। নারদ-স্মৃতিতে (১১।২৬) আমরা 'খিল' শব্দের এইরূপ বর্ণনা দেখিতে পাই—'এক বৎসর যে ভূমিতে হল-প্রয়োগ হয় নাই, তাহাকে 'অর্দ্ধ-খিল' বলে, এবং যে ভূমি তিন বৎসর কৃষ্ট হয় নাই, সেই ভূমির নাম 'খিল-ভূমি'। কৃষ্টাকৃষ্ট-বিলক্ষণ ভূমি—যাহাতে বাসস্থান নির্ম্মাণ পূর্ব্বক বসবাসের সুবিধা হইতে পারে, তাহার নাম 'বাস্তু-ভূমি'।

আলোচ্য শাসনপত্রগুলি হইতে আর একটি নূতন তথ্য অবগত হওয়া যায়। প্রাচীন বাঙ্গালার ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভূমির মূল্য ভিন্ন ভিন্ন রকমের ছিল। মূল্যবিষয়ে উত্তরবঙ্গে এক রূপ মর্য্যাদা অনুবৃত্ত ছিল—পূর্ব্ববঙ্গে অন্য রূপ। উত্তরবঙ্গে এক-কুল্যবাপ-পরিমিত ভূমির বিক্রয়মূল্য তিন দীনার ছিল, পূর্ব্ববঙ্গে সম-পরিমিত ভূমির মূল্য চারি দীনার ছিল। কেবল উত্তরবঙ্গের একখানি দলীলে (৪নং দ্রষ্টব্য) আমরা প্রতিকুল্যবাপ ভূমির মূল্য দুই দীনার বলিয়া লক্ষ্য করিয়াছি। সম্ভবতঃ, এই অল্পমূল্য তত্তৎ গ্রামগুলিতেই প্রচলিত ছিল এবং সেই স্থানে অল্প হারেই খিলভূমি বিক্রীত হইত ('গ্রামানুক্রম-বিক্রয়-মর্য্যাদা')। উত্তরবঙ্গে কি খিলভূমির, কি বাস্তু-সমন্বিত খিলভূমির, উভয়েরই বিক্রয়ে সমান-মর্য্যাদার মূল্য দিতে হইত (৬নং দ্রষ্টব্য)।

গুপ্ত-যুগের শাসন-লিপিতে আমরা তৎকাল-প্রচলিত স্বর্ণমুদ্রার দুইটি নামের পরিচয় পাই, 'দীনার' ও 'সুবর্ণ'। রোম-সাম্রাজ্যে যে স্বর্ণমুদ্রার নাম ছিল 'দীনারিয়াস' (denarius)—তাহা হইতেই সেই যুগে ভারতীয় স্বর্ণমুদ্রার নামও 'দীনার' রাখা হইয়াছিল বলিয়া প্রতিভাত হয়। অধ্যাপক ইয়োলী (Iolly) রোমের সম্রাটগণের রাজত্ব-সময়ের অধিক পূর্ব্বে ভারতবর্ষে স্বর্ণময় দীনার মুদ্রার আমদানি হইয়াছিল বলিয়া মনে করেন না, এবং বাস্তবিক ভারতে যে বহু সংখ্যক সুবর্ণ দীনার আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেগুলি খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর মুদ্রা (৮)। নারদীয় ও বার্হস্পত্য স্মৃতিতে আমরা এক দীনারকে দ্বাদশ 'ধানকে'র সমান বর্ণিত পাই। চারি 'অণ্ডিকা' বা 'কর্ষাপণ' মুদ্রায় এক 'ধানক'। এক কর্ষ তাম্র লইয়া যে মুদ্রা প্রস্তুত হইত, তাহার নাম 'কার্ষাপণ' ছিল। অমরসিংহের মতে (৩।৩।১৪) এক দীনার এক নিষ্কের সমান। কিন্তু বৃহস্পতির মতে এক 'নিষ্ক' চারি 'সুবর্ণ' মুদ্রার সমান বলিয়া উল্লিখিত (১০।১৪) হইয়াছে।

এক কুল্যবাপ ভূমির পরিমাণ কত তাহা নির্ণয় করা কঠিন। প্রাচীন কালের এক কুল্যবাপ বর্ত্তমান সময়ের প্রায় তিন বিঘা ভূমির সমান ছিল বলিয়া পার্জ্জিটার মহোদয়ের মত (৯)। সংস্কৃত অভিধানে এক কুল্য আট দ্রোণের সমান বলিয়া ব্যাখ্যাত পাওয়া যায়। দ্রোণ শব্দটি (= ৪ আঢ়ক) প্রায়ই বস্তুর পরিমাপ কার্য্যে ব্যবহৃত হইত, কিন্তু তাহা আবার ভূমির পরিমাণ কার্য্যেও ব্যবহৃত হইত বলিয়া স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে। এখনও বাঙ্গালা দেশের অনেক স্থানে ভূমির পরিমাণ দ্রোণ অনুসারে হইয়া থাকে। পূর্ব্ববঙ্গের ঢাকা জেলার অন্তর্ভুক্ত আস্রফপুর গ্রামে আবিষ্কৃত ৭ম—৮ম খৃষ্টাব্দের একখানি তাম্রশাসনে (১০) আমরা 'দ্রোণবাপ' শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাই। এক দ্রোণ বা এক কুল্য পরিমাণে বীজ লইয়া তদ্দ্বারা যতখানি ভূমিখণ্ডে রোপণ কার্য্য সমাধা হইতে পারে, ততখানি ভূমিকে বুঝাইবার জন্যই, হয় ত, 'দ্রোণবাপ' ও 'কুল্যবাপ' শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হইত (১১ ।

বৈদিক সাহিত্যেও ক্ষেত্র মাপের কথা উল্লিখিত পাওয়া যায়। আলোচ্য

---

(৮) নারদস্মৃতি—S. B. E, Vol. XXXIII, Introduction, p. XVIII.

(৯) Indian Antiquary, 1910, p. 215.

(১০) Memoris of the A. S. B, Vol. I, p. 90.

(১১) Indian Antiquary, 1919, p. 14 (লেখকের ইংরেজী প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)।

তাম্রশাসনের কতকগুলিতে, বিশেষতঃ, পূর্ব্ববঙ্গের কয়েকখানি লিপিতে, নল দ্বারা ভূমি মাপা হইত বলিয়া উল্লেখ দেখা যায়। সম্ভবতঃ দৈর্ঘ্যে ৯ নল ও প্রস্থে ৮ নল করিয়া মাপ করিলেই এক কুল্যবাপ ভূমি পাওয়া যাইত ('অষ্টক-নবক-নলাভ্যামপবিঞ্ছ্য')। কত হস্ত পরিমাণে এক নল হইত তাহা জানা যায় না। হয় ত, এখনকার মত তখনও প্রদেশ ও স্থানবিশেষে নলের পরিমাণও ভিন্ন ভিন্ন ছিল। পূর্ব্ববঙ্গের নব্যাবকাশিকা প্রদেশে 'প্রতীত' (বিখ্যাত), 'ধর্ম্মশীল' শিবচন্দ্র নামক ব্যক্তির হস্তের মাপে নল-দৈর্ঘ্য স্থির করা হইত বলিয়া তাম্রশাসনে উল্লেখ আছে। কিন্তু এই ব্যক্তির কত হস্ত পরিমাণে দীর্ঘতা এক নলে বর্ত্তমান থাকিবে তাহার কোনও আভাস দলীলগুলিতে পাওয়া যায় না।

আলোচ্য দলীলগুলিতে ভূমিখণ্ডের বিক্রয় ও দান কখনও নীবীধর্ম্মানুসারে, কখনও আবার অপ্রদাধর্ম্মানুসারে সম্পাদিত হইত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এই রীতি দ্বারা ইহাই বুঝিতে হইবে যে, ক্রেতা বা প্রতিগ্রহীতা কেহই ক্রীত বা দানপ্রাপ্ত মূলভূমির কোনরূপ ক্ষয় বা নাশ সাধন করিতে পারিবেন না, এমন কি, তাহা হস্তান্তরিত করিতেও পারিবেন না। প্রদত্ত বস্তু—ভূমিই হউক বা অর্থই হউক—যদি অক্ষয় নীবীরূপে প্রদত্ত হইয়া থাকে—তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, প্রদত্ত মূলদ্রব্য ক্রেতা বা প্রতিগ্রহীতা নষ্ট করিতে পারিবেন না—কেবল তাহা হইতে লব্ধ বৃদ্ধি বা আয়ের ব্যবহার করিতে পারিবেন। এই প্রকারে ক্রীত বা প্রাপ্ত ভূমির ভবিষ্যতে হস্তান্তর করাও অচল হইত।

শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক।

সাহিত্যে স্বাস্থ্যরক্ষা।

৬

গ্রন্থকার পার্ব্বতীর পাশাপাশি আরও একটি নিঃস্বার্থ প্রেমের চিত্র আমাদের সম্মুখে ধরিয়া দিয়াছেন; সে বারবণিতা চন্দ্রমুখীর প্রেম। কি শুভক্ষণে দেবদাসের সহিত চন্দ্রমুখীর দেখা হইল, সেই প্রথম দর্শনেই চন্দ্রমুখী আপনাকে ভুলিয়া দেবদাসের প্রতি আসক্ত হইল। অথচ দেবদাস তাহাকে ঘৃণা করে, দেবদাস তাহার দিকে ফিরিয়াও চায় না। দেবদাস তাহার বাড়ীতে যাতায়াত করে কেবল মদ খাইয়া নিজের দুঃখ ভুলিবার জন্য। সে চন্দ্রমুখীকে টাকা দেয়, কেবল খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া। অর্থ রূপ যৌবনশালিনী চন্দ্রমুখী

দেবদাসের জন্য পাগল হইয়া, তাহার নিজের ব্যবসা তুলিয়া দিল, নিতান্ত দরিদ্র ভাবে জীবনযাপন করিতে লাগিল। পরে দেবদাস তাহার প্রতি দয়া করিয়া তাহাকে কিছু টাকা দিয়া এক নিভৃত পল্লীগ্রামে বাস করিবার জন্য পাঠাইয়া দিল। সেখান হইতে দেবদাসের ঘোরতর অধঃপতনের কথা শুনিয়া সে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল এবং অনেক অনুসন্ধানের পর দেবদাসকে মাতাল হইয়া রাস্তায় পড়িয়া থাকা অবস্থায় তুলিয়া আনিয়া সেবা করিয়া বাঁচাইল। এই সময়ে দেবদাসের সহিত চন্দ্রমুখীর এইরূপ কথাবার্ত্তা হইল। দেবদাস হঠাৎ গম্ভীর ভাবে চন্দ্রমুখীকে প্রশ্ন করিয়া বলিল, 'আচ্ছা বৌ, তুমি আমার কে, যে এত প্রাণপণে আমার সেবা করচ?' চন্দ্রমুখী স্নেহজড়িত কণ্ঠে কহিল, 'তুমি আমার সর্ব্বস্ব—তা' কি আজও বুঝতে পারোনি?' দেবদাস দেওয়ালের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, 'তা পেরেছি; কিন্তু তেমন আনন্দ পাই নে। পার্ব্বতীকে কত ভালবাসি, সে আমাকে কত ভালবাসে; কিন্তু তবু কি কষ্ট! অনেক দুঃখ পেয়ে ভেবেছিলাম, আর কখনও এসব ফাঁদে পা দেব না; ইচ্ছা ক'রেও দেই নি। কিন্তু তুমি এমন কেন ক'রলে? জোর করে আমাকে কেন বাঁধলে?' বলিয়া আবার কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া কহিল— 'বৌ তুমিও হয়ত পার্ব্বতীর মতই কষ্ট পাবে।' ইহার পরে একবার পার্ব্বতী, একবার চন্দ্রমুখী তাহার হৃদয় মধ্যে বাস করিতে লাগিল। 'কখনও বা দুজনের মুখই পাশাপাশি তাহার হৃদয় পটে ভাসিয়া উঠিত—যেন উভয়ের কত ভাব।'

এখানে আমাদের মনে একটা প্রশ্নের উদয় হয়, এই দুইটি নারী দেবদাসের মধ্যে এমন কি দেখিয়াছিল যে, তাহার জন্য এতদূর পাগল হইয়া যথাসর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিল? চন্দ্রমুখী এক দিন পার্ব্বতীর কথা উল্লেখ করিয়া দেবদাসকে বলিয়াছিল —'তুমি যে কি আকর্ষণ, তা' যে কখন তোমাকে ভাল বাসিয়াছে, সেই জানে। এই স্বর্গ থেকে ফিরে যাবে, এমন মেয়ে মানুষ কি পৃথিবীতে আছে?'—'তোমার রূপ আছে বটে, কিন্তু তাতে ভুল হয় না। এই তীব্র রুক্ষ রূপ সকলের চোখেও পড়ে না। কিন্তু যার পড়ে সে আর চোখ ফিরুতে পারে না।' দেবদাসের আকর্ষণ রূপের আকর্ষণ নহে—চন্দ্রমুখী মুগ্ধ হইয়াছিল, তাহার তেজে। তাহাকে দেবদাস নিতান্ত তেজের সহিত অবজ্ঞা করিয়াছিল তাহার যে রূপ যৌবন দেখিয়া কত শত লোকে ভুলিয়াছিল, দেবদাস তাহাতে ভুলিল না। চন্দ্রমুখী এখানে দেবদাসের মধ্যে এমন

কিছু আবিষ্কার করিল যাহা সে এ পর্য্যন্ত অন্য কোনও পুরুষের মধ্যে দেখে নাই। কিন্তু তাহার এই অসাধারণ তেজের মূল কোথায়, তাহাও চন্দ্রমুখীর বাহির করিতে বিলম্ব হইল না। দেবদাস মাতাল অবস্থায় প্রায়ই পার্ব্বতীর কথা বলিত। তাহার কথা হইতে চন্দ্রমুখী দেবদাসের হৃদয়ের পরিচয় পাইল। সে বুঝিল, এই ব্যক্তি প্রেমের জন্য সর্ব্বত্যাগী হইয়াছে, ইহার হৃদয় খাঁটি সোনা।

পার্ব্বতীর পাশাপাশি চন্দ্রমুখীর চরিত্র অঙ্কিত করিয়া গ্রন্থকার পার্ব্বতীর চরিত্রকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। যে দেবদাসকে একবার মাত্র দেখিয়া বাজারের বারনারী পর্য্যন্ত আত্মবিস্মৃত হইতে পারে, তাহাকে আজন্ম দেখিয়া, আজন্ম তাহাকে ভাল বাসিয়া পার্ব্বতী সতীধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিতে পারিবে না কেন? যেন গ্রন্থকার আমাদিগকে বুঝাইতে চান ইহাতে পার্ব্বতীর কোনও দোষ নাই—পার্ব্বতী তাহার অসাধারণ প্রেমের বলে সাংসারিক ভাল মন্দের গণ্ডী অতিক্রম করিয়াছে—যেমন এক দিন ব্রজবধূগণ করিয়াছিল।

আমি ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পার্ব্বতীর লজ্জা নিন্দা ভয়ের সীমার অতীত এই অসাধারণ পরকীয় প্রেম কাব্য হিসাবে খুব উৎকৃষ্ট সন্দেহ নাই। কিন্তু সমাজের দিক দিয়া দেখিতে গেলে ইহা অনিষ্টকর। সেই ব্রজবধূগণের প্রেমই কোন্ সমাজের হিসাবে ভাল? ব্রজগোপীগণের দোহাই দিয়া—ধর্ম্মের নামে সমাজে কত নেড়ানেড়ির উৎপত্তি হইয়াছে ও হইতেছে তাহা সকলেই জানেন। সুতরাং সমাজের হিসাবে পার্ব্বতীর এই পরকীয় প্রেম যে নিতান্ত গ্লানিজনক সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। পার্ব্বতীর দেবদাসকে আপন ভাবা ও নিজের স্বামীকে পর ভাবা সমাজে সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় পরপুরুষ প্রেম-কলুষিত নারীর মনে একটা নজির হইয়া দাঁড়াইবে, কারণ, লেখকের আর্টের গুণে ইহা সকলেরই হৃদয়ে সহানুভূতির উদ্রেক করিতে পারে। লেখক হয় ত বলিবেন, ইহা ত সমাজেরই দোষ। শৈবলিনী বলিয়াছিল, 'এক বোঁটায় যে দুটি ফুল ফুটিয়াছিল, তাহাদিগকে পৃথক করিলে কেন?' পার্ব্বতীও এই কথা বলিতে পারিত। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র সেই শৈবলিনীরই অশেষবিধ প্রায়শ্চিত্তের বিধান করিয়া সতী-ধর্ম্মের মহিমা উজ্জ্বল করিয়া দেখাইয়াছেন। শরৎবাবু পার্ব্বতীর সে প্রকার কোনও প্রায়শ্চিত্তের বিধান করেন নাই। তবে তাহার প্রায়শ্চিত্ত অন্য ভাবে কিছু হইয়াছে। তাহা দেবদাসের অকাল ও শোচনীয় মৃত্যু দর্শন করিয়া জীবনব্যাপী দুঃখ।

এবার আমি শরৎবাবুর সৃষ্ট এই শ্রেণীর আর একটি পরকীয় প্রেমচিত্রের আলোচনা করিব। তাঁহার "স্বামী'' পুস্তকে তিনি আর একটি পরপুরুষাসক্তা নারীর চিত্রাঙ্কণ করিয়াছেন। সৌদামিনী বাল্যকালে তাহার মামার বাড়ীতে প্রতিপালিত হয়। তাহার মামা এক জন মস্ত পণ্ডিত-মূর্খ ছিলেন—অর্থাৎ, বই-পড়া বিদ্যা তাঁহার যথেষ্ট ছিল, কিন্তু তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্বে সন্দিহান ছিলেন—যাহাকে ইংরেজীতে বলে agnostic। তিনি সেই সৌদামিনীকে নিজে লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন। সৌদামিনীও অনেক বই পড়িয়াছিল,—এমন কি, ইংরেজী দর্শনশাস্ত্র লইয়াও তর্ক করিতে পারিত, কিন্তু তাহারও সেই মামার ন্যায় ঈশ্বরে বিশ্বাস ছিল না। তাহার প্রতিবেশী এক জমিদারের পুত্র, নামটি তার নরেন, সৌদামিনীর মামার কাছে আসিয়া পড়িত এবং সৌদামিনীর সঙ্গে খুব তর্ক করিত। ক্রমে উভয়ের মধ্যে ভালবাসা জন্মিল। পরে যে দিন নরেন সৌদামিনীর 'পারের কাণ্ডারী' হইয়া তাহাকে কোলে করিয়া বৃষ্টির জলমগ্ন একটা নালা পার করিয়া দিল ও সঙ্গে সঙ্গে তাহার 'ঠোঁট দুটোকে একেবারে পুড়িয়ে দিয়ে' সেই পারের মাশুল আদায় করিল, সেই দিন তাহাদের সেই গুপ্ত প্রেম চরমে উঠিল। দেখিতে দেখিতে তাহার বয়স পনেরো পার হইতে চলিল তবুও তাহার মামা তাহার বিবাহের নামও করেন না। অবশেষে তাহার মাতার নির্ব্বন্ধাতিশয্যে তিনি একটি দোজবর পাত্র দেখিতে গেলেন—দেখিয়া তাঁর পছন্দ হইল। পাত্রটি পাশ-টাস তেমন কিছু করিতে পারে নাই, সৌদামিনী তাহাকে দুই বৎসর ইংরেজী পড়াইতে পারে, কিন্তু বড় নম্র, বড় বিনয়ী। ইতিমধ্যে মামার পরপারের ডাক পড়িল, তিনি মৃত্যুকালে এই সম্বন্ধই করিতে বলিয়া গেলেন। এ দিকে সৌদামিনী বিবাহের আশঙ্কায় নিতান্ত ম্রিয়মাণ হইল। বাগানে একটা কাঁটালি চাঁপার কুঞ্জে বসিয়া নরেনের সহিত প্রেমালাপ করিতে করিতে তাহারা দুই জনে চোখের জলে ভাসিতে লাগিল। সৌদামিনী সারারাত্রি জাগিয়া জাগিয়া ভাবিত নরেন ভিন্ন অপরের সঙ্গে তাহার বিবাহ কোনও ক্রমেই হইতে পারিবে না। যদি বাস্তবিকই এই দুর্ঘটনা ঘটে তবে বিবাহ সভায় নিশ্চয়ই তাহার বুক চিরে ভলকে ভলকে রক্ত উঠিবে, এবং তাহাকে সেখান হইতে বিছানায় তুলিয়া নিতে হইবে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে সেরূপ কোনও ঘটনা ঘটিল না, বিবাহের পরে সে স্বামিগৃহে চলিয়া গেল। কিন্তু সৌদামিনীর মনে বড় দুঃখ রহিল, যাইবার সময় নরেনের সঙ্গে একটিবারও দেখা হইল না, নরেন কেন তাহাকে চাইল না, সে খবরও পাওয়া গেল না।

শ্বশুর বাড়ীতে সৎ শাশুড়ীর সংসার। তিনি তাহার নিজের ছেলে মেয়ে নিয়েই ব্যতিব্যস্ত, সৌদামিনীর স্বামী ঘনশ্যামের রোজগারের দ্বারা যদিও সংসার চলে, তবু কেহ সে বেচারীকে জিজ্ঞাসাও করে না। এই অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে সৌদামিনীর সুশিক্ষিত চিত্ত অল্প দিনের মধ্যেই বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। সে বিদ্রোহ, স্বামীর প্রতি তাহার নিজের ভালবাসার জন্য নহে, স্বামীর প্রতি অবিচার হইতেছে দেখিয়া। কিন্তু ঘনশ্যাম গৌরাঙ্গভক্ত বৈষ্ণব, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু ও ধরার ন্যায় ক্ষমাশীল, কোনও প্রকার অত্যাচারেই তাঁহার রাগ হয় না। বরং তাঁহার নিজের খাওয়া পরা লইয়া তাঁহার বিমাতার সঙ্গে ঝগড়া করিতে স্ত্রীকে নিষেধ করিয়া দিলেন। সৌদামিনী শাশুড়ীর সঙ্গে স্বামীর অযত্নের জন্য ঝগড়া করিত বটে, কিন্তু শয়নগৃহে স্বামীর সঙ্গে এক শয্যায় শয়ন না করিয়া খাটের নীচে একটা মাদুর পাতিয়া শুইত। ইহাতেও ঘনশ্যামের মনে কোনও বিকার জন্মে নাই। সৌদামিনী বরং এক দিন রাত্রে জাগিয়া দেখিল, স্বামী তাহার শিয়রে বসিয়া তাহার মাথা ধরার জন্য শুশ্রূষা করিতেছেন। যাহা হউক, শাশুড়ীর সঙ্গে স্বামীর পক্ষ হইয়া ঝগড়া করিতে করিতে আস্তে আস্তে সৌদামিনীর মনে স্বামীর প্রতি টান জন্মিতে লাগিল। ক্রমে স্বামীর বিছানায় শুইতেও তাহার মনে লোভ জন্মিতে লাগিল, কিন্তু মুখ ফুটিয়া কোনও কথা বলিতে পারিত না। এক দিন সাজসজ্জা করিয়া স্বামীর পালঙ্কের উপর শুইয়াছিল, ঘনশ্যাম তাহাকে এই অবস্থায় দেখিয়া দ্বিধা ও সঙ্কোচে নিজে অন্য ঘরে গিয়া শুইলেন। তখন সৌদামিনী মাটীতে পড়িয়া সারা রাত্রি কাঁদিয়া কাটাইল।

যখন সৌদামিনীর চিত্ত স্বামীর দিকে এতটা অগ্রসর হইয়াছে তখন আর এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটিল। উজ্জ্বল আকাশে উদিত ধূমকেতুর ন্যায় নরেন শিকারের ছল করিয়া তাহাদের বাড়ীতে উপস্থিত হইল। সৌদামিনীর উপর তাহার অতিথি-সৎকারের ভার পড়িলেও সে তাহার সম্মুখে বাহির হইল না। কিন্তু অপরাহ্নে বেলা দুইটা আড়াইটার সময় যখন বাড়ী নিস্তব্ধ, সৌদামিনী তাহার ঘরের জানালায় ধীরে বসিয়া তাহার স্বামীর কুলুঙ্গী হইতে একখানা বৈষ্ণব গ্রন্থ লইয়া পড়িতেছিল, তখন হঠাৎ তাহার আঁচলে টান পড়িল। চাহিয়া দেখিল নরেন নীচে জানালার বাহিরে বাগানে দাঁড়াইয়া আছে। সৌদামিনী বলিল, 'শিকার করিতে যাও নি কেন?' নরেন বলিল, 'তোমার স্বামী বৈষ্ণব মানুষ, তিনি এ বাড়ীতে আসিয়া জীবহত্যা করিতে

নিষেধ করিয়া দিয়াছেন।' এ কথা শুনিয়া সৌদামিনীর বুক স্বামিগর্ব্বে ফুলিয়া উঠিল—সে মনে মনে ভাবিল, এ লোকটা দেখুক আমার স্বামী কত বড়। কিন্তু এ ভাব বেশীক্ষণ থাকিল না। নরেন গরাদের ফাঁক দিয়া থপ করিয়া তাহার হাতটা ধরিয়া বলিল, টাইফয়েড জ্বর হইয়াছিল বলিয়া সে এতদিন তাহার খবর নিতে পারে নাই; সে মরিতে মরিতে বাঁচিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু তাহার মরণই ভাল ছিল; সে শুনিয়াছে যদিও সৌদামিনীর অন্যের সঙ্গে বিবাহ হইয়াছে, তবুও সে তাহারই আছে; মুক্তা ঝি তাহাকে সব খবর দিয়া থাকে, নরেন যদি জানিত যে সত্ত সুখে আছে, তাহা হইলে সে মনে সান্ত্বনা পাইত, কিন্তু এখন সে কোন্ সম্বল লইয়া বাঁচিয়া থাকিবে? 'এমন কোন্ সভ্য দেশ পৃথিবীতে আছে, যেখানে এত বড় অন্যায় হতে পারত?...কোন্ দেশের মেয়েরা ইচ্ছে করলে এমন বিয়ে লাথি মেরে ভেঙ্গে দিয়ে যেখানে খুসী চলে যেতে না পারে?' ইত্যাদি—

সৌদামিনী সেই সয়তানের এই সকল মধুর হলাহল পান করিতে করিতে, তাহার মনে উল্টা স্রোত বহিতে লাগিল। তাহার সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল, মনে হইল যেন নরেন কোনও অদ্ভুত কৌশলে তাহার পাঁচ আঙ্গুলের ভিতর দিয়া পাঁচ শ বিদ্যুতের ধারা তাহার সর্ব্ব শরীরে বহাইয়া দিয়া পায়ের নখ থেকে চুলের ডগা পর্য্যন্ত অবশ করিয়া আনিল।

এই সময়ে তাহার শাশুড়ী বারান্দার খোলা জানালার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন—'বউ মা, বলি, কথা কি তোমাদের শেষ হবে না বাছা?' ...'বাছা, এ পাড়ার লোকগুলো ত তেমন সভ্য-ভব্য নয়, অমন ঝোপের মধ্যে দাঁড়াইয়া কান্নাকাটি করতে দেখলে হয় ত বা দোষের ভেবে নেবে। বলি, বাবুটিকে ঘরে ডেকে পাঠালেই ত সব দিক দেখতে শুনতে বেশ হ'ত।' এই ঘটনার পরে নরেন চম্পট দিল। সৌদামিনী ঘরের মেজের উপর চোখ বুজিয়া শুইয়া পড়িল। সে দিন সে আর উঠিল না, কেহ তাহাকে ডাকিলও না। তাহার স্বামী যথাসময়ে বাড়ী আসিয়া তাঁহার বিমাতার মুখে সমস্ত শুনিলেন। কিন্তু তাঁহার মনে একটুও বিকার লক্ষিত হইল না। বাড়ীর সকলের মুখ ঘোর অন্ধকার, পর দিন সৌদামিনী হেঁসেলে ঢুকিতে পারিল না। তাহার পরে মুক্তা ঝির দ্বারা নরেন এক পত্র পাঠাইল। সৌদামিনী তাহা পড়িয়া টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া জলে ভাসাইয়া দিল। সৌদামিনীর মাতার গৃহদাহ হইয়াছে, যে চিঠিতে এই সংবাদ লেখা ছিল, তাহা ঘনশ্যামের পকেটে হঠাৎ পাওয়া

গেল। সৌদামিনী মনে করিল, কিছু অর্থ সাহায্য করিতে হইবে বলিয়া তাহার স্বামী এই সংবাদ তাহার নিকট গোপন করিয়াছেন, তাহার নাস্তিক মামা দ্বারা কি এত বড় ক্ষুদ্রতা সম্ভবপর হইত? সৌদামিনী স্বামীকে এই প্রসঙ্গে অনেক স্পষ্ট কথা শুনাইয়া দিল। অবশেষে বলিল, 'বাঙ্গালীর ঘরে জন্মেছি বলেই যে তোমরা খুঁচে খুঁচে তিল তিল ক'রে মারবে, সে অধিকার তোমাদের আমি কিছুতেই দেব না, তা' নিশ্চয় জেনো। আমার মামার বাড়ীতে এখনো ত রান্নাঘরটা বাকী আছে, আমি তার মধ্যেই আবার ফিরে যাবো। আমি কালই যাচ্ছি।'

ইহার পরে ঘনশ্যাম তাহার গহনাগুলা রাখিয়া যাইতে বলিলেন। সে বলিল, 'সেগুলো কেড়ে নিতে চাও ত বেশ, আমি রেখেই যাব।' ঘনশ্যাম বলিলেন, 'না না, তোমার কিছু গয়না আমি ভিক্ষে চাচ্ছি, আমার টাকার বড় অনাটন।' অর্থাৎ সৌদামিনীর মার ঘর প্রস্তুত করিবার জন্য। কিন্তু তাহার কথা কে শোনে? সৌদামিনী ক্রোধ ভরে তাহার সমস্ত গহনা, মূল্যবান কাপড়, জামা প্রভৃতি বিছানার উপর ছুঁড়িয়া ফেলিল। তাহার মন ঘৃণায়, বিতৃষ্ণায় বিষিয়ে উঠিল—সে বাহিরে গিয়া অন্ধকার বারান্দায় আঁচল পাতিয়া শুইয়া পড়িল। তাহার পর দিন স্বামীর সঙ্গে দেখা হইল না, তিনি প্রায় সমস্ত গয়না নিয়ে কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। রাত্রি বারোটা বেজে গেল, তিনি বাড়ীতে ফিরিলেন না। রাত্রি তুইটার সময় বাগানের দিকের জানালায় খট্‌খট্‌ শব্দ হইল, সোদামিনী বুঝিল নরেন আসিয়াছে—মুক্তা খিড়কীর দরজা খুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে—তখন সৌদামিনী অবলীলাক্রমে সেই দরজা দিয়া বাহির হইয়া, বাগান পার হইয়া নরেনের গাড়ীতে গিয়া বসিল। নরেন তাহাকে কলিকাতায় লইয়া গিয়া বৌবাজারে একটা ভাড়াটে বাড়ীতে রাখিল।

কথা আর বাড়াইব না, সেখানে গিয়া সৌদামিনীর মনে ঘোর অনুতাপ আরম্ভ হইল, সে বাড়ীতে ফিরিয়া আসিবার জন্য নরেনের নিকট অনেক কান্দাকাটী করিতে লাগিল। নরেন বলিল, 'আমি তোমাকে তোমাদের বাগানের কাছে রেখে আস্‌তে পারি, কিন্তু তিনি কি তোমাকে ঘরে নেবেন?' সৌদামিনী বলিল, 'ঘরে নেবেন না সে জানি, কিন্তু তিনি যে আমাকে মাপ করবেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। যত বড় অপরাধ হো'ক সত্যি সত্যি মাপ চাইলে তাঁর না বলবার যো নেই, এ যে আমি তাঁর মুখেই শুনেচি, ভাই, আমাকে তুমি তাঁর পায়ের তলায় রেখে এসো নরেন দা, ভগবান তোমাকে রাজ্যেশ্বর করবেন, আমি কায় মনে বলচি।'

নরেন এবার নিতান্ত ভাল মানুষটি হইয়াছে। কিন্তু সে দণ্ডবিধির ৪৯৮ ধারার ভয়ে কিছুতেই নিজে যাইতে সম্মত হইল না। তবে কয়েক দিন যাইতে না যাইতেই সৌদামিনীর সেই ক্ষমার অবতার স্বামী সেখানে নিজেই আসিয়া তাহাকে বাড়ী লইয়া গেলেন।

এই পুস্তকখানির নাম 'স্বামী।' গ্রন্থকার স্বামীকে খুব বড় করিবার জন্য স্ত্রীকে ছোট করিয়াছেন। তবু সৌদামিনীকে প্রধান চরিত্র বলিতে হইবে, এবং লেখকের আর্টের গুণে সৌদামিনীর চরিত্র খুব ভাল ফুটিয়াছে। সৌদামিনী আমাদের সহানুভূতি আকর্ষণ করে, তাহার অনুতপ্ত হৃদয়ের জন্য। গ্রন্থকার গোড়া হইতে শেষ পর্যান্ত তাহার নিজের জ্বালাময়ী অনুশোচনার ভাষায় তাহার হৃদয়ের ছবি আমাদের কাছে ধরিয়াছেন। সৌদামিনীর ন্যায় পার্ব্বতীকে কিন্তু একবারও অনুশোচনা করিতে দেখা যায় নাই। পার্ব্বতীও সৌদামিনীর ন্যায় এক জন দেবচরিত্র স্বামী পাইয়াছিল, কিন্তু পার্ব্বতী তাঁহাকে এক দিনের তরেও ভালবাসিতে চেষ্টা করে নাই, সে তাহাকে বরাবর পর ভাবিয়া আসিয়াছে আর পর পুরুষ দেবদাসকেই আপন ভাবিয়াছে। বৃদ্ধ ভুবনবাবুর কথা মনে পড়িলে পার্ব্বতীর কেবল হাসি পাইত, আর তাহার হৃদয়ের কান্না দেবদাসের জন্য মজুত করিয়া রাখিয়াছিল। অথচ লেখকের আর্টের জন্য আমরা পার্ব্বতীর দুঃখে দুঃখিত না হইয়া পারি না। পার্ব্বতীর জন্য আমাদের সহানুভূতি হয়, তাহার দুঃখ দেখিয়া—আর সৌদামিনীর জন্য আমাদের সহানুভূতি হয়, তাহার অনুতাপ দেখিয়া।

পার্ব্বতী ও দেবদাস, শৈবলিনী প্রতাপের ন্যায় এক বৃন্তে দু'টি ফুলের ন্যায় প্রায় জন্ম হইতে ফুটিয়াছিল। ভাগ্য বিপর্য্যয়ে তাহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া উভয়েই জীবনে ঘোরতর দুঃখ ভোগ করিল। কিন্তু সৌদামিনীর বেলায় এ কথা খাটে না। সৌদামিনী মামার যত্নে উত্তম রূপে আধুনিক শিক্ষা লাভ করিয়াছিল। সে দর্শনশাস্ত্রের জটিল প্রশ্ন লইয়া তর্ক করিতে পারিত, অথচ নিজের হিতাহিত বুঝিল না। বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের যুবকগণ যে নিরীশ্বর শিক্ষা godless education পাইতেছে, তদ্দ্বারা সমাজের বিশেষ অনিষ্ট সাধিত হইতেছে, এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন। আমাদের বালিকাগণও যদি সেইরূপ শিক্ষা পাইয়া তাঁহাদের চরিত্র গঠন করিতে অসমর্থ হন, তবে তাঁহাদিগকে এইরূপ শিক্ষা দেওয়া কত দূর সঙ্গত তাহা বিবেচনার বিষয় হইয়াছে। সৌদামিনী তাঁহার মামার নিকট এই godless education

পাইয়াছিল, এবং নরেনের সঙ্গে অবাধে মিশিতে পাইয়া তাহার প্রতি অবৈধ প্রেমে আসক্ত হইল। এইরূপ অগঠিত-চরিত্র যুবক যুবতীকে পরস্পরের সহিত অবাধে মিশিতে দেওয়া আমাদের সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় কতদূর সমীচীন তাহাও এ স্থানে বিবেচ্য। বাড়ীতে শাসন আলগা ছিল বলিয়াই নরেন সৌদামিনীর 'পারের কাণ্ডারী' হইয়া তাহার পারের মাশুল আদায় করিয়া লইতে পারিয়াছিল, এবং উভয়ে নিভৃত লতাকুঞ্জে মিলিত হইয়া প্রেমালাপ করিবার অবসর পাইয়াছিল। বলা বাহুল্য, ইহার জন্য সৌদামিনীর সেই 'পণ্ডিত মূর্খ' মামাই দায়ী। সৌদামিনী তাহার মামার নিকট এইরূপ বিকৃত শিক্ষা পাইয়াছিল, তাহার পরে স্বামিগৃহে গিয়া স্বামীর মহৎ চরিত্র দেখিয়া তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইতে না হইতে, নরেন আসিয়া তাহার কাণে মধুর হলাহল ঢালিয়া দিল। নরেন তাহাদের বিচ্ছেদের কারণ সমাজের ঘাড়ে চাপাইয়া বলিল, 'তুমি ত জান আমাদের মিথ্যে শাস্ত্রগুলো শুধু মেয়ে মানুষকে বেঁধে রাখবার শেকল মাত্র। যেমন করে হোক্, আটকে রেখে তাদের সেবা নেবার ফন্দি। সতীর মহিমা কেবল মেয়ে মানুষের বেলা—পুরুষের বেলায় সব ফাঁকি? আত্মা, আত্মা যে করে, সে কি মেয়েমানুষের দেহে নেই? তার কি স্বাধীন সত্তা নেই? সে কি শুধু এসেছিল পুরুষের সেবাদাসী হবার জন্য? ··কোন্ দেশের মেয়েরা ইচ্ছা করলে এমন বিয়ে লাথি মেরে ভেঙ্গে দিয়ে যেখানে খুসী চলে যেতে না পারে?' ইত্যাদি।

বলা বাহুল্য, এই সকল আপাতমনোরম সমাজদ্রোহীর যুক্তিতে সকলে ভুলিত না। কিন্তু সৌদামিনীর মন তাহার মামার শিক্ষায় এইরূপ যুক্তিতে ভুলিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল, এবং তাহার ফল হাতে হাতে ফলিল। এইরূপে আমরা দেখিলাম, সৌদামিনীর অধঃপতনের বীজ বাল্যকাল হইতেই তাহার হৃদয়ে উপ্ত হইয়া কালক্রমে সুযোগ পাইয়া তাহা পল্লব পুষ্পে শোভিত হইয়া অবশেষে বিষময় ফল প্রসব করিল। গ্রন্থকার তাহাকে সেইরূপ অবস্থা পরম্পরার মধ্যে স্থাপিত করিয়া, তাঁহার কলা কৌশলের পরিচয় দিয়াছেন এবং তাহাকে অনুশোচনায় দগ্ধ করিয়া তাহার প্রতি আমাদের সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়াছেন। কিন্তু সৌদামিনী যতই অনুতাপ করিয়া তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করুক, তাহার অধঃপতনের ইতিহাস যে একটা অস্বাস্থ্যকর আব-হাওয়ার সৃষ্টি করিবে সে বিষয় সন্দেহ নাই। আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ সমাজে পরকীয় প্রেমাসক্তা সৌদামিনীর সংখ্যা হয় ত বাড়িবে, কিন্তু দেবচরিত্র ঘনশ্যামের সংখ্যা বেশী বাড়িবে বলিয়া বোধ হয় না।

এই স্থানে বর্ত্তমান সময়ের একটা প্রধান সামাজিক সমস্যার আলোচনা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। সর্ব্বজন বিগর্হিত বরপণ প্রথার জন্যই হউক, বা অন্য যে কারণে হউক, আমাদের সমাজে অনূঢ়া কন্যাদিগের বয়স ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে। যাঁহারা ইয়ুরোপীয় আদর্শে আমাদের সমাজ সংস্কার করিতে প্রয়াসী, তাঁহারা ইহাকে শুভলক্ষণ বলিয়া মনে করেন। কিন্তু অধিক বয়সে মেয়ের বিবাহ দিলে যদি পার্ব্বতী ও সৌদামিনীর সৃষ্টি হয়—এবং তাহা যে কালক্রমে না হইবে এরূপ বলা যায় না—তবে ইউরোপীয় আদর্শটা আমাদের অবিচারে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য কি না, তাহা একবার বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত।

ক্রমশঃ।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ।

বিশ্বাসবাড়ীর বড় গিন্নী।

বলরামপুরের বনমালী বিশ্বাস এক জন সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থ ছিলেন। ইনি জাতিতে দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ। বাঙ্গালা ১২৪৫ সালে অনুমান ৬০ বৎসর বয়সে বনমালী দেহত্যাগ করেন। বনমালীর পৈত্রিক সম্পত্তি ছিল, আর তিনি নিজে নীল কুঠীর চাকরি করিয়া বিস্তর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন এবং সম্পত্তি বাড়াইয়া ছিলেন। বাটীর নিকটস্থ বাহাদুরপুরে এক প্রকাণ্ড কুঠী ছিল, এবং বনমালী তাহার বাঙ্গালী কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ছিলেন।

বনমালীর দুই সংসার। প্রথম পক্ষের স্ত্রী একমাত্র পুত্র ব্রজনাথকে রাখিয়া দেহত্যাগ করেন। বনমালীর বয়স তখন প্রায় চল্লিশ বৎসর হইবে। অবস্থা ভাল বলিয়া অনেকেই তাহাকে কন্যা সমর্পণ করিতে প্রস্তুত হইলেন, এবং বনমালী পুনরায় দার পরিগ্রহ করিলেন। তাঁহার দ্বিতীয়া স্ত্রী তিনটী পুত্র প্রসব করিয়া সধবা অবস্থাতেই গতাসু হন। প্রতিবেশীরা তাঁহাকে তৃতীয় বার বিবাহ করিতে অনুরোধ করিলেও তিনি তাহা করেন নাই। এই সময়ে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ব্রজনাথের বয়স প্রায় ২০ বৎসর হইয়াছিল। বনমালী একটী ভাল ঘরের কন্যা দেখিয়া তাহার সহিত ব্রজনাথের বিবাহ দেন এবং দ্বাদশবর্ষীয়া পুত্রবধূকেই সংসারের সমস্ত ভার অর্পণ করেন। এই পুত্রবধূ কোণা গ্রামের কুলীনশ্রেষ্ঠ কাঙ্গালীচরণ ঘোষ মহাশয়ের কন্যা। কাঙ্গালীর সহিত বনমালীর

অনেক দিন ধরিয়া জানাশুনা ছিল। কুঠীর কার্য্যোপলক্ষে তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে কোথায় যাইতে হইত, এবং তিনি ঘোষ মহাশয়ের বাড়ীতে সময়ে সময়ে বিশ্রাম করিতেন। সেই সূত্রে তিনি এই কন্যাটীকে দেখিয়াছিলেন এবং ইহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠন ও লক্ষণাদি দেখিয়া ইহাকে পুত্রবধূ করিবেন তাঁহার এইরূপ ইচ্ছা হইয়াছিল। কন্যাটীর নাম ভবতারিণী।

বাঙ্গালা ১২৩৫ সালে বার বৎসর বয়সে কাঙ্গালীচরণের কন্যা ভবতারিণী নববধূরূপে বিশ্বাসগৃহে প্রবেশ করেন, এবং কয়েক বৎসরের মধ্যে ইনিই বড় গিন্নী নামে পরিচিত হন। ইহার তিন দেবর বামাচরণ, শ্যামাচরণ ও তারাচরণ সকলেই ইহা অপেক্ষা বয়সে ছোট ছিলেন এবং ইহাকে জননীর ন্যায় দেখিতেন। ব্রজনাথ জ্যেষ্ঠ পুত্র বলিয়া বনমালীর মৃত্যুর পর তিনি বাড়ীর 'বড় কর্ত্তা' হন। গ্রামে তাঁহার পিতৃব্য পুত্র প্রভৃতি ভাই সম্পর্কের যত লোক ছিল, ব্রজনাথ তাহাদের সকলের অপেক্ষা বয়সে বড় ছিলেন, সুতরাং ভবতারিণীর ভাশুর সম্পর্কের কেহই ছিল না।

বিশ্বাসদের বাড়ীকে গ্রামের লোকে বড় বাড়ী বা দেওয়ান বাড়ী বলিত। গ্রামের অন্য কাহারও অবস্থা বিশ্বাসদের মত ছিল না বলিয়া বড় বাড়ী আর বনমালী বিশ্বাস নীলকুঠীর দেওয়ান ছিলেন বলিয়া দেওয়ান বাড়ী নাম হইয়াছিল। বাঙ্গালার বহু গ্রামে এখনও এইরূপ নামের বাড়ী পাওয়া যায়। বড় বাড়ীর বড় বধূ বলিয়াও ভবতারিণীর বড় গিন্নী নামের সার্থকতা ছিল। শ্বশুর বনমালীর তিনি অতি আদরের বধূ ছিলেন।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা এই বড় গিন্নী সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা লিপিবদ্ধ করিব। আমাদের জ্ঞান হইবার পর আমরা প্রথমতঃ বড় গিন্নীকে প্রৌঢ় বয়সের এবং শেষে তাঁহাকে বৃদ্ধাবস্থায় দেখিয়াছি। বড় ঘরের বড় বউ হইলেও বড় গিন্নীর বেশ ভূষার কোনও পারিপাট্য ছিল না। অলঙ্কার তাঁহার অতি সামান্যই ছিল। বড় গিন্নীর হাতে তাগা কখনও উঠে নাই। কানে নাকে গলায় নীচে হাতে যাহা কিছু গহনা ব্যবহার করিতেন তৎসমুদয়ের মূল্য বোধ হয় এখনকার মধ্যবিদ্ গৃহস্থের ঘরের বধূর একখানি অলঙ্কারের মূল্য অপেক্ষাও কম। আজ কাল সমাজে স্ত্রীলোকের পেটে ভাত না থাকিলেও গায়ে গহনা কিছু থাকা চাই-ই।

বড় গিন্নী জীবনে সায়া সেমিজ প্রভৃতি ব্যবহার করেন নাই। তবে তিনি কখনও পাতলা কাপড় পরিতেন না, আর লজ্জার আভরণ অবগুণ্ঠন কখনও ত্যাগ

করিতেন না। আমরা যখন তাঁহার দৌহিত্রের বয়সের বালক, তখনও এক দিনের জন্যও বড় গিন্নীকে অনাবৃত মস্তক দেখি নাই। অথচ দেবর প্রভৃতি সকলের সঙ্গেই তিনি স্বাধীন ভাবে কথা বার্ত্তা কহিতেন। শুনিয়াছি, বিবাহের পর হইতেই শ্বশুরের আদেশে শ্বশুরের সহিত তাঁহাকে কথা কহিতে হইত। বনমালীকে তিনি পিতার ন্যায় দেখিতেন। বড় গিন্নী রূপসী ছিলেন না। সুলক্ষণযুক্তা সুন্দর দেহবিশিষ্টা ছিলেন, ইহা পূর্ব্বেই আভাষ দিয়াছি।

বড় গিন্নী প্রত্যহ অতি প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিতেন, এবং রাত্রিতে প্রায়ই বাড়ীর সকলের শেষে নিজে শয্যা গ্রহণ করিতেন। সংসারের যত কিছু কাজ কর্ম্ম, গোশালা, ঠাকুরঘর প্রভৃতির সহিত বাড়ীর সমস্ত স্থান পরিষ্কার করা হইল কি না ইহা হইতে রন্ধন, পরিবেশন প্রভৃতি সমস্তই তিনি নিজে দেখিতেন। কিন্তু তাঁহাকে স্বহস্তে বিশেষ কিছু করিতে হইত না। দেবর বধূগণ এবং পুত্রবধূ তাঁহার আদেশে যাহা কিছু করিতেন, অন্যান্য কার্য্য ভৃত্যেরা করিত। বড় গিন্নী নিজে কেবল দুই তিনটী কার্য্য করিতেন। সকাল বেলায় বাড়ীর ছেলে মেয়েদের ভাত রাঁধিয়া দেওয়া আর রাত্রে সকলকে দুধ বণ্টন করিয়া দেওয়া তাঁহার নিত্য কর্ম্মের মধ্যে ছিল। আলু, পটল, বেগুন, কাঁচকলা, কাঁঠাল বিচি প্রভৃতি যে সময়ের যাহা তাহাই ভাতে দিয়া ভাত রাঁধিয়া ছোট ছেলেদের না খাওয়াইলে, আর রাত্রিতে চাকর চাকরাণী এবং ঘোড়ার সহিসকে অবধি দুধ ভাগ করিয়া না দিলে তাঁহার তৃপ্তি হইত না। বড় গিন্নীর সময়ে পল্লীগ্রামে দুগ্ধ দুষ্প্রাপ্য ছিল না, আর তাঁহার বাসস্থানে প্রাতঃকালে বাড়ীর বালকবালিকাদিগকে চিড়ে মুড়ি কিংবা দোকানের বিষাক্ত খাবার না দিয়া গরম ভাত এবং একটু টাট্কা গাওয়া ঘি দিবার ব্যবস্থা ছিল। বঙ্গের বহু পল্লীবাসীর সৌভাগ্য যে, এখনও বালকবালিকার জন্য এইরূপ খাদ্যের ব্যবস্থা আছে, এবং এই জন্যই বোধ হয় সে সকল স্থানে সহরের ন্যায় শিশুদের উদরের সহিত লিভার কিংবা যকৃতের সম্ভাব অধিক হয় না।

অতিথি অভ্যাগতের আহারাদির বন্দোবস্ত করিবার জন্য বড় গিন্নী সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতেন। রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্তও কোনও অতিথি আসিলে যাহাতে তাহার জন্য দুগ্ধ মৎস্যের অভাব না হয়, এ বিষয়ে তাঁহার লক্ষ্য ছিল। এখনও বলরামপুর এবং তাহার নিকটস্থ গ্রামগুলিতে কোনও স্থানে অসময়ে আগত অতিথির আহারের ব্যবস্থা ভাল হইলে লোকে বলে, ঠিক যেন বড় গিন্নীর বন্দোবস্ত।

দুর্গোৎসব পূজার সময়ে বড় গিন্নী অনিমন্ত্রিত দরিদ্রদিগকে সামান্য খাদ্যদ্রব্য সহ এক একখানি সরা দিতেন। সরায় থাকিত কিছু চিঁড়ে মুড়কি, দুটী পাকা কলা, দুখানি বাতাসা এবং দুটী নারিকেল নাড়ু। জিনিস অতি অল্প মূল্যের হইলেও ইহাই বড় গিন্নী এমন ভাবে সাজাইয়া এত যত্নের সহিত লোককে দিতেন যে, অনেকেই উহা পাইবার জন্য আগ্রহ করিত।

অতিথি অভ্যাগত ব্যতীত নিজ গ্রামের বা নিকটস্থ গ্রামের যে কোনও ভদ্রলোক বাড়ীতে আসিলেই সময় মত জল খাইতে বা আহার করিতে অনুরুদ্ধ হইতেন। বালক, যুবক প্রভৃতি যাঁহারা বড় গিন্নীকে প্রণাম করিতে বাড়ীর ভিতরে যাইতেন, তিনি তাঁহাদিগকে স্বহস্তে খাদ্যদ্রব্য দিতেন। যাঁহারা বাহিরে থাকিতেন, তাঁহাদের জন্য জল খাবার বাহিরে প্রেরিত হইত। পল্লীগ্রামে সন্দেশ মিঠাই প্রভৃতি মিষ্টান্ন সকল সময়ে প্রাপ্য নহে। বড় গিন্নী ফল যে কালে যাহা মিলে, তাহাই দিতেন। সঙ্গে সঙ্গে চিনি, বাতাসা বা মিছরি প্রভৃতি দেওয়া হইত। বৈশাখ মাসের শেষ হইতে আষাঢ় মাসের কিছু দিন পর্য্যন্ত প্রথম যত দিন গাছের আম থাকিত, তত দিন বিকাল বেলায় যিনিই আসিতেন, তাঁহাকে সুপক্ক মিষ্ট আম খাইতে দেওয়া হইত। বিশ্বাসদিগের বাগানে আম, জাম, বেল, কাঁঠাল, লিচু, নারিকেল, জামরুল, পেয়ারা, আনারস প্রভৃতি বহু ফলের গাছ ছিল, এবং সকল ফলই বাড়ীতে ব্যবহৃত বা বিতরিত হইত। বড় গিন্নীর কাজ কর্ম্ম যারপর নাই হিসাবী এবং পরিষ্কার ছিল। তাঁহার হাতে কোনও দ্রব্যের অপচয় হইত না, অথচ কোনও অপরিষ্কার দ্রব্যও গৃহে স্থান পাইত না। পানের মশলা, রাঁধিবার মশলা প্রভৃতি তিনি অতি যত্নের সহিত খুঁটিয়া বাছিয়া এবং কোনও কোনও জিনিস ধুইয়া শুকাইয়া ঘরে তুলিতেন। পান এমন পরিষ্কার করিয়া ধুইতেন যে, তাহাতে কোনও প্রকার ময়লা কিছু থাকিতে পারিত না। সমস্ত পানগুলি জলে ধুইয়া শেষে পরিষ্কার ভিজে ন্যাকড়া দিয়া প্রত্যেক পানটীর এ পিঠ ও পিঠ মুছিয়া ফেলিতেন।

চালের ক্ষুদ, ডালের ক্ষুদ, তরকারীর ছোব্‌ড়া, আমের খোসা, কাঁঠালের ভুতুড়ো প্রভৃতি কোনও জিনিসই বড় গিন্নী নষ্ট হইতে দিতেন না। যাহা মানুষের ব্যবহারে আসিতে পারিত, তাহা মানুষেই ব্যবহার করিত ; যাহা গরুতে খাইতে পারে, তাহা গোশালায় যাইত। এখনও বিশ্বাসবাড়ীতে পান ধোওয়া, মশলা ধোওয়া প্রভৃতি এবং ক্ষুদ্র দ্রব্যের ব্যবহার এই ভাবেই হইয়া থাকে। যাহা কোনরূপ কাজে লাগিতে পারে, তাহা কখনই ফেলিয়া দেওয়া হয় না।

বিশ্বাসদিগের ভদ্রাসন বাটীর সংলগ্ন প্রায় পঁচিশ ত্রিশ বিঘা জমী ছিল। বাগান, পুকুর ব্যতীত অনেক জায়গাই খালি পড়িয়া থাকিত এবং ইহাতে লাউ, কুমড়া, বেগুন, শশা, মূলো, ঝিঙ্গে, উচ্ছে, কলা, কচু নানা প্রকার শাক এবং তামাক পর্য্যন্ত জন্মিত। কোন্ সময়ে কোন্ বীজ বা গাছ লাগাইতে হয়, বড় গিন্নী তাহা জানিতেন এবং তিনিই এই সমস্ত ফল মূল ইত্যাদি বাড়ীতে উৎপন্ন করিবার ব্যবস্থা করিতেন। ভৃত্যেরা তাঁহার আদেশ অনুসারে কার্য্য করিত।

খামার জমীতে ধান, মুগ, মাষকড়াই, মটর, মসুর প্রভৃতি শস্য এবং সরিষা, তিশি, পাট, ইক্ষু প্রভৃতি জন্মিত। ক্ষেত্রের সরিষা কলুবাড়ীতে পাঠাইয়া পারিশ্রমিক দিয়া খাঁটি তেল করিয়া আনা হইত। পান, লবণ, মাছ, মিষ্টি, মশলা ভিন্ন অন্য দ্রব্য প্রায়ই কিনিতে হইত না। বাড়ীর গাভীগুলিই প্রচুর দুগ্ধ দিত এবং সেই দুধের সর পাতিয়া উৎকৃষ্ট ঘৃত প্রস্তুত হইত। মোটের উপর বড় গিন্নীর সংসার লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের ন্যায় ছিল। চিকিৎসা শাস্ত্রে কোনরূপ জ্ঞান না থাকিলেও সামান্য সামান্য ব্যারামের টোট্‌কা ঔষধ ও মুষ্টিযোগ বড় গিন্নীর এত জানা ছিল যে, গ্রামের বালক বালিকাদের কোনরূপ অসুখ হইলে তাহাদের বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা বড় গিন্নীর কাছে আসিতেন এবং তাঁহার প্রদত্ত ঔষধ বা ব্যবস্থা লইয়া যাইতেন। ইহাতেই অনেক সময়ে শিশুদের রোগ নিবারিত হইত। বিশ্বাসদের বাড়ীর বড় পুষ্করিণীর চারি ধারে নিম, ডালিম, বাকস, আনারস, কুটরাজ, শেফালিকা ফুলের গাছ প্রভৃতি নানা রূপ গাছ ছিল। এই সমস্ত গাছের ছাল কিংবা পাতা হইতে অনেকরূপ ঔষধ হইত। টাট্‌কা মধু প্রভৃতি অনুপান সর্ব্বদা বড় গিন্নীর ঘরেই থাকিত। ইহা ভিন্ন রুগ্ন, দরিদ্র প্রতিবেশীদের জন্য পথ্যের ব্যবস্থা অনেক সময়েই বিশ্বাসবাড়ীতেই হইত। মিছরি, সরু চাল, মুগ কিংবা মসুর ডাল প্রভৃতি যাহার যাহা কিছু প্রয়োজন, কিনিবার অবস্থা না থাকিলে বড় গিন্নীই তৎসমস্ত দান করিতেন। এইরূপ দানে বিরক্তির লেশ মাত্র ছিল না।

সময়ে সময়ে বিশ্বাসদের পুষ্করিণীতে মাছ ধরা হইত। বড় গিন্নী যে ভাবে গ্রামবাসী সকলকে মাছ বিতরণ করিতেন, তাহাতে মনে হইত যে, গ্রামের লোকের জন্যই মাছ ধরা হইয়াছে। পুষ্করিণীর পশ্চিম ধারে, বাড়ীর পূর্ব্বে, বাঁধা ঘাটের কাছে একটী প্রকাণ্ড বকুল গাছ ছিল। সমস্ত মাছ ধরা হইয়া এই গাছের নীচে আসিয়া জমা হইত। গ্রামের বালক বালিকা এবং

অনেক বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা আসিয়া সেইখানে, সারিবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইত। বড় গিন্নী আসিয়া দুই একটা বড় মাছ কাটিবার আদেশ দিতেন, এবং যে বাড়ীতে যত লোক প্রায় সেই অনুপাতেই মাছ বিলাইবার ব্যবস্থা করিতেন। ইহা ছাড়া অন্য রূপ হিসাবও ছিল। যাহার বাড়ীতে জামাই আসিয়াছে, তাহাকে বড় মাছের ভাগ কিছু অধিক দেওয়া হইত। যাহার বাড়ীতে অসুস্থ লোক আছে, তাহাকে মৌরলা প্রভৃতি ছোট মাছ দেওয়া হইত। যাহার যে রূপ মাছের দরকার, তজ্জন্য বড় গিন্নীর কাছে আবদার করা চলিত। সকলের প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিত, তাহাই শেষে বিশ্বাসবাড়ীতে যাইত। অবস্থা বিশেষে বড় গিন্নী কোনও কোনও দিন কিঞ্চিৎ অগ্রভাগও বাড়ীতে পাঠাইতেন। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বের আমাদের বাল্য কালের বড় গিন্নীর এই মৎস্য বিতরণের ব্যবস্থা এবং উদারতার দৃশ্য মনে পড়িলে ইহা বর্ত্তমান সময়ে বৃদ্ধ বয়সে আমাদের নিকট সুখ স্বপ্নের ন্যায় মনে হয়।

একবার জগদ্ধাত্রী পূজার দিন পূজার পর নিমন্ত্রিত লোকের আহার ও কাঙ্গালী ভোজন প্রভৃতি হইয়া গিয়াছে। সন্ধ্যা হয় হয়, এমন সময়ে একটী নীচ জাতীয় দরিদ্র রমণী তিনটী অল্পবয়স্ক বালক সঙ্গে লইয়া আসিয়া দু'টি অন্ন ভিক্ষা করিল। তখন বাড়ীতে অধিক লোক নাই। যাহারা কাজ কর্ম্ম পরিবেশনাদি করিয়াছিল, তাহারা নদীতে স্নান করিতে গিয়াছে। একটী ভৃত্য রমণীকে কহিল, এখন আর ভাত হবে না। দুটো চাল কি একটা পয়সা নিয়ে যা। রমণী কাতর স্বরে কহিল, 'দুটী প্রসাদ পাব না?' বড় গিন্নী দূর হইতে দেখিতে ও শুনিতে পাইয়া ছুটিয়া আসিয়া কহিলেন, 'বস, প্রসাদ পাবে বই কি!' ভৃত্যকে কহিলেন, 'পাতা এনে দে, আমার ভাত বাড়া আছে, দিচ্ছি।' ভৃত্য আদেশ পালন করিলে বড় গিন্নী তাহার নিজের জন্য রক্ষিত অন্ন-ব্যঞ্জনাদি আনিয়া পাতায় ঢালিয়া দিলেন। দরিদ্র রমণী এবং তাহার তিনটী পুত্রের জন্য খাদ্য পর্য্যাপ্ত হইবে না মনে করিয়া তিনি কহিলেন, 'খাও, পরিবেশকদের জন্য ভাত চড়েছে, শীঘ্রই ভাত হবে, আর তারা এলে তরকারীও দিতে পারবে।' স্ত্রীলোকটী আহারে বসিবার কিঞ্চিৎ পরেই পরিবেশকেরা ফিরিয়া আসিলেন এবং বড় গিন্নীর আদেশ মত রমণীও তাহার শিশুপুত্রগণকে আকণ্ঠ পুরিয়া খাইতে দিলেন। অন্ন কিছু অধিক হওয়ায় রমণী আপনার বসনাঞ্চলে উহা বাঁধিয়া লইল এবং 'ভাত ক'টী কাল সকালে ছেলেগুলোকে খাওয়াব' বলিয়া বড় গিন্নীর দিকে চাহিয়া কহিল, 'মা, যেমন

প্রাণ ঠাণ্ডা কল্লে, তেমনই সুখেই থেকো।' এই সময়ে কিঞ্চিৎ দূরে বাহিরের উঠানে পুরোহিত ঠাকুর বসিয়া তামাকু খাইতেছিলেন। গৃহস্বামী ব্রজনাথ তাঁহার নিকটে বসিয়া তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন। এই নীচ জাতীয়া রমণীর আহারের ব্যবস্থা দেখিয়া ব্রাহ্মণ প্রাণের আবেগে বলিয়া উঠিলেন, 'বড় বাবু, এই এতক্ষণে আপনার বাড়ীতে মা খেলেন। আমরা পূজার মন্ত্র উচ্চারণ করি বটে, মাকে আবাহন করি বটে, কিন্তু তাতে মার পূজো হয় না। আমার বিশ্বাস, মা এই মুচী রমণী রূপে এসে বড় মার হাত থেকে পূজো নিয়ে গেলেন।'

গৃহস্বামীর চক্ষে জল আসিল। বড় গিন্নীর নিজের ভাত তরকারী ক্ষুধার্ত্ত রমণীকে ধরিয়া দেওয়া তিনিও লক্ষ্য করিয়াছিলেন।

একবার গ্রীষ্মকালে এক দিন রাত্রিতে দশ বার জন বারেন্দ্র শ্রেণীর কুলীন ব্রাহ্মণ আসিয়া বিশ্বাসদের বাড়ীতে উপস্থিত হন। তাঁহারা নৌকাযোগে এক স্থান হইতে অন্যত্র যাইতেছিলেন; পথে নদীর মধ্যে নৌকা ডুবিয়া যাওয়ায় বিপন্ন অবস্থায় তাঁহাদিগকে বিশ্বাসবাড়ীতে আসিতে হয়। তাঁহারা কায়স্থের বাড়ীতে আহার করেন না বলিয়া রাত্রে উপবাসী থাকিবেন এইরূপ মত প্রকাশ করেন। বড় গিন্নী ইহা জানিতে পারিয়া চিন্তিত হইলেন, এবং ব্রাহ্মণদিগকে কিছুতেই অভুক্ত থাকিতে দেওয়া হইবে না বলিয়া উঁহাদের স্বশ্রেণীর এক অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, যিনি নিকটস্থ দুর্গাপুর গ্রামে বাস করিতেন, তাঁহাকে ডাকাইলেন। ব্রাহ্মণ আসিলে বড় গিন্নী তাঁহাকে দুই একটী কথা বলিতেই, তিনি বাহিরের আগন্তুক ব্রাহ্মণেরা শুনিতে পান, এমন ভাবে কহিলেন, 'বড় মা, আমার কতকগুলি ব্রাহ্মণ অতিথি এসেছেন। তাঁদের খাবার মত জিনিস পত্র আমাকে ভিক্ষা দিন।' বড় মা প্রস্তুত ছিলেন, তিনি সমস্ত দ্রব্যই দিলেন। দরিদ্র ব্রাহ্মণ সেইগুলি বাহিরে আনিয়া ব্রাহ্মণদিগকে নিজের পরিচয় দিয়া কহিলেন, 'আপনাদের জন্য আমি ইহা ভিক্ষা করিয়া এনেছি, গ্রহণ করুন।' ব্রাহ্মণদের জঠরানল জ্বলিতেছিল। তাঁহারা কহিলেন, 'আপনি কিছু দিলে তাহা গ্রহণ করিতে কোনও আপত্তি নাই।' এরূপ বিষয়ে বড় গিন্নীর বুদ্ধি এইরূপ ভাবে সর্ব্বদাই খুলিত। 'পতি পরম দেবতা' প্রভৃতি বাক্যযুক্ত লকেটাদি কখনও চক্ষে না দেখিলেও বড় গিন্নী স্বামীকে অকৃত্রিম ভক্তি করিতেন, কিন্তু তাঁহাকে জুজুব মত দেখিতেন না। শেষ বয়সে অনেক

সংক্রান্তির পূর্ব্ব দিন বাড়ীর গরুর রাখাল বড় গিন্নীর নিকট পরের দিন পিটে খাইবার জন্য ছুটী প্রার্থনা করে এবং তাঁহার অনুমতি অনুসারে সংক্রান্তির দিন কার্য্যে অনুপস্থিত হয়। সকাল বেলায় রাখাল না আসায় কিঞ্চিৎ অসুবিধা হইয়াছে শুনিয়া গৃহস্বামী ব্রজনাথ বিদ্রূপের স্বরে একটী ভৃত্যকে কহেন, 'যিনি রাখালকে ছুটী দিয়াছেন, তাঁকে এসে গরুর কাজ করতে বল।' বড় গিন্নী অধিক দূরে ছিলেন না। তিনি কথাটী শুনিতে পাইয়াই কোমরে আঁচল বাঁধিয়া গোশালায় প্রবেশ করিলেন এবং এক একটী করিয়া গরু বাহির করিতে লাগিলেন। একটী ভৃত্য ইহা দেখিতে পাইয়া 'বড় মা সরুন, বড় মা বাহিরে আসুন', বলায় বড় গিন্নী উত্তর করিলেন, 'তুই সর্ না, কর্ত্তার হুকুম, আমি আজ গরুর কাজ কর্‌বো।' কথা ক'টী মধ্যম ভ্রাতা বামাচরণ বাবুর কানে গেল। তিনি তাড়াতাড়ি আসিয়া ভ্রাতৃজায়ার চরণোপরি মস্তক নত করিয়া কহিলেন, 'মাপ করুন্, মাপ করুন্, আপনি গরুর কাজ করে আমাদের জাত মার্‌বেন না ; দাদামশায়ের ঘাট্ হয়েছে।'

ইহার কিছু কাল পরে এক দিন ব্রজনাথের অনুমতি লইয়া ঘোড়ার সহিস তাহার শ্বশুরবাড়ী গিয়াছে। ঘোড়ার জন্য ঘাস তুলিয়া তাহা এমন অসাবধানে রাখিয়া গিয়াছিল যে, গরুতে উহা সমস্তই খাইয়া গিয়াছে। পূর্ব্ব রাত্রে অত্যন্ত বৃষ্টি হওয়ায় কৃষাণেরা সকলেই ক্ষেতে কাজ করিতে গিয়াছে। চাকরেরা বাড়ীর নালা নর্দ্দামা পরিষ্কার করিতেছে। বড় গিন্নী অবস্থা দেখিয়া, কর্ত্তা শুনিতে পান, এমন ভাবে, কনিষ্ঠ দেবরকে কহিলেন, 'তোমার দাদামশাইকে যেয়ে জিজ্ঞেস কর ঘোড়ার ঘাস কাট্‌তে আজ আমি যাব না তিনি যাবেন ?'

স্বামীর সহিত এইরূপ ব্যবহার করিলেও বড় গিন্নী তাঁহার দেবরদিগকে নিজের পুত্রের ন্যায় দেখিতেন। বড় গিন্নীর একমাত্র পুত্র এবং দ্বিতীয় দেবর শ্যামাচরণ এই দুই জন চাকুরি উপলক্ষে বিদেশে যাইতেন, এবং বৎসরে একবার কি দুইবার মাত্র বাড়ীতে আসিতেন। প্রথম ও তৃতীয় দেবর বার মাস বাড়ীতেই থাকিতেন, এবং তাঁহারা ভ্রাতৃজায়ার আজ্ঞাকারী ভৃত্যের ন্যায় ছিলেন। সংসারের অনেক বিষয়ে তাঁহারা বড় গিন্নীর আদেশ লইয়া কার্য্য করিতেন। দুর্গোৎসব পূজার সময়ে গ্রামের এবং নিকটবর্ত্তী গ্রামের কোন্ কোন্ দুঃস্থ ব্যক্তির বাড়ীতে বস্ত্র বিতরণ করিতে হইবে, ইহা বড় গিন্নী নির্দ্দেশ করিয়া দিতেন। কোনও দরিদ্র প্রজা কিংবা অধমর্ণের অবস্থা শোচনীয় হইলে তাহারা আসিয়া বড় গিন্নীর কাছে দুঃখের কান্না কাঁদিত এবং বড় গিন্নীর

অনুমতি অনুসারে তাহাদের সহিত দেনা পাওনার ব্যবস্থা করিতে হইত। দুই এক সময়ে কোনও কোনও বিষয়ে বড় গিন্নী দেবরদিগের কৈফিয়ৎ তলব করিতেন।

বড় গিন্নীর চরিত্র যথাযথ অঙ্কিত করিতে পারিলাম কি না জানি না। প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে তিনি পতি পুত্র পৌত্র দেবর এবং দেবর-পুত্রগণকে রাখিয়া মর্ত্ত্যলোক ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পতি পুত্র এবং দেবরেরা সকলেই এখন গতায়ু হইয়াছেন। পৌত্র এবং দেবর পুত্রেরা সংসার করিতেছেন।

বড় গিন্নীর সহৃদয়তা, সংসারের সকল দিকে সমান দৃষ্টি এবং ক্রিয়াকাণ্ড বা পূজাপার্ব্বণাদির সময়ে সমস্ত দিন উপবাসিনী অবস্থায় সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রম প্রভৃতি সদ্‌গুণ সমাজে ক্রমশঃই বিরল হইয়া আসিতেছে। বঙ্গের গৃহলক্ষ্মীগণ আর কি কখনও বিশ্বাসবাড়ীর বড় গিন্নীর ভাবে অনুপ্রাণিত হইবেন না? আর কি আমরা 'লজ্জাভরণা দিব্যগঠনা' 'জীবপ্রেমপূরিতহৃদয়া' 'বঙ্গজায়া' দেখিতে পাইব না?

শ্রীচন্দ্রশেখর কর বিদ্যাবিনোদ।

সহযোগী সাহিত্য।

লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক ও বঙ্গে দেশীয় শিক্ষা।

অধ্যাপক শ্রীযুত যোগেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত 'লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক ও বঙ্গে জাতীয় শিক্ষা' বিষয়ে এক বিস্তৃত প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। আমরা তাহার সার সংগ্রহ করিয়া দিলাম—

পুরাতন জিনিস লইয়া মানুষ চিরকাল সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। কারণ, কালের গতির সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন জিনিসের আবশ্যকতাও ক্রমে ক্রমে হ্রাস পাইতে থাকে। কিন্তু পুরাতন জিনিসের পুরাতন বলিয়া আদর চিরকালই সমান ভাবে থাকে। পুরাতনের প্রয়োজন অস্বীকার করিলে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়। আমরা আজ নূতন পথের পথিক, সকল বিষয়েই পুরাতনকে পশ্চাতে ফেলিয়া ও ত্যাগ করিয়া নূতনের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি। শিক্ষাবিষয়েও স্যাড্‌লার কমিশনের কার্য্যবিবরণী অনুসারে নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তন হইতেছে। এ সময়ে যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া আমাদের শিক্ষাবিভাগ গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহা একবার স্মরণ করিলে মন্দ হইবে না। কারণ, পুরাতনের সহিত সামঞ্জস্য না রাখিয়া নূতন কিছু গঠন করিতে গেলে তাহা স্থায়ী হইবে না।

১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দ ভারতের শিক্ষাবিভাগে স্মরণীয় বৎসর। ঐ বৎসরে বিলাত হইতে ভারত-শাসন সম্বন্ধীয় যে সকল পত্রাবলী আসে, তাহাতেই এ দেশে শিক্ষা-বিস্তারের কথা বিশদ ভাবে আলোচিত হইয়াছে। স্যার চার্লস উডের স্মৃতি উহার সহিত জড়িত। শুনা যায়, ঐ শিক্ষাসম্বন্ধীয় পত্রাবলী না কি তৎকালীন প্রসিদ্ধ দার্শনিক ও বিশিষ্ট ভাবুক জন ষ্টুয়ার্ট মিল কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছিল। যাহা হউক, সেই পত্রাবলী অনুযায়ী কার্য্য বেশ সুশৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। এক্ষণে আবার নূতন প্রণালীর প্রয়োজন হইয়াছে। স্যার চার্লস উড বেশ বুদ্ধিমত্তার সহিত সে সময় কার্য্য করিয়াছিলেন। দেশীয় শিক্ষার ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কেন্দ্রসমূহকে একত্র করিয়া তাহাদিগের দ্বারা নূতন শিক্ষার প্রবর্ত্তন করাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। দেশ জয় করিবার সঙ্গে সঙ্গে বিজিত প্রজাগণের নৈতিক ও মানসিক উন্নতির উপায় বিধান করাও বিজয়ী জাতির অন্যতম প্রধান কর্ত্তব্য। এই কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়াই ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে এ দেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্য গবর্মেণ্ট বৎসরে ১ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে কৃতসংকল্প হন। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে এই কথাই পুনরালোচিত হয়। দেশের অন্যান্য উন্নতি অপেক্ষা শিক্ষার উন্নতি যে সর্ব্বপ্রথমে প্রয়োজন, সে বিষয়ে তাঁহাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। উদ্দেশ্য—ইংলণ্ডের সহিত সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ হইয়াও যেন ভারতের লোকরা অশিক্ষিত অবস্থায় না থাকে। কারণ, তাহা হইলে শিক্ষিত ইংরাজের নাম কলঙ্কিত হইবে। এমন কি, ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দেও তাঁহারা একখানি পত্রে বঙ্গে শিক্ষা-বিস্তারের বিষয় আলোচনা করিয়াছিলেন। শিক্ষা-বিস্তার না হইলে কখনই ইংরাজ শাসন এ দেশে সুফল প্রদান করিবে না, ইহাই তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। যাহা হউক, প্রথমে কিছু দিন তাঁহারা শিক্ষা-বিস্তারের কোনও প্রকার সুবন্দোবস্ত করিতে পারেন নাই। পরে ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই জুলাই তাঁহারা কি উপায়ে দেশে শিক্ষা-বিস্তার হইতে পারে ও কিরূপ ভাবে শিক্ষা-বিস্তার প্রথমে আরম্ভ করিতে হইবে, তাহা স্থির করিবার জন্য একটী কমিটী গঠন করেন। তাহার পর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেক তর্ক বিতর্কের ফলে ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের আমলে লর্ড মেকলে এক মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন। তাহাতে স্থির হয় যে, ভারতে পাশ্চাত্য সাহিত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়াই বৃটিশ গবর্মেণ্টের উদ্দেশ্য এবং সেই উদ্দেশ্যেই শিক্ষা বিভাগের সমুদায় অর্থ ব্যয় করা হইবে। তাহারই ফলে আজ কেবলমাত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে সপ্তশতাধিক উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়া বৎসরে প্রায় বিশ হাজার ছাত্রকে প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করিতেছে, এবং প্রায় পঞ্চাশটি কলেজ স্থাপিত হইয়া হাজার হাজার গ্রেজুয়েট বাহির হইতেছে। তাহারই ফলে আজ বিশ্ববিদ্যালয়ে এম, এ, পরীক্ষার্থী ছাত্রদিগের সংখ্যা এত অধিক বাড়িয়া গিয়াছে।

১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের শিক্ষাবিষয়ক পত্রাবলী দ্বারা আমাদের দেশে দুইটী উপকার সাধিত হয়। প্রথমতঃ, আমাদের দেশের পুরাতন শিক্ষাপদ্ধতি আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। আমাদের প্রাচীন সভ্যতার উপযোগী করিয়া প্রাচ্য শিক্ষার সহিত পাশ্চাত্য শিক্ষার নব ধারা প্রবর্ত্তিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, আমাদের পুরাতন শিক্ষাপ্রণালী স্বতঃই এখনকার সময়োপযোগী হইত না, সেই জন্যই তাহার সহিত পাশ্চাত্য সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি মিলিত হইয়াছে। তাহাতে

আমাদের নূতন জীবন গঠনের সাহায্য হইতেছে। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে সিপাহি বিদ্রোহের সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে যেমন আমাদের দেশের শাসন-পদ্ধতি আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, সেইরূপ শিক্ষা বিভাগেও পাশ্চাত্য প্রভাবের দ্বারা সমগ্র বিশ্বের বৈজ্ঞানিক উন্নতির সহিত আমাদেরও উন্নতি হইয়াছে।

লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক দেশীয় ভাষায় শিক্ষা দিবার যে ব্যবস্থা করেন, ইংরাজী শিক্ষা প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে সেই আদর্শই আমাদের নিকট আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠে। পাশ্চাত্য জগতের অসীম জ্ঞানভাণ্ডার হইতে জ্ঞান সংগ্রহ করিতে হইলে ইংরাজী শিক্ষার প্রয়োজন, কিন্তু দেশীয় ভাষার সাহায্যে সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতির শিক্ষাদানের ব্যবস্থায় তাহা আরও অধিক উপকারী বলিয়া বিবেচিত হইবে। কেবল ইংরাজী ভাষা মাত্র শিক্ষা করিতেই আমাদের বহুমূল্য জীবনের অনেক সময় কাটিয়া যায়। কাজেই জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার প্রচার করিতে হইলে দেশীয় ভাষায় তাহা করা ভিন্ন অন্য গতি নাই। মাতৃভাষায় শিক্ষা-প্রণালী প্রবর্ত্তিত না হইলে বেণ্টিঙ্কের জনসাধারণকে শিক্ষিত করিবার চেষ্টা কিছুতেই সুফল প্রদান করিত না।

যে সকল ভাষায় দেশের লোক আপনাদের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান করে, সেই ভাষায় শিক্ষা না দিলে তাহাদের বুঝিবার বিশেষ অসুবিধা হইবে। এই কথা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিয়াই তৎকালীন শিক্ষাসমিতি বিদ্যালয়ে ও কলেজে ইংরাজী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে মাতৃভাষা শিক্ষারও ব্যবস্থা করিলেন। শিক্ষাসমিতি এক পত্রে প্রচার করিয়াছিলেন যে, দেশে শিক্ষার বিস্তার করিতে হইলে তাহা দেশীয় ভাষাতেই করিতে হইবে, কারণ, তাহা না হইলে অতি অল্পসংখ্যক লোকই তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে। ইংরাজী শিক্ষিত লোকের সংখ্যা এ দেশে খুবই কম। অতি অল্প আয়াসে এক জন লোককে তাহার মাতৃভাষা লিখিতে ও পড়িতে শিখাইতে পারা যায়। সেই জন্যই গবমেণ্ট ইংরাজী পুস্তকসমূহ দেশীয় ভাষায় অনুবাদ করাইয়া তাহা বহুল পরিমাণে প্রচার করিবার ব্যবস্থা করেন। অবশ্য যাঁহারা প্রভূত জ্ঞান লাভ করিয়া বিখ্যাত পণ্ডিত হইতে চাহেন, তাঁহাদিগকে ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিয়া পাশ্চাত্য জ্ঞানভাণ্ডার নিজেদের নিকট উন্মুক্ত রাখিতে হইবে। পাশ্চাত্য ভাব ও আদর্শ সমূহ দেশীয় ভাষায় অনুবাদ করিয়া তাহা জনসাধারণকে শিক্ষা দেওয়াই ঐ সকল বিশ্বপণ্ডিতের কার্য্য হইবে। দেশে শিক্ষা-বিস্তারের কার্য্যভার তাঁহাদিগকেই ক্রমে ক্রমে গ্রহণ করিতে হইবে। বিদেশীয়দিগের দ্বারা অনূদিত পুস্তক যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা অনায়াসেই বুঝিতে পারেন যে, দেশীয় লোক দ্বারা অনুবাদ না হইলে তাহা প্রায় কোনই কাজে লাগে না। জাতীয় ভাষার আলোচনা ব্যতীত জাতীয় সাহিত্য গঠিত হয় না এবং জাতীয় সাহিত্য না হইলে জাতীয় জীবনও গঠিত হয় না। কেবল বিদেশী পোষাক সর্ব্বদা পরিধান করিয়া থাকিতে হইলে ক্রমে তাহা অসহ্য হইয়া উঠে। ইংরাজী ভাষার মত একটি কঠিন ও আমাদের দেশীয় ভাষার সহিত সম্পর্কশূন্য ভাষাকে শিক্ষার বাহন করা হইলে, শীঘ্র শীঘ্র শিক্ষা প্রচারের আশা যে কিরূপ সুদূরপরাহত হইত তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। এই জন্যই ১৮৩৫ সালে বেণ্টিঙ্ক উইলিয়ম আডাম নামক এক ব্যক্তিকে দেশীয় ভাষার উপযোগিতা

সন্ধানের জন্ম নিযুক্ত করেন। তিনিই প্রথমে আমাদের প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতির বিষয় বিশেষরূপে অবগত হইয়া দেশীয় ভাষায় লিখিত অমূল্য গ্রন্থরাশির সন্ধান পান। তিনি এ বিষয়ে যে মন্তব্য প্রকাশ করেন তাহা অতীব চিত্তাকর্ষক ও উপদেশপূর্ণ।

ভারতের প্রাচীন ও বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে আলোচনা-প্রসঙ্গে জেম্স লং ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে আডামের মন্তব্য সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহার কতকাংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল—

দেশীয় ভাষা ও বঙ্গদেশে জনসাধারণের শিক্ষা-প্রণালী সম্বন্ধে আডাম যাহা বলিয়াছেন তাহা খুবই মূল্যবান। তিনি তিন বৎসর কঠোর পরিশ্রমের পর গবমেণ্টের প্রায় লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করিয়া এই অনুসন্ধান কার্য্য সম্পন্ন করেন। তৎকালে কোনও সংবাদ সংগ্রহ করা অতিশয় কষ্টকর ছিল। তাহা সত্ত্বেও আডাম যাহা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন তাহার জন্ম তাঁহাকে প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না।

আডাম প্রথমে একজন খ্রীষ্টান ধর্ম্মপ্রচারকরূপে এ দেশে আসেন। তিনি বঙ্গদেশের শিক্ষা-প্রণালী সম্বন্ধে বেণ্টিঙ্ককে একখানি পত্র দিলে বেণ্টিঙ্ক তাহার যথোচিত উত্তর প্রদান করেন। আডাম বঙ্গদেশের প্রাচীন গুরুমহাশয়দিগের পাঠশালার পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। তখন গ্রামে গ্রামে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। কোনও গ্রামে আবশ্যক দ্রব্যের অভাব ছিল না। এক একখানি গ্রাম এক একটী ছোট দেশ বলিলেই চলিত। বাঙ্গালা ও বিহারে এইরূপ প্রায় এক লক্ষ গ্রামে গ্রাম্য পাঠশালা ছিল। পাঠশালার সংখ্যা বৃদ্ধি করা আডামের উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি ঐ সকল পাঠশালার সংস্কার আরম্ভ করিলেন। আডাম এইরূপ অনেকগুলি পত্র বেণ্টিঙ্ককে লিখেন। সেগুলি গবমেণ্টের নিকট খুব মূল্যবান বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। তাহাতেই আডামের সমগ্র অনুসন্ধানের ফল ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হয়; এবং সেই সকল পত্রের উপর নির্ভর করিয়াই বেণ্টিঙ্ক তাঁহার শিক্ষাপ্রণালীর কার্য্য আরম্ভ করেন। আডাম লিখিয়াছেন—হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান সকল শ্রেণীর ভিতরই শিক্ষা বিস্তার করা গবমেণ্টের একান্ত ইচ্ছা। তাহাদিগের মনের ও চরিত্রের উন্নতি সাধনের জন্ম যে সকল উপায় অবলম্বন করা উচিত, গবমেণ্ট তাহা সমস্তই করিতে প্রস্তুত আছেন। দেশের লোক সুশিক্ষিত ও সুচরিত্র না হইলে তাহারা আইনানুসারে কার্য্য করিবে না এবং দেশে শান্তি স্থাপন করা কঠিন হইবে। এই সকল উদ্দেশ্য লইয়াই গবমেণ্ট দেশে শিক্ষা বিস্তার আরম্ভ করেন। কিন্তু কি কি উপায় অবলম্বন করিলে দেশে শীঘ্র শীঘ্র শিক্ষা বিস্তার হইবে তাহা স্থির করিতে হইলে দেশের বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা সর্ব্বপ্রধান প্রয়োজন। যে দেশের সকল লোকই এক ভাষায় কথা কহে, একই ধর্ম্মাবলম্বী, একই প্রকারের ভাবে বিভোর, সে দেশে শিক্ষা প্রচার করা তত কঠিন নহে। কিন্তু যে দেশে নানা প্রকার দেশীয় ভাষা প্রচলিত, বহু সংখ্যক ধর্ম্ম ও আচার ব্যবহার প্রত্যেককে অপরের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন রাখিয়াছে, সে দেশে সর্ব্বসাধারণের উপযোগী করিয়া একটি শিক্ষা-প্রণালী নির্দ্দেশ করা খুবই কঠিন। যাহা হউক, দেশে বহু সংখ্যক শিক্ষার কেন্দ্র অবস্থিত থাকায় কার্য্য তত কঠিন হইবে না। পুরাতন কেন্দ্রগুলি যতই অসম্পূর্ণ ও অঙ্গহীন হউক না কেন

তাহাদিগকেই প্রথমে আদর্শ রূপে গ্রহণ করিতে হইবে। পরে ক্রমে ক্রমে তাহাদিগের সংস্কার করিয়া তাহাদিগকে উন্নতির পথে অগ্রসর করিতে হইবে। এ দেশে শিক্ষা যে একেবারে ছিল না তাহা নহে, তবে নানা রূপ কারণে তাহা অঙ্গহীন ও অসম্পূর্ণ হইয়া আসিতেছিল। রাজ্য পরিবর্ত্তনের সময় নানা প্রকার বিশৃঙ্খলায় এরূপ হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

পুরাতন জিনিসগুলি যতই দুর্দ্দশা প্রাপ্ত হউক না কেন, তাহা বজায় রাখিয়া ও সেই পুরাতন ঠাটের উপর নূতন জিনিস গঠন না করিলে লোকের বেশী সহানুভূতি ও যত্ন পাওয়া যাইবে না। অশিক্ষিত ও অর্দ্ধ শিক্ষিত লোকেরা পুরাতনের স্থানে একেবারে নূতন জিনিস দেখিলে নানা প্রকার সন্দেহ করিতে পারে। তদ্ব্যতীত যে সকল পুরাতন নিয়ম দেশে অনেক দিন ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে তাহা দেশের লোকের এক প্রকার মজ্জাগত হইয়া গিয়াছে। সে সকল পুরাতন নিয়ম দেশ হইতে একেবারে উঠাইয়া দিলে দেশের লোকের নানা প্রকার অসুবিধা হইবে। কাজেই কোনও নূতন পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত করিয়া তাহাকে ফলবান করিতে হইলে তাহা দেশের লোকের অবস্থা ও স্বভাবের অনুরূপ করিয়া গঠন করিতে হইবে। এই জন্যই পুরাতন শিক্ষার কেন্দ্রগুলি সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করা সর্ব্বপ্রথম ও প্রধান প্রয়োজন বলিয়া আমরা মনে করি।

আডামের এই পত্র পাইয়া গবর্ণর জেনারেল যে মন্তব্য প্রকাশ করেন তাহা সকল ভারতবাসীরই প্রণিধানযোগ্য।

১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে জানুয়ারি গবর্ণর জেনারেল যে মন্তব্য প্রকাশ করেন, নিম্নে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

ইহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, দেশের লোকের যথার্থ উন্নতি করিতে হইলে তাহাদের মধ্যে শিক্ষা ও জ্ঞান বিস্তার করা প্রয়োজন। কিন্তু কোন্ ভাষার দ্বারা শিক্ষা প্রচার করা হইবে, কোন্ ভাষাতে সরকারী কাজ কর্ম্ম চালান হইবে, এ সব বিষয় স্থির করা এক্ষণে আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। বহু কাল ধরিয়া দেশীয় লোকদিগের তত্ত্বাবধানে যে ভাবে দেশীয় শিক্ষা প্রচারিত হইয়াছে তাহা উত্তম রূপে জ্ঞাত না হইলে তাহাদিগের মানসিক উন্নতির বিষয় কিছুই ধারণা করা যাইবে না। দেশে শিক্ষা-বিস্তার হওয়া যখন সকল লোকেরই একান্ত ইচ্ছা, তখন দেশের পুরাতন স্কুল কলেজগুলির সংখ্যা ও পরিমাণ জানা আবশ্যক। পুরাতন স্কুল কলেজগুলির বর্ত্তমান ও অতীত অবস্থা ভাল করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইবে। নূতন কিছু না করিয়া পুরাতন শিক্ষাকেন্দ্রগুলির সংস্কার ও সাহায্য করিয়া দেখিতে হইবে তাহাদের দ্বারা শিক্ষাকার্য্য উত্তম রূপে নির্ব্বাহিত হয় কি না। যদি হয় তবে তাহারই আদর্শ লইয়া নূতন বিদ্যালয় স্থাপন করা হইবে। আর যদি সে আদর্শ এখনকার সময়োপযোগী না হয় তাহা হইলে এখনকার সময়োপযোগী করিয়া নূতন কিছু ব্যবস্থা করিতে হইবে।

আডাম যথাক্রমে ১৮৩৫, ৩৬ ও ৩৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনখানি ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যবিবরণী প্রকাশ করেন: প্রথমখানিতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া গেজেটিয়ারে প্রকাশিত হ্যামিলটনের ও বুকাননের মন্তব্য-গুলির সার সংকলিত হইয়াছিল। রাজসাহী জেলায় শিক্ষা প্রচারের জন্য রাণী ভবানী যে ব্যবস্থা

করিয়াছিলেন, দ্বিতীয় কার্য্যবিবরণীতে সেই বিষয়ই বিশেষ ভাবে আলোচিত হইয়াছে। তৃতীয়-খানিতে আডামের নিজের মন্তব্যগুলি প্রকাশিত হয়। তিনি পুরাতন ব্যবস্থাগুলি বজায় রাখিয়া বাঙ্গালা ও বিহারে শিক্ষা বিস্তারের যে ব্যবস্থা প্রণয়ন করেন তাহা তাঁহার প্রভূত অভিজ্ঞতার ফল বলিয়া বিবেচিত হইবে। মহামতি বার্ক এক স্থানে বলিয়াছিলেন যে, পুরাতন জিনিসের সংস্কার করিয়া তাহারই উন্নতি করা যথার্থ মানবের কার্য্য। সার টমাস মনরো এক স্থানে বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের পুরাতন ব্যবস্থার সহিত অনুকূল করিয়া কিছু গঠন না করিলে তাহা এ দেশে কখনও স্থায়ী হইতে পারে না।" আডামের মনে এই দুইটী উক্তি সর্ব্বদাই জাগরূক ছিল।

সে সময়ে আমাদের দেশে নানা প্রকারের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত ছিল। কোনটিতে কেবল বাঙ্গালা ও হিন্দী শিক্ষা দেওয়া হইত, কোনটিতে সংস্কৃত, কোনটিতে আরবী, আবার কোনটিতে বা পার্শী শিক্ষা দেওয়া হইত। তাহা ছাড়া গৃহকার্য্য শিক্ষা দিবার জন্যও অনেক বিদ্যালয় ছিল। আডাম তাঁহার রিপোর্টে একটি জেলার এই প্রকারের সকল বিদ্যালয়গুলির বিষয়ই বিশেষ ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। যাঁহারা আমাদের দেশে জাতীয় শিক্ষার উন্নতির জন্য চেষ্টা করেন তাঁহাদিগের নিকট আডামের রিপোর্ট বিশেষ মূল্যবান বলিয়া বিবেচিত হইবে। আডাম গ্রাম্য শিক্ষার যে ব্যবস্থা করেন তাহাতে দেশীয় ভাষা শিক্ষার সহিত কিছু কিছু ইংরাজী শিক্ষারও ব্যবস্থা হয় এবং পরে উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয় করিয়া উপযুক্ত শিক্ষক তৈয়ার করিবারও ব্যবস্থা হয়। কি ভাবে কার্য্য করিয়া বেণ্টিঙ্ক ও তাঁহার সহকর্ম্মিগণ এ দেশে শিক্ষা বিস্তার কার্য্যে সাফল্য লাভ করেন তাহা আডামের তৃতীয় রিপোর্ট হইতে উদ্ধৃত নিম্নোক্ত বাক্য হইতে বেশ হৃদয়ঙ্গম করা যাইবে—জাতীয় শিক্ষা দেশে উত্তমরূপে প্রচারিত হইলে এক নবযুগের আরম্ভ হইবে। লর্ড ময়রা তাঁহার ভারতীয় কার্য্যবিবরণীতে বলিয়াছেন যে, এ দেশে ইংরাজ রাজত্বের প্রথমে দেশে শান্তি স্থাপন করাই গবর্মেণ্টের প্রধান কার্য্য ছিল। কিন্তু অর্দ্ধ শতাব্দী এই ভাবে গত হইলে আরও অধিক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন আবশ্যক হইয়া পড়ে। যতই দেশের লোকের নানা বিষয়ে উন্নতি সাধন করা হইতেছে, ততই তাঁহারা ইংরাজ জাতির প্রতি অধিক শ্রদ্ধাবান হইতেছেন। উপযুক্ত পাত্রে উপদেশ প্রদত্ত হইলে তাহা কখনই কুফল প্রদান করে না।

রেনান এক স্থলে বলিয়াছেন যে, প্রাচীন ইতিহাসই আমাদের জীবন গঠন করিয়া দেয়। কোনও বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে ইতিহাসের সাক্ষ্যই অধিক মূল্যবান বলিয়া বিবেচিত হয়। শিক্ষাপদ্ধতি এই ঐতিহাসিক তথ্য হইতেই নির্দ্ধারিত হয়। দেশের শিক্ষা-পদ্ধতির উপরই দেশের আশা ভরসা সকলই নির্ভর করে। যে প্রকারের শিক্ষাপদ্ধতি হইবে সে প্রকারেই দেশ উন্নতি লাভ করিবে। দেশের লোকের মানসিক উন্নতি, দার্শনিক জ্ঞান, আর্থিক উন্নতি, শারীরিক বল, সামাজিক ব্যবস্থা সকল বিষয়ই শিক্ষার উপর নির্ভর করে। উপযুক্ত ভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত না হইলে উপরোক্ত কোনও বিষয়েই উন্নতি লাভ করা কাহারও পক্ষে সম্ভব-পর নহে।

শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

আগমনীর সময়।

১

সে দিন যাঁহার সহিত মিউনিসিপ্যাল মার্কেটের নিকট দেখা হইয়াছিল, তাঁহার নাম মিঃ গোবর্দ্ধন মিত্র।

লোকের মুখে শুনিয়াছিলাম যে, তাঁহার বহু লক্ষ টাকার কারবার, জমিদারীও বিস্তৃত। বেশী ভাগ পত্তনী-বিলি। মানুষটা সকলের মতে 'মাটীর মানুষ'। দেখিতে খুব সুশ্রী, বয়ঃক্রম পঁয়ত্রিশ বৎসর, কিংবা জোর চল্লিশ। মুখে অবসাদের ভাব অতিশয়। চক্ষু কোটরান্তর্গত।

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'মহাশয়ের নামই কি গোবর্দ্ধন মিত্র?'

উত্তর। কোনও দরকার আছে কি?

প্রশ্ন। ছেলেপুলে কয়টি?

উত্তর। কোনও দরকার আছে কি?

বলিলাম। 'ভগবান তাদের ভাল রাখুন।'

লোকটা সন্দিহান হইয়া আমার দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া চলিয়া গেলেন।

অবশ্য, অন্য কোনও লোক হইলে আমার কথায় হাসিতেন। কারণ, তাঁহার সন্তানাদি ছিল না। কিংবা অন্ততঃ পরিচয় গ্রহণ করিতেন। কিন্তু গোবর্দ্ধনবাবু সে রকম লোক নহেন।

গোবর্দ্ধন মিত্রের পূর্ব্বপুরুষের কথা কেহ বড় একটা জানিত না। কলিকাতা সহরের 'বনিয়াদি ঘরে'র তালিকার মধ্যে গোবর্দ্ধন বাবুর বংশের স্থান ছিল না। কিংবদন্তী, যে গোবর্দ্ধন বাবুর পিতা বীরভূম অঞ্চলের খুব বড় জমীদার ছিলেন। পুত্র তাঁহাকে না বলিয়া বিলাত চলিয়া যাওয়াতে তিনি রুষ্ট হইয়া 'ত্যাজ্যপুত্রের' মত একটা কিছু করিবেন তাহা সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু ক্রমে সুইজর্ল্যাণ্ড, ইতালী প্রভৃতি স্থান হইতে গোবর্দ্ধনের পত্র পাইয়া দশ জনকে বলিলেন, 'ছেলেটা একটা গর্দ্দভ। খোঁয়াড় ভেঙ্গে নানা দিকে চ'রে বেড়াচ্ছে। তোমরা সকলে মিলে একটা প্রায়শ্চিত্ত করতে ব'ল।'

পিতার হঠাৎ পরলোকপ্রাপ্তির পর বাটী ফিরিয়া, গোবর্দ্ধন মিত্র বোধ হয় প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন, এবং পিতৃশ্রাদ্ধও করিয়াছিলেন। কারণ, তাহার একটা হিসাবপত্র ও কাগজের তাড়া অনেকে দেখিয়াছিল।

কলিকাতায় আসিয়া মিষ্টার মিত্র এক দিন ইডেন গার্ডেনে এক জন বৃদ্ধ ভদ্রলোকের সহিত দুইটী বালিকাকে ভ্রমণ করিতে দেখিয়া একটীকে খুব পছন্দ করিলেন, এবং হঠাৎ বৃদ্ধ ভদ্রলোককে নমস্কার পূর্ব্বক বলিলেন, 'যদি আপনার আপত্তি না থাকে, তবে আমি ওঁকে বিবাহ করিয়া কৃতার্থ হইব।'

বালিকা উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা ও ধীর প্রকৃতি। সে বোধ হয় ভীতা হইয়া বৃদ্ধ পিতাকে কহিল, 'বাবা, ঐ দিকে যাই চল, ওঁকে পাগল ব'লে বোধ হচ্ছে।'

গোবর্দ্ধন মিত্র হতাশ্বাস হইয়া বাটী ফিরিয়া আসিলেন। তাহার পরে প্রায় ছয় মাস ধরিয়া বৃদ্ধ রামানুজ বসু তদন্ত করিয়া জানিলেন যে, গোবর্দ্ধন মিত্র পাগল নহে, এবং তাঁহার কন্যা নির্ম্মলার উপযুক্ত পাত্র গোবর্দ্ধন মিত্র ছাড়া পাওয়া অসম্ভব।

এ সম্বন্ধে নির্ম্মলার মতামতও প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছিল। যে দিন ইডেন গার্ডেনে দেখা হয়, সেই দিন হইতে ক্রমাগত ঐ পাগল ভদ্রলোকটীর কথা নির্ম্মলা তাহার কনিষ্ঠা অমলাকে জিজ্ঞাসা করিত। অমলারও সে দিনকার কথা বিলক্ষণ মনে ছিল। তাই বলিত, 'তিনি খুব সুন্দর।'

নির্ম্মলা। কিন্তু বদ্ধ পাগল।

অমলা। তাতে তোমার কি ?

এই কথা পিসির কর্ণে উঠিলে, তিনি ঝির সাহায্যে গ্রে ষ্ট্রীটবাসী গোবর্দ্ধন মিত্রের সঠিক খবর শীঘ্রই সংগ্রহ করিয়াছিলেন, এবং অগ্রজ বসুজা মহাশয়কে বলিয়াছিলেন, 'নির্ম্মলার মা যদি বেঁচে থাকৃত, তবে এখনই তার সঙ্গে গোবর্দ্ধনের বিয়ে দিত। ও, মস্ত লোকের ছেলে।'

২

নির্ম্মলার আপত্তি ছিল। কিন্তু সেটা ছোট। 'বিয়ে হ'লে আমার পড়া-শুনা বন্ধ হবে।' এ কথা মিষ্টার মিত্রের কর্ণে উঠিলে তিনি বলিয়া পাঠাইলেন (তাঁহার বন্ধু গোকুলচাঁদ ধর, এটর্ণি, দ্বারা) যে 'তাঁর (অর্থাৎ নির্ম্মলার) যত দিন ও যত বৎসর ইচ্ছা লেখাপড়া করুন, যখন ফুরসৎ হবে, তখন বিবাহ করবেন।' গোকুলচাঁদ বসুজা মহাশয়কে বলিলেন, 'এমন সুন্দর ও লিবারেল্ টার্ম‌স্ ভাবী স্বামী কখনও দিয়ে থাকে না। বিশেষতঃ ভারতবর্ষে।'

বসুজা মহাশয় কন্যাকে বলিলেন, 'মা, তোমার সতের বছর বয়স হয়েছে। অমলারও তের। কখন কি হয় বলা যায় না, আমার এ সংসারে আর ক' দিন তা ঠিক নেই।' এই কথায় নির্ম্মলার বুকে ব্যথা লাগিল, এবং নয়নে অশ্রু আসিল। ভাব দেখিয়া পিতা তাহার সম্মতি বুঝিতে পারিলেন।

প্রায় পাঁচ বৎসর নির্ম্মলার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। অমলার বিবাহের কথা চলিতেছে। নির্ম্মলা এখন স্বামীগৃহে প্রায় দুই বৎসর। তবে তাহার লেখাপড়ার 'বাতিক' এখনও মিটে নাই।

এই জন্যই বোধ হয় অনেকে বলিত, মিসেস্ মিত্রও একটা পাগল। অমলা বলিত, 'ওঁদের পাগলামির মধ্যে খুব গভীর প্রভেদ আছে।'

মিষ্টার মিত্র ব্যবসাক্ষেত্রে এক জন বিখ্যাত কর্ম্মবীর। সুতরাং দিনের বেলা বারটা একটার সময় আহার করিয়াই দুই ঘণ্টা ঘুমাইয়া পড়িতেন। আহারের সময় নির্ম্মলা একখানা সংবাদপত্রের আড়ালে স্বামীর মুখ দেখিয়া বুঝিত যে, তাঁহার মন শেয়ার-মার্কেট্ ও জুট্ কারবারে একেবারে বদ্ধ। পাছে আহার করিতে করিতে 'বিষম' লাগে, সেই ভয়ে নির্ম্মলা কথা কহিত না।

সন্ধ্যার সময় মিষ্টার মিত্র তাঁহার হিসাব ও খাতাপত্র নির্ম্মলার নিকট ফেলিয়া দিয়া বাহির হইতেন ও রাত্রি এগারটার সময় আসিয়া ঘুমাইয়া পড়িতেন।

সেই সময় নির্ম্মলা নভেল ও ইতিহাস প্রভৃতি লইয়া বসিত, ও স্বামীর নিদ্রা প্রগাঢ় হইলে, বহির পাতা মুড়িয়া, এক গ্লাস জল পান করিয়া ও দুরূহ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া নিদ্রাভিভূতা হইত।

এক এক দিন গৃহকর্ম্মে পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলে, কিংবা বেশী রকম হিসাব পত্র লইয়া বসিলে, নির্ম্মলার মাথার যন্ত্রণা তীব্র ভাব ধারণ করিত। সেই রকম এক দিন অমলা আসিয়াছিল।

অমলা। দিদি! আমি তোমাদের ত কখনও একটা ভাল ক'রে কথা কহিতে দেখ্লুম না।

নির্ম্মলা। সময় নেই।

অমলা। রাত্তিরে?

নির্ম্মলা। সময় নেই।

অমলা। তবে তোমার সঙ্গে ওঁর সম্বন্ধ কি?

অনূঢ়া ভগ্নীর মুখে স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধের কথার একটু আভাস পাইয়া নির্ম্মলা হাসিল, তাহাতে অমলাও লজ্জায় হাসিল।

নির্ম্মলা। সম্বন্ধটা এই। আমি ওঁর সেক্রেটরি। বিলেতে এই রকম অনেক আছে। স্ত্রী, খায় দায়, হিসাব পত্র নিয়ে পড়ে' থাকে, ইচ্ছা হ'লে একবার বাহিরে আমোদ প্রমোদ করবার জন্য বেড়িয়ে আসে, সময় পেলে

ঘুমোয়। ভাবনা কিসের? এই দেখ সব খরচ পত্র আমার হাতে। লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যাঙ্কে। রাশি রাশি এক টাকার ও আড়াই টাকার নোট আলমারিতে। আমার বইগুলো আঁটে না, তাই আমি আজ সকালে হাজার টাকার নোট্ পুড়িয়ে চা'র জল গরম করেছি।

ইহা বলিয়া নির্ম্মলা স্তূপাকার একটা ভস্মরাশির দিকে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইল ও খুব হাসিল।

অমলা। তোমার পাগ্‌লামী বাড়ছে দিদি। চল, আমাদের বাড়ীতে আজ মিস ডমিংগো গান করতে আস্‌বে।

নির্ম্মলা। কখনও না। আমি এই ঘরে অন্ধকারে মর্‌ব। কখনও বাহিরে যাব না।

৩

মরণের কথা শুনিয়া অমলার মনে হইল যে সুখ দুঃখ নামক দুইটি অদ্ভুত পদার্থ জগতে চিরকালই সমভাবে আছে। যে মরিবার কথা বলে সে দুঃখী। এই ন্যায়সঙ্গত কথার উপর অবলম্বন করিয়া অমলা সাহস পূর্ব্বক বলিল, 'দিদি, আমার সন্দেহ হয় যে তোমার মনে সুখ নাই।'

আর একটা কথা অমলা সাব্যস্ত করিয়াছিল যে, বিবাহ করিয়া সুখ নাই। কিন্তু সে কথা অমলা সাহস করিয়া বলিল না।

নির্ম্মলা। সুখ দুঃখের কথা তোর বোঝ্‌বার এখনও সময় হয় নাই। আমার অভাব কি? দুঃখ কিসের? দেশ জুড়ে কত দুঃখী আছে তাদের সংখ্যা নেই। তারা চারটী খেতে না পেয়ে অনাহারে মরে যা'চ্ছে, কিন্তু তাদের মনেও অন্ততঃ সুখের আশাটুকু আছে, নয় ত বাঁচ্‌তে সাধ কেন? আমাদের বাড়ীতে একটা কাল বেরাল আছে, সেটা খেয়ে খেয়ে মোটা হচ্ছে, আর তার মায়ের পেটের ভাইগুলো আস্তাকুঁড়োয় মাছের কাঁটা খুঁজে বেড়ায়।

নির্ম্মলার কি মনে পড়িল। আলমারী হইতে একটা মুক্তার সেলি বাহির করিয়া অমলার গলদেশে পরাইয়া দিল।

'ঠিক লেগেছে ত?'

অমলা। এটা কি?

নির্ম্মলা। বাবা লিখেছেন যে, তোর বিয়ের কথা এক রকম ঠিক হয়ে গেছে।

অমলা তাহার গলদেশ হইতে মুক্তামালা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।

নির্ম্মলা। কেন, এত রাগ কিসের?

অমলা। আমি বাবাকে স্পষ্টই বলেছি যে, আমার বিয়ে করবার ইচ্ছে নেই।

নির্ম্মলা। মিস্ কার্পেণ্টার হয়ে থাকৃবি? একটা কথা বলি, আমার জীবনের আশা ভরসা, যে তোর দুটো চারটে ছেলে মেয়ে হবে। এই ঘরে এসে তারা হামাগুড়ি দেবে, খেলা কর্‌বে, ঘরের জিনিসগুলো ভাঙ্গ্‌বে, বই পড়বে, সংসার সম্বন্ধে তাদের মতামত আধ' আধ' কথায় বল্‌বে। সংসার সম্বন্ধে সকলের মত এক নয়। ছোট ছোট ছেলেপুলের মনের কথা তাদের বহু জন্মের স্মৃতি হ'তে বেরোয়, সেগুলো তাদের অন্তরের। অমলা! আমাকে নিরাশ করিস্ নে।

অমলার চক্ষু জলে ভাসিয়া গেল। মাতৃহীনা হইয়া অবধি অমলা তাহার দিদির নিকট মাতৃস্নেহেরও অধিক স্নেহ পাইয়াছিল। অন্য উপায় না দেখিয়া সে দিদির গলদেশ বাহু দ্বারা বেষ্টন করিয়া কাঁদিল। নির্ম্মলাও সেই অবসরে কাঁদিয়া লইল।

নির্ম্মলা। আমার কথা রাখ্‌বি?

অমলা। রাখ্‌ব, কিন্তু হঠাৎ নয়, দু'দিন পরে। দিদি, এ কথা বাবাকে স্পষ্ট করে লেখ।

অমলা চলিয়া গেলে মিসেস্ মিত্র (নির্ম্মলা) একরাশি চিঠির কাগজ ও খাম লইয়া বসিয়া গেল। ব্লটিংএর খাতার মধ্যে দুখানা পুরাণো পত্র ছিল, তাহা একবার পাঠ করিয়া দেখিল—

'নির্ম্মলা! তোমার 'টার্মস্' অনুযায়ী তিন বৎসর পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছে, যদি ইচ্ছা হয় আমার কাছে চলে এস। কারবারে এত ব্যস্ত যে, তোমাদের বাড়ীতে যাবার সময় নেই।' গোবর্দ্ধন।

আবার তারই দশ দিন পরে,

'নির্ম্মলা আমি সে দিন তোমাদের বাড়ীতে গিয়েছিলেম, কিন্তু তুমি কোথায় বেড়াতে গিয়েছিলে। যার যেখানে খুসি সে বেড়াতে পারে, আমি তাতে বাধা দিই নে। কিন্তু আমার কারবারটার হিসাব পত্র রাখ্‌বার জন্য এক জন বিশ্বাসী লোক চাই। সুতরাং তুমি পত্রপাঠ চলে আস্‌বে।' গোবর্দ্ধন।

পত্র দুখানি ডেস্কের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া নির্ম্মলা তাহার পিতাকে লিখিল,

'বাবা, অমলার বিয়ে আর ছয় মাস স্থগিত রাখুন, বিশেষ কারণ আছে। আপনার স্নেহের কন্যা নিমি।'

৪

অন্য দিন রাত্রি দশটায় আহার করিয়া গোবর্দ্ধন মিত্র নিদ্রাগত হইলে, ভোর ছয়টার পূর্ব্বে তাঁর সাড়া শব্দ কেহই পায় না। সকলে বলিত, 'যে রকম মেহনত, তাতে এই নিদ্রার জোরেই তিনি বেঁচে আছেন।' মিসেস্ মিত্রও তাহাই বিশ্বাস করিতেন।

আজ কিন্তু রাত্রি বারটার পর মিঃ মিত্র হঠাৎ সুষুপ্তির অবস্থা অতিক্রম করিয়া শয্যা হইতে উঠিয়া বসিলেন। চক্ষুর চাহনি অতিশয় ভীতিপূর্ণ। মুখ-মণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ। ইতস্ততঃ চাহিয়া মিষ্টার মিত্র বলিলেন, 'ঘরে কেউ আছে?'

নির্ম্মলা। আছি।

গোবর্দ্ধন। এত রাত্রি অবধি জেগে?

নির্ম্মলা। জুটের শেয়ারটার হিসাব মিল্‌ছিল না।

গোবর্দ্ধন। সেটা চুলোর দুয়ারে যাক্‌। এখনকার কথা এই যে, আমি স্বপ্ন দেখে ডরিয়ে উঠেছি।

নির্ম্মলা শুনিয়াছিল যে, অষ্টাদশ বৎসর পূর্ব্বে সে একবার স্বপ্ন দেখিয়া মাতৃকোলে কাঁদিয়া উঠিয়াছিল। তখন সে 'কচি খুকি।' তাহা মনে পড়াতে সে রুমালে মুখ লুকাইয়া হাস্য সংবরণ করিল।

গোবর্দ্ধন। দেখ নির্ম্মলা! হাস্‌বার কথা নয়। স্বয়ং জগদ্ধাত্রী সিংহের উপর চ'ড়ে আমার সম্মুখে এসেছিলেন। তিনি বল্লেন, 'গোবর্দ্ধন! তোমার আর বেশী দিন সময় নেই।'

আবার মরণের কথা! স্ত্রীর হৃদয়ে সে কথা সবলে আঘাত করিল। নির্ম্মলা নিজের চেয়ারখানি সরাইয়া স্বামীর পালঙ্কের নিকট লইয়া গেল ও মুখ নত করিয়া বলিল, 'তার পর?'

গোবর্দ্ধন। তার পর আর কি? আমি বল্লুম, 'মা! মরণে আমার ভয় নেই। ব্যাঙ্কের ও জমিদারীর হিসেব পত্র নির্ম্মলা রাখ্‌ছে। সে সম্পত্তির সম্পূর্ণ মালিক ও ষোল আনা শেয়ার-হোল্‌ডর। তার প্রমাণ রেজেষ্ট্রী করা উইল। গোকুলচাঁদের জিম্মায় আছে।

নির্ম্মলার মুখে খরতর বেগে রক্তস্রোত বহিল। পাগলিনীর ন্যায় রক্তবর্ণ চক্ষু দুইটি স্বামীর মুখের প্রতি আরোপ করিয়া নির্ম্মলা তীব্র স্বরে বলিল,

'তুমি কি নিষ্ঠুর! মার সম্মুখে এই কথা বলে আমার অপমান করেছ। আমি কি কুকুর বেরালের চেয়েও অধম? স্বামিন্! আমাকে এ বাড়ী হ'তে বেরোবার স্বাধীনতা আজ আমাকে দেও।'

ইহা বলিয়া নির্ম্মলা তাহার বাহু হইতে কঙ্কন উন্মোচন করিয়া, বাতায়নের মধ্য দিয়া রাজপথে ছুড়িয়া ফেলিল, এবং পিতৃদত্ত একখণ্ড বস্ত্র আলমারী হইতে বাহির করিয়া পার্শ্বের ঘরের দিকে ছুটিল।

গোবর্দ্ধন মিত্র শয্যা হইতে তড়িদ্বেগে লাফ দিয়া নির্ম্মলার হাত ধরিলেন। স্বামীর করস্পর্শে নির্ম্মলার বহু বৎসরের রুদ্ধ অশ্রুধারা ছুটিল। সে আর্ত্তস্বরে কাঁদিয়া উঠিল।

গোবর্দ্ধন বলিলেন, 'ছি! নির্ম্মলা! এ কি ভাব তোমার? সমস্ত স্বপ্নের কথাটা এখনও ত বলি নাই। শুন্‌বে চল।'

তাহা বলিয়া মিষ্টার মিত্র নির্ম্মলার সম্পূর্ণ দেহভার উভয় বাহু দ্বারা বহন করিয়া, ও বুকের উপর তাহার আলুলায়িত নিবিড় কেশরাশির মধ্যে লুকানো মুখখানি সযত্নে ধরিয়া, একখানা ইজি-চেয়ারে গিয়া উপবেশন করিলেন।

স্বামী ভয়ে কাঁপিতেছিল দেখিয়া নির্ম্মলার বিষম ভয় হইল। মিষ্টার মিত্র নির্ম্মলার গলদেশে বাহু বেষ্টন করিয়া ও তাঁহার মুখখানি দিয়া নির্ম্মলার কপোল স্পর্শ এবং পুনরায় স্পর্শ করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, নির্ম্মলা জ্ঞানহারা হয় নাই। তাই, ধীরে ধীরে বলিলেন—'আমি মাকে পরখ করে দেখ্‌ছিলেম। তিনি হাস্‌লেন। তিনি কি জানেন না যে, আমি তোমাকে ছেড়ে পরলোকেও—স্বর্গেও—যেতে চাইনে?—মা তাই বল্লেন—আচ্ছা! 'একটা দিনের জন্য তোর জন্মভূমি বিল্বগ্রামে ওকে নিয়ে গিয়ে, ঘটা ক'রে আমার পূজো কর্‌লে এ যাত্রা নিস্তার পাবি।'

৫

বিল্বগ্রাম এক সময় বিখ্যাত গ্রাম ছিল। সেখানে গেলে প্রথমেই একটা প্রকাণ্ড বটবৃক্ষের পার্শ্বে বহু পুরাতন একটী শিবের মন্দির দেখিতে পাইবেন। তীর্থস্থান বলিয়া অনেক যাত্রী সেখানে—এক কালে আসিত। তাহার সন্নিকটে একটা গাঁজার দোকান ছিল। দোকানের কাট্‌তি এত বাড়িয়াছিল যে, দোকানদার চারুচরণ মিত্র স্বীয় জীবদ্দশায় একটি পাকা কোটা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ক্রমে দেশের অবস্থা দেখিয়াই হউক, কিংবা সময়ের পরিপক্কতাবশতঃই হউক, কিংবদন্তী, যে শিবলিঙ্গ মন্দির হইতে এক অমাবস্যার

নিশীথিনীর সময় অন্তর্হিত হইয়াছিলেন। খুব সম্ভবতঃ বটবৃক্ষের পার্শ্বস্থ বৃহৎ কূপের মধ্য দিয়া। ক্রমে কূপটিই পূজ্য হইয়া পড়িয়াছিল।

কূপের ও ভূতপূর্ব্ব গাঁজার দোকানের মধ্যে একটি ফুলের বাগান ছিল। দোকানদার চারুচরণ মিত্র মানবলীলা সংবরণ করিলে তদীয় পুত্র বিনয়কুমার গাঁজার দোকান তুলিয়া দিয়া তৎপরিবর্ত্তে সেখানে একটা 'গ্রাম্য লাইব্রেরী' নামক পুস্তকাগার স্থাপন করিয়াছিল। কলিকাতা হইতে বি. এ. পাশ করিয়া আসিয়া বিনয় সেই লাইব্রেরী ও ফুলের বাগানের মধ্যে দশ বিশ জন কৃষকের ও অন্যান্য শ্রমজীবীর সন্তান জুটাইয়া তাহাদিগকে এক নূতন ধরণের শিক্ষায় প্রবৃত্ত করিয়াছিল। সেটা ধর্ম্ম, পলিটিক্স ও শিল্প সম্বন্ধে, নানাবিধ উদ্যমে, অনিশ্চিত ভাবে জড়ানো। লোকে বলিত, 'বিনয় বাবুর রোজগারের চেষ্টা করা উচিত, নয় ত দৈন্যদশায় প'ড়্‌বেন। বাপের সামান্য পয়সা ক'দিন থাকে?' তাহার উত্তরে বিনয়ের শিষ্যেরা বলিত, 'আমরা আছি কি ক'র্‌তে? ষোলটা পয়সা একত্র হ'লে চার আনা হয়। ষোলখানা ঘর মিলে একটা সমাজ, ও ষোলটা সমাজ মিলে একটা জাতি। একটা জাতি যদি ঠিক থাকে, তবে জাতীয় জীবন হ'তে কতক্ষণ?'

গ্রামের মধ্যে জাতীয় জীবনের ভাবটা বিস্তৃত হইয়া অনেকগুলি গ্রাম আক্রমণ করিয়া বসিয়াছিল। বিনয় তাহাদের নেতা।

ব্যাপার দেখিয়া এক দিন কুণ্ড মহাশয় বিনয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এটা হচ্ছে কি? এর ফলে হবে কি?'

বিনয়। যদি শাস্ত্রের কথা মানেন তবে যা হবার তা হচ্ছে, আমরা নিমিত্ত মাত্র। ফলে যা হবে সেটা ভগবানের প্রাপ্য। যদি খারাপ হয় তবে ভগবানেরই অপমানের কথা। ভাল হ'লে আমাদের গৌরব। এখন আপনি একটা কথা বলুন।

কুণ্ড মহাশয়। কি?

বিনয়। আপনি তিনটি জিনিস খারাপ ক'চ্ছেন। প্রথম, বুধরাম মাড়ওয়ারীর সঙ্গে একজোট হয়ে তেলে মেশাবার জন্য বস্তা বস্তা ভ্যাজাল আমদানী করেছেন। দ্বিতীয় কথা, আপনি পাঁচ বৎসর পূর্ব্বেকার পচা চাউল, যেগুলো গরুতে খায়, সেইগুলো এখন সময় পেয়ে চার সের দরে বিক্রয় ক'চ্ছেন, অথচ আপনার আড়তে দশ হাজার মণ ভাল চাউল মজুত। তৃতীয় কথা, আপনি কলিকাতার মহাজনদের সঙ্গে জুটে জিনিসের দর ক্রমান্বয়ে বাড়াচ্ছেন।

কুণ্ড। আমরাও নিমিত্তের মধ্যে। এর কর্ম্মফলও ভগবানের হাতে।

বিনয়। ঠিক কথা, কেবল আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি। সম্প্রতি আপনি পঞ্চায়েতের প্রেসিডেণ্ট হয়ে কতকগুলো গোলমাল করেছেন, সেটা শীগ্‌গির কাগজে বেরুবে। আর যদি বেশী বাড়াবাড়ি করেন, তবে ধর্ম্মের অভিসম্পাতে বংশে কেউ থাকবে না।

কুণ্ড মহাশয় ভয় পাইয়া বলিলেন, 'ভায়া! অভিসম্পাত করিও না। গোড়ায় ধর্ম্ম বিগ্‌ড়ে গেলে তার স্রোত উপর দিকে আসে। তোমরা বল, আমরা ঠকিয়াছি, কিন্তু প্রজারা ঠকে কেন। তাদের মধ্যে এত সথ ঢুকেছে যে, বড় গুলো ছোটকে মেরে খায়। তুমি প্রজাদের ধর্ম্ম আগে ঠিক করগে।

৬

বিল্বগ্রামের ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের গরু মরিয়া, যজমানের সংখ্যা কমিয়া এবং ব্রহ্মোত্তর জমিটুকুর চাষ বন্ধ হইয়া এত দৈন্য দশা হইয়াছিল যে, তিনি ব্রাহ্মণের সৃষ্টিটাই যে ব্রহ্মার বেয়াকুফি তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। যখন ব্রহ্মার মুখ দিয়া ব্রাহ্মণের সৃষ্টি হয়, তখন দেশে ধান ছিল, এবং অসংখ্য গরু ছিল নিশ্চয়, অর্থাৎ ধর্ম্ম ছিল। সুতরাং দুই তিন যুগ ব্রাহ্মণদিগের সুখে কাটিয়াছিল। এখন ধর্ম্ম লোপ পাইয়া ব্রাহ্মণদিগের দুর্দ্দশা!

রোহিণীকান্ত ভট্টাচার্য্য নিতান্ত বৃদ্ধ নহেন। তবে, ব্রাহ্মণী চ'খে দেখিতে পান না। পুত্র কাশীবাসী। তিনিই মধ্যে মধ্যে দুই চারিটি টাকা পাঠান। ব্রাহ্মণের শেষ কন্যা জ্যোতির্ম্ময়ী প্রায় চতুর্দ্দশ বৎসরের, কিন্তু তাহার প্লীহা ও যকৃত পূর্ণ উদরে গৃহকর্ম্ম করা অসম্ভব। তাহা বুঝিতে পারিয়া চিররুগ্না বালিকা লুকাইয়া চোখের জল পুরাতন জীর্ণ একটা বালিসে মুছিত এবং নীরবে মাতার পদসেবা করিত।

মধ্যে মধ্যে বিনয় আসিয়া তাঁহাদের খবর লইয়া যাইত এবং চাঁদা করিয়া দুই চারি টাকা কিংবা দশ বিশ সের চাউল তুলিয়া দিত। বিপদে আপদে বিনয়কুমার ও তাহার প্রজা-শিষ্যবর্গই ব্রাহ্মণের দুর্দ্দিনের সহায়।

আজ দশ দিন হইল জ্যোতির্ম্ময়ীর জ্বর। অন্যান্য বার জ্বর ছাড়ে, আজ ছাড়ে নাই। গ্রামে এক জন পুরাতন নাপিত ছিল, সে বলিল, এবারকার জ্বর শক্ত!

জ্যোতির্ম্ময়ী জ্বরে পড়িয়া তার 'বিনয় দাদা'র আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল, কিন্তু বিনয়কুমার গ্রাম ছাড়িয়া অন্য গ্রামে তাহার 'জাতীয় জীবনের ভিত্তি'

সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে গিয়াছিল। কন্যার অবস্থা দেখিয়া ব্রাহ্মণের মুখ শুকাইয়া গেল, এবং জ্যোতির্ম্ময়ীর চক্ষু জ্যোতি ম্লান হইল।

মোটা চাউলের ভাত, শাক ও লবণ কদলীপত্রে ছিল। দারুণ ক্ষুধার উদ্রেক হওয়াতে ব্রাহ্মণ মনে করিলেন, 'চারিটি খেয়ে নিই।' কিন্তু কন্যার অবস্থা দেখিয়া তাহা দূর করিয়া ফেলিয়া দিলেন। দক্ষিণ দিক হইতে আকাশে ঘোর মেঘ ছুটিতেছিল। ব্রাহ্মণ ভিটার সম্মুখে বসিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার বহু অশ্রুবিন্দু পুরাতন ভিটার ধরণী সিক্ত করিতেছিল।

শেষে আকাশের কালো মেঘের দিকে চাহিয়া ব্রাহ্মণ বলিলেন, 'মা! মায়া মিথ্যা, কিন্তু তুমি ত মিথ্যা নও।'

দূরে বৃষ্টিধারা আরম্ভ হইয়াছিল, এমন সময় একটি শিবিকা ব্রাহ্মণের বাটীর সম্মুখে উপস্থিত হইল। শিবিকা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া একটি যুবতী ব্রাহ্মণকে সম্বোধন করিয়া বলিল, 'আমি পথ হারিয়েছি, ঘোর বৃষ্টিও পড়ছে। আপনি একটু আশ্রয় দেবেন কি?'

ব্রাহ্মণ চক্ষু জল মুছিয়া বলিলেন, 'এস মা এস।'

ব্রাহ্মণ তাঁহার সম্মুখে ষোড়শীর মূর্ত্তি দেখিলেন। অপূর্ব্ব গৌরবর্ণা। মুখখানি সৌন্দর্য্যের আধার, টানা ভ্রূ, অতি কোমল, করুণাভরা, স্নেহভরা আঁখি। ব্রাহ্মণ ভাবিলেন, 'এখনও কি পৃথিবীতে এমন রূপ আছে? না, মা ছলনা করতে এসেছেন!'

অমলা ব্রাহ্মণের পদধূলি গ্রহণ করিল ও কুটীর আলো করিয়া, প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনি কাঁদ্ছিলেন, আমি তা পাল্কীর মধ্যে দেখ্তে পেয়েছি। আপনার দুঃখ কিসের, আমাকে বল্তে হবে।'

ব্রাহ্মণ। মা, ঘরের ভিতর এস। গৃহে প্রবেশ করিয়া অমলা অন্ধ ব্রাহ্মণী ও রুগ্না, মুমূর্ষা জ্যোতির্ম্ময়ীকে দেখিল।

অমলা রোগ চিনিত। শীঘ্র নোট্‌বুক হইতে একখানি কাগজ ছিঁড়িয়া পেন্সিলে নির্ম্মলাকে পত্র লিখিল —

'দিদি, আমি এক জন ব্রাহ্মণের বাড়ীতে নেমেছি। তার মেয়ের বড় ব্যায়রাম। ডাক্তার বাবুকে শীঘ্র পাঠিয়ে দেবেন।'

এক জন শিবিকাবাহক পত্র লইয়া পুরাতন জমীদার মিত্রবংশের 'পুরাণো বাটী'তে চলিয়া গেল। বলা বাহুল্য, সকলে বিল্বগ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন, এবং অমলা গ্রাম দেখিতে বাহির হইয়াছিল।

৭

এক জন দাসী পত্রের উত্তর লইয়া আসিল। 'আমরা এই ট্রেণে একবার বীরভূম যাচ্ছি, বিশেষ দরকার। পরশু আস্‌ব। তুই ঝির কাছে সাবধানে থাকিস্।—নির্ম্মলা।'

ঝি আসিলে অমলা বলিল, 'তুই এখানে থাক্। দিদি ফিরে না আসা পর্য্যন্ত আমি ভট্টাচার্য্য মশায়ের বাড়ীতেই থাক্‌ব। খাবার জিনিস পত্রগুলো নিয়ে আয়।'

যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, অমলার নিকট পুরাতন জমীদার বংশের শেষ বংশধর গোবর্দ্ধন মিত্রের বিল্বগ্রামে আসিবার কথা শুনিলেন। অমলা বলিল, 'দিদি ঘটা ক'রে পূজো দেবেন, তার ভার আপনার উপর।'

নিমীলিতনয়না অন্ধা ব্রাহ্মণী অমলাকে বলিলেন, 'মা! কাছে এস, আমি দেখ্‌তে পাই নে, একবার কোলে নিই।' নির্ম্মলা সাদরে ব্রাহ্মণীর কোলে বসিলে, তিনি নির্ম্মলাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, 'দেখ কাল্ স্বপ্ন দেখেছি যে, মা, জয়া বিজয়াকে আমার ঘরে পাঠিয়ে দেবেন। জয়া এসেছে, এখন বিজয়া এলেই হয়।' এবং কন্যার দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, 'জ্যোতি, আমাদের কপাল ফিরেছে।'

ব্রাহ্মণ তাঁহার পুরাতন পুঁথি ও জমিদারবংশীয় কুলপত্রিকার অনুসন্ধান করিতেছিলেন। জ্যোতির্ম্ময়ী জ্বরে ছটফট্ করিতেছিল। ডাক্তার ঔষধ দিয়া গিয়াছিল, তাহা সেবন করিয়া জ্যোতি বলিয়াছিল, 'এবারকার অষুধ তত তেত না।'

অমলা। ওতে কুইনাইন নাই। তোমার মাথার চুলগুলো খুলে বাতাস করি। কি লম্বা চুল!

অমলা জ্যোতির কেশরাশি মুক্ত করিবার সময় তাহার মুখের ভাব দেখিয়া বুঝিল যে, সে একটু আশ্চর্য্য হইয়াছে।

জ্যোতি। আপনি আমাদের কে?

অমলা। তোমার বড় বোন।

জ্যোতি। আচ্ছা, দিদি! তুমি আমার বিনয় দাদাকে চেন?

অমলা। না।

জ্যোতি। তিনি কায়েতের ছেলে, অথচ আমার বড় ভাইয়ের মত। কেন?

অমলা। আমিও ত কায়েতের মেয়ে। বামুণ কায়েতের মধ্যে শ্রেণীর তফাৎ হলেও প্রাণের মধ্যে তফাৎ ত কিছুই নাই। সকলের জীবন একটা সুতোয় গাঁথা।

জ্যোতি। বিনয় দাদাও সেই কথা বলেন, আর তিনিও ঠিক তোমার মত আমার মাথার চুল এলিয়ে দিয়ে হাওয়া করেন। তুমি যেখানে ব'সে, ঠিক ঐ জায়গার বসে' থাকেন ও তুমি যেমন করে কথা কও, ঠিক সেই রকমের কথা কন। তিনি নিশ্চয় শিখিয়ে দিয়েছেন।

অমলা। জ্বরের সময় অত বক্‌তে নেই।

জ্যোতি। আমার জ্বর অনেক কমে' গিয়েছে, মাথায় হাত দিয়ে দেখ।

অমলা তাহার কপোল দিয়া জ্যোতির কপোল স্পর্শ করিয়া দেখিল যে, জ্বর অনেক কম ও অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া অঞ্চল দ্বারা জ্যোতির্ম্ময়ীর কপালের ও গলদেশের ঘর্ম্মবিন্দু সযত্নে মুছিয়া দিল।

জ্যোতি। তুমি কবে চলে' যাবে?

অমলা। আমি দিদি এলেই কাল্ চলে যাব।

জ্যোতি। তবে আমাকে দেখ্‌বে কে?

অমলা। কেন, তোমার বিনয় দাদা!

জ্যোতির্ম্ময়ীর এবার তত মনঃপূত হইল না। সে আবদার করিয়া বলিল, 'না তোমরা দু'জনেই থাক।'

অমলা। অচেনা লোকের কাছে আমি বসে' থাক্‌ব কি করে?

জ্যোতি। আমি আলাপ করিয়ে দেব। তিনি খুব বিদ্বান। বি. এ. পাশ করেছেন।

অমলা। আমি বিদ্বান লোকের সঙ্গে আলাপ করতে চাই নে। তা'রা বড় অবিশ্বাসী হয়। অহঙ্কারী হয়।

জ্যোতি। না দিদি! তাঁকে ছত্রিশখানা গাঁয়ের প্রজা বিশ্বাস করে। তিনি এই বৃষ্টি বাদলায় খালি পায়ে কাদা ভেঙ্গে কত দীন দুঃখীর বাড়ী ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তিনি দেখ্‌তে যেমন সুন্দর, শরীরেও তেমনই বল। এক দিন পত্তনিদারের ছয় জন বরকন্দাজ ও এক জন পুলিসের কনষ্টেবলকে লাঠী দিয়ে ঠেঙ্গিয়ে গ্রাম পার ক'রে দিয়েছিলেন।

অমলা। কেন?

জ্যোতি। তারা অন্যায় করে' দুটো প্রজার ধান ক্রোক করতে এসেছিল। বাবার ধানও অমনি করে ক'বার নিয়ে গেছে।

অমলা। বোধ হয় যুদ্ধে তাঁরও হাত পা কাটা পড়েছিল।

জ্যোতি। একেবারে কাটা পড়ে নাই, তবে সামান্য ভেঙ্গে গিয়েছিল।

অমলা। এবং তাঁর স্ত্রী দশ দিন রাত্তির জেগে শুশ্রূষা করেছিলেন।

জ্যোতি। কি ভুল তোমার! তিনি ত বিয়ে কর্‌বেন না বলে প্রতিজ্ঞা করেছেন। তাঁর মা বাপ কেউ নাই। আমাদের বাড়ীতে এসে পড়ে' ছিলেন। তুমি যে খাটে বসে' আছ, সেই খাটে শুয়ে থাক্‌তেন। আমি তাঁর হাতে জলপটি বেঁধে দিতুম।

অমলা। তবে আমার এ দেশে আসা ভুল হয়ে গেছে।

জ্যোতি। কেন দিদি?

অমলা। প্রথম, তাঁর ভালবাসার জিনিস অর্থাৎ তোমাকে আমি অধিকার করে বসে' আছি। দ্বিতীয়—দু'জন এক ধরণের লোক, এক জায়গায় থাক্‌লে খুনোখুনি হবার সম্ভাবনা। তিনিই এখানে রাজত্ব করুন।

৮

এক জন দ্বারের অন্তরালে দাঁড়াইয়া সেই অপূর্ব্ব কথোপকথন শুনিতেছিল, ও অমলার অপূর্ব্ব রূপ, ও মুখের ভাবগুলি অনিমেষ নয়নে দেখিতেছিল। সে বিনয়কুমার।

বিনয়কুমারের মনে হইল, 'আমি বড় অন্যায় করেছি। এ রকম লুকিয়ে কথা শোনা মহাপাপ।'

তাই সে বাটীর বাহিরে গেল। পদশব্দ শুনিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেও, বিনয়? চলে যাচ্ছ যে?'

বিনয়। বাটীতে নূতন লোক আছে, আমার যাওয়াটা ঠিক কি না বুঝ্‌তে পাচ্ছি নে।

ব্রাহ্মণ বিনয়কে ডাকিয়া আদ্যোপান্ত বুঝাইয়া দিলেন।

বিনয়। জমিদারদের পুরাণো বাড়ীতে পূজো হবে, সেটা অত্যন্ত সুখের বিষয়। কিন্তু সবই ত পত্তনি। প্রজাদের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ কি?

ব্রাহ্মণ। সেই সম্বন্ধটা করে' দেও। তুমি ত এ বিষয় ভাল বোঝ।' যে মেয়েটি আমার ঘরে এসেছে, তার শিক্ষা দেখে বোধ হয় যে, এরা দেবতার মত মানুষ।

বিনয়। আশ্চর্য্যের কথা বটে। আমি কাল আবার আস্‌ব।

গোবর্দ্ধন মিত্র ও নির্ম্মলা ফিরিয়া আসিলে অমলা 'পুরাণো বাটী'তে গিয়া উপস্থিত হইল, এবং গত দুই দিনের কথা অমলাকে বলিল।

নির্ম্মলা। ধন্তি মেয়ে তুই। আমি হলে' সেই বনে কখনও রাত্তির কাটাতে পারতুম না। তোর খাওয়া দাওয়ার কষ্ট হয় নাই ত?

অমলা। ব্রাহ্মণ নিজে যা রেঁধে দিতেন, তা অমৃত। আর দেখ দিদি, তাঁদের বাগানে কত করমচা ও চাল্‌তের গাছ। তারই অম্বল খেয়ে কৃতার্থ হয়েছি।

নির্ম্মলার মুখ জলপূর্ণ হইল। সে সাদরে অমলাকে কোলে টানিয়া লইয়া বলিল, 'কাল আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাস্।'

মিষ্টার মিত্র সম্প্রতি নির্ম্মলা ও গোকুলচাঁদের পরামর্শে দুর্গাপূজার বিরাট বন্দোবস্ত করিতেছিলেন, এবং মধ্যে মধ্যে সেগুলি বহির্বাটীর দালানে বসিয়া স্মৃতিপটে বিশেষ ভাবে অঙ্কিত করিতেছিলেন। এমন সময় এক জন আসিয়া সংবাদ দিল, 'এই গ্রামের এক জন প্রজা বিনয়কুমার মিত্র আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।'

বিনয়কুমার উপস্থিত হইলে গোবর্দ্ধন মিত্র তাহাকে সাদরে সম্ভাষণপূর্ব্বক বলিলেন, 'এস ভায়া এস। আমি মহা মুস্কিলে প'ড়েছি। সকলেই বলে যে তুমি ছাড়া লোক জন জুটবে না। তোমার জন্য আমি প্রতীক্ষা ক'রে আছি।'

বিনয় অভিবাদন পূর্ব্বক কহিল, 'আপনারা বড় লোক, শুনেছি টাকার অভাব নেই, আমার মত গরীব লোকের সাহায্য—'

গোবর্দ্ধন। ভায়া সে দিন নেই—আমার প্রজা আমার ছিল না, তাদের আপনার করতে গিয়ে এই কয় দিন বীরভূমে ছুটোছুটি করেছি। প্রজা-ট্রজা, ধানের গাছ, টানের গাছ, আগে ত কখনও দেখি নাই,—পরে নির্ম্মলার—অর্থাৎ, গোকুলচাঁদ—অর্থাৎ, নির্ম্মলা আমার স্ত্রী ও সেক্রেটরি, সেই এ সব বোঝে,—আর গোকুল আমার এটর্নি—কি বলছিলেন?

বিনয়। বীরভূমে ছুটোছুটি।

গোবর্দ্ধন। আমার স্মরণশক্তি ক্ষীণ হয়ে পড়েছে। স্ত্রীলোকদের যেমন বুদ্ধি তেমনই স্মরণশক্তি—অর্থাৎ, নির্ম্মলার পরামর্শে আমি পত্তনিদারের কাছে জমিদারীটা আবার কিনে নিইছি। শুধু তাই না। ডাক্তার বাবু আমার ছত্রিশখানা গ্রামের মশা মারবার জন্য একটা এষ্টিমেট্ করেছেন। তা ছাড়া—আমি প্রজাদের বাঁধগুলো নতুন করিয়ে বাঁধিয়ে দেব, তাদের মহাজনের ধারও শোধ করে দেব—আরও যেন কি করতে হবে—দুঃখের বিষয় মনে পড়ছে না—অমলা!—

ভগিনীপতির আহ্বানে অমলা আসিয়া পড়িল। বিনয় মুখ নত করিয়া রহিল।

গোবর্দ্ধন। এঁকে দেখে লজ্জা করিস্‌নে—ইনি আমাদের ছত্রিশখানা গ্রামের প্রজাদের সর্দ্দার—তোর দিদিকে ডেকে দে, আর মশা মারা, ও পূজোর ফর্দ্দগুলো নিয়ে আয়।

অমলা বিনয়কুমারের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া চলিয়া গেল ও নির্ম্মলাকে লইয়া আসিল।

বিনয় উঠিয়া দাঁড়াইল। সে নির্ম্মলাকে দেখিয়াই বুঝিল যে, মিত্র বংশের বিস্তীর্ণ জমিদারীর সর্ব্বমঙ্গলময়ী কর্ত্রী হইবার উপযুক্তা।

নির্ম্মলা বেশী কথা না বলিয়া বিনয়ের হাত ধরিয়া বলিল, 'ভাই, তোমার কথা আমরা শুনেছি। তোমাদের আড়াই হাজার প্রজাদের গিয়ে বল 'যে, তাদের অনুতপ্ত জমিদার দেশে ফিরে এসেছেন। আমরা যদি তাদের ভাল না করতে পারি তবে তাদেরই সঙ্গে এখানে মরব।'

বিনয়ের সঙ্গে নির্ম্মলার অনেক কথা হইবার পর, বিনয় বিদায় লইল, ও তাহার সবল বাহু দ্বারা নির্ম্মলার কোমল পদদ্বয়ের ধূলি লইয়া বলিল, 'এখন তাদের বলি গে, তোদের মা এসেছেন।'

৯

যে কালে গিরিরাণী স্বপ্ন দেখিতেন তখন ধরণী শান্ত, স্নিগ্ধ, উর্ব্বরা ও শস্য-শ্যামলা। সেই ধরিত্রীর অন্ন খাইয়া ভারতবর্ষের বহু যুগ কাটিয়া গিয়াছিল। সেই অন্নের মধ্যে অন্নপূর্ণা শক্তি সঞ্চারিত করিতেন। সেই শক্তি ধর্ম্মরূপে ভারতে প্রচারিত হইয়াছিল। সেই শক্তির বলে অসুর দলিত হইত। ক্রমে, সেই শক্তির আমরা অপব্যবহার করিয়াছি, তাহারই ফলে এই দুর্দ্দশা।

বিনয়কুমার বিল্বগ্রামের ভগ্ন শিবমন্দির ও পুরাতন কূপের নিকট তাহার আড্ডায় আসিয়া দেখিল যে প্রায় পাঁচ শত প্রজা উপস্থিত। সে তাহা-দিগকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—

'দেখ, জাতীয়-জীবনটা বজায় রাখ্‌বার জন্য মা বৎসর বৎসর আস্‌তেন। গ্রামে গ্রামে আস্‌তেন। ছত্রিশ জাতি মিলে একটা জাতি হয়ে পড়্‌ত, অথচ তাদের বর্ণ আলাদা। এই গ্রামে ছত্রিশ রকম গাছ আছে, ও বনে ছত্রিশ রকম পশু আছে। হয় ত তাদের মধ্যে অনেকগুলো অনেকগুলোকে মেরে, নিজের প্রাণটাকে বাড়িয়ে তোলে। অথচ শুনে আশ্চর্য্য হবে যে, যখন মানুষ

এ পৃথিবীতে জন্মায় নি, তখন হ'তে বড়গুলো ধ্বংস হ'চ্ছে, আর ছোটগুলো রক্তমারি ভাবে বাড়ছে। বড় বড় দৈত্য দানব, বড় বড় পাদপ পাহাড়, বড় বড় পশু, এ সব সেকালের। তাদের কঙ্কালগুলো কখনও কখনও দেখ্‌তে পাওয়া যায়। বড় বড় নদী ছোট হয়ে গিয়েছে। মানুষের মধ্যেও এখন বড় বড় অবতার হয় না, বড় বড় প্রতিভা, বিরাট ধর্ম্ম, বড় বড় রাজ্য ভেঙ্গে যাচ্ছে ও ক্রমে যাবে। ছোটগুলো পৃথিবী ছেয়ে পড়বে। তারা সকলে সমান হ'তে চেষ্টা করবে। এক জন কেউ বড় হতে গেলে বেশী দিন টিক্‌বে না। শক্তি প্রত্যেক পরমাণুতে সমভাবে সঞ্চালিত হবে। আমাদের শরীরের রক্ত যেমন প্রত্যেক ভাগে গিয়ে সমস্ত শরীরটাকে রক্ষা করে, সেই রকম মার শক্তি সমগ্র জাতিকে রক্ষা করবে।'

'এই শক্তি প্রসারণের মধ্যে কিন্তু পশুবৃত্তি চল্‌বে না। যেটাকে আমরা নিবৃত্তি বলি, সেই নিবৃত্তিটাই প্রবৃত্তি হয়ে দাঁড়াবে। সংযমে আনন্দ হবে। কারও একটা দোষ দেখ্‌লে সেটা সকলে দেশময় রাষ্ট্র ক'রে দেবে। সকলে পরস্পরের প্রাণরক্ষার জন্য ব্যস্ত হবে। পূর্ব্বকালে রাজা, ভূস্বামী ও দস্যু যে সব পাশবিক অত্যাচার ক'রত তা অনেক দিন পূর্ব্বেই উঠে গেছে। এখনও যেটুকু অত্যাচার আমরা দেখ্‌তে পাই, তাও থাক্‌বে না।'

'লোকে বলে ধর্ম্ম লোপ পাচ্ছে।' আমি বলি জাতীয়-জীবনের মধ্যে ধর্ম্ম ফুটে উঠ্‌ছে। পূর্ব্বে ধর্ম্ম গোটাকতক লোকের মধ্যে ছিল, এখন ছড়িয়ে পড়্‌ছে। সকল দেশেই এর ডালপালা বিস্তৃত হ'চ্ছে।'

'এ ধর্ম্ম প্রচার করবে নারী জাতি। সার ধর্ম্মের মর্ম্ম তাদেরই মধ্যে নিহিত। আমরা পশুর মত অত্যাচার করে গিয়েছি, তারা সহিয়া গেছে। কিন্তু তাদের মধ্যে যে শক্তি জাগ্‌ছে, তারই ফলে দেশে লক্ষ লক্ষ আদর্শ পুরুষ জন্মাবে। নারীশক্তি জেগে না উঠ্‌লে তাদের সন্তানের বাহুতে বল-সঞ্চার কখনও হবে না।'

'তোমাদের কিছু চেষ্টা করতে হবে না। চেষ্টা আপনিই আস্‌বে। কথা-গুলো মাঝে মাঝে মনে করিও। ধর্ম্মের পথ যে দিকে, সেই দিকে কেবল দৃষ্টি রাখ্‌লেই দেখ্‌তে পাবে যে, সমাজ একটা অপূর্ব্ব আনন্দময় অবস্থার দিকে যাচ্ছে। যারা এটাকে বলে "প্রলয়", তারা ঠিক বুঝ্‌তে পারে না।'

'আমাদের জমীদার তাঁর জন্মভূমি বিল্বগ্রামে ফিরে এসেছেন। তিনি ঘটা ক'রে মায়ের পূজো করবেন। এই সুযোগে তোমরা সেই পূজোতে যোগ

দেও। তিনি খুব সদাশয় লোক, ও তাঁর স্ত্রী সাধারণ মানুষ নয়, দেবী। তাঁরা "বড়" হয়ে কর্ত্তৃত্ব দেখাতে আসেন নাই। লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়ে তোমাদের ভবিষ্যতের অন্নসংস্থান ও শারীরিক ও মানসিক উন্নতির জন্য প্রস্তুত হয়ে এসেছেন, তোমাদের রক্তের জন্য তাঁদের জীবনের সঞ্চিত ধন ব্যয় ক'রবেন। তাঁরা তোমাদের মত ছোট হয়ে তোমাদের সঙ্গে মিশ্‌বেন।'

এক জন প্রজা। বড় আশ্চর্য্যি কথা! তিনিই ত মা বাপ। তিনি ছোট হবেন কেন?

আর এক জন। মা বাপই ত সন্তানের জন্য ছোট হয় রে ব্যাটা! ছোট না হ'লে তাঁকে আমরা বড় ব'লে জান্‌তে পারব কি ক'রে?

বিনয়। (সাহ্লাদে) ঠিক। এখন তোমরা জমীদারের পুরাণো বাড়ীতে গিয়ে মার প্রতিষ্ঠা কর গে।

১০

পর দিন আড়াই সহস্র প্রজা, আবালবৃদ্ধবনিতা সহ গোবর্দ্ধন মিত্রের বাস্তু-ভিটায় গিয়া উপস্থিত হইল। বহু সহস্র নয়নের দৃষ্টি নির্ম্মলা ও অমলার মুখে আরোপিত হইল। তাহা ভক্তিপূর্ণ।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাদের সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, 'মা, জয়া বিজয়াকে আগে পাঠিয়ে দিয়েছেন! তোরা ওঁদের অভ্যর্থনা কর।'

এমন সময় গোবর্দ্ধন মিত্র গোকুলচাঁদের সঙ্গে তাঁহার ডাবা হুঁকা হস্তে বাহিরে আসিয়া বলিলেন, 'মা, আরও দু'জনকে পাঠিয়েছেন, সে আমরা—নন্দী ও ভৃঙ্গী।'

দশ জন মাতব্বর প্রজা মিত্র মহাশয় ও নির্ম্মলার চরণ স্পর্শ করিয়া কহিল, 'আপনাদের সন্তান আমরা, আমাদের বল বুদ্ধি আজ থেকে সব আপনাদের কর্ম্মে নিযুক্ত হবে।'

নির্ম্মলা ও অমলা কৃষক বধূদিগকে আদর করিয়া পূজার দালানে লইয়া মুড়ি মুড়কির আয়োজন করিতে বসিয়া গেল। ইত্যবসরে বিনয়কুমারের সাহায্যে মিত্রজা প্রজাগণের সহিত আলাপ পরিচয়ে রত হইলেন।

ডাক্তার ও গোকুলচাঁদ এই ব্যাপার দেখিয়া আনন্দে বিহ্বল হইয়া বলিলেন, 'আজ হ'তে তোদের ডাক্তার ও উকীলের দরকার হলে আমাদের খবর দিস্, এক পয়সা লাগ্‌বে না। এমন কি, যদি দরকার হয় তবে আমরা তোদের মোটামুটি আইন কানুন ও চিকিৎসা বিদ্যা শেখাবার জন্য লোক পাঠিয়ে দেব।'

এই সুযোগে ডাক্তার মহাশয়, মশকের কি করিয়া উচ্ছেদ হয়, ও ম্যালেরিয়া নিবারিত হয়, তাহা বুঝাইয়া দিলেন।

দশভূজার মূর্ত্তি মিত্রবংশের পুরাণো বাড়ী অচিরাৎ আলোকিত করিল। সপ্তমীর দিন হইতে দলে দলে লোক আসিতেছিল। অমলা দ্বিতলে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কন্যা জ্যোতির্ম্ময়ীকে পার্শ্বে বসাইয়া কত কথা কহিতেছিল, তাহার সংখ্যা নাই।

ঢাকের বাদ্য আরম্ভ হইলে জ্যোতির্ম্ময়ীর ও অমলার হৃদয় নাচিয়া উঠিল।

জ্যোতির্ম্ময়ী। চল্ দিদি, ছুটে দেখে আসি।

অমলা। দাঁড়া, তোর চুল বেঁধে দিই। সিঁড়ি ভেঙ্গে নামতে পারবি ত?

চুল বাঁধিবার সময় জ্যোতির্ম্ময়ী বলিল, 'দিদি, নীচের তলায় ঐ যে ছুটোছুটি কর্‌ছে কে, দেখ্‌তে পাচ্ছ?'

অমলা। না।

জ্যোতি। আর্সির মধ্যে দেখ্‌ছিলুম তুমি কেবল তাঁরই দিকে তাকিয়ে আছ।

অমলা। ম্যালেরিয়াতে তোর চোখ খারাপ হয়ে গেছে।

জ্যোতি। তোমার ত যায় নি? তবে, চিরুণী দিয়ে আমার গলা আঁচড়ে দিয়েছ, তা দেখ্‌তে পাও নি কেন?

অমলা তাহার ভ্রম বুঝিতে পারিয়া অতিশয় লজ্জিতা হইল, এবং দুঃখিতা হইল, এবং কি ভাবিয়া জ্যোতির গলদেশে মুখখানি রাখিয়া হাসিল। জ্যোতির্ম্ময়ীও হাসিল।

অমলা। তুই অমন কর্‌লে আজ চুল বাঁধা হবে না।

জ্যোতি। তুমি বোধ হয় চিন্‌তে পার নাই, উনিই আমার বিনয় দাদা!

অমলা। বিনয় দাদা ছাড়া তোর কি আর কথা নাই?

জ্যোতি। আছে বৈ কি। তোমার কথা। তোমাদের দু'জনের কথা একত্র বল্লে' আমি ভাল থাকি। শান্তি পাই। কেন, তা জানি নে। দেখ দিদি! আমি আর বেশী দিন বাঁচব না, এটা ঠিক্ জেন'। আমাদের ঐ ছোট কুটীরখানিতে অনেক প্রজা বাবার কাছে ধর্ম্মের কথা শুনতে আস্‌ত। সেই সময় তাদের ছেলে মেয়েদের সঙ্গে একত্র বসে' আমিও শুন্‌তেম। আমি ক্রমে বুঝতে পেরেছি যে, মানুষ সংসারে কেবল ভালবাসার জন্যে আছে, সেটুকু না পেলে এ সংসার অরণ্য।

অমলা। তুই বচ্ছরকার দিনে পাগলীর মত কি বক্‌ছিস্ জ্যোতি ?

জ্যোতি। আমি বক্‌ছিনে, ঠিক দেখ্‌তে পাচ্ছি—আমার চোখের সম্মুখে—ঐ কুটীরের মধ্যে তোমরা দু'জন বস্‌বে—ঘর আলো ক'রে। স্বামী স্ত্রীর মত—। তুমি মেয়েদের শিক্ষা দেবে, আর বিনয় দাদা পুরুষদের। আমি তখন কোথায় থাকৃব জানি না—কিন্তু একবার একবার মনে করিও—এই চির দুঃখিনীকে। আমার মা বাপকে দেখ।

দুই ভগ্নী নয়নে অঞ্চল দিয়া কাঁদিল।—শরতের নির্ম্মল আকাশে খানকতক মেঘ অস্তগামী সূর্য্যকিরণে নানা বর্ণে প্রতিভাত হইতেছিল। কতই সুন্দর! কিন্তু কেহই দেখিল না।

নির্ম্মলা ও বিনয়কুমার উভয়ের অন্বেষণে দ্বিতলের সিঁড়ি বাহিয়া সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখিল যে, জ্যোতির্ম্ময়ী অমলার অঙ্কে মাথা রাখিয়া নিদ্রিতা।

নির্ম্মলা। তোদের কি বসে' থাকবার এই সময় ?

অমলা। জ্যোতি ঘুমিয়ে পড়েছে। ওকে নীচে নিয়ে যাই কেমন করে ?

বিনয়। তার উপায় আছে। আমি নিয়ে যাচ্ছি।

ইহা বলিয়া বিনয়কুমার অমলার পার্শ্বে আসিয়া ঘুমন্ত বালিকাকে ডাকিল, 'জ্যোতি!'

জ্যোতি নয়ন মেলিয়া দেখিল বিনয়কুমার অমলার পার্শ্বে উপবিষ্ট। উভয়ের সলজ্জ ভাব—তাহাতে বালিকার কতই আনন্দ!

সে কেবল বলিল, 'বিনয় দাদা, এ সংসার প্রেমের জন্য। অমলা দিদি! এ সংসার প্রেমের জন্য। তোমরা একত্র হয়ে সেটুকু বিলাও।'

বিনয়কুমার জ্যোতির্ম্ময়ীকে বুকে করিয়া উত্তোলন করিল।

বিনয়। নির্ম্মলা দিদি, এই বালিকা আজন্ম আনন্দময়ী। রোগে শোকে জরা জীর্ণ হয়েও আনন্দময়ী।

জ্যোতির্ম্ময়ী। আমাকে ছেড়ে দেও, আমি অমলা দিদির কাছে যাব।

অমলা অস্তমিত সূর্য্যের শেষ আভাগুলি দেখিতেছিল। যেন তাদের মধ্যে সুখ দুঃখ সমভাবে মিশ্রিত। কোন্‌টা শ্রেষ্ঠ? সুখ না দুঃখ?

নির্ম্মলা বিনয়কুমারকে ডাকিয়া দূরে লইয়া বলিল, 'ভাই ঐ ব্রাহ্মণ কন্যাই—মার মূর্ত্তি। ওদের মধ্যেই প্রেমময়ী জগদ্ধাত্রীর কিরণ প্রচ্ছন্ন থাকে, মাঝে মাঝে ফুটে বেরোয়—মাঝে মাঝে।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

প্রাচীন পল্লীসঙ্গীত ও কবিতা।

গত চৈত্র মাসে (১৩২৩ সালে) পটীয়া সাহিত্য-সম্মিলনে যোগ দিবার জন্য আমি পটীয়া গ্রামে গিয়াছিলাম। শুধু পটীয়া সম্মিলনে যোগ দেওয়াই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না। ভাবিয়াছিলাম, এই সুযোগে বিভিন্ন পল্লী-গ্রাম বেড়াইয়া চট্টগ্রামের প্রাচীন পল্লী-সম্পদ হস্তলিখিত পুঁথি, সঙ্গীত, কবিতা, হেঁয়ালী, প্রবচন প্রভৃতিও কিছু কিছু সংগ্রহ করা যাইবে। ভগবৎ-কৃপায় আমার ঐ উভয় উদ্দেশ্যই সার্থক হইয়াছে—আমি মাতুল শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রলাল সেন মহাশয়ের সাহায্যে বহু প্রাচীন হস্তলিখিত তালপাতার ও তুলট কাগজের পুঁথি এবং পল্লী সঙ্গীতাদি পাইয়াছি। নানা দৈব দুর্ব্বিপাকে প্রাচীন পুঁথিগুলি পড়িবার অবসর এখনও আমার ঘটে নাই। আজ কয়েকটী পল্লীসঙ্গীত ও কবিতা পাঠকবর্গকে উপহার দিতেছি।

ভরসা করি, সাহিত্য-রসিকেরা ইহার মধ্যে খাঁটী 'স্বদেশী সাহিত্য রসে'র সন্ধান পাইবেন। চট্টগ্রাম অঞ্চলে পল্লীগ্রামের কৃষকেরা কৃষিকার্য্য করিতে করিতে সকলে মিলিয়া যে গান করে, তাহাকে তাহারা 'ভোর' বলিয়া থাকে। 'ভোর' দূর হইতে বড় সুন্দর শোনায়। প্রথমেই এই 'ভোরে'র একটু পরিচয় লওয়া যাক্।—

১ম ভোর।

ধুয়া।— যমুনা সেনানে (১) চল যাই।
নন্দের ঘরের কানাই!
যমুনা সেনানে চল যাই॥

পদ।— হইল দু পহর বেলা
তাতিল পন্থের ধুলা
কি মতে হাঁটিবে লাঙ্গা (২) পাই (৩)।
যাইবা কি না যাইবা ভাইয়া
কহরে চিত্ত বুঝাইয়া—
যমুনা কূলে শ্যাম ভাই।
যমুনার জল কালা
সেনান করিতে ভালা
সর্ব্ব অঙ্গ জলেতে মিশাই॥

---

* বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে পঠিত।

(১) স্নানে। (২) শূন্য, খালি। (৩) পায়।

এই ক্ষুদ্র কবিতাটীর মধ্যে 'নন্দের ঘরের কানাই'এর প্রতি তাহার সঙ্গীদের এমন একটা আকুল আবেগ ভরা ভালবাসার ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে, যাহা সহজেই শ্রোতার হৃদয়কে স্পর্শ করে।

২য় ভোর।

ধুয়া।— বাঁশী বাজাইও না।
কোন রসিকে বাজায় বাঁশী নাম লইও না॥
পদ।— কদম তলে এরি (১) বাঁশী সেনান করেছে।
পবনের বাতাসে বাঁশী রাধা বলেছে॥
একে ত কানাইয়ের বাঁশী তাতে সপ্ত বেধা (২)।
বাঁশী যে কেমনে জানে মোর নাম রাধা॥
কোন্ রসিকে বাজায় বাঁশী শুনতে বিপরীত।
ঘরের কাম এরি ভইনে (৩) শুনে বাঁশীর গীত॥

রসিক চূড়ামণি কানাই যমুনার জলে স্নান করিতে আসিয়া বাঁশীর সুরে রাধিকাকে কিরূপ উতলা করিয়া তুলিয়াছেন, এ গানটীতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

উপরোক্ত দুইটী 'ভোর' সাধারণতঃ হিন্দু কৃষাণীরা গায়িয়া থাকে। হিন্দু মুসলমান উভয়ে মিলিয়া যে সকল 'ভোর' গায়, এবারে তাহার কয়েকটী উল্লেখ করিতেছি।

৩য় ভোর।

ধুয়া।— কংশ সাহদের ডিঙ্গা বায় (৪) উজায়ে (৫) লও খবর।
পদ।— আমার সাধু সদাগর কইল কাতা (৬) সহরে ঘর।
ছয় মাস ধরি না পাইলাম খবর॥
আমার সাধু সদাগর বোম্বাই সহরে ঘর।
ছয় মাস ধরি না পাইলাম খবর॥ ইত্যাদি।

এরূপে বারটী সহরের নামোল্লেখ করিয়া এ 'ভোর' গায়িতে হয়। এজন্য ইহাকে কেহ কেহ 'বার সহর মিলান কবিতা গীত' বলিয়া থাকে।

৪র্থ ভোর।

ধুয়া।— নেবু খাইয়া যা বঁধু যারে।
নেবুর কড়ি শুধিও মোরে॥

(১) রাখিয়া। (২) ছেঁদা, ছিদ্র। (৩) ভগ্নীতে।
(৪) বাইতেছে। (৫) অগ্রসর হইয়া। (৬) কলিকাতা।

পদ।— আমার হাতের কঙ্কন বেচিয়ারে।
বন্ধের (১) লেমুর কড়ি শুধিও মোরে॥
আমার নাকের নাকফুল বেচিয়ারে।
বন্ধের লেমুর কড়ি শুধিও মোরে॥

এরূপে রমণীদের প্রত্যেক অলঙ্কারের নামোল্লেখ করিয়া এ 'ভোর' কৃষকেরা গায়িয়া থাকে।

৫ম ভোর।

ধুয়া।— কানাই ভঙ্গ দে রে খেলা।
রাধনে (২) যাক্ রে বউ
দুপর হইল বেলা॥

পদ।— তবে যেরে এবে ধীরে রাধনেতে যাই।
তোমার গলার হাঁচুলী যদি বেপার (৩) পাই॥

৬ষ্ঠ ভোর।

ধুয়া।— ধুঁয়া ভালা আনি দে বিচি (৪) দে।
মশা ভালা (৫) লাগের ঘন ঘন॥

পদ।— গৃহস্থের সুন্দর বধূ ধুঁয়া দিতে যায়।
হাল্যার (৬) সঙ্গে ঢুকাঢুকি (৭) মশা উড়ি যায়॥

সম্ভবতঃ এই 'ভোরে'র মর্ম্মার্থ এইরূপ—মশার যাতনায় অস্থির হইয়া কোনও স্বামী তাঁহার স্ত্রীকে ঘরে ধূপের ধুঁয়া দিতে বলিলেন, সুরসিকা সুন্দরী স্ত্রী ধুঁয়ার যোগাড় করিতে যাইয়া বাড়ীর কৃষকের সঙ্গে প্রেমাভিনয় আরম্ভ করিয়া দিল, মশার কথা আর মনে রহিল না।

যাহা হউক, 'ভোরে'র কথা অনেক হইল। এবার পল্লীগ্রামের একটী প্রেমের গান শুনা যাক্।—

৭ম সঙ্গীত।

ওরে বন্ধু রে!
তোমার লাগি আমার মন পোড়ে।
কোন্ ছলে ওরে বন্ধু! দেখিব তোরে॥
ও ভইন!
তোমার লাগি আমি বিরহে বিরাগী।
তোর লাগি হইলাম দুঃখের ভাগী॥

---

(১) বঁধুর। (২) রাঁধিতে। (৩) মজুরী। (৪) বাতাস দেওয়া। (৫) অত্যন্ত বেশী। (৬) চাষার, কৃষকের। (৭) হাতাহাতি।

ওরে বন্ধু রে !

তোমার পীরিতি জ্বালায় রহিতে নারি ঘরে।

কোন্ ছলে ওরে বন্ধু ! দেখিব তোরে॥

ও জইন !

লোকের ডরে না আসি দেখিতে তোরে।

লোকেতে দেখিলে মোরে কলঙ্ক করে॥

লোকের কলঙ্কের ডরে রে।

আসিতে না পারি তোর ঘরে॥

এই গানটী নায়ক নায়িকার কথোপকথন ছলে রচিত হইয়াছে। তবে গানটীতে নায়ক অপেক্ষা নায়িকার প্রাণের 'দরদ' কিছু অধিক বলিয়াই বুঝা যায়। কেন না, নায়িকা 'পীরিতি জ্বালায়' ঘরে থাকিতে পারিতেছে না—নায়কের জন্য তাহার মন দগ্ধ হইতেছে, সে কোনও 'ছলে' তাহাকে একটু দেখিতে চায়। আর নায়ক 'লোকের কলঙ্কের ডরে' নায়িকার ঘরে আসিতে দ্বিধা বোধ করিতেছে, অধিকন্তু ভাবিতেছে—'তোর লাগি হইলাম দুঃখের ভাগী।'—পুরুষ অপেক্ষা নারীর প্রেম কত গভীর—কত আবেগময় !

৮ম সঙ্গীত।

বটতলাতে ঠাকুর বৈসে যজ্ঞের আউন(১) জ্বালি।

হাতে লইয়া শি (২) ডমরু কান্ধে ভাঙ্গের ঝুলি॥

পঞ্চ মুখে করে গান, জঠে জঠে করে বান (?)

শিঙ্গা বাজে ভম্ ভম্, ডমরু বাজে ডম্ ডম্,

ভূতে নাচে ধেইয়া।

নন্দী দাদা নাচন করে তা ধেইয়া তা ধেইয়া॥

ধলা (৩) বলদে নাচি নাচি খায় বেলের পাতা।

মেনা (৪) বলে এই এলা (৫) আমার সুলক্ষণ জামাতা॥

জটার মাঝে বৌ রাখে কোস্কেকার (৬)সোয়ামী (৭)।

জানে না যে সতী আমি জগতের মা।

কি করিতে না পারি আমি কি করি না॥

শিবে বলে চুপ্ কর রান্ধ (৮) গিয়া ভাত।

খাইতে আসিবেন এখন ঠাকুর জগন্নাথ॥

এই সঙ্গীতটীতে কেমন অল্প কথায় শঙ্কর ও তাঁহার পরিবারবর্গের চিত্র সুন্দর অঙ্কিত হইয়াছে ! নিম্নলিখিত কবিতাতে এ চিত্র আরও ফুটতর :—

---

(১) আগুন। (২) শিঙ্গা। (৩) সাদা। (৪) মেনকা। (৫) আসিলা। (৬) কোথাকার। (৭) স্বামী। (৮) রন্ধন কর।

১ম কবিতা।

পুণ্যধাম বাপের বাড়ী
যাইতে চাহে সকল নারী।
ঐ দেখ মা দুর্গাদেবী সিংহবাহিনী।
গণেশেরে কোলত (১) করি আস্তন (২) যে জননী॥
সম্মুখেতে নন্দী আইয়ের (৩) আশাসোটা ধরি।
ভৃঙ্গী চলে পিছে ধুতুম্ ভুতুম্ (৪) করি॥
মেনা আইলা বারাই (৫) নিতে আদরের ঝি।
ঝি নাতি দেখি মেনা হাসে ভাসে সুখে।
বাটা ভরি আইছে (৬) পান দিতে ঝিয়ের মুখে॥
আক বাড়াইয়া (৭) নিল মায়ে বাড়ীর ভিতর।
পূজা দিল বলি দিল খাবাইল বিস্তর॥
তিন দিনর দিন রাখিল মায়ে বড় যতন করি।
চার দিনর দিন বিদায় দিল যাইতে নিজের বাড়ী॥
শিবে বলে কি আনিলা আমার কারণ।
আলুনি কচু শাক
টুনী (৮) পোড়া পানিভাত (৯)
গরীব বাপের বাড়ী আমার ভোজন॥

এই কবিতাটীতে 'আগমনীর সুর' ঝঙ্কৃত হইয়াছে। ইহাতে মেনকা মায়ের স্নেহ-সুকোমল হৃদয়ের যে ছাপ পড়িয়াছে, তাহা কি কমনীয়! পল্লীকবির চক্ষে প্রেমিক শিব বুঝি 'ছান্দাবান্দা'র প্রত্যাশী; তাই তিনি (শিব) গৌরীকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—(পিত্রালয় হইতে) 'কি আনিলা আমার কারণ?' পার্ব্বতী তদুত্তরে যাহা বলিলেন, তাহা কি বিচিত্র রহস্যপূর্ণ! তাঁহার এ কথার মধ্যে যেন পাগল ভোলানাথের প্রতি প্রচ্ছন্ন কৌতুকভরা বিদ্রূপের হাসি ফুটিয়া উঠিতেছে! কবি এ ক্ষেত্রে নারী-হৃদয়-জ্ঞানের যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন।

২য় কবিতা।

গোয়ালিনী সকল মিলি করে কানাকানি।
কি পোলা (১০) পাইল আমাদের নন্দরাণী॥

---

(১) কোলেতে। (২) আসিতেছেন। (৩) আসিতেছে। (৪) ধুপধাপ্। (৫) অগ্রসর হইয়া। (৬) আনিয়াছে। (৭) অগ্রসর হইয়া। (৮) টুনীপাখী। (৯) পান্তা ভাত। (১০) ছেলে।

এক চুমুকে দুধ খাই মাইল্য (১) পুতনারে।
এৈকক (২) টানে বকাসুরে খান খান (৩) করি চিরে॥
ঘরে যাইতে না দেখিলুম কেমনে খাইল ননী।
বাঁশী বাজাই মন মজাইল কৈল্য (৪) পাগলিনী॥
যমুনা উজান চলে বাঁশের বাঁশীর স্বরে।
যে বলে হরি হরি যমে তারে ডরে॥
বল হরি বল, বল হরি ভাই।
হরি নাম লইয়া দৈ থৈ খাই॥

৩য় কবিতা।

তোমরা আমার কে ?

আদর করিয়া ভোজন করাইয়া সুখেতে রাখিছ যে॥
কত পরিপাটি বিছানা করহ আমার দেহের লাগি।
কাঠের উপরে কাঠেতে চাপিবা উড়ি গেলে জীউ (৫) পাখী॥
ব্যজন লইয়া আদর করিয়া ব্যজহ (৬) আমার গায়।
তোমারই লোক উজাল (৭) লইয়া আগুন লাগাইবা তায়॥
কভু যদি মোর গায়ে ব্যথা হয় আদরে টিপিতে থাক।
তোমারই লোক হলঙ্গা (৮) লইয়া ভাঙ্গিবা আমার দেহ॥
কত মত রসে রান্ধিয়া বাড়িয়া আমারে ভুঞ্জাইয়া থাক।
ঘরের কোণেতে ছাই কাঁটা দিয়া চেই চেই (৯) কৈক (১০) দেখ॥
আজিকার সুখ, সুখ কিছু নহে, পরে যদি নাহি থাকে।
সুজন হইতা (১১) সুবুদ্ধি যোগাইতা সুপথে চালাইতা মোকে (১২)॥

জানি না, কখন কোন্ পল্লীকবি এই বৈরাগ্যভাব পূর্ণ সুন্দর কবিতাটী রচনা করিয়াছিলেন!

৪র্থ কবিতা।

শোভার বিবরণ।

ঘরের শোভা ছিক্যোরা (১৩) পাতিল (১৪)
বেড়ার শোভা আর (১৫)।
তাহাতুন (১৬) অধিক শোভা
সোয়ামী (১৭) আছে যার॥

---

(১) মারিল। (২) এক। (৩) খণ্ড খণ্ড। (৪) করিল। (৫) প্রাণ। (৬) বীজন কর। (৭) মশাল। (৮) শবদাহ করিবার বংশদণ্ড। (৯) দুর্ দুর্। (১০) কহিবা। (১১) হইলে। (১২) আমাকে। (১৩) শিকা। (১৪) মাটীর হাঁড়ি। (১৫) বেড়া বাঁধিবার বাকাটি। (১৬) তাহা হইতে। (১৭) স্বামী।

নিশির শোভা শশী যেন
মাথার শোভা চুল।
আকাশের শোভা তারা যেন
গাছের শোভা ফুল ॥
দারগার শোভা দারগগিরি।
পেয়দার শোভা লালপাগড়ি ॥
হালিয়ার (১) শোভা হালেতে।
জালিয়ার (২) শোভা জালেতে ॥
নারীর শোভা অলঙ্কারে
যার যে শোভা করে ।
শোভার বিবরণ।

এই 'শোভার বিবরণে' পল্লীকবির স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য-জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার চক্ষে যখন যেটী সুন্দর লাগিয়াছে, তাহা কেমন সরল ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন !

৫ম কবিতা।

রমণী মাজান।

আনিল সোনালী দাবর (৩) খুলিল ঢাকনী।
ইছিয়া (৪) বাছিয়া লইল সোনার কাইকন (৫) কনি (৬) ॥
আচুরিবিচুরি (৭) কেশ করিল লড়া লড়া (৮)।
তার মধ্যে চড়ায়ে দিল মণি মুক্তার ছড়া (৯) ॥
এমন খোঁটা (১০) বান্ধিল যে বামেতে টানিয়া।
সেই খোঁটা না দেখিলাম ত্রিজগত বেড়াইয়া ॥
গলায় তুলিয়া দিল গজমতির হার।
দুই বাঁয়েরাত (১১) চড়াই দিল কুলুপ দিয়া তার (১২) ॥
হাতেতে চড়াই দিল দুই গাছি বালা।
* * *
পায়েতে চড়াইয়া দিল মুড়ামারা খাড়ু (১৩)।
তার লামাতে (১৪) চড়াই দিল চৌরাশী ঘুংগুর (১৫) ॥
হাজার টাকার সাড়ি আনি কেমাইল (১৬) মজাইল।
* * * *

---

(১) চাষার। (২) জেলের। (৩) বাক্স। (৪) ইচ্ছানুসারে। (৫) কঙ্কন। (৬) চিরুণী। (৭) আঁচড়াইয়া। (৮) বেণীযুক্ত। (৯) মালা। (১০) খোঁপা। (১১) বাহুতে। (১২) অনন্ত। (১৩) মল। (১৪) নীচে। (১৫) নূপুর। (১৬) কোমর।

হাঁটিতে লাগে ঝিমুক ঝামুক (?) দেখতে লাগে শোভা।
মেঘের আরে (১) পড়ে যেন বিদ্যুতের আভা॥

এই অপূর্ব্ব কবিতাটীর মাঝখানের দুইটী পংক্তি পাওয়া যায় নাই।

৬ষ্ঠ কবিতা।

আকাশের বুলবুলি পাইক (২)
আমার সোদর ভাই,
মা বাপেরে সমাচার কইও (৩)
আমারে নিতে আই (৪)।
এ বৎসর থাকরে ভইন (৫)
নদীর কূল চাইয়া,
আর বৎসর লইয়া যাইব
জোয়ারে নৌকা বাইয়া (৬)।

এই ক্ষুদ্র কবিতাটীর মধ্যে পিত্রালয়ে গমনোৎসুকা একটী ক্ষুদ্র নবোঢ়া বালিকার নিভৃত হৃদয়ের আকুল অশ্রু লুকান আছে। সে অশ্রুটুকু কত করুণ!

৭ম কবিতা।

বাড়ীর পিছে ডালম (৭) গাছে একটী ডালম ধরে।
একটী ডালম ছিঁড়ি রাজা কন্যাদান করে॥
কন্যাদান করি রাজা ফোঁপাই ফোঁপাই (৮) কাঁদে।
বড় ভাইয়ে কাঁদন করে খলির (৯) খুন্তা (১০) ধরি॥
ছোট ভাইয়ে কাঁদন করে দোলার খুন্তা ধরি।
ছোট ভইনে কাঁদন করে খেলার ঘরে বসি॥
আমার দিদি কনে (১১) গিল খেলা ভঙ্গ করি।
বড় ভইজে (১২) কাঁদন করে পাকঘরেতে বসি॥

এই কবিতাটী বোধ হয় অসম্পূর্ণ। যেটুকু পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে বেশ বুঝা যায়, পল্লীকবি কন্যাদানের পর পিতৃগৃহের চিত্র কেমন বিষাদমাখা ভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন। কিন্তু হায়, সে কোন্ পুণ্য যুগ? যে যুগে রাজাও কেবলমাত্র একটী ডালিম যৌতুক দিয়া স্বীয় কন্যাদান করিতে সমর্থ হইতেন! হয় ত এ কথার ভিতরে কবির কিছু অতিশয়োক্তি থাকিতে পারে, তথাপি ইহা অসঙ্কোচে বলা যায়, তখন হিন্দুসমাজে বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় কন্যার পিতার

(১) আড়ালে, অন্তরালে। (২) পাখী। (৩) কহিও। (৪) আসিয়া। (৫) বোন, ভগ্নী। (৬) বাহিয়া। (৭) ডালিম। (৮) ফোঁস ফোঁস করিয়া। (৯) বেড়ার। (১০) খুঁটি। (১১) কেবা। (১২) বৌদিদিতে।

হৃদয় রক্ত-শোষণকারী বীভৎস বরপণপ্রথা ছিল না। তখন সমাজে এ কুপ্রথার প্রচলন থাকিলে সরলপ্রাণ পল্লীকবি নিশ্চয়ই তাঁহার কবিতায় তাহা উল্লেখ করিতে বিস্মৃত হইতেন না।

৮ম কবিতা।

ঝিঁয়া (১) ফুল ফুটে (২) বেল (৩) নাই।
জামাই আইস্‌ছে (৪) তেল নাই॥
জামাই দিছে (৫) ভাতের হারা (৬)।
হউরী (৭) দিছে ঢেঁকীত বাড়া॥
বধূতে দিছে কড়াইত (৮) তেল।
এইকক (৯) ছোঁতে (১০) উড়িয়ে গেল॥

বর্ষাকালের মেঘ-মলিন অপরাহ্নে যখন হলুদে রঙ্গের ঝিঙ্গে ফুলগুলি ফুটিয়া উঠে, তখন প্রায়ই পল্লীবালক বালিকার মুখে এই কবিতাটী শুনিতে পাওয়া যায়।

৯ম কবিতা।

তালতলাতে আসি জামাই
তালের লড়ি (১১) পাইল।
ঘাটার আগায় আসি জামাই
যোড় কলসী পাইল॥
বড় উঠানে আসি জামাই
আঁক-প্রদীপ (১২) পাইল।
ভিতর উঠানে আসি জামাই
বেদীর লগন্‌ (১৩) পাইল॥
বারণ্ডাতে উঠি জামাই
ধানে দুর্ব্বা পাইল।
হাতিনাতে (১৪) উঠি জামাই
দুধে কলা খাইল॥
পাকঘরে যাইয়া জামাই
রাধনীরে (১৫) পাইল।

---

(১) ঝিঙ্গে। (২) ফুটিয়াছে। (৩) বেলা। (৪) আসিয়াছে। (৫) দিয়েছে। (৬) ফরমাইস্‌। (৭) শ্বশুরী। (৮) কড়াইতে। (৯) এক। (১০) সোঁ করিয়া। (১১) লাঠি। (১২) বরণ-দীপ। (১৩) সান্নিধ্য। (১৪) বারাণ্ডার পরবর্ত্তী গৃহ। (১৫) রন্ধনকারিণীকে অর্থাৎ স্ত্রীকে।

উয়াইর (১) তলে থাইয়া জামাই
বিলাইর (২) লাথি থাইল ॥

অজ্ঞাতনামা পল্লীকবি এই কবিতাটিতে শ্বশুরালয়ে আগত জামতার ক্রম-প্রাপ্তি বা সংবর্দ্ধনার কি অপূর্ব্ব সরল ও সরস চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন! কিন্তু জামাতৃপ্রবর রান্নাঘরে তাঁহার চিরবাঞ্ছিতা 'রাধনী'কে পাইয়া আবার কি জন্যে মাচার নীচে 'বিলাইর লাথি' থাইতে গেলেন, ঠিক বুঝিতে পারিলাম না।

১০ম কবিতা।

তামাকু পাতা লক্ষ্মী পাতা সেই পাতার বিনে (৩)।
পোঁদর লেণ্ডি (৪) বেচি সেই পাতারে কিনে ॥
এক চুলুম (৫) তামাকু ভরি তিন জনে খায়।
পথের পথোয়া (৬) বেটা ফিরি ফিরি চায় ॥
ছালামালা (৭) এরি বুর্গ্যা (৮) বেটা হোককার (৯) কাছে যায়।
একৈ টানে হাতত যেন গোড়া (১০) স্বর্গ পায় ॥
হোকা গেছে মক্কাপুরে লাগল (১১) গেছে বসে।
কোলকী (১২) গেছে শ্রীবৃন্দাবনে তামাকু খাবে কিসে ॥
এ জনমে না খাইলুম (১৩) তামাকু মনে হেলা করি।
মরিলে আর জন্ম যাবে হোক্কা হোক্কা (১৪) করি ॥

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

ওসমানিয়া ইউনিবর্সিটি ও উর্দ্দু ভাষা।

ভারতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সময়ই সাধারণ ভারতবাসীকে শিক্ষা দিবার চিন্তা শাসনকর্ত্তাদের বিচলিত করিয়াছিল। তাঁহারা বিচার করিতে বসিয়াছিলেন যে ভারতবাসীকে তাহাদের মাতৃভাষা কিংবা রাজভাষা ইংরাজিতে শিক্ষা দান করা উচিত। তখনকার শিক্ষা-বিভাগের সচীব লর্ড মেকলে স্থির করিলেন যে, ভারতীয় ভাষায় শিক্ষাদান অপেক্ষা ইংরাজিতে শিক্ষা দিলেই ভারতের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হইবে। হইয়াছেও তাহাই। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যদি

(১) জলের কলসী রাখিবার মাচা। (২) বিড়ালের। (৩) অভাবে। (৪) পাছার লেংটি। (৫) কল্কী। (৬) পথিক। (৭) ঝুলিটুলি। (৮) বুড়া। (৯) হুঁকোর। (১০) সম্পূর্ণ। (১১) হুঁকোর ডাঁট। (১২) কল্কী। (১৩) খাইলাম। (১৪) হুয়া হুয়া, অর্থাৎ শেয়ালের ডাক।

আমাদের ইংরাজিতে শিক্ষা না দিয়া প্রাচীন নিয়ম মত সংস্কৃত ও আরবীতে বেদ বেদাঙ্গ, ও কোরাণ, ন্যায়, দর্শন ইত্যাদি শিক্ষা দিতেন, তাহা হইলে হয় ত আজ আচার বিচার লইয়া ব্যস্ত, বড় বড় নৈয়ায়িক, দার্শনিক ন্যায়রত্ন বিদ্যাবাগীশ দেখিতে পাইতাম, কিন্তু জাতি হারাইবার ভয়হীন, সমুদ্রপারে গমনকারী, স্বাধীনতাপ্রয়াসী, বাঙ্গালী সৈনিক যুবক পাইতাম না। আবার সংস্কৃততে শিক্ষা দিলে আমাদের শাসনকর্ত্তারাও খানসামা, সহিস অপেক্ষা সুলভ মূল্যে কেরাণী পাইতেন না। আধুনিক ইতিহাস বিজ্ঞানাদি ভারতীয় ভাষায় অনুবাদিত করিয়া শিক্ষা দিবার কথা বোধ হয় তখন তাঁহারা চিন্তা করেন নাই। ভারতীয় ভাষায় ঐ সকল বিষয় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিলে হয় ত এত দিনে ভারতবাসীদের মধ্যে আবিষ্কারকের দল পুষ্ট হইত। যাহা হয় নাই তাহার জন্য এখন দুঃখ করা নিষ্ফল; ঐরূপ দুঃখ না করিয়া এখন যাহাতে ঐরূপ শিক্ষাই প্রচলিত হয় তাহার চেষ্টা করা একান্ত উচিত। লর্ড মেকলে-প্রবর্ত্তিত নিয়মে সে কালের তিনটি প্রধান নগরে—কলিকাতা, বম্বে, মাদ্রাসে—বিশ্ব-বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। তাহার বহু কাল পরে লাহোরে ও পরে এলাহা-বাদে, ও অল্প দিন হইল পাটনাতে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। অল্প দিন হইল মহীশূরে স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। এইটিই দেশীয় রাজ্যের প্রথম ইউনিবর্সিটি। তাহার পরে হায়দ্রাবাদে ওসমানিয়া ইউনিবর্সিটি স্থাপিত হইয়াছে। যদিও বয়সে ওসমানিয়া ইউনিবর্সিটি সর্ব্বাপেক্ষা ছোট, তথাপি ইহার সর্ব্বাপেক্ষা ফলপ্রদ বিশেষত্ব আছে। অন্য ইউনিবর্সিটিতে বিদেশী ভাষায় শিক্ষাদান করা হয়, কিন্তু ইহাতে ভারতীয় ভাষা, অর্থাৎ, উর্দুতে শিক্ষাদান হইতেছে। উর্দুতে শিক্ষাদান করিতে নানা প্রকার বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিতে হইয়াছে ও হইতেছে। সর্ব্বপ্রথম বিঘ্ন এই যে, উর্দু বা কোনও ভারতীয় ভাষাতে ইউনিবর্সিটির শিক্ষাদানের উপযুক্ত পুস্তক নাই বা ছিল না। সেই জন্য নিজাম গবর্মেণ্ট প্রথমেই একটি অনুবাদ-সঙ্ঘ স্থাপন করিলেন, তাহাতে ভারতের নানা স্থান হইতে বিদ্বানমণ্ডলী একত্র করিয়া অনুবাদ কার্য্য আরম্ভ করা হইল। এক এক বিষয়ের পুস্তক চিহ্নিত করিয়া সেই বিষয়ের বিশেষজ্ঞ দ্বারা অনুবাদ আরম্ভ করা হইল, কিন্তু যে সময়ের মধ্যে এফ. এর. কোর্স অনুবাদ করিবার আশা করা হইয়াছিল, সে সময়ে পুস্তক প্রস্তুত হইল না। কারণ, যাঁহারা বিশেষজ্ঞ, বিষয়টি ভাল করিয়া ইংরাজিতে পড়িয়াছেন, কার্য্যতঃ দেখা গেল, তাঁহারা উর্দু সাহিত্যে তেমন সুন্দর লেখক নহেন, আবার যাঁহারা ভাল লিখিতে

পারেন, তাঁহারা বিষয়টি ভাল করিয়া বুঝিতে পারেন না। অতএব, বিশেষজ্ঞ দ্বারা অনুবাদিত অংশগুলি উর্দ্দু সাহিত্যে পাকা লেখক দ্বারা সংশোধিত করান হইল। এই ভাষার সংশোধনের পর দেখা গেল, স্থানবিশেষে বিষয়টির ব্যাখ্যা ভুল হইয়াছে। আবার বিশেষজ্ঞরা সংশোধন করিলেন। এইরূপ বার বার পাণ্ডুলিপিগুলি কাটা ছাঁটা হইয়া পাঠ্য পুস্তক রূপে মুদ্রিত হইয়াছে। অনুবাদ-কার্য্যের সহিত কয়েকটি পারিভাষিক শব্দ গঠন করিবার সভা স্থাপন করা হইয়াছে। যথা, একটি সভাতে অঙ্কশাস্ত্র, পদার্থ বিজ্ঞান, ও রসায়ন শাস্ত্রের শব্দ গঠন করা হয়, একটিতে দর্শন ও ন্যায়, ও একটিতে ইতিহাস ও অর্থশাস্ত্রের শব্দ গঠন করা হয়। প্রত্যেক সভাতে ছয় হইতে আট জন সভ্য আছেন।

গত বৎসর (১৯১৯) আগষ্ট মাসে কলেজ বিভাগের প্রথম বার্ষিক শ্রেণী খোলা হয়। সকল ছাত্রদেরই দ্বিতীয় ভাষারূপে ইংরাজি শিক্ষা করিতে হয়। দেশের রাজা হনফী সম্প্রদায়ের সুন্নী মুসলমান, এখন কেবল সেই ধর্ম্ম শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। বোধ হয় আগামী বৎসর শিয়া ও হিন্দুদের ধর্ম্মশিক্ষার ব্যবস্থা হইবে। এখন অঙ্কশাস্ত্র, পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন, অর্থ বিজ্ঞান, দর্শন, ন্যায়, প্রাচীন সাহিত্য মধ্যে সংস্কৃত, আরবী, পার্সী, আধুনিক সাহিত্য মধ্যে উর্দ্দু, মরাঠী, তেলেঙ্গী, কর্ণাটী, ও আধুনিক ইরাণি ও ইতিহাসে প্রাচীন (রোম ও গ্রীস) ইংল্যাণ্ড, ভারত ও ইসলামের ইতিহাসে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। ভবিষ্যতে বায়োলজি, বটানি ইত্যাদি বিজ্ঞান ও আইন বিভাগ খোলা হইবে। গত বৎসর ১৪৪টি ছাত্র কলেজে প্রবেশ করিয়াছিল, এ বৎসর ১১৫। কিন্তু উর্দ্দু দেশের ভাষা নহে। কেবল বড় নগরের মুসলমান ও যুক্তপ্রদেশ ও পঞ্জাব হইতে আগত লোকেরা উর্দ্দু বলে। স্থানীয় হিন্দু অধিবাসী ও গ্রাম্য মুসল-মানের ভাষা তেলেঙ্গী, তাহাদের উর্দ্দু বিদেশীয় ভাষা রূপে শিক্ষা করিতে হয়। সেই জন্য যদিও নিজাম রাজ্যে শতকরা ৮৯ জন হিন্দু ও ১০ জন মুসলমান বাস করে, তথাপি কলেজে কেবল ৫২টি (বা শতকরা ২০) হিন্দু ও ২০৭টি (শতকরা ৮০) মুসলমান ছাত্র।

উর্দ্দু ভাষায় শিক্ষাদানে যে কত সুবিধা হইতে পারে, তাহা পূর্ব্বে অনুমানও করিতে পারি নাই। এখন দেখিতেছি, ইংরাজিতে শিক্ষা দিতে যে সময় লাগে উর্দ্দুতে তাহার দুই-তৃতীয়াংশ সময় পাইলে যথেষ্ট হয়, বোধ হয় আরও অভ্যাস হইলে অর্দ্ধেক সময় লাগিবে। এখানে আর একটি পরীক্ষা সফল হইয়াছে। এখানে গত ৬৪।৬৫ বৎসর হইতে একটি আরবী ভাষার কলেজ ছিল,

তাহাতে সাহিত্য ও ধর্ম্ম শিক্ষা হইত। ৮।১০ বৎসর পূর্ব্বে তাহাতে মেট্রিক কোর্স পর্য্যন্ত উর্দুতে ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্ক, বিজ্ঞান ইত্যাদি শিক্ষা আরম্ভ করা হয়। আরবী বা পার্সী সাহিত্যে উপাধি পরীক্ষায় ও অন্য বিষয়ে উর্দুতে মেট্রিকে উত্তীর্ণ আট জন ছাত্র সংগ্রহ করা হইল, ও তাহাদের ইংরাজি বর্ণ পরিচয় হইতে আরম্ভ করিয়া দুই বৎসরে বম্বে ইউনিবর্সিটির মেট্রিক কোর্সে পরীক্ষা লওয়া হইল। ছয় জন উত্তীর্ণ হইয়া এইবার এফ. এ. পড়িতেছে। অর্থাৎ, প্রথমে ছাত্রদের মেট্রিক পর্য্যন্ত, অঙ্ক, ইতিহাস ইত্যাদি যদি মাতৃভাষায় গ্রাম্য পাঠশালাতে শিক্ষা দেওয়া হয়, পরে দুই বৎসর কেবল ইংরাজি সাহিত্য শিক্ষা দেওয়া হয়, তবে অল্প সময়ে ও অল্প ব্যয়ে তাহারা এণ্ট্রান্স পাস করিতে পারে। বঙ্গদেশে এই নিয়ম করিলে বোধ হয় এখনকার তুলনায় অল্প ব্যয়ে ও অল্প সময়ে গ্রাম্য ছাত্রেরা শিক্ষালাভ করিতে পারে।

বঙ্গভাষার পক্ষে যেমন সাহিত্য-পরিষদ, উর্দুর সেইরূপ অঞ্জুমন-ই-তরক্কী-উর্দু। এই সভার সম্পাদক পূর্ব্বে অলীগড়ে ছিলেন, এখন নিজাম সরকারে কার্য্য করেন। তাঁহার সহিত সভার কেন্দ্র এখানে আসিয়া হায়দ্রাবাদাধিপতিকে পৃষ্ঠপোষক স্বরূপ পাইয়াছে। ওসমানিয়া ইউনিবর্সিটি অনুবাদ সভা কেবল ইউনিবর্সিটির পাঠ্যপুস্তক রচনা ও অনুবাদ করিতেছে, কিন্তু অঞ্জুমনও যে কার্য্য করিতেছে দেখিলে আনন্দ হয়। বঙ্গভাষায় গল্প সাহিত্য পুষ্ট হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু চিন্তা করিবার মত বিষয়ের পুস্তকের একান্ত অভাব। কিন্তু অঞ্জুমন খুঁজিয়া খুঁজিয়া ইংরাজিতে যত ভাল পুস্তক পাইয়াছেন সব অনুবাদ করিয়াছেন ও করিতেছেন। এই উর্দু অঞ্জুমন ছাড়া যুক্ত প্রদেশের আজমগড়ে একটি দার-উল-মুসন্নফীন্ বা গ্রন্থকার সমিতি মৌলবী শিবলীর চেষ্টাতে স্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে আমাদের নিজাম বাহাদুর মাসিক ৫০০৲ সাহায্য করেন। ভারতের অন্য বড় লোকেরাও যথেষ্ট সাহায্য করিয়া থাকেন। সেখানে সাহিত্যসেবক ও গ্রন্থকারদের সপরিবারে থাকিবার উপযুক্ত কতকগুলি বাটী প্রস্তুত করা হইয়াছে ও একটি সুন্দর পুস্তকালয় ও মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করা হইয়াছে। রচয়িতা বা গ্রন্থলেখকরা সেইখানে বাস করিয়া উর্দু ভাষাতে পুস্তক রচনা করেন ও তাঁহাদের রচনাগুলি সমিতি মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করেন। তাঁহাদের প্রয়োজন মত ১০০৲ পর্য্যন্ত মাসিক সাহায্য করা হয়। অবশ্য তাঁহারা হয় ত অন্য কোনও ব্যবসা করিলে আরও বেশী উপার্জ্জন করিতে পারিতেন, কিন্তু যাঁহারা বাণীর সেবাতে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন বা

করিতে প্রস্তুত, তাঁহারা কেবল মাত্র ভরণপোষণ ব্যয় লইয়া মাতৃ ভাষার সেবা করিতেছেন। আমাদের পরিষদ কি সেরূপ কিছু করিতে পারেন না? আমার বিশ্বাস, এরূপ চেষ্টা করিলে বঙ্গদেশের রাজা ও জমিদারেরা সাহায্য করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না ও পরিষদের সভ্য মধ্যে বিদ্বান, বাগ্মীর ও দেশসেবক এমন অনেক আছেন, যাঁহারা অল্প আয় স্বীকার করিয়া রচনা কার্য্যে ব্রতী হইতে স্বীকৃত হইবেন। অনেকে রাজকার্য্য হইতে অবসর লইয়া আজমগড়ে বসিয়া পেনশন ভোগ ও নামমাত্র অল্প সাহায্য লইয়া বা বিনা সাহায্যে রচনা করিতেছেন।

একমাত্র গল্প সাহিত্য ও টিকটিকি সাহিত্য ছাড়া এখন উর্দ্দুভাষা বাঙ্গালা অপেক্ষা অনেকটা অগ্রগামী হইয়াছে, আর কিছু দিন বাদে, অর্থাৎ ওসমানিয়া ইউনিবর্সিটির সকল পাঠ্যপুস্তক এম, এ, এম, এস সি কোর্স পর্য্যন্ত প্রস্তুত হইলে বাঙ্গালাকে অনেকটা পিছাইয়া পড়িতে হইবে, তাহার সন্দেহ নাই।

অনুবাদ-সঙ্ঘে যেরূপ ব্যয় হইয়াছে ও হইতেছে, স্বীকার করি যে, সাহিত্য পরিষদ সেরূপ ব্যয় করিয়া পুস্তক প্রস্তুত করিতে অক্ষম। কিন্তু অন্য রূপে সাহিত্য-পরিষদ যাহা পারেন সঙ্ঘ অর্থ বলে বলীয়ান হইয়াও তাহা পারেন না। সাহিত্য-পরিষদের সভ্য সংখ্যা অল্প নহে, সভ্যদের মধ্যে সকল বিষয়ের বিশেষজ্ঞ বিদ্বান, সুলেখকের অভাব নাই। তাঁহারা যদি অল্প সময় ব্যয় করিয়া ও কষ্ট স্বীকার করিয়া বিজ্ঞানে ছোট বড় পুস্তক রচনা করেন, ও পরিষদ যদি সেগুলি চার আনা হইতে বার আনা সচিত্র সংস্করণে প্রকাশ করেন, তবে বোধ হয় এখন এমন সময় আসিয়াছে যে, প্রত্যেক গৃহস্থ বাটীতে মাসকাবারের বাজারের সহিত ২।৪ খানা বা বেশী পুস্তক কেনা হইতে পারে। একখানি গল্পের বহি দেখিলাম মূল্য ৩৸০। লোকে যদি ৩৸০ দিয়া উপন্যাস পড়িতে পারে, তবে নিশ্চয়ই ভাল চিন্তা করিবার বা শিক্ষা পাইবার মত পুস্তক প্রতি মাসে ২।১ টাকার কিনিতে তাহাদের কষ্ট হইবে না। আজ কাল কতকগুলি প্রকাশক গল্প পুস্তকের মালা প্রকাশ করিতেছেন। তাহাদের কাটতিও কম নহে, তাহাতেই বুঝিতে পারা যায় যে, সাধারণ লোক এখন পাঠ করিতে চাহে। যখন দেশের সে শুভ ইচ্ছা উদিত হইয়াছে, তখন কেবল টিকটিকি উপন্যাস না পড়িয়া ২।৪ খানা ভাল পুস্তক পাইলে নিশ্চয় পড়িবে, এখন পড়ে না কেবল ঐরূপ পুস্তকের অভাব বলিয়া। এ সময়ে, আমার বিবেচনাতে সাহিত্য-পরিষদ সমাজকে পুষ্টিকর মানসিক খাদ্য যোগাইতে ধর্ম্মত বাধ্য।

হিন্দীভাষায় নাগরী প্রচারিণী সভা ত জীবন্মৃত অবস্থাতে কাশীতে পড়িয়া আছে। বেহার অঞ্চলে নাগরী প্রচলিত হওয়ায় তাহার যথেষ্ট উন্নতি করা উচিত ছিল।

ওসমানিয়া ইউনিবর্সিটি বহু কাল প্রচলিত ইংরাজি শব্দও এখন ত্যাগ করিয়াছে। আগামী সংখ্যাতে আমাদের গঠিত পারিভাষিক শব্দের নমুনা পাঠককে দেখাইবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীঅমৃতলাল শীল।

গুরুমশায়।

১

চৈতন্যগঞ্জের মাধব বৈরাগী দীর্ঘ দশ বৎসর কাল গুরুমহাশয়গিরি করিয়া যখন দেখিল যে, এই দশ বৎসরে ছেলে ঠেঙ্গাইয়া তাহার হাতখানা খুব দোরস্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু মনটা একটুও দোরস্ত হয় নাই। তাহার কঠোর বেত্রাঘাত প্রভাবে অনেক দুরন্ত ছেলে শান্ত হইয়াছে, কিন্তু শাসনের অভাবে নিজের মনটা এমনই উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহাকে সংযত করা যে কোনও গুরুমহাশয়েরই অসাধ্য। মনের এই অবস্থা দেখিয়া মাধব ভীত হইয়া পড়িল, এবং বেতগাছটা পাঠশালার চালের বাতায় তুলিয়া রাখিয়া হরিনামের মালা লইয়া মনটাকে শাসন করিতে যত্নবান হইল।

মাধবের এই পরিবর্ত্তন দর্শনে কেহ যদি জিজ্ঞাসা করিত, 'বেত ছেড়ে মালা ধরলে যে বৈরিগী মশায়?' তাহা হইলে মাধব হাসিয়া উত্তর করিত, 'পিছনে আর এক জন যে বেত উঁচিয়ে আগিয়ে আসছে।'

মাধবের উত্তর শুনিয়া অনেকে হাসিত; কেহ অতীত-যৌবনা বারাঙ্গনার উদাহরণ প্রদর্শন করিত, কেহ বা বৈরিগী মশায়ের মস্তিষ্ক-বিকৃতির সম্ভাবনায় দুঃখ প্রকাশ করিতে থাকিত; আর ছেলের দল বেত্রহস্ত গুরুমহাশয়ের গোপীচন্দনচর্চ্চিত মালাজপনিরত সৌম্য মূর্ত্তি দর্শনে ভীতির পরিবর্ত্তে প্রেম ও ভক্তি প্রকাশ করিত।

মাধব কিন্তু কাহারও কথায় কর্ণপাত না করিয়া আপনার মনের শাসনে প্রবৃত্ত হইল। দশ বৎসরের অব্যবহারে নামের ঝুলিটা ময়লা হইয়া গিয়াছিল,

সেটাকে পরিষ্কার করিয়া, নূতন সূতা দিয়া মালাছড়া গাঁথিয়া লইল। পেঁড়া খুলিয়া গোপীনাথের পট, গোপীমৃত্তিকা, তিলককাঠী, মহাজন পদাবলী বাহির করিল। আরশুলায় গোপীনাথের পটের কোণগুলা খাইয়া ফেলিয়াছিল, স্থানে স্থানে অপরিষ্কার করিয়াছিল। পদাবলীর পুঁথি এমন জীর্ণ হইয়া গিয়াছিল যে, হাতে তুলিতেই তাহার কতকগুলা পাতা গলিত পত্রের ন্যায় ঝরিয়া পড়িল। মাধব স্তব্ধ বিস্ফারিত নেত্রে সেগুলার দিকে চাহিয়া চাহিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল।

এক দিন এই পুঁথিগুলা কি যত্নের সামগ্রী ছিল! এখন ইহাদের এক একখানা পাতা বুকের এক ছটাক রক্ত অপেক্ষাও মূল্যবান বোধ হইত; ইহার এক একটা ছত্র হইতে অমৃতের মধুর ধারা ঝর্ ঝর্ করিয়া পড়িত। গোপীনাথের এই ক্ষুদ্র পটখানার মধ্যে স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল তিন লোকের সুষমা সমষ্টীভূত হইয়া বিরাজ করিত। তখন এই পটখানির দিকে চাহিলে প্রেমে ও আনন্দে সমগ্র হৃদয়টা ভরিয়া উঠিত। এই পটখানি, এই পুঁথিগুলি, এই মালাছড়া, এইগুলিকে সম্বল করিয়া মাধব দুঃখতাপ পূর্ণ সংসারে যে একটী শান্তির পথ বাছিয়া লইয়াছিল, সে পথ আজ কোথায়—কত দূরে? তখন বসন্তের মলয়মারুত স্পর্শে সংসার-উদ্যানটা ফলে ফুলে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছিল, যৌবনের পিক পঞ্চম তানে ডাকিয়া ডাকিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছিল। মাধব সে সকলকে উপেক্ষা করিয়া একমাত্র হরিনামকেই সার করিয়া লইয়াছিল; এবং গোপীনাথের চরণে আপনার সুখ দুঃখ সব অর্পণ করিয়া আত্মতৃপ্তি অনুভব করিতেছিল। সেই তৃপ্তিতে বিভোর থাকিয়াও চঞ্চল মনোভৃঙ্গটা সময়ে সময়ে বিষয় বাসনারূপ কেতকী কুসুমের দিকে ছুটিয়া যাইতে উদ্যত হইলে মাধব বিদ্যাপতির পদ বাহির করিয়া গায়িতে থাকিত—

'আধ জনম হাম নিন্দে গোঙায়নু
জরা শিশু কত দিন গেলা;
যৌবনে নিধুবন রসরঙ্গে মাতনু
আর তোহে ভজব কোন্ বেলা।'

২

এক দিন হঠাৎ গুরুদেব আসিয়া বলিলেন, 'বৎস, বৈষ্ণব ধর্ম্ম যোগীর শুষ্ক সাধনার ধর্ম্ম নয়; এ সাধনায় সাধন-সঙ্গিনীর প্রয়োজন, নতুবা সাধনা সম্পূর্ণ হয় না।'

মাধব গুরুদেবের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া লইল, এবং গোপাল দাসের বিধবা কন্যা মঞ্জরী দাসীর সহিত কণ্ঠীবদল করিয়া ফেলিল।

কণ্ঠীবদলের পর মাধব দেখিল, গুরুদেবের কথা যথার্থ, সাধনসঙ্গিনী না থাকিলে সাধন পূর্ণাঙ্গ হয় না। আগে ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিয়া মাধবকে নিজেই পূজা আহ্নিকের যোগাড় করিয়া লইতে হইত। কিন্তু এখন দেখিত, তাহার আসিবার আগেই সমস্ত সুন্দর রূপে প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে। মাধব হৃষ্টচিত্তে গিয়া পূজায় বসিত। আগে জপ করিতে করিতে মাঝে মাঝে বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখিতে হইত, কতটা বেলা হইল। বেলা অতিরিক্ত হইলে তাড়াতাড়ি জপ সারিয়া লইয়া রন্ধনের উদ্যোগ করিতে হইত। কিন্তু এখন সে ঝঞ্ঝাট ছিল না; সুতরাং মাধব ইচ্ছামত জপ আহ্নিক সম্পন্ন করিয়া লইবার অবসর পাইত। তার পর স্বহস্তে তাড়াতাড়ি প্রস্তুত অর্দ্ধসিদ্ধ বা পোড়া ভাত, আর লবণাক্ত ব্যঞ্জন; তাহার তুলনায় মঞ্জরীর সযত্নে প্রস্তুত অন্নব্যঞ্জনের মধ্যে কি অমৃতের আস্বাদ! পরিতৃপ্তির সহিত আহার করিতে করিতে মাধব অতৃপ্ত নয়নে মঞ্জরীর সহাস্য মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত।

তার পর এক এক দিন রাত্রিতে বাড়ীখানা শ্মশানের স্তব্ধ গাম্ভীর্য্য লইয়া কি বিভীষিকা প্রদর্শন করিত! সেই গভীর স্তব্ধতার মধ্যে নাম গান করিতে গিয়া মাধব কত দিন নিজের কণ্ঠস্বরে নিজে শিহরিয়া উঠিয়াছে। এখন কিন্তু নাম গান করিতে বসিলেই মঞ্জরী আসিয়া পাশে বসিত এবং একটীর পর একটী পদ শুনিতে আগ্রহ প্রকাশ করিয়া মাধবের প্রাণটাকে উদ্দীপনাময় করিয়া তুলিত। এক এক দিন জপান্তে জ্যোৎস্নাপ্লাবিত প্রাঙ্গণে বসিয়া মাধব গান ধরিত—

'যতনে যতেক ধন　　পাপে বাঁটায়নু
মেলি পরিজনে খায়;
মরণক বেরি　　কোই না পুছই
করম সঙ্গে চলি যায়।'

মঞ্জরী আসিয়া তর্জ্জন করিয়া বলিত, 'ও আবার কি ছাই গান!'

সহাস্যে মাধব জিজ্ঞাসা করিত, 'তবে কি গাইবো?'

মঞ্জরী বলিত, 'কেন, ওই সব ছাড়া আর গান নাই কি? সেই যুগল মিলনের পদটী গাও।'

মাধব হাসিয়া গোবিন্দদাসের পদ ধরিত—

'রাধা মাধব দুহুঁ তনু মিলল
উপজল আনন্দ কন্দ ;
কনকলতায় তমাল জনু বেঢ়ল
রাহু গরাসল চন্দ।
যৈছনে কমলে ভ্রমরা রহে মাতি ;
জলদে বেঢ়ল জনু তড়িত লতাবলি
রতিপতি বিদরয়ে ছাতি।'

মঞ্জরী মুগ্ধ চিত্তে বসিয়া সঙ্গীত-সুধা পান করিত ; উপর হইতে চাঁদের আলো আসিয়া তাহার প্রফুল্ল মুখখানাকে আরও উজ্জ্বল করিয়া দিত। সেই চন্দ্রালোকপ্রফুল্ল মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া মাধব উৎসাহ সহকারে গাহিতে থাকিত—

'কুঞ্জ কুটীর কুসুম নব পল্লব
ভ্রমর ভ্রমরী কত রঙ্গে ;
সারী নারী শুক পুরুখ জোড়ে জোড়ে
ময়ূর ময়ূরীক সঙ্গে।'

তবে একটা বিষয়ে কিছু গোল বাধিল। আগে নাম গান করিয়া, কীর্ত্তন গাহিয়া মাধব কোনরূপে নিজের পেটটা চালাইয়া দিত, কিন্তু এখন আর সে উপায়ে দুইটা পেট চলিল না। কাজেই মাধবকে পেট চালাইবার উপায় অন্বেষণ করিতে হইল। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষে সে বারোয়ারির আট-চালায় পাঠশালা খুলিয়া বসিল। কাছাকাছি আর পাঠশালা না থাকায় আয় মন্দ হইল না ; সে আয়ে দুইটা পেট স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইতে লাগিল।

কেবল ঐহিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্য নয়, মঞ্জরী পারত্রিক মঙ্গলেরও সহায় হইল। আগে এক জন বৈষ্ণব অতিথি আসিলে তাহার সেবা লইতে মাধবকে ব্যতি-ব্যস্ত হইতে হইত। কিন্তু এখন দশ জন অতিথি আসিলেও মাধবের কোনও চিন্তা ছিল না ; তাহারা মঞ্জরীর সেবা যত্নে পরিতৃপ্ত হইয়া মাধবের আতিথ্য-ধর্ম্মের প্রশংসা কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রস্থান করিত। মাধব আপনার সংসার-আশ্রমকে সার্থক জ্ঞান করিয়া লইত।

এই রূপে মাধব যখন পরিত্যক্ত সংসারটাকে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার অসারতার মধ্যে সার সত্যের মধুর আস্বাদ অনুভব করিতেছিল, তখন সংসারটা যেন পূর্ব্ব উপেক্ষার প্রতিশোধ লইবার জন্যই স্বীয় কোমল বন্ধন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহাকে দূরে ফেলিয়া দিল। রঞ্জিতপুরে ধুমধামের সহিত মহোৎসব

হইতেছিল। মাধব সেখানে কীর্ত্তন গায়িতে গিয়াছিল। তিন দিন পরে ফিরিয়া দেখিল, সংসার তাহার উপর কঠোর প্রতিশোধ লইয়াছে, তাহার প্রেমের শিকল কাটিয়া মঞ্জরী বিহঙ্গী উড়িয়া গিয়াছে; শূন্য খাঁচার মত ঘরখানা পড়িয়া রহিয়াছে। সেই শূন্য গৃহের দিকে চাহিয়া মাধব বজ্রাহতের ন্যায় বসিয়া পড়িল। তার পর অনুসন্ধানে জানা গেল, পরম ভাগবত কৃষ্ণদাস বাবাজি তাহার গৃহে আতিথ্য স্বীকার করিয়া অতিথিসেবার পুরস্কার স্বরূপে শ্রীমতী মঞ্জরী দাসীকে প্রেমের সরল পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। মঞ্জরীর অনুসন্ধানের জন্য অনেকে পরামর্শ দিলে মাধব তাহাতে কর্ণপাত করিল না; সে হরিনামের মালা, গোপীনাথের পট, আহ্নিকের উপকরণ, পদাবলীর পুঁথি সব একটা বেতের পেঁড়ায় তুলিয়া পাঠশালায় গিয়া বসিল, এবং কঠোর বেত্রাঘাতে অনেক দুরন্ত বালককে শান্ত করিয়া অল্প দিনের মধ্যেই আপনার গুরুমহাশয় পদের প্রতিপত্তি সর্ব্বত্র জাহির করিয়া ফেলিল।

সেই দিন হইতে মাধব খোলের বাজনা শুনিলে কানে আঙ্গুল দিত, বৈষ্ণব ভিখারী দেখিলে তাড়াইয়া মারিতে যাইত, কেহ হরিনামের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলে তাহাকে ভণ্ড বলিয়া বিদ্রূপ করিত। কাজের মধ্যে শুধু ছেলে ঠেঙ্গাইত, আর পাড়ায় পাড়ায় গল্প করিয়া বেড়াইয়া দিন কাটাইয়া দিত। এইরূপে সে দীর্ঘ দশটী বৎসর কাটাইয়া দিল।

এই দশ বৎসরে মাধব হরিনাম ভুলিল, খোলের বাজনা ভুলিল, জপ আহ্নিক, মহাজনপদ সব ভুলিয়া গেল, ভুলিল না শুধু মঞ্জরীকে। অতীত দুঃস্বপ্নের মত মঞ্জরীর স্মৃতিটা মনের পাশে ঠিক জাগিয়া রহিল। চঞ্চল পতঙ্গ যেমন নূতন ফুল না পাইয়া শুক্‌না ঝরা ফুলটারই আশে পাশে ঘুরিয়া বেড়ায়, মাধবের মনোভৃঙ্গও তেমনই এই পুরাতন নির্গন্ধ স্মৃতিকুসুমকে সম্বল করিয়া তাহারই চারি পাশে উড়িয়া বেড়াইত; কিছুতেই সে দিক হইতে ফিরিতে চাহিত না। এই অবাধ্য মনটাকে বশে আনিবার কোনও উপায় যখন খুঁজিয়া পাইল না, তখন মাধব হরিনামের চাবুক দিয়া তাহাকে শাসন করিতে উদ্যত হইল।

৩

'মোতাই, ও মোতাই!'

হাঁড়ীতে তেল দিয়া তাহাতে আলুগুলা ফেলিয়া দিবার জন্য মাধব অপেক্ষা করিতেছিল। বাদলায় কাঠগুলা এমনই স্যাঁতা হইয়া গিয়াছিল যে, কিছুতেই

জ্বলিতে চাহিতেছিল না, ধোঁয়ায় চোখ দুইটা করঞ্জার মত লাল হইয়াছিল। আগের দিনে একাদশী গিয়াছে; কোথায় তাড়াতাড়ি এক মুঠা পেটে দিয়া ক্ষুধার তাড়না দূর করিবে, তাহা না হইয়া আজই উনানটা বাদ সাধিয়া বসিল। ক্রোধে বিরক্তিতে মাধবের মুখখানা ভীষণ হইয়া উঠিয়াছিল। বহু কষ্টে ভাতটা নামিয়াছে, কিন্তু শুধু ভাত তো খাওয়া যায় না। কাজেই একটা তরকারী রাঁধিবার জন্য মাধব হাঁড়ীতে তেল দিয়া, আলুগুলা হাতে লইয়া একবার হাঁড়ীর দিকে আর বার উনানের মৃদু শিখার দিকে বিরক্তিসূচক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিল, আর হাঁড়ী সমেত উনানটাকে পদাঘাতে চূর্ণ করিয়া দিয়া ছুটিয়া পলাইবে কি না তাহাই এক একবার ভাবিয়া লইতেছিল। কিন্তু পলাইবে কোথায়? যেখানেই যাক্, ক্ষুধা যে সঙ্গে সঙ্গে যাইবে। হরিনামে সংসারের ত্রিতাপ জ্বালা দূরীভূত হয়, কিন্তু পোড়া পেটের জ্বালা তো দূর হয় না! এই দুর্দ্দমনীয় জঠর জ্বালাটাকে অভিসম্পাত করিতে করিতে মাধব আলুর টুকরাগুলা হাঁড়ীতে ফেলিবার উদ্যোগ করিতেছিল, এমন সময় কে ডাকিল, 'মোশাই!'

সে ডাকে চমকিত হইয়া মাধব পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিতেই দেখিল, এক বিধবা যুবতী আধ ঘোমটা টানিয়া উঠানের এক পাশে নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। বিস্ময়ের সহিত মাধব জিজ্ঞাসা করিল, 'কে গা?'

যুবতী সঙ্কোচ-জড়িত কণ্ঠে উত্তর দিল, 'আমি মোশাই।'

একটু বিরক্ত ভাবে মাধব পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, 'কে তুমি?'

'আমাকে চিনতে পাচ্ছেন না মোশাই?'

বলিয়া যুবতী মুখের ঘোমটাটা কপালের উপর পর্য্যন্ত তুলিয়া দিল। মাধব ধূমরক্তিম দৃষ্টিটাকে বিস্ফারিত করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিল। যুবতী মৃদু কম্পিত কণ্ঠে বলিল, 'আমি—আমি রাজু।'

বিস্ময়-জড়িত কণ্ঠে মাধব বলিয়া উঠিল, 'রাজু! ছিষ্টে দাদার মেয়ে রাজু?'

রাজু দুই পা আগাইয়া আসিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, 'তা হ'লে তোমার মনে আছে?'

মাধবের হাত হইতে আলুর টুকরাগুলা মাটীতে পড়িয়া গেল। তাহার সেই আশ্চর্য্য ভাব লক্ষ্য করিয়া রাজু বলিল, 'তুমি যে অবাক্ হয়ে গেলে মোশাই!'

বাস্তবিক মাধব অবাক হইয়া গিয়াছিল; তাহার মুখ দিয়া একটা কথাও বাহির হইল না, শুধু ক্রোধ ও বিস্ময়ে মুখখানা বিকৃত হইয়া রহিল।

সেই রাজু? যে এক দিন সকালের ফুটন্ত ফুলটীর মত তাহার চোখের সামনে নাচিয়া বেড়াইত; কোঁকড়া কোঁকড়া চুলের রাশ দোলাইয়া ছুটিয়া আসিয়া ডাকিত, 'মোতাই, ওগো মোতাই!' মঞ্জরীর অন্তর্ধানে তখন সংসারের সব সুরগুলা বেসুর হইয়া গিয়াছিল; তাহার মধ্যে শুধু এই একটা সুরই যাত্রার দলের ওস্তাদী রাগরাগিণী আলাপের মধ্যে কোনও একটী বালক কণ্ঠে উত্থিত কীর্ত্তনের সুরের মত এত মিষ্ট লাগিত যে, তাহা শুনিবার জন্য মাধব প্রায়ই উৎকর্ণ হইয়া থাকিত। সে সুর শুনিলেই হৃদয়ের অবসাদ মলিন তন্ত্রীগুলাও যেন একবার সাড়া দিয়া উঠিত। বাড়ীর পাশেই পাঠশালা; সুতরাং দিনের অধিকাংশ সময় রাজু পাঠশালাতেই কাটাইয়া দিত। কখনও সে বই লইয়া অ আ পড়িত, কখনও পুঁথির পাতা উল্টাইয়া ছবি দেখিত, কখনও বা কোনও ছেলের দোয়াত কলম টানিয়া লইয়া হিজি বিজি লিখিতে বসিত। ছেলেদের অভিযোগে বিরক্ত হইয়া মাধব তাহাকে ধমক দিলে সে আধ-ফুটন্ত পদ্মকোরকের ন্যায় ভাসা ভাসা চোখ দুইটীর উপর কচি পাতার মত হাত দু'খানি চাপা দিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিয়া উঠিত; কখনও বা রাগে মাধবের গলা জড়াইয়া, মাথার শিখা টানিয়া, চুল ছিঁড়িয়া অস্থির করিয়া তুলিত।

তার পর তাহার বিবাহ হইল। বিবাহের সময় যখন সে শ্বশুরবাড়ী যায়, তখন আবদার ধরিয়া বসিল, মোশাইকে যেতে হবে। সে আবদার মাধব ঠেলিতে পারিল না; পাঠশালা বন্ধ দিয়া পাল্কীর পিছনে পিছনে তাহাকে পাঁচ ক্রোশ পথ ছুটিতে হইয়াছিল, এবং যে কয় দিন সে শ্বশুরবাড়ীতে ছিল, সে কয় দিন মাধব বাড়ী ফিরিতে পারে নাই।

ইহার পর কিছুদিন পরে যে দিন রাজুর বৈধব্য সংবাদ আসিয়া পঁহুছিল, সে দিন এই বজ্রের কঠোর আঘাত সহ্য করিবার জন্য ছিষ্টিধর বা তাহার মাতা কেহই জীবিত ছিল না, একা মাধবকেই সেই দুঃসহ আঘাত বুক পাতিয়া লইতে হইয়াছিল। সে আঘাতের ক্ষত এখনও বুঝি শুষ্ক হয় নাই। কিন্তু সে ক্ষত শুষ্ক না হইতেই তাহাতে আর একটা খোঁচা লাগিল। সেটা বড় সহজ খোঁচা নয়, যেন বিষাক্ত শল্যের আঘাত। লোকপরম্পরায় মাধব শুনিতে পাইল, রাজুর চরিত্র কলুষিত হইয়াছে, কুসংসর্গে পড়িয়া

হতভাগিনী গৃহত্যাগিনী হইয়াছে। শুনিয়া মাধব যেন আকাশ হইতে পড়িল। সেই ফুলের মত সুন্দর, দেবতার নির্ম্মাল্যের ন্যায় পবিত্র বালিকা, তাহার ভিতর এমন বিষাক্ত কীট! অথবা নারীজাতি এমনই বিশ্বাসঘাতিনী বটে। মঞ্জরীকে দিয়াই তো মাধব তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাইয়াছে। উঃ, জগতে এই জাতিটা কি ঘৃণ্য!

আজ সেই রাজু সম্মুখে উপস্থিত। মাধব বেশ লক্ষ্য করিয়া দেখিল, এখনও তাহার মুখে সেই সৌন্দর্য্য, স্বরে সেই মাদকতা; সে স্বরে এখনও হৃদয়ের ছিন্নপ্রায় তারগুলা সাড়া দিয়া উঠিতে চায়। ক্রোধে ঘৃণায় মাধবের ললাট কুঞ্চিত হইল।

রাজু জিজ্ঞাসা করিল, 'কি ভাবচো মোশাই?'

তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া লইয়া একটু ইতস্ততঃ করিয়া মাধব বলিল, 'তুমি—তুমি যে হঠাৎ—'

রাজু বলিল, 'আমার অবস্থা সব শুনেছ কি?'

'কতক কতক শুনেছি বৈ কি।'

'বাকীটা শুনবে?'

'দরকার নাই।'

রাজু নতমুখে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। মাধব জিজ্ঞাসা করিল, 'এখন তোমার কি দরকার তাই বল।'

রাজু একবার মুখ তুলিয়াই নামাইয়া লইল; একটা ঢোঁক গিলিয়া বলিল, 'আমার—শ্বশুরের ভিটেয় আমার ঠাঁই নাই।'

'না থাকবারই কথা।'

'এ গাঁয়েও কেউ আমাকে ঠাঁই দিতে চায় না।'

'এইটাই পাপের প্রধান সাজা, রাজু।'

রাজুর চোখ দুইটা জ্বলিয়া উঠিল। সে জ্বলন্ত দৃষ্টিটা মাধবের মুখের উপর স্থাপন করিয়া তীব্র কণ্ঠে বলিল, 'সংসারে পাপী কি একা আমিই, মোশাই?'

এ প্রশ্নের উত্তর মাধব সহজে দিতে পারিল না। রাজু তাহার উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই বলিল, 'আমার তো পাপের সীমা নাই। কিন্তু বিষয়ের ভাগ দিতে হবে ব'লে নিজের শালাকে পিছনে লাগিয়ে যে কলে কৌশলে

আমার মুখে কলঙ্কের ছাপ মেরে দিলে, সে কি আমার চাইতে বেশী পুণ্যবান্ মোশাই ?'

মাধবের দৃষ্টিটা বিস্ফারিত হইয়া আসিল। সে যে কি উত্তর দিবে ভাবিয়া পাইল না। রাজু নাসা কুঞ্চিত করিয়া বলিল, 'চুলোয় যাক্ পাপ পুণ্য। এখন আমাকে একটু জায়গা দিতে পারবে ?'

চিন্তা-মলিন মুখে মাধব বলিল, 'পারি। তবে—'

'তবে লোকে নিন্দে করবে এই যা ভয়, না ?'

'আমি বোষ্টম ভিখিরী মানুষ, লোকের নিন্দা সুখ্যাতিতে আমার কিছু আসে যায় না।'

বলিয়া মাধব একটু হাসিল। রাজু বলিল, 'তা জানি ব'লেই তোমার কাছে এসেছি মোশাই।'

রাজু এতক্ষণ উঠানে রোদে দাঁড়াইয়াছিল, এক্ষণে আগাইয়া গিয়া দাবার উপর বসিল। এবং উনানের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, 'তোমার কি রকম রান্না হচ্ছে মোশাই ? উনান যে নিবে গিয়েছে।'

মাধব পুনরায় উনান জ্বালিতে প্রবৃত্ত হইল। রাজু ঈষৎ হাসিয়া বলিল, 'শীগ্‌গীর রেঁধে নাও মোশাই। অনেক দিন পরে আজ বোষ্টমের পাতের পেসাদ পেয়ে তবু একটু পবিত্র হব।'

৪

সন্ধ্যার সময় মাধব পাঠশালা হইতে ফিরিতেছিল। পথে ধর্ম্মদাস চক্রবর্ত্তীর সহিত সাক্ষাৎ হইলে চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন, 'আর শুনেছ মশাই, আজ ছিষ্টে ঘোষের মেয়ে এসেছিল যে।'

মাধব চমকিয়া উঠিল। চক্রবর্ত্তী বলিলেন, 'ঠিক দু'কুর বেলা ছুঁড়ী এসে হাজির। বলে, পুরুত দাদা, আমাকে একটু ঠাঁই দাও। আমার মনে হ'লো মাগীকে ঝাঁটা পেটা ক'রে ঠাঁইছাড়া করি। গিন্নী বললে, না না ; লোকে কি বলবে ! তাঁর ইচ্ছা, এমন সময় এসেছে, একমুঠো ভাত দিই। আরে রামচন্দ্র ! পাপিষ্ঠা বেশ্যা, তাকে আবার খেতে দেব ! তাকে দয়া করলেও পাপ আছে।'

মাধব নির্ব্বাক্ ভাবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। চক্রবর্ত্তী বলিলেন, 'কিন্তু ধর্ম্মের কি সূক্ষ্ম গতি দেখ। ছিষ্টে ঘোষ, বেটার কি অহঙ্কার

ছিল। ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব দেখে মাথা নোয়াত না। তেমন হ'য়েছে, দর্পহারী মধুসূদন দর্প চূর্ণ করেছেন। মেয়ে বেশ্যা হ'য়ে এক মুঠো ভাতের তরে দোরে দোরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তবু লোকে বলে ভগবান্ নাই।'

ভগবানের অস্তিত্বে দৃঢ় বিশ্বাসী চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের ধর্ম্মনিষ্ঠা মাধবের বিস্ময় উৎপাদন করিলেও সে মুখে কিছু বলিতে পারিল না; আমতা আমতা করিয়া তাড়াতাড়ি তাঁহার সম্মুখ হইতে প্রস্থান করিল।

রাত্রিতে মাধব রাজুকে জিজ্ঞাসা করিল, 'তুই এখন কি করবি রাজু?'

রাজু বলিল, 'কি করবো তা তুমিই বলে দাও না।'

মাধব ভাবিতে লাগিল। রাজু বলিল, 'আচ্ছা, ভেক নিয়ে বোষ্টম হ'লে হয় না?'

ভ্রূকুটী করিয়া মাধব বলিল, 'ছিঃ!'

মাধব মহা সমস্যায় পড়িল। তাহার এমন ইচ্ছা নয় যে, রাজু তাহার কাছে থাকে। পাপের উপর যতটা ঘৃণা থাক্ বা না থাক্, স্ত্রীজাতির উপর তাহার তীব্র বিদ্বেষ ছিল; বিশেষ ব্যভিচারিণীর প্রতি। সুতরাং রাজুর সংশ্রব তাহার একটুও ভাল লাগিল না। অথচ, তাহাকে চলিয়া যাও, এমন কথাটাও বলিতে পারিল না! ছিঃ, কাহারও মুখের উপর—বিশেষতঃ এক জন নিরাশ্রয়াকে কি এমন কথা বলা যায়? অনেক ভাবিয়া মাধব শেষে 'যা করেন হরি' স্থির করিয়া এই কঠিন সমস্যার সহজ সমাধান করিল।

পাঁচ জনে কিন্তু এত সহজে এ সমস্যার সমাধান করিতে পারিল না। তাহারা মাধবের ব্যবহার দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল। কেহ বলিল, 'বৈরিগী মশাই ওকে ভেক দিয়ে বোষ্টম করবে।' কেহ বলিল, 'বোষ্টম নয়, বোষ্টমী ক'রে ওর সঙ্গে কণ্ঠীবদল করবে।' কেহ বলিল, 'শেষ বয়সে বোষ্টমী নিয়ে বৃন্দাবনবাসী হবে।'

ছেলেরা কিন্তু কণ্ঠীবদলটাই বিশ্বাস করিয়া লইল, এবং সেই সময়ে তাহারা কয় দিন ছুটী পাইবে তাহা লইয়া তর্ক বিতর্ক করিতে লাগিল।

৫

সকালে পাঠশালায় গিয়া মাধব দেখিল, দুই তিনটী ছেলে মাত্র উপস্থিত হইয়াছে। মাধব তাহাদের এক জনকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'আর সব কোথায় রে নীলে?'

নীলে অন্যান্য ছাত্রদের অনুপস্থিতির ঠিক কারণ বলিতে পারিল না। মাধব তখন তাহাদের ডাকিতে পাঠাইয়া খানিক পরে নীলমণি একা ফিরিয়া আসিয়া জানাইল যে, আর কোনও ছেলেই পাঠশালায় আসিবে না, তাহারা বলে যে, গুরুমহাশয়ের বিবাহে তাহারা ছুটী পাইয়াছে। মাধব হাসিয়া নিজে ডাকিতে গেল। দুই এক জন ছেলে পিতার নিষেধ, খুড়ার নিষেধ, ইত্যাদি কারণ প্রদর্শন করিল। পরিশেষে ধর্ম্মদাস চক্রবর্ত্তীর সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি বলিলেন যে, মাধব যখন একটা বেশ্যার সংসর্গে আসিয়াছে, তখন কোনও ধার্ম্মিক ব্যক্তিই ছেলেদের তাহার সংশ্রবে যাইতে দিতে পারে না; ছেলেরা না হয় মূর্খ হইয়া থাকিবে, কিন্তু ধর্ম্মটাকে ত কেহ খোয়াইতে পারে না। মাধব শুনিয়া স্তম্ভিত চিত্তে পাঠশালায় ফিরিল, এবং যে কয় জন ছেলে আসিয়াছিল, তাহাদের ছুটী দিয়া বাড়ী চলিয়া আসিল।

রাজু জিজ্ঞাসা করিল, 'এরি মধ্যে ফিরলে যে মোশাই?'

মাধব উত্তর করিল, 'শরীরটা ভাল নয়।'

মাধব প্রকৃত কথাটা লুকাইবার চেষ্টা করিলেও সেটা রাজুর নিকট গোপন রহিল না। বিকালে পুকুর-ঘাটে গা ধুইতে গিয়া সে শিবু মাইতির মার মুখে আসল কথা শুনিয়া আসিল। তাহার জন্যই মাধবকে এই লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছে, অথচ মাধব তাহার কাছেই আসল কথাটা গোপন করিয়াছে, ইহাতে সে মাধবের নিকট কৃতজ্ঞ হইলেও তাহার উপর না রাগিয়া থাকিতে পারিল না। সে রাগে রাগে আসিয়া বাড়ী ঢুকিল।

মাধব তখন দাবার উপর মাদুর পাতিয়া বসিয়া চৈতন্যচরিতামৃত সম্মুখে রাখিয়া সুরের সহিত পড়িতেছিল—

'কুবুদ্ধি ছাড়িয়া কর শ্রবণ কীর্ত্তন।
অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণ প্রেমধন॥
নীচ জানি নহে কভু ভজনে অযোগ্য।
সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য॥
যেই ভজে সেই বড় অভক্ত হীন ছার।
কৃষ্ণ ভজনে নাহি জাতি কুল বিচার॥
দীনেরে অধিক দয়া করে ভগবান্।
কুলীন পণ্ডিত ধনীর বড় অভিমান॥'

ভিজা কাপড়ে সম্মুখে আসিয়া রাজু ডাকিল, 'মোশাই!'

মাধব পুঁথি হইতে মুখ তুলিয়া চাহিল। রোষ-গম্ভীর কণ্ঠে রাজু বলিল, 'তাই না শরীর ভাল নয় ব'লে তুমি পাঠশালা যাও না?'

মাধবের ওষ্ঠপ্রান্তে স্নিগ্ধ হাস্যরেখা দেখা দিল। বলিল, 'তাতে কি হ'য়েছে রাজু?'

ক্রোধে ভ্রূভঙ্গী করিয়া রাজু বলিল, 'কি হ'য়েছে? তোমার পাঠশালা বন্ধ হ'য়ে গিয়েছে তা জান?'

সহাস্যে মাধব বলিল, 'মন্দ কি হ'য়েছে রাজু? এতক্ষণ পাঠশালে ব'সে ছেলেগুলোকে ক খ আঙ্ক পড়াতাম, আর আজ ঘরে ব'সে কেমন চৈতন্যচরিতামৃত পড়ছি।'

'কি খেয়ে পড়বে?'

'আর কিছু না পারি, বোষ্টমের ছেলে ভিক্ষা ক'রেও তো খেতে পারবো।'

রাজু রাগে গর্ গর্ করিতে করিতে কাপড় ছাড়িতে গেল। মাধব পাতা উল্টাইয়া পড়িতে লাগিল—

'জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥'

৬

রাজু কিন্তু কিছুতেই সহ্য করিতে পারিল না যে, তাহার জন্য মোশাই এত লাঞ্ছনা ভোগ করিবে। সে ধরিয়া বসিল, 'তোমার ক্ষতি ক'রে আমি এখানে কক্ষণো থাকবো না মোশাই।'

মাধব জিজ্ঞাসা করিল, 'কোথায় যাবি?'

রাজু রাগত ভাবে বলিল, 'চুলোয়।'

মাধব খানিক ভাবিয়া বলিল, 'বেশ, কিন্তু একা মেয়ে মানুষ তুই, যেতে পারবি না; মায়ে বেটায় যাই চল।'

বিস্মিত ভাবে রাজু জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি কোথায় যাবে?'

মাধব হাসিয়া বলিল, 'চুলোয়। যে চুলোয় পাঠশালা নাই, সংসারের গোলযোগ নাই, লোকনিন্দার বালাই নাই।'

'সে কোথায়?'

'শ্রীবৃন্দাবন।'

রাজু বিস্ময়-স্তব্ধ দৃষ্টিতে মাধবের মুখের দিকে চাহিল। মাধব বলিল, 'তুই

যখন পর হ'য়ে আমার ক্ষতি সইতে পারিস্ না, তখন আমি নিজে নিজের ক্ষতি কি সহ্য করতে পারি ? তার চাইতে এই ক্ষতির জায়গা ছেড়ে যেখানে শুধু লাভ সেইখানে যাওয়াই ভাল।'

ইহার পর এক দিন সকালে মাধব গাঁটরী বাঁধিয়া যখন বাড়ীর বাহির হইতেছিল, তখন জন কতক ছেলে আসিয়া দরজায় দাঁড়াইয়াছিল। সর্দ্দার পোড়ো হরিধন সাহস করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কোথায় চললে গুরুমশাই ?'

মাধব বলিল, 'এত দিন তোদের গুরুমশায়গিরি করেছি, এবার একবার মনের গুরুমশায়গিরি করতে চললাম।'

মাধবের চোখ ছাপাইয়া দুই ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল। সে রাজুর হাত ধরিয়া আস্তে আস্তে গরুর গাড়ীতে উঠিল।

গাড়ী চলিয়া গেলে শীতল ঘোষ বলিল, 'বৈরিগী মশায় চলে গেল। লোকটী কিন্তু ছিল ভাল।'

ধর্ম্মদাস চক্রবর্ত্তী বলিলেন, 'এদানী কিন্তু মতি গতিটা বড্ডই বিগড়ে গিয়েছিল। আর দিন থাকলে গাঁয়ে নেড়া নেড়ীর দল হ'ত।'

সম্মুখে মুদীর দোকানে বসিয়া ভিখারী বৈষ্ণব গায়িতেছিল—

'মন পাখি ছাড় রে চালাকী।
তুমি পরকে ফাঁকি দিতে গিয়ে
নিজের কাজে দাও ফাঁকি।'

শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

সাহিত্যে স্বাস্থ্যরক্ষা।

৬

সধবার প্রেম (বিবাহের পরে জাত)।

এবার আমরা বিবাহিতা স্ত্রীর পরকীয় প্রেমাসক্তির বিষয়ে আলোচনা করিব। সৌভাগ্যের বিষয়, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার একখানা উপন্যাসেও এইরূপ প্রেম চিত্র অঙ্কিত করিয়া তাঁহার লেখনী কলঙ্কিত করেন নাই। হয় ত তাঁহার সময়ে art for art's sake এই নীতি fashionable হয় নাই; অথবা তিনি সমাজের যথার্থ হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন বলিয়া এরূপ চিত্রাঙ্কনে হস্তক্ষেপ করেন নাই। কবিবর স্যার রবীন্দ্রনাথই এইরূপ চিত্রের পথপ্রদর্শক। তাঁহার 'নষ্ট-নীড়' যখন 'ভারতী'তে বাহির হইত, তখন আমার এক সমালোচক বন্ধু বলিয়াছিলেন, এরূপ উপন্যাস আমাদের কন্যা বা ভগিনীদিগের হস্তে দেওয়া নিতান্ত অবৈধ। এই 'নষ্ট-নীড়ে' যাহার অঙ্কুর দেখা গিয়াছিল, 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে তাহার পূর্ণ বিকাশ। আবার রবীন্দ্রনাথের 'নষ্ট-নীড়' ও 'চোখের বালির' একটা মিলিত সংস্করণ সংপ্রতি বটতলা বা তাহার নিকটবর্ত্তী কোনও স্থান হইতে বাহির হইয়াছে—তাহার নাম শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত 'চরিত্রহীন'।

নষ্ট নীড়ের গল্পটি অতি ক্ষুদ্র। ভূপতি নামক এক কলিকাতাবাসী ধনী সুশিক্ষিত যুবকের ছেলেবেলা হইতে ইংরাজী লিখিবার এবং বক্তৃতা দিবার সখ ছিল। তিনি তাঁহার উকীল শ্যালক উমাপতির পরামর্শে এক খবরের কাগজ বাহির করিলেন। সেই সম্পাদকী নেশায় তাঁহাকে পাইয়া বসিল। এ দিকে তাঁহার সুশিক্ষিতা ও সুরুচিসম্পন্না স্ত্রী চারুলতার আর সময় কাটে না। ভূপতির অমল নামে একটি পিস্তুত ভাই তাহার আশ্রয় লইয়া কলেজে লেখা পড়া করিত। সে চারুলতার সঙ্গে সাহিত্য-চর্চ্চা করিয়া তাহার সময় কাটাইবার সহায়তা করিতে লাগিল। ক্রমে উভয়ের মধ্যে সাহিত্য-চর্চ্চা হইতে ঘনিষ্ঠতা, ও ঘনিষ্ঠতা হইতে স্নেহ, ও স্নেহ হইতে প্রেম জন্মিল। অমল মাসিক পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করিল, ক্রমে সে এক জন বিখ্যাত লেখক হইয়া উঠিল। সে চারুলতাকে তাহার লেখা পড়িয়া শুনাইত। যেখানে প্রেম সেইখানেই অভিমান—যখন চারুলতার প্রতি তাহার অভিমান হইত, তখন

উমাপতির স্ত্রী মন্দাকিনীকে তাহার লেখা পড়িয়া শুনাইত, যদিও মন্দাকিনী তাহার রস গ্রহণ করিতে পারিত না। এইরূপে চারু ও মন্দার মধ্যে ঈর্ষানল প্রজ্বলিত হইল। অমলের দেখাদেখি চারুও গোপনে প্রবন্ধ রচনা আরম্ভ করিল। এক দিন অমল তাহার একটা লেখা কাড়িয়া লইয়া এক মাসিক পত্রিকায় বাহির করিয়া দিল। অন্য আর একটি মাসিক পত্রিকার সম্পাদক চারুর এই লেখাটির অত্যন্ত প্রশংসা করিয়া ও অমলের লেখার নিন্দা করিয়া একটা সমালোচনা বাহির করিলেন। অমল তাহা প্রথমে চারু যাহাতে দেখিতে না পায় সে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু তাহা ভূপতির হাতে পড়ায় ভূপতি চারুকে দেখাইয়া তাহার কত প্রশংসা করিলেন। অমল যখন ইহা জানিতে পারিল, তখন সে চারুর প্রতি অভিমান করিয়া মন্দাকিনীকে তাহার লেখা বেশী করিয়া শুনাইতে আরম্ভ করিল। ইহাতে মন্দাকিনীর প্রতি চারুর ঈর্ষা বাড়িয়া উঠিল এবং মন্দাকিনীর সহিত অমলের চরিত্র দোষ ঘটিয়াছে, ভূপতির নিকট এইরূপ সন্দেহ প্রকাশ করিল। ভূপতি কৌশলে মন্দাকিনীকে বিদায় করিয়া দিলেন। তাহার স্বামীও বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া ভূপতির অনেকগুলি টাকা ভাঙ্গিয়া বিতাড়িত হইল। অমল চারুর সন্দেহের কারণ জানিতে পারিয়া চারুর প্রতি আরও রাগান্বিত হইল, এবং বর্দ্ধমানের এক উকীলের মেয়ের সঙ্গে যখন তাহার বিবাহের প্রস্তাব উপস্থিত হইল, সে তৎক্ষণাৎ বিবাহে সম্মতি দিয়া, বিবাহান্তে বিলাত যাত্রা করিল। এ দিকে অমল চলিয়া গেলে চারু তাহার বিরহে নিতান্ত অধীর হইল। সে অমলের স্মৃতিকে যত্নপূর্ব্বক হৃদয়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইল। ক্রমে এমনই হইয়া উঠিল, একান্তচিত্তে অমলের ধ্যান তাহার গোপন গর্ব্বের বিষয় হইল—সেই স্মৃতিই যেন তাহার জীবনের শ্রেষ্ঠ গৌরব। চারু গৃহকার্য্যের অবকাশে একটা সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইল। সেই সময় নির্জ্জনে গৃহদ্বার রুদ্ধ করিয়া তন্ন তন্ন করিয়া অমলের সহিত তাহার নিজ জীবনের প্রত্যেক ঘটনা চিন্তা করিত। সে উপুড় হইয়া বালিশের উপর মুখ রাখিয়া অমলকে সম্বোধন করিয়া বলিত * * * 'অমল, অমল, তোমাকে আমি এক দিনও ভুলি নাই, এক দিনও না—এক দণ্ডও না। আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ পদার্থ সমস্ত তুমিই ফুটাইয়াছ, আমার জীবনের সার ভাগ দিয়া প্রতিদিন তোমায় পূজা করিব।'

'এইরূপে চারু তাহার সমস্ত ঘরকন্না, তাহার সমস্ত কর্ত্তব্যের অন্তঃস্তরের তলদেশে সুড়ঙ্গ খনন করিয়া সেই নিরালোক নিস্তব্ধ অন্ধকারের মধ্যে অশ্রুমাল্য

সজ্জিত একটি গোপন শোকের মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া রাখিল। সেখানে তাহার স্বামীর বা পৃথিবীর আর কাহারও কোন অধিকার রহিল না। সেই স্থানটুকু যেমন গোপনতম, তেমনি গভীরতম, তেমনি প্রিয়তম।' এ দিকে বাহিরে সে স্বামীকে একনিষ্ঠ হইয়া প্রীতি ও যত্ন করিতে লাগিল। ভূপতি যখন নিদ্রিত থাকিত, চারু তখন ধীরে ধীরে তাহার পায়ের কাছে মাথা রাখিয়া পায়ের ধূলা সীমন্তে তুলিয়া লইত। সেবা শুশ্রূষা গৃহকর্ম্ম স্বামীর লেশমাত্র ইচ্ছা সে অসম্পূর্ণ রাখিত না।'

কিন্তু এই প্রবঞ্চনা বেশী দিন টিকিল না। চারু অমলের চিঠি পাওয়ার জন্য নিতান্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিল। কিন্তু কোনও চিঠি আসিল না। চিঠি না আসাতে সমস্ত সংসার চারুর নিকট কণ্টক-শয্যা হইয়া উঠিল। চারু অবশেষে তাহার নিজের গহনা বন্ধক দিয়া অমলের নিকট বিলাতে এক reply prepaid টেলিগ্রাম করিল। 'আমি ভাল আছি।' তাহার এই সংক্ষিপ্ত উত্তর হঠাৎ ভূপতির হাতে পড়িল। তখন ভূপতির মনে সন্দেহের উদয় হইল। ক্রমে ভূপতি চারুর আচরণ মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করিতে লাগিল এবং আসল কথা বুঝিতে তাহার আর বিলম্ব হইল না। তখন যে স্ত্রী হৃদয়ের মধ্যে নিয়ত অন্যকে ধ্যান করিতেছে, তাহার সংসর্গ ভূপতির নিকট নিতান্ত অসহনীয় হইয়া উঠিল। তখন চারুকে ত্যাগ করিয়া মহীশূরে চলিয়া গেল।

ভারতচন্দ্র অবিবাহিত প্রেমিক প্রেমিকার মিলনের জন্য মাটীর তলে সুড়ঙ্গ কাটার কথা লিখিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথই প্রথমে বিবাহিত স্ত্রীর মনের মধ্যে পরপুরুষের ধ্যানের জন্য সুড়ঙ্গ নির্ম্মাণের পথ দেখাইয়াছেন। ভূপতি বেচারীর অপরাধ, সে তাহার খবরের কাগজ লইয়া সারাদিন ব্যস্ত থাকিত, চারুর সঙ্গে প্রেমালাপের অবসর পাইত না। ইহার পরে, যে সকল বড় বড় উকীল সারা-দিন রাত্রি মোক্কেলের কাজ লইয়া ব্যস্ত থাকেন, তাঁহারা সাবধান হইবেন। যে সকল ডাক্তার কবিরাজ সারাদিন রোগী দেখিয়া বেড়ান, স্নানাহারের অব-সর পান না, তাঁহারা সাবধান হইবেন। যে সকল মুন্সেফ, সবজজ, ডেপুটী কাছারীতে সারাদিন কাটাইয়া রাত্রি জাগিয়া রায় লেখেন, তাঁহারা সাবধান হইবেন। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানের যে সকল কেরাণী ভোরে উঠিয়া কোন ক্রমে ভাত নাকে মুখে গুঁজিয়া daily passenger হইয়া কলিকাতার আফিস করিতে যান এবং রাত্রি ৯টা ১০টায় বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া আহার করিয়াই নিদ্রা যান, তাঁহারাও সাবধান হইবেন। কে জানে তাঁহাদের অন্তঃ-

পুরে এইরূপ সুড়ঙ্গ নির্ম্মিত হইতেছে কি না? আবার ইহাদের মধ্যে যাঁহাদের বাসায় এক আধটী যুবক ছোট ভাই থাকে তাঁহারা আরও সাবধান হইবেন। আমাদের হিন্দুর গৃহে দেবর ভ্রাতৃবধূ সম্বন্ধটা বড়ই মধুর সম্বন্ধ, স্বামীর ছোট ভাইকে স্ত্রী নিজের ভাইয়ের মতই যত্ন করিয়া থাকেন এবং রহস্যালাপের মধ্যে তাঁহাদের পরস্পর স্নেহ জমিয়া উঠে। বলা বাহুল্য, সেই স্নেহ পবিত্র, তাহাতে কিছুমাত্র মলিনতা নাই। কবিবর রবীন্দ্রনাথই প্রথমে সেই পবিত্র স্নেহের কিরূপ অপব্যবহার হইতে পারে তাহা শিক্ষা দিয়াছেন। তাঁহার অনুকরণ-কারীরা ইহার পরে অনেক দেবর-বৌঠা'নের সঙ্গে প্রেম ঘটাইয়াছেন ও ঘটাই-তেছেন। এই সকল, সাহিত্য-সমাজ-শরীরে বিষের ন্যায় কার্য্য করিতেছে সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

চারুলতা তাহার স্বামীকে ভুলিয়া কেন অমলের সঙ্গে প্রেমে পড়িল? অমল চারুর জীবনের শ্রেষ্ঠ পদার্থ সকল ফুটাইয়া তুলিয়াছিল—এই কি তাহার একমাত্র কারণ? তাহা হইলে গৃহশিক্ষক মাত্রেই বয়স্থা বালিকার প্রেমের পাত্র হইতে পারে। আসল কথা, চারু অমলের সহিত ইচ্ছা করিয়া প্রেমের খেলা খেলিতে খেলিতে সেই খেলায় নিজকে সত্যিকার প্রেমের ফাঁদে ধরা দিল। লেখক চারুর প্রতি আমাদের বিন্দুমাত্র সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে পারেন নাই, আমাদের সহানুভূতি স্বভাবতঃ ধাবিত হয় সেই গোবেচারা স্বামী ভূপতির দিকে। কবি স্কুল মাষ্টারের স্থান অধিকার করিয়া নীতিশিক্ষা দেও-য়ার জন্য অবশ্য তাঁহার গ্রন্থ রচনা করেন নাই—তিনি আর্টের কারচুপি দেখানের জন্যই চারু-চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন—কিন্তু আমার মতে এখানে তাঁহার আর্ট নিষ্ফল হইয়াছে। লাভের মধ্যে আমাদের সাহিত্যে একটি পাপ-চিত্র বাড়াইয়া সমাজের আবহাওয়া দূষিত করিয়াছেন।

কবিবর রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' উপন্যাস এই 'নষ্ট নীড়ে'র রাজকীয় সংস্করণ (royal edition)। এই উপন্যাসে কবিবর art for art's sake এই নীতির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। আমরা অতি সংক্ষেপে এই গ্রন্থখানি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

নিখিলেশের এক সাবেকি আমলের রাজার ঘরে জন্ম। তিনিই এ বংশে প্রথম রীতিমত লেখা পড়া শিখিয়া এম. এ. পাশ করেন। আবার তাঁহার স্ত্রী বিমলাকেও বিলাতী মেম রাখিয়া রীতিমত লেখা পড়া শিখাইয়াছেন। নিখিলেশ মনে করিতেন স্ত্রী পুরুষের পরস্পরের প্রতি সমান অধিকার, সুতরাং

তাদের প্রেমের সম্বন্ধও সমান। তাঁহার একান্ত ইচ্ছা, স্ত্রীকে বাহিরে বের করেন। কিন্তু সংসারের কর্ত্রী তাঁহার পিতামহী যত দিন জীবিত ছিলেন, তত দিন এ সম্বন্ধে বেশী উচ্চ বাঁচ্য করিতে পারেন নাই। সংসারে বিমলার দুই বিধবা বড় জা ছিলেন—তাঁহার মধ্যে সকলের বড়টি জপ তপ ব্রত উপবাস লইয়া থাকিতেন, মধ্যমটির সে সব 'ভড়ং' ছিল না, বরং তাঁহার কথাবার্ত্তায়, হাসি ঠাট্টায়, রসের বিকার ছিল। বিমলা প্রথমে স্বামীর ইচ্ছামত বাহিরে যাইতে অনিচ্ছুক ছিলেন। সে সম্বন্ধে তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে এইরূপ কথা-বার্ত্তা হইয়াছিল :—

বিমলা বলিলেন,—'বাইরেতে আমার দরকার কি?' স্বামী বলিলেন, 'তোমাকে বাইরের দরকার থাকতে পারে—আমি চাই, বাইরের মধ্যে তুমি আমাকে পাও, আমি তোমাকে পাই। ঐখানে আমাদের দেনা পাওনা বাকী আছে।' বিমলা বলিলেন,—'কেন, ঘরের মধ্যে পাওয়ার কমতি হ'ল কোথায়?' স্বামী বলিলেন,—'এখানে আমাকে দিয়ে তোমায়—সমস্ত মুড়ে রাখা হয়েছে—তুমি যে কাকে চাও তাও জান না, কাকে পেয়েচ তাও জান না।'

অর্থাৎ, নিখিলেশের মতে তাঁহার স্ত্রী ঘরের বাহিরে গিয়া আর দশ জন পুরুষের সঙ্গে প্রেমের যাচাই করিয়া যদি অবশেষে তাঁহার নিকটই আবার ফিরিয়া আসেন, তবেই তাঁহার সেই প্রেম খাঁটি প্রেম হইবে। তবে কথা এই, কৈমাছ পুকুরে তেমন বাড়িতেছে না মনে করিয়া তাহাকে যদি নদীতে ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তবে সে আবার পুকুরে নাও ফিরিয়া আসিতে পারে। না আসে না আসুক, সে বাড়িবে ত। যাহা হউক, 'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী'—বাঙ্গালা দেশে তখন স্বদেশীর খুব ধুম পড়িয়াছিল। নিখিলেশের মনেও বিলক্ষণ দেশভক্তি ছিল। সেই কারণে তাঁহার এক স্বদেশ-সেবক বন্ধু সন্দীপ তাঁহাকে একেবারে পাইয়া বসিল। সে নিখিলেশের মাথায় হাত বুলাইয়া স্বদেশিকতা প্রচার করিতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে নিজের খরচও চালাইতে লাগিল। অবশেষে সে প্রচারকার্য্য উপলক্ষে নিখিলেশের বাড়ীতে উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিল। সে এক বক্তৃতা করিয়া বিমলার শোণিতে আগুন ধরাইয়া দিল। বিমলা বক্তৃতা শুনিতে শুনিতে চিকের বাহিরে মুখ বাহির করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়াছিলেন—তাঁহার মনে হইল 'কাল পুরুষের নক্ষত্রের মত সন্দীপ বাবুর উজ্জ্বল দুই চোখ আমার মুখের উপর এসে পড়ল। কিন্তু আমার হুঁস ছিল না। আমি কি তখন রাজবাড়ীর বউ? আমি

তখন বাংলা দেশের সমস্ত নারীর একমাত্র প্রতিনিধি—আর তিনি বাংলা দেশের বীর!' বস্—অমনি কেল্লা ফতে হইয়া গেল। বিমলা সন্দীপকে নিজে উপস্থিত থাকিয়া খাওয়াইবার অভিপ্রায় স্বামীর নিকট ব্যক্ত করিলেন। অবশ্য নিখিলও ইহাই চান। এই সূত্রে সন্দীপের সহিত বিমলার প্রত্যক্ষ ভাবে আলাপ পরিচয় হইল। সন্দীপও সুযোগ বুঝিয়া তাহার কথায় বুকুনি দিতে লাগিল। 'আজ আপনিই আমার কাছে দেশের রাণী। এ আগুন ত আমি কোনো পুরুষের মধ্যে দেখিনি। না, না, লজ্জা করবেন না—মিথ্যা লজ্জা সঙ্কোচ বিনয়ের অনেক উপরে আপনার স্থান। আপনি আমাদের মৌচাকের মক্ষি-রাণী—আমরা আপনাকেই চারিদিকে ঘিরে কাজ করব—সেই কাজের শক্তি আপনারই—সেই কাজের কেন্দ্র আপনিই।' এই সকল চাটুবাক্যের ফল অবশ্যই ফলিল। নিখিল বিমলাকে লইয়া দার্জ্জিলিঙ যাইতে চাহিল। বিমলা যাইতে স্বীকৃত হইল না। সন্দীপ কি প্রকৃতির লোক তাহা তাহার নিজের কথায়ই প্রকাশ পায়—'আমি যা চাই, তা আমি খুবই চাই। তা আমি দু হাতে ক'রে চটকাব, দুই পায়ে ক'রে দলব,—সমস্ত গায়ে তা মাখব, সমস্ত পেট ভরে তা খাব। চাইতে আমার লজ্জা নেই, পেতে আমার সঙ্কোচ নেই… আমি যা চাই তা আমি সিঁদ কেটে নিতে চাই।'.. 'যে শক্তিতে এই মেয়েদের পাওয়া যায়, সেইটেই হচ্ছে বীরের শক্তি'—ইত্যাদি। এই প্রকৃতির সন্দীপের সহিত দেশের কথা লইয়া বিমলার যতই পরামর্শ চলিতে লাগিল, ততই সে তাহার মায়াজালে হরিণীর মত জড়াইয়া পড়িল। ক্রমে সন্দীপ তাহাকে বুঝাইতে লাগিল 'প্রবৃত্তিকে বাস্তব বলে স্বীকার করা ও শ্রদ্ধা করাই হচ্ছে মডর্ণ। প্রবৃত্তিকে লজ্জা করা, সংযমকে বড় জানাটা মডার্ণ্ নয়।'—অবশেষে এক দিন সন্দীপের মনে হইল—'বিমল যে আমার কামনার বিষয় হ'য়ে উঠেচে সে জন্যে আমার কোন মিথ্যে লজ্জা নেই। আমি যে স্পষ্ট দেখ্‌চি ও আমাকে চায়—ওই ত আমার স্বকীয়া। আমি জানি দু'বার তিন বার এমন এক একটা মুহূর্ত্ত এসেচে যখন আমি ছুটে গিয়ে বিমলার হাত চেপে ধ'রে তা'কে আমার বুকের উপর টেনে আন্‌লে সে একটি কথা বল্‌তে পারত না; কিন্তু সময়টা ব'য়ে যেতে দিয়েছি।'

এ দিকে এসব দেখিয়া শুনিয়া নিখিলেশের মনে কাঁদুনি আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু তিনি কান্নাকে আমল দিতে চান না—'আর কিছু না—জীবনটাকে কেঁদে ভাসিয়ে দেওয়ার চেয়ে হেসে উড়িয়ে দেওয়াই ভাল। বিমল যদি তোমার না

হয় ত সে তোমার নয়ই, যতই চাপাচাপি রাগারাগি করবে, ততই ঐ কথাটা আরো বড় করে প্রমাণ হবে। বুক ফেটে যায় যে—তা' যাক্।…বিমল যদি বলে সে আমার স্ত্রী নয়, তা' হ'লে আমার সামাজিক স্ত্রী যেখানে থাকে আমি বিদায় হলুম—'

সন্দীপ এক দিন বিমলার কাছে তাহার স্বদেশী কার্য্যের জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা চাহিয়া বসিল। বিমলা তাহাকে না বলিতে পারিল না। কিন্তু এত টাকা কোথা হইতে দিবে? তাহার গয়না বিক্রয় করিয়া দিতে চাইল, সন্দীপ বলিল, সে হবে না, গয়না এখন হাতে রাখিতে হইবে, তোমার স্বামীর টাকা থেকে দাও। যখন দেশের প্রয়োজন হয়েছে, তখন এ টাকা নিখিল দেশের কাছ থেকে চুরি ক'রে রেখেছে। বন্দে মাতরং এই মন্ত্রে লোহার সিন্দুকের দরজা খুলবে। বল, বন্দে মাতরং—বিমলাও বলিল, বন্দে মাতরং। কিন্তু সন্দীপ অবশেষে তাহার পঞ্চাশ হাজারের দাবী পাঁচ হাজারে কমাইয়া আনিল। মহিষ মর্দ্দিনীর পূজার জন্য তাহার এই টাকার এখনই দরকার। তাহার উদ্দীপনা পূর্ণ বক্তৃতায় মুগ্ধ হইয়া বিমলাই সেই টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইল।

কিন্তু সে এই পাঁচ হাজারও কোথায় পাইবে? তাহাদের শোবার ঘরের পাশে একটা ছোট কুঠরিতে লোহার সিন্দুকে নিখিল তাহার বড় ও মেজ ভাজের বাৎসরিক প্রণামীর জন্য ছয় হাজার টাকা মজুত রাখিয়াছিল। বিমলা নিখিলের পকেট হইতে সেই লোহার সিন্দুকের চাবি সংগ্রহ করিয়া সেই ছয় হাজার টাকার গিনি চুরী করিল এবং পর দিন তাহা সন্দীপের হাতে দিল। ইহাই বিমলার প্রেম-যজ্ঞের পূর্ণাহুতি—অথবা তাহার স্বদেশ-সেবা ব্রতের দক্ষিণা।

এই কার্য্য করার পর বিমলার মনে ঘোর আত্মগ্লানি উপস্থিত হইল। অমূল্য নামে সন্দীপের একটি চেলা ছিল, সে বিমলাকে দিদি বলিয়া ডাকিত। বিমলা তাহাকে নিজের গহনার বাক্স দিয়া বলিল, যে রূপে হউক এই গহনা বিক্রয় করিয়া আমাকে ছয় হাজার টাকা কালই আনিয়া দেও। অমূল্য সেই গহনার বাক্স লইয়া তাহার তোরঙ্গের মধ্যে রাখিল, সে কিছুতেই গয়না বিক্রয় করিবে না। সে নিখিলের এক কাছারী লুট করিয়া ছয় হাজার টাকা আনিয়া বিমলাকে দিতে গিয়া দেখিল সন্দীপ সেই গয়নার বাক্স চুরী করিয়া আনিয়া বিমলাকে দিতেছে। সন্দীপ বলিল, 'মক্ষিরাণী, এ গয়না আজ আমি নেব ব'লে আসিনি—তোমাকে দেব বলেই এসেছিলুম। কিন্তু আমার জিনিষ যে তুমি অমূল্যর হাত থেকে নেবে সেই অন্যায় নিবারণ করবার জন্যেই প্রথমে

এ বাক্‌সে আমার দাবী তোমাকে স্পষ্ট ক'রে তোমাকে দিয়ে বলিয়ে নিলুম। এখন আমার এই জিনিষ তোমাকে আমি দান করচি—এই রইল।' অমূল্য সেই ছয় হাজার টাকার নোট দিতে চাহিলে, বিমলা তাহা ফিরাইয়া দিয়া বলিল —এ টাকা যেখান থেকে আনিয়াছ সেখানে রাখিয়া আইস। অমূল্য বলিল—সে বড় শক্ত কথা—সে প্রথমে সন্দীপের নিকট থেকে সেই গিনিগুলি ফেরত আনিতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু সন্দীপ তাহা কোথায় লুকাইয়া রাখিয়াছে—অগত্যা তাহাকে অন্য উপায়ে এই ছয় হাজার টাকা সংগ্রহ করিতে হইল—'দিদি তোমার কাছে এলুম বলেই ত ওকে চিন্‌তে পেরেছি—দিদি ওর মন্ত্র একেবারে ছুটে গেচে—তুমিই ছুটিয়ে দিয়েচ।' বিমলা বলিল,—'ভাই আমার, আমার জীবন সার্থক হয়েচে। কিন্তু অমূল্য এখনও বাকী আছে। শুধু মায়া কাটালে হবে না, যে কালী মেখেচি সে ধুয়ে ফেল্‌তে হবে।'

সন্দীপ বিমলার সঙ্গে কথা কহিতেছে, এই সময়ে নিখিল আসিয়া সন্দীপকে বলিল, 'কাল কলকাতায় যাচ্ছি, তোমাকে যেতে হবে।' সন্দীপ বলিল, 'কেন বল দেখি, আমি কি তোমার অনুচর নাকি?' 'আচ্ছা তুমিই কলকাতায় চল, আমিই তোমার অনুচর হব।' 'কলকাতায় আমার কাজ নেই।' 'সেই জন্যেই ত কলকাতা যাওয়া তোমার দরকার। এখানে তোমার বড্ড বেশী কাজ।' 'আমি ত নড়ছিনে।' 'তা হ'লে তোমাকে নাড়াতে হবে।' 'জোর?' —'হাঁ জোর।'—'আচ্ছা বেশ নড়ব।' ইহার পরে সন্দীপ বিমলাকে সম্বোধন করিয়া এক লম্বা বক্তৃতা ঝাড়িল 'মক্ষিরাণী, আমি তোমাকে বন্দনা করি—আমি তোমারই বন্দনা করতে চল্লুম—তোমাকে দেখবার পর থেকে আমার মন্ত্র-বদল হয়ে গেচে—বন্দে মাতরং নয়, বন্দে প্রিয়াং, বন্দে মোহিনীং—মা আমাদের রক্ষা করেন—প্রিয়া আমাদের বিনাশ করেন—বড় সুন্দর সে বিনাশ।... মাতার দিন আজ নেই—প্রিয়া, প্রিয়া, প্রিয়া,—দেবতা স্বর্গ ধর্ম্ম সত্য সব তুমি তুচ্ছ করে দিয়েচ, পৃথিবীর আর সমস্ত সম্বন্ধ আজ ছায়া, নিয়ম সংযমের সমস্ত বন্ধন আজ ছিন্ন' ইত্যাদি।

বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, বিমলা আবার এই কথার ছটায় ভুলিয়া মনে মনে বলিতে লাগিল, 'যাকে ছাই ব'লে দেখেছিলুম তার মধ্যে থেকে আগুন জ্বলে উঠেচে। এ একবারে খাঁটি আগুন তাতে কোন সন্দেহ নেই—আধ ঘণ্টা আগেই আমি মনে মনে ভাবছিলুম এই মানুষটাকে এক দিন রাজা ব'লে ভ্রম হয়েছিল বটে কিন্তু এ যাত্রার দলের রাজা, তা নয়—তা নয়—যাত্রার দলের পোষাকের মধ্যেও রাজা লুকিয়ে থেকে যায়—' ইত্যাদি।

আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই, নিখিল চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া সন্দীপের এই প্রিয়ার বক্তৃতা শুনিতে লাগিল। আর কেহ হইলে তখনই সন্দীপের পদাঘাতে বিতাড়িত হইত।

যাহা হউক, সন্দীপ অবশেষে বিদায় নিতে নিতে বলিল, 'দেবী আজ আমার এই বিদায়ের মধ্যেই তোমার বন্দনা সব চেয়ে বড় হ'য়ে উঠল। দেবী আমিও আজ তোমাকে মুক্তি দিলুম। আমার মাটির মন্দিরে তোমাকে ধরছিল না—এ মন্দির প্রত্যেক পলকে পলকে ভাঙ্গবে ভাঙ্গবে করছিল। আজ তোমার বড় মূর্ত্তিতে বড় মন্দিরে পূজা করতে চল্লুম।' বিমলা তাহার গয়নার বাক্‌স টেবিলের উপর হইতে তুলিয়া ধরিয়া সন্দীপকে বলিল, 'আমার এই গয়না আমি তোমার হাতে দিয়ে যাকে দিলুম তার চরণে তুমি পৌঁছে দিয়ো।' নিখিল চুপ করিয়া রহিল, সন্দীপ বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

কিছু দিন হইতে বিমলার স্বামীর সঙ্গে বেশ সহজে কথাবার্ত্তা কওয়ার প্রণালীটা বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। স্বামী পৃথক ঘরে শুইতেন। সে দিন লোকজনকে খাওয়াইতে অনেক রাত্রি হইয়া গেল। বিমলার ইচ্ছা হইল তাহার সেই জন্মতিথিতে স্বামীর পায়ের ধূলা সে লইবে। শোবার ঘরে গিয়া দেখিল স্বামী অকাতরে ঘুমাইতেছেন। খুব সাবধানে মশারি একটুখানি খুলিয়া তাহার পায়ের কাছে আস্তে আস্তে মাথা রাখিল। পরে পশ্চিমের বারান্দায় গিয়া মাটীর উপর উপুড় হইয়া শুইয়া কাঁদিতে লাগিল, একটা কোনো দয়া কোথাও থেকে চাই, একটা কোনো আশ্রয়, একটু ক্ষমার আভাস, একটা এমন আশ্বাস যে সব বুকেও যাইতে পারে। মনে মনে বলিল, 'আমি দিন রাত ধর্ন্না দিয়ে পড়ে থাক্‌ব প্রভু—আমি খাবনা, আমি জল স্পর্শ করব না, যতক্ষণ না তোমার আশীর্ব্বাদ এসে পৌঁছয়।' তাহার প্রার্থনা মিথ্যা হইল না। তাহার স্বামী শিয়রের কাছে আসিয়া বসিলেন, সে বুকের মধ্যে স্বামীর পা চাপিয়া ধরিল, তিনি আস্তে আস্তে তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন।

ইহার পরে বিমলার সেই সিন্ধুক হইতে ছয় হাজার টাকা চুরী ধরা পড়িল। সেই সিন্ধুকের চাবির খোঁজ হইতেই বিমলা আসিয়া নিখিলকে বলিল, 'চাবি আমার কাছে আছে, আমি চাবি দিয়া সিন্ধুক খুলিয়া টাকা বাহির করিয়া নিয়া সন্দীপকে দিয়াছি। কিসে খরচ করিয়াছে, তাহা বলিল না, নিখিলও তাহা জানিতে চাহিল না, কিন্তু তাহার মনের মধ্যে এই ছয় হাজার টাকার

সহিত সেই ছয় হাজার টাকা ডাকাতির যে যোগ আছে, তাহা বুঝিতে পারিল। তখন নিখিলের মনে হইল—'বিমলা আমার নিকট হইতে তফাৎ হইয়া পড়িয়াছে, তাহার কারণ বিমলা যা' পারত তা' আমার চাপে উপরে ফুটে উঠতে পারে নি বলেই নীচের তল থেকে রুদ্ধ জীবনের তল থেকে রুদ্ধ জীবনের ঘর্ষণে বাঁধ ক্ষয়িয়ে ফেলেচে। এই ছয় হাজার টাকা ওকে চুরি ক'রে নিতে হয়েছে—আমার সঙ্গেও স্পষ্ট ব্যবহার করতে পারে নি, কেন না ও বুঝেছে এক জায়গায় আমি ওর থেকে প্রবলরূপে পৃথক। সরল মানুষকেও আমরা কপট ক'রে তুলি। আমরা সহধর্ম্মিণীকে গড়তে গিয়ে স্ত্রীকে বিকৃত করি।' শোবার ঘরে বিছানার উপর বসিয়া নিখিল এইরূপ ভাবিতেছিল—তখন বিমলা দরজার কাছে আসিয়া আবার ফিরিয়া যাইতেছিল। নিখিল তাহাকে ধরিয়া ঘরের মধ্যে আনিতেই সে মেজের উপর পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। নিখিল তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া নেবার চেষ্টা করিল। সে একটু জোরে হাত ছাড়াইয়া নিয়ে হাঁটু গেড়ে নিখিলের পায়ের উপর মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করতে লাগিল। নিখিল পা সরিয়ে নিতেই সে তাহার পা জড়িয়ে ধরে বলিল, 'না, না, না, তোমার পা সরিয়ে নিয়ো না—আমাকে পূজো করতে দিও।'

আখ্যায়িকা এখানেই এক প্রকার শেষ হইল। ইহার পরে যাহা আছে, তাহা আমাদের না শুনিলেও চলে। নিখিল কলিকাতায় যাওয়ার উদ্যোগ করিতেছিল, এমন সময় খবর আসিল স্বদেশী দলের বিরুদ্ধে মুসলমানের দল ক্ষেপিয়া উঠিয়া লুট পাট করিতেছে ও স্ত্রীলোকদিগের ধর্ম্ম নষ্ট করিতেছে। নিখিল তাহা শুনিয়া ঘোড়া ছুটাইয়া যুদ্ধ করিতে গেল, কাহারও বাধা মানিল না। রাত্রি দশটার সময় সে আহত হইয়া ফিরিল, সঙ্গে সঙ্গে অমূল্যর মৃতদেহও আসিল।

রবীন্দ্রনাথের এই উপন্যাসখানির অনেক অনুকূল ও প্রতিকূল সমালোচনা হইয়াছে। কেহ কেহ ইহাতে তাঁহার আর্টের পরাকাষ্ঠা দেখিতে পাইয়াছেন, কেহ বা এটাকে একটা allegcry (রূপক) মনে করিয়া ইহার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়াছেন, আবার কেহ বা অনেক গালি দিয়াছেন। আমরা ভয়ে ভয়ে দুই চারিটী কথা বলিব। আমাদের সূক্ষ্ম দৃষ্টির একান্ত অভাব, নিতান্ত স্থূল দৃষ্টিতে, সাধারণ জ্ঞান হইতে যাহা বুঝিতে পারি, তাহাই বলিব।

ক্রমশঃ।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ।

ওড়িষ্যার আদিম অধিবাসী।

পশ্চিম ওড়িষ্যার দুরধিগম্য পর্ব্বতমালার অভ্যন্তরে মানবজাতির একটী প্রাচীনতম অধ্যায়ের পরিচয় পাওয়া যায়। আধুনিক সভ্যতার প্রভাব হইতে বহু দূরে কত আদিম জাতিপুঞ্জ তাহাদের প্রাচীন আচার ব্যবহার এখনও অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। ইহাদিগের মধ্যে যাহারা পার্ব্বত্যবাস ত্যাগ করিয়া সমতল ভূমিতে নামিয়াছে, তাহারা হিন্দুদিগের সংস্পর্শে আসিয়া অনেক পরিমাণে হিন্দুভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে ও উদার হিন্দুসমাজের প্রশস্ত বক্ষে ক্রমশঃ স্থান লাভ করিয়াছে। ইহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ তাহাদিগের প্রাচীন আচার ব্যবহার একেবারে পরিত্যাগ না করিয়া হিন্দু রীতিনীতির সহিত সমন্বয় করিয়া লইয়াছে। বর্ব্বর অবস্থা হইতে হিন্দু সমাজে উন্নয়নের এই তিনটী সোপান কয়েকটী জাতির মধ্যে সুস্পষ্ট ভাবে লক্ষিত হয়।

ইহাদিগের মধ্যে ভূঞা, জুয়াঙ্গ ও খন্দ জাতি উল্লেখযোগ্য।

ভূঞাগণ ছোটনাগপুরে, ওড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ কেওন্ঝর, গাঙ্গপুর প্রভৃতি করদরাজ্যে, মধ্যপ্রদেশের সরগুজা ও যশপুরে বাস করে। 'ভূঞা' শব্দের অর্থ—ভূমিজ বা ভূমি হইতে উৎপন্ন। ভূঞা শব্দ অন্যত্র অন্য অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে—যথা, বঙ্গের বারভূঞা।

ভূঞা জাতি কোন্ বংশের (Race) অন্তর্ভুক্ত ইহা লইয়া মতভেদ হইয়াছে। ভূঞাদের আদিম ভাষা লোপ পাইয়াছে, সুতরাং ভাষাগত সাদৃশ্য কোন্ বংশের ভাষার সহিত, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। ভূঞা জাতির সহিত দ্রাবিড়বংশীয় 'সবর' জাতির অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য আছে বলিয়া Colonel Dalton ভূঞাকে দ্রাবিড় বংশভুক্ত করিয়াছেন। কিন্তু Dr. Greerson তাঁহার Linguistic Surveyতে প্রমাণ করিয়াছেন যে, সবর ভাষার কোলবংশীয় 'খারিয়া' ও 'জুয়াঙ্গ' ভাষার সহিত সাদৃশ্য আছে। সুতরাং ভূঞাকে কোলবংশীয় বলিয়া সন্দেহ হয়। উভয়ের আচার ব্যবহার আলোচনা করিলে এই সন্দেহ বদ্ধমূল হয়। দৈহিক সাদৃশ্যও যথেষ্ট আছে—কোনও ভূঞাকে হঠাৎ দেখিয়া কোল বলিয়া মনে করা বিচিত্র নহে। ছোটনাগপুরের মুণ্ডা ও লড়কা কোল-দিগের মধ্যে এই প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, তাহারাই আদিম অধিবাসী ভূঞা-দিগকে বিতাড়িত করিয়া সেখানে বসবাস করিয়াছিল। এখনও কোনও কোনও দেবমন্দিরে কেবল ভূঞাই পূজারী হইতে পারে।

ভূঞাগণ ভারতবর্ষের বহু প্রদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। Buchanan Hamilton ভাগলপুরের 'ভাঙ্গিয়া' জাতিকে ভূঞাদিগের জাতি বলিয়া স্থির করিয়াছেন। ইহারা অশ্ব মূষিক প্রভৃতির মাংস খাইত, মদ্যপান করিত। ইহাদের উপাস্য দেবতা ছিল—'বীর' বা মৃত পূর্ব্বপুরুষ।

Sir Edward Gait এর আসামের ইতিহাসে লিখিত আছে যে, ত্রয়োদশ শতাব্দীতে অহোমবিজয়ের পূর্ব্বে চুটিয়া ও ভূঞাগণ আসামে প্রবল ছিল। শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের মতে এই ভূঞা ও চুটিয়া ওড়িষ্যার ভূঞাদিগের শাখা। 'ছোট' নাগপুর (বা চুটিয়া নাগপুর) এই চুটিয়াদের নামানুসারেই হইয়াছে। Buchanan Hamilton বলেন যে, দিনাজপুরে বার জন ভাঙ্গিয়া বা ভূঞা আসিয়া আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল।

অতএব, সুদূর আসাম হইতে মধ্য প্রদেশের রায়পুর পর্য্যন্ত ভূঞা উপনিবেশের চিহ্ন মধ্যে মধ্যে লক্ষিত হয়। কোনও বিস্মৃত অতীতে হয় ত এই সমগ্র ভূখণ্ড ভূঞাদিগের অধিকারে ছিল।

এখনও ওড়িষ্যা ও ছোট নাগপুরের অনেক রাজ-পরিবারে ভূঞাদিগের আধিপত্য দেখা যায়, যথা বামড়া ও কেওনঝর। বামড়া রাজবংশের আদি পুরুষকে ভূঞা ও খন্দগণ পাটনা রাজপরিবার হইতে শৈশবে অপহরণ করিয়া বামড়ায় প্রতিষ্ঠিত করে। আজ কালও ভূঞারা বামড়া রাজপরিবারের সেবা করিয়া নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করে।

ওড়িষ্যার ভূঞাগণ ময়ূরভঞ্জাধীশ্বরের পূর্ব্বে প্রজা ছিল। পার্ব্বত্য আবাস হইতে সুদূর ময়ূরভঞ্জে প্রতি বৎসর কর দিতে যাওয়া অপমানজনক ও কষ্টসাধ্য বলিয়া ভূঞাগণ একটী স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাপন করিতে সংকল্প করে। ময়ূরভঞ্জরাজের একটী শিশুপুত্রকে রাজধাত্রীর সহায়তায় অপহরণ করিয়া ইহারা তাহাকে সযত্নে লালন পালন করে। গোয়ালা, নাপিত, রজক প্রভৃতিকে আনাইয়া তাহাদিগকে গ্রামে বাস করায়। রাজপুত্রের খাদ্য ব্রাহ্মণে পাক করিত এবং কোনও ভূঞা আহারকালে উপস্থিত থাকিত না। পাছে ভূঞাদিগের স্পর্শ দ্বারা রাজার ভোজনপাত্র অপবিত্র হয়, এই ভয়ে মৃৎপাত্রে তাঁহাকে আহার করিতে হইত এবং সেই পাত্র প্রত্যহ এক জন ভূঞা ভাঙ্গিয় ফেলিত। এই প্রথা এখনও কেওনঝর রাজপরিবারে প্রচলিত আছে।

ভূঞাগণ কেওনঝরে রাজাদিগের রাজ্যাভিষেকের সময় উপস্থিত থাকে। Colonel Dalton ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে একটি অভিষেকে উপস্থিত ছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন :—

'প্রাসাদের বাহিরের একটী প্রশস্ত কক্ষে তীর্থ-সলিলপূর্ণ ঘট, ও শাস্ত্রীয় বিধানানুযায়ী মাঙ্গলিক দ্রব্যাদি আনা হইল। ব্রাহ্মণ সম্মুখে বসিলেন। তাঁহাদিগের পশ্চাতে অনেকগুলি প্রধান ভূঞা পরিষ্কার বস্ত্র পরিধান করিয়া বসিল। তাহার পর রাজা ধনঞ্জয় ভঞ্জ প্রবেশ করিয়া সমবেত ব্যক্তিগণকে পান মশলা, মিষ্টান্ন ও মাল্যাদি বিতরণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। অল্পক্ষণ পরে ভূঞাদিগের জাতীয় বাদ্য বাজিয়া উঠিল—রাজা এক জন বলিষ্ঠ ভূঞা সর্দ্দারের স্কন্ধে আরূঢ় হইয়া প্রবেশ করিলেন। তখন উপস্থিত ভূঞাগণ রাজার দণ্ড, পতাকা, চামর লইয়া তাঁহার চারি দিকে দাঁড়াইল। এক জন সর্দ্দার একটি পাহাড়ী লতা আনিয়া রাজার পাগড়ীতে বাঁধিয়া দিল—ইহাই ভূঞাজাতির দেওয়া শিরোপা। ভাটগণ জয়গান করিল ও ব্রাহ্মণগণ বেদ পাঠ করিলেন। প্রাচীনতম ভূঞা সর্দ্দার রাজার ললাটে চন্দনের টীকা দিল। তাহার পর রাজার ব্রাহ্মণ বেবর্ত্তা (মন্ত্রী) ও উপস্থিত ব্রাহ্মণগণ টীকা দিলেন। রাজা রাজতরবারী গ্রহণ করিলেন। একটী বলিষ্ঠ ভূঞা যুবক তাঁহার সম্মুখে জানু পাতিয়া বসিল। রাজা তাঁহার স্কন্ধ তরবারী দ্বারা স্পর্শ করিলেন। সে তৎক্ষণাৎ দৌড়িয়া পলাইল, এবং তিন দিন পরে ফিরিল। এই প্রথা পূর্ব্বের নরবলির কথা স্মরণ করায়। ভূঞাগণ তাঁহাদের ভেট আনে—চাউল, কলাই, ঘৃত, দুধ ও মধু।

তাহার পর প্রাচীনতম ভূঞা সর্দ্দার রাজাকে সম্বোধন করিয়া এই মর্ম্মে বক্তৃতা করিল—'আমরা আমাদের চিরন্তন প্রথা অনুসারে তোমার হাতে এই রাজ্যের ও ইহার অধিবাসীর সুখ দুঃখের ভার অর্পণ করিলাম। আশা করি, সত্য ও ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া এই কার্য্য সম্পাদন করিবে।'

ভূঞাদের মুখ বেশ গোল, ঠোঁট পুরু, কপাল সরু। গালের হাড় উচ্চ। নাক উন্নত নহে। দেহের বর্ণ ঘোর কৃষ্ণ নহে। শারীরিক গঠন খুব দৃঢ়, দেহের বলও অসীম। পুরুষগণ মাথার সম্মুখ দিক কামায়, পশ্চাতে দীর্ঘ কেশ রাখে, সময় সময় লাল চিরুণী দিয়া মাথার উপর জড়াইয়া রাখে। পুরুষগণ কৌপীন পরে। কাজ করিবার সময় ইহারা কাঁধ হইতে এক খণ্ড চামড়া ঝুলাইয়া দেয়, ইহাতে ভারী দ্রব্য উঠাইতে সুবিধা হয়। গলায় এক থাক্ বা দুই থাক্ বাঁশের টুকরার মালা পরে। কেহ কেহ ব্রাহ্মণের মত পৈতাও পরে।

ইহারা বিশ্বাসী ও অতিথিপরায়ণ। সভ্যতার সংস্পর্শে না আসাতে ইহারা

এখনও সরল, সাধু ও স্বাধীনতাপ্রিয়। অতিথি দেবতা। গ্রামে কোনও আগন্তুক আসিলে সব গ্রামবাসী তাহার পরিচর্য্যায় তৎপর হয়। গ্রামে একটী সাধারণের অর্থে নির্ম্মিত গৃহ থাকে। সেখানে অতিথিকে থাকিতে দেওয়া হয়। অভ্যাগত যদি কোনও রাজকর্ম্মচারী হন, তাহা হইলে গ্রামের স্ত্রীলোকগণ কাষ্ঠাসন ও হলুদ জল লইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করে। অতিথি যত দিন ইচ্ছা গ্রামে থাকিতে পারেন।

ইহাদের জাতীয় ঐক্য আছে। কোনও কার্য্য উপলক্ষে যদি জাতির সকলকে আহ্বান করা হয়, তাহা হইলে প্রত্যেককেই আসিতে হইবে। না আসিলে জাতিকে অপমান করা হইল, জ্ঞান করা হইবে। ইহাদের জাতীয় ঐক্য আছে বলিয়াই সহজে ইহাদের কোনও অধিকার কাড়িয়া লওয়া সম্ভব নহে। এই কারণেই সামান্য ক্রটী হইলেই ইহারা বিদ্রোহী হয়।

ভুঞাগণ কুকুট, কীট পতঙ্গাদি খাইলেও হিন্দুরা তাহাদিগকে নীচ, অস্পৃশ্য বলিয়া ঘৃণা করে না—বরং 'জল আচরণীয়' বলিয়া তাহারা গৃহীত হয় ও হিন্দু পরিবারে ভৃত্য রূপে কার্য্য করিতে পায়।

ভুঞা স্ত্রীলোকগণ গ্রাম্য তাঁতীর বোনা মোটা শাড়ী পরে, কিন্তু মাথায় কাপড় দেয় না। ইহারা বাহু ও কাঁধে উল্কী পরে। ইহাদের অলঙ্কার বড় অদ্ভুত রকমের—কান ও নাকে পিতলের ফুল, গলায় নানা রঙ্গের পাথরের হার—হাতে অনেকগুলি পাতলা পিতলের বালা।

ইহাদিগের বিশ্বাস যে, প্রত্যেক পর্ব্বত, নদী, ঝরণা এক এক দেবতার অধীনে। তাঁহাদিগকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত ঘৃত, চাউল ও কুকুট উপহার দেওয়া হয়।

ইহাদিগের চারিটী প্রধান দেবতা—দাসম্ পাট, বামনি পাট, কইসব পাট ও বোরাম। প্রথম তিন জন ভ্রাতা—ইহাদের প্রস্তর মূর্ত্তি পূজিত হয়। বোরামই সর্ব্বপ্রধান—ইহার অপর নাম ধরম বা সূর্য্য। বোরামই সৃষ্টিকর্ত্তা, সুতরাং ধান রোপনের সময় শুভ্র কুকুট বলি দিয়া পূজা করা হয়। পীড়ার সময় দাসম পাটের নিকট ছাগ বলি দেওয়া হয়। ইহাদিগের বিশ্বাস, সূর্য্য ও চন্দ্র সজীব দেবতা, বিদ্যুৎ ও অগ্নি সূর্য্যের সন্তান; নক্ষত্র চন্দ্রের সন্তান। এক দিন চন্দ্র সূর্য্যকে নিমন্ত্রণ করেন। সূর্য্য পরম পরিতোষের সহিত আহার করিলেন। তখন চন্দ্র বলিলেন যে, অতিথিসেবার নিমিত্ত তিনি নিজের সন্তানগুলিকে মারিয়া রন্ধন করিয়াছেন। ইহা শুনিয়া সূর্য্য গৃহে ফিরিয়া

নিজের সন্তানগুলিকে বধ করিয়া আহার করিলেন, কিন্তু তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র অগ্নি একটী বৃক্ষে গিয়া লুকাইল ও কন্যা বিদ্যুৎ ইতস্ততঃ ছুটিতে লাগিল, সুতরাং সূর্য্য তাহাকে ধরিতে পারিলেন না। রাত্রে নক্ষত্রগুলি আকাশে দেখা গেল—তখন সূর্য্য বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি প্রতারিত হইয়াছেন। অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি অভিশাপ দিলেন যে, মাসে ১৫ দিন চন্দ্র মরিবে। সেই জন্য দিনে নক্ষত্র দেখা যায় না, কৃষ্ণপক্ষে চন্দ্র অদৃশ্য হন ও বৃক্ষের ঘর্ষণে অগ্নি উৎপাদিত হয়।

যাহারা সভ্যতার আলোক একবারেই পায় নাই, তাহারা এখনও পৃথিবী-দেবতা (রত্তা), ব্যাঘ্রদেবতা, শস্যদেবতা ও গ্রামদেবীর পূজা করে। Dalton বলেন যে, রামায়ণে বর্ণিত হনুমানের অনুচর ইহারাই ছিল। ইহারা পর্ব্বোপলক্ষে হনুমানের কীর্ত্তিগাথা গান করে। ইহাদের এক শ্রেণীর নাম—'পবন অংশ।'

গ্রামের কুমার কুমারী গৃহে রাত্রিবাস করে না। যুবকগণ 'ধাঙ্গড়বাসা' বা 'মন্দরঘরে' থাকে। যুবতীগণ এক জন প্রৌঢ়ার তত্ত্বাবধানে ধাঙ্গড়ী ঘরে বাস করে। এইরূপ অভিভাবকহীন হইয়া রাত্রি যাপন করিলেও ইহাদিগের মধ্যে নীতিবিরুদ্ধ কার্য্য কদাচিৎ ঘটে।

এই ধাঙ্গড়-ঘরের নিকটে একটী উন্মুক্ত প্রান্তরই গ্রামের নৃত্যভূমি। যুবকগণ ধাঙ্গড়-ঘর হইতে বাদ্য যন্ত্রাদি লইয়া নৃত্যভূমিতে আসিয়া উপস্থিত হইলে, যুবতীগণ সুসজ্জিতা হইয়া যোগদান করে। কিছুকাল নৃত্য গীত হইবার পর যে যাহার গৃহে ফিরিয়া যায়।

সময় সময় এক গ্রামের যুবকগণ অন্য গ্রামের যুবতীগণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যায়। তখন তাহারা সেই গ্রামের নৃত্যভূমিতে উপস্থিত হইয়া বাজনা বাজাইয়া আগমন ঘোষণা করে। সেই বাদ্য শুনিয়া যুবতীগণ দৌড়িয়া আসে। তখন নৃত্য গীত আরম্ভ হয়। এই সময় সেই গ্রামের কোনও পুরুষ গৃহের বাহির হয় না। যুবকগণ ঢাকের মত এক প্রকার বাজনা ('চাঙ্গ') বাজাইতে বাজাইতে বৃত্তাকারে ঘুরিতে থাকে—সেই বৃত্তের মধ্যে যুবতীগণ অনুচ্চ স্বরে একটী সুমিষ্ট গান গায়িতে থাকে। মধ্যে মধ্যে রহস্য বিদ্রূপও চলে, উচ্চ হাস্যেও সেই স্থান ভরিয়া যায়। যখন সকলে ক্লান্ত হইয়া পড়ে, তখন নৃত্য গীত কিছুকাল বন্ধ থাকে। এই সময় যুবকগণ তাহাদিগের আনীত উপহার চিরুণী, মিষ্টান্ন, পুষ্পাদি যুবতীগণকে দেয়। যুবতীগণও স্বহস্তে রন্ধন করিয়া অতিথিসেবা

করে। ভোজের পর সারারাত্রি আবার নৃত্য গীত চলিতে থাকে এবং প্রভাতের পূর্ব্বেই অনেক যুবকই তাহাদের জীবন-সঙ্গিনী নির্ব্বাচন করে। এই নির্ব্বাচনের চিহ্ন স্বরূপ যুবক প্রণয়িনীর চুলে ফুল গুঁজিয়া দেয় ও নিজের গলা হইতে এক গাছি পাথরের মালা খুলিয়া তাহাকে পরাইয়া দেয়। ইহার পর সেই বালিকাটি যুবকের ফুলমিত্র হইল এবং অন্য কাহাকেও সে বিবাহ করিতে পারিবে না।

প্রভাতে যুবকগণ নাচিতে নাচিতে বিদায় গ্রহণ করে, যুবতীরাও তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ নিকটবর্ত্তী নদীতীর পর্য্যন্ত যায়। যুবকেরা নদী পার হইলে, উভয়ে দুই তীর হইতে ছড়া কাটে, হাস্য পরিহাস করে। একটী ভূঞা-গীতের মোটামুটি অনুবাদ দেওয়া হইল :—

যুবক

ওগো, কাঞ্চন ফুল এখানে আন
আমরা যে শুনব তোমাদের গান

যুবতী

রান্নার যোগাড় করিগে যাই
এখানে গান গাইব না ভাই

যুবক

ওগো, ও রাধার ছোট্ট সুন্দর দূতী
শোনাও মধুর গান, মোদের এ মিনতি

যুবতী

ধরোনা মোদের, ঐ রূপের ফাঁদে
সত্যি, ভাই, তোমার তরে পরাণ কাঁদে

যুবক

এক রত্তি মেয়ে কিন্তু কথায় পাকা বুড়ী
অবাক করলে, খুঁজে না পাই তোমার জুড়ি

যুবতী (মানভরে)

আহা! পাখীরা গান গায়, আর যায় উড়ে
আজ এত আনন্দ, কাল তোমরা কত দূরে

যুবক (প্রেমভরে)

হাঁগো, এবার রঙিন মাছ গেঁথেছি
যাব কোথা, আমরা এবার মজেছি

যুবতী (সানন্দে)

মেঘ যায় উড়ে, দিনের কোটে আলো
এস বন্ধু, নাচ গাও, সেই বাসি ভালো

যুবক

না গো না, ভুলব না মুখের কথায়
তোমরা এস মোদের ঘড়ো বাসায়

যুবতী

পাখীরা গাহিছে সুখে
পড়ে রইব কি দুখে
বাপ মা ছেড়ে যাব চলে
তোমাদেরি হাত ধরে ;

(১) বিবাহ।—যুবতীগণও যুবকগণের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসে। প্রণয়িনীগণ তাহাদিগের প্রণয়ীর বাসগৃহাদি দেখিয়া যায়। ইহার পরেই যুবকগণ পুনরায় সেই গ্রামে নাচিতে যায়। নৃত্য গীত যখন পূর্ণবেগে চলিতেছে তখন, পূর্ব্বমন্ত্রণা অনুসারে যুবক তাহার প্রণয়িনীকে সঙ্গে লইয়া স্বগ্রামে ফিরিয়া আসে। গ্রামের বাহিরে যুবতীকে রাখিয়া তাহার গৃহে যাইয়া মাতা ব্যতীত অপর কোনও আত্মীয়াকে সব কথা বলে। সেই আত্মীয়া আসিয়া বধূকে গৃহে

লইয়া যায়। সেখানে যুবকের মাতা বরবধুর কপালে হলুদের ফোঁটা দেয়। ইহার পরদিবস বিবাহোৎসব (হাঁড়িসরা) অনুষ্ঠিত হয়। ইহা আমাদের বৌ-ভাতের অনুরূপ। বধূ একটী নূতন হাঁড়িতে অন্ন পাক করিয়া সকলকে খাইতে দেয়।

(২) 'ঝিকা' বিবাহ।—নৃত্যোৎসবের সময় যদি কোনও যুবক কোনও বালিকার প্রতি আকৃষ্ট হয়, তাহা হইলে গৃহে গিয়া তাহার অভিপ্রায় সকলকে জানায়। যদি তাহার পিতা এই প্রস্তাবে সম্মত হয় ও তাহার কন্যাপণ (তিনটী বলদ, কিছু ধান ও কাপড়) দিবার সামর্থ্য থাকে, তাহা হইলে পাত্রের আত্মীয়-গণ কন্যার পিতাকে সব কথা জানায়। কন্যাকর্ত্তার সম্মতি পাইলে, যুবক তাহার বন্ধুবান্ধবকে লইয়া কন্যার গ্রামে যায়। সে নিজে গ্রামের বাহিরে থাকে ও দুই জন সহচরকে, কন্যার পিতাকে তাহার আগমনবার্ত্তা জানাইতে পাঠায়। কন্যাকর্ত্তা জঙ্গল হইতে কাঠ আনিতে, তাহার কন্যাকে বলে। কন্যা গ্রামের বাহিরে পদার্পণ করিলেই, পাত্র তাহার হাত ধরিয়া লইয়া পালায়। কন্যার সহিত যাহারা আসিয়াছিল, তাহারা কন্যাকে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করে। বিফল হইয়া গ্রামে ফিরিয়া আসিয়া কহে যে, বাঘে তাহাদের সঙ্গিনীকে লইয়া গিয়াছে। তখন কন্যার আত্মীয় স্বজন অস্ত্র শস্ত্রাদি লইয়া ব্যাঘ্রের অন্বেষণে পাত্রের গ্রামে যায়। পাত্রের পিতা আসিয়া তাহাদিগকে বলে যে, 'যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে, এখন আমাদিগের যাহা করিতে পার কর।' বলা বাহুল্য, ইহার পর পান ভোজনে অতিথিগণ আপ্যায়িত হইয়া সানন্দে ফিরিয়া যায়।

(৩) মাঙ্গি বিবাহ।—বরের পিতা মাতা কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত কন্যাকে বিবাহ করিতে রাজী হইলে, বর তাহার বন্ধুবান্ধবগণকে লইয়া বিবাহ করিতে যায়। এই বিবাহ অপেক্ষাকৃত সুসভ্য ভুঞাদের মধ্যে প্রচলিত আছে।

(৪) যুবক তাহার প্রণয়িনীর অভিভাবকের সম্মতি না পাইলে অনেক সময়ে বন্ধুবান্ধবকে লইয়া বলপূর্ব্বক কন্যাকে অপহরণ করিবার চেষ্টা করে। ইহার ফলে দুই দলে যুদ্ধ বাধে—পাত্র জয়ী হইলে কন্যাকে লইয়া যাইতে পারে।

রায় বাহাদুর শ্রীশরৎচন্দ্র রায় বিহার ও ওড়িষ্যা রিসার্চ্চ সোসাইটীর জর্ণালে ভুঞাদের বিবাহ-গীতের নমুনা দিয়াছেন। আমরা তাহার মূল ও অনুবাদ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

বন পুরাই পুরাই
খজুর মুল দিসাই

সাত্তি বেয়া থাঙ্গড় থাঙ্গড়ি

আমার বেরা বুড় হাই

অর্থাৎ, যখন জঙ্গলের গাছ পোড়ান হয়

খেজুরের গুঁড়িই বাকী থাকে

সেই রকম প্রত্যেক যুবক এক যুবতী পায়

কেবল আমার জোটে এক বুড়ী।

(৫) বিধবা বিবাহ ইহাদিগের মধ্যে প্রচলিত আছে। ছোট ভাই বিধবা ভ্রাতৃজায়াকে বিবাহ করিতে পারে। কিন্তু যদি এই বিধবা অপর কাহাকে বিবাহ করে, তাহা হইলে, পুত্র কন্যার উপর কোনও অধিকার আর থাকে না।

ভূঞাদের বিবাহ-বন্ধন নানা কারণে ছিন্ন হয়—যথা, স্ত্রী স্বামীর অবাধ্য হইলে, গৃহকর্ম্ম না করিলে, কলহ করিলে বা পরপুরুষানুরক্ত হইলে।

গ্রামের পুরোহিতই মাঙ্গী বিবাহের প্রধান উদ্যোগী; কারণ, তাঁহার এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে অর্থাগম হয়। বর কন্যা হলুদ জলে স্নান করিয়া, নব বস্ত্র ও অলঙ্কার পরিয়া বেদীতে বসে। পিতা বা কোনও নিকট-আত্মীয় কন্যার হাতে একটি টাকা দিয়া বলে,—'আমার যথাসর্ব্বস্ব দিয়ে তোকে আশীর্ব্বাদ করছি যে, তুই ভাগ্যবতী হ'। স্বামীর বিশ্বাসভাজন হ'।' তৎপরে প্রৌঢ়াগণ কন্যার মস্তকে আতপ চাউল সিঞ্চন করিয়া ঘৃত দীপ লইয়া বরণ করে। যে ঘরে বর কন্যার বাসর হয়, পুরোহিত (দেহুরি) পূর্ব্বেই সেই ঘরে দুধ ও আতপ চাউল দিয়া দেবতার পূজা করেন, তাহার পর এক মৃৎপাত্র জলপূর্ণ করিয়া ঘরের এক পার্শ্বে রাখা হয়। ইহাদিগের বিশ্বাস যে, পূর্ব্বপুরুষদিগের আত্মা সেখানে পিপাসা নিবারণ করিবার নিমিত্ত আসিবে ও বর কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করিবে।

কুঠার ও তীর ধনুক ইহাদিগের প্রধান অস্ত্র। তীরের মুখে লোহার বাঁকান ফলা দেওয়া হয়, যাহাতে দেহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে সহজে বাহির হইবে না। পক্ষী বধের নিমিত্ত ভোঁতা কাঠের তীর ব্যবহৃত হয়। ইহাদের তরবারি বাঁকা, দূরে নিক্ষেপ করিয়া ইহারা গোলাকার লোহার চাকতির দ্বারা পশুর গতিরোধ করিয়া থাকে।

অরণ্যাচ্ছাদিত পর্ব্বতের পাদদেশে নদীতীরে ভূঞা গ্রামগুলি অবস্থিত। গ্রামের চতুষ্পার্শে কাঁঠালের বন। ঠিক মধ্যস্থলে একটি প্রশস্ত রাস্তা গ্রামকে দুই ভাগে বিভক্ত করে—তাহার উভয় পার্শ্বে বাড়ীগুলি। মেড়ল ও অন্যান্য প্রধানদিগের গৃহ গ্রামের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। গ্রামের বাহিরে পান, কোল

প্রভৃতি নীচ জাতির বাস—ইহারা ভূঞাদের ভৃত্য। মোড়লের গৃহের নিকট দরবার বা মণ্ডপ ঘর। এখানে গ্রামের অবিবাহিত যুবকগণ রাত্রি যাপন করে—ইহার নিকটে নৃত্যভূমি।

ভূঞাগণ অনেকগুলি গোত্রে বিভক্ত। গোত্রপতির নামানুসারে গোত্রের নামকরণ হয়। কতকগুলি পরিবার লইয়া এক একটি গোত্র। পিতার জীবদ্দশায় সম্পত্তিতে পুত্রের কোনও অধিকার নাই।

অনেকগুলি গোত্র লইয়া একটি দল গঠিত হয়। দলের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বলবান যে, সেই দলপতি হয়। দলপতির বিশেষ কোনও অধিকার নাই, কেবল ভোজের ও শীকারের সময় তাঁহাকে সকলে নিজের ভাগ হইতে কিছু কিছু দিয়া সম্মানিত করে।

চুরী ধরা পড়িলে, চোরকে অপহৃত দ্রব্য ফিরাইয়া দিতে হয়। দাগী চোরকে জাতিচ্যুত করা হয়। দাঙ্গায় কেহ আহত হইলে, প্রধানগণ উভয় পক্ষকে তিরস্কার করে, তাহার পর একটি জ্বলন্ত মশালে থুথু ফেলিয়া নিভাইয়া দেয়, ইহা শান্তি স্থাপনের চিহ্ন।

অপরাধী ধরিবার নিমিত্ত অনেক প্রকার পরীক্ষা প্রচলিত আছে।—(১) এক তাম্রখণ্ড ফুটন্ত গোবর জলের মধ্যে ফেলা হয়। আসামীকে সেই জলের ভিতর হইতে হাতে করিয়া সেই তাম্র তুলিতে হইবে—অক্ষত অবস্থায়। (২) একটি উচ্চ বৃক্ষের নিকট এক বৃত্ত অঙ্কিত করা হয়। সেই বৃক্ষের উচ্চ শাখার উপর আসামীকে এক পাত্র দুধ ও চাল লইয়া উঠিতে হয়। তাহার পর শাখাকে সজোরে দোলাইয়া দেওয়া হয়। এই অবস্থায় বৃত্তের মধ্যে তাহাকে দুধ এমন ভাবে ঢালিতে হইবে, যেন বাহিরে একটুও না পড়ে। (৩) দুই হাতে এক সের ভারী গলিত লোহা ধরিয়া কিছু দূর যাইতে হইবে।

সমাজে ভূঞাদিগের স্থান সর্ব্বত্র সমান নহে। কোনও স্থানে ভূঞাদের প্রাধান্য এখনও অব্যাহত আছে, সেখানে তাহারা 'জল আচরণীয়'। আবার কোনও স্থানে তাহারা অস্পৃশ্য—গ্রামের বাহিরে বাস করিতে বাধ্য হয়।

ভূঞাগণই এই প্রদেশের আদিম অধিবাসী। আর্য্যগণ আসিয়া ইহাদিগকে বিতাড়িত করিয়া বসবাস করেন। যে প্রদেশে আর্য্যগণ অধিক সংখ্যায় আসিয়া বসবাস করিলেন, সেখানে আদিম অধিবাসিগণ হীনবল হইয়া দাসত্ব করিতে বাধ্য হয়—সেখানে তাহারা এখনও অস্পৃশ্য, ঘৃণ্য।

ছোটনাগপুরে আর্য্যগণ অল্প সংখ্যায় আসিয়াছিল, সুতরাং অধিবাসিগণ

সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হয় নাই। সেই জন্য ইহাদিগের আচার ব্যবহার বিশেষ পরিবর্ত্তিত হয় নাই—অনেকাংশে ইহারা ইহাদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিতে পারিয়াছে। এখানে ইহারা হিন্দু সমাজে স্থান পাইয়াছে, এবং কৃষিকর্ম্মই ইহাদের জীবিকানির্ব্বাহের উপায়। এখানে অনেকগুলি মন্দিরের সেবাইত ইহারাই—ব্রাহ্মণের সেখানে কোনও অধিকার নাই।

শ্রীভূপতিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

প্রাচীন ও নবীন।

১

'হুজুর, এমন করলে ত আর জমিদারী রক্ষা করা যায় না। হয় আমায় নিজের মতলবে কাজ করতে দিন, না হয় অবসর দিন। যে ক'টা দিন বাঁচি, বিশ্বনাথের সেবায় কাশীতেই কাটিয়ে দিই—'

'কি, হয়েছে কি? করালী যে কেঁদেই ফেল্লে হে! বলি ব্যাপারটা কি হে?'

'আজ্ঞে, ব্যাপার আর কি, প্রজাদের যদি এমনই করে প্রশ্রয় দেওয়া হয়—'

'ও হো হো, আর বলতে হবে না, বুঝেছি। বাঁদরটা আবার বুঝি নতুন একটা হাঙ্গামা বাধিয়েছে?'

বলিতে হইবে না, বোধ হয় কথা হইতেছে জমিদার ও নায়েবে। রাধানাথপুরের দত্তবাবুরা দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ জমিদার, তাঁহাদের নামে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায়। দত্তবংশ কত কালের প্রাচীন তাহা কেহ বলিতে পারে না, তবে পর পর অনেক দত্তই যে রাধানাথপুর জমিদারীর শাসনদণ্ড নির্ম্মম কঠোর অমোঘ বিধাতার দণ্ডের ন্যায় পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন, তাহা রাধানাথপুরের অতি প্রাচীন মোড়ল প্রজাদের জিজ্ঞাসা করিলেও বলিয়া দিবে। তাই যখন আজ সদর নায়েব করালীচরণ বড়বাবু গুপিনাথ দত্ত মহাশয়ের দরবারে আসিয়া কাঁদিয়া পড়িল, এবং তাঁহার বড় আদরের পৌত্র কান্তিকুমারের নামে অভিযোগ উপস্থিত করিল, তখন তিনি জমিদারীর কার্য্যে বাধার কথা শুনিয়া একবারে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন। কান্তিকুমার কলেজের পড়া শেষ করিয়া দেশে আসিয়া অবধি জমিদারীর কাজে বহু বার বাধা বিঘ্ন ঘটাইয়াছে। তাহার

উৎপাতে নায়েব গোমস্তাদের প্রাণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। যাহারা এত কাল কঠোর জমিদারের আশ্রয়ে থাকিয়া নির্ব্বিবাদে জমিদারীর 'কাজ' চালাইয়াছে, আজ তাহাদের নিরবচ্ছিন্ন একটানা 'কাজে'র স্রোতে বাধা দেয় কি না একটা কালেজের পাশ-করা সেদিনকার অজাতশত্রু বালক!

নায়েব করালীচরণ কান্না ও অভিমানের সুর বজায় রাখিয়া বলিয়া যাইতে লাগিল, 'হুজুর, হাঙ্গামা ত লেগেই রয়েছে। ছোটবাবু এসে অবধি এই ছোট-লোক প্রজা বেটাদের সঙ্গে মিলে মিশে বেড়াচ্ছে। এতে বেটারা আঁর আস্কারা পাবে না? আঁস্তাকুড়ের পাত নাই পেয়ে একেবারে মাথায় উঠেছে। শাসন বাঁধন সব একেবারে গোল্লায় গেল।'

জমিদার বাবু তাকিয়াটা ঠেলিয়া দিয়া আলবোলার নলটা ফেলিয়া বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হুঁ, ব্যাপারটা হয়েছে কি?'

নায়েব বলিল, 'আজ দীনে গোয়ালার চৈৎ কিস্তির দরুণ সুদের পাওনার দিন ছিল। দীনে ছুতো ধরেছিল, তার রক্তআমাশা হয়েছে। পেয়াদা পাঠিয়েছিলুম শালার কান ধরে সদর কাছারীতে হাজির করতে। খবর পেয়ে তার মেয়েটা ছোটবাবুর কাছে ছুটে এসে পায়ে ধরে কেঁদে পড়লো; ছোটবাবু তাদেরই বাটীর কাছে বিলের পুকুরে মাছ ধরছিলো কি না। শুনেই ছিপ ফেলে দীনে শালার বাড়ী হাজির। ছিরে বাগ্‌দীকে পাঠিয়েছিলুম। ছোটবাবু তাকে থাইচ্ছে-তাই অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছে, আর ছোটলোক বেটাদের সকলের সামনে বলেছে, 'করালে বেটা ফের এ রকম অত্যাচার করলে তার কান ধরে ঘোড়দৌড় করাবো।' বাবু, আমায় জবাব দিন। চুল পাকলো মনিবের সেবায় এই কাজে, এখন বুড়ো বয়সে অপমানিত হয়ে কলঙ্ক কিনে যাব!'

বৃদ্ধ গুপিনাথের চক্ষু ধক ধক জ্বলিয়া উঠিল। অতি কষ্টে তিনি যে অন্তরের ক্রোধ-বহ্নি চাপিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। করালীচরণ মুখ ফিরাইয়া লইয়া টিপি টিপি হাসিল। গুপিনাথ বলি-লেন, 'করালী, দুঃখ কোরো না, তুমি এমন জমিদারের কাজ কর না, যার কাছে ন্যায়বিচারের অভাব হবে। তুমি এখন যাও, এর বিহিত না করে জলগ্রহণ কোরবো না।' তাহার পর করালী চলিয়া গেলে জলদগম্ভীর নাদে ডাকিলেন, 'কে আছিস ওখানে, বৌমাকে একবার সদরবাড়ীতে আসতে বল।'

২

কান্তিকুমার বগলে ছিপ ও হাতে একটা মাছ ঝুলাইয়া লইয়া যখন সদর-

বাড়ী পার হইতেছিল, তখন পিতামহের বৈঠকখানায় তাহার জননীর গলার আওয়াজ পাইয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। লুকাইয়া পরের কথা শুনা তাহার অভ্যাস ছিল না। তথাপি পিতামহ ও জননীর কথোপকথনের মধ্যে তাহার নাম বিজড়িত রহিয়াছে শুনিয়া, কথাটা সব শুনিবার জন্য কৌতূহলী হইল। শুনিল পিতামহ বলিতেছেন, 'বৌমা, কান্তি কোথায়? তাকে নিয়ে ত আর কাজ চলে না।' জননী ভীত হইয়া বলিলেন, 'কেন বাবা?' গুপিনাথ সে কথার জবাব না দিয়া বলিলেন, 'বৌমা, আমাদের এ জমিদারী কত কালের?'

জননী জবাব দিলেন, 'কেন বাবা, সকলেই ত জানে, যত দিন চন্দ্র সূর্য্য উঠছেন, তত দিন আমাদের এ জমিদারী—'

'তবে সে দিনকার একটা ছোঁড়া—যার গলা টিপলে এখনও দুধ বেরোয়—সে, আসে কোন্ সাহসে আমাদের সেই জমিদারীর শাসন ওলট-পালট করতে?'

জননী ভীত হইয়া বলিলেন, 'কেন বাবা, কান্তি কি আবার কিছু পাগলামি করেছে?'

বৃদ্ধ ভয়ঙ্কর ক্রুদ্ধ হইয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন, 'পাগলামি? পাগলামি বোলো না একে, এ সব নষ্টামি, এ সব কলেজের পড়া বুদ্ধির ফল। আমি কলেজে পড়াতে চাই নি, তুমিই ত মা জোর করে ওকে কালেজে পড়িয়েছ, এখন সামলাও।'

জননী উত্তরোত্তর ভীত হইয়া, যেন নিজেই অপরাধী, এই ভাবে মৃদু স্বরে জিজ্ঞাসিলেন, 'কি হয়েছে বাবা?'

বৃদ্ধ বলিলেন, 'যা রোজ হয়ে থাকে। আমার শাসন ওর চোখে ভাল ঠেকে না। ও সব-তাতেই আমার শাসন উল্‌টে দিতে যায়। কিন্তু আমিও বলে রাখছি, বার বার আমি সইব না। জমিদারী আমার, তোমার ছেলের নয়। বেশী বাড়াবাড়ি হলে আমি বিষয় যাকে ইচ্ছা বিলিয়ে দিয়ে যাব।'

কান্তিকুমার এইটুকু শুনিয়াই একটু মুচকি হাসিয়া অন্দরে চলিয়া গেল। কিন্তু সে যদি আর একটু দাঁড়াইত, তাহা হইলে শুনিতে পাইত তাহার জননী মিনতির সুরে বলিতেছেন, 'স্বীকার করছি বাবা, ও একটু চঞ্চল, তার উপর ওর শরীরটা দয়া মায়ায় পূর্ণ, গরীব প্রজাদের দুঃখু কষ্ট একবারে সহ্য করতে পারে না। বদমায়েস প্রজা কি করে শাসন করতে হয় তা জানে না, তবে শাসন হ'তে দেখলেই একবারে খেপে উঠে প্রজার পক্ষ নিতে ছোটে। কলেজের লেখাপড়া শিখে ও ছোটলোক ভদ্রলোকের তফাৎ বুঝতে পারে না। তা, এখানে কিছু দিন

থাকলে, আপনার দৃষ্টান্ত দেখলে, ও সব বাই ওর সেরে যাবে।' উত্তরে পিতামহ বলিতেছেন, 'হাঁ, ওর বংশাভিমান যে নেই তা নয়, তবে কালেজে পড়ার দোষে ও চাষীভূষিদের সঙ্গে মিলতে মিশতে ভালবাসে। কালে দোষটা সেরে যাবে বলছ ভালই, না হলে আমার সঙ্গে ওর বনিবনাও হবে না বলে রাখছি। মার কাছে শিক্ষা না পেলে ছেলের ঠিক শিক্ষা হয় না। তাই তোমায় সব শুনিয়ে রাখলুম বৌমা, ওকে একটু বুঝিয়ে শুঝিয়ে জমিদারের মত থাকতে বোলো।'

কান্তিকুমার ঘরে আসিয়া বেশভূষা পরিবর্ত্তন করিয়া একটু স্থির হইয়া বসিতেই দেখিল তাহার জননী তাহারই কক্ষের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। দেখিয়াই সে সহাস্য বদনে জননীকে বলিল, 'বেশ, কোথায় ছিলে তুমি মা? খিদেয় নাড়ী জ্বলে যাচ্ছে।'

জননী মুখ অত্যন্ত গম্ভীর করিয়া পুত্রের সান্নিধ্যে উপস্থিত হইতেছিলেন। পুত্রের হাসি হাসি মুখ ও বালকোচিত সরল সম্ভাষণ শুনিয়া হাসিয়া ফেলিলেন, বলিলেন, 'খাবার দিচ্ছি, আয় খাবি আয়। কিন্তু এতখানি বেলা হল, কি কচ্ছিলি বল দেখি, দুরন্ত ছেলে!' জননীর চক্ষুতে এই বিংশতিবর্ষীয় বলিষ্ঠ যুবকও যেন তাঁহার সেই ক্রোড়ের শিশুটী!

'বাঃ, মাছ ধোরবো না বুঝি? কেবল ঘরের কোণে বসে থাকা আর জমিদারীর কাগজপত্র দেখা ভাল লাগে না। এখানে এসে অবধি না আছে ফুটবল ক্রিকেট, না আছে সুইমিং, না আছে এথ্লেটিক স্পোর্ট—'

'থাম্, থাম্। জমিদারের ছেলে বুঝি ঐ সব করে বেড়ায়?'

'কেন, জমিদার হলেই বুঝি ভুঁড়ি বাগিয়ে তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে আলবোলার নল টানে?'

'তা নয় ত কি? জমিদারের ছেলে বুঝি ছোটলোকদের সঙ্গে ধেই ধেই নেচে বেড়িয়ে নিজের মান ইজ্জৎ খোয়ায়?'

'মা, তোমার মুখে ও কথা শুনলে বড় কষ্ট পাই। এ দিকে তোমার এত দয়া মায়ার শরীর, গরীব প্রজাদের বেলা তবে অমন নাক সিঁটকোও কেন? আহা! তারা আমারই মত ত তোমার সন্তান!'

'সন্তান নয় তা ত বলি নি। তবে তাদের সঙ্গে তোর কি প্রভেদ নেই? তবে ভগবান এমন আলাদা অবস্থার সৃষ্টি করেছিলেন কেন?'

আলাদা কিসে? তাদের পয়সা নেই, আমাদের আছে, এই ত? তাদের ক্ষমতা থাকলে তারাও আমাদের মত লেখা পড়া শিখবার অবকাশ পেতো,

আর তা হলে আমাদেরই মত তাদের মতি গতি রুচি প্রবৃত্তি হ'ত। আমাদের মত তারাও হাসে কাঁদে, সুখ দুঃখ ভোগ করে। তবে ওরা তফাৎ কিসে? গরীব বলেই কি ওদের উপর অত্যাচার উৎপীড়ন করতে হবে? ওরা কি মানুষ না?

'অত কথা জানি নি বাপু। তবে তোর জন্যে তোর মা কষ্ট পায়, এইটেই কি দেখতে ভালবাসিস?'

কান্তি ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসিল, 'কেন মা, কষ্ট পাবে কেন? আমার জন্যে কষ্ট—সে কি কথা?'

'কষ্ট নয়? দেখ দেখি নায়েবের শাসনে ব্যাঘাত ঘটালে তোর দাদামশাই কত রাগ করেন। আজ কি এক কাণ্ড বাধিয়েছিস, কর্ত্তা শুনে ভারি রাগ করেছেন। আমার মাথা খাস, বল, আর এ রকম করবি নি? আগে জমিদারীর কাজ শেখ, তার পর নায়েবের কাজ বুঝে নিস।'

কান্তি হাসিয়া বলিল, 'ওঃ এই কথা। তা নায়েব মশাই অন্যায় করেন কেন? তাঁকে অন্যায় করতে বারণ করে দিও। এখন চল খাবার দেবে চল।'

৩

'দেখি, ও কি ক'রছ। ওখানা কি আঁকছ?'

'ওখানা একটা নক্সা। দাদা, দেখুন দেখি কেমন হয়েছে, এই ভাবে প্রজাদের সব ঘর বেঁধে দিলে হয় না?'

জমিদার গুপিনাথ বাবুর মুখ গম্ভীর হইল। তিনি বলিলেন, 'কাছারীতে বসে এই বুঝি জমিদারীর কাজ শেখা হচ্ছে। তা বেশ, এ সব ছাই ভস্ম করে সময় নষ্ট না করে বাড়ী বসে ডাক্তারী-টাক্তারী যা হয় একটা কিছু শিখলে পার। তোমার ধাতে জমিদারী সবে না।'

'আমি ত পড়তে চেয়েছিলুম, আপনি দিলেন না কেন?'

গুপিনাথ ঘৃণাভরে নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, 'জমিদারের ছেলে ডাক্তারী ওকালতী করে, এটা আমার ইচ্ছা নয়। তা ব'লে সে ছাই ভস্ম করে সময় কাটায়, তাও দেখতে ইচ্ছা করি নি।'

'ছাই ভস্ম? আপনি যখন তখন এগুলোকে ছাই ভস্ম বলেন। দেখুন দেখি, এই ভাবে প্রজাদের ঘর ছাইয়ে দিলে, আর এই ভাবে গ্রামে জলনিকাশের ব্যবস্থা করলে ব্যায়রাম পীড়া একবারে দূর হয়ে যাবে। এই কিছুদিন

আগে Agricultural Review দেখে এখনকার উপযোগী লাঙ্গল এনে চাষ-বাসের experiment করতে বললুম, তাতেও বললেন, ও সব ছাই ভস্ম; এখনকার বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষ বাস করলে, জমীর সার দিলে, সেচের ব্যবস্থা করলে, বীজের উন্নতি করলে আমাদেরও লাভ, প্রজাদেরও লাভ। তা আপনি সেই মান্ধাতার আমলের পৈতৃক প্রথা ত ছাড়বেন না। এ সব তাঁর ছাই ভঁস্ম।'

যদি কান্তিকুমার এতক্ষণ তাহার পিতামহের মুখপানে তাকাইয়া দেখিত তাহা হইলে এতটা বলিতে সাহসী হইত কি না সন্দেহ। সে আপনার নক্সাতেই বিভোর হইয়া হর্ষভরে মনের কথা বলিয়া যাইতেছিল, সেখানে যে পিতামহ বসিয়া আছেন সে কথা তাহার স্মরণই ছিল না। হঠাৎ সে শুনিল, জলদগম্ভীর নাদে পিতামহ বলিতেছেন, 'মান্ধাতার আমলের প্রথা আমাদের হ'তে পারে কিন্তু জমিদারীটাও আমার, এ কথাটা মনে রেখো।'

'আমি ত তা অস্বীকার করছি না। আপনার জমিদারীর উন্নতি হয়, এও কি আপনি চান না?'

'না',—তক্তপোষের উপর প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাত করিয়া গুপিনাথ বলিলেন, 'না, আমি উন্নতি চাই না। আমার বাপ পিতামহ যা করে গেছেন, আমি তাই করে যাব, আমি তাঁদের চেয়ে বুদ্ধিমান নই।'

কান্তিকুমার বৃদ্ধ পিতামহকে অত্যন্ত ক্রোধপরায়ণ ও নির্ব্বন্ধপরায়ণ বলিয়া জানিত; কিন্তু তাহা হইলেও আজ তাঁহার অস্বাভাবিক উষ্মা দেখিয়া বিস্মিত হইল। সে নিজেও নির্ব্বন্ধপরায়ণ কম ছিল না, পিতৃ পিতামহের স্বভাব সেও কতকাংশে অর্জ্জন করিয়াছিল। তাই নিজের মন্তব্য বজায় রাখিবার জন্য সেও অপেক্ষাকৃত উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল, 'এমনই ক'রে নিজের চোখে না দেখে নায়েব গোমস্তার উপর প্রজাদের অবস্থা দেখবার ভার দিয়ে বাপ পিতামহ যদি নিশ্চিন্ত হয়ে থাকেন, তা হ'লে তাঁরা যে বিশেষ বুদ্ধি দেখিয়েছেন এমন ত মনে হয় না।'

'কি, ছোট মুখে বড় কথা? আমার বাপ পিতামহ বুদ্ধিমান ছিলেন না, তুমি কলেজে দু'পাতা ইংরাজী পড়ে বুদ্ধিমান হয়েছ বটে! তা হ'লে বুদ্ধি খাটিয়ে নিজে করে খাও গে, এ মুখ্খুদের অন্নে থাকবার কোনও আবশ্যক নেই।'

ব্যাপার এই সামান্য কথা হইতেই এতদুর গড়াইবে, কান্তিকুমার তাহা

স্বপ্নেও ভাবে নাই। প্রথমটা বৃদ্ধ অন্যায় বলিতেছেন মনে করিয়া সে ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল, কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই তাহার রাগ পড়িয়া গেল, সে হাসিয়া ফেলিল। কিছুক্ষণ নীরবে থাকিবার পর বলিল, 'আপনি রাগ করছেন কেন দাদামশাই? আমি কি আমার নিজের পূর্ব্ব পুরুষদের বুদ্ধিহীন বলতে পারি? আমি জানি, তাঁরা কথনও নায়েব গোমস্তাদের উপর প্রজাপালনের ভার ছেড়ে দিতেন না। দিলে প্রজারা এত কাল সুখে বাস করে আসত না, তাঁদের নাম গান করতও না।'

'তা হ'লে তুমি বলতে চাও, আমার আমলেই প্রজাপালন ঠিক হচ্ছে না, আমিই বুদ্ধিহীন, নায়েব গোমস্তার উপর ভার দিয়ে রেখেছি?'

'এমন কথাও বলছি না। আমি কেবল বলছি যে, আপনি এথন বিশেষ পরিশ্রম করতে পারেন না বলে সব নিজে দেখতে পারেন না। তাইতে নায়েব গোমস্তারা সুবিধে পেয়ে প্রজাদের সুখ দুঃখ কিছুই দেখে না, কেবল নিজেদের পেট ভরাতেই ব্যস্ত থাকে।'

'বটে, কোথায় প্রজাদের দুঃখ হয়েছে শুনি।'

'এই ধরুন না, বিলবৌলি চকটা। এটা ত আমাদের কাছারী থেকে এক পো পথেরও বেশী হবে না, অথচ ওখানে প্রজাদের চালে খড় নেই, দেয়ালে মাটী নেই, নায়েব এমন শুষে নিয়েছে যে, বেচারীরা বীজ ধানও সব বেচে ফেলেছে, এইবার তাদের হাল গরুও বেচতে হবে।'

'শুষে নিলে কি করে?'

'বুনো মুখ্‌খু প্রজা, মুখের কথাই তাদের দলীল। নায়েবের মুখের কথায় বিশ্বাস ক'রে তারা খাজনা দিয়েছে, নায়েব বলে তাদের পূর্ব্বের আসল ও সুদের পাওনা শোধ হয়েছে। তার পর এই দেখুন না, নলকাটির চকটা, ওখানে ক'বছর ধরে একটা জলনিকেশের বাক্স-কল বসাবার জন্যে প্রজারা—'

'আরে, থাম থাম, এই ত' বছরখানেক আগে ওখানে ভেড়ী বাঁধা হল, বাক্সকল বসান হ'ল—'

'এই দেখুন, আপনি মোটেই জানেন না, ওখানে ও সব কিছুই হয় নি। নায়েব আপনাকে যা বুঝিয়েছে আপনি তাই মেনে নিয়েছেন। খরচা সব নায়েব লিখিয়ে সই করে আদায় করে নিয়েছে, অথচ খরচা একটী পয়সাও হয় নি। নোনা জলে আবাদ ভাসছে, প্রজারা অনেকে পালিয়ে পাশের লাটে গিয়ে বাস করেছে। প্রজারা দরবার করতে এলে তাদের কথা কেউ শোনে

না, সদর কাছারীতেই তারা ঢুকতে পায় না, বাইরে থেকে কেঁদে চলে যায়। নায়েবের উপর বিশ্বাসই হয়েছে যত অনিষ্টের মূল। যদি সপ্তাহ সপ্তাহ, মাস মাস হিসেব দেখা হয়, প্রতি চিঠি পত্তর নিজে দেখা হয়, দু' তিন মাস অন্তর—অন্ততঃ বছরে দু'বারও—যদি সব লাট তদারক করা হয়, তা হলে জমিদারীর কত উন্নতি হয়!'

'এতদিন যেমন হিসেব নিকেশ চলে আসছে, তা হলে ও সব কোনও কাজের নয়?'

'কোনও কাজের নয়, এমন কথা বলছি না। তবে এখনকার কালের মত হিসেব নিকেশ রাখলে বেশী সুবিধে হয় তাতে সন্দেহ নেই। এই দেখুন না, আমি প্রত্যেক দিনের হিসাব রাখবার একটা নিয়ম তৈরী করছি, এটা—' বলিয়া কান্তিকুমার একটা কাগজ তাহার পিতামহের হাতে দিল। বৃদ্ধ গুপিনাথ সেটা না দেখিয়াই টানিয়া দূরে ফেলিয়া দিয়া গম্ভীর ভাবে বসিয়া মুহুর্মুহু আলবোলার নল টানিতে লাগিলেন।

কান্তিকুমার এইবার যথার্থ ক্রুদ্ধ হইল। সে অনেক পরিশ্রম করিয়া তাহার বিদ্যাবুদ্ধি মত যে হিসাবের পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়াছিল তাহা সে নিঃস্বার্থভাবে জমিদারীর উন্নতির জন্যই করিয়াছিল; কিন্তু ঐ পরিশ্রম-সঞ্জাত হিসাব-পদ্ধতি দাদামহাশয় ত দেখিলেনই না, পরন্তু না দেখিয়া ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। অভিমানে ক্রোধে তাহার হৃদয় ভরিয়া উঠিল। সে দাঁড়াইয়া উঠিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিল, 'তা হলে আপনি কোনও উন্নতিই চান না?'

বৃদ্ধ গম্ভীর স্বরে বলিলেন, 'না, চাই না। বার বার ঐ কথাই ত' বলছি। তোমার উন্নতি নিয়ে তুমি থাক গে, আমার এতকাল ও সকল কলেজি বিদ্যের উন্নতির দরকার হয় নি।'

কান্তিকুমার আহত হইয়া সমান ওজনে বলিল, 'দরকার হবে কি করে? দরকার বুঝতে পারলে ত!'

'কি, যত বড় মুখ তত বড় কথা! আমি বুঝতে পারি নি, আমার বুদ্ধি নেই? পাজী, ছুঁচো ছোঁড়া কোথাকার—'

'আমায় গালই দিন আর যাই করুন, যে ভাবে জমিদারী চালান হচ্ছে, আমাদের প্রজারা যে ভাবে রয়েছে,—তা আমাদের লজ্জার কথা। গরু বাছুরেও অমন সব কুঁড়েতে থাকে না।'

'বেশ করবে থাকবে। আমার প্রজাদের আমি যেমন ভাবে রাখবো তেমনই ভাবে থাকবে, তুই কথা কবার কে?'

'পাঁচ শ বার কইবো। শুধু কইবো না, এবার যে দিন দেখবো করালী কি তার লোক জন প্রজাদের উপর অত্যাচার করছে, তা হলে—'

কথা শেষ হইল না, বৃদ্ধ একেবারে পাগলের মত দুই চক্ষু পাকাইয়া হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন, 'দূর হ, এখনই কাছারী থেকে বেরিয়ে যা—আমার বাড়ী থেকে দূর—'

'দাদা, দাদা, কি বলছেন, আমি—'

'কোনও কথা শুনতে চাই নি, এখনই দূর হয়ে যা, এত বড় স্পর্দ্ধা, কলেজে পড়ে এত তেজ, আমায় বলে কি না, পাজী রাস্কেল—' বৃদ্ধের মুখ হইতে ফেণ নির্গত হইল, বৃদ্ধ হাঁপাইতে লাগিলেন। এ অবস্থায় বাগ বিতণ্ডা করা বৃথা দেখিয়া কান্তিকুমার ধীরে ধীরে কাছারী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

৩

যখন কাছারী-বাড়ীতে এই কাণ্ড হইতেছিল, তখন যদি কেহ একবার বিল-বৌলির বিলের পুকুরের পার্শ্বে উপস্থিত হইত এবং অনতিদূরে দীননাথ গোয়া-লার কুঁড়ে ঘরখানির দিকে দৃষ্টিপাত করিত, তাহা হইলে আর একটী অভাবনীয় কাণ্ড দেখিয়া অবাক হইয়া যাইত। দীননাথের কুটীরে মড়াকান্না উঠিয়াছে, তাহার শয্যাবস্ত্র ও তৈজসপত্রাদি যৎসামান্য যাহা কিছু ছিল, তাহা কতক কুটীরের অঙ্গনে, কতক বা বাহিরের রাজপথের ধূলায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, চারি পাঁচটা কালান্তক যমের মত বেলদার ঘরের জিনিষ পত্র—এমন কি শীল নোড়া, হাঁড়ি কুঁড়ি—ইত্যাদি টান মারিয়া বাহিরে ফেলিয়া দিতেছে, স্বয়ং করালীচরণ পরম পুলকিত ও সন্তুষ্ট চিত্তে দাঁড়াইয়া হুকুম দিতেছে, দীনু গোয়ালার স্ত্রী ও কন্যা কাঁদিয়া অঙ্গনে মাথা কুটিয়া দয়া ভিক্ষা করিতেছে,—আর জমি-দারের ভয়ে ভীত প্রতিবেশী জনকয়েক প্রজা দূরে গাছের আড়ালে দাঁড়াইয়া সভয়ে এই কাণ্ড প্রত্যক্ষ করিতেছে।

জমিদারের বাড়ী হইতে বিলবৌলি এক পোয়া পথের মধ্যে অবস্থিত—বস্তুতঃ বিলবৌলির বিলের পুকুরটা জমিদারের খাসের বলিয়া কান্তিকুমার প্রায় তথায় মাছ ধরিতে যাইত—অথচ স্বয়ং জমিদার বাবু বিলবৌলির অস্তিত্ব অবগত ছিলেন কি না সন্দেহ। তিনি তথায় যাইতে হইলে গাড়ী পালকী ভিন্ন যাইতেন না, প্রজাদের কাহাকেও চিনিতেন না,—তাঁহার ধারণা ছিল, এ সকল কর্ত্তব্য নায়েব গোমস্তার, জমিদার স্বয়ং উহা করিলে জমিদারের বহুকাল সঞ্চিত মানের পুঁজি খোয়া যাইবে। জমিদার প্রায় তাঁহার কলিকাতার প্রাসাদতুল্য ভবনে

বাস করিতেন, তবে ইদানীন্তন মাঝে মাঝে স্বগ্রামের পিতৃপিতামহের ভবনে আসিয়া দুই এক মাস কালক্ষেপ করিতেন। ইহাও কান্তিকুমারের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে করিতে হইয়াছিল। এবার কান্তিকুমার কলেজের পড়া সাঙ্গ করিয়া বেশী দিন দেশে বাস করিবার জন্য জিদ ধরিল, কাজেই অনিচ্ছা সত্ত্বেও বৃদ্ধকে গ্রামে থাকিতে হইল। অবশ্য সহরের ভোগবিলাসের অভাব যে তাঁহাকে অহরহঃ মনঃপীড়া দিতে লাগিল, তাহা বলাই বাহুল্য।

যখন ধূর্ত্ত নায়েব করালীচরণ দেখিল, সে মিথ্যা নালিশে মনিবের মন বিগড়াইয়া দিতে সমর্থ হইয়াছে এবং যখন সে স্বচক্ষে দেখিল কান্তিকুমার বৃদ্ধ জমিদারের সহিত কাছারী-ঘরে কথাবার্ত্তা কহিতেছে, তখন সে নিশ্চিন্ত মনে দীননাথের সর্ব্বনাশ সাধন করিতে গেল। করালীচরণের রাগের মূল কারণ এই যে, সে গরীব দীননাথের বিধবা কন্যা সুরাজির নিকট বার বার কু-প্রস্তাব করিয়াও সফলমনোরথ হইতে পারে নাই। ছোটলোক বেটাদের একবার স্পর্দ্ধা দেখ! আমি বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, তাহাতে জমিদারের নায়েব, আমার পা পূজো করতে পেলে তো বেটাদের ঊর্দ্ধতন চৌদ্দ পুরুষ স্বর্গে যায়, আমি যেচে প্রস্তাব করলুম, তা বলে কি না, 'ঠাকুর, আমরা গরীব, আমাদের ধর্ম্মই বড়!' আ মোলো, আবার বেশী পীড়াপীড়ি করলে বলে কি না, 'ঠাকুর, তোমারও মা বোন আছে ত! তোমার মেয়ে যে আমি!' রাম! রাম! রাধাকৃষ্ণ! শুওরবেটী গয়লার মেয়ে, আস্পর্দ্ধাটা দেখ! আমার মেয়ে তুই বেটী গয়লানী? তবে তুই ছোটলোক গয়লা হলি কেন, আর ভগবান আমায় জাতে শ্রেষ্ঠ বামুন করলেন কেন? করালীচরণের মনে এ রাগ তুষের আগুনের মত ধীকি ধীকি জ্বলিতেছিল। মেয়েটাকে এই বেলা হাত করতে না পারলে সে আর মাসে শ্বশুরবাড়ী চলিয়া যাইবে। কিন্তু এ দিকে ঐ হুঁদে ছোঁড়া কান্তেটা বড় গোলমাল বাধিয়েছে। ও ছোঁড়া দীনে গয়লার দিক নেয় কেন? নিশ্চয়ই ছুঁড়িটার চোখ দুটো দেখে মজেছে, না হলে দিন নেই ক্ষণ নেই, কেবল বিলের পুকুরে ছিপ হাতে বসে আছে! হুঁ, হু, তবে, এই বেলা দীনে বেটাকে ঠাণ্ডা করাই ভাল, ছুঁড়িটা থাকতে থাকতে দেখুক যে কর্ত্তা কে, আমি না ঐ ছোঁড়া। আরে জমিদার ত আমার মুঠোর ভিতর, ছোঁড়া কি করবে।

মনে মনে এই সংকল্প আঁটিয়া আর জমিদারের নিকট ঢালা হুকুম লইয়া করালীচরণ পূর্ব্বাহ্নে প্রস্তুত হইয়াছিল। যেমন দেখিল, জমিদারে ও নাতিতে বচসা চলিয়াছে, অমনি সে সদলবলে দীননাথের কুটীরে উপস্থিত হইল এবং

দীননাথের স্ত্রী ও কন্যার কাতর ক্রন্দন সত্ত্বেও তাহাদের দ্রব্যাদি চারি দিকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিতে লাগিল। যখন বেলদারেরা এই বীরোচিত কার্য্যে নিযুক্ত, তখন করালী সুরাজিকে এক পার্শ্বে ডাকিয়া লইয়া চুপি চুপি বলিল, 'কেমন দেখলি ত, কেউ তোদের রক্ষা করবার আছে? এখনও রাজী হ, তোদের যেমন ছিল তেমনই সব থাকবে, আরও সোনাদানায় মুড়ে দেব, না হলে আজই গাছতলায় দাঁড়াতে হবে।'

সুরাজি ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল, 'নায়েব বাবু, তুমি আমাদের মা বাপ, তুমি রক্ষা না করলে কে করবে? দোহাই বাবু, দু'টী পায়ে পড়ি, আজ তাড়িও না, বাবা বিছানায় পড়ে, বাবা সেরে উঠলেই আমরা ঘর ছেড়ে চলে যাব—'

নায়েব রাগিয়া বলিল, 'নে, নে, ও সব বজ্জাতি রাখ, যা বললুম তার জবাব দিলি নি। বুঝি নি বুঝি কিছু, উঁচু দিকে নজর মারছিস, সব জানি, জমিদারের নাতি—'

সুরাজি সরোষে বলিল, 'ছিঃ ছিঃ, অমন কথা বোলো না ঠাকুর, জিব খসে যাবে। তিনি যে দেবতা, আমাদের গরীব দুঃখীর মা বাপ—'

করালী মহা ক্রুদ্ধ হইয়া ব্যঙ্গের সুরে বলিল, 'মা বাপ, না তোর না—'

কথা শেষ করিতে হইল না, 'তবে রে হারামজাদা' বলিয়া এক জন লোক দাওয়ার উপর হইতে তাহার ঘাড়ের উপর লাফাইয়া পড়িল। অতর্কিত ভাবে আক্রান্ত হইয়া করালী আক্রমণকারীকে লইয়া ভূতলশায়ী হইল। আক্রমণকারী দীননাথ। ব্যাপারটা এই। দীননাথ রক্তামাশয় ও জ্বরে অবসন্ন হইয়া ঘরে কাঁথা মুড়ি দিয়া পড়িয়াছিল। করালী সুরাজীকে লইয়া তাহারই ঘরের দাওয়ার নীচে দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছিল। দীননাথ দাওয়ায় আসিয়া কাঁথা মুড়ি দিয়া বসিয়া সকল কথাই শুনিয়াছিল। শেষে রাগে জ্ঞানহারা হইয়া সেই দুর্ব্বল শরীরেই কাঁথা মুড়ি দেওয়া অবস্থাতেই দাওয়ার উপর হইতে তাহার ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িল। বেলদারেরা ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে ঘাড় ধরিয়া দাঁড় করাইল এবং করালীর সঙ্কেতে তাহার সেই রোগগ্রস্ত দুর্ব্বল শরীরের উপরে চড় লাথি কিল ইত্যাদি বর্ষণ করিতে লাগিল, সুরাজী ও তাহার মা দীননাথকে ছাড়াইয়া লইবার নিমিত্ত বেলদারদের সঙ্গে টানাটানি করিতে লাগিল, প্রতিবেশীরা মরিয়া হইয়া এই সময়ে অঙ্গনে ঢুকিয়া পড়িল, একটা খুনোখুনি কাণ্ড ঘটিবার উপক্রম হইল।

ঠিক এই সময়ে এক জন লোক ভিড় ঠেলিয়া অঙ্গনে প্রবেশ করিল। সে কান্তিকুমার। সে অঙ্গনে প্রবেশ করিবামাত্র প্রজারা এক বাক্যে সানন্দে সোৎসাহে চীৎকার করিয়া উঠিল, 'এই যে ছোটবাবু, দেখুন বাবু একবার অত্যাচার, এমন করলে আমরা টিঁকি কি করে। আমাদের চাল কেটে বাস তুলে নিয়ে যেতে হবে এখান থেকে।'

ছোটবাবুর দুই চারিটী ঘুসি ও লাথি খাইয়া বেলদারেরা হতভাগ্য দীননাথকে ছাড়িয়া দিয়াছিল। দীননাথ মুমূর্ষুবৎ অঙ্গনে পড়িয়া গোঁ গোঁ করিতেছিল, প্রহারের চোটে তাহার মুখ দিয়া ভলকে ভলকে রক্ত উঠিতেছিল, দীননাথের স্ত্রী ও কন্যা ছুটিয়া আসিয়া তাহার পায়ের উপর আছাড়িয়া পড়িয়া ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল, প্রতিবেশীরা দীননাথকে ধরিয়া তুলিয়া বসাইয়া মুখে চোখে জল দিতে লাগিল।

কান্তিকুমার মুহূর্ত্তকাল একবার সমস্ত অবস্থাটা দেখিয়া লইয়া জলদগম্ভীর-কণ্ঠে বলিল, 'এ সব কি হচ্ছে, করালী বাবু?' করালীর মুখ শুকাইয়া গিয়াছিল। সে আমতা আমতা করিয়া ঠোঁট ভিজাইয়া লইয়া বলিল, 'আজ্ঞে, দীনে বেটা খাজনা দেয় না, খাজনা আদায় করতে এসেছিলুম ব'লে ওপরচড়া হয়ে মারতে এলো, এই সব হারামজাদা বদমায়েস প্রজারা ওর হয়ে মারামারি করতে এসেছে, এখন যা হয় বিচার করুন, আপনারাই মা বাপ।'

তখন চারি দিক হইতে তাহার কথার প্রতিবাদ করিয়া নানা অভিযোগ উপস্থিত হইল, সে গোলযোগে কাহারও কথা ভাল করিয়া বুঝা যায় না। কান্তিকুমার করালীকে লক্ষ্য করিয়া আবার বলিল, 'তা যেন বুঝলুম, কিন্তু দীনু শয্যাগত ছিল, সে এখানে এল কি ক'রে?'

করালীচরণ আপনার কথা বলিয়া যাইতে লাগিল। দীননাথ এতক্ষণে প্রকৃতিস্থ হইয়াছিল, সে করালীর কথার উপরেই বলিল, 'ঠাকুর, বামুনের ছেলে হয়ে এত মিথ্যে বল? হুজুর, আপনারা গরীবের মা বাপ, ওর একটা কথা বিশ্বেস করবেন না, নায়েব মশাই খাজনা আদায় করতে আসে নি, এসেছিল এই গরীবের মেয়েকে—'

করালী লাফাইয়া উঠিয়া দীননাথের হাত ধরিয়া একটা ঝাঁকার দিয়া বলিল, 'দেখ, মিথ্যে বলিসনি বলছি, জিভ খসে পড়বে। বামুনের নামে মিথ্যে? এখনও চন্দ্র স্যয্যি উঠছে জানিস?'

তাহার কথা শেষ হইল না, কান্তিকুমার তাহার ঘাড় ধরিয়া দীননাথের

নিকট হইতে দূরে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বলিল, 'করালী আমি সব বুঝিছি ; ছিঃ ছিঃ ছিঃ, তুমি না বামুণ, তোমার এই কাজ? যাও আজ থেকে তোমায় ছাড়িয়ে দিলুম, তোমার পাওনা চুকিয়ে নিয়ে চলে যেও, আমার এলাকায় আর পা দিও না। এই গরীব প্রজা—'

করালীচরণ কৃত্রিম ক্রন্দনের সুরে বলিল, 'তা ত বলবেনই বাবু। বলে, যার জন্যে চুরী করি সেই বলে চোর! আমার কি, আমার ত আর জমিদারী না। ঘোর কলিকাল!'

কান্তিকুমার উত্তরোত্তর অসন্তুষ্ট হইয়া বলিল; 'আচ্ছা, আচ্ছা, তুমি যাও।'

করালী প্রজাদের সম্মুখে নিতান্ত অপমানিত বোধ করিয়া একটু ক্রুদ্ধস্বরে বলিল, 'বেশ, যাচ্ছি আমি। কলির বিচার বটে। আমার কথাটা বিশ্বেস হ'ল না, বিশ্বেস হ'ল ঐ গয়লা ছুঁড়ির কথা। গন্তানি বেটী যাদু করেছে বাবুকে, ঠাটখানা আছে কি না—'

কান্তির চোখ দু'টী ধক ধক জ্বলিয়া উঠিল. সে আবার করালীর ঘাড় ধরিয়া শূন্যে তুলিল, নিঃশ্বাসের উপর নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'যাও। না হলে বামুণ বলে মানব না।'

করালী কাঁদিয়া বলিল, 'এঁ্যা, মারলে, আমায় সত্যি সত্যি মারলে ছোট বাবু? বামুণের গায় হাত তুললে?'

কান্তি বিরক্ত হইয়া বলিল, 'হাঁ, হাঁ, মেরেছি। তোমার মত বামুণের গায় হাত তুলে যদি আমার কিছু পাপ হয়ে থাকে, তা আমি মাথায় পেতে নিয়েছি। এখন দূর হও।'

করালী বলিল, 'আচ্ছা, আচ্ছা, যাচ্ছি বড়বাবুর কাছে, দেখি এর বিচার আছে কি না।' করালী এই কথা বলিয়া যেমন অঙ্গনের বাহিরে যাইবে; অমনই দেখিল, দ্বারপথে দাঁড়াইয়া স্বয়ং বড়বাবু! বিস্ময়ে তাঁহার চক্ষু বিস্ফারিত হইল। এ কি হইল! পৃথিবীটা কি উল্‌টিয়া গেল! এমন অভাবনীয় কাণ্ড, বড়বাবু আজ স্বয়ং প্রজার ঘরে!

৪

জমিদার গুপিনাথ বাবু কান্তিকুমারকে ক্রোধের বশে তাড়াইয়া দিয়া সুস্থির রহিলেন না। এই পিতৃহীন পৌত্রটী তাঁহার নয়নের তারা স্বরূপ ছিল। বাহ্যে জমিদার বাবু গম্ভীর প্রকৃতির হইলেও তাঁহার মনের মধ্যে পৌত্রস্নেহের ফল্গুস্রোত সদাই প্রচ্ছন্ন ভাবে প্রবাহিত হইত। সুতরাং কিছুক্ষণ গম্ভীর হইয়া বসিয়া

থাকিবার পর অভিমানী কান্তিকুমার কোথায় গেল এই ভাবনায় তিনি অস্থির হইয়া উঠিলেন। কান্তিকুমার অন্য দিকে যাহাই হউক—আজকালকার ছাই ইংরাজী লেখাপড়া শিখিতে দেওয়ার এই ফল—সে ধীর স্থির শান্ত বাধ্য সুবোধ ছেলে। কিন্তু সে বংশের ধারা পাইয়াছিল; অন্যায় বলিয়া যাহা মনে করিত তাহা হইতে দেখিলে সে ক্রোধে জ্ঞানহারা হইত; তাহার আর একটা দোষ ছিল, সে বড় অভিমানী। এক্ষেত্রে তাহার ক্রোধের কারণ ছিল; অথচ ক্রোধের কারণ সত্ত্বেও মিথ্যা তিরস্কৃত হইয়া সে গৃহত্যাগ করিবার আদেশ পাইয়াছে, যদি সে সেই অভিমানে যথার্থই দেশত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়!

বৃদ্ধের প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিল; কিন্তু তাহা বলিয়া জমিদারী-সংক্রান্ত কার্য্যে পৌত্রের অনধিকার ও অন্যায় চর্চ্চা তিনি সমর্থন করিতে পারেন না। এতকাল চলিয়া আসিয়াছে যে নিয়মে, আজ এই অপোগণ্ড শিশুটা দু'পাতা ইংরাজী পড়িয়া বলে কি না তাহা পরিবর্ত্তন করিতে! বাপ পিতামহ যাহা এযাবৎ করিয়া আসিয়াছেন, তাহা বলে কি না উল্টাইয়া দিতে! স্পর্দ্ধা ত কম নয়!

কি করি, কোন্ পথে যাই! বৃদ্ধের প্রাণ সংশয়-দোলায় আন্দোলিত হইয়া উঠিল। শেষে বৃদ্ধ স্থির করিলেন, একবার গাড়ী জুতিয়া গ্রামটা বেড়াইয়া আসি। জানিতে দেওয়া হইবে না যে, তাহাকে খুঁজিতে বাহির হইয়াছি, অথচ বেড়াইবার নাম করিয়া খোঁজাও হইবে। এমন ত গাড়ী চড়িয়া বেড়ান হইয়া থাকে।

সংকল্প স্থির হইলে গুপিনাথ বাবু গাড়ী প্রস্তুত করিয়া বেড়াইতে বাহির হইলেন। নদীর পথে অগ্রসর হইয়া কিছু দূর যাইবামাত্র বিলবৌলির বিলের পুকুরের সান্নিধ্যে অবস্থিত এক প্রজার ঘরে মহা হাঙ্গামার লক্ষণ দেখিয়া কর্ত্তা-বাবু গাড়ী থামাইয়া পদব্রজে সেই পর্ণশালার দিকে চলিলেন। তাঁহাকে আজ হাঁটিতে দেখিয়া সইস কোচম্যান বিস্মিত হইল। একজন বেহারার বাবুর পশ্চাতে শরীর-রক্ষীর ন্যায় চলিল।

দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া জমিদার বাবু সমস্ত ঘটনা প্রত্যক্ষ করিলেন। শেষের কথাগুলিও তাঁহার কর্ণগোচর হইল। করালীচরণ যখন ক্রোধভরে তাঁহার নিকট নালিশ করিব বলিয়া অঙ্গন হইতে গৃহের বাহির হইয়া আসিতেছিল, তখন তিনি অঙ্গুলি সঙ্কেতে তাহাকে দাঁড়াইতে বলিয়া অঙ্গনে প্রবেশ করিলেন।

তাঁহাকে দেখিয়া উপস্থিত জনমণ্ডলীর কি ভাব হইল, তাহা তাহাদের অন্তর্য্যামী ব্যতীত কেহ বলিতে পারে না। কি ভাবে তিনি আসিয়াছেন তাহা তাহারা জানে না, অথচ তিনি প্রজার মা বাপ, আজ যদি অভাবনীয় রূপে তিনি প্রজার ঘরে এমন করিয়া দেখা দিয়াছেন, তাহা হইলে তাহাদের এতকালের আবেদন নিবেদন তিনি নিশ্চয়ই শুনিতে আসিয়াছেন। তখন দরিদ্র প্রজা-মণ্ডলী তাঁহার সম্মুখে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া আপনাদের দুঃখের কাহিনী বলিয়া যাইতে লাগিল। দীননাথের কথা কহিবার সামর্থ্য ছিল না, কিন্তু তাহার স্ত্রী কন্যা দরবিগলিত ধারে কাঁদিয়া তাহাদের উপর অত্যাচারের কথা বিবৃত করিল।

জমীদার নীরবে সেই হাটের হট্টগোল শুনিয়া যাইতে লাগিলেন। তাঁহার মুখের ভাব দেখিয়া তাঁহার অন্তরের কথা কিছুই বুঝা গেল না। সকলের কথা সাঙ্গ হইলে জমীদার কাহারও কথার জবাব না দিয়া সরাসর পৌত্রের মুখপানে তাকাইয়া বলিলেন, 'তুমি আমার নায়েবের কার্য্যে বাধা দিয়েছ?'

কান্তিকুমার নির্ভীক চিত্তে স্পষ্ট স্বরে উত্তর দিল, 'হাঁ, দিয়েছি।'

কর্ত্তা গম্ভীর স্বরে বলিলেন, 'কেন দিয়েছ? কি অধিকারে দিয়েছ?'

কান্তিকুমার এবারও দৃঢ় কণ্ঠে বলিল, 'মানুষের ন্যায় অন্যায় বিচার করবার যে স্বাভাবিক অধিকার আছে, সেই অধিকারের বলে দিয়েছি। এতে আমার অপরাধ হয়ে থাকে, তার শাস্তি আমি বহন করতে প্রস্তুত। কিন্তু এই দরিদ্র প্রজাদের কথা শুনুন, ওদের বিষয়ে সুবিচার করুন, আপনি ওদের রক্ষাকর্ত্তা, ভয়ত্রাতা, প্রতিপালক বাপ মা।'

'সে উপদেশ তোমার কাছে যখন নেবার আবশ্যক হবে তখন নেওয়া যাবে। এখন জবাব দাও, তুমি আমার নায়েবের গায়ে হাত তুলেছ কেন?'

কান্তিকুমারের স্বভাবতঃ শান্ত আনন কঠিন আকার ধারণ করিল, প্রতিভাদীপ্ত নয়ন দুইটী ধক্ ধক্ জ্বলিয়া উঠিল, সে গম্ভীর স্বরে বলিল, 'হাত তুলিবার প্রয়োজন হয়েছিল বলে তুলেছি, আবার প্রয়োজন হলে তুলবো। আরও বলছি শুনুন, এই গরীব গৃহস্থকে বে-ইজ্জৎ করবার চেষ্টা করেও নায়েব ক্ষান্ত হয় নি, এর যথাসর্ব্বস্ব ভেঙ্গে চুরে ক্ষতি করেছে, সে ক্ষতিপূরণ যত দিন না করবে তত দিন ওকে ছাড়বো না, ওর কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ করিয়ে নিতে যদি দাঙ্গা হাঙ্গামা করতে হয় তাও করব, জেলে যেতে হয় তাও যাব।'

কান্তিকুমার এই কথা বলিয়া গৃহের বাহিরে চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে

জমীদার গুপিনাথ তাহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, 'আমার এলাকায় আমিই প্রভু, তুমি নও। তুমি জমীদারের লোককে তাদের কর্ত্তব্যে বাধা দিয়েছ, জমীদারের নায়েবের অঙ্গে হস্তক্ষেপ করেছ। শুধু তাই নয়, তুমি মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে সরকারের প্রজাকে মার ধর করবে বলে শাসিয়েছ। তোমাকে আমি আপাততঃ কাছারী-বাড়ীতে আটক করলুম, আমি অনারারি মাজিষ্ট্রেট জান ত। তার পর তোমার নিকট এক বৎসর কালের জন্য শান্ত থাকবার মুচলেকা লিখিয়ে নিয়ে ছেড়ে দিব কি না, বিবেচনা করব। যাও বেলদার, বাবুকে কাছারী-বাড়ী পৌছে দিয়ে এস। আমি কাছারী না যাওয়া পর্য্যন্ত সেখান থেকে ছেড়ে দেবে না।'

কান্তিকুমার কিছুমাত্র প্রতিবাদ না করিয়া চলিয়া গেল। বেলদার সঙ্গে যাইতেছিল, গুপিনাথ বাবু ইঙ্গিতে তাহাকে যাইতে নিষেধ করিলেন। করালী-চরণের হাসি ধরে না, কিন্তু তাহার কাণ্ডকারখানা দেখিয়া প্রজামণ্ডলী ভয়ে বিস্ময়ে অভিভূত হইল। কান্তিকুমার চলিয়া গেলে পর তিনি করালীচরণকে কাছে ডাকিয়া জলদগম্ভীর নাদে বলিলেন, 'এদের চালে খড় নাই যেমন, এমন আর কজন প্রজার নেই বল্‌তে পার ?'

করালী বলিল, 'আজ্ঞে, সকলকারই আছে, কেবল ও বেটা হাবাতে বলে নেই।'

'জমীদার বলিলেন, 'বটে। চল ত একবার গাঁ-টা ঘুরে আসা যাক। আচ্ছা, বিলের জল নিকেশের বাক্স বসান হয়েছে, তবুও বিলের জলে পুকুরের জলে একসা কেন ? ঐ বিলের জমীতেই বা চাষ হয় নি কেন ?'

করালীর মুখ শুকাইল, সে বলিল, 'আজ্ঞে, এবার বর্ষাটা নাবি হওয়াতে জল দাঁড়িয়েছে, ও জল শীগ্‌গীর সরে যাবে।'

জমীদার বলিলেন, 'যাবে ত ? দেখ, ওতে অনেক খরচ করিয়েছ। চল, যাওয়া যাক। হাঁ দেখ, ভাল কথা, এদের কি দেনা হয়েছে, যার জন্যে এদের বাড়ী চড়াও হয়েছিলে ? যাক, ও সব কথা কাছারীতেই হবে'খন। এখন যাও।'

করালীচরণ আমতা আমতা করিতে করিতে গৃহের বাহিরে গেল। জমী-দারের ইঙ্গিতে অন্যান্য প্রজারাও চলিয়া গেল। তখন জমীদার অঙ্গনে নিপতিত আহত দীননাথের দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'হাঁ রে, তোর কি বড় লেগেছে ? কি নাম তোর ? দীননাথ ? আহা, তোর বড় কষ্ট, না ? হাঁ মা, (দীন-

নাথের স্ত্রী কন্যার প্রতি) তোদের হাঁড়ি কুঁড়ি সব গেল ত! আহা হা, তোদের এমন সর্ব্বনাশও করে! তা তোরা সময়ে খাজনা দিস নি কেন?'

তখন দীননাথের পত্নী হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া তাঁহার পায়ে মাথা কুটিয়া তাহাদের দুঃখের কাহিনী বিবৃত করিল। সকল কথা না বুঝিলেও জমীদার সুরাজীর নিকট নায়েবের কু-প্রস্তাবের কথাটা বুঝিলেন। গম্ভীর ভাবে বলিলেন, 'থাক মা, ও সব নালিশ করিস নি, ওর প্রমাণ দিতে ত পারবি নি। তবে আমি সব বুঝিছি, তোদের আর কোনও কষ্ট হবে না। ঠিক কাজ করে যাস, ঠিক সময়ে খাজনা দিস, তোদের কেউ কিছু বলবে না। এই নে, তোদের জিনিস পত্র নষ্ট হয়েছে কিনে নিস মা।' এই কথা বলিয়া জমীদার চলিয়া গেলেন। সুরাজী শপথ করিয়া বলিতে পারে, যাত্রাকালে তাঁহার চোখে কে জল দেখিয়াছিল। সুরাজীর জননীর কিন্তু সে দিকে হুঁস ছিল না, সে তখন দুই খানা দশ টাকার নোট আঁচলে বাঁধিতেছিল।

৫

কান্তিকুমারের জননীর জমীদারের বৈঠকখানায় ডাক পড়িয়াছে। তিনি ত ভয়েই আকুল। না জানি দুরন্ত কান্তি আজ কি কাণ্ডই বাধাইয়াছে! কান্তির কোনও কুকীর্ত্তির কথা না জানাইবার হইলে ত তাঁহার হঠাৎ বৈঠকখানায় কর্ত্তাবাবুর কাছে ডাক পড়ে না।

বধূমাতা সদরে আসিয়াই সভয়ে দেখিলেন, তাঁহার শ্বশুর অভ্যাস মত ফরাসের উপর না বসিয়া কক্ষমধ্যে পাদচারণা করিয়া বেড়াইতেছেন। কোনও একটা গভীর উত্তেজনার কারণ না হইলে তিনি ত এমন করেন না!

তাঁহার পা আর চলে না। দুই এক পা করিয়া অগ্রসর হইয়া তিনি ভীতিকম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আমায় ডেকেছেন কি বাবা?'

গুপিনাথ কি একটা বিষয়ে ভাবিতেছিলেন, হঠাৎ তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন। পরে বলিলেন, 'হাঁ, ডেকেছি। শুনেছ মা, আমি তোমার ছেলেকে কয়েদ করেছি?'

কান্তির জননী উদ্বিগ্ন চিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি বললেন, কয়েদ করেছেন?' কথাটা তাঁহার বিশ্বাস করিতেই প্রবৃত্তি হইল না। অসম্ভব, পিতামহ পৌত্রকে—একমাত্র বংশের নন্দনকে—কয়েদ করিবেন, ইহা হইতেই পারে না।

'হাঁ, সত্য সত্যই তাকে কাছারী-বাড়ীতে আটক করেছি। এত বড় স্পর্দ্ধা, আমার উপর কলম চালায়? আমায় বলে কি না, জমীদারীর চাল চুল বদ-

শাতে; এক রত্তি ছোঁড়া সেদিন কোলে করে ঘুম পাড়িয়েছি। আমি জানি নি জমিদারী চালাতে, আমায় আসে শেখাতে।'

'বাবা, ছেলেমানুষ, ওর কি বুদ্ধি শুদ্ধি হয়েছে, ওর উপর রাগ করে কি—'

'রাগ করেছি? কে বলেছে মা তোমায় রাগ করেছি? আমার সোণার চাঁদ ছেলে, আমার বংশের গৌরব, তার উপর রাগ করব?'

বধূমাতা শ্বশুরের চোখে জল দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। তাঁহার শ্বশুরের কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ, ভাবাবেশে তিনি অভিভূত। বধূমাতা সাহস পাইয়া বলিলেন, 'বংশের গৌরব, তাই কি তাকে কয়েদ করেছেন?'

'করব না? দোষ যা করেছে, তার শাস্তি দেব না? কিন্তু তা বলে তার গুণের কথা বলব না? আঃ তুমি ত দেখনি মা, হনুমানটা কি করে গরীবের হয়ে আমার লোকজনের সঙ্গে লড়্‌লে! দীনু গোয়ালার কুঁড়ের বার হ'তে দেখেছি, সে কেমন করে বেলদারের লাঠী ছিনিয়ে নেয়, বদমায়েস নায়েবের ঘাড় ধরে দূরে ছুড়ে ফেলে দেয়, গরীবের চোখের জল মুছিয়ে দেয়। পাজিটা সে দিনের এই এতটুকু ছোঁড়া, কিন্তু গায়ে অসুরের বল। ভেবো না আমার নাতি বলে নায়েব বা বেলদারেরা তাকে রেহাই দিয়েছে। তারা তাকে জখম করবার ঢের চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তার কাছে কেউ এগুতে সাহস করে নি। বউ মা, তোমার ছেলে আমার মুখ উজ্জ্বল করেছে।'

বৃদ্ধের চক্ষু দিয়া আনন্দাশ্রু ঝরিয়া পড়িল, পুত্রের জননীর কি অবস্থা হইল, তাহা কি আর বলিয়া দিতে হইবে?

বৃদ্ধ আবার বলিতে লাগিলেন, 'বৌমা! এত দিন অন্ধ ছিলুম, আমার বংশের দুলাল আমার চোখ ফুটিয়ে দিয়েছে। জমীদার হ'লেই যে গদীয়ান হয়ে পৃথিবীর যত ভোগ বিলাস অকর্ম্ম কুকর্ম্মে গা ভাসান দিতে হয়, তার কোনও মানে নেই। মানুষের নিকট মানুষের যা প্রাপ্য, জমীদারের নিকটও প্রজার তাই প্রাপ্য। কেবল মুখে মা বাপ সেজে প্রজার সুখ দুঃখে উদাসীন হ'লে মানুষের কর্ত্তব্য পালন করা হয় না। অতি প্রাচীন কালে কি হ'ত জানি নি, কিন্তু আমাদের বাপ পিতামহের আমল থেকে শুনে আসছি 'দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ জমীদার, যার নামে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায়।' তা খেতে পারে, কিন্তু তার সঙ্গে প্রজার সুখ দুঃখের, অবস্থার উন্নতির সম্পর্ক কি?'

সজল নয়নে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বধূমাতা বলিলেন, 'তবে বাবা, তাকে আটক থেকে মুক্ত করে দিন—'

বৃদ্ধ বাধা দিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, 'বদমাসকে ছেড়ে দেব? কখনও না। আগে সে জরিমানা দিক, তার পর ছেড়ে দেব।'

'জরিমানা? কত টাকা? কিসের জরিমানা?'

'বাঃ, জরিমানা করব না? রাস্কেল আমার হুকুমের উপর হুকুম চালায়! তাকে ১০০৲ টাকা জরিমানা করেছি। কেন, সে তার জলপানির টাকা থেকে ১০০৲ টাকা দিতে পারে না, মাসে মাসে ত ১০০৲ টাকা করে পাচ্ছে।'

'ও মা, সে টাকা ও জমায় কি না! কোথায় কার মেয়ে ঘরে রাখা যায় না, বড় হ'য়ে উঠেছে, ছুটলো সেই মেয়ের বিয়ে দিতে; কোথায় কোন্ প্রজার ছেলের গরু মড়কে মরেছে, চললো তার গরু কিনে দিতে—'

'আর, আর, শুনেছ মা, বজ্জাতটা শেষ জলপানির টাকায় বাগ্দীপাড়ায় কূয়ো কাটতে দিয়েছে, ওখান থেকে বাগ্দী বৌ ঝির অনেক পথ ভেঙ্গে জল আনতে হয়। তা যাক গে, ওর জরিমানার টাকাটা আমার তবিল থেকেই দিয়ে দেব'খন। কি বল মা?'

'না বাবা, আদ্দেক আপনি দেবেন।'

'আর আদ্দেক?'

'আমি দিয়ে দোবো।'

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু।

নম্বুদ্রী।

আমাদের পাঠক পাঠিকার মধ্যে ভগবান শঙ্করাচার্য্যের নাম সকলেই শুনিয়াছেন। তিনি নম্বুদ্রী ব্রাহ্মণ ছিলেন। নম্বুদ্রীরা কেরল দেশবাসী বা মলায়ালী। মলয় শব্দের অর্থ পর্ব্বত ও পর্ব্বতবহুল দেশকে মলায়ালী দেশ বলে। আধুনিক ত্রিবঙ্কুর ও তাহার উত্তরে মাদ্রাস প্রদেশের দক্ষিণ মলাবার জেলা ও বম্বে প্রদেশের উত্তর মলাবার জেলা, এই কয়টী দেশের প্রাচীন নাম কেরল দেশ। উত্তর ভারতে যেমন 'পঞ্চগৌড়' নামক পাঁচ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ আছেন, দক্ষিণে সেইরূপ 'পঞ্চদ্রাবিড়';—মলায়ালী, তামিল, তেলুগু, কর্ণাট ও মহারাষ্ট্রীয়। ইহাদের মধ্যে মলায়ালীরা কখনও দেশ ছাড়িয়া বিদেশে গিয়া বাস করেন নাই; দেশেও চিরকাল হিন্দু রাজারা রাজত্ব করিয়াছেন। অতএব তাহাদের আচার ব্যবহার এখনও প্রাচীন কালের মতই আছে বা অতি অল্পই পরিবর্ত্তন হইয়াছে। মলা-

য়ালী ব্রাহ্মণেরা আপনাদের ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ বলিয়া গর্ব্ব করিয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে নম্বুদ্রীরা কেবল পূজা, পাঠ, অধ্যয়ন ও অধ্যাপন লইয়াই জীবন কাটায়, রাজকার্য্য বা ব্যবসা করা হেয় বিবেচনা করে। নম্বুদ্রী শব্দের নানা প্রকার অর্থ করা হইয়াছে, কিন্তু নম্বু = শুদ্ধ ও তিরি = সম্মানসূচক পদ অর্থই সম্ভব বলিয়া বোধ হয়। তাঁহারা বলেন তাঁহারা পূর্ব্বে অহিক্ষেত্রম্ নামক স্থানে বাস করিতেন, সে স্থান হইতে কুরুক্ষেত্রে আর্য্যপুরম্ নামক স্থানে আসেন। আর্য্যপুরম্ হইতে ত্রেতাযুগে পরশুরাম তাঁহাদের কেরল দেশে আনিয়া ৬৪ খানি গ্রাম দিয়া দেশের শাসন ভার দিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী কালে নর্ম্মদা, কৃষ্ণা ও কাবেরী তটবাসী ব্রাহ্মণেরাও ইহাঁদের সহিত কেরলে স্থান পাইয়াছিলেন।

নম্বুদ্রীরা সপ্ত শাখায় বিভক্ত। দেখিতে উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, উন্নত নাসিকা, দীর্ঘ চক্ষু। তাহাদের মধ্যে কৃষ্ণবর্ণ বা কুৎসিত লোক নাই বলিলেই চলে। তাহারা যে বুদ্ধিমান, সরল ও সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন, তাহা তাহাদের মুখ দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। তাহাদের আচার ব্যবহার অতি প্রাচীন কালের, অতএব আধুনিক বড় নগরে বাস করা তাহাদের পক্ষে অতি কষ্টকর। তাহারা লোকালয় হইতে অতি দূরে নির্জ্জন নদীতীরে বাস করিতে ভালবাসে। সেই নির্জ্জনে আপনার স্নান, ধ্যান, পূজা, পাঠ, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনে দিন কাটাইয়া দেয়। তাহাদের বসন ভূষণ অতি সাদাসিধা। একখানি দশহাতি সাদাধুতি ও একখানি অঙ্গবস্ত্রম (চাদর) হইলেই তাহাদের পরিচ্ছদ হইয়া যায়। যাহারা ধনী, তাহাদের ধুতির পাড়ে অল্প স্বর্ণ সূত্র দেখা যায়, নতুবা অন্য বিলাসিতা তাহাদের নাই। তাহারা বিলাতি বস্ত্র বা বহুমূল্য পট্টবস্ত্র ব্যবহার করে না। স্থানীয় গ্রামের তন্তুবায় তাহাদের বস্ত্র জোগায়। তাহাদের গৃহলক্ষ্মীরা এক খানি দশ হাতি শাদা ধুতি পাইলেই তুষ্ট। অন্যদেশবাসী রমণীদের মত কাঁচলী ইত্যাদি কথনও ব্যবহার করেন না। তাহাদের অবরোধ প্রথা অতি কঠোর। তাঁহারা বিশেষ প্রয়োজন না হইলে অন্তঃপুরের বাহিরে আসেন না। যখন আসেন তখন আপাদমস্তক একখানি মোটা চাদরে এমন জড়াইয়া আসেন যে, এক জন পথপ্রদর্শক সঙ্গে না থাকিলে মহাবিভ্রাট হয়। চাদর জড়াইয়া, তাহার উপর একটি গভীর ছাতা মাথায় দিয়া একটি নায়র স্ত্রী পথপ্রদর্শক সঙ্গে লইয়া বাহির হন। আমাদের দেশের অন্তপুরিকারা দেবমন্দিরে, স্নানের ঘাটে, বিবাহ বা অন্য ক্রিয়া-বাটীতে পর্দ্দা প্রথা অনেকটা শিথিল

করিয়া থাকেন, কিন্তু নম্বুদ্রীরা সে সকল অবস্থাতে কঠোরতা ত্যাগ করেন না। পুত্র যখন বিবাহ করিয়া বধূসহ দ্বারে উপস্থিত হয় তখন তাহাদের বরণ করিতেও পুত্রের মাতা দ্বার পর্য্যন্ত যাইতে পারেন না। তিনি এক জন নায়র স্ত্রীলোককে আপনার প্রতিনিধি করিয়া আপনার বসন ভূষণ দিয়া ঠিক আপনার মত সাজাইয়া পাঠাইয়া দেন। এমন কি, সে সময়ে অন্য লোকে বা সেই নায়র রমণীকে বরের মা বলিয়াই সম্বোধন করে, বরের আপন মাতা অন্দরের ঘরের প্রদীপ নিবাইয়া অন্ধকারে দূরে দাঁড়াইয়া সেই দৃশ্য দেখিয়া চক্ষু সার্থক করেন।

পুরুষদের ভূষণ মধ্যে অঙ্গুরীয় ও কটীদেশে একটি বা একাধিক মাদুলী। ইহা ছাড়া আর কোন ভূষণ বা অলঙ্কার নাই। রমণীরা গলায় তালী, কানে এক প্রকার মাকড়ী ও হাতে বালা ব্যবহার করেন। নাকে ছিদ্র করেন না, কোনও গহনাও নাই। সধবা, বিধবা উভয়ে দশহাতী পাড়হীন শাদা ধুতি পরেন। অধিকাংশ বিধবারা গহনা ত্যাগ করেন না। রমণীদের উলকী পরিতে নাই। দক্ষিণের অন্য জাতীয়া রমণীদের মত তাহারা হরিদ্রা বা কুঙ্কুম ব্যবহার করেন না। রমণীরা পুরুষদের আড়া-আড়ি রেখা মত তিলক ধারণ করেন। স্নানান্তে প্রায় চন্দনের একটি বা একাধিক টানিয়া দেন।

বসন ভূষণ।

নম্বুদ্রীদের প্রধান প্রধান সংস্কারগুলিতে প্রাচীন আর্য্যদের আভাস পাওয়া যায়। কেন না, তাহাদের পরিবর্ত্তন হয় নাই বা অতি অল্পই হইয়াছে। তাহাদের আচার ব্যবহার ও নিত্যকর্ম্মে ভিন্ন দেশীয় ও ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদের প্রভাব হয় নাই, তাহারা চিরকাল নির্জ্জনে বাস করিয়া আসিতেছে। তাহাদের প্রধান সংস্কারগুলি এইরূপ :—

সংস্কার।

১। জাতকর্ম্ম :—শিশুর জন্মের প্রায় ৩৬ ঘণ্টা পরে হয়। এই সময়ে পিতা শিশুর প্রথম মুখদর্শন করেন। পরে স্নানান্তে পিতৃপুরুষ ও বিশ্বদেবকে ফল মূল ইত্যাদি উৎসর্গ করিয়া যথাসাধ্য দান করেন।

২। নামকরণ :—শিশু বার দিনের হইলে তাহার নামকরণ করা হয়। পিতা, শিশুর দক্ষিণ কর্ণে তাহার যে নাম রাখা হইল ধীরে ধীরে উচ্চারণ করেন, পরে মাতাও ঐরূপ বলেন। পরে যথাসাধ্য দান।

৩। নিষ্ক্রমণ :—শিশু চার মাসের হইলে শুভ দিনে শুভ ক্ষণে পিতা কোলে করিয়া গৃহের বাহিরে কাঁটালগাছ তলায় গিয়া অল্পক্ষণ বসেন, পরে ফিরিয়া আসেন। ইহার পূর্ব্বে শিশুকে সদর দ্বারের বাহিরে আনা হয় না।

৪। অন্নপ্রাশন :—ছয় মাসের হইলে বন্ধু বান্ধবদের লইয়া গৃহদেবতার পূজা করিয়া অন্ন খাওয়ান হয়।

৫। মুণ্ডন :—তৃতীয় বা পঞ্চম বর্ষে মাথার চুল ক্ষৌর করিয়া দেওয়া হয়। বালক, বালিকা উভয়ের।

৬। বিদ্যারম্ভ :—প্রায় পঞ্চম বর্ষে হয়। বিদ্যারম্ভের পূর্ব্বে নয় দিবস সরস্বতীর ঘটস্থাপন করিয়া পূজা করিতে হয়। দশম দিবস (বিজয়া দশমী হইলে সর্ব্বোৎকৃষ্ট) শুভদিনে প্রথমে গণেশের পূজা করিয়া যথাসাধ্য দান করা হয়। পরে পিতা পুত্রকে কোলে করিয়া বসেন ও এক খণ্ড সোনা (প্রায়ই অঙ্গুরীয়) দিয়া বালকের দুই রগে প্রণব মন্ত্র লিখিয়া দেন ও বালকের জিহ্বার উপর অঙ্গুলি দিয়া লেখেন, "হরি, শ্রী, গণপত্যয়ে নমঃ" ও দুই কাণে প্রণব উচ্চারণ করেন। পরে আপনার সম্মুখে মেঝের উপর কিছু চাউল পাতিয়া লিখিবার স্থান করেন ও বালকের দক্ষিণ হস্তের অনামিকা ধরিয়া একে একে সকল অক্ষরগুলি লিখাইয়া দেন। পর দিবস হইতে গ্রাম্য পন্তলু বা গুরু মহাশয়ের কাছে প্রকৃত শিক্ষা আরম্ভ হয়।

৭। উপনয়ন :—প্রায় অষ্টম বর্ষে হয়। প্রথমে শিক্ষা-গুরুকে কিছু দক্ষিণা দিয়া তুষ্ট করিতে হয়। বঙ্গদেশে তিন বা পাঁচ দিনে উপনয়ন শেষ হইয়া যায়, কেবল মুণ্ডিত মস্তক ও গলায় পৈতা চিহ্ন থাকে, কিন্তু নম্বুদ্রীরা উপনয়নের সময়ে যে ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করে তাহা অন্ততঃ ছয় বৎসর কাল ছাড়ে না। অবশ্য বাঙ্গালীদের মত ঘরে দ্বার রুদ্ধ করিয়া থাকিতে হয় না, তবে ছয় বৎসর তাহাকে কৌপীন, কৃষ্ণাজিন, পলাশ দণ্ড ও কটিদেশে মুঞ্জা ধারণ করিয়া থাকিতে হয়। সে কোনও প্রকার গন্ধদ্রব্য (চন্দনও নহে) ধারণ করিতে পারে না, তৈল মাখিতে, ক্ষৌর করিতে, পান সুপারি খাইতে পায় না। জুতা, ছাতা, পরের বাটী অন্ন গ্রহণ, ও দিবা নিদ্রা নিষেধ। প্রত্যহ স্নান করিয়া সন্ধ্যা বন্দনা করিয়া গুরুর বাটী বাস করিয়া বেদ অধ্যয়ন করিতে হয়। গুরু যদি গ্রামে, নিকটেই থাকেন, তবে অনেকে দৈন ছাত্রের (day scholar) মত দিনে পাঠগ্রহণ করিয়া রাত্রে আপন বাটীতে থাকে। এই রূপে ছয় বৎসর বেদ অভ্যাস করিতে সকলে বাধ্য। যে সমস্ত বেদ ও বেদাঙ্গ শিক্ষা করিতে চাহে তাহাকে আরও দীর্ঘকাল থাকিতে হয়, কিন্তু ছয় বৎসরের পূর্ব্বে রোগে অক্ষম না হইলে ব্রহ্মচর্য্য ত্যাগ করিতে নাই।

৮। সমাবর্ত্তন :—ছয় বৎসর বা বেদ বেদাঙ্গ পাঠ শেষ হইলে শুভ দিনে

প্রাতে স্নান করিয়া সন্ধ্যাবন্দনার পর হোম করে, পরে ব্রাহ্মণমণ্ডলীর সম্মুখে গুরুকে ব্রহ্মচর্য্যের চিহ্নগুলি ফিরাইয়া দেয়। পরে ক্ষৌর করিয়া (উপনয়নের পর এই প্রথম) স্নান করিয়া ভাল বসন ভূষণ পরিয়া তিলক ধারণ করে। সমস্ত দিন ছায়াতে থাকিতে হয়, রৌদ্রে আসিতে নাই। সন্ধ্যার সময়ে চন্দ্র বা তারা দর্শন করিয়া গুরুর অনুমতি লইয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করে।

৯। বিবাহ :—বঙ্গদেশের বিবাহ প্রথার সহিত বিশেষ প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। নম্বুদ্রী ব্রাহ্মণের যতগুলি পুত্র হউক না কেন, কেবল মাত্র জ্যেষ্ঠ পুত্রের স্বঘরে, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ কন্যার সহিত বিবাহ সম্ভব, কেবল মাত্র জ্যেষ্ঠ পুত্রই বংশ রক্ষা করে। অন্য পুত্রেরা আইনের চক্ষে কেহ নহে। তাহারা ইচ্ছামত নায়র কন্যার সহিত "সম্বন্ধম্" করিয়া গৃহস্থালি পাতান। তাহাদের সন্তানেরা নায়র হয়, ব্রাহ্মণ হয় না। সম্বন্ধম করিবার জন্য কোষ্টি বিচার করা হয় বটে, কিন্তু ইহার কোনও প্রকার বাহ্যাড়ম্বর নাই। সম্বন্ধম করা স্ত্রী আইনের চক্ষে রক্ষিতা মাত্র, যখন ইচ্ছা ত্যাগ করা চলে কিন্তু কার্য্যতঃ কেহ কখন ত্যাগ করে না। ত্যাগ করিলে সন্তানগুলি মাতার ভাগে পড়ে। জ্যেষ্ঠ পুত্রের প্রথমা ভার্য্যার গর্ভে সন্তান না পুত্র না হইলে সে দ্বিতীয় বা তৃতীয় বার বিবাহ করিতে পারে, কিন্তু চতুর্থ বিবাহ হয় না। চতুর্থ বিবাহ করিলে তাহার গর্ভজাত পুত্র বিষয়ের উত্তরাধিকার পায় না। জ্যেষ্ঠ পুত্রের পুত্র না হইলে বা সন্তান হইবার পূর্ব্বে মরিয়া গেলে দ্বিতীয় পুত্র ব্রাহ্মণ কন্যা বিবাহ করিয়া বংশ রক্ষা করিবে। তাহার নায়র পত্নী ও তাহার গর্ভজাত সন্তানেরা সংসারে স্থান পাইবে ও ভরণ পোষণের অধিকারী হইবে। কনিষ্ঠ পুত্রদের নায়র পরিবার সাধারণ সংসার হইতে প্রতিপালিত হইবে, কিন্তু তাহাদের বিবাহ দেওয়া হইবে না, তাহারা বিবাহ করিয়া ভিন্ন ও স্বাধীন ভাবে থাকিতে পারে। জ্যেষ্ঠ পুত্রই পৈত্রিক ধনের অধিকারী, অতএব নম্বুদ্রীর বিষয় ভাগ হইয়া কয়েক পুরুষ বাদে বঙ্গের জমীদারদের মত নিঃস্ব হয় না। নম্বুদ্রীদের কন্যাদায় বঙ্গবাসীর কন্যাদায় অপেক্ষা বড় দায়; কেন, প্রতি বংশে একটির বেশী পাত্র পাওয়া যায় না, আবার কোষ্ঠী বিচার করিয়া বিবাহ দিতে হয়। তবে এক সুবিধা যে, কন্যাদের যৌবনের পূর্ব্বে বিবাহ প্রথা নাই, ও অনেকে চির কুমারী থাকে তাহাতে দোষ নাই। কিন্তু যৌবন প্রাপ্ত কুমারী মরিলে তাহার সংকার হয় না। মৃত্যুর পর পাত্র স্থির করিয়া মৃতদেহের গলায় তালী পরাইয়া অবিবাহিতা দোষ খণ্ডন করিয়া তবে সংকার

বিবাহ স্থির হইলে বর যে দিন বিবাহ করিতে যাত্রা করে, সে দিন তাহার বাটীতে ভোজ উৎসব হয়, কিন্তু ভোজের ব্যয় বরের শ্বশুর বহন করে। বঙ্গদেশীয় বর যেমন জাঁতি হাতে করিয়া বিবাহ করিতে যায়, নম্বুদ্রী সেইরূপ বিবাহিত জীবনের চিহ্ন স্বরূপ একটি ষোল গাঁইট যুক্ত বংশদণ্ড, মাঙ্গল্য চিহ্ন স্বরূপ একখানি ক্ষুদ্র দর্পণ ও নববধূকে ভূত, প্রেত ও অপদেবতার দৃষ্টি হইতে রক্ষা করিতে একটি তীর হাতে করিয়া বিবাহ করিতে যায়। তাহার সহিত কন্যার জন্য চারখানি শাদা ধুতি ও তালী থাকে। উত্তর ভারতে তালী নাই, ইহা দক্ষিণের বিশেষ দ্রব্য। ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য সমাজেও তালী বন্ধন প্রথা আছে। কোনও রমণীর গলায় তালী থাকিলে বুঝিতে হইবে যে তাহার বিবাহ হইয়াছে, তবে সধবা কি বিধবা তালী দেখিয়া বুঝিতে পারা যায় না। নম্বুদ্রীরা কেবল সোনার তালী পরে, অন্য জাতিতে রূপা, পিতল, কাঁসার তালী প্রচলিত আছে। কয়েকটি মোহর বা মোহরের আকারের মাদুলী গাঁথিয়া নেকলেসের মত গলায় পরে, ইহাকে তালী বলে। বর যাত্রা করিবার সময়ে স্ত্রী পুরুষেরা এক প্রকার শব্দ করে যাহা আমাদের উলুর মত। বর কন্যা-বাটীতে আসিলে দ্বারের কাছে তাহার ভাবী শ্বাশুড়ী বরণ করে কিন্তু নম্বুদ্রীদের অবরোধ-প্রথা অতি কঠোর ও সে সময়ে অন্য পুরুষদের নিকটে থাকা সম্ভব, সেই জন্য ভাবী শ্বাশুড়ী স্বয়ং না আসিয়া এক জন নায়র স্ত্রীকে আপনার প্রতিনিধি করিয়া পাঠান। এই প্রতিনিধি একখানি থালাতে অষ্ট মাঙ্গল্য দ্রব্য রাখিয়া বরণ করে। মাঙ্গল্য দ্রব্য যথা:—চাউল, ধান, খই, নারিকেলের কচি পাতা, সুগন্ধ পুষ্প, তীর, দর্পণ, শাদা ধোয়া ধুতি, অগ্নিশিখা (ঘৃত প্রদীপ, পঞ্চ বা সপ্ত প্রদীপ), চেপ্প্ (এক প্রকার ছোট কৌটা) ইত্যাদি। বর বিবাহ সভাতে আসিলে কন্যার পিতা মন্ত্র পাঠ করিয়া বলেন, 'তুমি স্নান করিয়া আমার কন্যাকে বিবাহ করিয়া সংসার ধর্ম্ম পালন কর।' বরও মন্ত্র পড়িয়া স্বীকার করে। পরে বর স্নান করিয়া শ্বশুর-দত্ত ধুতি ও অঙ্গ বস্ত্রম (উড়ানি চাদর) পরিয়া বিবাহ করিতে পিঁড়িতে বসেন। তাহার পর নান্দীমুখ ও পিতৃকর্ম্ম করা হয়। পরে কয়েকটি আচার (আমাদের স্ত্রী-আচারের মত, শাস্ত্রীয় অঙ্গ নহে) হইবার পর কন্যার পিতা বরের আনীত তালী কন্যার গলায় পরাইয়া দেন। অন্য ব্রাহ্মণ সমাজে ও যে জাতিতে তালী প্রচলিত, বর স্বয়ং তালী পরাইয়া দেয়। এই বার সভাতে কন্যাকে আনা হয়। বাঙ্গালীদের মেয়ে মুখ ও মাথা খুলিয়া সভাতে আসে, কিন্তু নম্বুদ্রী কন্যা আপাদ-

মস্তক একখানি মোটা চাদর জড়াইয়া আসে। এক জন নায়র রমণী, যেখানে কন্যা এতক্ষণ বসিয়াছিল, সেখানে তাহাকে পঞ্চ বা সপ্ত প্রদীপ দিয়া বরণ বা আরতি করে, পরে ঐরূপ চাদর দিয়া ঢাকিয়া তাহার হাত ধরিয়া সভাতে আনে। নায়র রমণীর অন্য হস্তে প্রদীপ থাকে। কন্যা সভাতে আসিয়া বরের সম্মুখে মুখামুখি দাঁড়ায়। এই সময়ে পুরোহিত ও উপস্থিত অন্য ব্রাহ্মণেরা বেদ উচ্চারণ করিতে থাকেন ও বর কন্যা উভয়ে উভয়কে প্রথম দর্শন করে। এই ক্রিয়াকে 'মুখদর্শনম্' বলে। ইহার পর 'উদকপূরণম্'। অর্থাৎ কন্যার পিতা কন্যার হাত এমন করিয়া ধরিয়া তাহাতে জল ঢালেন যে, সেই জল কন্যার হাত হইতে গড়াইয়া বরের হাতে পড়ে। এইরূপে তিনবার জল ঢালিয়া এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করেন যে, 'তোমরা উভয়ে মিলিয়া ধর্ম্ম আচরণ কর।' পরে দান সামগ্রী উৎসর্গ করা হয়। পরে 'পানিগ্রহণম্'। তাহার পর 'লাজ-হোম'। হোমের পর 'অশ্মারোহণ' অর্থাৎ কন্যার দক্ষিণ পাদ বর একটী জাঁতার পাটের উপর তুলিয়া রাখে ও যে মন্ত্র পড়ে তাহার অর্থ 'হে প্রিয়া! তুমি এই পাথরের মত দৃঢ় হও, সতী, হও, আমার বিশ্বাসপাত্রী হও'। ইহার পর 'সপ্তপদী' হইলেই বিবাহ শেষ হইল। মালবার দেশে 'উদকপূরণম্' ও 'পানি-গ্রহণম্' সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় ও প্রধান অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হয়। অন্য অংশগুলি অবস্থাবিশেষে শাটে হইতে পারে।

কন্যা শ্বশুরালয়ে গিয়া সেখানেও তিন দিন ধরিয়া নানা কৌলিক আচার পালন করে। চতুর্থ দিবস রাত্রে 'ফুলশয্যা' হয়। কিন্তু সে দিন অশুভ হইলে শুভ দিন দেখিয়া দু' এক দিন পরে হইতে পারে। সে দিবস বৈকালে বর ও কন্যা স্নান করিয়া উভয়ে মিলিয়া হোম করিতে বসে। হোম শেষ করিয়া যে ধুতি পরিয়া বিবাহ হইয়াছিল সেই ধুতি পরিয়া শয়নাগারে প্রবেশ করে।

পঞ্চম দিবস প্রাতে নম্বুদ্রীদের মধ্যে, বিশেষতঃ যজুর্ব্বেদীদের মধ্যে এক অদ্ভুত আচার পালন করিতে হয়। বর কন্যা উভয়ে এক হাঁটু গভীর জলে গিয়া দাঁড়ায় ও একখানা ছোট পাতলা কাপড় দুই জনে ধরিয়া যেমন করিয়া মাছ ধরে সেই রূপ অভিনয় করে। যদি নিকটে মৎস্য বহুল জলাশয় থাকে, তবে সত্য সত্যই মাছ ধরে, নতুবা ছোট ছোট মাছ সংগ্রহ করিয়া রাখা হয়, সেগুলি জলে ছাড়িয়া দিয়া আবার ছাঁচিয়া তোলে। এই আচারের বিশ্বাসযোগ্য কারণ খুঁজিয়া পাই নাই। নানা লেখক নানা প্রকার লিখিয়াছেন। হাণ্টর (Sir W. W. Hunter) বলেন :—

পরশুরাম কেরল দেশে সৎ ব্রাহ্মণদের বাস করাইতে পারিলেন না। কয়েক বার উত্তর ভারত হইতে ব্রাহ্মণ আনিয়া তাহাদের ধন রত্ন দিয়া বাস করাইলেন, কিন্তু কিছুকাল পরে তাহারা স্বদেশে চলিয়া গেল। পরে বিরক্ত হইয়া ঐ দেশবাসী ধীবরদের জাল ছিঁড়িয়া উপবীত করিয়া তাহাদের পরাইয়া দিলেন ও ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত করিলেন। পরবর্ত্তী কালে উত্তরাপথ হইতে যখন সৎ ব্রাহ্মণেরা আসিয়া বাস করিল তাহারা এই ধীবর ব্রাহ্মণদের ঘৃণা করিত। নম্বুদ্রীদের বংশ রক্ষার জন্য কেবল এক পুত্রের বিবাহ ও অন্য পুত্রদের নায়র কন্যার সহিত সম্বন্ধম প্রথা ঐ ধীবর অবস্থায় আচারের ধ্বংসাবশেষ।

নম্বুদ্রীরা বলেন, মৎস্য বংশ বৃদ্ধির চিহ্ন, অতএব মৎস্য ধরা অর্থে আমাদের মৎস্যের মত বংশ বৃদ্ধি হউক। কিন্তু এ অর্থ ভুল বলিয়া বোধ হয়, কেন না, যাহারা একটি মাত্র পুত্রের বিবাহ দেয় ও তাহার একটি মাত্র পুত্রকে গ্রহণ করে, তাহাদের বংশবৃদ্ধি অসম্ভব। যাহা হউক, আমি ইহার এমন কোনও অর্থ পাইলাম না যাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করা যাইতে পারে।

১০। পুংসবন :—গর্ভের তৃতীয় মাসে রবি, সোম বা বৃহস্পতিবারে হোম করা হয়। হোমে ব্যবহৃত ঘৃতের অবশিষ্টাংশ গর্ভবতী পান করে, তাহা হইলে কন্যা না হইয়া পুত্র সন্তান হয়।

১১। সীমন্তোন্নয়ন :—গর্ভের ষষ্ঠ বা অষ্টম মাসে হোম ও নান্দীমুখ করিয়া স্বামী বৈদিক মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে একটা সজারুর কাঁটা দিয়া স্ত্রীর মাথার চুল দুই ভাগ করিয়া সিঁতি কাটিয়া দেয়।

১২। প্রসবের পর একাদশ দিনে জননাশৌচ দূর হয়।

১৩। মৃত্যু :—মৃত্যুর পূর্ব্বে ধরাতলে কুশের আস্তরণ করিয়া তাহার উপর শয্যা পাতিয়া শোয়ান হয়। পরে আত্মীয়েরা 'কর্ণমন্ত্রম্' অর্থাৎ দক্ষিণ কর্ণে ইষ্টমন্ত্র বা ভগবানের নাম উচ্চারণ করে। মৃত্যুর পর আত্মীয়েরা স্নান করিয়া ভিজা কাপড়ে দুইটী কদলী দণ্ড কাটিয়া আনেন, একটী মাথার ও একটি পায়ের উপাধান করিয়া দেন। পরে ক্ষুর দিয়া মাথার চুল, গোঁপ, দাড়ি ফেলিয়া দেন। জলে হলুদ ও এক প্রকার লাল রং গুলিয়া সেই জলে মৃতদেহকে স্নান করান হয়। পরে শ্বেত চন্দনের (বৈষ্ণবের গোপী চন্দনের) তিলক পরাইয়া দেওয়া হয়। নূতন শাদা ধুতি পরাইয়া খাটুলি বা বাঁশের মাচানে রাখিয়া শাদা নূতন চাদর দিয়া ঢাকিয়া বাহির বাটীর আঙ্গিনাতে আম কাটের চিতার কাছে আনিয়া রাখা হয়। মাথার কাছের ঢাকা খুলিয়া আত্মীয়েরা সকলেই মৃতের মুখে দুই

চারিটি করিয়া তণ্ডুল দেয়, নবদ্বারে নয়টি সোনার কুচি রাখিয়া দেয়। পুরোহিত বেদ পাঠ করিতে থাকে, মুখ অগ্নিকারী (বা কর্ত্তা) জ্যেষ্ঠ পুত্র চিতার কাছে হোম করে ও হোমাগ্নি শবের বুকের উপর রাখিয়া চিতার তিন স্থানে অগ্নি সংযোগ করে। চিতা ধরিয়া উঠিলে মুখাগ্নিকারী স্নান করিয়া একটা মাটীর হাঁড়িতে জল লইয়া চিতা প্রদক্ষিণ করে, পরে হাঁড়িটা ফুটা করিয়া জল অন্য এক হাঁড়িতে ধরে। ফুটা হাঁড়িটা ফেলিয়া দেয় ও জল চিতাতে ঢালিয়া দেয়। এই ক্রিয়ার অর্থ যে, মৃত ব্যক্তিকে গঙ্গোদকে স্নান করান হইল, অগ্নিদেব তাহার সাক্ষী রহিলেন। যখন দেহের অল্প অংশ অবশিষ্ট থাকে তখন মুখাগ্নিকারী আবার স্নান করিয়া সেই অংশ মাখা মাটিতে জড়াইয়া, কোনও স্রোতে ভাসাইয়া দেয়।

মৃতাশৌচ দশ দিন থাকে। চতুর্থ দিবসে 'সঞ্চয়নম্‌' বা অস্থি সঞ্চয় করা হয়। দশম দিবসে দশবলী, একাদশ দিবসে সকলে এক ঘাটে শুদ্ধ হয়। মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ পুত্রের পক্ষে এক বৎসর কালাশৌচ থাকে। তাহাকে এই সময়ে প্রত্যহ শ্রাদ্ধ ও তর্পণ করিতে হয়, তৃণ শয্যাতে শুইতে হয়। বিবাহিত হইলে তাহার স্ত্রীকেও ঐ রূপে ব্রহ্মচর্য্য করিতে হয়। উভয়কে সংবৎসর পান, তামাক, সুপারি খাইতে নাই, ক্ষৌর করিতে নাই।

নম্বুদ্রীদের জ্যেষ্ঠ পুত্রই বিষয়ের উত্তরাধিকারী, অন্য পুত্রেরা কেবল ভরণ পোষণ পায়। যদি কোনও ব্রাহ্মণের একমাত্র পুত্রের একমাত্র কন্যা হইবার পর কন্যার পিতৃবিয়োগ হয়, তবে কন্যার মাতা উপযুক্ত পাত্রে কন্যা ও বিষয় দান করেন। এরূপ দানকে 'সর্ব্বস্ব দান' বলে। জামাতা বিষয়ের উত্তরাধিকার ও শ্রাদ্ধ করিবার ক্ষমতা পায়। অবস্থাবিশেষে পোষ্যগ্রহণ করিবার প্রথা আছে। পোষ্য পুত্র লইবার পর যদি ঔরস পুত্র হয় তথাপি পোষ্যই বিষয়ের পূর্ণ অধিকারী হয়।

নম্বুদ্রীদের পালনীয় ৬৪টি বিশেষ নিয়ম আছে। অন্য বর্ণের লোক ও অন্য সমাজের ব্রাহ্মণেরা এই নিয়মগুলিকে 'অনাচার' বলেন। কেন না, তাহাতে এমন সব নিয়ম আছে যাহাকে অনাচার না বলিয়া আর কিছু বলা চলে না। যথা :—নম্বুদ্রীরা উলঙ্গ হইয়া স্নান করিতে বাধ্য, তাহাদের সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে স্নান করিতে নাই, দুই জন নম্বুদ্রী পথে ঘাটে দেখা হইলে কোনও প্রকার অভি-বাদন করা নিয়ম বিরুদ্ধ। সধবা, বিধবা সকলকে শাদা, পাড়হীন ধুতি পরিতে হইবে। রাত্রির গৃহ প্রাঙ্গণে মৃতদেহ ভস্ম করিতে হইবে। প্রবাদ আছে যে,

এ নিয়ম শঙ্করাচার্য্য প্রচলিত করেন। তিনি যখন সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে মাতার অনুমতি চাহিলেন, মাতা বলিলেন, তুমি আমার একমাত্র সন্তান, আমার মৃত্যুর সময়ে পুত্রবতীর প্রাপ্য—ছেলের হাতে আগুন পাইব না। শঙ্কর স্বয়ং সন্ন্যাসী হইয়াও তাঁহার মুখাগ্নি ও প্রেতকার্য্য করিবেন প্রতিজ্ঞা করিলেন। তাঁহার মৃত্যুর সময়ে শঙ্কর তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন, কিন্তু শ্মশানে লইয়া যাইতে কোনও ব্রাহ্মণের সাহায্য পাইলেন না, তখন বাহির বাটীতেই মাতাকে দাহ করিলেন। ইহার কিছু কাল পরে দেশের রাজা শঙ্করের ভক্ত হইলেন। অবসর বুঝিয়া রাজার অনুমোদনে শঙ্কর নিয়ম করিলেন যে, নম্বুদ্রীদের আপন বসতবাটীর আঙ্গিনাতেই মৃতদেহ দাহ করিতে হইবে।

নম্বুদ্রীদের ভাষায় একটী বিশেষত্ব আছে। তাহারা আপনাদের জন্য সম্মানসূচক শব্দ ব্যবহার করে ও পরের (বিশেষতঃ শূদ্রের জন্য) অপমান-সূচক শব্দ। যদি কোনও অব্রাহ্মণ নম্বুদ্রীকে বলিতে চাহে 'তোমার বাটীর কাছে আমার বাটী' তবে তাহাকে বলিতে হইবে 'তোমার প্রাসাদের কাছে আমার আঁস্তাকুড়' ইত্যাদি। উর্দ্দু ভাষাতেও ঐরূপ শব্দ ব্যবহার করা প্রচলিত আছে, তবে জাতিবিশেষের জন্য নহে। বক্তা, আপনাকে বিনয়পূর্ব্বক হীন বলিয়া পরিচিত করে। লক্ষ্ণৌতে নবাবি আমলে এইরূপ বিনয়ের বাড়াবাড়ি ছিল, এখনও নামমাত্র আছে। লক্ষ্ণৌ সমাজের একটী হাস্যকর গল্প বাল্যকালে শুনিয়াছিলাম, সেটি পাঠকদের উপহার দিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না।

লক্ষ্ণৌতে এক গ্রাম্য বিদ্বান আসিলেন। এক জন ধনবান নবাব তাঁহাকে আহার করিতে নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়া বলিলেন, আজ সন্ধ্যার সময়ে এ গরীবের পর্ণ কুটীরে যথা উপস্থিত 'রুটি ও লবণ' আহার করিবেন। কয়েক দিবস পরে বিদ্বান নবাবকে নিমন্ত্রণ করিতে যাইতেছিলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, নিমন্ত্রণ করিতে কি শব্দ ব্যবহার করা উচিত। নবাব তাঁহার বিস্তৃত প্রাসাদকে পর্ণ কুটীর বলিয়াছেন আর আমার ক্ষুদ্র মাটির ঘর, নবাব তাঁহার বহুমূল্য সুস্বাদু আহারীয়কে 'রুটি ও লবণ' বলিয়াছেন আর আমি ত বেশী মূল্যবান দ্রব্য খাওয়াইতে পারিব না। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে নবাবকে বলিলেন, 'আজ সন্ধ্যার সময় আমার পায়খানাতে যথা উপস্থিত গু-গোবর আহার করিবেন।

নম্বুদ্রীদের কয়েকটি বিশেষ গুণ আছে। তাহারা অতিথি সৎকার ও দানে

তাহাদের মধ্যে প্রাচীন আর্য্যদের আচার ব্যবহার বর্ত্তমান বা অতি অল্পই পরিবর্ত্তন হইয়াছে, কেন না, তাহারা কখনও অহিন্দু রাজাদের অধীনে বাস করে নাই, তাহাদের উপর ভিন্ন দেশীয় সভ্যতা প্রভাব বিস্তার করিবার অবসর পায় নাই। ভাল হউক বা মন্দ হউক, সেই প্রাচীন রীতি নীতি লইয়া তাহারা লোকালয়ের কোলাহল হইতে দূরে, নির্জ্জনে বসিয়া জীবন কাটাইয়াছে। রমণীদের যৌবনারম্ভের পর বিবাহ, বিধবার মাথায় চুল রাখা, সধবাদের শাদা ধুতি পরা, শনিবারে বিবাহ ও অস্থি চয়নের শুভ সময় নির্ব্বাচন, অতি প্রাচীন কালের আচারের নিদর্শন, যাহা এখন অন্য দেশে লুপ্ত হইয়াছে। দক্ষিণের অনার্য্য বংশীয় শূদ্রদের 'অতি শূদ্র' বা 'পঞ্চম বর্ণ' বা 'পঞ্চম' বলে। এখনও নম্বুদ্রী এক জন পঞ্চমের পাঁচ সাত হাতের মধ্যে যাইলে অশুদ্ধ হয়, তাহাকে স্নান করিয়া শুদ্ধ হইতে হয়। নম্বুদ্রীর গৃহে পঞ্চম প্রবেশ করিলে সে গৃহখানি পোড়াইয়া ফেলে।

শ্রীঅমৃতলাল শীল।

কৃষক—মুসলমান আমলে।

বলা বাহুল্য, পৌরাণিক যুগের অনেক পরবর্ত্তী কাল পর্য্যন্ত হিন্দু রাজত্ব ছিল। হিন্দু রাজত্বে শাসন-নীতির মূল গৃহ্যসূত্র ও ধর্ম্মসূত্র। এই ধর্ম্মসূত্রের বিধি হইতেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, কৃষক, বণিক, পশুপাল, কুসীদী ও শিল্পী স্বজাতীয় পঞ্চায়তের দ্বারা বিচার করাইয়া লইতে পারিতেন (১)। কর সম্বন্ধেও পূর্ব্বপ্রচলিত ষড়্ভাগ রাজপ্রাপ্য ছিল। ইহা রাজার ভৃতি এবং এই হিসাবে রাজা প্রজার ভৃত্য। প্রজা এ কথা জানিত এবং বলিত, ইহা রাজার গর্ব্বের বিষয় নয়, রাজার গর্ব্ব এই যে, রাজা গণদাস—'গণদাসস্য তে গর্ব্বঃ, ষড়্ভাগেন ভৃত্যস্য কঃ।'

কিন্তু চিরদিন এ অবস্থা থাকিল না। ভারতের প্রাকৃতিক সম্পৎ ও কৃষি-বাণিজ্য-সমৃদ্ধি বিদেশীর লোলুপ দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। নন্দবংশের শেষ রাজার সময়ে ম্যাসিডনের অধিপতি আলেকজাণ্ডার ভারত আক্রমণ করেন। তাঁহার সঙ্গে অনেক গ্রীক এ দেশে আসেন। তাঁহারা তদানীন্তন হিন্দু সভ্যতার বর্ণনা

(১) কর্ষক বণিক পশুপাল কুসীদিকারবঃ স্বে স্বে বর্গে। গৌতমীয়ধর্ম্মসূত্রম্, ১১।২১।

করিয়া বলিয়াছেন, ভারতবর্ষে তখন সাতটি জাতি ছিল; তাহার মধ্যে গো-মেষ-রক্ষক ও কৃষক অন্যতম। আরীয়ান লিখিয়াছেন, ভারতবর্ষে দাস নাই, সকলেই স্বাধীন। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, সে সময়ে অর্থাৎ খৃষ্টাব্দের তিন শত বৎসর পূর্ব্বে শূদ্রগণ আর দাস ছিল না, সকলেই স্বাধীন হইয়া স্বাধীন বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিত। অনেকেই কৃষিকর্ম্ম করিত। গ্রীক্ পর্য্যটকগণ যে সাতটি জাতির উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা অবশ্য ভ্রমাত্মক। ভিন্ন ভিন্ন রূপ কর্ম্ম দেখিয়া ভিন্ন ভিন্ন জাতির কল্পনা করা অসম্ভব নয়।

গ্রীকদিগের অনেক পরে চীন পরিব্রাজক হুয়েন সাঙ্ ভারতবর্ষে আসেন। তিনি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, এই চারি জাতির কথাই বলেন। তাহার মধ্যে বৈশ্যগণকে বণিক ও শূদ্রগণকে কৃষক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কৃষকের বৈশ্যত্ব হইতে শূদ্রত্বে অবনতির বোধ হয় এই প্রথম আরম্ভ। বৈশ্য দ্বিজাতী-য়ের অন্তর্গত, বেদাধ্যয়ন যাগযজ্ঞাদিতে অধিকারী, শূদ্র তাহা নয়। সুতরাং এই অবনতিটা জাতীয় মর্য্যাদা এবং আত্মমর্য্যাদা উভয়েরই হানিকর। এই চীন পরিব্রাজক বলেন, তখন রাজকর অতি সামান্য ছিল, সকলেই পৈতৃক ভূমি অধিকার করিয়া কৃষিকার্য্য করিত এবং রাজার নিকট হইতে বীজ প্রাপ্ত হইয়া শস্য উৎপাদন করিত, এবং উৎপন্ন শস্যের ষষ্ঠাংশ কররূপে রাজাকে দিত।

ইহার কিছু পরেই মুসলমান আমলের আরম্ভ। মুসলমান রাজারা আলেক-জাণ্ডারের মত দিগ্বিজয় করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া যান নাই। তাঁহারা রাজ্য স্থাপন করিতে লাগিলেন এবং হিন্দু রাজাদিগকে বশ্যতা স্বীকার করাইতে লাগিলেন। কিন্তু বশ্যতা স্বীকার করাইয়াই ক্ষান্ত হইলেন না। তাঁহাদিগের রাজ্যশাসন ও সৈন্যসামন্ত রক্ষার ব্যয়ের জন্য করও আদায় করিতে লাগিলেন। পরাজিত রাজারা আবার এই কর প্রজার নিকট হইতে আদায় করিতে লাগি-লেন। অন্যান্য করের সহিত ভূমিকরেরও বৃদ্ধি হইল; এবং প্রধানতঃ কৃষককেই তাহা বহন করিতে হইল। হিন্দু রাজত্বে ধর্ম্মশাস্ত্র ও প্রচলিত দেশা-চার অনুসারে কর নির্দ্ধারিত হইত। মুসলমান রাজারা ধর্ম্মশাস্ত্রও মানিলেন না, দেশাচারেরও সম্মান রক্ষা করিলেন না। তাঁহাদিগের অনিয়ন্ত্রিত ইচ্ছাই অলঙ্ঘনীয় বিধি হইল।

মুসলমান শাস্ত্র অনুসারে বিজিত দেশবাসীদিগকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হইত—প্রথম, মিল্লী, অর্থাৎ যাহারা শান্তিপ্রিয় এবং শান্ত, দ্বিতীয়, জিম্মী অর্থাৎ বশীকৃত 'অবিশ্বাসী' (অ-মুসলমান), তৃতীয়, হার্বী অর্থাৎ মুসলমান-বিদ্বেষী।

বিজিত দেশে যদি দেশবাসীদিগকে বাস করিতে দেওয়া হইত, তাহা হইলে তাহাদিগের জমির উপর 'খিরাজ' ও মাথার উপর 'জিজিয়া' কর স্থাপন করা হইত। আলাউদ্দীন খিলজীর ধর্ম্মোপদেষ্টা এক কাজী আলাউদ্দীনকে পরামর্শ দিয়াছিলেন যে, এই দুই করের পরিমাণ এমন হওয়া উচিত যে, অবিশ্বাসী প্রজা উহাকে মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞার বিকল্প বলিয়া বিবেচনা করে। ধর্ম্মজ্ঞ কাজী ইহাও বলেন যে, এই কর আদায় করিবার জন্য প্রজার শেষ কপর্দ্দক পর্য্যন্ত লওয়া যাইতে পারে। আলাউদ্দীন কাজী সাহেবের মুখে এই ব্যবস্থার কথা শুনিবার পূর্ব্বেই 'খিরাজ ও জিজিয়া' এই ভাবেই আদায় করিবার আদেশ দিয়াছিলেন, সুতরাং তিনি কাজী সাহেবকে বলিলেন, 'আপনি বুঝিতে পারিতেছেন পাণ্ডিত্যপূর্ণ ধর্ম্ম-শাস্ত্র না পড়িয়াও আমি রসুলের আজ্ঞা কার্য্যতঃ পালন করিতেছি।' (১) 'খিরাজ' শব্দের অর্থ কৃষিকার্য্যে শস্য উৎপাদন করিবার ব্যয় বাদে যাহা কিছু থাকে তাহার সমস্ত। 'খিরাজ' অনেক প্রকারের ছিল। তাহার মধ্যে এক প্রকারের নাম 'খিরাজ মুকাসিমা' অর্থাৎ উৎপন্ন শস্যের অংশ। মুসলমান রাজাদিগের মধ্যে সকলেই অবশ্য আলাউদ্দীনের মত ছিলেন না। অনেক রাজা 'খিরাজ মুকাসিমা'র এক পঞ্চমাংশ রাজপ্রাপ্য বলিয়া নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন। ইহা হিন্দু রাজাদিগের ষড় ভাগের অতি নিকটবর্ত্তী। শস্য সংগ্রহ করিয়া তাহাকে প্রচলিত মুদ্রার সহিত বিনিময় করা হইত। তখন ইহার নাম হইত 'খিরাজ-মু-ওয়াজিফা' সংক্ষেপে 'ওয়াজিফা'। কৃষকের শস্য উৎপাদনের সামর্থ্য অনু-সারে ইহা নিয়মিত হইত। কর সম্বন্ধে আলাউদ্দীনের বা তাঁহার কাজী সাহে-বের আদেশ যাহাই হউক, ব্রিগ বলেন, উৎপন্ন শস্যের অর্দ্ধেক আলাউদ্দীনের সময় কর বলিয়া গৃহীত হইত (২)।

মুসলমান রাজাদিগের রাজত্বে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে কর সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন রীতি প্রচলিত ছিল বলিয়া বোধ হয়। আকবর টোডর মল্লের সাহায্যে ইহাকে সুপ্রণালীবদ্ধ করেন। ১৫৭১ খৃঃ অব্দে জরিপের দ্বারা বন্দোবস্ত আরম্ভ হয়। গুণানুসারে জমির শ্রেণীবিভাগ হয়—(১) পলেজ, যে জমিতে ক্রমাগত চাষ চলিতে পারে, কখনও পতিত রাখিতে হয় না; (২) ফিরাওটি অর্থাৎ শস্য পর্য্যায়ের জন্য যে জমিকে মধ্যে মধ্যে পতিত রাখিতে হয়; (৩) চিচর, অর্থাৎ বন্যাপ্লাবিত হওয়া বা অন্য কারণে যে জমিকে তিন চারি বৎসর পতিত

(১) Beames' Elliot's Glossary Vol II, Sub-voc Jizia.

(২) Brigg's Ferishta Vol I, P. 347.

রাখিতে হয়; (৪) বনজর, পতিত জমি যাহাতে পাঁচ বৎসরের অধিক চাষ হয় নাই। প্রথম তিন শ্রেণী আবার উত্তম, মধ্যম ও অধম, এই বিভাগে বিভক্ত হইত। এই সকল জমিতে যে শস্য উৎপন্ন হইত, রাজা তাহার এক-তৃতীয়াংশ পাইতেন। 'বনজর' বা পতিত জমির খাজনা প্রথম বৎসরে উৎপন্ন শস্যের এক সের বা দুই সের, দ্বিতীয় বৎসরে চারি সের; এইরূপে ক্রমে ক্রমে বাড়িয়া পূর্ণমাত্রায় দাঁড়াইত। ভিন্ন ভিন্ন প্রকার জমিতে কত শস্য উৎপন্ন হইত এবং তাহার দাম কত তাহারও উনিশ বৎসরের হিসাব করিয়া একটা গড় পড়তা করা হইয়াছিল। প্রজা ইচ্ছা অনুসারে উৎপন্ন শস্যের অংশ বা তাহার মূল্য করস্বরূপে দিতে পারিত। কিন্তু ইহার পরে নগদ টাকায় জমির খাজনা নির্দ্ধারিত করা হইয়াছিল। আকবরের রাজত্বের ১৫শ বর্ষ হইতে ২৪শ বর্ষ পর্য্যন্ত যে ভূমিকর কার্য্যতঃ আদায় হইয়াছিল তাহার হিসাব রাখা হইয়াছিল। এই মোট আদায়ের এক দশমাংশ পরবর্ত্তী দশ বৎসরের খাজনার হার বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল।

ইহা হইতেও স্পষ্ট দেখা যায়, ভূমির অধিকারী ছিল কৃষক এবং রাজা ও কৃষকের মধ্যবর্ত্তী রাজস্বভাগী বা উপস্বত্বভোগী আর কেহ ছিল না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি হিন্দু রাজাদের সময়ে কর আদায় করিবার জন্য কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইত। স্থানভেদে এই কর্ম্মচারীদিগকে গ্রামপতি,প্রধান, দেশমুখ্য প্রভৃতি নাম দেওয়া হইত। কোন কোন স্থানে তাহাদিগকে চৌধুরীও বলা হইত। পাঠান রাজত্বকালেও ইহাদের অস্তিত্ব লুপ্ত হয় নাই। পাঠান রাজত্বের শেষ ভাগে বাঙলা দেশে বার জন ভূঞা ছিলেন। ইহাদিগকে বারভূঞা বলিত। ভূঞা কথাটি বোধ হয় 'ভৌমিক' কথার অপভ্রংশ। এই ভৌমিকেরা সাধারণতঃ অর্দ্ধ স্বাধীন রাজার ন্যায় থাকিতেন। সুযোগ পাইলে সম্পূর্ণ স্বাধীনও হইতেন। মোগল রাজত্বের শেষ সময়ে এই ভৌমিকেরা রাজস্ব আদায়ের জন্য যে কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতেন তাহাদিগকে বেতনের পরিবর্ত্তে জমি দিতেন। এই জমির নাম তালুক ও কর্ম্মচারীর নাম তালুকদার। বাঙলা দেশে এই-রূপে রাজা ও প্রজার মধ্যবর্ত্তী ভূম্যধিকারীর সৃষ্টি হয়। মুসলমান সম্রাটগণ এক ভূম্যধিকারীর পরে অন্য ভূম্যধিকারীকে সনন্দ দিবার অধিকার নিজ হস্তে রাখিলেও কার্য্যতঃ উত্তরাধিকার সূত্রেই ভূম্যধিকারীর পুত্র পৌত্রাদিগণ ভূম্যধি-কারী হইতেন। আকবর কর্ত্তৃক বঙ্গবিজয়ের পর ভৌমিকদিগের প্রভাব তিরো-হিত হয়, কিন্তু তাহাদিগের সৃষ্ট তালুকদারগণ থাকিয়া যান। ভৌমিকগণ

ব্যতীত বাঙলার সীমান্তে কতকগুলি অর্দ্ধ স্বাধীন করদ ও মিত্ররাজ্য ছিল। এই সকল রাজ্যের অধিপতিদের সহিত মুসলমান রাজগণের একটা ভূমিকরের বন্দোবস্ত ছিল। এই কর দিতে পারিলেই ইহাদের ভূ-সম্পত্তি-ভোগের আর কোনও বিঘ্ন থাকিত না।

রাজা প্রজার মধ্যবর্ত্তী এই ভূম্যধিকারীর সৃষ্টি হইতে, প্রাচীন কালে প্রজা যে রাজাকে উৎপন্ন শস্যের ষড়ভাগ কর স্বরূপ দিত, তাহারও বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিল। ভূম্যধিকারী রাজাকে যে কর দিতেন, প্রজার দেয় ষড়ভাগের উপর তাহার যোগ হইল। পূর্ব্বে কি হিসাবে এই দুইটী কর যুক্ত হইয়া প্রজার নিকট হইতে আদায় করা হইত তাহার বিশেষ বৃত্তান্ত জানা যায় না। কিন্তু মুরশিদ কুলী খাঁর সময়ে সমস্ত বাঙলা দেশ পরগণায় পরগণায় বিভক্ত হইয়া গুণানুসারে ভূমিকরের একটা হার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। সেই হারেই কর আদায় করা হইত। কিন্তু অল্প দিন পরেই মুরশিদ কুলী খাঁ 'আব ওয়াব খাস-নবিসী' নামে এক অতিরিক্ত কর স্থাপন করেন। এই কর হইতে তিনি নিজ সরকারের খালসা সেরেস্তার কর্ম্মচারীদিগকে পার্ব্বণী দিতেন।

এই সময়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সহিত বাঙলার নবাবদিগের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠে এবং তাহার ফলে অত্যন্ত ব্যয়বৃদ্ধি হয়। সাধারণ রাজস্ব হইতে তাহার নির্ব্বাহ হইত না। কাজেই নূতন কর সংস্থাপনের আবশ্যক হইল। সুজা খাঁ মুরশিদ কুলী খাঁর নজীর অনুসরণ করিয়া আর চারিটি আব-ওয়াব আদায়ের আদেশ দিলেন—(১) নজর-আনা মোকররী অর্থাৎ স্থায়ী নজর-আনা; (২) জার মাথট; (৩) মাথট ফিলখানা; (৪) আবওয়াব ফৌজদারী। আলীবর্দ্দী খাঁ ইহার উপর আর দুইটি আবওয়াব যোগ করেন— (১) চৌথ মারাঠা, (২) নজরআনা মনসুরগঞ্জ। মীর কাসিম আরও চারিটি যোগ করিলেন —(১) কেয়াফৎ হস্তবুদ, (২) কেয়াফৎ ফৌজদারান্, (৩) তৌজির জায়গীর দারান, (৪) সেরফ্ সিক্কা। বলা বাহুল্য, এই সকল করের গুরুভার কৃষককেই প্রধানতঃ বহন করিতে হইত।

শ্রীহৃষিকেশ সেন।

নবগ্ব ও দশগ্ব।

অঙ্গিরাগণ।

ঋগ্বেদের ঋষিগণ কতকগুলি প্রাচীন কিম্বদন্তী আপন আপন সূক্তে উল্লেখ করিয়াছেন। উহারা আপাতঃদৃষ্টিতে আজগুবি গল্প বলিয়া মনে হয়। প্রাচীন নবগ্ব ও দশগ্ব নামক অঙ্গিরাদিগের এবং অঙ্গিরাবংশীয় ঋভু, বিভু ও বাজ নামক তিন ভ্রাতার উপাখ্যান ইহাদের অন্তর্গত। আমরা প্রথম নবগ্ব ও দশগ্বদিগের বিষয় পাঠকদিগকে বলিব।

কথিত আছে, পণি নামক এক জাতি কোনও সময়ে সূর্য্য, উষা, অর্ক ও গো হরণ করিয়া লইয়া যায়। উহাদের দলপতি 'ফলিগ বল' বা 'বল' ইহাদিগকে এক পর্ব্বতে আবদ্ধ করিয়া রাখে। (১) ইন্দ্র, বৃহস্পতি, নবগ্ব ও দশগ্ব অঙ্গিরাগণ জানিতেন না কোন্ পর্ব্বতে সূর্য্য প্রভৃতি আবদ্ধ হইয়াছিলেন। এজন্য ইন্দ্র তাঁহার সরমা নাম্নী কুক্কুরীকে উহাদের সন্ধানে প্রেরণ করেন। সরমা একটী ভীষণ নদী পার হইয়া পণিদিগের দেশে উপস্থিত হইল। সে পণিদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জানাইল যে, তাহারা যদি গাভীদিগকে বাহির করিয়া না দেয় তবে ইন্দ্র, বৃহস্পতি ও অঙ্গিরাগণ আসিয়া উহাদিগকে বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইয়া যাইবেন। (২) কিন্তু পণিগণ ইহাতে সম্মত হইল না। তখন

---

(১) ইন্দ্রঃ। বলং। রক্ষিতারং। দুঘানাং। করেণ ইব। বি। চকর্ত। রবেন।

স্বেদাঞ্জিভিঃ। আশিরং। ইচ্ছমানঃ। অরোদয়ৎ। পণিং। আ। গাঃ। অমুষ্ণাৎ॥—১০।৬৭।৬

যেমন হস্ত দ্বারা কর্ত্তন করে, সেইরূপ শব্দ দ্বারা ইন্দ্র, দুগ্ধবতী গাভীদিগের রক্ষক 'বল'কে কর্ত্তন করিয়াছিলেন। স্বেদচিহ্নযুক্তদিগের সহিত আশির (অর্থাৎ দুগ্ধযুক্ত সোম) ইচ্ছা করিয়া পণিকে কাঁদাইয়াছিলেন (ও) গো সকলকে কাড়িয়া লইয়াছিলেন।

সঃ। সুষ্টুভা। সঃ। স্তুভা। সপ্ত। বিপ্রৈঃ। স্বরেণ। অদ্রিং। স্বর্যঃ। নবগ্বৈঃ।

সরণ্যুভিঃ। ফলিগং। ইন্দ্র। শক্র। বলং। রবেণ। দরয়ঃ। দশগ্বৈঃ॥—১।৬২।৪

সেই সুন্দর স্বামী (বৃহস্পতি) সুন্দর স্তোত্রের দ্বারা, তিনি স্তব দ্বারা ও স্বরের (অর্থাৎ শব্দের) দ্বারা সাতজন নবগ্ব বিপ্রের সহিত অদ্রিকে (এবং) হে শক্র ইন্দ্র! (তুমি) দশগ্বদিগের সহিত গো যুক্ত 'ফলিগ বল'কে শব্দের দ্বারা বিদারণ করিয়াছ।

(২) ইন্দ্রস্য। দূতীঃ। ইষিতা। চরামি। মহঃ। ইচ্ছন্তী। পণয়ঃ। নিধীন্। বঃ।

অতিস্কদঃ। ভিয়সা। তৎ। নঃ। আবৎ। তথা। রসায়াঃ। অরম্। পয়াংসি॥—১০।১০৮।২

হে পণিগণ! তোমাদিগের মহৎ গুপ্ত ধন (কোথায় আছে জানিতে) ইচ্ছা করিয়া (আমি)

সরমা গাভীর অবরোধ স্থান অন্বেষণ করিতে লাগিল। সে উহাদের শব্দ দ্বারা জানিতে পারিল কোন্ পর্ব্বতে উহারা আবদ্ধ আছে। (১) এই সন্ধান প্রাপ্ত হইয়া, ইন্দ্র প্রমুখ দশ জন দশগ্ব অঙ্গিরা এবং বৃহস্পতি প্রমুখ সাত জন নবগ্ব অঙ্গিরা, পর্ব্বতের দ্বার ভগ্ন করতঃ সূর্য্য, উষা, গো এবং অর্ক উদ্ধার করিয়াছিলেন। (২) সেই অবধি দিবসে সূর্য্য এবং রাত্রে চন্দ্র নক্ষত্রাদিকে অঙ্গিরাগণ উঠাইয়া দিতেছেন। তাঁহারা দিবসে আলোক এবং রাত্রে অন্ধকারও স্থাপন করিয়াছেন। (৩) সরমা ও তাহার পুত্র 'শ্বা' এই কার্য্যে সহায়তা করায় অঙ্গিরাদিগের যজ্ঞে ভাগ প্রাপ্ত হয়।

ইন্দ্রের দূতী (তাঁহার দ্বারা) প্রেরিত হইয়া বিচরণ করিতেছি। (আমি) পার হইতেছি জানিয়া (নদী) ভয়ে আমাকে রক্ষা করিয়াছে ; অনন্তর নদীর জল অতিক্রম করিয়াছি।

আ। ইহ। গমন্। ঋষয়ঃ। সোমশিতা। অযাস্যঃ। অঙ্গিরসাঃ। নবগ্বাঃ।
তে। এতং। ঊর্বম্। বি। ভজন্ত। গোণাং। অথ। এতৎ। বচঃ। পণয়ঃ। বমন্। ইৎ॥
—১০।১০৮।৮

সোমপানে তেজস্বী হইয়া অযাস্য (অর্থাৎ বৃহস্পতি), অঙ্গিরাগণ, নবগ্ব ঋষিগণ এই স্থানে আসিবেন। তাঁহারা এই গো সমূহকে বিভাগ করিয়া লইবেন। হে পণিগণ! তখন এই বাক্য পরিত্যাগ করিতে হইবে।

(১) বিদৎ। যদি। সরমা। রুগ্নং। অদ্রেঃ। মহি। পাথঃ। পূর্ব্যং। সধ্র্যক্। কঃ।
অগ্রং। নয়ৎ। সুপদী। অক্ষরাণাং। অচ্ছ। রবং। প্রথমা। জানতী। গাৎ॥—৩।৩১।৬

সরমা যখন অদ্রির ভগ্নার্হ দ্বার জানিয়াছিল, (তখনই তাহাকে ইন্দ্র) পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞাত মহৎ অন্ন দান করিয়াছিলেন। অবিনশ্বরদিগের সুন্দর পদযুক্তা (কুক্কুরী) (গোদিগের) শব্দ প্রথম জানিয়া, তাহার অভিমুখে অগ্রে অগ্রে গিয়াছিল।

(২) সখা। হ। যত্র। সখিভিঃ। নবগ্বৈঃ। অভিজ্ঞু। আ। সত্বভিঃ। গাঃ। অনুগ্মন্।
সত্যং। তৎ। ইন্দ্রঃ। দশভিঃ। দশগ্বৈঃ। সূর্য্যং। বিবেদ। তমসি। ক্ষিয়ন্তম্॥—৩।৩৯।৫

যথায় সখা (অর্থাৎ বৃহস্পতি) নবগ্ব সখা সকলের সহিত নতজানু হইয়া গো সকলের অনুগমন করিয়াছিলেন ; দশজন দশগ্বদিগের সহিত ইন্দ্র অন্ধকারে অবস্থিত সেই সূর্য্যকে সত্যই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

(৩) অভি। শ্যাবং। ন। কৃশনেভিঃ। অশ্বং। নক্ষত্রেভিঃ। পিতরঃ। দ্যাম্। অপিংশন্।
রাত্র্যাং। তমঃ। অদধুঃ। জ্যোতিঃ। অহন্। বৃহস্পতিঃ। ভিনৎ। অদ্রিং। বিদৎ। গাঃ॥
—১০।৬৮।১১

যেমন শ্যামবর্ণ অশ্বকে (লোকে) সুবর্ণ দ্বারা (অলঙ্কৃত করে) সেইরূপ পিতাগণ (অর্থাৎ অঙ্গিরাগণ) দ্যুলোককে নক্ষত্রদিগের দ্বারা অলঙ্কৃত করিলেন ও রাত্রে অন্ধকার (এবং)

ঋগ্বেদে অগ্নিকে প্রথম অঙ্গিরা বা অঙ্গিরাদিগের আদি বলা হইয়াছে। (১) বৃহস্পতিও অঙ্গিরাবংশীয় ছিলেন। (২) ইহা হইতে মনে হয়, পৃথিবীতে যাঁহারা অঙ্গিরাবংশীয় বলিয়া পরিচিত ছিলেন, তাঁহারা আপনাদিগকে অগ্নি হইতে উৎপন্ন বলিয়া বিশ্বাস করিতেন (৩) এবং তাঁহারাই প্রাচীন কালে অগ্নি দ্বারা যজ্ঞের প্রবর্ত্তক ছিলেন। তাঁহারা মনে করিতেন, সূর্য্যে অর্ক বা স্বর্গীয় অগ্নি অবস্থিত আছেন। সূর্য্যের রশ্মিকে স্বর্গীয় গো রূপে তাঁহারা গ্রহণ করিতেন। উষাকে তাঁহারা যজ্ঞার্হা দেবী বলিয়া মনে করিতেন। উপরি বর্ণিত গল্প হইতে আমরা ইহাও অবগত হইতেছি যে, প্রাচীন অঙ্গিরাগণ যেমন সূর্য্য, উষা ও অগ্নির পূজা করিতেন, সেইরূপ গো ও কুকুরকে তাঁহারা গৃহ-পালিত করিয়াছিলেন এবং উহারা যজ্ঞার্হ হইয়াছিল। ঐ কালে ইন্দ্র গো জয়ে নিযুক্ত; বৃত্র সংহার করিয়া স্বর্গীয় বারি আনিবার জন্য তিনি আহূত হইতেন না। এই সকল কারণে মনে হয়, পশুপালন যুগে নবগ্ব ও দশগ্ব অঙ্গিরা-গণ জীবিত ছিলেন। আমাদের এই অনুমানের আর এক প্রধান কারণ এই যে, নবগ্বগণের বৎসর-যজ্ঞ দশ মাসব্যাপী ছিল। (৪) কিন্তু ঋগ্বেদের যুগে উহা বার মাস ব্যাপী হইয়াছে। (৫) 'বৎসর' শব্দের প্রকৃত অর্থ 'বাস করা'

---

(১) ত্বং। অগ্নে। প্রথমঃ। অঙ্গিরাঃ। ঋষিঃ। দেবঃ। দেবানাং। অভবঃ। শিবঃ। সখা।
—১।৩১।১

হে অগ্নে! প্রথম (বা প্রধান) অঙ্গিরা, ঋষি, দেব তুমি দেবতাদিগের শিব সখা হইয়াছ।

ত্বং। অগ্নে। প্রথমঃ। অঙ্গিরস্তমঃ। কবিঃ। দেবানাম্। পরি। ভূষসি। ব্রতম্।—১।৩১।২

হে অগ্নে! তুমি প্রথম, অঙ্গিরশ্রেষ্ঠ, দেবতাদিগের কবিব্রত (অর্থাৎ যজ্ঞ) অলঙ্কার কর।

(২) যঃ। অদ্রিভিৎ। প্রথমজাঃ। ঋতাবা। বৃহস্পতিঃ। আঙ্গিরসঃ। হবিষ্মান্।—৬।৭৩।১

যে বৃহস্পতি অদ্রিভেদকারী, অঙ্গিরা বংশে প্রথম জাত, ঋতাবা (ও) হবিষ্মান্ (অর্থাৎ যজ্ঞভাগী)।

(৩) যে। অগ্নেঃ। পরি। জজ্ঞিরে। বিরূপাসঃ। দিবঃ। পরি। নবগ্বঃ। নু। দশগ্বঃ।
অঙ্গিরস্তমঃ। সচা। দেবেষু।—১০।৬২।৬

যাঁহারা অগ্নি হইতে জন্মিয়াছেন (তাঁহারা) দেবলোকে বিবিধরূপ যুক্ত। নবগ্ব ও দশগ্ব (অঙ্গিরাগণ) অঙ্গিরাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; দেবতাদিগের মধ্যে অবস্থিত হইয়া দান করেন।

(৪) ধিয়ং। বঃ। অপ্সু। দধিষে। স্বর্ষাং। যয়া। অতরন্। দশ। মাসঃ। নবগ্বাঃ।
—৫।৪৫।১১

(হে দেবগণ!) তোমাদিগের স্বর্ষাধীকে জলের মধ্যে স্থাপন করিয়াছিলে। যে (ধী) দ্বারা নবগ্বগণ দশ মাস উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন।

(৫) বেদ। মাসঃ। ধৃতঃ। ব্রতঃ। দ্বাদশঃ। প্রজাবতঃ।—১।২৫.৮

ব্রতধারী প্রজাযুক্ত দ্বাদশ মাস জানেন।

বুঝায়। 'বৎস' শব্দের অর্থও তাহাই। ইহা হইতে মনে হয়, গর্ভে দশ মাস বাস করে বলিয়া সন্তানে 'বৎস' শব্দ প্রযুক্ত হইত। সেইজন্য 'বৎসর' শব্দ জন্মের পর প্রত্যেক দশ মাসকে বুঝাইয়া 'বৎসে'র বয়ঃক্রম নির্দ্ধারিত হইত। আর্য্য জাতির অপরাপর শাখায় ইহার উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যেমন রোমানদিগের বৎসর দশ মাসব্যাপী ছিল। উহাদের শেষ মাসকে December বা দশম মাস বলা হইত। সকল আর্য্য জাতির মধ্যে গণনায় 'দশমিক' প্রথা এইজন্য বর্ত্তমান, আমরা অনুমান করি।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই, পণিদিগের দ্বারা সূর্য্য, উষা, গো ও অর্ক অপহরণ গল্প কি সম্পূর্ণ কল্পনাসম্ভূত, না ইহার মূলে কোনও সত্য আছে? আমরা অনুমান করি ইহার মূলে একটী প্রাকৃতিক ঘটনা অবস্থিত ছিল। ঋগ্বেদের ঋষিগণ ঐ ঘটনা দেখেন নাই। কিন্তু তাঁহারা আপনাদিগের স্বর্গীয় পূর্ব্ব পুরুষদিগের এই কীর্ত্তি, হয় প্রাচীন রচনায় বা কিম্বদন্তী রূপে অবগত হইয়াছিলেন। আমরা অনুমান করি, ঋগ্বেদের ঋষিদিগের পূর্ব্ব পুরুষগণ উত্তর মেরু প্রদেশের সন্নিহিত কোনও দক্ষিণ দেশে বাস করিতেন। তাঁহারা যে স্থানে বাস করিতেন, তথায় কিছু দিনের জন্য সূর্য্য দক্ষিণায়ন (Winter Solstice) কালে প্রায় অদৃশ্য হইতেন। সূর্য্যের অদৃশ্য হইবার প্রকৃত কারণ তাঁহারা জানিতেন না। সেইজন্য কল্পনা সাহায্যে ইহার নানা প্রকার কারণ অনুমান করিতেন। 'বসু-দেব' পূজক অঙ্গিরাগণ এই প্রাকৃতিক ঘটনার কারণ ঐ গল্প দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, আমাদের অনুমান। আমরা পরে দেখাইব, কোনও কোনও আর্য্য সম্প্রদায় ইহার কারণ অন্য গল্প দ্বারা প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

অঙ্গিরাদিগের গল্পে আমরা আরও জানিতেছি যে, 'বল'-প্রধান পণিগণ আর্য্যদিগের শত্রু ছিল এবং মাঝে মাঝে তাহাদের গো হরণ করিত। পৃথিবীতে যেমন পণি জাতি ছিল, সেইরূপ স্বর্গেও পণিদিগের আদিপুরুষগণ বাস করিত, বোধ হয় অঙ্গিরাগণ এইরূপ বিশ্বাস করিতেন। অতএব, স্বর্গীয় সূর্য্য, উষা, গো প্রভৃতিকে স্বর্গীয় পণিগণ হরণ করিলে, স্বর্গবাসী ইন্দ্র, বৃহস্পতি ও অঙ্গিরাগণ উহাদিগের নিকট হইতে সূর্য্যাদি উদ্ধার করেন, অঙ্গিরাদিগের গল্প এইরূপ আকার ধারণ করে।

আমাদিগের অনুমান যে দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত, তাহা সার্ নর্ম্মান লকিয়ারের 'ষ্টোনহেঞ্জ' নামক পুস্তক হইতে কিছু উদ্ধার করিয়া দেখাইতেছি।

"The Year-gods in Babylonia and Egypt respectively were Baal and Thoth. We find Bel, or Baal common to the two areas, (*i. e.* Western Europe and Babylonia). Mr. Borlase informs us (op-cib. p. 1164) that in Western Europe Bel, Beal, Balor, Balder and Phol, Fal, Fail are the equivalents of the Semitic Baal. Balus, indeed, is named as the first King of Orkney. A May worship is connected with all the above."—P. 259.

আমরা পরে দেখাইতে চেষ্টা করিব, বৃটণে এক জাতি মিসল্‌টো পূজা লইয়া গিয়াছিল, এবং উহারা বল্‌ডার পূজক জাতিকে পরাভূত করিয়া ইংলণ্ডে আপন ধর্ম্ম ও রাজ্য বিস্তারে সক্ষম হয়। লকিয়ার মনে করেন বল্‌ডার পূজকগণ ব্যাবিলন হইতে আসিয়াছিল এবং উহারা সেমেটিক জাতীয় ছিল। ঋগ্বেদেও দেখিতেছি, অঙ্গিরাদিগের সহিত পণিদিগের নায়ক 'ফলিগ বলে'র বিবাদ রহিয়াছে। পণিদিগকে ঋগ্বেদে 'মন' নামও প্রদান করা হইয়াছে। অতএব উহারা যে সেমেটিক জাতীয় ছিল তাহাতে সন্দেহ থাকে না। তবে উহারা ব্যাবিলন হইতে উত্তর ও পশ্চিম ইউরোপে গমন করিয়াছিল কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ করিতে পারা যায়। সম্ভবতঃ আর্য্য ও পণিগণ উভয়েই উত্তরে বাস করিত। পরে উহারা ক্রমে দক্ষিণ দিকে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করে।

আমাদিগের অনুমান ঠিক হইলে, নবগ্ব ও দশগ্ব অঙ্গিরাগণ উত্তর জার্ম্মাণির অক্ষাংশে (Latitude) বাস করিতেন প্রমাণ করা যায়। তাঁহারা সোমো-পাসক ছিলেন এবং চন্দ্রের পূর্ণিমা দ্বারা মাস গণনা করিতেন। এইরূপ দশ মাসে তাঁহাদের বৎসর হইত। হয় ত প্রত্যেক পুর্ণিমা কালে তাঁহারা একটী যজ্ঞ করিতেন। তবে দক্ষিণায়ন (winter solstice) কালে যখন সূর্য্য ও উষা অদৃশ্য হইত, তখন অঙ্গিরাগণ উহাদের উদ্ধারের জন্য যে একটী যজ্ঞ করিতেন তাহাতে সন্দেহ নাই। ঐ যজ্ঞ তাঁহাদের সৌর বৎসর সম্বন্ধীয় একমাত্র যজ্ঞ বলিয়া মনে করি। ক্রমে কৃষিকর্ম্মের আবিষ্কার ও উন্নতির সহিত সৌর বৎসর নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। ইহার ক্রমবিকাশ ঋগ্বেদে ঋভুদিগের গল্পে দেখিতে পাই। ঋভুদিগের উপাখ্যান বর্ণনা কালে, এই বিকাশের দ্বিতীয় স্তর পাঠকদিগকে দেখাইতে চেষ্টা করিব।

প্রাচীন অঙ্গিরাদিগের কালে সৌর বৎসরের আদি ও অন্ত হিম (অর্থাৎ

শীত) কালে পড়িত। তখন বৎসর ভাবে ঐ যজ্ঞ হইত না। সেকালে উহা হিম ঋতুর যজ্ঞ বা দক্ষিণা যজ্ঞ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। উহা দ্বাদশ দিবস ব্যাপী ছিল বলিয়া 'দ্বাদশাহের যজ্ঞ' নামও প্রাপ্ত হইয়াছিল। উহাকে 'বিষুবাণের যজ্ঞ'ও বলা হইত।

ঋগ্বেদের কোনও ঋষি যজ্ঞে 'দক্ষিণা' দানের ক্ষমতা কতদূর তাহা বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন, 'পিতাদিগের দ্বারা দত্ত মহৎ জ্যোতিঃ আসিতেছেন; দক্ষিণার মহৎ পথ দেখা গিয়াছে।' (১) এক ঋষি 'দক্ষিণা' অর্থে অঙ্গিরাদিগের প্রতিষ্ঠিত 'দক্ষিণা' নামক যজ্ঞকে বুঝাইয়াছেন। (২) ইহা হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, প্রাচীন পিতা নবগ্ব ও দশগ্ব অঙ্গিরাগণ যে যজ্ঞ দ্বারা সূর্য্যকে দক্ষিণায়ন কালে পণিদিগের নিকট হইতে উদ্ধার করিয়া আনিয়াছিলেন, সেই যজ্ঞের কথাই ঋষি 'দক্ষিণা' শব্দ দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন। বোধ হয় সেকালে এই যজ্ঞ শ্রেষ্ঠ ছিল বলিয়া ঋষিগণ এই যজ্ঞে শ্রেষ্ঠ দক্ষিণা প্রাপ্ত হইতেন। দক্ষিণ ও দক্ষিণা শব্দ সূর্য্যের দক্ষিণায়ন গমনের সহিত যে সংশিষ্ট তাহা পাঠকগণ অনুধাবন করিবেন।

---

(১) আবিঃ। অভূৎ। মহি। মাঘোনং। এষাং। বিশ্বং।
জীবং। তমসঃ। নিঃ। অমোচি।
মহি। জ্যোতিঃ। পিতৃভিঃ। দত্তম্। আ।
অগাৎ। উরুঃ। পন্থাঃ। দক্ষিণায়াঃ। অদর্শি॥—১০।১০৭।১

ইহাদিগের (অর্থাৎ যজমানদিগের) ইন্দ্রসম্বন্ধীয় মহৎ (জ্যোতিঃ) প্রকাশিত হইয়াছেন; সকল প্রাণীকে অন্ধকার হইতে নির্ম্মুক্ত করিয়াছেন। পিতা (অঙ্গিরা)দিগের দ্বারা দত্ত মহৎ জ্যোতিঃ (সূর্য্য) আসিতেছেন। দক্ষিণা (নামক যজ্ঞের) মহৎ পথ দেখা গিয়াছে।

(২) যে। যজ্ঞেন। দক্ষিণয়া। সং অক্তাঃ।
ইন্দ্রস্য। সখ্যং। অমৃতত্বং। আনশঃ॥—১০।৬২।১

'দক্ষিণা' (নামক) যজ্ঞের দ্বারা সংগত হইয়া যাঁহারা ইন্দ্রের সখ্য (ও) অমৃতত্ব (অর্থাৎ দেবত্ব) লাভ করিয়াছেন।

যে। ঋতেন। সূর্যং। আ। অরোহয়ন্।
দিবি। অপ্রথয়ন্। পৃথিবীং। মাতরং। বি।
সুপ্রজাত্বং। অঙ্গিরসঃ। বঃ। অস্তু।
প্রতি। গৃভ্ণীত। মানবং। সুমেধসঃ॥—১০।৬২।৩

যাঁহারা ঋতের দ্বারা (অর্থাৎ যজ্ঞের দ্বারা) সূর্য্যকে আকাশে উঠাইয়াছেন, পৃথিবী মাতাকে বিস্তৃত করিয়াছেন, হে অঙ্গিরাগণ! তোমাদিগের সুন্দর প্রজাত্ব হোক্। হে সুমেধাগণ! মনুর পুত্র, (আমাকে) গ্রহণ কর।

যেমন ঋগ্বেদে হিম শব্দ দ্বারা বৎসর বুঝায়, সেইরূপ জেন্দাবেস্তায় হিম-বার্চক শব্দ বৎসর বুঝাইত। (১) ইউরোপে আর্য্য জাতিদিগের মধ্যে হিম ঋতুতেই বৎসর আরম্ভ ও শেষ হয়। ইহাদের সকলের মূলে অঙ্গিরাদিগের প্রভাব রহিয়াছে মনে করি।

কত শত বা সহস্র বৎসর পূর্ব্বে অঙ্গিরাগণ উত্তর মেরুর সন্নিহিত দেশে বাস করিতেন, তাহা জানিতে অনেকের ইচ্ছা হয়। আমরা মোটামুটি এই কালের গণনা করিতে পারি। ঋগ্বেদের ঋষিদিগের এই কথা যদি সত্য হয়, যে প্রাচীন অঙ্গিরাদিগের কালে সরমা সূর্য্যের সন্ধান প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং সরমার উদয়ের পর দক্ষিণায়ন কালে সূর্য্য উদিত হইত, তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে যে, 'সরমা' আকাশের একটী নক্ষত্রের নাম। ঋষিদিগের বর্ণনা হইতে আরও জানা যাইতেছে যে, সরমা কুক্কুরী স্বর্গীয় নদীর পারে, দক্ষিণ দিকস্থ পণিদিগের দেশে গমন করিয়াছিল। আমরা যাহাকে ছায়াপথ (বা Milky Way) বলি উহাই সেকালের দিব্য সিন্ধু। সরমা কুক্কুরী তাহা হইলে ছায়া-পথের দক্ষিণে অবস্থান করিবে। আরও দেখা যায় ইহার শ্বা নামে এক পুত্রও ছিল। (২) এই গল্প যখন রচিত হয়, তখন আর্য্যগণ একত্র বাস করিতেন। সেই জন্য এই কুক্কুর নক্ষত্রের কথা আমরা অপরাপর আর্য্য জাতিদিগের মধ্যেও দেখিতে পাই। গ্রীক, রোমান, জর্ম্মান, ইংরাজ প্রভৃতি জাতির মধ্যে প্রকৃতই দুই কুক্কুর নক্ষত্রের নাম পাওয়া যায়। উহাদের ল্যাটিন নাম Conis Major ও Conis Minor। Conis Majorকে ইংরাজীতে Serius বলা হয় Serius ছায়া-পথের দক্ষিণ ও Conis Minor উহার উত্তর পারে বর্ত্তমান। অতএব Serius যে সরমা নক্ষত্র তাহাতে সন্দেহ করিবার কোনও অবকাশ থাকে না।

---

(১) বি। দ্বেষাংসি। ইনুহি। বর্দ্ধয়। ইড়াং।

মদেম। শতহিমাঃ। সুবীরাঃ ॥—৬।১০।৭

(হে অগ্নে!) শত্রুদিগকে দূর কর; ইড়াকে বর্দ্ধিত কর, সুবীর (আমরা) শত হিম আনন্দ করিব। [পৃথিবীকেও ইড়া বলা হইত।]

(২) ইন্দ্রস্য। অঙ্গিরসাং। চ। ইষ্টৌ।

বিদৎ। সরমা। তনয়ায়। ধাসিম্ ॥—১।৬২।৩

ইন্দ্রের ও অঙ্গিরাদিগের যজ্ঞে সরমা নিজ পুত্রের জন্য অন্ন পাইয়াছিল।

শ্বানং। বস্তঃ। বোধয়িতারং। অব্রবীৎ।

সংবৎসরে। ইদং। অদ্য। বি। অখ্যত ॥—১।১৬১।১৩

বস্ত শ্বাকে জ্ঞানদাতা বলিয়াছিলেন। সংবৎসরে অদ্য (শ্বা) ইহাকে প্রকাশ করিতেছে।

প্রাচীন অঙ্গিরাদিগের যুগে দক্ষিণায়ন কালে সূর্য্য অদৃশ্য হইবার পর পুনরায় যখন উদিত হইতেন, তখন সরমা নক্ষত্র (বা Serius) তাহার অগ্রে উদিত হইতে দেখা যাইত, বামদেব ঋষি (১) প্রকাশ করিয়াছেন। বোধ হয় এইজন্য সেকালের লোকে মনে করিত উষা, সূর্য্য, অর্ক ও গো 'বলের' পর্ব্বত হইতে প্রমুক্ত হইয়া সরমা কুক্কুরীর পশ্চাৎ আগমন করিতেছে।

যদ্যপি সরমা নক্ষত্রকে পুনর্বসু নক্ষত্রের অন্তর্গত মনে করি, তাহা হইলে ঐ নক্ষত্রে সূর্য্য গমন করিলে সেকালে দক্ষিণায়ন বা Winter Solstice হইত। ইহার কিছুদিন পরে সূর্য্য তৎপর নক্ষত্রে গমন করিলে উষাকালে প্রথম সরমা ও তৎপরে সূর্য্যোদয় দৃষ্ট হইত। বর্ত্তমান কালে মূলা নক্ষত্রে Winter Solstice হইতেছে। অয়ন চলন (বা Precision of the Equinox) জন্য Winter solstice প্রায় ১৪ নক্ষত্র পশ্চাৎ গমন করিয়াছে। প্রত্যেক নক্ষত্রের পশ্চাৎ গমন করিতে প্রায় ৯৫০ বৎসর লাগে। তাহা হইলে প্রাচীন অঙ্গিরাদিগের কাল বর্ত্তমান সময় হইতে ১৩,৩০০ বৎসর পূর্ব্বে ছিল।

পাঠকগণ মনে রাখিবেন যে, ঋগ্বেদের ঋষিগণ অঙ্গিরাদিগের বিষয় কিম্বদন্তী রূপে জানিতেন। তাঁহারা মনে করিতেন, তাঁহারা যে দেশে বাস করিতেছেন, তাঁহাদের পিতাগণও সেই দেশে বাস করিতেন। কিন্তু তাঁহারা এরূপ কোনও বর্ণনা করেন নাই, যাহাতে বুঝা যায় যে, তাঁহাদের দেশে সূর্য্য কিছু দিনের জন্য দক্ষিণায়ন কালে অদৃশ্য হইয়া থাকিত। যদ্যপি তাঁহাদের পিতৃলোকে যাতায়াত থাকিত, তবে এইরূপ বর্ণনা কোনও না কোনও ঋষির স্তবে সুস্পষ্ট দেখা যাইত। আমরা ইহাও মনে করি যে, নবগ্ব ও দশগ্ব অঙ্গিরাদিগের কালে ইন্দ্র ও বৃহস্পতির পৃথক যজ্ঞ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ঋভুদিগের কালে ইহা হইয়াছিল, পরে দেখান যাইবে।

শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়।

---

(১) অপঃ। যৎ। অদ্রিং। পুরুহূত। দর্দঃ। আবিঃ। ভুবৎ। সরমা। পূর্ব্যং। তে।
সঃ। নঃ। নেতা। বাজং। আ। দর্ষি। ভূরিং। গোত্রা। রুজন্। অঙ্গিরোভিঃ।
গৃণানঃ॥—৪।১৬।৮ (বামদেব)

হে পুরুহূত (ইন্দ্র)। যখন জল সকল (ও) অদ্রিকে বিদারণ করিয়াছিলে, তখন তোমার সরমা প্রকাশিত হইত। অঙ্গিরাদিগের দ্বারা স্তূয়মান হইয়া আমাদিগের নেতা তিনি গোত্রভেদ করত বহু অন্ন আদর করিয়াছেন।

ক্ষত্রপ রাজবংশ।

ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ববিভাগীয় রিপোর্টের পাতা উল্টাইলে এমন অনেক প্রাচীন জাতির উল্লেখ পাওয়া যায়, যাহারা দোর্দণ্ডপ্রতাপে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া বিশ্বের বুকে বিজয়-শকট চালাইয়া গিয়াছে, কিন্তু পরে তাহাদের এমনই শোচনীয় পতন হইয়াছে যে, বর্ত্তমানে কতকগুলি ভগ্ন মন্দির, স্তূপ, মুদ্রা ও শিলালিপি ব্যতীত তাহাদের অস্তিত্বের কোনও চিহ্নই পাওয়া যায় না। কত শত জাতি প্রচণ্ড বিক্রমে উঠিয়াছে, আবার পড়িয়াছে; কেহ বা নিজের শক্তি ও বুদ্ধির সাহায্যে আবার বিশ্বের সম্মুখে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে, কেহ বা চিরতরে বিস্মৃতির অতলগর্ভে ডুবিয়া গিয়াছে। প্রকৃতির এই বিরাট ধ্বংস ও সৃষ্টি-লীলার ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া কত প্রাচীন জাতি লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, আর তাহাদের স্থানে কত নবীন জাতির অভ্যুদয় হইয়াছে। এই লুপ্ত জাতিগণের মধ্যে ভারতের ক্ষত্রপ রাজবংশ অন্যতম। এই জাতি প্রচণ্ড বিক্রমে প্রায় চারি শত বৎসর ধরিয়া ভারতের বিভিন্ন স্থানে—বিশেষ করিয়া পশ্চিম ভারতে রাজত্ব করিয়াছে; কিন্তু আজ আর ইহাদের কোনও চিহ্নই নাই! ভারতের অন্যান্য প্রাচীন জাতি বা রাজবংশ সম্বন্ধে অনেক কথাই জানিতে পারা যায়, কিন্তু এই জাতি সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানিতে পারা যায় না। বারখানি শিলালিপি, একখানি তাম্রপত্র এবং কয়েক সহস্র মুদ্রা ব্যতীত ইহাদের ইতিহাস লিখিবার অন্য কোনও উপকরণই নাই; ইহাদের বংশের বিস্তৃত পরিচয় অদ্যাবধি পাওয়া যায় নাই। "ক্ষত্রপ" ইহাদের জাতীয় উপাধিবাচক শব্দ। যদিও "ক্ষত্রপ" শব্দ সংস্কৃত বলিয়া বোধ হয় এবং ইহার অর্থও ক্ষত্রিয়গণের রক্ষাকর্ত্তা হইতে পারে, তবুও ইহা সংস্কৃত শব্দ নহে; ইহা প্রাচীন পারস্যে প্রচলিত "ক্ষথ্রপাওয়ন" শব্দের সংস্কৃত রূপান্তর। ইহার অর্থ পৃথিবীর রক্ষক। এই শব্দের 'ক্ষত্রপ', 'ছত্রপ' 'ছত্রব' প্রভৃতি প্রাকৃত রূপও দেখিতে পাওয়া যায়। সংস্কৃত সাহিত্যে কোথাও এই শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় না, এই শব্দটি সর্ব্বপ্রথম ভারতের শাসনকারী এক বিশেষ জাতির রাজগণের মুদ্রায় এবং খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর শিলালিপিতে দৃষ্ট হয়। পারস্যে এই শব্দটি সম্রাটের সুবাদার বা মন্ত্রীর উপাধি-বিশেষ ছিল, ভারতবর্ষেও ইহা ঐ অর্থেই ব্যবহৃত হইত। পারস্য এবং ভারতে প্রচলিত শব্দের মধ্যে প্রভেদ এই ছিল যে, ভারতবর্ষে ঐ শব্দের সহিত গৌরব-

'ময় "মহা" শব্দ যুক্ত করিয়া দেওয়া হইত। ভারতের একই স্থান এবং কালের "ক্ষত্রপ" ও "মহাক্ষত্রপ" উপাধিধারী ভিন্ন ভিন্ন নামের মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, ইহা হইতে অনুমান হয় যে, স্বাধীন শাসককে "মহাক্ষত্রপ" এবং তাঁহার উত্তরাধিকারী যুবরাজকে "ক্ষত্রপ" উপাধিতে ভূষিত করা হইত; এই ক্ষত্রপই পরে 'মহাক্ষত্রপ' উপাধিতে ভূষিত হইতেন। সারনাথ হইতে কুশানরাজ কনিষ্কের রাজ্যকালের তৃতীয় বর্ষের যে শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, উহা হইতে জানিতে পারা যায় যে, "মহাক্ষত্রপ খরপলান" কনিষ্কের সুবাদার বা প্রতিনিধি ছিলেন। * খুব সম্ভব মহাক্ষত্রপ হইয়াও মধ্যে মধ্যে ইহাঁরা কোনও কোনও পরাক্রমশালী রাজার অধীন ছিলেন। ক্রমাগত রাজত্ব করিতে করিতে ইহাঁদের বংশ ভারতবর্ষের চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে, খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দী হইতে চতুর্থ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত ক্ষত্রপগণের তিনটি শাখা ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে রাজত্ব করিয়াছিলেন, ইহাদের মধ্যে উত্তর এবং পশ্চিম ভারতীয় ক্ষত্রপ রাজবংশ বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইতিহাসজ্ঞগণ তক্ষশীলা ও মথুরার ক্ষত্রপগণকে উত্তর ভারতীয় ক্ষত্রপরাজবংশ † এবং পশ্চিম ভারতের ক্ষত্রপগণকে পশ্চিম ভারতীয় ক্ষত্রপ রাজবংশ বলিয়া থাকেন। খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষার্দ্ধে ইহাঁরা গুজরাট ও পাঞ্জাবের ভিতর দিয়া পশ্চিম ভারতে আসিয়া উপস্থিত হন, খুব সম্ভব এই সময় ইহাঁরা উত্তর পশ্চিম ভারতের কুশান রাজার সুবাদার ছিলেন, কিন্তু শেষে ইহাঁরা স্বাধীনভাবে ভারতে রাজত্ব করিতে থাকেন। ক্রমে ইহাঁরা প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠেন এবং মালওয়া, গুজরাট, রাজপুতানা, সিরোহী, ঝালাবাড়, কোটা, প্রতাপগড়, ডুঙ্গরপুর, বাঁশওয়াড়া প্রভৃতি প্রদেশ জয় করেন। ‡

ক্ষত্রপ রাজবংশের সুবিন্যস্ত ইতিহাস রচনা করা অসম্ভব, ইহাদের বংশের যথাযথ পরিচয় দেওয়াও অত্যন্ত কঠিন। পূর্ব্বের কয়েকজন মহাক্ষত্রপ বা ক্ষত্রপের কোনও সঠিক পরিচয় পাওয়া যায় না, মহাক্ষত্রপ বিজয়সেন হইতে ইহাঁ-

---

* See Royal Asiatic Society's Journal, 1903. P. I.

† "......When it was conquered by the later Indo-Scythians of the Kushan tribe, under the great Kanishka. During this period..., Taxila was governed by satraps. Several coins and inscriptions of these local governors have been found at Shah-Dheri and Manikyala,"—Cunningham's A. S. of India. Vol. II. P. 113. 1871.

‡ See Epigraphica Indica, Vol. VIII. P. 36.

দের বংশের কতকটা পরিচয় পাওয়া যায়। বিজয়সেন ক্ষত্রপ দামসেনের পুত্র ও বীরদামা এবং যশোদামার ভাই ছিলেন। ১৬০ হইতে ১৭২ শক্ সম্বতের মধ্যে ইহাঁর নামাঙ্কিত রৌপ্যমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, সুতরাং এই কয় বৎসরই ইনি রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইহাঁর মুদ্রার এক দিকে—"রাজ্ঞো মহাক্ষত্রপস দামসেনস পুত্রস রাজ্ঞো ক্ষত্রপস বিজয়সেনস" এবং অন্য দিকে শক সম্বৎ লেখা আছে। দুই বৎসর ইনি ক্ষত্রপ ছিলেন, পরে ১৬২ শক সম্বৎ হইতে মহাক্ষত্রপ পদে আরূঢ় হন। ইহাঁর পর তৃতীয় দামজদ বা যশোদামা মহাক্ষত্রপ হন, ইহাঁর রাজত্ব কাল ১৭৩ হইতে ১৭৬ শক সম্বৎ পর্য্যন্ত। ইহাঁর মুদ্রাও বিজয়সেনের মুদ্রার ন্যায়, কিন্তু ইহাতে দামজদের নাম লিখিত। ইহার পর দামজদের ভ্রাতা বীরদামার পুত্র, দ্বিতীয় রুদ্রসেন মহাক্ষত্রপ হন, ১৭৮ হইতে ১৯৬ শক সম্বৎ পর্য্যন্ত ইনি রাজত্ব করেন; বিশ্বসিংহ ও ভর্তৃদামা নামে ইহাঁর দুই পুত্র ছিল। পিতার মৃত্যুর পর বিশ্বসিংহ মহাক্ষত্রপ হন, ইনি কতদিন রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহা এখনও স্থির হয় নাই, সম্ভবতঃ ইনি চারি বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন; ১৯৮ হইতে ২০১ শক সম্বৎ পর্য্যন্ত ইহাঁর রৌপ্যমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। ইহাঁর পর ভর্তৃদামা মহাক্ষত্রপ হন, ২০২ হইতে ২১৭ শক সম্বৎ পর্য্যন্ত ইহাঁর রাজত্ব কাল, ইহাঁর সময়ের অসংখ্য রৌপ্য মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে; বিশ্বসেন নামে ইহাঁর এক পুত্র ছিল। পিতার পর বিশ্বসেন ক্ষত্রপ হন, ইহাঁর রাজত্ব কাল ২১৮ হইতে ২২৬ শক সম্বৎ পর্য্যন্ত; অদ্যাবধি ইহার যতগুলি মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে ইহাঁর মহাক্ষত্রপ উপাধির উল্লেখ নাই। ইহাঁর পুত্র বা অন্য কোনও উত্তরাধিকারী না থাকায়, খুব সম্ভব ইহাঁর আত্মীয় জীবদামার পুত্র দ্বিতীয় রুদ্রসিংহ ক্ষত্রপ হন, ২২৭ হইতে অনুমান ২৩৭ শক সম্বৎ পর্য্যন্ত ইনি রাজত্ব করেন; ইহাঁর পুত্রের নাম যশোদামা ছিল। পিতার পর যশোদামা ক্ষত্রপ হন, ২৩৯ হইতে ২৫৪ শক সম্বৎ পর্য্যন্ত ইহাঁর রৌপ্য মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে; সুতরাং ইনি ঐ কয় বৎসরই রাজত্ব করিয়াছিলেন। যশোদামার পর আর এই বংশের যথাযথ বিবরণ পাওয়া যায় না। ইহাঁর পর মহাক্ষত্রপ দ্বিতীয় রুদ্রদামার নাম তাঁহার পুত্র রুদ্রসেনের রৌপ্য মুদ্রা হইতে জানিতে পারা যায়, ভর্তৃদামার পর সর্ব্বপ্রথম ইহাঁরই নামের পূর্ব্বে মহাক্ষত্রপ উপাধি দৃষ্ট হয়। সম্ভবতঃ, মধ্যে ইহাঁরা কোনও পরাক্রমশালী রাজার অধীনতা স্বীকার করেন। জীবদামা বা ভর্তৃদামার বংশের সহিত ইহাঁর কি সম্বন্ধ ছিল, তাহা অদ্যাবধি নির্ণীত হয় নাই। ইহাঁর একটী পুত্র ও একটী কন্যা ছিল। ২৭০ হইতে ৩০০ শক সম্বৎ পর্য্যন্ত তৃতীয়

রুদ্রসেন রাজত্ব করেন, ইনি দ্বিতীয় রুদ্রদামার পুত্র ছিলেন। ইহাঁর রাজত্ব কালের কয়েক বৎসরের (২৭৩ হইতে ২৮৬ শক সম্বৎ পর্য্যন্ত) মুদ্রা অদ্যাবধি পাওয়া যায় নাই ; খুব সম্ভব, এই তের বৎসর ইহাঁর রাজত্বে কোনরূপ অশান্তি বা উৎপাত উপস্থিত হওয়ায় মুদ্রা প্রস্তুত কার্য্য বন্ধ ছিল। * ২৮০ হইতে ২৯৪ শক সম্বতের মধ্যে কতকগুলি সীসার মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, এই মুদ্রাগুলি সম-চতুষ্কোণ, দেখিতে প্রায় ক্ষত্রপরাজগণের মুদ্রারই মত, কিন্তু অদ্যাবধি কেহই ইহা স্থির করিতে পারেন নাই যে, এই মুদ্রাগুলি তৃতীয় রুদ্রসেনের বা তাঁহার রাজ্য আক্রমণকারী অন্য কোনও রাজার। + তৃতীয় রুদ্রসেনের পর তাঁহার ভাগীনেয় সিংহসেন মহাক্ষত্রপ উপাধি ধারণ করিয়া সিংহাসনে উপবেশন করেন, ৩০২ হইতে ৩০৪ শক সম্বৎ পর্য্যন্ত ইনি রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইনি যে রুদ্রসেনের ভাগীনেয় ছিলেন, তাহা ইহাঁর রৌপ্যমুদ্রা হইতে জানিতে পারা যায়, ইহাঁর মুদ্রায় এইরূপ লিখিত আছে,—"রাজ্ঞো মহাক্ষত্রপস স্বামী রুদ্রসেনস-স্বস্রিয়স রাজ্ঞো মহাক্ষত্রপস স্বামী সিংহসেনস।" সিংহসেনের রুদ্রসেন নামে এক পুত্র ছিল। পিতার পর রুদ্রসেন মহাক্ষত্রপ হন, ইহাঁর রৌপ্য মুদ্রার লিপি এমনই কদর্য্য যে, তাহা পাঠ করা দুরূহ। অনুমান হয় যে, ইনি ৩০৪ হইতে ৩০৭ শক সম্বৎ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। রুদ্রসেনের পুত্র বা তাঁহার কোনও উত্তরাধিকারীর সঠিক, বিবরণ জানিতে পারা যায় না, তৃতীয় রুদ্রসিংহের মুদ্রা হইতে মহাক্ষত্রপ সত্যসিংহের নাম পাওয়া যায়, কিন্তু এই সত্যসিংহ রুদ্র-সেনের আত্মীয় ছিলেন কি না, তাহা নির্ণয় করা কঠিন ; সম্ভবতঃ ৩০৭ হইতে ৩১০ শক সম্বৎ পর্য্যন্ত ইনি রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইহার পর সত্যসিংহের পুত্র তৃতীয় রুদ্রসিংহ মহাক্ষত্রপ উপাধি গ্রহণ করেন, ইনিই ক্ষত্রপ বংশের শেষ রাজা ছিলেন। ইনি যে কতদিন রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহা ঠিক জানা যায় নাই ;—কারণ ইহাঁর মুদ্রায় যে সম্বৎ লিখিত আছে তাহা অস্পষ্ট, তবে ইনি যে ৩১০ শক সম্বতের পর হইতে রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহা নিঃসন্দেহ। তৃতীয় খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগ হইতেই ভারতে গুপ্তরাজগণের প্রভুত্ব বর্দ্ধিত হইতে থাকে এবং ভারতের বিভিন্ন রাজগণ ইহাঁদের অধীনতা স্বীকার করেন। এলাহাবাদে

---

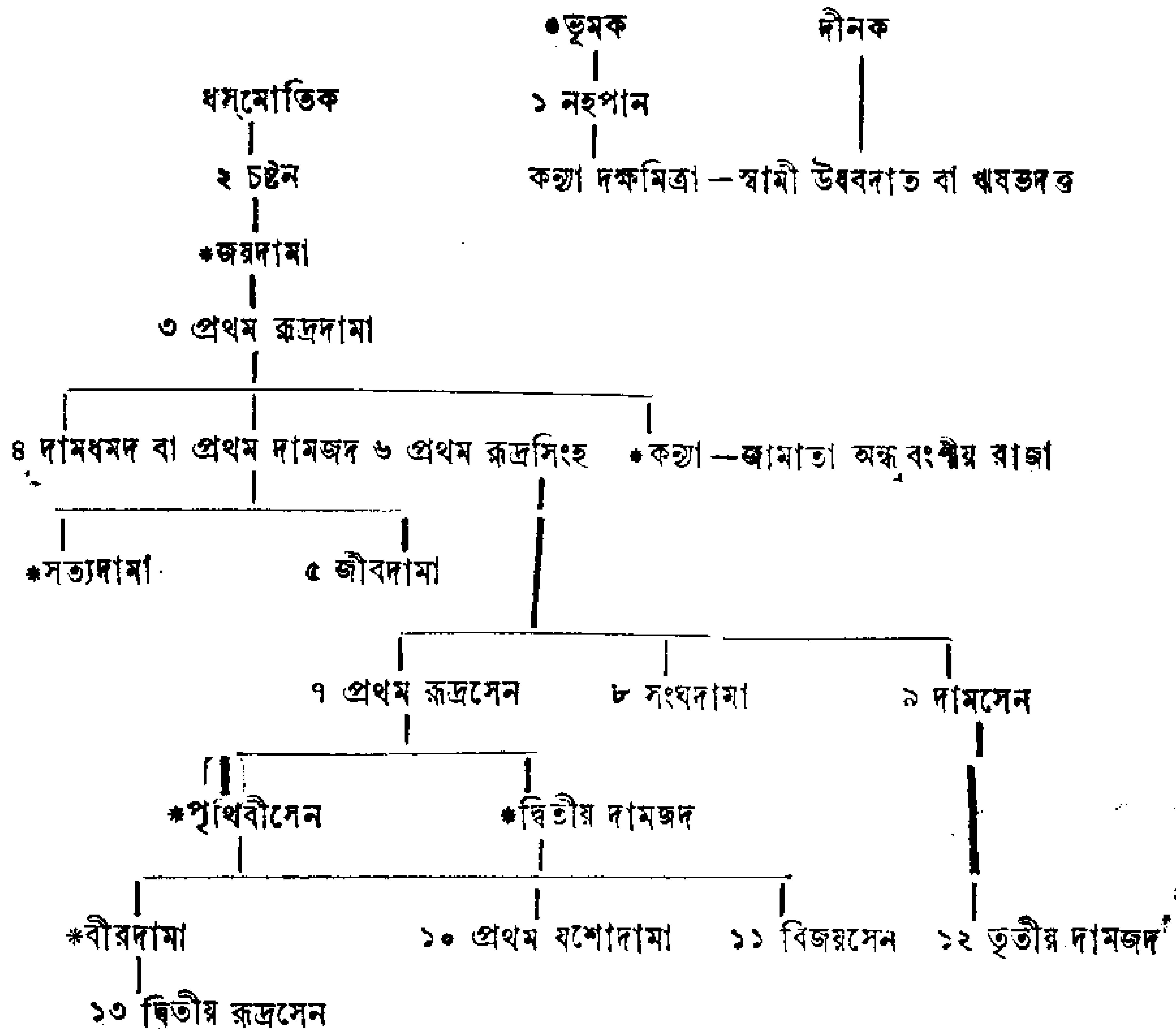
* See Royal Asiatic Society's Journal of Bombay Branch. Vol. XX. P. 209. 1899.

+ Rapson's Catalogue of the Andhra and Kshatrap dynasty.—P. CXLV.

সমুদ্রগুপ্তের যে শিলালিপি আছে, তাহা হইতে জানিতে পারা যায় যে, ভারতের শক রাজগণও সমুদ্রগুপ্তের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন। ৩৮০ খৃষ্টাব্দে সমুদ্রগুপ্তের পুত্র চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসনে উপবিষ্ট হন, ৩৮৮ খৃষ্টাব্দে ইনি সমগ্র ভারত জয় করিয়া অবশিষ্ট স্বাধীন শকরাজগণকেও পরাস্ত করেন। এইরূপে ভারত হইতে শক জাতির আধিপত্যের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষত্রপ রাজগণের আধিপত্যও লুপ্ত হইয়া যায়, বর্ত্তমানে কয়েকখানি শিলালিপি ও কয়েক সহস্র মুদ্রা ব্যতীত তাঁহাদের অস্তিত্বের কোনও চিহ্নই নাই। অনুমান ও প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া ভারতীয় ক্ষত্রপ রাজবংশের একটী তালিকা প্রদত্ত হইল। ইহাতে ভ্রমপ্রমাদ থাকাই সম্ভব, কারণ, এই রাজবংশের কোন সঠিক বিবরণ অদ্যাবধি পাওয়া যায় নাই। এই বংশ-তালিকায় যাঁহাদের নামের পূর্ব্বে ১, ২ ইত্যাদি সংখ্যা লিখিত আছে তাঁহারা 'মহাক্ষত্রপ' হইয়াছিলেন, যাঁহারা কেবলমাত্র 'ক্ষত্রপ' হইয়াছিলেন, তাঁহাদের নামের পূর্ব্বে তারার চিহ্ন দেওয়া হইল; যাঁহারা 'ক্ষত্রপ' বা মহাক্ষত্রপ কিছুই হন নাই, তাঁহাদের নামের পূর্ব্বে কোন চিহ্ন নাই। যে সকল ক্ষত্রপ বা মহাক্ষত্রপের পুত্র বা উত্তরাধিকারী ছিল না, তাঁহাদের বংশ সেই স্থানেই শেষ করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং তাঁহাদের পর নূতন ক্ষত্রপ বা মহাক্ষত্রপের নাম লিখিত হইয়াছে; এই নবীন ক্ষত্রপ বা মহাক্ষত্রপের সহিত পূর্ব্ববর্ত্তী মহাক্ষত্রপ বা ক্ষত্রপের কি সম্বন্ধ ছিল, তাহা স্থির করা কঠিন। ভারতীয় ক্ষত্রপ রাজগণের বংশ-তালিকা এইরূপ :—(পর পৃষ্ঠা দেখুন)

ক্ষত্রপ রাজগণের জাতি সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে মতভেদ আছে, কেহ বলেন, ইহাঁরা ক্ষত্রিয়, কেহ বলেন, ইহাঁরা ভারতের প্রাচীন অনার্য্য অধিবাসী, কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন,—ইহাঁরা মধ্য এশিয়ার মূল নিবাসী এবং জাতিতে শক; শেষোক্ত মতটিই সঠিক ও সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। যদিও পরবর্ত্তী ক্ষত্রপগণ ভারতীয় নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তবু 'ধম্'—'জদ্'—'দামন' প্রভৃতি শব্দ হইতে ইহাঁদের বৈদেশিকতা স্পষ্ট প্রমাণিত হয়; ইহাঁরা যে ভিন্ন দেশ হইতে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, দুই একজন ঐতিহাসিক ব্যতীত সকলেই এ কথা স্বীকার করিয়াছেন। ভূমক, নহপান ও চষ্টনের মুদ্রা খরোষ্ঠী অক্ষরে মুদ্রিত হওয়ায় এবং নহপান, চষ্টন, ধস্মোতিক, দামজদ্ ইত্যাদি নাম হইতেও প্রমাণিত হয় যে, ইহাঁরা বিদেশী। নাসিকে একখানি লিপি পাওয়া গিয়াছে * উহা হইতে জানিতে পারা যায় যে, নহপানের জামাতা উষবদাত জাতিতে শক

* See Epigraphica Indica, Vol. VIII. P. 85.


*ভূমক
দীনক
ধসমোতিক
১ নহপান
২ চষ্টন
কন্যা দক্ষমিত্রা—স্বামী উষবদাত বা ঋষভদত্ত
*জয়দামা
৩ প্রথম রুদ্রদামা
৪ দামধমদ বা প্রথম দামজদ
৬ প্রথম রুদ্রসিংহ
*কন্যা—জামাতা অন্ধ্রবংশীয় রাজা
*সত্যদামা
৫ জীবদামা
৭ প্রথম রুদ্রসেন
৮ সংঘদামা
৯ দামসেন
*পৃথিবীসেন
*দ্বিতীয় দামজদ
*বীরদামা
১০ প্রথম যশোদামা
১১ বিজয়সেন
১২ তৃতীয় দামজদ
১৩ দ্বিতীয় রুদ্রসেন

- ১৩ দ্বিতীয় রুদ্রসেন
  - ১৪ বিশ্বসিংহ
    - স্বামী জীবদামা
      - *দ্বিতীয় রুদ্রসিংহ
        - *দ্বিতীয় যশোদামা
  - ১৫ ভর্ত্তৃদামা
    - *বিশ্বসেন
    - ১৬ দ্বিতীয় রুদ্রদামা
      - ১৭ তৃতীয় রুদ্রসেন
        - ১৮ সিংহসেন
          - ১৯ চতুর্থ রুদ্রসেন
      - *কন্যা
        - ২০ সত্যসিংহ
          - ২১ তৃতীয় রুদ্রসিংহ

ছিলেন। প্রায় ৪০০ বৎসর ভারতে রাজত্ব করিয়া শেষে ইহাঁরা ভারতীয় নাম ও ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ক্ষত্রিয়গণের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধও স্থাপন করিতেন, কিন্তু পূর্ব্বের ক্ষত্রপগণ সনাতন ও বৌদ্ধ উভয় ধর্ম্মেরই পক্ষপাতী ছিলেন এবং কেবল শক জাতির সহিতই বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিতেন। ইহাঁরা যে জাতিতে শক ছিলেন, তাহার আর একটি প্রমাণ এই যে, কয়েক শতাব্দী ভারতে রাজত্ব করা সত্বেও ইহাঁরা 'মহারাজ' বা 'মহারাজাধিরাজ' প্রভৃতি ভারতীয় উপাধি গ্রহণ করেন নাই এবং নিজেদের মুদ্রায় শক সম্বৎই মুদ্রিত করাইয়াছিলেন।

ফার্গুসন সাহেব স্থির করিয়াছেন যে, কুশানরাজা কনিষ্ক কর্ত্তৃক শক সম্বৎ প্রচলিত হইয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে ইহার বিরুদ্ধে বিস্তর প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়া থাকে। এই বিরুদ্ধ প্রমাণের মধ্যে প্রধান এই যে, কনিষ্ক জাতিতে কুশান ছিলেন—শক ছিলেন না। যদি এইরূপ হয় যে, এই সম্বৎ কনিষ্কের দ্বারাই প্রচলিত হইয়াছিল এবং ক্ষত্রপগণের পরাক্রম ও রাজ্যবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের লিপি আদিতে লিখিত হইয়া ইহা জনসাধারণে প্রচারিত হয় এবং সেই জন্যই এই সম্বতের সহিত কুশান রাজা কনিষ্কের নাম যুক্ত না হইয়া, যাঁহারা এই সম্বৎ সাধারণে প্রসিদ্ধ করিয়াছিলেন, সেই শক জাতির নামের সহিত যুক্ত হইয়া, উহা 'শক সম্বৎ' নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। শক সম্বৎ সম্বন্ধে এইরূপ হওয়াই সম্ভব; কিন্তু এ সম্বন্ধে এখনও স্থির নিশ্চয় হয় নাই। কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন, এই সম্বৎ প্রতিষ্ঠানপুরের রাজা শালিবাহন কর্ত্তৃক প্রচলিত হইয়াছিল; জনপ্রভু সূরি-রচিত "কল্পপ্রদীপে"ও এই কথা লিখিত হইয়াছে। অলবরুণী লিখিয়াছেন,—শক রাজাকে পরাস্ত করিয়া, এই বিজয়ের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ বিক্রমাদিত্য এই সম্বৎ প্রচলিত করেন।

কচ্ছ ও কাঠিয়াবাড় হইতে প্রাপ্ত ক্ষত্রপগণের সর্ব্বপ্রথম ৫২ হইতে ১৩৩ শক সম্বৎ অবধির শিলালিপিতে এবং ১০০ হইতে ৩১০ শক সম্বৎ পর্য্যন্ত মুদ্রায় কেবলমাত্র সম্বৎই লেখা আছে। * এই সম্বতের সহিত সর্ব্বপ্রথম 'শক' শব্দের বিশেষণ বরাহমিহির রচিত সংস্কৃত পুস্তক 'পঞ্চসিদ্ধান্তিকা'য় দৃষ্ট হয়,—"সপ্তাশ্বিবেদসংখ্যংশককালমপাস্য চৈত্রশুক্লাদৌ"—ইহা হইতে জানিতে পারা যায় যে, ৪২৭ বর্ষে এই সম্বৎ শক সম্বৎ নামে প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত হয়; ইহার দুইটি অর্থ হইতে পারে, শক রাজার সম্বৎ বা শক জাতির সম্বৎ।

* See Epigraphica Indica, Vol. VIII. P. 42.

১২৭৬ শক সম্বতে যাদব রাজা বুক্করায়ের দানপত্রে উক্ত সম্বতের সহিত সর্ব্বপ্রথম শালিবাহনের নাম দৃষ্ট হয়,—"নৃপশালিবাহন শকে ১২৭৬" *। মালওয়া সম্বতের সহিত বিক্রমাদিত্যের নাম যুক্ত দেখিয়া, খ্রীষ্টিয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে দক্ষিণ ভারতবাসিগণও উক্ত শক সম্বতের সহিত তাঁহাদের কথা প্রসিদ্ধ রাজ শালি-বাহনের নাম যুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন, এইরূপ অনুমান হয়। এই শালিবাহন অন্ধ্র ভৃত্যবংশীয় রাজা ছিলেন, ইহাঁরা খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দী হইতে ২২৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দক্ষিণ ভারতে রাজত্ব করেন, ইহাঁদের রাজধানী গোদাবরী তটস্থিত প্রতিষ্ঠানপুর ছিল; এই বংশের বর্ণন বায়ু, মৎস্য, ব্রহ্মাণ্ড, বিষ্ণু ও ভাগবত পুরাণে পাওয়া যায়। এই বংশেই শাতকর্ণী নামে একজন পরাক্রমশালী রাজা হন। খুব সম্ভব, দক্ষিণ ভারতবাসিগণ উক্ত সম্বতের সহিত তাঁহারই নাম যুক্ত করিয়াছিল। কিন্তু শালিবাহন বা তাঁহার বংশধরগণের শিলালিপিতে কেবল মাত্র রাজ্য বর্ষ লিখিত আছে, ইহা হইতে স্পষ্ট জানা যায় যে, শালিবাহন বা তাঁহার বংশধরগণ এই সম্বতের প্রচারক নহেন; এই বংশের রাজ্যকাল শেষ হইবার পর একাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত উক্ত সম্বতের সহিত শালিবাহনের নাম পাওয়া যায় না, সুতরাং ইহা নিঃসন্দেহ যে, শালিবাহন উক্ত সম্বৎ প্রচলিত করেন নাই। কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন, এই সম্বৎ কুশানরাজা কনিষ্কের দ্বারা প্রচলিত হইয়াছিল; কেহ বলেন, ইহা ক্ষত্রপ নহপান কর্ত্তৃক প্রচলিত হইয়া-ছিল; কেহ বলেন, শক রাজা বেনস্ ইহার প্রতিষ্ঠাতা; কেহ বা ইহাকে শক্ রাজা অজের (Azeo) প্রচলিত বলিয়া থাকেন। অদ্যাবধি এই সম্বৎ সম্বন্ধে কোনরূপ স্থির নিশ্চয় না হইলেও, ইহা যে কুশানরাজা কনিষ্ক কিংবা ক্ষত্রপ নহপান কর্ত্তৃক প্রচলিত হইয়াছিল, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। †

ইহাঁদের মধ্যে কোন্ ভাষা প্রচলিত ছিল, তাহা লইয়া ঐতিহাসিকগণের মধ্যে মতভেদ আছে। কেহ বলেন, ইহাঁদের প্রচলিত ভাষা খরোষ্ঠী ছিল, কেহ বলেন সংস্কৃত, কেহ বলেন প্রাকৃত, কেহ বলেন সংস্কৃত মিশ্র প্রাকৃত ভাষাই ইহাঁদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। অদ্যাবধি এই রাজবংশের বারখানি শিলালিপি ও একখানি

* List of Inscription's of Souh India, P. 78. No. 455.

† "Kanishka was the real founder of the era which is now known by the name of Vikrama." A. S. of India by Cunningham, Vol. II. P. 68. foot-note.

তাম্রপত্র পাওয়া গিয়াছে। * ইহার মধ্যে নহপানের কন্যা দক্ষমিত্রা, জামাতা উষবদাত ও দৌহিত্র দেবনক বা মিত্রদেবের লিপি প্রাকৃত ভাষায় লিখিত; নহপানের মন্ত্রী অযমের লিপিও প্রাকৃত ভাষায় লিখিত। প্রথম রুদ্রদামা, রুদ্রসিংহ ও রুদ্রসেনের লিপি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত, কিন্তু ভূমক হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার পরবর্ত্তী যে সকল ক্ষত্রপের মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, সে সকলের লিপিই প্রাকৃত মিশ্র সংস্কৃত ভাষায় লিখিত; এই সকল মুদ্রায় ষষ্ঠী বিভক্তির "স্য" এর স্থানে "স" লিখিত আছে; যথা,—"রুদ্রসেনস পুত্রস।" এই সকল মুদ্রার বিশেষত্ব এই যে, "রাজ্ঞোক্ষত্রপস" পদে ক বর্গ সম্মুখে হওয়া সত্বেও সন্ধি নিয়মের বিরুদ্ধে "রাজ্ঞঃ" এর বিসর্গ লোপ করিয়া ওকার দেওয়া হইয়াছে।

নহপানের জামাতা উষবদাতের চারিখানি শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে দুইখানির লিপিকাল নাই ১, তৃতীয়খানির সম্বৎ ভাঙিয়া গিয়াছে, কেবল চৈত্র শুক্লাপূর্ণিমা পড়া যায় ২, চতুর্থ লিপিখানিতে ৪১, ৪২ ও ৫৫ শক সম্বৎ লিখিত আছে; কিন্তু লিপিখানি ৪২ শক সম্বতেই লিখিত ৩, উষবদাতের পত্নী—নহপানের কন্যা দক্ষমিত্রার সম্বৎ শূন্য একখানি লিপি ৪, এবং উষবদাতের পুত্র দেবনকের একখানি লিপি পাওয়া গিয়াছে ৫। মহাক্ষত্রপ নহপানের মন্ত্রী অযমের ৪৬ শক সম্বতের একখানি শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, ইনি বৎস্ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন ৬। জয়দামার পুত্র প্রথম রুদ্রদামার ৭২ শক সম্বৎ মার্গশীর্ষ কৃষ্ণ প্রতিপদার একখানি লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে †। রুদ্রদামার পুত্র প্রথম রুদ্রসিংহের দুইখানি লিপি পাওয়া গিয়াছে, ইহার মধ্যে একখানি শক সম্বত ১০৩ বৈশাখ শুক্লাপঞ্চমীর ‡ অন্যখানি চৈত্র শুক্লাপঞ্চমীর, ইহার সম্বৎ

---

* See translation of this copper plate by J. Dowson in Royal Asiatic Society's Journal, Vol. XX. P. 221.

(১) See Ep. Ind, Vol. VII. P, 57. and Vol. VIII P. 78.

(২) Ep. Ind. Vol. VIII. P. 85.

(৩) Ep. Indica. Vol. VIII. P. 82.

(৪) Ep. Ind. Vol. VIII. P. 81.

(৫) Ep. Ind, Vol. VIII. P. 56.

(৬) Royal Asiatic Society's Journal of Bombay Branch. Vol. V. P. 169.

† Epigraphica Indica. Vol. VIII. P. 36.

‡ Indian Antqr. Vol. X. P. 157.

নষ্ট হইয়া গিয়াছে *। প্রথম রুদ্রসিংহের পুত্র প্রথম রুদ্রসেনের দুইখানি লিপি পাওয়া গিয়াছে, প্রথমখানি শক সম্বৎ ১২২ বৈশাখ কৃষ্ণাপঞ্চমীর †, দ্বিতীয়খানি শক সম্বৎ ১২৭ ভাদ্র কৃষ্ণাপঞ্চমীর ‡। ইহাঁদের সময়ের শিলালিপি ও মুদ্রার ভাষা প্রাকৃত ও প্রাকৃত মিশ্র সংস্কৃত হইলেও ইহাঁদের সময়ের অক্ষর ও অঙ্ক ব্রাহ্মী এবং খরোষ্টীই ছিল; ক্ষত্রপগণের সমস্ত লিপি এবং মুদ্রা, খরোষ্ঠী ও ব্রাহ্মী অক্ষরে লিখিত। ভূমক, নহপান ও চষ্টনের মুদ্রায় ব্রাহ্মী এবং খরোষ্ঠী উভয় লিপিই আছে; কিন্তু পরবর্ত্তী ক্ষত্রপগণে মুদ্রা কেবলমাত্র ব্রাহ্মী অক্ষরেই লিখিত হইয়াছে। খরোষ্ঠী লিপি ফারসী অক্ষরের ন্যায় দক্ষিণ দিক হইতে বাম দিকে লিখিত হইয়া থাকে। ইহাঁদের সময়ের অঙ্ক বা সংখ্যাবাচক অক্ষরের বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে একক—দশক ইত্যাদি নাই। যেমন এক হইতে নয় পর্য্যন্ত অঙ্ক স্বতন্ত্র লিখিত হইয়া থাকে, তেমনি দশ হইতে এক শত অবধি অঙ্ক ও কেবলমাত্র একটি স্বতন্ত্র চিহ্ন দ্বারা লিখিত হইত এবং শতের অঙ্কে প্রয়োজনানুসারে এক-দুই চিহ্ন যুক্ত করিয়া দিলে ঐ একটি অঙ্কই ২০০, ৩০০ রূপে পরিণত হইত। ঐ সময় এক শত পঞ্চান্ন লিখিতে হইলে, প্রথমে এক শত, পরে পঞ্চাশ, পরে পাঁচ লেখা হইত, যেমন ১০০+৫০+৫=১৫৫।

বিভিন্ন ক্ষত্রপ রাজার রাজত্ব কালের কয়েক সহস্র মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। ভূমকের কেবলমাত্র তাম্র মুদ্রাই পাওয়া গিয়াছে, ইহার এক দিকে তীর, বজ্র ও খরোষ্ঠী অক্ষরে লিখিত লিপি এবং অন্য দিকে সিংহ, ধর্ম্মচক্র ও ব্রাহ্মী অক্ষরের লিপি আছে। নহপানের রৌপ্যমুদ্রায় একদিকে রাজার প্রতিমূর্ত্তি ও গ্রীক অক্ষরে লিখিত লিপি এবং অন্যদিকে বান, বজ্র ও খরোষ্ঠী এবং ব্রাহ্মী অক্ষরের লিপি আছে; ইহাঁর তাম্র মুদ্রায় রাজার মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে বৃক্ষ অঙ্কিত আছে।

চষ্টন ও তাঁহার উত্তরাধিকারিগণের রৌপ্য, তাম্র প্রভৃতি বিভিন্ন ধাতুর মুদ্রা পাওয়া যায়, ইহার মধ্যে রৌপ্য মুদ্রাই অধিক পাওয়া যায়; অন্যান্য ধাতুর মুদ্রা কচিৎ কখনও পাওয়া যায়, এবং ইহাতে লিখিত লিপিও বিশেষ সংশয়াপন্ন।

ক্ষত্রপগণের রৌপ্য মুদ্রার আকার গোল, প্রাচীনকালে ইহাকে "কার্ষাপন"

* Royal Asiatic Society's Journal. 1890. P. 651.

† See J. R. A. S. 1890. P. 652.

‡ Ind. Ant. Vol. XII. P. 32.

বলা হইত ; ইহার ওজন প্রায় ৩৪ হইতে ৩৬ গ্রেণ পর্য্যন্ত, অর্থাৎ প্রায় ১৪ রতি। নাসিক হইতে উষবদাতের যে লিপি পাওয়া গিয়াছে তাহাতে লিখিত আছে যে, ৭০০০০ কার্ষাপন ২০০০ স্বর্ণমুদ্রার তুল্য ; ইহা হইতে জানিতে পারা যায় যে, ৩৫ কার্ষাপন একটি স্বর্ণমুদ্রার তুল্য ছিল। এই স্বর্ণমুদ্রার ওজন ১২৪ গ্রেণ বা ৬ মাসা ২ রতির কাছাকাছি। অতএব, ঐ সময় স্বর্ণের মূল্য রৌপ্য অপেক্ষা দশ গুণ অধিক ছিল।

অন্যান্য জাতির মধ্যে যেমন পিতার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং তাঁহার পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সিংহাসনের অধিকারী হইতেন, ক্ষত্রপগণের মধ্যে সেরূপ কোনও নিয়ম ছিল না। পিতার মৃত্যুর পর অগ্রে জ্যেষ্ঠ পুত্র পরে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সিংহাসনে উপবেশন করিতেন, এইরূপ মৃত রাজার যতগুলি পুত্র থাকিত,—বয়ঃক্রম অনুসারে, পর পর তাঁহারা সকলেই রাজ্যের উত্তরাধিকারী হইতেন, এবং সর্ব্বশেষে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার জ্যেষ্ঠ পুত্র সিংহাসনে বসিতেন।

শ্রীবিমলকান্তি মুখোপাধ্যায়।

সাহিত্য ; ৩০শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা।

বিহার।

রাজগিরি-দর্শনে।

একি সেই মগধ-বিহার !
যুগ-যুগান্তর গত   ভারত-রাজন্য কত
সুখে যেথা করিত বিহার,—
একি সেই মগধ-বিহার !

একি সেই মগধ-বিহার !
যেথায় বৌদ্ধশ্রমণ   করি ইন্দ্রিয়দমন
বিষয় করিত পরিহার—
একি সেই মগধ-বিহার !

কোন্ যুগে বেদব্যাস হেথা *
বশিষ্ঠাদি মুনিগণ   করিলেন আমন্ত্রণ
মহাযজ্ঞে তীর্থে মহাচেতা—
কোন্ যুগে বেদব্যাস হেথা !

সে অবধি হইল জাগ্রত—
সরস্বতী গোদাবরী   আসিল গো-রূপ ধরি
মহাতীর্থে হ'ল পরিণত।
সে অবধি হইল জাগ্রত।

---

* কথিত আছে যে, মহামুনি বেদব্যাস এইখানে এক মহাযজ্ঞ সম্পাদনের জন্য বশিষ্ঠাদি অনেক অনেক মুনিগণকে আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছিলেন। সেই অবধি এই স্থান একটী শ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিতেছে।

শোভিল রে কুণ্ড সারি সারি—
পাষাণেতে বহিল রে তপ্ত ধারা ঝরঝরে,
ক্ষীরসম বহে পূত বারি।
শোভিল রে কুণ্ড সারি সারি। *

সে সময়ে হ'ত বেদগান।
এই পুণ্য তপোভূমে, সুগন্ধিত হোমধূমে
ছাইত'রে সবাকার প্রাণ!—
সে সময়ে হ'ত বেদগান!

এখনো ত সেই পঞ্চগিরি।
'বৈভার,' 'বিপুলাচল,' 'রত্নকূট' 'রত্নাচল',
'গিরিব্রজ' রহিয়াছে ঘিরি'
এখনো ত সেই পঞ্চগিরি।

'ব্রহ্মকুণ্ডে' বহে সপ্তধারা
পুণ্য স্রোতে করি স্নান, চারিদিকে রম্যস্থান,
বসে' দেখি হই আত্মহারা!
ব্রহ্মকুণ্ডে বহে সপ্তধারা।

পূর্ব্বদিকে 'শৃঙ্গ ঋষিকুণ্ডে'
'বিপুল অচল' হ'তে তপ্তধারা বহে স্রোতে
ঢালে বারি যেন করি-শুণ্ডে।
পূর্ব্বদিকে 'শৃঙ্গ ঋষিকুণ্ডে'। †

দেখ ওই 'বৈভার অচল'!
এখনো বহিছে উহা নিবিড় গুম্ফা গুহা

---

* মহর্ষি বেদব্যাস ঋষিগণের জলপানের জন্য এই স্থানে পার্ব্বত্য জলধারাগুলিতে গঙ্গা যমুনা প্রভৃতি নদীসমূহের পূত সলিলের আবাহন করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধি আছে যে, সেই অবধি এ সকল ধারা স্বস্বাদু অমৃতধারায় পরিণত হয়।

† শৃঙ্গঋষিকুণ্ডের আর এক নাম 'মকদুম কুণ্ড'। এই নাম মুসলমানেরা মকদুম্ পীরের নামে দিয়াছেন। বর্ত্তমানে এই কুণ্ডটি মুসলমানদেরই হস্তগত।

স্থপ্রাচীন কীর্ত্তি অবিচল,
দেখ ওই 'বৈভার অচল'।

'সোমনাথ' 'সিদ্ধিনাথ' নামে
দেখিবে ঐ গিরিশিরে প্রাচীন দেব-মন্দিরে
মাটী-চাপা ছিল ধরাধামে—
'সোমনাথ' 'সিদ্ধিনাথ' নামে।

বৌদ্ধদের সপ্তপর্ণী গুহা—
জরাসন্ধ-কোষাগার ছিল হেথা জেনো সার
গিরিতলে দেখিবে গো উহা—
বৌদ্ধদের সপ্তপর্ণী গুহা। *

পুরাকালে জরাসন্ধ-রাজ
প্রাচীর-বেষ্টিত পুরী শত্রুভয় হেথা দূরি'
নিরমিলা দুর্গ গিরিমাঝ—
পুরাকালে জরাসন্ধরাজ।

শোভে যেথা শৈল 'গিরিব্রজ'
সেথা মহাসমারোহে বিচরিত দর্প মোহে
জরাসন্ধরাজ-অশ্বগজ।
শোভে যেথা শৈল 'গিরিব্রজ'!

আশ্চর্য্য দেখিনু কিবা আজ!
ভীমসেন জরাসন্ধ করেছিলা যেথা দ্বন্দ্ব—
আজিও তা করিছে বিরাজ।
আশ্চর্য্য দেখিনু কিবা আজ!

সকলই সময়ের গতি।
বিধির ইচ্ছায় সব ঘটিছে ঘটনা নব—

* 'বৈভার' অচলের নিম্নতলে স্থিত যে গুহাটী বৌদ্ধেরা প্রসিদ্ধ সপ্তপর্ণীগুহা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, হিন্দুরা উহাকে পৌরাণিক যুগের জরাসন্ধ রাজার কোষাগার বলিয়া দাবী করেন।

উত্থান পতন অবনতি।
সকলই সময়ের গতি।

কত সৌধ কত না মন্দির
আজিও তোমার কোলে প্রাচীন রহস্য খোলে
অট্টালিকা তুলে আছে শির।
কত সৌধ কত না মন্দির।

কোথা আজি ‘বুদ্ধ’ ‘চন্দ্রগুপ্ত’।
কত অশোকের স্তূপ বক্ষে ধ’রে আছ চুপ
কালে কালে হ’ল সব লুপ্ত—
কোথা আজি বুদ্ধ চন্দ্রগুপ্ত।

আজি হেরি কি দশা ইহার!
রাজরাজেশ্বর ভূপ কত শত বুদ্ধ রূপ—
যার কোলে করিত বিহার।
আজি হেরি কি দশা ইহার!

হে বিহার, তুমি কীর্ত্তিমান!
কক্ষে কক্ষে শিলামূর্ত্তি আজো ধরে তব কীর্ত্তি—
প্রাচীনতা করে সপ্রমাণ,
হে বিহার, তুমি কীর্ত্তিমান্।

শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বিষ্ণুপুর অথবা দ্বিতীয় দিল্লী।

বিষ্ণুপুর সঙ্গীতচর্চ্চার কেন্দ্রভূমি ছিল, এখনও তাহা সমভাবে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। বিষ্ণুপুরের স্বাধীন নৃপতিবৃন্দ কর্ত্তৃক এই সঙ্গীতের উন্নতি হইয়াছিল; শুনা যায়, মহারাজ চৈতন্যসিংহ দেব বাহাদুরের সময়ে সঙ্গীতের বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। মহারাজ বাহাদুর দিল্লী হইতে তানসেনের বংশধর বাহাদুর খাঁ সাহেবকে (বাহাদুর সেন) আনাইয়া বিষ্ণুপুর রাজধানীতে তাঁহাকে মাসিক ৫০০৲ টাকা বেতন দিয়া গায়কপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং বিষ্ণুপুরের লোককে সঙ্গীত শিক্ষা দিবার জন্য খাঁ সাহেবকে আদেশ করিয়াছিলেন। তিনি রাজাজ্ঞা যথার্থই পালন করিয়াছিলেন। বাহাদুর সেনের প্রধান শিষ্য স্বর্গীয় গদাধর চক্রবর্ত্তী। গদাধর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পুত্র স্বর্গীয় রামগোপাল চক্রবর্ত্তী। ইনি ইঁহার পিতার নিকট গান শিক্ষা করিয়া তৎপরে প্রসিদ্ধ খেয়ালি ৺ কানাইলাল চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নিকটও কিছু শিক্ষা করিয়াছিলেন। ৺ রামগোপাল মহাশয়ের পুত্র ৺ অনন্তলাল চক্রবর্ত্তী, ৺ মাধবলাল চক্রবর্ত্তী ৺ দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্ত নীলমাধব চক্রবর্ত্তী। ইহাঁদের বংশের মধ্যে কেবল মাত্র নীলু বাবুই জীবিত আছেন। ইনি ৺ মহারাজ স্তর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের দরবারে সঙ্গীতাচার্য্যপদে নিযুক্ত ছিলেন, এখন পেন্‌সন্ লইয়াছেন। ইহাঁরা সকলেই সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। ৺ গদাধর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নিকট বিষ্ণুপুরের প্রধান গায়ক ৺ রামশঙ্কর ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রথমে গান শিক্ষা করিয়া তৎপরে দিল্লীতে শিক্ষা করেন। ৺ কানাইলাল চক্রবর্ত্তী প্রথমে ৺ রামশঙ্করের নিকট গান শিক্ষা করিয়াছিলেন, তৎপরে দিল্লীতে শিক্ষা হয়। ৺ গদাধর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের আরও দুই জন উত্তম শিষ্য ছিলেন। একজনের নাম ৺ নিতাই নাজির, কনিষ্ঠ ৺ বৃন্দাবন নাজির। এই দুই ভ্রাতার বংশে এখন কেহই নাই। ইহাঁরা কায়স্থ ছিলেন। বূড়া ধর্ম্ম নামক প্রসিদ্ধ দেবতা মাড়োর সন্নিকটে এখন ভগ্নবাটীর চিহ্ন রহিয়াছে। ৺ হলধর গোস্বামী বিষ্ণুপুরের একজন প্রসিদ্ধ খেয়ালি ছিলেন। ইহাঁর খেয়াল গানের প্রশংসা শুনা যায়। ইহাঁর গ্বালিয়ারে শিক্ষা হয়। ৺ শ্যাম গোস্বামী নামক একজন সঙ্গীতাচার্য্য ছিলেন। ইহাঁদের বংশে এখন কেহই নাই। ৺ দীননাথ নামক একজন খেয়াল টপ্পা এবং তবলা বাদনে বিখ্যাত ছিলেন। ইহাঁর পুত্র ৺ গঙ্গানারায়ণ গোস্বামী। ইনিও ইহাঁর পিতার নিকট গান শিক্ষা করিয়াছিলেন।

দুঃখের বিষয়, ইনি অনেক দিন জীবিত ছিলেন না। ৺ রামশঙ্কর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সঙ্গীতের টোল ছিল। ইনি বিদেশী লোককে খোরাক দিয়া গান শিক্ষা দিতেন এবং ইহাঁর নিকট বহুসংখ্যক লোক গান শিক্ষা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে নামজাদা শিষ্যগণের নাম দেওয়া হইতেছে। ইহাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রসিদ্ধ গায়ক ৺ রামকেশব ভট্টাচার্য্য, ৺ অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ৺ যদুনাথ ভট্ট (ইনি প্রথমে রামশঙ্করের নিকট শিক্ষা করিয়া তৎপরে গোবরডাঙ্গার বিখ্যাত জমিদার মহাশয়ের গায়ক ৺ গঙ্গানারায়ণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট গান শিক্ষা করেন) ৺ ক্ষেত্র মোহন গোস্বামী, ৺ কেশবলাল চক্রবর্ত্তী। ৺ ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী কলিকাতা রাজধানীতে থাকিয়া লুপ্ত সঙ্গীতের পুনরুদ্ধার সাধনকল্পে সঙ্গীতের নানাবিধ পুস্তক স্বরলিপি সহ প্রকাশ করিয়া বিশেষ সম্মানভাজন হইয়া গিয়াছেন। ৺ কেশবলাল চক্রবর্ত্তী, ৺ রামকেশব ভট্টাচার্য্য, ৺ যদুভট্ট প্রভৃতি চারিদিকে সঙ্গীতের আলোক ফুটাইয়া গিয়াছেন। বিষ্ণুপুর রাজধানীতে থাকিয়া একমাত্র ৺ অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ই বিষ্ণুপুরে সঙ্গীতের গৌরব আজ পর্য্যন্ত সমভাবে দেদীপ্যমান রাখিয়া গিয়াছেন। এমন কি, ইনি যদি সকলকে গান শিক্ষা না দিতেন, তাহা হইলে বিষ্ণুপুরে আজ গানের চর্চ্চা উঠিয়া যাইত এবং সঙ্গীত পূর্ব্ব গৌরব রাখিতে অপারগ হইত। এক্ষণে ৺অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট বিষ্ণুপুরের গায়কগণ চিরঋণী, তদ্বিষয় অসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে।

সঙ্গীতগুরু ৺অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

বঙ্গীয় সঙ্গীতাকাশের গৌরবসূর্য্য স্বর্গীয় অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ১২৩৯ বঙ্গাব্দে ৺ গঙ্গানারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ঔরসে স্বর্গীয়া নারায়ণী দেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন, পিতামহের নাম শ্রীধর বন্দ্যোপাধ্যায়। আচার্য্য বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পিতা শাস্ত্রবিষয়ক পণ্ডিত ছিলেন। অনন্তলালকেও শাস্ত্রব্যবসায়ী করিবেন সঙ্কল্প ছিল। অনন্তলালও সংস্কৃত শাস্ত্রাধ্যয়নে নিয়োজিত হইয়াছিলেন, ব্যাকরণ পাঠ সমাপ্ত করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হয়েন, সংস্কৃত শিক্ষার সময়ও মধ্যে মধ্যে অবসরকালে সঙ্গীতের আলোচনা করিতেন। সঙ্গীতের প্রতি তাঁহার স্বাভাবিকী শ্রদ্ধা ও রুচি ছিল। অদম্য স্বভাবের প্রেরণায় সঙ্গীতচর্চ্চায় সময়ক্ষেপ না করিয়া পারিতেন না। তিনি যদি স্বভাবের বিরুদ্ধে শাস্ত্র শিক্ষার জন্যই প্রাণপাত পরিশ্রম করিতেন, তাহা হইলে তিনি তাদৃশ গৌরব লাভ করিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ। জগতের ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্ত

বিরল নহে। অনন্তলাল শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিতে করিতে প্রবৃত্তির বশে সঙ্গীত শিক্ষা আরম্ভ করেন। প্রথম উদ্দেশ্য ছিল—সঙ্গীত শাস্ত্রে একটুকু লব্ধদৃষ্টি হইলে কথকতার অধ্যবসায়ে অর্থাগমের উপায় করিবেন। কিন্তু অনন্তলাল সে জন্য জন্মগ্রহণ করেন নাই। তিনি তাৎকালিক প্রসিদ্ধ গায়ক ৺ রামশঙ্কর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট শিষ্যত্বগ্রহণ করিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের শিষ্যবৃন্দের মধ্যে কেহই ইহাঁর সমকক্ষ হইতে পারেন নাই। ইনি স্বাভাবিক ধীশক্তি প্রভাবে অতি অল্পকাল মধ্যেই সঙ্গীতে অপার জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। ইহাঁর কণ্ঠস্বর স্বভাবতঃই অতি সুন্দর ছিল। তাহার উপর রীতিমত সাধনার দ্বারা ইনি সঙ্গীতবিদ্যাকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়াছিলেন। বিষ্ণুপুর রাজদরবারে তদানীন্তন সঙ্গীতাচার্য্য রামশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের পরলোকগমনের পর সেই পদে বরিত হইবার উপযুক্ত লোক অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যতীত কেহই ছিলেন না। ইনি মহারাজ গোপাল সিংহের রাজসভায় সঙ্গীতাচার্য্য নিযুক্ত হইয়া প্রধানতঃ রাজপুত্রদ্বয়কে, পরিশেষে আগন্তুক সঙ্গীতার্থী মাত্রকেই অকাতরে গান শিক্ষা দিতেন। যে ব্যক্তির কণ্ঠস্বর ভাল, তাহাকে স্বয়ং ডাকিয়া গান শিক্ষা দিতেন। ইহাঁর নিকট শিক্ষার কোনরূপ ইতর বিশেষ ছিল না, বড়লোকের প্রতিও যেমন, আবার গরীবের প্রতিও তেমন। তাঁহার হিন্দী ও বাঙ্গলা অনেকগুলি গীত রচনা ছিল। তাঁহার গীত সঙ্গীতপ্রকাশিকাতে দেখিতে পাওয়া যায়। সঙ্গীতশাস্ত্রের প্রতি তাঁহার কিরূপ আসক্তি ও ভক্তি ছিল, তাহা তাঁহার একটী গীতই পরিচয় দিতেছে। তিনি নাদবিদ্যাসম্বন্ধে লিখিয়াছেন, * * * * * "কহত দ্বিজ অনন্ত কোনহি পায়ে ইহ অন্ত, অনন্ত সুখনিদান নাদসিন্ধু অপরম্পার"। যিনি সঙ্গীতের অর্থ বুঝিয়াছেন, তিনি ইহার মহৈশ্বর্য্যময় মহিমায় অভিভূত হইয়াছেন। বৈজু, তানসেন প্রভৃতি সঙ্গীত মহারথিগণ এইরূপ বিস্ময়বিমুগ্ধভাবে নাদ শাস্ত্রকে অপার সমুদ্রবৎ ভাবিয়া দিশাহারা হইয়াছেন। অনন্তলালও নাদসিন্ধুকে 'অপরম্পার' বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি যে শিক্ষার উচ্চ গ্রামে অধিরোহণ করিয়াছিলেন, ইহাই তাহার প্রমাণ। ইনি দেবতাবিশেষ লোক ছিলেন। ইনি নির্লোভ, নিরহঙ্কার, উদারচেতা, তেজস্বী ও সত্যবাদী ছিলেন বলিয়া মহারাজ ইহাঁর বিশেষ সম্মান করিতেন। ইনি ভ্রমেও কখন মাদক দ্রব্য স্পর্শ করিতেন না। ইনি বিষ্ণুপুর রাজধানী ছাড়িয়া কোথাও যাইতে ইচ্ছুক ছিলেন না। ইহাঁর উপযুক্ত ছাত্রবৃন্দের নাম যথা:—৺ উদয়চন্দ্র গোস্বামী (রাজা স্যর সৌরীন্দ্র মোহনের সঙ্গীতাচার্য্য), কাশিমবাজারের মহারাজ শ্রীযুক্ত মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী

বাহাদুরের সঙ্গীতবিদ্যালয়ের সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী। নারাজোলাধিপতির সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়। ভারতবর্ষের প্রধান গায়ক শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজা :স্যার সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের ভূতপূর্ব্ব বিদ্যালয়ের সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত বিপিন চক্রবর্ত্তী। বিষ্ণুপুর সঙ্গীতবিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীযুক্ত হারাধন দেবঘেরিয়া, সঙ্গীতবিশারদ শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ কাব্যতীর্থ। শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র সরকার প্রভৃতি। ৺ অনন্ত-লালের চারি পুত্র যথা :—রামপ্রসন্ন, গোপেশ্বর, সুরেন্দ্র ও রামকৃষ্ণ। চারিপুত্রই উপযুক্ত ; এতন্মধ্যে কনিষ্ঠ রামকৃষ্ণ ১৭ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। সুরেন্দ্র আদিব্রাহ্মসমাজের প্রধান গায়ক। ইনি গোপেশ্বরের নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করিয়াছিলেন, শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী, (মৃদঙ্গবিশারদ ৺ জগৎ চাঁদ গোস্বামীর উপযুক্ত পুত্র)। রাধিকাপ্রসাদ, রামপ্রসন্ন, গোপেশ্বর এবং সুরেন্দ্র ইঁহারাই এক্ষণে ভারতবর্ষের প্রধান সঙ্গীতাচার্য্য। এক্ষণে বিষ্ণুপুরের পুরাতন ও নব্য গায়ক ও বাদকগণের নাম নিম্নে একত্রে প্রদত্ত হইতেছে যথা :—

পুরাতন নামজাদা গায়কগণের নাম।

প্রসিদ্ধ গায়ক ৺ গদাধর চক্রবর্ত্তী, প্রসিদ্ধ গায়ক ৺ রামশঙ্কর ভট্টাচার্য্য। প্রসিদ্ধ গায়ক ও তাউস বাদক ৺ রামকেশব ভট্টাচার্য্য, প্রসিদ্ধ খেয়ালী ৺ কানাই লাল চক্রবর্ত্তী .এবং তস্য ভ্রাতা মাধব চক্রবর্ত্তী, প্রসিদ্ধ ধ্রুপদী সেতারী ও মৃদঙ্গী ৺ যদুভট্ট, অদ্বিতীয় গায়ক ও সঙ্গীতশাস্ত্রবিশারদ ৺ অনন্তলাল বন্দোপাধ্যায়। সঙ্গীতশাস্ত্রবিশারদ ৺ ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, প্রসিদ্ধ ধ্রুপদী ৺ কেশবলাল চক্রবর্ত্তী, প্রসিদ্ধ খেয়ালী ৺ হলধর গোস্বামী, প্রসিদ্ধ টপ্পা, খেয়াল ও তবলা-বাদক ৺ দীননাথ গোস্বামী, প্রসিদ্ধ গায়ক ও সানাই বাদক ৺ শ্যাম গোস্বামী। প্রসিদ্ধ গায়ক ৺ রামগোপাল চক্রবর্ত্তী, গায়ক ও যন্ত্রী ৺ অনন্তলাল চক্রবর্ত্তী। গায়ক ও সারঙ্গী বাদক ৺ মাধব চক্রবর্ত্তী, গায়ক ও বীনকার ৺ দ্বারিকানাথ চক্রবর্ত্তী, বিখ্যাত যন্ত্রী শ্রীযুক্ত নীল মাধব চক্রবর্ত্তী, প্রসিদ্ধ গায়ক ও তাউস বাদক ৺ উদয় গোস্বামী।

পুরাতন নামজাদা বাদকগণের নাম।

মৃদঙ্গবিশারদ ৺ রামমোহনচক্রবর্ত্তী, মৃদঙ্গ বিশারদ ৺ জগৎচাঁদ গোস্বামী, মৃদঙ্গবাদক ৺ জগন্নাথ মুখোপাধ্যায়, সেতারী ৺ মধু ভট্ট (যদু ভট্টের পিতা) সেতারী ৺ মাধবলাল চক্রবর্ত্তী (কবিরাজ) সেতারী ৺ কার্ত্তিকচন্দ্রবন্দ্যোপাধ্যায়।

নব্য নামজাদা গায়কগণের নাম।

প্রসিদ্ধ গায়ক ও সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী। প্রসিদ্ধ ধ্রুপদী ও অদ্বিতীয় সেতারী সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়। অদ্বিতীয় গায়ক সঙ্গীত-বিজ্ঞানপ্রণেতা সঙ্গীত-নায়ক, সঙ্গীতবিদ্যার্ণব ইত্যাদি শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রসিদ্ধ গায়ক ও সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। গায়ক ও কাব্যতীর্থ শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত রামপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

নব্য বাদকগণ।

মৃদঙ্গবিশারদ শ্রীযুক্ত কাৰ্ত্তিকচাঁদ গোস্বামী (৺ জগৎচাঁদ গোস্বামীর পুত্র) প্রসিদ্ধ তবলাবাদক ও মৃদঙ্গী শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। মৃদঙ্গ ও তবলা-বাদক শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র সরকার।

বিষ্ণুপুরের নব্য সঙ্গীতজ্ঞ মহোদয়গণের মধ্যে শ্রীযুক্ত সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নামটী উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। ইনি ৬ বৎসর বয়স হইতে, বৰ্দ্ধমানাধিপতির স্বনামখ্যাত সঙ্গীতাচার্য্য গোপেশ্বর বাবুর নিকট সঙ্গীত শিক্ষা আরম্ভ করেন। গোপেশ্বর বাবু ইহাঁর সঙ্গীতে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, বিশেষ অনুরাগ ও সুকণ্ঠ স্বরে সন্তুষ্ট হইয়া, নিজের বাসায় রাখিয়াই, অতি যত্নের সহিত শিক্ষা দেন। অতি অল্পবয়সেই, সত্যকিঙ্কর গান, সুরবাহার, সেতার, এস্রাজ, পাখোয়াজ ও তবলা প্রভৃতিতে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন। সম্প্রতি ইনি কাশীপুরের মহারাজের গায়কপদে নিযুক্ত।

শ্রীঅতুলবিহারী বক্সী।
ফরিদপুর।

আমি বিষ্ণুপুরে কিছু দিন ছিলাম; সেই সময় রাজবাটীর পুরাতন কর্ম্মচারীদ্বারা এবং অন্যান্য ভদ্র মহাশয়দিগের নিকট হইতে এই সমস্ত বিষয় সংগ্রহপূর্ব্বক প্রকাশ করিলাম। রাজবাটীর অন্যান্য বৃত্তান্ত পরে প্রকাশ করিবার বাসনা রহিল।

গঙ্গবংশানুচরিতম্ ।

তিন বৎসর পূর্ব্বে বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির সদস্যগণ উৎকলে ও কলিঙ্গ-দেশে তথ্যানুসন্ধানে ব্যাপৃত হইয়া, একখানি সংস্কৃত পুথির সন্ধান লাভ করিয়াছিলেন। তাহাতে অনেক ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক বিবরণ সন্নিবিষ্ট থাকায়, পুথিখানি নকল করাইবার চেষ্টা করা হয়। পুরাতন উড়িয়া-অক্ষরে লিখিত তালপত্রের পুথির পাঠোদ্ধারে অভ্যস্ত, সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞ, এবং বঙ্গাক্ষরে নকল করিতে সিদ্ধহস্ত সুযোগ্য লেখক বড় দুর্ল্লভ বলিয়া, তিন বৎসরের অধ্যবসায়ে নকলকার্য্য কোনরূপে সমাপ্ত হইয়াছে। একখানি মাত্র মূলপুথির এইরূপ অশুদ্ধি-বহুল নকল হইতে প্রকৃত পাঠ নির্ণয় করা সহজ নহে। প্রথম চেষ্টায় যতদূর জানিতে পারা গিয়াছে, তাহার উপর নির্ভর করিয়া, এই পুথিখানির কিঞ্চিৎ বিবরণ প্রদান করা যাইতেছে। ধারাবাহিক ইতিহাসের অভাবে এই শ্রেণীর গ্রন্থ হইতেই বিবরণ সঙ্কলন করিতে হয়; সুতরাং এই শ্রেণীর যত গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইতেছে, সকলগুলিই সাহিত্য-সমাজে উপস্থাপিত হইবার যোগ্য।

গ্রন্থখানি দশ অধ্যায়ে বিভক্ত, সংস্কৃত ভাষা-নিবদ্ধ, গদ্যপদ্যাত্মক চম্পূ-কাব্য; গ্রন্থের নাম,—"গঙ্গবংশানুচরিতম্।" গ্রন্থকার আপনার পরিচয়দানের জন্য লিখিয়া গিয়াছেন,—তিনি রাজগুরু ছিলেন; তাঁহার নাম "বাসুদেবরথ সোমযাজী।"

গোদাবরী-দক্ষিণতীর-নিবাসী মাগধেন্দ্র রায়োপাধিক বিদ্যার্ণব নামক কোনও স্তুতি-পাঠক তদীয় প্রিয়তমা সহধর্ম্মিণী লীলাবতী দেবীকে লইয়া শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে তীর্থদর্শনে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের গমনাগমন পথের বর্ণনা করিতে গিয়া, কবি কাব্যচ্ছলে নানা ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক সমাচার লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রধান কথা গঙ্গবংশীয় নৃপতিগণের কীর্ত্তিকথা বলিয়া, গ্রন্থখানি "গঙ্গবংশানুচরিতম্" নামেই অভিহিত হইয়াছে।

গঙ্গবংশীয় নরপতিগণ কলিঙ্গদেশ হইতে অভ্যুত্থান লাভ করিয়া, কালক্রমে সমগ্র উৎকলের ও বঙ্গভূমিরও কিয়দংশের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। আবার অধঃপতনের দিনে তাঁহারা কলিঙ্গের শেষ সীমায় তাড়িত হইয়াছিলেন। এই

রাজবংশের পুরুষোত্তম নামক নরপতির শাসন-সময়ে গ্রন্থখানি রচিত হইয়াছিল। ইহাতে প্রসঙ্গক্রমে শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রের বিচিত্র মন্দিরাদির অনেক উল্লেখযোগ্য বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহার আলোচনা ভবিষ্যতের জন্য রাখিয়া দিয়া, সম্প্রতি অল্প কয়েকটি কথারই অবতারণা করিব।

কাব্যোক্ত তীর্থযাত্রী দম্পতী মহেন্দ্রনামক কুলাচলের উপকণ্ঠে "কূর্ম্মক্ষেত্রে" উপনীত হইয়া, তথা হইতে মহেন্দ্রতনয়া-নদীর সহিত সাগরসঙ্গমের পুণ্যতীর্থে আসিয়া, পোতারোহণ করেন। লীলাবতী দেবী পোতের আন্দোলনে বিব্রতা হইলে, বিদ্যার্ণব তাঁহার স্থৈর্য্য-সম্পাদনচেষ্টায় প্রাকৃতিক শোভার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার আশায়, অনেক কবিতার অবতারণা করিয়াছিলেন। একটি কবিতায় সমুদ্রবক্ষে সন্ধ্যার বর্ণনা কবির রচনালালিত্যের নিদর্শনরূপে উদ্ধৃত হইবার যোগ্য।

যথা :—

"এতদ্বারিধিবারি হীরকঘটা-কান্তচ্ছটাচ্ছাদিতং
ভূয়োভাতি(?) সুধাবদেব ধবলং গঙ্গাম্বুভঙ্গাদিব।
মাণিক্যোপল-বিদ্রুমাঙ্কুর-করশ্রেণীবিভিন্নোদরং
সন্ধ্যাংশু-প্রতিবিম্ব-চুম্বিতমিবারক্তীকৃতং রোচ্যতে॥"

লীলাবতী ও বিদ্যার্ণব পোতারোহণে পুরীধামের "স্বর্গদ্বার" নামক বেলা-ভূমির উপকণ্ঠে উপনীত হইয়া, "প্রতিপোতারোহণে" সমুদ্রতটে পদার্পণ করিবার পর, "তন্ত্রমন্ত্রানুসারে" স্নান-তর্পণাদি সমাপ্ত করিয়া, তথায় অনেক প্রস্তর-চৈত্য দেখিতে পাইয়াছিলেন। মহাসমুদ্রতটের মহাশ্মশানে যাঁহাদের নশ্বর দেহ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় ভস্মীভূত হইত, তাঁহাদের চিতার উপরে সেই সকল চৈত্য নির্ম্মিত হইত। কেন হইত, তাহার কারণ নির্দ্দেশের জন্য কবি লিখিয়া গিয়াছেন,—

"যেঽত্র ক্ষেত্রবরে পুরা কৃতপরীপাকাস্তনুত্যাগিনো
দহ্যন্তে কিল যত্র যত্র বিধিবত্তত্তৎস্থলে সত্বরম্।
প্রাসাদা বিপুলোপলৈর্ব্বিরচিতাঃ সম্যক্ সুধাশালিনঃ
স্থাপ্যন্তে মলমূত্রদূষণভিয়া তৎপুত্রপৌত্রাদিভিঃ॥"

এখনও এই শ্রেণীর দুই চারিটী চৈত্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল চৈত্যের অনতিদূরে, শ্মশানভূমির সান্নিধ্যে, "শ্রীচৈতন্য-মণ্ডলী" নামক "পরম-

ভাগবতগণের" আবাস দেখিয়া,—তাঁহারা পুরী ছাড়িয়া শ্মশানবাসী হইয়াছেন কেন?—তাহা জানিবার জন্য লীলাবতী দেবীর স্বাভাবিক কৌতূহল উপস্থিত হয়। তাহা চরিতার্থ করিতে গিয়া, বিদ্যার্ণব উৎপ্রেক্ষার সাহায্যে একটী গুপ্তরহস্যের দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া গিয়াছেন। তখনও "চৈতন্যমণ্ডলী" নগরমধ্যে স্থান লাভ করিতে পারেন নাই। কারণ তখনও তাঁহারা "নিঃশ্রেণিক" বলিয়া সামাজিকগণের প্রতিবেশী হইবার অধিকার লাভ করেন নাই। যথা,—

"লোকানামভিযোগিনাং সুরপুরাদুচ্চৈঃপদারোহণে
তৎকার্য্যেঽপ্যবলম্বনায় কিমপি প্রায়ো ন সংপশ্যতা।
মন্যে দৈন্যবশীকৃতেন বিধিনা স্বর্দ্বারমারোপি কিং
শ্রীচৈতন্যমতানুসারি-সুজনশ্রেণীতি নিঃশ্রেণিকা॥"

অতঃপর তীর্থযাত্রী দম্পতী পুরীধামের বিভিন্ন দেবমন্দির দর্শনোপলক্ষে নানা তথ্যের আলোচনায় অনেক ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক সমাচার বিবৃত করিয়া, তীর্থযাত্রাবসানে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে আরম্ভ করেন। লীলাবতী দেবীর সাগরভীতিই বোধ হয় প্রত্যাবর্ত্তনকালে স্থলপথের দিকে বিদ্যার্ণবকে আকৃষ্ট করিয়া থাকিবে। কিন্তু স্থলপথে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সময়েও চিল্কাহ্রদ উত্তীর্ণ হইতে হইয়াছিল। তাহা সাগরও নহে, নদীও নহে,—তাহা কি ও তাহার নাম কি, লীলাবতী দেবী তদ্বিষয়ে প্রশ্ন করায়, বিদ্যার্ণব চিল্কাহ্রদের নামোৎপত্তির একটি নিরুক্তির উল্লেখ করিয়াছেন। উহার নাম "চিল্লিখা",—তদ্দেশের লোকে এখনও উহাকে "চিলিখা" বলিয়াই অভিহিত করিয়া আসিতেছে,—তাহাই ইংরাজী গ্রন্থের "চিল্কা"। তাহার নিরুক্তি এইরূপ,—

"পঙ্কং যস্মাচ্চিল্লিখং প্রাহুরার্য্যাঃ
মত্বর্থীয়াকারযোগেন তস্য।
স্ত্রীত্বং লোকাদ্দাস্যহত্যাদিবত্তু
তস্মাল্লোকে চিল্লিখেতি প্রসিদ্ধা॥"

নৌকাযোগে "চিল্লিখা" উত্তীর্ণ হইয়া, লীলাবতী ও বিদ্যার্ণব যে স্থানে উপনীত হইয়াছিলেন, তাহার নাম "খল্লিকোট";—তাহাই এক্ষণে "কালিকট" নামে রম্ভা ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী চিল্কা হ্রদের দক্ষিণতটে অবস্থিত সুপরিচিত রাজবাটী। সেকালেও তথায় রাজবাটী ছিল। তথায় পীতাম্বর নামক নরপতি পিতৃবৎ প্রজাপালন করিতেন।—

"শশ্বদ্ধর্ম্মধরো জনৈকসদনঃ শৌটীর্য্য-শৌর্য্যাশ্রয়ো
ধৈর্য্যৌদার্য্য-বিবেককেলি-নিলয়ঃ কারুণ্য-পণ্যাপণঃ।
ষাড়্গুণ্যার্থবিচারবারিধি-গলৎসারাংশপীযূষভাক্
প্রেম্না পালয়তি প্রজাঃ পিতৃসমঃ পীতাম্বরঃ পার্থিবঃ॥"

"খল্লিকোটের" নগর-শোভা এখনও বড় রমণীয়; তৎকালে আরও রমণীয় ছিল। নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যের সঙ্গে নগররচনার শিল্পকৌশল মিলিত হইয়া, তাহাকে "কাঞ্চনশালিনী কাঞ্চী" হইতে,—"বিকাশবতী কাশী" হইতে—"সিদ্ধ-স্তনী হস্তিনা" হইতে,—অধিক রমণীয় করিয়া রাখিয়াছিল। "রঘুনাথ-সাগর" নামক সরোবর ও রঘুনাথ-নির্ম্মিত একটি সমুচ্চ দেবমন্দির নগরশোভাকে অত্যুজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছিল, কোন স্থানে "হিরণ্যপরীক্ষা" কোন স্থানে "কুশাদি প্রণয়ন" কোন স্থানে "চিত্র কম্বলসঞ্চয়" কোন স্থানে "ভোজন-ভাজন" ইত্যাদি "পণ্যপরিপাটি" আপণশ্রেণীকে রমণীয় করিয়া রাখিয়াছিল।

এই নগর হইতে লীলাবতী ও বিদ্যার্ণব "ঋষিকুল্যা" নদীতীরে "পিত্তল গ্রামে" উপনীত হইয়াছিলেন। "ঋষিকুল্যা" উৎকল প্রদেশের দক্ষিণ সীমায় অবস্থিত। তাহা "গঙ্গা-প্রতিরূপা", পুণ্যতোয়া স্রোতস্বতী বলিয়া, লীলাবতী সাষ্টাঙ্গ-প্রণতা হইয়াছিলেন। ঐ প্রদেশ তৎকালে জয়সিংহ নামক নরপতির "ধরা-কোট" নামক বিষয়ের অন্তর্গত ছিল। জয়সিংহ কেবল দোর্দ্দণ্ডবিক্রমশালী "নলরাজকুলপ্রসূত" প্রভূতগুণশালী নরপাল ছিলেন না;—তিনি "দ্রব্যকাব্য-নির্ম্মাণপটু" সুপণ্ডিত বলিয়াও পরিচিত ছিলেন।

এই স্থান হইতে তাঁহারা "খিমুণ্ডী" জনপদের "পাঠপুর গ্রামোপবনে" প্রবেশ করিয়াছিলেন। তৎকালে তাহা "গঙ্গবংশকরীরাঙ্কুরাবতার" পুরুষোত্তম-নামধেয় "চক্রবর্ত্তিচূড়ামণি" অনঙ্গভীমদেব নৃপতির অধিকারভুক্ত ছিল। লীলা-বতীর প্রশ্নে গঙ্গবংশের আমূল কাহিনী কীর্ত্তন করিয়া, বিদ্যার্ণব গ্রন্থ শেষ করিয়াছেন। ওড্রদেশে "কটক-রাজধানীনিবাসী" নরপতিগণের পরিচয়প্রদানের জন্য বিদ্যার্ণব বলিয়াছেন;—

"গঙ্গান্বয়ে প্রথমতোঽজনি দেবষট্কং
সংজজ্ঞিরে তদনু ষড়্বলিতো নৃসিংহাঃ।
ষড়্ভানবোঽপ্যুদয়সম্পদমাপুরেব-
মষ্টাদশাজনি ততঃ ক্ষিতিপাঃ ক্রমেণ॥"

এই বংশ "গঙ্গবংশ" নামে পরিচিত হইয়াছিল কেন? লীলাবতী দেবীর এই প্রশ্নের উত্তরে বিদ্যার্ণব একটি ঐতিহাসিক তথ্যের অবতারণা করিয়া বলিয়া গিয়াছেন,—

"দেবেষু চাবিরভবৎ প্রথমং কুড়ঙ্গো
যং চৌড়গঙ্গ ইতি কেচন নির্দ্দিশন্তি।
ধীমানসৌ সহজবুদ্ধি-বলোদয়েন
সিংহাসনং গজপতেঃ স্বয়মধ্যুবাস॥"

চৌড়গঙ্গ হইতে গঙ্গবংশের উৎপত্তি; তিনিই গজপতির সিংহাসনে প্রথমে আরোহণ করিয়াছিলেন। ইতিহাসপাঠকের নিকট চৌড়গঙ্গের পরিচয় অবিজ্ঞাত নাই। তিনি বঙ্গবিজয়ী রাজেন্দ্রচোড়ের দৌহিত্র। উত্তরকালে গঙ্গবংশের উৎপত্তি-কাহিনী জনশ্রুতির অত্যাচারে একটি অলৌকিক কাহিনীতে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। "গঙ্গবংশানুচরিতম্" রচিত হইবার সময়েও সে কাহিনী প্রচলিত ছিল। গ্রন্থকার তাহার উল্লেখ করিয়া বলিয়া গিয়াছেন,—

"বিধবায়া গঙ্গাভিধেয়ায়াঃ কস্যাশ্চিৎ ব্রাহ্মণ্যা
মহাদেব-বরপ্রসাদাৎ যঃ পুত্রোঽভূৎ তদ্বংশো গঙ্গবংশঃ"

এই কাহিনী লোকসমাজে প্রচলিত থাকিলেও, ইহা যে প্রকৃত কাহিনী নহে, তাহার পরিচয় প্রদানের জন্য কবি স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া গিয়াছেন,—"তদসৎ"।

গঙ্গবংশীয় নরপতিগণের অনেকগুলি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত ও প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার সাহায্যে উৎকলের ইতিহাস কিয়দংশে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে; বাঙ্গালার ইতিহাসেরও কোন কোন বিলুপ্ত তথ্য উদ্‌ঘাটিত হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং এই কাব্যে গঙ্গবংশের যে কোন কীর্ত্তিকাহিনী উল্লিখিত আছে, তাহা সযত্নে আলোচিত হইবার যোগ্য। আপাততঃ সে আলোচনায় হস্তক্ষেপ না করিয়া, কাব্যোক্ত গঙ্গবংশের বিবরণ উদ্ধৃত করিয়াই নিরস্ত হইব।

এই কাব্যে বংশাবলী যেভাবে বিবৃত হইয়াছে, তাহার সূচি প্রথমেই প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এই বংশে ছয় জন "দেব," ছয়জন "নৃসিংহ," ছয়জন "ভানু" এই অষ্টাদশ নৃপতি; এবং তৎপরে অন্যান্য "ক্ষিতিপতি" জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের নাম যথাক্রমে এইরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। (১) কুড়ঙ্গ (২) চুড়ঙ্গ (৩) রাজরাজেশ্বর (৪) অতিরথ (৫) একজটা কামদেব (৬) মদন কামদেব (৭) অনঙ্গ ভীম (৮) নৃসিংহ (৯) ভীম নৃসিংহ (১০) পুরুষোত্তম নৃসিংহ (১১) কবি নৃসিংহ (১২) অকটাসরটা নৃসিংহ (১৩) প্রতাপ নৃসিংহ (১৪) নিশঙ্ক ভানু (১৫) বাতুল ভানু (১৬) বীর ভানু (১৭) রুচিক ভানু

(১৮) মধর ভানু (১৯) কজ্জল ভানু (২০) স্বর্ণভানু (২১) কালষণ্ড (২২) চুড়ঙ্গ (২৩) নৃসিংহ (২৪) অনন্ত (২৫) পদ্মনাভ (২৬) পীতাম্বর (২৭) পীতাম্বর-বৈমাত্রেয়-বাসুদেবের পুত্র পুরুষোত্তম।

কবি প্রসঙ্গক্রমে এই সকল নরপালের শাসনকালের সংখ্যা ও কীর্ত্তিকলাপ কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায়,—অনঙ্গভীম কর্ত্তৃক শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দির ও প্রথম নৃসিংহদেব কর্ত্তৃক কোণার্কের সূর্য্যমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। শ্রীশ্রীজগন্নাথমন্দির নির্ম্মাণের সময় এইরূপে উল্লিখিত আছে, যথা—

"অঙ্কক্ষৌণী-শশাঙ্কেন্দু-সম্মিতে শকবৎসরে।
অনঙ্গভীমদেবেন প্রাসাদঃ শ্রীপতেঃ কৃতঃ॥"

ইহাতে ১১১৯ শকাব্দা—১১৯৭ খৃষ্টাব্দ প্রাপ্ত হওয়া যায়। মন্দিররচনায় শিল্পরীতির সহিত ইহার সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়। তখন বঙ্গভূমির জীবন-সন্ধ্যা,—উৎকলের জীবন-প্রভাত।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

সারস।

কি সুন্দর পাখী দুটি—কারো নয় বশ,
বিহরে আপন মনে, সবে গায় যশ।
দুজনার যদি কেহ হয় কভু ছাড়া,
একটি ডাকিলে, দেয় অপরেতে সাড়া।
সুমুখেতে সরোবর করে ঝক্‌মক্—
কপালে সিঁদুর মাখি' ভামিনী সারসী
সারাক্ষণ দেখে মুখ—স্বচ্ছ সে আরশি।
ভেকেরা ভেংচায় ভয়ে করে মক্‌মক্।
কমলিনী দেখাইছে বিতরি সৌরভ,
প্রস্ফুটিত চল চল রূপের গৌরব।
জলদের ছায়া পড়ে চারু উপবনে,
ঘণায় প্রেমের কথা বিরহীর মনে।
মনোরম ছন্দে কোন্ সারসীর কণ্ঠ
কতদূর চলে যায়, নাহি তার অন্ত।

শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সহযোগী সাহিত্য।

সংস্কৃতে দেশাবলীবিবৃতি।

পাটলীপুত্রে প্রতিষ্ঠিত 'বিহার-উৎকল গবেষণাপত্র' মনীষী গেট মহোদয়ের অন্যতম শুভ্রকীর্ত্তি। উদারধী জায়স্‌বালের মহতী চেষ্টায়, অক্লান্তকর্ম্মী শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রভৃতির কার্পণ্যমুক্ত সাহায্যে, বিহার-উৎকলের বহু গুহানিহিত ও পঙ্কপ্রোথিত তত্ত্বও আবিষ্কৃত ও প্রকাশিত হইয়া প্রাদেশিক ইতিহাসের অধ্যায়ের পর অধ্যায় হইতে কুহেলিকার যবনিকা অপসারণ করিতেছে। অদ্য আচার্য্য শাস্ত্রী মহাশয়ের একটী অনুসন্ধানসাফল্যের সার সঙ্কলন করিয়া 'সাহিত্যের' পাঠকদিগকে উপহার দিব।

সাহিত্য জাতীয় জীবনের আদর্শ। উচ্চাবচ সর্ব্ববিধ পর্য্যায়ের প্রতিবিম্ব-পাতেই ইহার সার্থকতা। ধর্ম্মাধর্ম্ম, সাফল্য-বৈফল্য, পাপপুণ্যের সম্মিশ্রণে মনুষ্যজীবন গঠিত। ব্যক্তিগত মনুষ্যজীবনের সংঘবদ্ধ সমষ্টির নাম জাতীয় জীবন। জাতীয় জীবনের মূলসূত্র—অবস্থাবৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া মানবের সর্ব্বতো-মুখী চেষ্টা। অতএব অমুক জাতির সাহিত্য ধর্ম্মসম্বন্ধীয়, জাত্যন্তরের ঐহিক, এবম্বিধ উক্তিতে উক্ত জাতির বিষয়বিশেষে চেষ্টাধিক্য ও নিষ্ঠাই অধিগম্য। অপরাপর বিষয়ে সম্পূর্ণ ঔদাসীন্যকল্পনা যুক্তিবিগর্হিত। সুতরাং ভারতের সংস্কৃতসাহিত্য যদি জাতীয় সাহিত্য বলিয়া বিবেচিত হইবার যোগ্য হয়—বর্ত্তমান সন্দেহশীল যুগে সংশয়ের অন্ত স্বয়ং অন্তকেরও অগোচর—ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সাহিত্যের প্রাধান্য স্বীকার করিলেও, ধর্ম্মেতর সাহিত্যে অস্তিত্ব পরিকল্পনা সর্ব্বথা অপরিহার্য্য।

এতাবৎকাল এই পরিকল্পনার পশ্চাতে সত্যের পরিচ্ছন্ন কায়া সাধারণ্যে সুপরিচিত ছিল না। সুতরাং একাধিক ধীমান্ স্বয়ং সংশয়মূঢ় হইয়া অপরকে আত্মসন্দেহের অংশ বিতরণ করিয়াছেন। তাহারই ফলে পাশ্চাত্যের ধারণা—প্রতীচীর মানব ধর্ম্মৈকচিত্ত এক অপূর্ব্ব জীব, অতীতের সহিত ছিন্নসম্পর্ক, বর্ত্তমানে সামঞ্জস্যশূন্য। অধুনা-আবিষ্কৃত ধর্ম্মেতর সাহিত্যের সমৃদ্ধি সর্ব্ববাদি-সম্মত। অনুশাসন, তাম্রলিপি প্রভৃতি ধর্ম্মপ্রচারের সহিত গূঢ়সম্বন্ধ—সুতরাং

তদন্তর্গত সাহিত্য মুখ্যতঃ ধর্ম্মসম্বন্ধীয়। কিন্তু অন্ততঃ তিন বিষয়ে সংশয়ের সম্ভাবনা কষ্টকল্পনামাত্র—অর্থনীতি, চৌর্য্যশাস্ত্র এবং দেশাবলীবিবৃতি (Gazetteer Literature)। শেষোক্তের পরিচয়ই বর্ত্তমান প্রবন্ধের অভিপ্রেত—পূজনীয় শাস্ত্রী মহাশয়ের অনন্যসুলভ গবেষণাশক্তির মৌলিক নিদর্শন।

সংস্কৃত দেশাবলীবিবৃতি প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। খণ্ড বা পুরাণ; মনুষ্যরচিত পৌরাণিক বীরপুরুষের ভ্রমণবৃত্ত; পুরাণ বা পৌরাণিক গন্ধশূন্য ব্যবসায়, বাণিজ্য, কৃষি, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি-বিষয়ক তথ্যসম্ভৃত সমসাময়িকের ব্যবহারার্থ সঙ্কলিত দেশাবলীবিবৃতি। তৃতীয়টাই বর্ত্তমানে প্রকৃত দেশাবলীবিবৃতি বলিয়া বিবেচিত হইবার যোগ্য। প্রথমোক্ত দুইটীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ জ্ঞাতব্য। শেষোক্তটী যথাসম্ভব সবিস্তারে বর্ণনা করিব। ইহারা বিগত পঞ্চশত বৎসর যাবৎ হিন্দু ও বিহারবাসিবর্গের তৎকালপরিচিত পৃথিবীর ষট্পঞ্চাশৎ (৫৬) দেশসমূহের জ্ঞান অর্জ্জনের প্রবলপ্রয়াসের বিতণ্ডাসহ সাক্ষ্যস্বরূপ সমুপস্থিত।

মিথিলার মোহন কবি বিদ্যাপতি এবম্বিধ রচনারীতির প্রথম পথপ্রদর্শক। পণ্ডিতপ্রবর সার জর্জ গ্রীয়ারসেনের যত্নে ও উৎসাহে বিদ্যাপতির ললিত প্রেমগীতি আজি জগতের বরেণ্য ও আনন্দবর্দ্ধন। কবিত্ব ব্যতীত বিদ্যাপতির সংস্কৃতে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যও সবিশেষ প্রশংসনীয়। তদীয় স্মৃতি ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় গ্রন্থাবলী মিথিলায় প্রমাণিত বলিয়া স্বীকৃত ও মতামত ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত অনুসৃত। কবি ও পণ্ডিত বিদ্যাপতি দক্ষতা ও কৃতিত্বের সহিত সৈনাপত্য ও রাজ্যশাসন কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। রাজ্যশাসনব্যপদেশেই তৎকালীন পঞ্চষষ্টি (৬৫) দেশের বিবৃতি-সঙ্কলনের অভিপ্রায় উৎপন্ন। পুরাণ, তন্ত্র, প্রাচীন ভ্রমণকারী, বিশেষতঃ মূল্যবান্ রাজকীর দলিলপত্র এই অভিপ্রায়সিদ্ধির উপায়স্বরূপ গৃহীত। সম্পূর্ণতঃ সহজবুদ্ধিসাধ্য, বৈজ্ঞানিক রীতিতে গ্রন্থপ্রণয়ন তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু পাঠকবিষয়িণী রিরংসা ক্ষুণ্ণপথপ্রতিকূলতার পরিপন্থিনী। বিদ্যাপতিও সাময়িক প্রথার বিরুদ্ধাচরণে সাহসী হন নাই। সুতরাং তদীয় কাহিনী শ্রীকৃষ্ণের অগ্রজ বলরামের প্রায়শ্চিত্তহেতু ভ্রমণের আকার ধারণ করে। বিদ্যাপতির পৃষ্ঠপোষক শিবসিংহ তৎকালে মিথিলায়; বিদ্যাপতি শিবসিংহের পিতা দেবসিংহের সহিত নৈমিষারণ্যে। এই নৈমিষারণ্যই বিবৃতিপ্রণয়নের কল্পনাভূমি। ভারতের পুরাতত্ত্বে নৈমিষারণ্য স্বনামধন্য। বহু বর্ষ ব্যাপিয়া ঋষিগণের বৈদিক যজ্ঞ ও সূত কর্ত্তৃক পুরাণ-পাঠে পূত। বিদ্যাপতির সময়েও নৈমিষারণ্যের

এই ইতিহাসপূজিত সম্বন্ধের স্মৃতি জাগরূক থাকিয়া বিবরণীর জন্মভূমিরূপে পরিগৃহীত।

নৈমিষারণ্যে আগত বলরাম ক্রোধবশতঃ একজন সূতের প্রাণসংহার করেন। ভারতের অভিজাতগৌরব পাণ্ডিত্যে, ব্রাহ্মণ সেই পাণ্ডিত্যের আধার। সুতরাং ব্রাহ্মণবধ মহাপাতকের অন্যতম। উচ্চ দিব্যযোনি বলরাম পর্য্যন্ত ব্রহ্মহত্যাপাপে অভিভূত হন। পৃথিবী পর্য্যটন করতঃ তীর্থ-সন্দর্শন ও তত্রত্য কর্ত্তব্যপালন ঋষি-নির্দ্দিষ্ট ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্ত। বলরাম নৈমিষ হইতে দ্রুপদের রাজ্য পঞ্চালে গমন করেন। পঞ্চালই আধুনিক রোহিলখণ্ড। তথায় দ্রুপদের শস্ত্রাগার, রাজধানী, তাঁহার ও পূর্ব্বপুরুষগণের পূজিত দেবমন্দির অথচ অধুনাতন যোগিগণের অধ্যুষিত গ্রামের দর্শন একত্র উল্লিখিত। ইহাই পুরাণ-পন্থী বিবৃতি-প্রয়াসের প্রধান দোষবৈগুণ্য। বিদ্যাভিমানী বিদ্যাপতিও সময়ের শক্তিতে শৃঙ্খলিত। দ্রুপদের রাজ্য হইতে ব্রহ্মাবর্ত্ত; সংখ্যাতীত কালশুভ্র শাশ্বত স্মৃতির আশ্রয়, স্বয়ম্ভু মনুর স্থান। লঘু ও বৃহৎ, পরস্পর পৃথক্ দুইটী ব্রহ্মাবর্ত্তের ধারণা দৃষ্ট হয়। ব্রহ্মাবর্ত্তের পর বাল্মীকির তপোবন। পৌরাণিকরীতির অনুকরণে আশ্রমাদির পুরাতন নামই গৃহীত হইয়াছে—ইহার সহিত এতদ্দেশে বলরামের সম্বর্দ্ধনাপ্রসঙ্গ; পুরাকালে বর্ত্তমানের আরোপ কল্পনায় সম্ভব, কিন্তু বাস্তবের বিরোধী। প্রাচীন ও নবীনের এবম্বিধ মিশ্রণ ভ্রমাত্মক ও জটিল। বাল্মীকির আশ্রম হইতে বলরাম প্রয়াগে উপস্থিত হন। প্রয়াগের তীর্থসমূহ বিশদভাবে বর্ণিত। তথা: হইতে ভরদ্বাজকুঞ্জে প্রয়াণ, ও প্রতিষ্ঠানে পুনরাবর্ত্তন; তাহার পর শৃঙ্গবের ও গঙ্গার উত্তর তটমার্গে কাশী। কাশী হইতে সারনাথ ও বৌদ্ধধ্বংসাবশেষ। তথা হইতে রামায়ণপ্রোক্ত রামের মার্গ অনুসরণে গঙ্গাসরযূর সঙ্গমে গৌতমাশ্রম, তাড়কার বাসভূমি, চ্যবনের তপোভূমি ও পাটলিপুত্র। ভবিষ্যতের সামগ্রী পাটলিপুত্র রামায়ণে অনুল্লিখিত; বিদ্যাপতির ভারত পাটলিপুত্রের গৌরবে সমৃদ্ধ, সুতরাং তাহার নাম গ্রহণ অবশ্যম্ভাবী। পাটলিপুত্র হইতে তীরভুক্তি, পরে মিথিলা। তত্রত্য পুরাতন তীর্থের বর্ণনায় স্বদেশবৎসল কবির লেখনী প্রীতিমুগ্ধ ও হর্ষচঞ্চল—কিন্তু দুর্ভাগ্য-বশতঃ বর্ণিতব্য পঞ্চষষ্টি প্রদেশের এক তৃতীয়াংশেরও শেষ হইবার পূর্ব্বেই পাণ্ডুলিপি এস্থানে অকালে পর্য্যবসিত ও নষ্ট।

নেপাল হইতে প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপির সাহায্যে বিদ্যাপতির সময় সুনিশ্চিত। পঞ্চদশশতাব্দীতে তাঁহার উদ্ভব, সুদীর্ঘ জীবিতযাপনের পর দেহত্যাগ।

পলাতকপ্রায় পৃষ্ঠপোষকবংশীয়গণের সহিত বনমধ্যে অবস্থানকালে কাব্যপ্রকাশের মৈথিল টীকা প্রাপ্ত হন ও তাহার প্রতিলিপি প্রস্তুতার্থ দুইজন লিপিকর নিযুক্ত করেন। সমস্ত পাণ্ডুলিপিতে তাহাদের দুইজনের বিভিন্ন হস্তাক্ষর সুপরিস্ফুট। পাণ্ডুলিপির অন্তে প্রদত্ত তারিখ ২৯১; অর্থাৎ খ্রীষ্টাব্দের ১৪০৬ বা ১৪০৭। বিদ্যাপতির দেশাবলীবিবরণীর পরিশিষ্টে প্রদত্ত কালনির্ঘণ্ট ১৪৮০ সম্ভবতঃ লিপিকরের সময়। অতএব পঞ্চদশমশতাব্দী হইতে চতুর্দ্দিকস্থ দেশসমূহের পরিচয় লাভের জন্য বিহারবাসী উৎসুক ও চেষ্টিত।

বিদ্যাপতির অধস্তন পুস্তক বিক্রমসাগর, পাটনার বৈজলবংশীয়ের সংগৃহীত। পরবর্ত্তী দেশাবলীকার জগমোহনের সময়ে প্রামাণিকরূপে বিবেচিত, ও জগমোহনের পরিশিষ্টে বহুস্থলে স্বীয় গ্রন্থের ভিত্তিস্বরূপ উল্লিখিত। এবম্বিধ উল্লেখের সত্যনিরূপণ সম্ভব নহে সত্য, কিন্তু পরবর্ত্তী কালে বিক্রমসাগরের ক্ষুদ্র খণ্ডমাত্র পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে মঙ্গলাচরণ, প্রস্তাবনা ও পাটলীপুত্রবিষয়ক অধ্যায় দৃষ্ট হয়। পাটলীপুত্রের সুচন্দ্রনামা নৃপতির বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ। সুচন্দ্রের পত্নী বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বিনী, তদীয় মানসিক বৃত্তি-প্রপঞ্চক তথাগতের শিক্ষাসম্মত। পঞ্চষষ্টি (৬৫) প্রদেশের বিজয় কল্পনার প্রেরণায়, পূর্ব্বদিকে অভিযান করিয়া বঙ্গ, আসাম, মণিপুর, বর্ম্মা, পেগু এবং অপরাপর দেশ জয় করেন। এই বৃত্তান্তের পর, বিক্রমসাগর জগমোহনের গ্রন্থের সহিত একীকৃত ও লুপ্তস্বাতন্ত্র্য। জগমোহনের পুস্তকেও, পাটলীপুত্র অধ্যায়ে সুগতিচন্দ্রের বিজয়বার্ত্তা বর্ণিত। সুগতিচন্দ্র সুচন্দ্রেরই নামান্তর মাত্র। সুচন্দ্রের পরিচয় অজ্ঞাত। চন্দ্রগুপ্ত ও মৌর্য্যগণের কালপ্রবাহে ধৌতাবশেষ স্মৃতির ছায়া হইতে পারে। অর্ব্বাচীন বৌদ্ধ কিম্বদন্তীতে সুচন্দ্রের নাম সুবিখ্যাত। কালচক্রায়ণের গ্রন্থরাজীতে তাঁহার প্রভাব বহুব্যাপী ও সমধিক; পালি ও বর্ম্মীয় সাহিত্যেও তিনি নিতান্ত অপরিচিত ছিলেন না।

বিক্রমসাগরের পরবর্ত্তী জগমোহনের পুস্তক আধুনিক আদর্শেও যথার্থ দেশাবলীবিবৃতি। গঙ্গার উভয়তীরস্থ পাটনার চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত চারিটী পরগণার স্বত্বাধিকারী চৌহান জায়গীরদারের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রণীত। তদানীন্তন হিন্দুজগতের পঞ্চষষ্টি প্রদেশের ইতিবৃত্ত সংগ্রহের জন্য বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ জগমোহনের নিয়োগ। পৃষ্ঠপোষক দুলাল বা দেব বৈজল এবং সঙ্কলয়িতা জগমোহন যথাক্রমে প্রষ্টা ও উত্তরদাতৃরূপে কল্পিত। খ্রীষ্টীয় ১৬৫০ অব্দে পৃষ্ঠপোষক লোকান্তরিত হন; মৃত্যুর তারিখ শক, সম্বৎ এবং কলিযুগ, তিন বিভিন্ন গণনায় প্রদত্ত। শক ১৫৭২

কলিযুগ, ৪৭৫০; সম্বতের 'বিক্রমস্যচ' অবশিষ্ট, অঙ্কাংশ বিলুপ্ত। পঞ্চষষ্টি প্রদেশের দেশবিবরণী সমাপিতপ্রায়, এমন সময় বৈজলের দেহাবসান। আনুষঙ্গিক গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলার ফলে বিবরণী অনাদৃত ও উপেক্ষিত হয়। কতকাংশ নষ্ট, এবং সমুদয় ভাগই ছিন্নসূত্র হইয়া যায়। মূলে "ছিন্ন, ভিন্ন" ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত। জগমোহনের পরলোক গমনের বহু বৎসর পরে বৈজল-পরিবারের স্বগ্রামস্থ শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণ প্রাপ্ত খণ্ডগুলির সংগ্রহ ও পুনঃ সম্পাদন এবং সেই সঙ্গে অন্তর্বর্ত্তী সময়ের ইতিহাস যোগ করিয়া দেন। দশবৎসরে খ্রীষ্টাব্দের ১৭১৮-১৭২৮এ পুনঃ সম্পাদন সমাপ্ত হয়।

জগমোহনরচিত পাটনায় প্রাপ্ত পুস্তকের নাম দেশাবলীবিবৃতি। চতুর্দ্দিকস্থ দেশসমূহের কার্য্যকর সংবাদ, প্রয়োজনীয় বৃত্তান্ত সম্পূর্ণ সহজ ভাবে বর্ণিত। প্রস্তাবনায় প্রকাশ, বিক্রমসাগরের ন্যায় পূর্ব্বতন গ্রন্থাবলী, অভিজ্ঞ প্রাচীন পর্য্যটক, এবং স্বয়ং প্রত্যক্ষীকৃত বস্তুনিচয়ের সাহায্য গৃহীত। ইহাতে বৈজ্ঞানিক রীতি ও বিবেচনাসঙ্গত প্রথার মর্য্যাদা সতর্কতার সহিত রক্ষিত। কিন্তু দেশাবলীবিবৃতি হিন্দুর উপকারার্থ প্রণীত—সুতরাং তীর্থক্ষেত্র, পীঠস্থান, দেবভূমি প্রভৃতির প্রকাম পরিচয়ে পূর্ণ। স্থানমাহাত্ম্য, আরাধনাযোগ্য দেবদেবী, এবং আচরণীয় ক্রিয়াকলাপের পরিচায়ক বহুতর পুরাণ ও শ্রুতির বচনবহুল গয়া ও কামাখ্যার বিবরণ আধুনিক পাঠকের প্রীতিপ্রদ নাও হইতে পারে। কিন্তু অপরাপর সংবাদ সম্পূর্ণ প্রয়োজনীয় এবং আজিও তথ্যান্বেষীর পাঠোপযোগী। কয়েকটী দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিব। সরল ও সুখবোধ্য রচনাশৈলীতে সপ্তদশ শতাব্দীতে তমলুকের লবণব্যবসায় এবং চন্দ্রকোণা ও মেদিনীপুরের অন্তঃপাতী স্থানসমূহের বস্ত্রবয়ন বর্ণিত। কর্দ্দম প্রস্তর বা ইষ্টকে নির্ম্মিত, বৃক্ষ, বংশ বা পরিখায় বেষ্টিত দুর্গ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচিত হইয়াছে। প্রবেশপথের সংখ্যা ও রক্ষণপদ্ধতি সবিস্তারে উল্লিখিত। লোকসমষ্টি—যবন, ফিরিঙ্গি; ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, নবশাখ, তন্তুবায়, বণিক্, ভিন্নজাতীয় ক্ষত্রিয়, পৃথক্শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণ ইত্যাদিতে বিভক্ত। তাহাদের চরিত্রচিত্রণও সুখভোগ্য—একস্থানে সকলেই চোর, অপরত্র দস্যু ও ঘাতকের সংখ্যা প্রবল। ব্যবসায়োপযোগী উৎপন্ন সামগ্রী ও দ্রব্যসম্ভারের বর্ণনই সর্ব্বাপেক্ষা উপাদেয়। অমূল্য ঐতিহাসিক উপাদানও অল্প নহে। মেদিনীকোষ-রচয়িতা মেদিনীকর মেদিনীপুরের প্রতিষ্ঠাপকরূপে নির্দ্দিষ্ট। মেদিনীকোষ সুন্দর বিজ্ঞানসম্মত রীতিতে প্রস্তুত সংস্কৃত অভিধান; প্রামাণ্য অমরকোষের পরই উল্লেখযোগ্য। দেশাবলী-

রচনাকালে তীর্থযাত্রীরা বোধগয়ার বোধিদ্রুম আলিঙ্গন করিত। সম্ভবতঃ শ্রীতারানাথ তর্কবাচস্পতির বিহিত শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান তৎকালে প্রচলিত ছিল না। লেখক ও পরবর্ত্তী সম্পাদক বহু সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাসধৃত ব্যক্তির নাম করিয়াছেন; তন্মধ্যে আকবর, জাহাঙ্গীর, সাজাহান, ঔরঙ্গজেব হইতে বাহাদুর শাহ পর্য্যন্ত দিল্লীর সম্রাট্‌গণের নাম দ্রষ্টব্য। পণ্ডিচেরী ফিরিঙ্গীগণের করায়ত্ত বলিয়া উক্ত। তাঞ্জোরের মারহাট্টাবংশ, রিস্তাম্বোরের ভূপতিবর্গ, বুন্দেলখণ্ড ও অপরাপর স্থানের শাসকসম্প্রদায়ের ধারাবাহিক বংশাবলী সংক্ষেপে সুরক্ষিত।

এবম্বিধ দেশাবলীর প্রয়োজন ও উপযোগিতা নিন্দাস্তুতির অতীত। দুঃখের বিষয়, অদ্যাবধি একটীও সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি হস্তগত হয় নাই। প্রাপ্ত খণ্ডগুলির কোনটী আদির, অপরটী অন্তের, কোনটী বা মধ্যের। কোন খণ্ডে অষ্টাদশ, কোথায়ও ত্রয়োবিংশতি, তৃতীয়টীতে দ্বাবিংশতি, খণ্ডান্তরে আরও অল্পসংখ্যক। সমুদয়ের সমবায়েও পঞ্চষষ্টির অনেক কম। নিম্নলিখিত দেশের বিবরণ সন্নিবিষ্ট; (১) অঙ্গ বা ভাগলপুর, (২) অঙ্গ ও গৌড়ের (রাজমহল, পিরপৈন্তি, ও সন্নিহিতভূখণ্ড) মধ্যবর্ত্তী সন্ধিদেশ, (৩) শেখরভূমি বা পঞ্চকোট, (৪) হাজারিবাগ, ছোটনাগপুর ও জঙ্গল মহালের সমষ্টি রামগড়, (৫) কীকট বা গয়া, (৬) পাটলিপুত্র, (৭) প্রয়াগ ও মগধের অন্তর্ব্বর্ত্তী পুণ্ড্রদেশ, (৮) বরেন্দ্রদেশ, (৯) আসাম, (১০) হেরম্বদেশ, (১১) জয়ন্তিয়, (১২) শ্রীহট্ট, (১৩) ত্রিপুরা, (১৪) চট্টল, (১৫) বদর যোগিনী (আধুনিক ঢাকা), (১৬) বরিশালযুক্ত বাক্‌লা, (১৭) যশোর, (১৮) মনতদেশ (হুগলি), (১৯) বর্দ্ধমান, (২০) ভানক, (২১) রিস্তাম্বোর, (২২) সাগর, (২৩) ভূপাল, (২৪) বুন্দেলখণ্ড, (২৫) বৈর ও অবধিযুক্ত কোশল, (২৬) রাজগৃহ, (২৭) বীরভূম, (২৮) মল্লভূমি, (২৯) ব্রাহ্মণভূমি, (৩০) গৌড়দেশ, (৩১) বঙ্গদেশ, (৩২) দ্রবিড়দেশ, (৩৩) কর্ণালদেশ, (৩৪) মণিপুর, (৩৫) ইঙ্গিরিদেশ, (৩৬) অলপসিংহ, (৩৭) মৈমনসিংহ, (৩৮) সুসঙ্গ, (৩৯) সরযুপার, (৪০) গাধিদেশ (বর্ত্তমান আজমগড়), (৪১) তাম্রলিপ্তি, (৪২) ব্রজমণ্ডল, (৪৩) অন্তর্ব্বেদিদেশ।

পাণ্ডুলিপিগুলি ফোর্ট উইলিয়মকলেজ-পুস্তকাগারের জন্য সংগৃহীত। উক্ত পুস্তকালয়ের অপরাপর পাণ্ডুলিপির লিখিত সংখ্যার হস্তাক্ষর ও বর্ণিত পাণ্ডুলিপির সংখ্যা-লেখনের হস্তাক্ষর অভিন্ন। উক্ত কলেজের পাণ্ডুলিপি বিভাগ ও বিতরণ কালে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অংশে পড়ে। আপাততঃ পাণ্ডুলিপিগুলি

তথায় রক্ষিত। সমস্তই পরিস্কার দেবনাগরী অক্ষরে লিখিত। বাঁকুড়ায় প্রাপ্ত বঙ্গাক্ষরে লিখিত একটীমাত্র খণ্ড এক্ষণে বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটীর সম্পত্তি।

এই শ্রেণীর রচনার শেষ গ্রন্থ 'পাণ্ডব-দিগ্বিজয়'। মহাভারতের সভাপর্ব্বে উপাখ্যাত যুধিষ্ঠিরের চারি ভ্রাতার পৃথ্বীদিগ্বিজয়ের আকার অবলম্বনে বিরচিত। লেখক অষ্টাদশশতাব্দীতে শেখরভূমির রাজুর প্রিয়কবি রামকবি। পূর্ব্বোক্ত উপাখ্যানই ইহার আখ্যান বস্তু, কিন্তু সংবর্দ্ধিত ও আধুনিক ইতিবৃত্তের সমীকরণে প্রস্তুত। পূর্ব্বগামিগণের সাহায্য গ্রহণ করিয়া উহা নূতন উপাদানে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। সুতরাং সর্ব্বক্ষেত্রেই রামকবি জগমোহন অপেক্ষা বিশদ। চারি ভ্রাতার অভিযান আশ্রয়ে পুস্তকটী চারিভাগে বিভক্ত। হিন্দুমাত্রেরই বহু জ্ঞাতব্য তথ্যে গৌরবান্বিত। কিন্তু পাণ্ডুলিপিগুলির অবস্থা শোচনীয়।

যুধিষ্ঠির স্বয়ং দিগ্বিজয়ে নির্গত হন নাই। তাঁহার চারি ভ্রাতার বিজয়-কীর্ত্তিতে গ্রন্থের চারিবিভাগ। ভীমের অভিমান পূর্ব্বে, নকুলের দক্ষিণে, সহদেবের পশ্চিমে এবং অর্জ্জুনের উত্তরে। নকুলদিগ্বিজয়ে শকগণনার প্রবর্ত্তক শালিবাহনের সুদীর্ঘ ইতিবৃত্ত নিবদ্ধ। সমগ্র ভারতবিজয়ের পর বভ্রু-ঘোটকের সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। বভ্রুঘোটক বিক্রমসম্বৎ-প্রতিষ্ঠাতা বিক্রমাদিত্যের বংশধর। শালিবাহন সর্পনায়ক তক্ষপতি নাগরাজের ঔরসে কুম্ভকার পত্নীর গর্ভে জাত। শিবের প্রসাদে তিনি বিজয় লাভ করেন। উজ্জয়িনী নৃপের সহিত বিরোধপ্রসঙ্গে বহু দেশ ও জাতির বর্ণনা সুখকর। তাঁহার বিক্রমভীত সুদূর ব্রহ্মপুত্র ও সিন্ধুতীরে পলাতক বহু ক্ষত্রিয়জাতি যোদ্ধবৃত্তি বিসর্জ্জন দিয়া ভিন্ন ব্যবসায় ও জীবিকার অন্য পন্থা অবলম্বন করে। অখণ্ড কুমারিকাখণ্ড জয়ের পর নকুল বৌদ্ধ অধিবাসিপূর্ণ সিংহলে গমন করেন। 'পাণ্ডবদিগ্বিজয়' কাব্য অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে শেখর-ভূমিতে রামকবির লিখিত; ভারতের তৎকালীন বৌদ্ধধর্ম্মের মনোরম চিত্র সকলকেই মুগ্ধ করিবে। চতুর্ব্বিংশতি শাসন দেবতার নাম দেখিতে পাই। আরও দেখি ভূচন্দ্র মাগধীভাষায় পিপলবনে এবং লক্রমোচ সিংহলে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করেন।

কলিযুগের ২৪০০ বর্ষে নৈমিষারণ্যে সূত ভাগবত ব্যাখ্যা করেন। সেই সময়ে কীকটে শুদ্ধোদন ও মায়াদেবীর পুত্র বুদ্ধদেব অবতীর্ণ হন। তিনি প্রচার করেন যে, শরীরের অতিরিক্ত আত্মা কল্পনামাত্র, মৃত্যুই নির্ব্বাণ। তাঁহার অনুচরগণের কেহ সিংহলে, কেহ চীনে, কেহ কিরাতদেশে, কেহ বা পূর্ব্ব ভূবিভাগে গমন করেন। এক সময়ে সমবেত পণ্ডিতপ্রধানগণকে যুক্তিবলে পরাস্ত করেন;

পরিশেষে শঙ্করাচার্য্য, উদয়নাচার্য্য, কুমারিলভট্ট এবং মণ্ডন মিশ্রের নিকট পরাজয় স্বীকার করেন।

গ্রন্থকার রামকবি বৌদ্ধ, জৈন এবং চার্ব্বাকগণের পার্থক্য ও মতের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে পারেন নাই। বৌদ্ধগণের প্রতি চতুর্ব্বিংশতি শাসনদেবতা ও নবতত্ত্বে বিশ্বাসের আরোপ করিয়াছেন। সিংহল ও তত্রত্য মঠবিহারাদির বিবরণ সর্ব্বাংশে যথাযথ না হইলেও তথ্যবহুল। লেখকের মতে সিংহলের আরাধ্য দেবতা কার্ত্তিকেয় পত্নী কর্তৃক অভিশপ্ত হইয়া সিংহল হইতে নির্ব্বাসিত হন ও বুদ্ধদেবের আবির্ভাব ঘটে।

সহদেবের পশ্চিমদিকে দিগ্বিজয় কঠিন ও কষ্টসাধ্য হওয়ায় যুধিষ্ঠিরের আদেশে নিজকার্য্যে কৃতকৃত্য নকুল তাঁহার সাহায্যার্থ প্রেরিত হন। উভয়ের সম্মিলিত অভিযানে আরব, পারস্য বল্‌ক, তুর্কিস্থান, বদক্ষণ, বর্ম্মা, চীন, মহাচীন ও সিয়াম যুধিষ্ঠিরের বশ্যতা স্বীকার করে।

ভীমের বিজয়ব্যাপার উত্তর পঞ্জাব হইতে প্রারব্ধ। অমৃতেশ্বর (সম্ভবতঃ বর্ত্তমান অমরনাথ), জম্বু, সিয়ালকোট, সরযুপার, গণ্ডক এবং বাঙ্গলা ও বিহারে তাঁহার বিজয়বৈজয়ন্তী উড্ডীন হয়। জগমোহনের দৃষ্টান্তে রামকবির শেষোক্ত প্রদেশদ্বয়ের বিবরণ বিশদ, আধুনিক সংবাদ-সম্বলিত এবং পরম হৃদয়গ্রাহী।

অর্জ্জুনের দিগ্বিজয় সংক্ষিপ্ত ও ভীমের বিজয়ের সহিত সম্মিশ্রিত। এই অংশে ভৌগোলিক ও অপরাপর বিষয়সন্নিবেশ পরিস্ফুট নহে। ইন্দ্রপ্রস্থ হইতে চারিভ্রাতার অভিযান আরব্ধ হয়। সুতরাং সহদেবের বিতস্তা ও সিন্ধুর তীরদেশ এবং ভীমের জম্বু ও সিয়ালকোট বিজয় দুর্ব্বোধ্য হইয়া উঠে।

রামকবি তদীয় সঙ্কলনের সময় লিখিয়াছেন—"রন্ধ্রাভিনেত্রচন্দ্রৈস্ত গণিতে বৎসরে" সম্বৎগণনার ১৩৭০ অব্দে। কিন্তু কোন্ সম্বৎ অনুসারে গণনা করা হইয়াছে, তাহার পরিচয় নাই।

পুরাণবিষয়ে ভবিষ্যপুরাণের ব্রহ্মখণ্ড বৃহত্তম গ্রন্থ। বঙ্গ ও বিহারের পূর্ব্ব ও পশ্চিমস্থ পঞ্চষষ্টি দেশের বর্ণনা ইহার উদ্দিষ্ট। বারাণসী হইতে মণিপুরের বৃত্তান্ত বিশদ ও বাহুল্যপূর্ণ। পুরাণ ধর্ম্ম ও নীতির প্রদেষ্টা ; সুতরাং দেশবিশেষের পাপাচার তীব্রভাবে সমালোচিত। দ্বাপরের অন্তে ব্যাসদেবের রচিত বলিয়া কল্পিত হইলেও ইহা আধুনিক, অর্ব্বাচীন গ্রন্থ। বর্দ্ধমানের বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান ইহাতে স্থান পাইয়াছে। লোকরঞ্জক স্বভাবকবি ভারতচন্দ্রের আপামর-

পরিচিত 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্য ১৭৫৩ অব্দে সমাপ্ত হয়। ১৭০৪ অব্দে মুর্শিদ কুলি খাঁ নিজনামে রাজধানীর নামকরণ করেন। বঙ্গের শেষ মুসলমান রাজধানী 'মোরাশিদাবাদ' নামে কথিত ও এই পুরাণে স্থান পাইয়াছে। সম্ভবতঃ এক প্রাচীন পৌরাণিক পুস্তক বহুবার সংস্করণের পর অথবা নূতন ও সমসাময়িক ব্যাপারের অন্তর্ব্বিন্যাসে বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে।

পুরাণ ও পৌরাণিকঘটনার আশ্রয়ে রচিত দেশবিবরণীর ঐতিহাসিক উপযোগিতায় সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। কিন্তু জগমোহনের অনুসৃত মার্গে সঙ্কলিত দেশাবলীবিবৃতি যথার্থই প্রয়োজনীয়। মানব কর্ত্তৃক মানবের ব্যবহারার্থ প্রস্তুত পার্থিব পদার্থনিচয়ের তথ্যপূর্ণ, বাণিজ্য, ব্যবসায়, কলকারখানার চিত্তাকর্ষক ও অত্যাবশ্যক সংবাদসম্পদে প্রত্যেকেরই উপযোগী। কল্পনার কামক্রীড়া বাব্যকলার প্রাণস্বরূপ, কিন্তু গন্ধময় বাস্তবের বর্ণনে ইহার যথেচ্ছব্যবহার স্থানবিরুদ্ধ। এইজন্য জগমোহনের বিবৃতি জাতীয় জীবনের অকৃত্রিম অঙ্কনহেতু সমাদরযোগ্য।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মতে ভারতের শিল্প বিজ্ঞান ও সাহিত্যের মৌলিকতা প্রমাণসাপেক্ষ। বৈদেশিক আদর্শের অনুপ্রেরণার সন্দেহ তাঁহাদের সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে সহজ ও স্বাভাবিক। সংশয় সমদর্শী; গ্রীক্, পারসী, তুর্কী, পাঠান ও মোগল সর্ব্বত্র সংস্কৃতের আদর্শান্বেষী। বর্ত্তমানক্ষেত্রে প্রথমোক্ত চারিটীর অসদ্ভাবে, মোগলের আশ্রয়ও চিন্তনীয়। সুতরাং আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরীর সহিত দেশাবলীবিবৃতির সম্পর্কও বিবেচ্য। এরূপ সন্দেহের নিরাকরণ অতি সহজসাধ্য। বিদ্যাপতির কাল আবুলফজলের ১৫০ বৎসরের পূর্ব্বে। বিক্রমসাগরের রচয়িতা বা পৃষ্ঠপোষক বিক্রম-বৈজলও আবুলফজলের পূর্ব্ববর্ত্তী, কারণ ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে, জগমোহন বিক্রমসাগর হইতে প্রচুর সাহায্য গ্রহণের উল্লেখ করিয়াছেন। জগমোহন ও রামকবি আবুলফজলের প্রায় সমসাময়িক সুতরাং আবুলফজলের প্রভাব সম্ভবপর। কিন্তু উভয়ের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ বিভিন্ন। অতএব এবম্বিধ প্রভাবের অবসর অতি অল্প। আবুলফজলের অভীষ্ট—রাজকীয় দলিলাদির সঙ্কলন; দেশাবলীবিবৃতি হিন্দুর জন্য অভিপ্রেত—পীঠস্থান ও ক্রিয়াকলাপাদির বিশিষ্টবিবরণে পরিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ। অতএব সংস্কৃতে দেশাবলীবিবৃতির কল্পনা ভারতের ভাবজাত, ভারতীয়ের নিজস্ব।

দুর্ভাগ্যক্রমে পাণ্ডুলিপিগুলি খণ্ডাকারে প্রাপ্ত। বর্ণিত দেশসমূহের পরম্পরাগত পর্য্যায় দুষ্প্রাপ্য। বারেন্দ্র হইতে দ্রাবিড়, হেরম্ব হইতে রিস্তাম্বোরে

খণ্ডকল্প তি প্রয়াণ জটিল ও বোধাতীত। সুতরাং আপাততঃ, প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপি-খণ্ডের সাহায্যে উপাদেয় তথ্যের আভাসই উপভোগ্য। কিন্তু 'বিহার-উৎকল-গবেষণাসমিতি'র অনুষ্ঠিত চেষ্টায়, উৎকৃষ্ট পাণ্ডুলিপি প্রাপ্তির পূর্ব্বে উহাদের যথারীতি সম্পাদন সুদূরপরাহত। প্রত্নতত্ত্বের বলে ও পাণ্ডুলিপি অনুসন্ধানের ফলে ইতিমধ্যেই অনেক অচিন্তনীয় রত্নরাজীর উদ্ধার সম্ভবপর হইয়াছে—লুপ্ত পাণ্ডুলিপির পুনরাবিষ্কারের আশাও একান্ত অবৈধ ও অলীক নহে। *

শ্রীঅনন্তপ্রসাদ শাস্ত্রী।

সোহাগ ও সোহাগা।

সোহাগে হৃদয় গলে সোহাগায় সোণা,
সত্য ইহা—ধ্রুব সত্য,—জানে জগজ্জনা।
থাক্‌না কেন হৃদে মলা—অভিমানের ভার,
গল্‌তে হ'বে পড়্‌লে তাহে সোহাগ-পীযূষ-ধার।
থাক্‌না সোণায় পাণ মর্ত্তা, কিম্বা বিষম খাদ,
সোহাগাতে গল্‌তেই হ'বে নাইরে বিসংবাদ।
কিন্তু হৃদি গলেনা হায়, যে সোহাগের রাগে,
আর যে কাঞ্চন গলেনাক' সোহাগা সংযোগে,
সে সোহাগ, সে সোহাগা বলনা কেমন ?—
কেমন সে হৃদি, আর কেমন কাঞ্চন ?

শ্রীরাজকুমার সেনগুপ্ত।

---

* Gazetter Literature in Sanskrit : M M. Hara Prasad Shastri.

ন্যায়রত্নের নিয়তি।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

অনেক দিন পরে ন্যায়রত্ন আজ একটু সচ্ছন্দ বোধ করিয়া শয্যাত্যাগ করিয়া কুশাসনে উপবেশন করিয়াছেন, কিন্তু নিরবলম্বভাবে সোজা হইয়া বসিবার সামর্থ্য নাই; তিনি একখানি কাঠের পিঁড়িতে হেলান দিয়া বসিয়া সুমতিকে নিকটে বসাইয়া তাহার সহিত গল্প করিতে লাগিলেন।

সুমতি অনেক দিন তাহার পিতাকে উঠিয়া বসিয়া কথাবার্ত্তা বলিতে দেখে নাই। কঠিন রোগের যন্ত্রণায় তিনি এতই কাতর থাকিতেন যে, সুমতি কোন দিন মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহার মুখে হাসি দেখিতে পায় নাই। শ্রাবণের আকাশ সর্ব্বদাই গাঢ় মেঘান্ধকারে সমাচ্ছন্ন থাকে, কিন্তু সহসা যদি কোন দিন অপরাহ্ণকালে পশ্চিম গগনপ্রান্ত হইতে সেই নিবিড় জলদজাল অপসারিত হয়—তাহা হইলে মুহূর্ত্তমধ্যে অস্তোন্মুখ তপনের বদনমণ্ডল যেমন প্রসন্ন হাস্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, সে দিন পিতার রোগকাতর পাণ্ডুর মুখমণ্ডল সেইরূপ হাস্যোজ্জ্বল দেখিয়া সুমতির উৎকণ্ঠাকণ্টকিত হৃদয়ও আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিল। তাঁহাকে স্বচ্ছন্দভাবে কথা বলিতে শুনিয়া সুমতি কিঞ্চিৎ আশ্বস্তা হইল।

ন্যায়রত্ন কন্যার সহিত গল্প করিতেছেন, এমন সময় বলরাম ঘোষ ন্যায়রত্নের শয়ন-কক্ষের দ্বারপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইল। সে ন্যায়রত্নকে পিঁড়া ঠেস দিয়া বসিতে দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইল, সোৎসাহে বলিল, "বাবাঠাকুর যে উঠে বস্‌তে পেরেছেন! কি ভাগ্যি! আজ 'শরীল' তবে এট্টু ভালই আছেন?"

ন্যায়রত্ন সস্নেহে বলিলেন, "হাঁ বাবা, আমার যন্ত্রণা ক্রমেই যেন ক'মে আস্‌চে।"

বলরাম ঘাড় বাঁকাইয়া বলিল, "খামকা কম্‌বে না? আল্‌বৎ কম্‌তে হবে, যে বস্তি লাগিয়েছি। বস্তির ওসুদেই ব্যামো আরাম হ'য়ে যাবেন বাবাঠাকুর! সে তো হো'ল, এদিকে যে আর এক কাণ্ড বাবাঠাকুর! হরেমপুর থেকে কে একজন মস্ত আমীর লোক পাল্কী হেঁকিয়ে আমার বাড়ীর দরজায় এসে হাজির! ষোলটা কাহার পাল্কীখানা একেবারে উড়িয়ে এনেছে, পাল্কীর

আগে পিছে পাঁচজন মাথায় পাক-বাঁধা বরকন্দাজ, ভারি জবর 'হেতের' (হাতিয়ার) বাবাঠাকুর! 'কাহার' (বেহারা)-দের হাঁক শুনে আর বরকন্দাজদের হেতের দেখেই আমার আক্কেল গুড়ুম। মনের মদ্দি সন্দো হলো এ কোন 'আজা আজড়া' হবে, পথ ভুলে এ গাঁয়ে এসে পড়েচে। পুছ্ করলাম এ গাঁয়ে দরকার কি? পাল্কী থেকে বেরিয়ে এসে তিনি বুল্লে তেনার নাম বেজয় দত্তো, আপনার সাথে তেনার কি কথা আছে। আমি তেনাকে বসিয়ে রেখে আপনাকে খপর দিতে আলাম।"

বিজয় দত্ত? সুবিস্তীর্ণ পরগণার তালুকদার প্রবলপ্রতাপ বিজয় দত্ত ন্যায়রত্নের দর্শনপ্রার্থী! তাঁহার সহিত সাক্ষাতের জন্য স্বয়ং এই সুদূরপল্লীতে উপস্থিত হইয়াছেন! ন্যায়রত্ন এরূপ অসম্ভব কথা হঠাৎ বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তিনি বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে বলরামের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন; তাঁহার মনে হইল তিনি জাগিয়া স্বপ্ন দেখিতেছেন! কিন্তু বিজয় দত্তের নাম শুনিয়া সুমতির বুক দুরুদুরু করিয়া উঠিল, কি যেন এক অজ্ঞাত ভয়ে সে শিহরিয়া উঠিল। সভয়ে তাহার পিতাকে বলিল, "বিজয় দত্ত আপনার সন্ধানে এখানে এসেছে? আমাদের সর্ব্বস্বান্ত ক'রে, আমাদের পথে দাঁড় করিয়েও তার সাধ মেটেনি, আবার এখানে পর্য্যন্ত তাড়া করে এসেছে। তার মতলবখানা কি বাবা!"

ন্যায়রত্ন সংযতস্বরে বলিলেন, "কিছুই ত বুঝ্‌তে পারছিনে মা! আমি ত এখন পারের যাত্রী, আর কেন?"

সুমতি বলিল, "আপনার এই অন্তিম কালে সেই নরপিশাচ যে, আপনার সঙ্গে দেখা ক'রে কতকগুলা দুর্ব্বাক্য বলবে, আপনার শান্তিভঙ্গ করবে—এ আমি সহ্য করতে পারব না। এখন আর আমরা তার তালুকের প্রজা নই, তার সঙ্গে আমাদের কোন সম্বন্ধ নেই। বলাই দাদা, তাকে বল বাবাঠাকুর প্রাণসংশয় কাহিল, তাঁর সঙ্গে দেখা হবে না, ফিরে যাক্ সে। যে রকম করে পার তাকে বিদায় করে দাও। সে বড় লোক আছে—আছেই, আমরা তার মত নরপশুর মুখ দেখ্‌তে চাই নে।"

ন্যায়রত্ন কন্যার কথা শুনিয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, "ও কি কথা মা! তুমি কেন এত বিচলিত হচ্ছ? এ রকম রূঢ় কথা তোমার মুখে শোভা পায় না। বলরাম, যাও বাবা, তাঁকে সঙ্গে করে এখানে নিয়ে এসো। তিনি মস্ত মানী লোক—রাজা মানুষ।"

বলরাম বলিল, "যে আজ্ঞে বাবাঠাকুর! পাল্কীর ডামাট রূপো দিয়ে মোড়া, তাতে আবার বাঘের মুখ! যে-সে লোক কি অ্যামোন পাল্কাতে চড়তে পারে? আজাটা আপনার শিষ্যি বুঝি?"

বলরাম প্রস্থান করিলে সুমতি বলিল, "আমি অন্যায় কথাটা কি বলেছি বাবা? যে নরাধম আমাদের সঙ্গে পিশাচের মত ব্যবহার করেছে, তার কি মুখ দর্শন করতে আছে? তার সঙ্গে আর আমাদের কি সম্বন্ধ বাবা! সামান্য পিপ্‌ড়েটাকেও পা দিয়ে মাড়ালে সে কামড়াতে আসে। আর এই বিজয় দত্ত আমাদের লাঞ্ছনার বাকি রেখেছে কি? সে সব কথা ভুলে গিয়ে তার-ই সঙ্গে আপনি দেখা করবার জন্যে ব্যস্ত, তাকে এখানে আস্‌তে বল্‌লেন!"

ন্যায়রত্ন বলিলেন, "দেখ মা, বিজয় দত্ত কি উদ্দেশ্যে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন—তা বুঝতে প্যার্‌চি নে। কিন্তু তাঁর মত সম্ভ্রান্ত লোক কষ্ট স্বীকার ক'রে যখন এতদূর এসেছেন, তখন নিশ্চয়ই তার একটা গুরুতর কারণ আছে। সেই কারণটি কি, তা জানায় দোষ কি? তিনি যে আমার নূতন কোন অনিষ্ট করবেন, সে আশঙ্কা আমার নেই মা! বিশেষতঃ তিনি এতদূর এসে আমার সঙ্গে দেখা না করে চলে যাবেন, এরূপ মনে হয় না। যদি আমি দেখা কর্‌তে সম্মত না হ'তাম, তা হ'লেও তিনি এখানে আমার সম্মুখে আস্‌তেন, তাঁর সঙ্গে আমাকে দেখা করতেই হ'তো, এ অবস্থায় দেখা করবো না বলায় অশিষ্টতা প্রকাশ করা ভিন্ন কোন ফল নেই; তা তিনি আসুনই না, কি বলেন শোনা যাক্।"

ন্যায়রত্নের কথা শেষ হইতে না হইতে বিজয় দত্ত তাঁহার শয়ন-গৃহের বহির্দেশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন; কিন্তু ন্যায়রত্নের অনুমতি না লইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন না; বলরাম দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া ইঙ্গিতে তাঁহার আগমনবার্তা জানাইলে ন্যায়রত্ন ক্ষীণস্বরে বলিলেন, "দত্ত মহাশয়, বাহিরে দাঁড়াইয়া আছেন কেন? আসুন, ভিতরে আসুন। আমি উঠিয়া আপনার অভ্যর্থনা করি—এরূপ আমার শক্তি নাই।"

ন্যায়রত্নের আহ্বানে বিজয় দত্ত তাঁহার নাগোরা জুতা বাহিরে খুলিয়া রাখিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং তাঁহার পদপ্রান্তে নিপতিত হইয়া উভয় হস্তে তাঁহার চরণ ধারণ করিলেন; ন্যায়রত্ন তালুকদারের এই বিচিত্র ব্যবহারে কিঞ্চিৎ ব্যস্ত হইয়া বাধাদানের চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহার চেষ্টা সফল হইল না। বিজয় দত্ত তাঁহার চরণ ধরিয়া কাতরস্বরে বলিলেন, "ঠাকুর, আমি

গুরুতর অপরাধে অপরাধী, আমার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত নাই। আমি আপনাদের মিথ্যা চোর অপবাদ দিয়া অপদস্থ করিয়াছি, পৈশাচিক উৎপীড়ন করিয়া পৈতৃক বাস্তভিটা হইতে বিতাড়িত করিয়াছি, আপনার ভূসম্পত্তি অপহরণ করিয়া আপনাকে কন্যাসহ গ্রাম হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াছি, এখন কোন্ মুখে আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিব? আমার মত মহাপাপিষ্ঠ নির্লজ্জেরও আপনার মুখের দিকে চাহিতে লজ্জা হইতেছে।"

ন্যায়রত্ন মুহূর্ত্তকাল নীরব থাকিয়া আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "আমার ন্যায় হতভাগ্য, নিরাশ্রয় দরিদ্র ব্রাহ্মণের পদতলে এ ভাবে পড়িয়া থাকা আপনার ন্যায় প্রবলপ্রতাপ অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতির পক্ষে অত্যন্ত অশোভন। এ ভাবে আপনার পদগৌরবের ও বৈভবের অপমান করিবেন না, পা ছাড়ুন।"

বিজয় দত্ত বলিলেন, "আমি জানি—আমি আপনার ক্ষমা লাভের যোগ্য নহি; কিন্তু আপনার অভিসম্পাত দুষ্ট প্রেতের মত দিবারাত্রি আমার পশ্চাতে ঘুরিতেছে, আমার মনে সুখ নাই, শান্তি নাই, দিবারাত্রি আমি অশান্তির আগুণে দগ্ধ হইতেছি, শত সহস্র বৃশ্চিকের দংশনজ্বালা আমি দিবারাত্রি অনুভব করিতেছি; আমার আহারে রুচি নাই, নয়নে নিদ্রা নাই, অনেক কষ্টে নিদ্রাকর্ষণ হইলে উৎকট দুঃস্বপ্ন দেখিয়া আমি চমকিয়া উঠি; আমার যন্ত্রণা অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। আমি আপনার দাসানুদাস, আমার অপরাধ মার্জ্জনা না করিলে আপনার চরণ ত্যাগ করিব না।"

বিজয় দত্ত ন্যায়রত্নের উভয় চরণে মস্তক স্থাপন করিয়া পড়িয়া রহিলেন, তাঁহার চক্ষু হইতে অশ্রুপাত হইয়া ন্যায়রত্নের সর্ব্বজনবন্দনীয় চরণদ্বয় সিক্ত করিল। বিজয় দত্তের বাহুপাশ হইতে পদদ্বয় মুক্ত করিতে ন্যায়রত্নের সাধ্য হইল না।

বিজয় দত্তকে অনুতপ্ত দেখিয়া ন্যায়রত্নের উদার হৃদয় করুণায় বিগলিত হইল। তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন, "চোর সন্দেহে আপনারা আমাদিগকে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন। অপরাধীর দণ্ডবিধান বিচারকের অবশ্যকর্ত্তব্য, যে বিচারক তাহাতে পরাঙ্মুখ হন—তাঁহাকে কর্ত্তব্যলঙ্ঘনজনিত পাপে লিপ্ত হইতে হয়। কাজি সাহেব কর্ত্তব্যের অনুরোধে আমাদের শাস্তি দিয়াছেন, সে জন্য আপনাকে দোষী করিতে পারি না; ইহাতে তাঁহারও দোষ নাই; মানুষের দুর্ব্বল হৃদয় শাস্তি পাইলে স্বভাবতঃই শাস্তিদাতার প্রতি বিমুখ হইয়া উঠে; কিন্তু আমাদের শাস্তি যতই কঠোর হউক, সে জন্য আমি কোন দিন

আপনাকে বা তাঁহাকে অভিসম্পাত করি নাই। তবে কেন বলিতেছেন, আমার অভিসম্পাতে আপনি অহর্নিশি মনঃকষ্ট পাইতেছেন? আপনার এই ভ্রান্ত ধারণার জন্য আমিই হৃদয়ে বেদনা পাইলাম।"

বিজয় দত্ত ক্ষুব্ধস্বরে বলিলেন, "হাঁ, বিচারকের কর্ত্তব্য আমরা আঠার আনা পালন করিয়াছি! আপনি সকল কথা জানিয়া যদি এ কথা বলিতেন, তাহা হইলে আপনার এই উক্তি শ্লেষ ভিন্ন আর কিছুই মনে করিতে পারিতাম না। কিন্তু প্রকৃত রহস্য আপনার অবিদিত। সেই বিড়ম্বনার কথা আপনার নিকট প্রকাশ করিতে আমার জিহ্বা আড়ষ্ট হইতেছে। কিন্তু অপরাধ করিয়া কথা স্বীকার না করা অধিকতর অপরাধের কার্য্য। সত্যবালার ফিতাটি হারাইয়াছিল সত্য, কিন্তু ফিতা চুরী যাওয়ার কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। আমরা না বুঝিয়া—ভ্রমক্রমে আপনার সুশীলা কন্যা সুমতিকে চোর বলিয়া সন্দেহ করিয়াছিলাম। সেই সন্দেহের বশবর্ত্তী হইয়াই আপনাদের অপমান করিয়াছি, সুমতির নিষ্কলঙ্ক চরিত্রে কলঙ্কের কালী ঢালিয়া দিয়াছি, আপনাদের উভয়ের প্রতি পৈশাচিক উৎপীড়ন করিয়াছি, আপনাদিগকে নিরাশ্রয় করিয়া গ্রাম হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছি। আপনাদের প্রতি যে অত্যাচার করিয়াছি, মানুষ মানুষের প্রতি ততদূর করিতে পারে না, বোধ হয় পিশাচেও পারে না। কিন্তু ধর্ম্মের জয় অধর্ম্মের পরাজয় চিরকালই আছে। এত দিন পরে সেই ফিতাটি পাওয়া গিয়াছে।"

ন্যায়রত্ন বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে বিজয় দত্তের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, তাঁহার বাক্যস্ফুরণ হইল না। সুমতি অদূরে অবগুণ্ঠনাবৃত মস্তকে অবনত মুখে বসিয়া রহিল; অশ্রুরাশি তাহার উভয় গণ্ড প্লাবিত করিতে লাগিল।

বিজয় দত্ত বলিলেন, "আপনার স্মরণ থাকিতে পারে আমার বাসার কাছে একটি প্রকাণ্ড বটগাছ ছিল, সেই গাছের উচ্চডালে কাকে বাসা করিয়াছিল। কয়েক দিন পূর্ব্বে রাত্রিকালে প্রচণ্ড ঝড় হইয়াছিল, সেই ঝড়ে বট গাছটি ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। কাকের বাসায় কোকিলের ছানা থাকে শুনিয়া সত্যবালা একজন দাসীকে সঙ্গে লইয়া সেই ভাঙ্গা গাছের কাছে গিয়া দেখিতে পায়, তাহার সেই জরীর ফিতাটি কাকের বাসার খড়কুটার সঙ্গে জড়াইয়া আছে। সত্যবালা দীর্ঘকাল পরে ফিতাটির সন্ধান পাইয়া আনন্দে বিহ্বল হইয়া আমাকে ডাকিতে লাগিল। তাহার উত্তেজিত ভাব দেখিয়া আমি ব্যস্তসমস্ত হইয়া ভাঙ্গা বট-গাছের তলায় উপস্থিত হইলাম, তাহা দেখিয়া অনেক লোক সেখানে আসিয়া জুটিল। গাছের

ডাল হইতে কাকের বাসাটি ভাঙ্গিয়া দেখিলাম, কাক সেই ফিতা, খড়কুটা, ছেঁড়া নেকড়া, পাখীর পালক, গাছের পাতা প্রভৃতির সংযোগে সেই বাসাটি নির্ম্মাণ করিয়াছিল। বুঝিলাম কাক তাহা অন্যের অলক্ষ্যে কুড়াইয়া লইয়া গিয়া এই কাজ করিয়াছে।

"তখন বুঝিলাম, অন্যায় সন্দেহে কি কুকর্ম্মই করিয়াছি! আমি তৎক্ষণাৎ আমার সেই দাসী—রমণীকে সেই স্থানে আনাইতে লোক পাঠাইলাম। আপনারা গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া আসিবার পর রমণী পক্ষাঘাতরোগে আক্রান্ত হইয়া একেবারে উত্থানশক্তি-রহিত হইয়াছিল, তাহার দুর্গতির সীমা ছিল না। আমার বাসা হইতে সেই গাছ-তলায় তাহাকে গাড়ী করিয়া আনিতে হইল। ইতিমধ্যে সেই অদ্ভুত কথা গ্রামে প্রচারিত হওয়ায় গ্রামস্থ সমস্ত লোক গাছের চারিদিকে আসিয়া জুটিল। সকলেই ফিতাটি দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া ভিড়ের মধ্যে আসিয়া ঠেলাঠেলি করিতে লাগিল। ইত্যবসরে কয়েকজন লোক দৌড়াইয়া গিয়া কাজি সাহেবকে সেখানে ডাকিয়া আনিল।

"রমণীকে লইয়া গরুর গাড়ী সেখানে আসিবামাত্র তিন চারি জন লোক তাহাকে গাড়ী হইতে টানিয়া বাহির করিল, তাহারই নষ্টামীতে একটি ব্রাহ্মণ-পরিবারের সর্ব্বনাশ হইয়াছে বুঝিয়া উত্তেজিত গ্রামবাসীরা তাহাকে কদর্য্য ভাষায় গালি দিতে লাগিল। কেহ কেহ এতই ক্রুদ্ধ হইয়াছিল যে, তাহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইল। আমি অনেক কষ্টে তাহাদিগকে থামাইয়া রমণীকে বলিলাম, 'তুই বলিয়াছিলি ন্যায়রত্ন ঠাকুরের মেয়ে এই ফিতা চুরী করিয়াছিল, কিন্তু এখন কাকের বাসায় ইহা পাওয়া গেল; তুই নিশ্চয়ই মিথ্যা কথা বলিয়াছিলি। এমন কায কেন করিয়াছিলি বল্। আবার যদি মিথ্যা কথা বলিস্—তাহা হইলে এখানকার এই সকল লোক তোকে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিবে। তোর হাড় গুঁড়া হইবে, আমি তোকে রক্ষা করিতে পারিব না। যদি তোর প্রাণের মায়া থাকে, তবে সব কথা খুলিয়া বল। মিথ্যা কথা বলিলে তোর রক্ষা নাই।"

"আমার কথা শুনিয়া রমণী কাঁদিয়া বলিল, বাবা, আমার আর বাঁচবার ইচ্ছে একটুও নেই, এখন মরণ হ'লেই বাঁচি; এ যাতনা আমার আর সহ্য হচ্ছে না। সেই বামুন ঠাকুরের শাপ আমার হাড়ে হাড়ে নেগেচে। সুমতি ঠাক্‌রুণ ফিতে চুরি করেনি বাবা! আমি তাকে জব্দ করবার জন্যে মিছে কথা বলেছিলাম। সত্যবালা দিদির একখানা পুরোনো ভাল গায়ের কাপড় ছিল,

সেখানি আমারই পাবার আশা ছিল, তা আমার কপালে ছাই পড়লো—সত্যবলা দিদি একদিন সেই কাপড়খানি সুমতি ঠাক্‌রুণের গায়ে জড়িয়ে দিলেন। তা দেখে রাগে হিংসেয় আমার সর্ব্বশরীর জ্বলে উঠ্‌লো, সুমতি ঠাক্‌রুণের উপর মা ঠাক্‌রুণের 'চিত্তির' কি ক'রে বিগ্‌ড়িয়ে দেব, তাই ভাব্‌তে লাগলাম। শেষে ফিতে চুরির কলঙ্ক তার ঘাড়ে চাপিয়ে দিলাম। তার আর তার বুড়ো বাপের চূড়ান্ত নাকাল হলো। মনের সুখে আমি হাততালি দিয়ে নাচ্‌তে লাগ্‌লাম। আমি যে দুষ্কর্ম্ম করলাম—তা আপনারা কেউ জানতে পারলেন না, কিন্তু মাথার উপর থেকে একজন ত দেখ্‌তে পেলে, তার চোখে ত ধুলো দিতে পারলাম না। এখনও দিনের পর রাত হচ্ছে, চন্দোর সূয্যি অকাশে উঠ্‌চে। ধম্মে সইবে কেন? ভগবান্ আমাকে যে সাজা দিলেন—তা আপনারা দেখ্‌চেন। আমি এখন মলেই বাঁচি; আমার পাপের 'প্রাচিত্তির'ত হচ্ছেই, কিন্তু আপনার আর (কাজি সাহেবকে দেখাইয়া) ঐ নেড়ে বেটার চোকছুরত যে আজও বজায় আছে এই আশ্চয্যি!'—এই কথা বলিয়া সেই হতভাগিনী সেই স্থানে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহার কথা শুনিয়া সমস্ত লোক স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর অসঙ্কোচে আমাকে ধিক্কার দিতে দিতে প্রস্থান করিল। আমি বুঝিলাম বিধাতার বিচারে পক্ষপাত নাই, রমণী তাহার দুষ্কর্ম্মের উপযুক্ত প্রতিফল পাইয়াছে, বিধাতার অভিসম্পাত বজ্রের ন্যায় আমার মস্তকের উপর উদ্যত থাকিয়া আমার জীবনের সুখ শান্তি নষ্ট করিতেছে; আমি আপনার চরণ ধারণ করিয়া আপনার নিকট মার্জ্জনা ভিক্ষা করিব—এই আশায় কত স্থানে আপনার অনুসন্ধান করিয়াছি, অবশেষে আপনি এখানে বাস করিতেছেন, সংবাদ পাইয়া আপনার নিকট ছুটিয়া আসিয়াছি—আপনি—"

কিন্তু বিজয় দত্তের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই ন্যায়রত্ন দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া আবেগকম্পিতস্বরে বলিলেন, "হরিহে! তোমার খেলা তুমিই জান, তোমার রাজ্যে সত্য কখন মিথ্যা হয় না। সত্য চিরদিন গোপন থাকে না। আজ হোক, কাল হোক আর দশদিন পরে হোক—যদি ইহলোকে না হয়, পরলোকে সত্যের জয় হইবেই। ক্ষুদ্র বুদ্ধি মানব আমি, তোমার অপার লীলা কি বুঝিব হরি!"

ন্যায়রত্নের মুখ হইতে আর কোন কথা নিঃসারিত হইল না। এইরূপ অচিন্ত্য উপায়ে তাঁহাদের কলঙ্কক্ষালন হওয়ায় আনন্দে ও আকস্মিক উত্তেজনায় তাঁহার কণ্ঠরোধ হইল, তাঁহার কোটরগত দীপ্তিহীন চক্ষু তারকা অস্বাভাবিক

উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, দুই বিন্দু অশ্রু তাঁহার নয়নপ্রান্ত হইতে অস্থিসার বিবর্ণ গণ্ডে গড়াইয়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মস্তকটি পিঁড়ির উপর হইতে ঢলিয়া পড়িল, তাঁহার চেতনা বিলুপ্ত হইল। তাঁর অবস্থা দেখিয়া বিজয় দত্ত তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাঁহাকে ধরিয়া তুলিলেন, সুমতি লজ্জা ত্যাগ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। তাহার পর বিজয় দত্ত ও সুমতি ন্যায়রত্নের সংজ্ঞাহীন দেহ ধরাধরি করিয়া অতি সাবধানে শয্যায় স্থাপন করিলেন; এবং তাঁহার চেতনা-সম্পাদনের জন্য উভয়ে তাঁহার শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইলেন।

সেই মুহূর্ত্তে কবিরাজ ন্যায়রত্নের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

কবিরাজ মহাশয় বলরাম ঘোষের বাড়ীর সম্মুখ দিয়া আসিবার সময় পাল্কী, বেহারা ও অস্ত্রধারী বরকন্দাজবর্গকে দেখিয়া যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইয়াছিলেন। বলরাম তখন বিজয় দত্তকে ন্যায়রত্নের নিকট পৌঁছাইয়া দিয়া বাড়ী ফিরিয়াছিল; সে বিজয়দত্তের প্রকৃত পরিচয় জানিত না, তবে বরকন্দাজদের জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিয়াছিল—তিনি একটি সুবিস্তীর্ণ পরগণার তালুকদার রাজতুল্য ব্যক্তি। সে বিজয়দত্তকে ন্যায়রত্নের চরণপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িতে দেখিয়াছিল, সুতরাং তাহার ধারণা হইয়াছিল, তিনি বাবাঠাকুরের একজন ভক্ত শিষ্য। বাবাঠাকুরের পীড়ার সংবাদ শুনিয়া তিনি তাঁহার চরণ দর্শন করিতে আসিয়াছেন। কবিরাজ বলরামকে জিজ্ঞাসা করিয়া বিজয় দত্তের সেই পরিচয়ই জানিতে পারিলেন। কিন্তু পাঠক-পাঠিকাগণের স্মরণ থাকিতে পারে, কবিরাজ মহাশয় কয়েকদিন পূর্ব্বে কথাপ্রসঙ্গে ন্যায়রত্নকে তাঁহার অজ্ঞাতবাসের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, ন্যায়রত্ন কোন কথা গোপন না করিয়া তাঁহার প্রতি বিজয়দত্তের দুর্ব্ব্যবহারসংক্রান্ত সকল কথাই প্রকাশ করিয়াছিলেন। এ অবস্থায় বিজয় দত্ত কি উদ্দেশ্যে ন্যায়রত্নের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন, তাহা বুঝিতে না পারিয়া কবিরাজ অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন, এতবড় পাষণ্ড অত্যাচারীকে ন্যায়রত্নের শিষ্য বলিয়াই বা বলরামের ধারণা হইল কেন? কবিরাজ কিছুই বুঝিতে না পারিয়া সন্দেহাকুলচিত্তে ন্যায়রত্নের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, পিতৃভক্ত পুত্র যেরূপ আন্তরিক যত্ন ও আগ্রহের সহিত পীড়িত পিতার

পরিচর্য্যা করে, বিজয়দত্ত সেই ভাবে ন্যায়রত্নের সেবাশুশ্রূষা করিতেছেন, তাঁহার চেতনাসঞ্চারের জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন, ইহা দেখিয়া তাঁহার বিস্ময় সমধিক বর্দ্ধিত হইল। কিন্তু তিনি বিজয়দত্ত বা সুমতিকে কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া তাঁহাদিগকে সরিয়া দাঁড়াইতে ইঙ্গিত করিয়া স্বয়ং ন্যায়রত্নের শুশ্রূষার ভার গ্রহণ করিলেন। তাঁহার শুশ্রূষায় ন্যায়রত্ন অবিলম্বে সংজ্ঞা লাভ করিলেন; তিনি চক্ষু উন্মীলিত করিয়া স্থিরদৃষ্টিতে কবিরাজের মুখের দিকে চাহিলেন, ক্ষীণ স্বরে বলিলেন, "তুমি কখন এলে? বোস!"

কবিরাজ তাঁহার পাশে বসিয়া তাঁহার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন, ধীরে ধীরে বলিলেন, এই একটু আগে এসেছি—এসেই দেখি আপনার মূর্চ্ছা হয়েছে। এখনও আপনার নাড়ী বড় ক্ষীণ, আপনি স্থিরভাবে বিশ্রাম করুন। এখন অধিক কথা বল্‌বেন না।"

ন্যায়রত্ন বলিলেন, "বিজয় কোথায়?"

বিজয়দত্ত অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "এই যে আমি এখানেই আছি। আপনি ব্যস্ত হইবেন না।"

ন্যায়রত্ন বলিলেন, "না, আমি মোটেই ব্যস্ত হই নাই, তবে বিজয়ের কথা শুনিয়া হঠাৎ আমি একটু উত্তেজিত হইয়াছিলাম, দুর্ব্বল দেহে আকস্মিক উত্তেজনা সহ্য হয় নাই, তাই মোহ হইয়াছিল। এখন বেশ সুস্থ হইয়াছি। কবিরাজ বিজয়ের সঙ্গে তোমার পরিচয় নাই, তোমাদের পরিচয় করাইয়া দিই।"

কবিরাজ অপ্রসন্নভাবে বলিলেন, "না থাক, পরিচয়ের আবশ্যক নাই, আপনার নিকট পূর্ব্বেই ত উহাঁর যথেষ্ট পরিচয় পাইয়াছি। তাহা শুনিয়া আর অধিক পরিচয় জানিবার জন্য আগ্রহ নাই; তবে এ সময়ে 'মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা' দিতে উনি না আসিলেই ভাল হইত। এই পরম ভাগবত, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের প্রতি প্রজারঞ্জক রাজার যাহা কর্ত্তব্য, তাহার কিছুই বাকি রাখেন নাই, এখন এই সুদূর পল্লীতে জীবনের প্রান্তোপনীত মুমূর্ষু ব্রাহ্মণের শান্তিভঙ্গ করিতে কেন আসিয়াছেন, তাহা বুঝিতে না পারিয়া একটু বিস্মিত হইয়াছি, একথা অবশ্যই স্বীকার করিব।"

বিজয় দত্তের প্রতি কবিরাজের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া ন্যায়রত্ন ক্ষুণ্ণ হইলেন, তিনি ক্ষুব্ধস্বরে বলিলেন, "কবিরাজ, বিজয় অনুতপ্ত, উনি আমাদের প্রতি যে অন্যায় ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা একটি গুরুতর ভ্রমের ফল। মানুষ মাত্রেই ভ্রমপ্রমাদের অধীন; ভ্রমের বশে কোন অন্যায় কার্য্য করিয়া যিনি সরল-

ভাবে ত্রুটি স্বীকার করেন, তিনি প্রকৃতই মহাশয় ব্যক্তি। বিজয় তাঁহার ভ্রম বুঝিতে পারিয়া ত্রুটি স্বীকার করিবার জন্য কষ্ট করিয়া এতদূর আসিয়াছেন, এ অবস্থায় পূর্ব্ব কথা স্মরণ করিয়া তাঁহাকে বাক্যবাণে বিদ্ধ করা, বা উঁহার সম্বন্ধে বিরুদ্ধ ধারণা পোষণ করা সঙ্গত নহে, তুমি আর উঁহাকে লজ্জা দিও না, ইহাই আমার অনুরোধ।”

বিজয় দত্ত বলিলেন, “কবিরাজ মহাশয়, আপনি বোধ হয় ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিকট উহাঁর প্রতি আমার পৈশাচিক ব্যবহার সম্বন্ধে কোন কোন কথা শুনিয়াছেন। কিন্তু আমি কতদূর স্বার্থপর লোভী ইতরপ্রকৃতি নরাধম, তাহা উনি আপনাকে বুঝাইয়া দিতে পারিয়াছেন কিনা সন্দেহ; কারণ উনি ক্ষমাশীল, ধর্ম্মনিষ্ঠ সাধু ব্যক্তি, উনি কাহারও নিন্দা করেন না, পরচর্চ্চা উঁহার স্বভাব-বিরুদ্ধ। আমি মহাপাপিষ্ঠ, নিতান্ত ঘৃণিত জীব। কিন্তু নিজের প্রতি আমার যেরূপ ঘৃণা হইয়াছে, আপনি আমাকে ততদূর ঘৃণা করিতে পারিবেন না। যে অনুশোচনার অনলে দিবারাত্রি আমার হৃদয় দগ্ধ হইতেছে, তীব্র শ্লেষ, কঠোর বাক্যবাণ তাহার তুলনায় তুচ্ছ। শুনিয়াছি নিজের পাপের কথা মুক্তকণ্ঠে অন্যের নিকট প্রকাশ করিলে পাপের গুরুত্ব হ্রাস হয়। আমার অপরাধ কিরূপ গুরুতর, তাহা আমার মুখেই শ্রবণ করুন, তাহা হইলে আপনি বুঝিতে পারিবেন, আমি কিরূপ নরাধম।”

অনন্তর বিজয় দত্ত ন্যায়রত্নের প্রতি তাঁহার আক্রোশের কারণ হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার কন্যার ভিতার অন্তর্দ্ধান ও তাহার পুনঃপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত সমস্ত কথা ধীরে ধীরে কবিরাজের গোচর করিলেন। কবিরাজ স্তম্ভিতহৃদয়ে নির্ব্বাক্‌-ভাবে সেই বিচিত্র কাহিনী শ্রবণ করিলেন।

বিজয় দত্ত নিজের কুকীর্ত্তি প্রকাশ করিয়া সবিষাদে বলিলেন, “কবিরাজ মহাশয়, আমি যে মহাপাপ করিয়াছি, তাহার বিবরণ শুনিলেন, আমার এ পাপের প্রায়শ্চত্ত নাই। এ জীবনে যে পুনর্ব্বার শান্তি লাভ করিব—তাহার আশা নাই। তবে যদি ঠাকুরের হাতেপায়ে ধরিয়া পুনর্ব্বার উঁহাকে উঁহার পিতৃ ভিটায় সংস্থাপিত করিতে পারি, তাহা হইলে বুঝিব উনি আমাকে ক্ষমা করিয়াছেন,—সেই আশায় উঁহার চরণপ্রান্তে উপস্থিত হইয়াছি। ঠাকুর, আপনার চরণাশ্রিত অনুতপ্ত হতভাগ্যকে নিরাশ করিবেন না।”

ন্যায়রত্ন কোন উত্তর করিলেন না, মুক্ত বাতায়নপথে অনন্ত নীলাম্বরে দৃষ্টি সম্বদ্ধ করিয়া স্তব্ধভাবে কি ভাবিতে লাগিলেন। সুমতি, অদূরে বসিয়া বিজয়

দত্তের সকল কথা শুনিতেছিল, পূর্ব্ব কথা স্মরণ হওয়ায় তাহার হৃদয় শত চিন্তায় আন্দোলিত হইতেছিল; তাহার পর বিজয় দত্ত যখন কথাপ্রসঙ্গে সত্যবালার কথা উত্থাপিত করিলেন, চির দুঃখিনী ভাগ্যবিড়ম্বিতা সখী সুমতিকে দেখিবার জন্য সে কিরূপ আশা ও আগ্রহের সহিত তাঁহার প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষা করিতেছে—তাহার উল্লেখ করিলেন, তখন সুমতি আর আত্মসংবরণ করিতে পারিল না, তাহার উভয় চক্ষু হইতে ঝর-ঝর করিয়া অশ্রু ঝরিয়া তাহার বক্ষের বসন সিক্ত করিল। অবশেষে সে চক্ষু মুছিয়া অবনতমস্তকে ধীরে ধীরে তালুক-দারকে বলিল, "সত্য এখনও আমাকে ভুলিতে পারে নাই; সে আমাকে কত ভালবাসে, তা আমিই জানি। জীবনে আবার তাহাকে দেখিতে পাইব, সে আশা ত্যাগ করিয়াছিলাম। এ বিদেশে আমরা আশার অতিরিক্ত আদর যত্ন পাইয়াছি, বলাইদাদার নিঃস্বার্থ ভালবাসা, তাহার সেবা কখন ভুলিতে পারিব না; কিন্তু তবু যেন মনে হয় এখানে আপনার জন কেহ নাই! পিতৃপিতামহের ভিটার কি আকর্ষণ আছে, তাহার তুলনায় স্বর্গসুখও তুচ্ছ মনে হয়। বাড়ী ফিরিয়া যাইতে বাবার যাহাতে মত হয়, আপনি সেজন্য চেষ্টা করুন। সত্যর জন্য আমার বড়ই মন কেমন করিতেছে।"

সুমতির মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া ন্যায়রত্ন তালুকদারের মুখের উপর স্থির দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া বলিলেন, "বিজয়, আমার শরীরের অবস্থা দেখিতেছ ত? আমি উত্থানশক্তি-রহিত, কবিরাজকে জিজ্ঞাসা করিলেই জানিতে পারিবে—আমার জীবনদীপ নির্ব্বাপিত হইবার আর অধিক বিলম্ব নাই। এ জীবনে আর যে আমার জন্মভূমি দেখিতে পাইব সে আশা নাই।" এই কথা বলিতে বলিতে ন্যায়রত্নের নয়নপ্রান্ত সজল হইয়া উঠিল।

পিতার জীবন শেষ হইতে আর অধিক বিলম্ব নাই, এ কথা শুনিয়া সুমতি মনে অত্যন্ত বেদনা পাইল। সে জানিত এ কথা ধ্রুব সত্য, পিতার অবস্থা দেখিয়া এই কঠোর সত্য সে উপলব্ধিও করিত, কিন্তু মিথ্যা আশার আবরণে সে এই সত্য ঢাকিয়া রাখিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিত। পিতার কথা শুনিয়া সে আবেগের সহিত বলিল, "কি কুক্ষণে যে বাড়ী হইতে পা বাড়াইয়াছিলাম, বিপদের পর বিপদ আসিয়া আমাদের পিষিয়া ফেলিতেছে। এক দিনও সুখশান্তির মুখ দেখিতে পাইলাম না! বাবা, এখানে আসিয়া অবধি তোমার শরীর একটি দিনের জন্যও ভাল দেখিলাম না। একটা-না-একটা অসুখ লাগিয়াই আছে, গ্রামে দশজন আত্মীয় স্বজন আছে, আমার মুখের দিকে

চাহিবার পাঁচজন আত্মীয়াও আছে। এখানে আমি যদি হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়ি—তোমার মুখে একটু জল দেয় এমন কেহ নাই। পাঁচ ক্রোশের মধ্যে এক ঘর ব্রাহ্মণ নাই। এই রকম শরীর লইয়া কোন্ ভরসায় তুমি এখানে থাকিতে চাহিতেছ বুঝিতে পারিতেছি না। তালুকদার মহাশয় না আসিলে আমাদিকে অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া এখানেই পড়িতে থাকিতে হইত; কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা বোধ হয় অন্যরূপ। নতুবা তালুকদার মহাশয় আমাদের জন্য কষ্ট করিয়া এতদূর আসিতেন না। মা জগদম্বার করুণায় নির্ভর করিয়া চল বাবা, বাড়ী যাই। বাড়ী গেলেই তোমার এ ব্যারাম সারিয়া যাইবে।”

ন্যায়রত্ন মৃদু হাসিয়া বলিলেন, “হাঁ, এ আরোগ্য হইবার মতই ব্যাধি বটে! সে যাহাই হউক, আমার শরীরের এই অবস্থায় এই দূর দেশ হইতে কি করিয়া আমাকে বাড়ী লইয়া যাইবে—তাহা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি?”

ন্যায়রত্নের অন্য কোন আপত্তি নাই বুঝিয়া বিজয় দত্ত উৎসাহভরে বলিলেন, “আপনি ত পাল্কীতে চড়িবেন না, কিন্তু সে জন্য অসুবিধা হইবে না, আপনাকে নৌকায় করিয়া লইয়া যাইব। এখান হইতে নৌকায় কিছু দূর গিয়া আমরা গঙ্গায় পড়িব। গঙ্গার বাতাসে আপনার শরীরও অনেকটা সুস্থ হইবে।”

ন্যায়রত্ন নৈরাশ্য-বিজড়িত স্বরে বলিলেন, “আর সুস্থ হইয়াছি! এ জীবনে গঙ্গাদর্শন আমার ভাগ্যে নাই। কবিরাজ, তুমি কি বল?”

কবিরাজ বলিলেন, “আপনি একেবারে হাল ছাড়িয়া দিলে আর কি বলিব? দীর্ঘকালব্যাপী রোগে ঔষধ ফলপ্রদ না হইলে দেখিয়াছি স্থানপরিবর্ত্তনে ফল পাওয়া যায়। আপনারও ইহাতে উপকার হওয়াই সম্ভব।”

সুমতি বলিল, “কবিরাজ মহাশয়, যে উপায়ে হউক—আপনি বাবাকে বাড়ী পাঠাইবার ব্যবস্থা করুন; আপনার মত হইলে উনি আর আপত্তি করিবেন না।”

বিজয় দত্ত বলিলেন, “দেখুন ন্যায়রত্ন মহাশয়, এতক্ষণ আমি নিজের কথা লইয়াই আপনার সময় নষ্ট করিয়াছি; আসল কথাটা এখনও আপনাকে বলা হয় নাই। আপনি আমার সঙ্গে বাড়ী যাইতে অসম্মত হইলেও আপনাকে বাড়ী যাইতেই হইবে; নবাব বাহাদুরের আদেশ আপনি অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন না।”

বিজয় দত্তের এ কথার মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া ন্যায়রত্ন সবিস্ময়ে তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন, তাহার পর ধীরে ধীরে বলিলেন, “বিজয়, আমি তোমার কথা বুঝিতে পারিলাম না; কাজি সাহেবের আদেশে আমি নির্ব্বাসিত হইয়াছি,

এই কঠোর দণ্ডাজ্ঞার বিরুদ্ধে আমি নবাব-দরবারে প্রতিকারপ্রার্থী হই নাই, মা জগদম্বার শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করিয়া বিচারক-প্রদত্ত দণ্ড নতশিরে গ্রহণ করিয়াছি, এ অবস্থায় নবাব বাহাদুর স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বিচারক-প্রদত্ত দণ্ড রহিত করিবেন, আমাকে বাড়ী লইয়া যাইবার আদেশ দিবেন, তাহা সম্ভব বলিয়া মনে করিতে পারিতেছি না।”

বিজয় দত্ত বলিলেন, নবাব বাহাদুর একজন সাধারণ প্রজার হিতের জন্য ব্যস্ত হইয়া আপনার গৃহ-প্রত্যাবর্ত্তনের পরোয়ানা বাহির করিবার আদেশ দিয়াছেন, এরূপ মনে করিবেন না। নবাব বাহাদুর কেবল যে সাহিত্য ও সঙ্গীতেরই পক্ষপাতী এরূপ নহে, প্রত্নতত্ত্বেও তাঁহার আন্তরিক অনুরাগ আছে—ইহাও বোধ হয় আপনার অজ্ঞাত নহে; কারণ আপনার স্মরণ থাকিতে পারে—অনেক পূর্ব্বে গৌড়ের ভগ্নস্তূপের মধ্যে একখানি শিলালিপি আবিষ্কৃত হওয়ায় তাহার পাঠোদ্ধারের ভার আপনার উপরেই পড়িয়াছিল।”

ন্যায়রত্ন বলিলেন, “হাঁ, আমার বিলক্ষণ স্মরণ আছে, সে অনেক দিনের কথা, আমাদের পরগণা তখনও তুমি ইজারা বন্দোবস্ত করিয়া লও নাই। আমি ত নবাব বাহাদুরের আদেশে সেই শিলালিপির পাঠোদ্ধার করিয়া দিয়াছিলাম; এমন কি, আমার পরিশ্রমে সন্তুষ্ট হইয়া তিনি আমাকে পুরস্কৃত করিবারও প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি পুরস্কারের লোভে উহা করি নাই, এ কথা তাঁহাকে জানাইয়াছিলাম। ইহাতে তিনি সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে জানাইয়াছিলেন, আমার কথা তাঁহার স্মরণ থাকিবে। এই ঘটনার কিছুকাল পরে তুমি যখন আমাদের তালুকের মালিক হইলে, এবং আমার ভাগ্যদোষে কাজি সাহেবের প্রতিকূলতায় আমি সর্ব্বস্বান্ত হইলাম, উৎপীড়িত ও লাঞ্ছিত হইয়া জন্মভিটা হইতে বিতাড়িত হইলাম—তখন একবার আমার মনে হইয়াছিল নবাব বাহাদুরকে আমার বিপদের কথা আদ্যোপান্ত জানাইয়া তাঁহার কৃপা-প্রার্থনা করি, নবাব বাহাদুর হয় ত কৃপাপরবশ হইয়া শরণাগত আশ্রিতকে রক্ষা করিতেন; কিন্তু তাহাতে তোমার ও কাজি সাহেবের অনিষ্ট হইতে পারে, বিশেষতঃ প্রবলপ্রতাপ তালুকদার ও নবাব বাহাদুরের প্রতিনিধি-স্থলাভিষিক্ত কাজি সাহেবের বিপক্ষতাচরণ আমার ন্যায় দুর্ব্বল নিঃস্ব প্রজার পক্ষে ধৃষ্টতামাত্র মনে করিয়া আমি সেই অভিপ্রায় ত্যাগ করি—নবাব বাহাদুরে শরণাগত না হইয়া নবাবের যিনি নবাব, সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যিনি মালিক, তাঁহারই শ্রীচরণে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। সেই দিনই আমি তোমাকে ক্ষমা করিয়াছিলাম।

এতদিন পরে সেই শিলালিপির পাঠোদ্ধারপ্রসঙ্গে নবাব বাহাদুর কি জন্ত এই অকিঞ্চন বৃদ্ধকে স্মরণ করিয়াছেন?”

ন্যায়রত্নের কথা শুনিয়া বিজয় দত্ত ক্ষণকাল স্তম্ভিতভাবে বসিয়া রহিলেন, তাহার পর বিনীতভাবে বলিলেন, “ন্যায়রত্ন মহাশয়, আপনার ক্ষমাশীলতার তুলনা নাই, এই স্বার্থপরতাপূর্ণ পৃথিবীর বহু ঊর্দ্ধে আপনার আসন প্রতিষ্ঠিত। আপনার প্রতি নবাব বাহাদুরের যেরূপ শ্রদ্ধার পরিচয় পাইয়াছি, তাহাতে মনে হয় আমার হস্তে আপনার নিগ্রহের কথা তাঁহার গোচর করিলে আমাকে অপদস্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইত; আমি লোকবল ও অর্থবলের সাহায্যে আত্মসমর্থনের চেষ্টা করিতাম, হয় ত আপনাকে রাজদ্বারে অপরাধী প্রতিপন্ন করিতে পারিতাম, কিন্তু বাঙ্গালা-বিহার-উড়িষ্যার দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ নবাব আইন-কানুন বা সাক্ষী-প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া সকল বিচার সম্পন্ন করেন না, অনেক সময় নিজের দুর্দ্দমনীয় হৃদয়াবেগেরই অনুসরণ করেন, আপনার প্রতি তিনি প্রসন্ন, আমি আপনার অনিষ্ট করিয়াছি, এ বিশ্বাস সহজেই তাঁহার মনে বদ্ধমূল হইত, আমার সহস্র সাক্ষী প্রমাণ, অগণিত অর্থ তাঁহার সে ধারণা বিচলিত করিতে পারিত না। তিনি যাঁহার নিকট উপকৃত ও কৃতজ্ঞ, আমি তাঁহার অশেষ অনিষ্ট করিয়াছি, একবার তাঁহার এ ধারণা হইলে আর আমার রক্ষা ছিল না। ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া দুর্ব্বল ব্যক্তি অনেক সময় প্রবল শত্রুর বিরুদ্ধাচরণে সাহসী হয় না, শত্রুকে ক্ষমা করে—কিন্তু সেই ক্ষমা ক্ষমানামের যোগ্য নহে, তাহা নিরুপায়ের অক্ষমতামাত্র; কিন্তু যিনি প্রতিকারের উপায় সত্ত্বেও শত্রুর অনিষ্টাশঙ্কায় প্রতিকারের চেষ্টা করেন নাই, তিনিই প্রকৃত ক্ষমাশীল, তিনি দেবতা। আপনার এই ক্ষমাশীলতা পৃথিবীতে দুর্লভ। কিন্তু কথায় কথায় অনেকদূর আসিয়া পড়িয়াছি, আসল কথা চাপা পড়িয়া গিয়াছে। সেই কথা বলি শুনুন।—আপনি সেই জীর্ণ ও ক্ষয়প্রাপ্ত শিলালিপির পাঠোদ্ধার করিবার পর অন্যান্য পণ্ডিতকে তাহা পরীক্ষা করিতে দেওয়া হয়, তাঁহারা আপনার মতাবলম্বী হইলেন না, শিলালিপির উৎকীর্ণ শ্লোকগুলির যে পাঠোদ্ধার করিলেন, তাহা অন্য প্রকার। ইহাতে নবাব বাহাদুরের সন্দেহ ভঞ্জন না হওয়ায় কাশীর পণ্ডিতমণ্ডলী দ্বারা উহার পাঠোদ্ধারের জন্য শিলালিপিখানি তিনি অযোধ্যাপ্রদেশের নবাবের নিকট প্রেরণ করেন। কাশী-নরেশ অযোধ্যার নবাবের অধীন তালুকদার মাত্র, অযোধ্যার নবাবের আদেশে কাশীর নরপতি খানকার প্রধান প্রধান পণ্ডিত দ্বারা উহার পাঠোদ্ধার করিয়া শিলালিপি

ফেরত পাঠাইয়াছেন। এতদিনে আপনার পাঠই নির্ভুল প্রতিপন্ন হইয়াছে; ইহাতে এক নিগূঢ় ঐতিহাসিক রহস্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। নবাব বাহাদুরের রাজ্যমধ্যে—এই বঙ্গদেশে আপনার ন্যায় মহামণ্ডিত আছেন, ইহা তিনি গৌরবের বিষয় মনে করিয়াছেন, এবং আপনাকে সম্মানিত করা রাজধর্ম্মানুসারে অবশ্যকর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া আপনাকে খেতাব ও খেলাত প্রদানের জন্য তাঁহার কারকুনকে পাঠাইবার আদেশ প্রদান করিয়াছেন; কারকুন মহাশয়ের অভ্যর্থনার কোন ত্রুটি না হয়, এই মর্ম্মে আমি নবাব সরকার হইতে এক পরোয়ানা পাইয়াছি।"

কবিরাজ মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "ওঃ বুঝা গিয়াছে! এই জন্যই ন্যায়রত্ন মহাশয়কে ভিটাছাড়া করিয়া আপনার এত অনুশোচনা হইয়াছে যে, আপনি নিজেই উঁহাকে খুঁজিতে বাহির হইয়াছেন, পাছে নবাবের কারকুন আসিয়া, আপনার ষড়যন্ত্রেই উনি উদ্বাস্ত ও নির্ব্বাসিত হইয়াছেন শুনিয়া ক্রুদ্ধ হন এবং মুর্শিদাবাদে প্রত্যাগমন করিয়া আপনার গুণের কথা নবাব বাহাদুরের গোচর করেন!"

কবিরাজের এই তীব্র ব্যঙ্গোক্তিতে বিজয় দত্ত মর্ম্মাহত হইলেন, কিন্তু কোন কথা না বলিয়া ম্লানমুখে মস্তক অবনত করিলেন। কে বলিবে এই সেই সুবিস্তীর্ণ পরগণার অসংখ্য প্রজার ভাগ্যবিধাতা, দম্ভের অবতার, প্রবলপ্রতাপ তালুকদার বিজয় দত্ত,—যাঁহার দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জলপান করে!

ন্যায়রত্ন বিজয় দত্তের মনঃক্ষোভ বুঝিতে পারিয়া অসংযতবাক্ কবিরাজের প্রতি অসন্তুষ্ট হইলেন; তিনি ক্ষুব্ধস্বরে বলিলেন, "দেখ কবিরাজ তোমার এই রূঢ় কথা শুনিয়া আমি মনে বড় বেদনা পাইলাম, তুমি কি জান না 'সত্যং ব্রূয়াৎ, প্রিয়ং ব্রূয়াৎ, মা ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্'—ইহাই নীতিশাস্ত্রকারের উপদেশ? অপ্রিয় কথা সত্য হইলেও বলিতে নাই, সেরূপ কথায় বন্ধুও বিরক্ত হন—পর ত পরের কথা! বিশেষতঃ তোমার কথা সত্য নহে; অপ্রিয় মিথ্যা কথা বলিয়া কাহারও মনে কষ্ট দেওয়া গুরুতর অপরাধ। বিজয় প্রকৃতই অনুতপ্ত হন নাই, ইহা তুমি কিরূপে বুঝিলে? কারকুনের ক্রোধের কথা বলিতেছ, তিনি নবাবের বেতনভোগী কর্ম্মচারী মাত্র; আমার নির্ব্বাসনের জন্য বিজয়ই দায়ী, এই ধারণাই যদি তাঁহার মনে বদ্ধমূল হয়, আর সে জন্য বিজয়ের প্রতি তিনি অসন্তুষ্ট হন,—তাহা হইলে তাঁহার মুখবন্ধ করা কি বিজয়ের অসাধ্য বলিয়া তুমি মনে কর?

ছিঃ,—এ রকম অশ্রদ্ধেয় কথা বলিতে নাই। বিজয় স্বকৃত কর্ম্মের জন্য আন্তরিক অনুতপ্ত না হইলে উনি কখনই বিপন্নের মত এখানে আসিতেন না, ষোড়শোপচারে কারকুনের পূজার ব্যবস্থা করিয়াই নিশ্চেষ্ট থাকিতেন। কতখানি অনুতাপের ফলে বিজয়ের মত ধনবান্ ও মহাসম্মানিত ব্যক্তি একজন চিরদরিদ্র নগণ্য নির্ব্বাসিত বৃদ্ধের অন্বেষণে বহু দূরবর্ত্তী পল্লীস্থিত একজন সামান্য গোয়ালার কুটীর দ্বারে আসিয়া দাঁড়ায়, তাহা কি তোমার বুঝিবার শক্তি আছে? না, বিজয়, প্রগল্ভতায় দুঃখিত হইও না, আমি তোমার অনুতাপের গভীরতা বুঝিতে পারিয়াছি। তোমার অনুশোচনা যে আন্তরিক—এ বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু আমার মনে হয় আমার সন্ধানে কারকুনকে অনর্থক পাঠাইতেছেন। আমি যে-রাজ্যের পথিক হইয়াছি—মানুষের প্রদত্ত খেতাব ও খেলাত সেখানে সঙ্গে লইয়া যাইবার উপায় নাই। আর যদি আমার তাহা ভোগ করিবার সময়ও থাকিত, তাহা হইলেও আমি তাহাতে লোভ করিতাম না। দাতা সদাশয়তার বশবর্ত্তী হইয়া যাহা দান করেন, গৃহীতার তাহা গ্রহণের যোগ্যতা আছে কি না তাহাও বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। খেতাবের অর্থ উপাধি; আমার মনে হয় উপাধি গ্রহণ নিজের বিদ্যাবুদ্ধি ও গুণপণার বিজ্ঞাপন প্রচার মাত্র; নিজেকে এই ভাবে জাহির করা কি অহঙ্কার ও মাৎসর্য্যের পরিচায়ক নহে? প্রথম যৌবনে আমি যখন টোল হইতে বাহির হইয়া আসি, তখন আমার গুরুদেব আমাকে 'ন্যায়রত্ন' উপাধি দিয়াছিলেন; কিন্তু যে শাস্ত্রের পারদর্শিতার নিদর্শনস্বরূপ আমাকে এই উপাধি দেওয়া হইল, সমুদ্রের ন্যায় গভীর অপরিমেয় সেই ন্যায়শাস্ত্রের আমি জানিই বা কি, বুঝিই বা কতটুকু? ক্ষুদ্র পিপীলিকা চিনির পাহাড়ে গিয়াছিল, সে চিনির একটি ক্ষুদ্র কণিকামাত্র মুখে করিয়া ফিরিয়া আসিবার সময় মনে করিয়াছিল—পাহাড়ের সমস্ত চিনি সে আয়ত্ত করিয়াছে, আমিও সেইরূপ কয়েক দিন ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া তাহার কণামাত্র আয়ত্ত করিতে পারিলাম কি না সন্দেহ; কিন্তু ন্যায়রত্ন হইয়া দাঁড়াইলাম! এই উপাধি গ্রহণ করা আমার পক্ষে কতদূর ধৃষ্টতার কার্য্য হইয়াছিল—ইহা বুঝিয়া ন্যায়রত্ন বলিয়া পরিচয় দিতে আমি আন্তরিক সঙ্কোচ অনুভব করি; কিন্তু কি করিব, অনেক দিন পর্য্যন্ত লোকে আমাকে ন্যায়রত্ন বলিয়াই জানিয়াছে—কাজেই আর তাহা পরিত্যাগ করিতে পারি নাই।"

কবিরাজ বলিলেন, "টোলের অধ্যাপকের প্রদত্ত উপাধি ও নবাব বাহাদুরের

প্রদত্ত উপাধিতে অনেক তফাৎ। নবাব বাহাদুর আপনাকে কোন উপাধি দিলে আপনি কি তাহা গ্রহণ করিবেন না ?"

ন্যায়রত্ন বলিলেন, নিশ্চয়ই নহে। এই সকল উপাধির কোন স্বার্থকতা আছে বলিয়া আমার মনে হয় না। কিন্তু দিন দিন দেশের লোকের মতি গতি কি শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে! বিদ্যাশিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য জ্ঞানলাভ, কিন্তু সে দিকে কাহারও লক্ষ্য নাই, সকলেই উপাধিলাভের জন্য ব্যস্ত; নামের সঙ্গে একটা উপাধি জুড়িতে পারিলেই সকলে কৃতার্থ! যে জ্ঞানানুরাগ, নিস্পৃহতা ও আড়ম্বরহীনতা যুগ যুগ ধরিয়া ব্রাহ্মণের চরিত্রগত বিশেষত্ব ছিল, গৌরবের নিদর্শন ছিল, তাহা দিন দিন উপেক্ষিত হইতেছে; সে কালের মত প্রগাঢ় পণ্ডিত কোথাও খুঁজিয়া পাইবে না, অথচ বিদ্যালঙ্কার, স্মার্ত্তশিরোমণি, ন্যায়পঞ্চানন প্রভৃতি উপাধিব্যাধি-মণ্ডিত পাণ্ডিত্যাভিমানী যত্র তত্র দেখিতে পাইবে। ইহা কি সামান্য ক্ষোভ ও লজ্জার বিষয় ?"

বিজয় দত্ত বলিলেন, "খেতাব না হয় গ্রহণ নাই করিলেন। কিন্তু নবাব বাহাদুর যদি আপনাকে কোন খেলাত বা জায়গীর দান করেন, তাহাও কি আপনি প্রত্যাখান করিবেন ? আপনার ভরণপোষণের জন্য একশত বিঘা লাখ-রাজ নবাব সরকার হইতে দান করা হইবে, নবাব দরবারে নাকি এইরূপ একটি কথা উঠিয়াছে। রাজধানীর অনেক সংবাদই আমি শুনিতে পাই, এই সংবাদটিও জানিতে পারিয়াছি।"

ন্যায়রত্ন বলিলেন, "নবাব বাহাদুর অনুগ্রহের নিদর্শনস্বরূপ আমাকে যাহা দান করিবেন, সেই রাজপ্রসাদ প্রত্যাখান করিয়া তাঁহার প্রতি অসম্মান প্রদর্শন আমি সঙ্গত মনে করি না, সেই দান আমাকে মাথা পাতিয়া লইতে হইবে।"

কবিরাজ বলিলেন, "ম্লেচ্ছের দানটা ভোজন হস্তে গ্রহণ করিবেন ? ইহা কি আপনার ন্যায় শুদ্ধাচারী নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য ?"

ন্যায়রত্ন বলিলেন, "রাজা ক্ষত্রিয়ই হউন, আর ম্লেচ্ছই হউন, প্রজার পিতৃ-স্থানীয়; রাজদত্ত পুরস্কার সাধারণ দানের সমতুল্য নহে। আর আমার জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্যও রাজদত্ত খেলাত বা জায়গীরের প্রয়োজন নাই। নবাব বাহাদুর রাজপ্রসাদস্বরূপ আমাকে যদি সত্যই কিছু নিষ্কর ভূমি দান করেন, তাহা আমি বিজয়ের হস্তেই সমর্পণ করিয়া যাইব। তিনি উক্ত লাখরাজ সম্পত্তির আয় হইতে প্রতিবৎসর বিজয়া দশমীর দিন দীন-দুঃখীদের অন্নবস্ত্র বিতরণ করিবেন। ইহাতে বহু অনাথের উপকার হইবে; বুভুক্ষিত দরিদ্র-নারায়ণের সেবায় নবাব

বাহাদুরের দান সার্থক হইবে; দরিদ্রের এই প্রকার হিতের তুলনায় শত শত উপাধি, খেতাব বা খেলাত নিতান্তই তুচ্ছ।"

সুমতি বলিল, "ওসব কথা এখন থাক্ বাবা! আগে ত নবাব বাহাদুরের হুকুম বাহির হউক, তাহার পর যে ব্যবস্থা করিতে হয় করিবেন। এখন শীঘ্র যাহাতে বাড়ী রওনা হইতে পারেন, তাহাই স্থির করুন, আমার মন বাড়ীর জন্য বড়ই অস্থির হইয়াছে। বাড়ী ফিরিতে না পাইলে আমার মনের আগুন নিবিবে না।"

ন্যায়রত্ন কন্যার অধীরতায় ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলেন, "মা, এত তাড়াতাড়ি করিলে কি চলে? আমার এই ভগ্ন দেহে পথের কষ্ট সহ্য হইবে কি না বিবেচনা করিয়া দেখি, যাহারা এই নিরাশ্রয় বিপন্ন পরিবারকে আশ্রয় দান করিয়া পরম আদর যত্নে এত দিন প্রতিপালন করিল, তাহাদেরই বা অভিপ্রায় কি, তাহাও জানা আবশ্যক। তাহার পর যেরূপ ব্যবস্থা সঙ্গত বোধ হয়—তাহাই করা যাইবে। বিজয় আমাদের অতিথি, বাড়ী যাইবার উৎসাহে তুমি অতিথির প্রতি কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইলে ত চলিবে না মা! আমরা নিতান্ত দরিদ্র, বিজয়ের মত মহাসম্ভ্রান্ত অতিথির যথাযোগ্য পানভোজনের ব্যবস্থা করিবার শক্তি আমাদের নাই। কিন্তু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও বিদুরের ক্ষুদকুড়ায় তৃপ্তি লাভ করিয়াছিলেন, দরিদ্র বিদুর সামান্য শাকান্ন দ্বারা ভগবানের সেবা করিতে লজ্জা বোধ করেন নাই, আমাদেরও লজ্জিত হইবার কারণ নাই। তুমি যাও উঁহার আহারের আয়োজন কর। আজ মধ্যাহ্নে নিয়মিত সময়ে বোধ হয় উঁহার আহার হয় নাই।"

পিতার আদেশে সুমতি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া গেল।

সুমতি প্রস্থান করিলে ন্যায়রত্ন তালুকদারের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "যিনি আমাদিগকে গৃহহীন করিয়াছেন, যাহার ইচ্ছায় আমরা নির্ব্বাসিত হইয়াছি, তিনি যদি এতদিন পরে আমাদিগকে বাড়ী লইয়া যাইবার জন্য উৎসুক হইয়া থাকেন, তাহা হইলে বাড়ী যাইতেই হইবে। তাঁহার ইচ্ছা ভিন্ন আপনার আমার ইচ্ছায় কিছুই হইবে না। তাঁহার ইচ্ছায় মূক বাক্‌শক্তি লাভ করে, পঙ্গু গিরি লঙ্ঘন করে; সুতরাং তাঁহার ইচ্ছা হইলে আমার বাড়ী ফিরিয়া যাওয়া যে অসম্ভব—ইহা আমি বিশ্বাস করি না; কিন্তু এখন আমার শরীরের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে আমি যে এ জীবনে আমার জন্মভিটা পুনর্ব্বার দেখিতে পাইব, ইহা দুরাশা বলিয়াই মনে হইতেছে। আমার বিশ্বাস—এই কুটীরেই আমার ইহলীলার অবসান হইবে; সেই অন্তিম মুহূর্ত্তের প্রতীক্ষাতেই আমি কালাতিপাত

করিতেছি। আমি শীঘ্রই নিন্দাপ্রশংসার সীমা অতিক্রম করিব, তথাপি আপনার কন্যার অপহৃত ফিতাটি যে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছেন—জীবনদীপ নির্ব্বাণের পূর্ব্বে এই সংবাদটি শুনিতে পাইয়া আমি বড়ই আনন্দ লাভ করিয়াছি। আমার মনে আর কোন ক্ষোভ নাই, এখন আমি সুখে মরিতে পারিব। সুমতি কলঙ্কমুক্তা হইয়া গ্রামে ফিরিয়া যাইতে পারিবে, নতুবা গ্রামে ফিরিয়া সে আত্মীয় স্বজনগণকে মুখ দেখাইতে পারিত না। তাহার পরিণামচিন্তায় আমার অন্তিম মুহূর্ত্ত অশান্তিপূর্ণ হইত। দেখ বিজয় সংসারে আমার আর কোন বন্ধন নাই, কেবল সুমতিই সংসারে আমার একমাত্র বন্ধন। পৃথিবীতে তাহার মুখের দিকে চাহিবার আর কেহ নাই, কিন্তু তোমার সুশীলা কন্যা তাহাকে বড়ই স্নেহ করে, সুমতিও তাহার অনুরাগিণী। সুমতি বাড়ী ফিরিয়া যাইবার জন্য এত ব্যস্ত হইয়াছে—তাহার কারণ সত্যবালার স্নেহের আকর্ষণ। সে সত্যবালার ভালবাসার, তোমার স্নেহের অযোগ্যা নহে—ইহার প্রমাণ ত তুমি পাইয়াছ; আমি তোমার হাতেই সুমতিকে সমর্পণ করিলাম। আমি ইহলোক ত্যাগ করিলে সে নিরাশ্রয় হইবে, আমার অভাবে ব্যাকুল হইবে,—এই জন্য আমার অনুরোধ তুমি তাহাকে আশ্রয় দিও, তোমার সত্যবালার ন্যায় তাহারও প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করিও।”

ন্যায়রত্নের কর্ণ রোধ হইল, তাঁহার কোটরগত চক্ষু হইতে দুই বিন্দু অশ্রু ঝরিয়া উপাধান সিক্ত করিল। বিজয় দত্তের চক্ষুর পাতাও ভিজিয়া উঠিল। মরুভূমি করুণার প্লাবনে ভাসিয়া গেল। তিনি মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় নিস্তব্ধ বসিয়া রহিলেন।

ন্যায়রত্ন ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া, তালুকদারের উভয় হস্ত স্বীয় শীর্ণ বিবর্ণ হস্তদ্বয়ে পরিবেষ্টিত করিয়া আবেগকম্পিতস্বরে বলিলেন, “বল, আমার সুমতির ভার গ্রহণ করিলে। বিজয়, মরণাহত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের এই অন্তিম প্রার্থনা পূর্ণ কর।”

তালুকদার বলিলেন, “আপনাকে স্পর্শ করিয়া অঙ্গীকার করিতেছি, সুমতির সকল ভার আমি গ্রহণ করিলাম। আমার সত্যবালা ও আপনার সুমতিকে আমি ভিন্ন চক্ষে দেখিব না, তাহাকে সুখী করিতে পারিব, সে আশা নাই, বিধাতা যে দিন তাহাকে বিধবা করিয়াছেন—সেই দিন তাহার সকল সুখ হরণ করিয়াছেন, তবে সে যাহাতে শান্তিলাভ করে—তাহার ব্যবস্থার ত্রুটি হইবে না, আমার এ কথায় আপনি নির্ভর করিতে পারেন।”

ন্যায়রত্ন তাঁহার দক্ষিণ করতল বিজয় দত্তের মস্তকে রাখিয়া সাশ্রুনেত্রে বলিলেন, "বাবা, তুমি চিরসুখী হও, মা কমলা তোমার সংসারে অচলা হউন।— আজ আমি নিশ্চিন্ত হইলাম।"

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

ন্যায়রত্নকে সঙ্গে লইয়া বাড়ী যাইবার আশায় তালুকদার বিজয় দত্ত অষ্টাহ কাল তাঁহার বাড়ীতে বসিয়া রহিলেন; তিনি পাল্কী বেহারা বিদায় করিয়া নৌকারও বন্দোবস্ত করিলেন, কিন্তু ন্যায়রত্নকে স্থানান্তরিত করিবার সুযোগ পাইলেন না। কবিরাজ বলিলেন, তাঁহার শরীর একটু সুস্থ না হইলে তাঁহাকে স্থানান্তরিত করা সঙ্গত হইবে না; সামান্য পরিশ্রমও তাঁহার পক্ষে সাংঘাতিক হইতে পারে। কিন্তু আট দিন বসিয়া থাকিয়াও বিজয় দত্ত ন্যায়রত্নের রোগোপশমের কোন লক্ষণ দেখিতে পাইলেন না, তৈলহীন দীপের আলোকশিখার ন্যায় ন্যায়রত্নের জীবনপ্রদীপ ক্রমেই নিষ্প্রভ হইতে লাগিল। কবিরাজের চিকিৎসাকৌশল, সুমতি ও বিজয় দত্তের প্রাণপণ চেষ্টা যত্ন ও সেবা শুশ্রূষা সমস্তই ব্যর্থ হইল।

এই ভাবে আটদিন অতীত হইলে, নবমদিন প্রভাতে ন্যায়রত্ন কথঞ্চিৎ সুস্থ বোধ করিয়া উঠিয়া বসিলেন! সে দিন তাঁহার রোগযন্ত্রণার অনেকটা উপশম বোধ হইতেছিল। তাঁহার আদেশে সুমতি তাঁহার শীর্ণ কণ্ঠ হরিনামের মালায় পরিবেষ্টিত করিল, এবং একখানি নামাবলী দ্বারা তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া দিল। তখন তিনি এতই দুর্ব্বল যে, হাত-পা নাড়িবারও শক্তি ছিল না, কিন্তু বাক্‌শক্তি রহিত হয় নাই; কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হইলেও স্বাভাবিকভাবেই কথা কহিতে পারিতেছিলেন। তাঁহার মূর্ত্তি প্রাবৃটের অপরাহ্নের অস্তোন্মুখ তপনের ন্যায় নিষ্প্রভ; কিন্তু অত্যন্ত স্থির ও গম্ভীর। ঝটিকারম্ভের পূর্ব্বে প্রকৃতি যেরূপ স্তম্ভিত ভাব ধারণ করে, সেইরূপ স্তম্ভিতপ্রায়।

ন্যায়রত্ন বিজয় দত্তের সহিত ধর্ম্মাধর্ম্ম ও পাপপুণ্য সম্বন্ধে কি আলোচনা করিতেছিলেন, এমন সময় কবিরাজ সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তিনি ন্যায়-রত্নকে সেই ভাবে শয্যায় উপবিষ্ট দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, কিন্তু এই আকস্মিক

সহসা উজ্জ্বল হইয়া উঠে, ইহা তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না। তিনি ন্যায়রত্নের শয্যা-প্রান্তে উপবেশন করিয়া তাঁহার ধমনীর বেগ পরীক্ষা করিলেন; কিন্তু কোন কথা বলিলেন না।

ন্যায়রত্ন কবিরাজের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কি দেখিলে কবিরাজ! আর কত বিলম্ব?"

কবিরাজ অবনতমস্তকে বসিয়া রহিলেন; দীপ নির্ব্বাণের আর অধিক বিলম্ব নাই—এ কথা তাঁহার মুখে উচ্চারিত হইল না, অথচ সত্য গোপন করিতেও তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না।

ন্যায়রত্ন বোধ হয় তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিলেন, ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "তুমি না বল, কিন্তু আমি বুঝিয়াছি আমার জীবনতরী ঘাটে আসিয়া লাগিয়াছে! হাঁ, কূলে ভিড়িয়াছে।"

কবিরাজ কুণ্ঠিতভাবে বলিলেন, "সত্যই যদি সেরূপ অবস্থা আসিয়া থাকে—তাহা হইলে—"

ন্যায়রত্ন কবিরাজের কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, তাহা হইলে আমার বাড়ীর পথ খুব নিকট। ঝটিকাসংক্ষুব্ধ উত্তাল তরঙ্গময়ী বিশালকায়া নদী পার হইয়া তরণী কূলে আসিলে, অচিরে অদূরবর্ত্তী স্বগৃহে উপস্থিত হইতে পারিব মনে করিয়া প্রবাসীর মনে কিরূপ আনন্দের সঞ্চার হয়, তাহা কখন অনুভব করিয়াছ কি? যদি কখন সেই আনন্দ অনুভব করিয়া থাক, তাহা হইলে আমার মনের ভাব তুমি কতকটা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে। আমার এই আনন্দের যে বাধাটুকু ছিল, বিজয়ের অনুগ্রহে তাহা দূর হইয়াছে।"

কবিরাজ প্রশংসমান-নেত্রে ন্যায়রত্নের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "দেখুন ন্যায়রত্ন মহাশয়, চিকিৎসা-ব্যবসায়ে আমি নূতন ব্রতী নহি, এই ব্যবসায়েই আমি চুল পাকাইলাম! চিকিৎসা উপলক্ষে আমাকে অনেক রোগীরই মৃত্যুশয্যাপ্রান্তে উপস্থিত থাকিতে হইয়াছে; অনেকের অন্তিম অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়াছি; কিন্তু মৃত্যুকালে ভয় বা দুশ্চিন্তায় কাতর হয় নাই, এরূপ লোক কোন দিন দেখিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না!"

ন্যায়রত্ন ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিলেন, "সংসারে আসিয়া দীর্ঘ জীবনে বিভিন্নপ্রকৃতির বহুলোকের সংস্রবে আসিয়াছি, তাহাদের রুচি, প্রবৃত্তি, সংস্কার ও বিশ্বাসেরও যথেষ্ট পরিচয় পাইয়াছি; কিন্তু দেখিয়াছি অধিকাংশ লোকেরই ভাগবানে আন্তরিক ভক্তি বা কায়মনো . ক্যে নির্ভর করিবার শক্তি নাই, পর-

লোকেও বিশ্বাস নাই। অনেকে তাঁহাকে মানে এবং বিপদরাশি যখন প্রলয়ের মেঘের মত তাহাদের মাথার উপর ঘনাইয়া আসিয়া তাহাদের প্রাণে ত্রাসের সঞ্চার করে—তখন তাহারা তাঁহাকে ডাকে, প্রাণ ভরিয়াই ডাকে,—কিন্তু সে কিরূপ ডাক? আমরা নৌকা হইতে জলে পড়িয়া ডুবিয়া মরিবার ভয়ে নৌকার মাঝির সাহায্যপ্রার্থনায় যে ভাবে তাহাকে ডাকি, ইহাও সেইরূপ। কিন্তু পশুরাও ত বিপন্ন হইয়া উদ্ধারলাভের আশায় কাতরভাবে আর্ত্তনাদ করে, যাহাকে তাহারা রক্ষক বলিয়া বুঝিতে পারে—ব্যাকুল প্রাণে সকরুণ-দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকে;—এই পশুধর্ম্মই কি ভগবানে ভক্তি-নির্ভরতার নামান্তর? আমরা মৃত্যুকালে আতঙ্কে ও উৎকণ্ঠায় অধীর হই কেন, জান? একেত আমরা কায়মনোবাক্যে ভগবানে নির্ভর করিতে পারি না, জননীর স্নেহময় ক্রোড়ে শয়ন করিয়া শিশু যেমন নিঃশঙ্ক ও নিশ্চিন্ত থাকে—বিশ্বজননীর ক্রোড়ও আমাদের পক্ষে সেইরূপ নিরাপদ ও শান্তিপ্রদ, ইহা আমরা অন্তরের সহিত বিশ্বাস করিতে পারি না, তাহার উপর—আমাদের এই নশ্বর দেহ একদিন এখানে ফেলিয়া রাখিয়া চলিয়া যাইতে হইবে, শীঘ্র হউক, বিলম্বে হউক পৃথিবীর সহিত এই ভৌতিক দেহের সকল সম্বন্ধ একদিন বিচ্ছিন্ন হইবে—একথা অনেকেই চিন্তা করে না—এই জন্য মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে তাহারা কি একটা অঘটন ঘটিল ভাবিয়া ত্রাসে উদ্বেগে চারিদিকে অন্ধকার দেখে! কোথায় যাইতেছি, না জানি সেখানে কি যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে, এই চিন্তায় অন্তিমমূহূর্ত্ত অতীব কষ্টদায়ক হইয়া উঠে, তাহার উপর দুশ্ছেদ্য মায়াপাশ! স্ত্রীপুত্রাদি পরিজনবর্গের মায়া, দেহের মমতা, বিষয়সম্পত্তির আকর্ষণ তাহাদিগকে বিব্রত করিয়া তোলে। সম্মুখে শত সহস্র সুখ সুবিধা, আশা, আনন্দ, ভোগ ও তৃপ্তির আধার এই লোকালোকপূর্ণ বসুন্ধরা, পশ্চাতে বিস্মৃতিতমসাচ্ছন্ন, অনিশ্চিত, অজ্ঞাত মৃত্যু-পারাবার! কিন্তু যদি আমরা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করিতাম যে, আমরা ভাল করি বা মন্দ করি, পাপ করি আর পুণ্যই করি—কর্ম্মফলভোগের জন্য পরলোক আছে, তাহার অধিকার হইতে নিষ্কৃতি লাভ আমাদের সাধ্যাতীত,—তাহা হইলে আমাদের জীবনপথ সুখে, শান্তিতে অতিবাহিত হইত; মৃত্যুকে শিয়রে উপস্থিত দেখিলে ভয়ের কোন কারণ থাকিত না। উহাত জীবনের অবশ্যম্ভাবী অবস্থান্তর মাত্র। হাঁ, সত্যই পরলোকে লোকের আস্থা নাই; এই জন্য ধর্ম্ম অন্তরের সামগ্রী না হইয়া পোষাকে পরিণত হইয়াছে; অনেকের উহা জীবিকার অবলম্বন! অনেকেরই

ইহা সাংসারিক প্রতিষ্ঠার জয়-পত্র। যে যত উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম কীর্ত্তন করে, সমারোহে দুর্গোৎসব করে, ধর্ম্মের নামে গোড়ামীর পরাকাষ্ঠা দেখায়,—সে তত ধার্ম্মিক! কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা বিশ্বাসের সামগ্রী, ইহা জীবনের অবলম্বন, ইহা ধ্রুব নক্ষত্রের ন্যায় সংশয়সঙ্কুল সংসার-সমুদ্রে মানবকে দিগ্‌ভ্রান্ত হইতে না দিয়া যে মহাপারাবারের অপরপ্রান্তে সুনিশ্চিত গন্তব্য-পথ নির্দ্দেশ করিতেছে—তাহারই নাম মৃত্যু।'

কবিরাজ এই জীবনোপান্তনীত বৃদ্ধের অমৃতময়ী বাণী শ্রবণ করিয়া মোহিত হইলেন; মুগ্ধহৃদয়ে বলিলেন, "কিন্তু ঠাকুর, এই সংসারে আপনার ন্যায় ধর্ম্মবিশ্বাস কয়জনের আছে?"

ন্যায়রত্ন বলিলেন, "না, না, ওকথা বলিও না। আমি ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব কিছুই বুঝি না, অতি অকিঞ্চন, অজ্ঞান আমি, যে ধর্ম্ম-বিশ্বাস যুগ যুগ ধরিয়া বিশ্বাসহীনতার মহাপ্লাবন হইতে আর্য্য ঋষি ও তপস্বিগণের এই সুপবিত্র তপোবনকে রক্ষা করিয়াছে—সেই বিশ্বাসের যদি কণামাত্রও লাভ করিতে পারিতাম, তাহা হইলে জীবন সফল মনে করিতাম। কিন্তু আমি সেরূপ সুকৃতি কোথায় পাইব? আমি কিছুই জানি না, কিছুই বুঝিও না। আমি আত্মশক্তিতে নির্ভর করিয়া যে কর্ম্ম করিতে গিয়াছি, তাহা সম্পন্ন করিতে না পারিয়া, হে ভগবান্, তোমারই নিকট শক্তি ভিক্ষা করিয়াছি, এবং তোমার ন্যাস করিয়া, তোমার শরণাপন্ন হইয়া আরব্ধ কার্য্য সম্পাদনের চেষ্টা করিয়াছি; কিন্তু অনাদিকাল-সঞ্চিত সংস্কার আসিয়া পদে পদে আমাকে বাধা দিয়াছে। বিষয়বাসনা ও ভোগলালসা অজ্ঞাতসারে আমাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করিয়াছে। আমি সেই ভোগলালসা চরিতার্থ করিবার জন্য কতবার আত্মবিস্মৃত হইয়াছি। এই বিষয়বাসনাই আমাদের সকল দুঃখের মূল। স্পৃহা হইতেই অভিনব স্পৃহার উৎপত্তি, তাহা প্রবৃত্তির উৎসধারা প্রবল করিয়া তোলে; কিন্তু এই ভোগ-বিলাসের পরিণাম কি? কেবল অশান্তি ভিন্ন তাহাতে আর কি লাভ হয়? আর আমাদের কয়টি ইচ্ছাই বা ফলবতী হয়? বাসনা পূর্ণ না হইলে দুঃখ, আবার বাসনার অনুরূপ ফললাভ করিয়া তাহা রক্ষা করিতে না পারিলে, তাহাতেও দুঃখ। অনিত্য বস্তুর আকাঙ্ক্ষায় বাসনার তীব্র জ্বালায় জ্বলিয়া পুড়িয়া যখন বুঝিয়াছিলাম বাসনার ক্ষয় ব্যতীত মানসিক সন্তোষ ও শান্তি লাভের সম্ভাবনা নাই, তখন হইতেই আমি সকল আকাঙ্ক্ষা, সকল বাসনা বিসর্জ্জন দিয়া 'ভগবান্ তুমি যা' কর, তাহাই হউক' বলিয়া তাঁহার উপর

নির্ভর করিয়াছিলাম। কিন্তু তাহাতেই কি শান্তিলাভ করিয়াছি! সে পথেও নিত্য কত বাধা, কত বিঘ্ন আমার শান্তি নষ্ট করিয়াছে। আমাকে রোগ-শোকে কত কষ্টই না পাইতে হইয়াছে! আমার মাথার উপর দিয়া যত বিপদের ঝড় বহিয়া গিয়াছে—তত বিপদ অতি অল্প লোকের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে। রোগের যন্ত্রণায় শোকের তাড়নায়, নূতন নূতন বিপদের আক্রমণে আমি অভিভূত হইয়া পড়িতাম; কুমতি সেই সুযোগে আমার হৃদয়ে আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করিত; আমাকে বুঝাইতে চাহিত—এ সকল ভগবানের নিষ্ঠুরতার পরিচায়ক; এতদূর নিষ্ঠুর যিনি, তাঁহাকে কি ভক্তি বিশ্বাস করিতে আছে? তাঁহার শরণাগত হইয়া লাভ কি? যে সকল কারণে মানুষ সংশয়-বাদী, অবিশ্বাসী ও ভগবানে ভক্তিহীন হয়—আমার জীবনে তাহার কখন অভাব হয় নাই। কিন্তু এই অকৃতি অধম সন্তানের প্রতি তাঁহার করুণার সীমা নাই, তাঁহার কৃপায় আমি আমার চরিত্রের দুর্ব্বলতা জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। তিনি যাহা করেন—তাহা আমাদের মঙ্গলের জন্যই করেন; তিনি কি গূঢ় উদ্দেশ্যে আমাদিগকে নিয়ত কঠোর পরীক্ষার অনলে নিক্ষেপ করেন—ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানব আমরা তাহা কতদিনে হৃদয়ঙ্গম করিব—এইরূপ চিন্তা করিয়া হৃদয়ে বল সঞ্চয় করিতাম। তাঁহার অপার করুণাবলে সকল বিপদ তাঁহারই উপর নির্ভর করিতে পারিয়াছি; কঠোর পরীক্ষানলে অঙ্গারের ন্যায় নিয়ত দগ্ধ হইয়াও দুর্গতিহারিণী বিপত্তারিণী মা জগদম্বাকে মনে প্রাণে ডাকি-য়াছি; বিপদ্‌ভঞ্জন হরি, সর্ব্বসন্তাপহারী শ্রীমধুসূদনের পাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি। আমার প্রতি ভগবানের যে কত দয়া, তাহা সেই সময় স্পষ্ট বুঝিতে পারিতাম। তাঁহারই কৃপাকটাক্ষে নিত্য নূতন বিপদের অগ্নিতে দগ্ধ হইয়াও ভস্মে পরিণত হই নাই; সকল কুপ্রবৃত্তিকে জয় করিয়া—আমার এই অকিঞ্চিৎকর জীবনের ব্রত উদ্‌যাপিত করিয়াছি। এতদিনে পরলোক হইতে আমার ডাক পড়িয়াছে, আমি এখন সুখে ও শান্তিতে এই জীর্ণ দেহের বোঝা নামাইয়া রাখিয়া তাঁহার আদেশ পালন করিতে যাইতেছি। ইহা কি আমার অল্প সৌভাগ্যের কথা?"

কবিরাজ বলিলেন, "পরলোকে আপনার প্রগাঢ় বিশ্বাস; কিন্তু ইহা কি সংস্কারমাত্র নহে? সত্যই যদি পরলোক থাকে—তাহা হইলে তাহার কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় না কেন? প্রত্যক্ষ প্রমাণ ভিন্ন দুগ্ধপোষ্য শিশুও কোন কথা বিশ্বাস করিতে চাহে না।"

ন্যায়রত্ন ক্ষুব্ধভাবে বলিলেন, "দুগ্ধপোষ্য শিশু চাক্ষুষ প্রমাণ ভিন্ন যাহা বিশ্বাস করে না, তুমিও চাক্ষুষ প্রমাণ নাই বলিয়া তাহা অবিশ্বাস করিবে? জড়বাদী নাস্তিকের ন্যায় পরলোক নাই বলিয়া উড়াইয়া দিবে? আমরা যাহা চক্ষু দ্বারা প্রত্যক্ষ না করিব—তাহারই অস্তিত্বে সন্দেহ করিতে হইলে জগতের অনেক ধ্রুব-সত্যই অবিশ্বাস করিতে হয়। আত্মা তুমি দেখিতে পাও না বলিয়া কি বলিবে আমাদের দেহে আত্মার অস্তিত্ব নাই? মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আমরা সম্পূর্ণ ধ্বংস প্রাপ্ত হইব, একমুষ্টি ভস্মই দুর্লভ মানবজন্মের একমাত্র পরিণাম?"

কবিরাজ বলিলেন, "অনেকেরই এইরূপ বিশ্বাস।"

ন্যায়রত্ন বলিলেন, "অত্যন্ত ভ্রান্ত বিশ্বাস। পৃথিবীতে কিছুই ধ্বংস হয় না, কেবল রূপান্তর প্রাপ্ত হয় মাত্র। মৃত্যুর পর দেহ পঞ্চভূতে বিলীন হইলেও দেহে যে চৈতন্যস্বরূপ নিত্য পদার্থ বিরাজ করিতেছেন, তাঁহার ধ্বংস নাই। রাত্রি না থাকিলে যেমন দিন হইত না, সেইরূপ পরলোক ভিন্ন ইহলোকের অস্তিত্ব সম্ভব হইত না। অন্য যুক্তি তর্কে আবশ্যক কি? শ্রীভগবান্ই স্বয়ং বলিয়াছেন,—

"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥" (২২)

তোমার ন্যায় সংস্কৃতভাষাবিৎ পণ্ডিত ব্যক্তির নিকট ইহার ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।—আত্মা এই জীর্ণ দেহ ত্যাগ করিয়া নব দেহ ধারণ করিবে। জীর্ণ-বস্ত্রের ন্যায় জীর্ণ দেহ অবশ্যপরিত্যাজ্য।"

কবিরাজ বলিলেন, "কিন্তু জীর্ণ বস্ত্রে ও জীর্ণদেহে আকাশ পাতাল প্রভেদ। একটী পরিবর্তন আমাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে, অপরটীর পরিবর্তনের কর্ত্তা আমরা নহি। কিন্তু সে সকল তর্ক এখন থাক, আমার কেবল এই কথা জানিবার আগ্রহ হইতেছে যে, আজীবনের সুখদুঃখের আধার, চিরজীবনের শিক্ষা ও সাধনার ক্ষেত্র এই দেহ—হউক জীর্ণ, তথাপি ইহা ত্যাগ করিতে আপনার মনে কি দুঃখকষ্ট বা ক্ষোভ উপস্থিত হইবে না? জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগের ন্যায় আপনি ইহা অবিচলিতচিত্তে ত্যাগ করিতে পারিবেন?"

ন্যায়রত্ন বলিলেন, "পুরাতন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র ধারণ করিতে কি তোমার মন বিচলিত হয়? এই পরিবর্তনে দুঃখের কোন কারণ আছে কি?"

কবিরাজ বলিলেন, "এই তুলনা কতদূর সঙ্গত বুঝিতে পারিতেছি না। জীর্ণ-বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র পরিধান করিতে সকলেরই আগ্রহ হয় বটে, কিন্তু

দেহ জরাজীর্ণ ও দুর্ব্বহ হইলেও তাহা ত্যাগ করিতে কাহারও আগ্রহ হয়—একথা পূর্ব্বে শুনিয়াছি বলিয়া মনে হয় না ; তবে রোগে শোকে মানুষ মৃত্যুর অধিক যন্ত্রণা পাইলে মৃত্যু প্রার্থনা করে বটে, কিন্তু সেই প্রার্থনা আন্তরিক কিনা সন্দেহ।”

ন্যায়রত্ন বলিলেন, “সে কথা সত্য। দেহী মাত্রেরই দেহের প্রতি আন্তরিক একটা মমতা আছে। বরং যুবক অপেক্ষা বৃদ্ধেরই এই মমতা অধিক। প্রকৃতিকে সংযত করিতে না পারায় মরণোন্মুখ বৃদ্ধেরও সংসারের প্রতি আসক্তি-মমতা এতই অধিক হইয়া থাকে যে, যুবকদেরও ততখানি দেখা যায় না! শমনকে শিয়রে দণ্ডায়মান দেখিয়াও অশীতিপর পলিতকেশ বৃদ্ধ এক কাঠা জমীর জন্য জ্ঞাতির সহিত বিবাদ করিতে কুণ্ঠিত হয় না! আমার এই দেহখানিকে যথেষ্ট ভালবাসি বলিয়াই ইহাকে বজায় রাখিবার জন্য নানা প্রকার চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু এই জীর্ণ কুটীরের চালের খড় পড়িয়া গিয়াছে—খুটিগুলি ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া পতনোন্মুখ হইয়াছে, আর তালি চলে না ; ইহা সংস্কারের সীমা অতিক্রম করিয়াছে। পরলোকে গিয়া কেবল যে নূতন দেহ পাইব এরূপ নহে, আমার যে সকল পরমাত্মীয় পূর্ব্বেই আমাকে ত্যাগ করিয়া সেই পথের পথিক হইয়াছেন, তাঁহাদেরও দেখা পাইব। তাঁহাদের সহিত আমার পুনর্ম্মিলন হইবে।”

ন্যায়রত্নের মুখমণ্ডল সহসা প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, তাঁহার কোটরগত নিষ্প্রভ চক্ষু উজ্জ্বল হইল ; সঙ্গে সঙ্গে দুই বিন্দু অশ্রু তাঁহার নয়নকোণে লক্ষিত হইল। তাঁহার ভাব দেখিয়া বোধ হইল—তাহা আনন্দাশ্রু। তিনি ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া সুমতিকে ডাকিলেন ; সুমতি তাঁহার নিকটে আসিয়া বসিলে, তিনি দক্ষিণ হস্ত তাহার মস্তকে রাখিয়া হাত বুলাইয়া বলিলেন, “মা, তোমাকে আমার যাহা বলিবার ছিল, তাহা সমস্তই বলিয়াছি। ভবিষ্যতে তোমাকে যেভাবে চলিতে হইবে, তাহাও তুমি শুনিয়াছ। আমার দেহান্তে তুমি আমার উপদেশ অনুসারে চলিবে। তোমাকে যে গীতাখানি দিয়াছি, তাহা দু’সন্ধ্যা পাঠ করিবে, গীতার উপদেশেই তোমার জীবন পরিচালিত করিবে। তালুকদার বিজয়দত্ত নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া তোমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইয়াছেন ; অনুশোচনায় তাঁহার হৃদয় পবিত্র হইয়াছে, উনি তোমার রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার সেই অঙ্গীকার মৌখিক নহে, তুমি কুণ্ঠা ত্যাগ করিয়া উঁহার সহিত হরিরামপুরে ফিরিয়া যাইবে। উঁহারই আশ্রয়ে বাস করিবে। আমার আশীর্ব্বাদে তোমার অবশিষ্ট জীবন শান্তিতেই কাটিবে।”

সুমতি কোন কথা বলিতে পারিল না। দুই চক্ষু হইতে অশ্রুধারা নির্গত হইয়া তাহার অঞ্চল সিক্ত করিল।

ন্যায়রত্ন চক্ষু মুদিত করিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার ইষ্ট মন্ত্র জপ করিলেন। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলেন, "হে হরি, হে পতিতপাবন মধুসূদন! এ জীবনে জ্ঞানতঃ ও অজ্ঞতাবশতঃ কত অপরাধ করিয়াছি, তাহা মার্জ্জনা করিয়া তোমার অভয় চরণে আমাকে স্থান দাও; সুমতি যেন তোমার আশ্রয়ে বঞ্চিত না হয়, তাহাকে তুমি সর্ব্বদা রক্ষা করিও। তোমার শ্রীচরণে যেন তাহার মতি স্থির থাকে।"

ন্যায়রত্ন চক্ষু উন্মীলিত করিয়া দেখিলেন, বলরাম, তাহার স্ত্রী-পুত্রেরা এবং গ্রামের অনেক লোক তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছে।

ন্যায়রত্ন কবিরাজের হাত দুইখানি উভয় হস্তে ধরিয়া বলিলেন, "ভাই, তোমাকে পাইয়া আমার জীবনের এই শেষ কয়দিন বড় আনন্দে কাটিয়াছে। তুমি আমার জীবন রক্ষা করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছ, সেবা-শুশ্রূষারও ত্রুটি কর নাই; তুমি আমার জন্য যাহা করিয়াছ—পিতার বা পিতৃকল্প জ্যেষ্ঠ সহোদরের জন্য কেহ তাহার অধিক করিতে পারে না। তোমার ঋণ পরিশোধ আমার সাধ্যাতীত; আর বলরাম, উহার গুণের কথা আর কি বলিব? বলরাম আমার জীবনদাতা; পূর্ব্বজন্মে বলরাম বোধ হয় আমার কোন পরমাত্মীয় ছিল—"

ন্যায়রত্নের কথা শুনিয়া বলরাম হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, সে ললাটে করাঘাত করিয়া কাতরস্বরে বলিল, "বাবাঠাকুর, সত্যি তুমি আমাদের ছেড়ে যাবা! এত করেও তোমাকে বাঁচাতে পাল্লাম না, বাবাঠাকুর! তুমি যে আমাদের গাঁয়ের দেবতা, বাবাঠাকুর, তোমাকে ছেড়ে আমরা কি নিয়ে থাক্‌বো? আমাদের দুরদেষ্ট না হলে কি তোমাকে হারাই বাবাঠাকুর!"

বলরাম তাঁহার পদপ্রান্তে ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিল; ন্যায়রত্ন মিষ্টবাক্যে তাহাকে সান্ত্বনা দান করিলেন; তাহাকে এবং গ্রামস্থ নরনারীগণকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, সকলেরই চক্ষু অশ্রুময়, সকলেরই হৃদয় হাহাকারে পূর্ণ।

ন্যায়রত্ন কবিরাজের কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া অস্ফুট স্বরে বলিলেন, আমাকে আঙ্গিনায় লইয়া গিয়া তুলসীমঞ্চের নিকট শয়ন করাও, ভাই!"

কবিরাজ ন্যায়রত্নের হাত ধরিয়া দেখিলেন, তাঁহার ধমনীর গতি রোধ

হইয়াছে! ন্যায়রত্নকে তিনি ধরিয়া তুলিবার চেষ্টা করিলে ন্যায়রত্ন মাথা নাড়িয়া নিষেধ করিলেন ; স্বয়ং তাঁহার স্কন্ধে ভর দিয়া ও সুমতির বাহু অবলম্বন করিয়া উঠিয়া ধীরে ধীরে সেই কক্ষ ত্যাগ করিলেন, এবং তুলসীমঞ্চের সম্মুখে আসিয়া শয়ন করিলেন, মস্তকটি তুলসীতলায় রাখিলেন।

ন্যায়রত্ন চক্ষু মুদিয়া মনশ্চক্ষে দেখিলেন, তাঁহার স্ত্রী কল্যাণী তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন ; কিন্তু কল্যাণী একা নহেন, আরও কেহ কেহ তাঁহার সঙ্গে আছেন। তাঁহাদের দেহ জ্যোতির্ম্ময়, সে জ্যোতিঃ স্বর্গীয়! ন্যায়রত্নের মুখ প্রফুল্ল হইল। সেই পবিত্র হৃদয়, সংযতমনা সাধু পুরুষের তখন অতীন্দ্রিয় দর্শন ও শ্রবণশক্তি বিকসিত হইয়াছিল।

ন্যায়রত্ন মুদিতনেত্রে অস্ফুটস্বরে তাঁহার পরলোকগতা পত্নীকে লক্ষ্য করিয়া কি বলিতে লাগিলেন ; যেন সেই সাধ্বীর প্রেতাত্মার নিকট হইতে তিনিও অনেক কথা শুনিতেছিলেন। তখন অনেক লোক তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিয়াছিল ; তাহাদের ধারণা হইল, মরণাহত ন্যায়রত্ন প্রলাপ বকিতেছেন। ন্যায়রত্নের কথাগুলি যে প্রলাপ ভিন্ন আর কিছু হইতে পারে,—এ সম্ভাবনা তাহাদের মনে স্থান পাইল না।

কিছুকাল পরে ন্যায়রত্ন চক্ষু মেলিয়া সম্মুখে চাহিলেন, তিনি সমাগত গ্রামবাসিগণকে লক্ষ্য করিয়া দক্ষিণ হস্ত ঈষৎ উত্তোলনপূর্ব্বক ক্ষীণস্বরে বলিলেন, "তোমরা সকলে একবার হরি বল।"

তাঁহার কণ্ঠস্বরে জড়তার লেশমাত্র ছিল না। তাঁহার আদেশে সকলে সমস্বরে বলিল, "হরি বোল, হরি বোল!"—হরিধ্বনিতে ন্যায়রত্নের গৃহপ্রাঙ্গণ পুনঃপুনঃ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল, ন্যায়রত্ন সেই সুরে সুর মিলাইয়া প্রেমোদ্বেলিত-স্বরে বলিলেন,—হরি বোল, হরি বোল, হরি বোল!"

হরিনাম উচ্চারণ করিতে করিতে তাঁহার উভয় নেত্র হইতে আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হইল ; কবিরাজ তাঁহার মুখের উপর মস্তক অবনত করিয়া আবেগভরে বলিলেন,—"হরে মুরারে মধুকৈটভারে!"

তারকব্রহ্ম নাম শ্রবণ করিতে করিতে ন্যায়রত্নের জীবাত্মা নশ্বরদেহ ত্যাগ করিয়া নিত্যধামে প্রস্থান করিল। সুমতি তাঁহার পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া বলিল, "বাবা গো বাবা! আমাকে ফেলে রেখে তুমি তোমার কোন্ বাড়ীতে চলে গেলে?"

বিংশ পরিচ্ছেদ।

(উপসংহার।)

ন্যায়রত্নের মৃতদেহ নদীতীরে বহন করিয়া লইয়া যাইবার জন্য বিজয়দত্ত ব্রাহ্মণের সন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু সেই পল্লীতে একঘর ব্রাহ্মণেরও বাস ছিল না; তাঁহাকে ব্রাহ্মণসংগ্রহে বিফলমনোরথ দেখিয়া কবিরাজ বলিলেন, তাঁহাদের গ্রামে কয়েক ঘর ব্রাহ্মণ আছেন, চেষ্টা করিলে এই বিপদে তাঁহাদের সহায়তা লাভ করা যাইতে পারে। বিজয় দত্ত তৎক্ষণাৎ কবিরাজের সঙ্গে কয়েকজন লোক পাঠাইলেন। কবিরাজের চেষ্টায় কয়েকজন ব্রাহ্মণ সংগৃহীত হইল। তিনি তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া এক প্রহরের মধ্যে ন্যায়রত্নের গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। ব্রাহ্মণেরা গঙ্গাতীরে ন্যায়রত্নের মৃতদেহ বহিয়া লইয়া চলিল; গ্রামের সমস্ত লোক খোল বাজাইয়া হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে তাঁহাদের অনুসরণ করিল। বিজয় দত্ত নগ্নপদে একবস্ত্রে সর্ব্বাগ্রে চলিলেন। যেন তিনি নদীজলে দেবমূর্ত্তি বিসর্জ্জন দিতে চলিয়াছেন!

মৃতদেহের সংকারের পর সুমতি তাহার পিতার দেহভস্ম ও একখণ্ড অস্থি মাথায় করিয়া গৃহে ফিরিল, এবং বিজয়দত্তের সহিত নৌকাযোগে হরিরামপুরে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক তাহাদের গৃহপ্রাঙ্গণে সেই চিতাভস্ম ও অস্থি সমাহিত করিল। তালুকদার যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করিয়া অতি অল্পদিনেই সেই স্থানে একটি সুন্দর মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন।

সুমতি এই সমাধিমন্দিরটী দেবমন্দির অপেক্ষাও পবিত্র মনে করিত। বিজয়দত্ত তাঁহার অঙ্গীকার বিস্মৃত হন নাই, তিনি সুমতিকে কন্যার ন্যায় পরম যত্নে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। সত্যবালার স্নেহে, আদরে তাহার হৃদয় বেদনার লাঘব হইল; স্নেহময়ী সখীর সাহচর্য্যে তাহার জীবনের দিনগুলি শান্তিতেই কাটিতে লাগিল, সত্যবালা সধবা হইয়াও যে পতিবিরহযন্ত্রণা সহ্য করিতেছে—এই দুঃখেই সুমতিকে মধ্যে মধ্যে কাতর করিয়া তুলিত।

সুমতি প্রত্যহ প্রভাতে উঠিয়া—তাহার পিতার সমাধিমন্দিরের অভ্যন্তর-ভাগ ও বহির্ভাগ সযত্নে ধৌত করিত, এবং তাহা মুছিয়া তালুকদারের বাগানের প্রস্ফুটিত কুসুমরাশি দ্বারা সুসজ্জিত করিত। মধ্যাহ্নে স্বহস্তে অন্ন ব্যঞ্জন

রাখিয়া ভোগের মত তাহা মন্দিরমধ্যে সাজাইয়া রাখিত, এবং ভক্ত যেমন ভক্তিভরে গৃহদেবতাকে ভোগ নিবেদন করে—সে সেইভাবেই তাহা তাহার পিতার উদ্দেশে নিবেদন করিত। সন্ধ্যার সময় সে সেই মন্দিরে দীপ জ্বালিয়া ধূপ দিত। ধূপের সৌরভে মন্দির পরিপূর্ণ হইত।

নবাব বাহাদুর ন্যায়রত্নকে একশত বিঘা জমি পুরস্কার দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন; ন্যায়রত্নের মৃত্যু সংবাদ পাইয়াও তিনি তাঁহার আদেশ প্রত্যাহার করেন নাই। তালুকদার বিজয়দত্তের যত্নে ও তত্ত্বাবধানে সেই জমি হইতে যথেষ্ট আয় হইত। সেই অর্থে প্রতিবৎসর বিজয়া দশমীর দিন দীনদুঃখী ও অন্ধ-আতুরগণকে মন্দিরপ্রাঙ্গণে সমবেত করিয়া অন্ন বস্ত্র দানে পরিতৃপ্ত করা হইত। সুমতি পিতার নামে তাহা স্বহস্তে বিতরণ করিত; এবং সে প্রত্যহ প্রত্যূষে ও শয়নকালে একখানি কুশাসনে এই মন্দিরমধ্যে উপবেশন করিয়া পবিত্র মনে গীতা পাঠ করিত; পাঠ সাঙ্গ হইলে, সে গীতাখানি বন্ধ করিয়া পিতার উদ্দেশে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া ভক্তিভরে বলিত,—

"পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥"

হায় মা বঙ্গভূমি! এমন পিতা, এমন কন্যা আর কি এ যুগে তোমার ক্রোড়ে দেখিতে পাইব?

সম্পূর্ণ।

সম্পাদকের নিবেদন।

অগ্রহায়ণ মাসের "সাহিত্য" প্রকাশিত হইল। এ সংখ্যাতেও ৺ সুরেশচন্দ্র সমাজপতির নাম সম্পাদক বলিয়া মুদ্রিত হইল, কারণ গত অগ্রহায়ণ মাসে তিনি জীবিত ছিলেন, এবং তাঁহারই চিহ্নিত প্রবন্ধ সকল হইতে বাছিয়া এবারকার সকল প্রবন্ধ মুদ্রিত হইল।

পৌষ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত চারি মাসের চারিটা সংখ্যা একসঙ্গে ছাপা হইবে। তাহার মুদ্রণকার্য্যও আরম্ভ হইয়াছে। সাহিত্যের জন্য স্বতন্ত্র টাইপ, স্বতন্ত্র কম্পোজিটার এবং ছাপাখানা হইতেছে। গোড়ার আয়োজন পূর্ণ করিতে একটু বিলম্ব ঘটিতেছে, অর্থব্যয়ও যথেষ্ট হইতেছে। ইহার মধ্যে প্রায় পাঁচ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে।

গোড়ার আয়োজন শেষ করিয়া তবে আমরা নবপর্য্যায়ের সাহিত্য নূতন-ভাবে বৈশাখ হইতে প্রকাশ করিতে থাকিব। বৈশাখ এবং জ্যৈষ্ঠের সংখ্যা বাহির হইতে একটু বিলম্ব ঘটিতে পারে। বড় বিষম দায়িত্ব ঘাড়ে করিয়া লইয়াছি। একখানি মাসিক পত্রের আয়ের উপর নির্ভর করিয়া ৺ সুরেশচন্দ্রের জননী (পুণ্যশ্লোক বিদ্যাসাগরের কন্যা) এবং তাঁহার বিধবা পত্নীর প্রতিপালন ভার গ্রহণ করিয়াছি। তাঁহাদিগকে মাসিক পঞ্চাশ টাকা দিতে হইবে। তাহার উপর গোড়ায় এই ব্যয়, ইহা ছাড়া পত্রপরিচালনের ব্যয়ও অনেক করিতে হইতেছে। আমাদের বল-বুদ্ধি-ভরসা বাঙ্গালার বিদ্বজ্জন-সমাজ, সাহিত্যের অনুরাগী কাব্যামোদী সকল; তাঁহারা কৃপা না করিলে, পর্য্যাপ্ত অনুকম্পা প্রকাশ না করিলে আমরা এ গুরুভার বহন করিতে সমর্থ হইব না। তাই কথাটা স্পষ্ট করিয়া বলিলাম।

নিবেদক,

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

সাহিত্য-সম্পাদক।

মুখবন্ধ।

এই পৌষমাস হইতে সাহিত্যের সম্পাদন-ভার আমার স্কন্ধেই ন্যস্ত হইল। শ্রীমান্ যতীন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় ইহার পরিচালক ও কর্ম্মকর্ত্তা হইলেন। উভয় পক্ষে কথাবার্ত্তা চালাইতে—ব্যবস্থা বন্দোবস্ত করিতে এই চারিমাস কাটিয়া গিয়াছে। নববর্ষের বৈশাখ আসিয়াছে; তাই পৌষ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত এই চারিমাসের চারিসংখ্যা দুই খণ্ডে বাহির করিয়া, নূতন পর্য্যায়ের "সাহিত্য" নূতন ভঙ্গীতে প্রকাশ করিব, এমন সঙ্কল্প করিয়াছি। নববর্ষের বৈশাখের সংখ্যা বাহির করিতে একটু বিলম্ব ঘটিবে। "সাহিত্যের" মুদ্রণ জন্য সকল ব্যবস্থা স্বতন্ত্র-ভাবে হইতেছে, সে পক্ষে অধিকারিগণকে একসঙ্গে প্রায় চারি-পাঁচহাজার টাকা গোড়ায় ব্যয় করিতে হইতেছে। ইহার উপর আর একটা বড় দায়িত্ব ঘাড়ে করিয়া লইতে হইয়াছে। সুরেশচন্দ্রের বিধবা পত্নী এবং শোকজীর্ণা জননীর সেবার ভার আমরা গ্রহণ করিলাম। সাহিত্যে লাভ হউক আর নাই হউক, প্রতিমাসে তাঁহাদের সেবার জন্য আমাদিগকে পঞ্চাশ টাকা বৃত্তি যোগাইতে হইবে। বিদ্যাসাগর করুণার সাগর ছিলেন, তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যার রক্ষাভার গ্রহণ করা শ্লাঘার কথা। সুরেশচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বড় আদরের দৌহিত্র ছিলেন। তাঁহার বিধবা পত্নীর সেবার ভারও আমাদিগকে লইতে হইয়াছে। এ দায়িত্ব আমাদের পক্ষে সুখের এবং অনেকটা স্পর্দ্ধার দায়িত্ব। এটুকু আমরা বেশ বুঝি ও জানি যে, বাঙ্গালী বিদ্বজ্জনসমাজ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে ভুলিতে পারেন নাই, ভুলিবেনও না। এটুকুও বেশ বুঝি, সুরেশচন্দ্রের "সাহিত্য" ত্রিশ বৎসরকাল বাঙ্গালার কাব্যামোদীদিগকে উল্লাসিত করিয়া রাখিয়া ছিল; উহার প্রকাশের নানাবিধ ত্রুটি বিচ্যুতি সত্ত্বেও "সাহিত্য" বিদ্বজ্জনসমাজে সমাদরই লাভ করিয়াছে।

এইটুকু বুঝি ও জানি বলিয়াই এতটা দায়িত্ব ঘাড়ে করিয়া, এতটা অর্থব্যয় করিয়া আমরা "সাহিত্য" প্রকাশে সাহসী হইয়াছি। সাহিত্যের যেমন প্রচার বৃদ্ধি হইবে, লাভ হইবে, তেমনই সুরেশচন্দ্রের মাতা ও পত্নীর সকল অভাব দূর করিতে পারিব। তাঁহাদেরই সেবার জন্য আমরা "সাহিত্যে"র ভিক্ষার ঝুলি

কাঁধে করিলাম। দুস্থ সাহিত্যসেবীর স্বজন-পরিজন প্রতিপালন উদ্দেশ্যে এই প্রথম ভিখারীর ঝুলি স্কন্ধে করিলাম। মনে দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, এই ব্রতে সহায়তা করিতে বাঙ্গালার বিদ্বজ্জনসমাজ তিলমাত্র কৃপণতা করিবেন না। বাঙ্গালার ধনী-নির্দ্ধন সকলেই সাহিত্যের গ্রাহক হইয়া, সাহিত্যে প্রবন্ধ-নিবন্ধ পাঠাইয়া দিয়া আমাদিগকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিবেন। আমাদের বল-বুদ্ধি-ভরসা সকলই বাঙ্গালার বিদ্বজ্জন সমাজ।

সুরেশচন্দ্র গত ত্রিশবৎসরে সাহিত্যের যে একটা স্বতন্ত্র ধারার সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সে ধারা ও ভাব বজায় রাখিবার জন্য আমরা বিশেষ চেষ্টা করিব। তবে কথাটা গোড়ায় খুলিয়া বলা ভাল যে, সাহিত্য শিক্ষিত হিন্দুসমাজের মুখপত্ররূপে পরিচালিত হইবে। সাহিত্যের পুরাতন লেখকগণ যাহাতে নিয়মিত সন্দর্ভ-নিবন্ধ পাঠাইতে থাকেন, তাহার ব্যবস্থা করিব। কেবল সম্পাদক-পরিবর্ত্তন হেতু উহার মাসিক সাহিত্য-সমালোচনের ভঙ্গী একটু পরিবর্ত্তিত হইবে। সহযোগী সাহিত্য পূর্ব্বে আমি যে পদ্ধতি অবলম্বনে লিখিতাম, তাহারই উন্নতি-সাধনে সচেষ্ট হইব। যাহাতে সাহিত্য উচ্চাঙ্গের—উচ্চ কোটির মাসিক পত্র এবং সমালোচন বলিয়া সমাজে গ্রাহ্য হয়, সে পক্ষে আমার ক্ষুদ্র শক্তি প্রয়োগে ত্রুটি করিব না। চৈত্র পর্য্যন্ত সুরেশচন্দ্রের নির্দ্দেশ ও চিহ্ন অনুসরণ করিয়া পুরাতন প্রবন্ধ নিবন্ধ দিয়া চারিসংখ্যা পূর্ণ করিতেছি। এবার সম্পাদকের পক্ষ হইতে সামান্য কিছু বলিয়া, যতদূর সম্ভবপর পুরাতন ধারা বজায় রাখিয়া বাকী-বকেয়া পূর্ণ করিয়া দিতেছি। আমাদের ব্যক্তিগত সাধ-খেয়াল, ধারণা-বিশ্বাস যাহা কিছু আছে, তাহার বিকাশ আগামী বৈশাখের সংখ্যা হইতেই সূচিত হইবে। আশা আছে, বঙ্গের লেখকসমাজ, সাহিত্যের পুরাতন লেখকগণ আমাদিগকে নানারূপে সাহায্য করিয়া বাধিত করিবেন, ইহাই একমাত্র ভিক্ষা।

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

৺ সুরেশ চন্দ্র সমাজপতি।

সুরেশচন্দ্রের অকাল-মৃত্যুতে বাঙ্গলার সাময়িক সাহিত্য-ক্ষেত্রের খানিকটা স্থান যে খালি হইয়াছে, এ কথা বোধ হয় অনেকেই স্বীকার করিবেন। সে স্থানটা কতখানি উঁচু, তাহা অবশ্য বিবেচনা করিবার সময় এখনও হয় নাই। অভাবটা এত তীব্রভাবে অনুভূত হইতেছে, যে এখনও তাহা সঠিক পরিমাণ করা কঠিন। সুরেশচন্দ্র সাহিত্যপত্রের সম্পাদক এবং সাহিত্যের মাসিক সাহিত্যসমালোচনার লেখকরূপে সাহিত্যক্ষেত্রে পরিচিত। আমরা তাঁহার কর্ম্মজীবনের এই দিক্‌টা সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা যাহা জানি, তাহা নিবেদন করিব।

সুরেশচন্দ্র স্বনামধন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দৌহিত্র এবং তাঁহার দ্বারা প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন স্বর্গারোহণ করেন, তখন সুরেশচন্দ্রের বয়স ২১ বৎসর, অর্থাৎ তিনি সাবালক হইয়াছেন, এবং সাহিত্যপত্রও চালাইতেছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় সুরেশচন্দ্রকে কিরূপ শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহা জানিবার জন্য স্বভাবতঃই একটা কৌতূহল হয়। যাঁহারা সুরেশচন্দ্রের কৈশোরের সহচর ছিলেন, তাঁহারাই অবশ্য এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিবার অধিকারী। কিন্তু এ সম্বন্ধে একটি প্রমাণ আমার হাতে আসিয়াছে, এখানে তাহার পরিচয় দিব। প্রমাণটি এই—

"কল্কিপুরাণ। (বেদ, পুরাণ, ইতিহাস, দর্শনাদি নানাশাস্ত্রসঙ্কলিত টীকা-সমেত।) মূল সংস্কৃত হইতে শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি কর্ত্তৃক অনুবাদিত। কলিকাতা। ১২৯৩।"

এই গ্রন্থের "অনুবাদকের বিজ্ঞাপন" এই প্রকার—

"কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের কল্কিপুরাণের যে হস্তলিপি আছে, প্রধানতঃ তদবলম্বনে এই অনুবাদ সম্পন্ন হইয়াছে। যদি এই অনুবাদ পাঠ করিয়া কাহারও চিত্তে কিঞ্চিন্মাত্রও প্রীতির সঞ্চার হয়, তাহা হইলে শ্রম সফল বোধ করিব।

"পরিশেষে কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি যে, লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত, মদীয় শিক্ষাগুরু শ্রীযুক্ত রামসর্ব্বস্ব বিদ্যাভূষণ, ও বেদবিৎ পণ্ডিত ব্রহ্মব্রত সামা-

ধ্যায়ী মহাশয় এই অনুবাদে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন, এবং শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় অনুকম্পাপুরঃসর এই পুস্তকের সম্পাদকতার ভার গ্রহণ করিয়া আমাকে নিরতিশয় অনুগৃহীত করিয়াছেন। সম্মানভাজন সুরভি ও পতাকা-সম্পাদক মহাশয়ের সমীপেও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি। তাঁহার উৎসাহ ব্যতিরেকে এই অনুবাদ প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনা ছিল না। ইতি—

কলিকাতা, কার্ত্তিক, ১২৯৩। } শ্রীসুরেশচন্দ্র শর্ম্মা।

এই "কল্কিপুরাণ" যখন প্রকাশিত হয়, তখন সুরেশচন্দ্রের বয়স ১৭ বৎসর। "কল্কিপুরাণের" এই অনুবাদ পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়, বিদ্যাসাগর মহাশয় সুরেশচন্দ্রকে কি রীতিতে লেখাপড়া শিখাইতেছিলেন। এই রীতি তখনকার বা এখনকার প্রচলিত শিক্ষারীতি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। প্রচলিত রীতি অনুসারে শিক্ষার্থীকে ব্যাকরণ এবং অভিধান অভ্যাস করিয়া ক্রমশঃ বিভিন্ন শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় সুরেশচন্দ্রকে সংস্কৃত বিদ্যার বিভিন্ন শাখায় প্রবিষ্ট করাইবার জন্য ব্যাকরণ এবং কাব্য পড়াইয়াই তাঁহার হাতে একটি কাজ দিয়াছিলেন; হস্তলিপি দেখিয়া একখানি উপপুরাণ অনুবাদ করিতে এবং নানা শাস্ত্র হইতে তাহার টীকা সঙ্কলিত করিতে দিয়াছিলেন। কেবল অধ্যয়ন অপেক্ষা এই প্রকারে নিজের হাতে অনুবাদ এবং টীকা টিপ্পনী সংগ্রহ করা যে শিক্ষার হিসাবে অধিকতর কার্য্যকরী, একথা সহজেই বুঝা যায়। হাতের লেখা সংস্কৃত পুস্তকের বঙ্গানুবাদ পরিশ্রমের কাজ; এই পরিশ্রমের ফলে, শিক্ষার্থীর যত লাভ হইতে পারে, অধ্যাপকের কাছে বইখানিকে খুব ভাল করিয়া পাঠ করিলে তত লাভ হওয়া সম্ভব নহে। সুরেশচন্দ্রের এই "কল্কিপুরাণে" যে টীকা আছে, তাহা বড়ই মূল্যবান্। কি রীতিতে এই টীকা সঙ্কলিত হইয়াছে, তাহার একটী উদাহরণ দিতেছি। চতুঃষষ্টিকলার উল্লেখের পর লিখিত হইয়াছে—

"পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ চতুঃষষ্টিকলার যে বিবরণ লিখিয়াছেন এবং শুক্রনীতি পুস্তকে যেরূপ ব্যাখ্যা ও বিবরণ পরিলক্ষিত হয়, তদনুসারে এই বিবরণ সঙ্কলিত হইয়াছে। শুক্রনীতির চতুর্থ অধ্যায়ের তৃতীয় প্রকরণে, মধুসূদনসরস্বতী-কৃত মহিম্নস্তোত্রের হরিহর টীকায় ও বাৎসায়নীয় কামসূত্রের টীকাতে চতুঃষষ্টিকলার বিবরণ সন্নিবদ্ধ আছে।" (২৫ পৃঃ)

অধ্যাপক মহাশয়ই অবশ্য সুরেশচন্দ্রকে এই সকল প্রমাণের সন্ধান বলিয়া দিয়াছিলেন। কোন একটা বিষয়ে এইভাবে নিঃশেষে প্রমাণ সংগ্রহ করা অভ্যাস করান খুব হিতকর। কল্কিপুরাণের এই টীকা পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, নানা শাস্ত্রের সহিত পরিচিত করাইবার জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় সুরেশচন্দ্রের হাতে এই কাজটি দিয়াছিলেন। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, এই শিক্ষায় কি ফল হইয়াছিল? এই রীতিতে পুরাণ অনুশীলন করিলে যে প্রধান লাভ হওয়া উচিত ছিল, তাহাও হয় নাই, অর্থাৎ সুরেশচন্দ্র যে পুরাণে পারদর্শী ছিলেন, এমন কোন পরিচয় ত দিয়া যায়েন নাই। একখানিমাত্র উপপুরাণ আদ্যোপান্ত অনুশীলন করিলে পুরাণে পারদর্শিতা লাভ করা সম্ভব নহে। কিন্তু যে রীতিতে সুরেশচন্দ্র কল্কিপুরাণের অনুশীলন করিয়াছিলেন, মহাপুরাণ সম্বন্ধে যদি এই রীতি কিছুকাল অনুসরণ করিতেন, অর্থাৎ বিষ্ণু পুরাণ বা বায়ু পুরাণের মত একখানি মহাপুরাণ যদি অনুবাদ করিয়া ফেলিতে পারিতেন এবং তাহার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর টীকা সংগ্রহ করিতে পারিতেন, তবে অবশ্যই পুরাণে পারদর্শী হইতে পারিতেন। সুরেশচন্দ্র পুরাণে পারদর্শী হউন আর নাই হউন, কল্কিপুরাণের অনুবাদ এবং টীকা সংগ্রহ করিতে গিয়া যে তিনি অন্য প্রকারে বিশেষ লাভবান্ হইয়াছিলেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তাঁহার বাঙ্গালা ভাষার উপর অসাধারণ অধিকার এই কল্কি পুরাণের অনুবাদজনিত পরিশ্রমের একটি ফল এবং এই সম্পর্কে নানা শাস্ত্রের অনুসন্ধানের এবং আলোচনার ফলে তাঁহার বুদ্ধি বিশেষ তীক্ষ্ণতা লাভের অবকাশ পাইয়াছিল। শিক্ষার্থীর পক্ষে গোড়ায় শাস্ত্রবিশেষের অনুশীলন বিশেষজ্ঞ হইবার জন্য নহে, ভাষাজ্ঞানকে মার্জ্জিত এবং বুদ্ধিবৃত্তিকে পরিস্ফুট করিবার জন্য। শিক্ষার্থীর পক্ষে আলোচ্য শাস্ত্রবিশেষ শিক্ষার নিমিত্ত বা উপায় মাত্র। এ দেশের পরীক্ষাজীবিশিক্ষকেরা এই কথা ভুলিয়া গিয়া মহা বিভ্রাট ঘটাইয়াছেন; বিভিন্ন শাস্ত্রের এবারতের দ্বারা যথাসাধ্য যথাসম্ভব ছাত্রদের মাথা বোঝাই করিয়া দিতে গিয়া বুদ্ধিবৃত্তিকে ফুটিবার অবসর দেনই নাই, পক্ষান্তরে মস্তিষ্কে অজীর্ণ এবং হাঁপানি রোগের সৃষ্টি করিয়াছেন। মানুষ গড়ার হিসাবে আমাদের উচ্চশিক্ষা বিফল হইয়াছে। তাই বলিয়া যে দশ বিশজন মানুষের মত মানুষ এদেশে এ আমলে বনিয়া উঠে নাই এমন নহে। কিন্তু সেরূপ মানুষ তৈয়ার হইয়াছে কতকটা স্বভাবের গুণে, কতকটা বিদ্যালয় ছাড়া ও শিক্ষার আর যে সব সুযোগ আছে, তাহা আশ্রয় করার ফলে। আমাদের বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্য

অনেকটা ইংরেজী শিক্ষার ফল হইলেও ইহা দেশের শিক্ষার যথেষ্ট সহায়তা করিতেছে, দেশের লোকের চোখ, কাণ, মন ফুটাইয়া তুলিতেছে। কিন্তু দেশের নায়কতা এবং শিক্ষকতা করিতে যত লোকের দরকার, তত লোকের যোগাড় রাখিতে হইলে শিক্ষার মুখটাকে মানুষ গড়ার দিকে ঘুরাইয়া দিতে হইবে। বিদ্যাসাগর মহাশয় সুরেশচন্দ্রকে যে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহা এইরূপ শিক্ষা। ১৭ বৎসর বয়সে সুরেশচন্দ্র কল্কিপুরাণ প্রকাশিত করিয়াছিলেন। আরও পাঁচ সাত বৎসর ক্রমান্বয়ে এই প্রকার শিক্ষা চলিলে তিনি একটা বড় পণ্ডিত হইতে পারিতেন। যতটুকু শিক্ষা তাঁহার হইয়াছিল, তাহা যে সার্থক হইয়াছিল, সুরেশচন্দ্রের বাঙ্গালা রচনায় তাহা বেশ প্রকাশ পাইয়াছে।

বাঙ্গলা সাহিত্যের আসরে সুরেশচন্দ্র প্রধানতঃ "সাহিত্য" পত্রের সম্পাদকরূপে পরিচিত ছিলেন। সুরেশচন্দ্রের বয়স যখন মাত্র ২০ বৎসর, তখন তিনি "সাহিত্য" সম্পাদন আরম্ভ করিয়াছিলেন। প্রথম বৎসরেই এই লেখকের সহিত সাহিত্যের পরিচয় হয়। প্রথম বৎসরের "সাহিত্য ও কল্পদ্রুমে" শ্রীযুত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের লিখিত রৈবতক কাব্যের সমালোচনা পড়িয়াছিলাম, ইহা বেশ মনে আছে। তার পর কিছুদিন সাহিত্যের গ্রাহকও ছিলাম। সেই আমলের সাহিত্যে প্রকাশিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রভাবতীর উপাখ্যান, কবিবর নবীনচন্দ্রের ভারত ভ্রমণ বিশেষ আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়াছিলাম। প্রায় ২১ বৎসর পূর্ব্বে "পাঠান সাম্রাজ্যে প্রজা" নামক এই লেখকের প্রথম বাঙ্গালারচনা ভারতীপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। সাহিত্যের মাসিক সাহিত্য-সমালোচনায় সুরেশচন্দ্র এই লেখাটির সমাদর করিয়া নবীন লেখককে বিশেষ উৎসাহিত করিয়াছিলেন। তার পর শ্রীযুত নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের দ্বারা এই লেখকের খোজখবরও তিনি করিয়াছিলেন। কিন্তু সুরেশচন্দ্রের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ হইয়াছিল, ১৯১০ সালে ভাগলপুরের সাহিত্যসম্মিলনে। ভাগলপুর হইতে রাজসাহিতে ফিরিয়া আসিয়া আমরা 'বরেন্দ্র অনুসন্ধানসমিতি' স্থাপন করিয়া কার্য্য আরম্ভ করি। সুরেশচন্দ্র বসুমতীতে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমাদের গুণকীর্ত্তন আরম্ভ করেন। এই সূত্রে সাহিত্যের সহিত 'বরেন্দ্র অনুসন্ধানসমিতি'র সাহচর্য্যের এবং সুরেশচন্দ্রের সহিত এই লেখকের বন্ধুতা আরম্ভ হয়। তার পর সাত বৎসর কাল আমরা এক প্রকার একত্রেই কাজ করিয়াছি। এই কয়

ঢাক বাজাইয়াছেন। বাঙ্গালাদেশে 'বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি'র খ্যাতি কতক পরিমাণে এই দুইজন বন্ধুর লেখার ফল। সুরেশচন্দ্র সর্ব্বদাই আমাদের হইয়া লড়িয়াছেন, সুযোগ পাইলেই আমাদের গুণকীর্ত্তন করিয়াছেন। তৎকালে এই লেখক 'বরেন্দ্র অনুসন্ধানসমিতি'র সম্পাদক ছিল। সুরেশচন্দ্র 'বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতি'র কিরূপ হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন, তাহা বুঝিবার বেশ সুযোগ ছিল। ১৯১৬ সালে বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মিলনের যশোহরের অধিবেশন উপলক্ষে এই লেখকের সহিত সুরেশচন্দ্রের মতভেদের সূত্রপাত হয়। স্বাধীন আলোচনার ব্যবস্থা না থাকিলে এই লেখক সম্মিলনে যোগদান করিতে সম্মত ছিলেন না। সুরেশ-চন্দ্রের মত ছিল অন্যরূপ। তিনি বলিতেন, "উপস্থিত হইয়া স্বাধীন আলোচনায় অধিকার চাওয়া উচিত, সরিয়া থাকা কর্ত্তব্য নয়।" ইহার পর সাহিত্যপরিষদে অন্তর্দ্রোহ উপস্থিত হয়। সুরেশচন্দ্র রামেন্দ্রসুন্দরের এবং হীরেন্দ্রনাথের মতা-বলম্বী হয়েন। এই লেখক অপর পক্ষের প্রতি একখানি ঘোষণাপত্রে যে অবি-চার হইয়াছিল, তাহা দেখাইতে গিয়া সুরেশচন্দ্রের বিশেষ বিরক্তিভাজন হয়েন। এখন সব শেষ হইয়াছে। এখন এই লেখকের মনে পড়িতেছে সুরেশচন্দ্র কিরূপ আন্তরিকতার সহিত 'বরেন্দ্র অনুসন্ধানসমিতি'র সমর্থন করিতেন। সুরেশচন্দ্র সর্ব্বদাই মফস্বলবাসী সাহিত্যসেবকগণের বিশেষ সহায়তা করিতেন। কলি-কাতার একখানি মাসিক পত্র যখন ঢাকার "প্রতিভা" এবং "ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন" পত্রকে আক্রমণ করেন, তখন সুরেশচন্দ্র তাহাদের সমর্থন করিয়াছিলেন; অথচ শেষোক্ত পত্রখানি তাঁহাকে পরে আর এক ব্যাপার উপলক্ষে কতই না গালিগালাজ করিয়াছিল। সাহিত্য ক্ষেত্রে এইরূপ বন্ধু সুদুর্লভ।

শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ।

৺ রামকৃষ্ণ পরমহংস

ও

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি।

গতবারে যখন পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি গৌহাটিতে আগমন করিয়াছিলেন, তখন একদা কথাপ্রসঙ্গে ৺ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব সম্বন্ধে আলোচনা হয়। তাঁহার সহিত যে পরমহংস দেবের সাক্ষাৎভাবে আলাপ-পরিচয় ছিল, এ কথা অনেক গ্রন্থেই পাঠ করিয়াছিলাম; তাই কৌতূহলী হইয়াই ঐ আলোচনায় প্রবৃত্ত হই—বিশেষতঃ পরমহংস তাঁহার 'চাপরাশ' আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন এবং তিনিও যখন ৺রামকৃষ্ণ গলনালীর পীড়ায় কষ্ট পাইতেছিলেন—তখন পীড়াযুক্ত স্থানে মন একাগ্র করিলেই পীড়া সারিয়া যাইবে, একথা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, এই দুই বিষয় বিস্তারিত জানিতে চাহিয়াছিলাম। তিনি ঐ সময়ে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা পরমহংস দেবের ভক্তগণের লিখিত বিবরণ হইতে বিশেষভাবে বিভিন্ন; এবং তাঁহার সম্বন্ধে চূড়ামণি মহাশয় সামান্যতঃ যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাও পরমহংসের ভক্তগণের প্রচারিত গ্রন্থাদিপাঠে তৎসম্বন্ধে যেরূপ অবগত হওয়া যায়—তাহা হইতে অনেক পৃথক্ রকমের বোধ হইয়াছিল।

৺ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে আমি আন্তরিক শ্রদ্ধা করি—এবং একজন উচ্চদরের সাধু মহাত্মা বলিয়াই তাঁহাকে মনে করিয়া থাকি। তাঁহার ভক্তগণের রচিত জীবন-চরিত ইত্যাদি ছাড়াও অপরের লিখিত পরমহংস-দেবসম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধাদি পাঠ করিয়া আমি তাঁহার প্রতি ভক্তির ভাব পোষণ করি—এমন কি হিন্দুর সাধনশাস্ত্রে ও দেবদেবীতে যাঁদের বিশ্বাস আদৌ ছিল না, এমন অনেক লোককে আমি পরমহংসদেবের উক্তি ও জীবনচরিত পাঠ করিতে বলিয়াছি, কেহ কেহ তদ্দ্বারা ফলও পাইয়াছেন। এ অবস্থায় তাঁহাকে খর্ব্ব করিবার জন্য বর্ত্তমান আলোচনায় প্রবৃত্ত হই নাই—বরং তিনি প্রকৃত যাহা ছিলেন, তাহা সাধারণ্যে প্রচারিত হউক—এই অভিপ্রায়ই এই প্রবর্ত্তনার কারণ।

পণ্ডিত মহাশয়ের কথাগুলি যথাযথ লিখিয়া রাখিতে পারি নাই—তাই সেদিন তাঁহাকে অনুরোধ করিয়া লিখিয়াছিলাম যে, আমার নিকট তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা যেন অনুগ্রহপূর্ব্বক লিপিবদ্ধ করিয়া প্রেরণ করেন। তদুত্তরে তর্কচূড়ামণি মহাশয় যে পত্রখানি লিখিয়াছেন, তাহা সাধারণের অবগত্যর্থে প্রকাশিত করা গেল।

পরন্তু আগে পূর্ব্বপক্ষ সম্যক্ না বলিলে উত্তরপক্ষ ঠিক্ বোঝা যাইবে না। তাই রামকৃষ্ণ দেবের ও পণ্ডিত তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের মধ্যে 'চাপরাশ' ও মনঃসংযোগ দ্বারা রোগশান্তিবিষয়ে যে কথাবার্ত্তা হয় তাহা, ডাক্তার রামচন্দ্র দত্ত যেরূপ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, সেইরূপই এ স্থলে উদ্ধৃত করা হইতেছে;

"চাপরাশ" সম্বন্ধে কথা।

"একদা এই রঙ্গমন্দিরের সম্মুখস্থিত ভক্তিভাজন ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে রামকৃষ্ণদেবের আগমন হইয়াছিল। এই স্থানে পণ্ডিত-প্রবর শশধর তর্কচূড়ামণির নাম শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত তিনি গমন করেন। আমরা সকলেই পশ্চাদ্গমন করিয়াছিলাম। আমাদের সহিত নরেন্দ্রও ছিলেন। চূড়ামণি মহাশয়ের নিকটে উপস্থিত হইয়া রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছিলেন যে, "হ্যাঁগা তুমি যে ধর্ম্ম প্রচার করিতেছ, তোমার চাপরাশ আছে?" চূড়ামণি মহাশয় কোন উত্তর প্রদান করিতে পারিলেন না এবং আমরা সকলে হাঁ করিয়া রহিলাম। ঠাকুর পুনরায় কহিলেন, "দেখ যখন রাস্তায় অনেক লোক গোলমাল করে, তখন পাহারাওয়ালা আসিবামাত্র সকলে সরিয়া পড়ে। লোকের হিসাবে পাহারাওয়ালা স্বতন্ত্র কোন প্রকার জীব নহে। তবে লোকে কেন সরিয়া যায়? কেন তাহাকে ভয় করে? কেন তাহার কথা শুনে? পাহারাওয়ালা সামান্য লোক, তাহার বেতন ৩৲ টাকা, তাহাকে কেহ ভয় করে না। কিন্তু তাহার যে চাপরাশ আছে, তাহা দেখিয়া লোকে ভীত হইয়া থাকে, যেহেতু চাপরাশ মহাশক্তির পরিচায়ক। সেইরূপ ভগবানের আদেশ এবং ইচ্ছা না হইলে তাঁহার শক্তি কাহার ভিতর না প্রবিষ্ট হইলে, যে যত পণ্ডিত হউক, যে যত বহুদর্শী হউক, যে যত শাস্ত্রজ্ঞ হউক, যে যত সুবক্তা হউক, কেহ কখন লোকের মন হরণ করিতে পারে না।" ইত্যাদি * রামচন্দ্র দত্তের বক্তৃতাবলী—৪৮৪ পৃষ্ঠা।

* এ বিষয়টি শ্রীম—কথিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ১ম ভাগ একাদশ খণ্ডে (দ্বিতীয়

মানসিক একাগ্রতা দ্বারা রোগপ্রশমনের কথা।

"শশধর তর্কচূড়ামণি পরমহংসদেবকে কতবার অনুরোধ করিয়াছিলেন যে, সমাধির সময় ক্ষতস্থানে কিঞ্চিৎ লক্ষ্য করিলে তৎক্ষণাৎ উহা আরোগ্য হইয়া যাইবে। পরহংসদেব সে কথা অগ্রাহ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, "সমাধি করিয়া রোগ আরোগ্য করিতে হইবে? এ অতি রহস্যের কথা।" * পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ১৪৫ পৃষ্ঠা।

এখন শ্রীযুত তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের পত্রখানি অবিকল উদ্ধৃত করিতেছি।

৺ সদাশিবঃ শরণং।

বহরমপুর

২৭।৯।২৫ †

পরম স্নেহাস্পদেষু—সানুনয় সমাবেদনমিদং—

মহাত্মন্! ‡ অনেকদিন হয় আপনার পত্রখানি পাইয়াছি, উত্তরে অনেক কথা লিখিতে হইবে, তাদৃশ অবকাশের প্রতীক্ষায় এতদিন বিলম্ব হইয়াছে।

অধ্যায়ে বিশেষতঃ) বর্ণিত আছে; তাহাতে একটু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়—শ্রীম—মহাশয় বেশ একটু মোলায়েম করিয়াই লিখিয়াছেন। কিন্তু দুই জন "সাক্ষাৎ দ্রষ্টা"র বর্ণনায় এইরূপ পার্থক্য হওয়াটা একটু আশ্চর্য্যজনক নহে কি?

* এ কথাটাও গ্রন্থান্তরে আর এক রকমে আছে—ঠাকুরের তখন অসুখ—কাশীপুরের বাগানে—বাড়াবাড়ি। শ্রীযুত শশধর তর্কচূড়ামণি, সঙ্গে কয়েকজন, অসুখের কথা শুনিয়া দেখিতে আসিলেন। পণ্ডিতজী কথায় কথায় ঠাকুরকে বলিলেন, "মহাশয় শাস্ত্রে পড়েছি, আপনাদের ন্যায় পুরুষ ইচ্ছামাত্রেই শারীরিক রোগ আরাম করিয়া ফেলিতে পারেন। আরাম হোক্ মনে ক'রে মন একাগ্র ক'রে একবার অসুস্থ স্থানে কিছুক্ষণ রাখিলেই সব সেরে যায়। আপনার একবার ঐরূপ করিলে হয় না?"

ঠাকুর বলিলেন—"তুমি পণ্ডিত হ'য়ে এ কথা কি করে বল্লে গো? যে মন সচ্চিদানন্দে দিয়েছি, তাকে সেখান থেকে তুলে এ ভাঙ্গা হাড়মাংসের খাঁচাটার উপর দিতে কি আর প্রবৃত্তি হয়?" পণ্ডিতজী নিরুত্তর হইলেন। ইত্যাদি স্বামী সারদানন্দপ্রণীত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ—গুরুভাব—পূর্ব্বার্দ্ধ ৭৪ পৃষ্ঠা।

† অর্থাৎ ২৫শে পৌষ ১৩২৭। পূর্ব্বে সনের অঙ্ক লেখাটাই সনাতনরীতি; পাশ্চাত্যের সঙ্গে এখানেও আমাদের প্রভেদ। (লেখক)

‡ তর্কচূড়ামণি মহাশয় পণ্ডিত—এবং "বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি। শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥"—তাই এই ক্ষুদ্রকেও এতাদৃশ সম্বোধন করিয়াছেন।

রামকৃষ্ণ মহাশয়ের (পরমহংসের) সম্বন্ধে আমি যতটা বিদিত আছি, তৎসমস্তই সংক্ষেপে জানাইতেছি। এতদ্দ্বারাই আপনার জিজ্ঞাসিত সকল বিষয়ের উত্তর হইবে।

রামকৃষ্ণ 'পরমহংস' উপাধি কাহার নিকট পাইয়াছিলেন, তাহা আমি জানি না। খুব সম্ভব ইহা সাধারণ লোকের নিকটই পাইয়াছিলেন। আজকাল সাধারণ লোকেরাই ঋষি, মহর্ষি, অমুকানন্দ, অমুক স্বামী, অমুক পরমহংস ইত্যাদি উপাধি দিয়া থাকে। ইহার দৃষ্টান্ত কলিকাতা অঞ্চলে যথেষ্ট আছে। রামকৃষ্ণের পরমহংস নামও বোধ হয় সেই ভাবেই হইয়াছিল। আর যদি তাঁহার গুরুই ঐ উপাধি দিয়া থাকেন, তবে তাহাও ভ্রান্তিমূলকই বুঝিতে হইবে, কারণ শাস্ত্রমতে যেরূপ অবস্থা হইলে পরমহংস বলা যায়, সে লক্ষণ তাঁহাতে আমি দেখিতে পায় * নাই। এ কারণে তাঁহার প্রতি ঐ উপাধিটি ব্যবহার করিতে আমি সাহস পায় না, তবে তাঁহাকে আমি মহাশয় লোক বলিয়া বুঝিয়াছিলাম, এই জন্য আমি তাহাই বলিয়া থাকি। আর আশ্রমের ভাবে ধরিলে তাঁহাকে কোনও সংজ্ঞাই অকুণ্ঠিতভাবে দেওয়া যায় না। তাঁহার পরমহংসের লক্ষণ যেমন ছিল না, তেমন তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তি ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম-ত্রয়েরও শাস্ত্রতঃ লক্ষণ দৃষ্ট হয় নাই—দণ্ডীও ছিলেন না, তবে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের ব্যবস্থামতে তাঁহাকে 'অবধূত আশ্রমী' বলিলে নিতান্ত অসঙ্গত হয় না। অতএব আমার বিবেচনায় তাঁহাকে 'রামকৃষ্ণ অবধূত' বলাই উচিত।

রামকৃষ্ণের সহিত আমার অনেকদিনই দেখা সাক্ষাৎ হইয়াছে। প্রথম তিনিই আমার কলিকাতার বাসায় গিয়াছিলেন। তৎপরে আমিও তাঁহার নিকট গিয়াছিলাম, শেষে তিনিও মধ্যে মধ্যে আসিতেন, আমিও মধ্যে মধ্যে তাঁহার নিকট যাইতাম। "ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিতে তোমার কোন চাপরাশ আছে কি না" আমাকে এতটুকু জিজ্ঞাসা করার অধিকার আমি তাঁহাকে দেয় নাই। সুতরাং ঐ ভাবে আমাকে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন না এবং তিনি করেনও নাই। তিনি যে লেখাপড়া কিছু জানিতেন না এবং শাস্ত্রও পড়েন নাই, এ বিষয়ে তিনি বেশ ধারণা রাখিতেন এবং আমি যে তখন ২৫।৩০ বৎসর পর্য্যন্ত যথাশক্তি শাস্ত্রের অনুশীলন করিয়াছি, তাহাও তিনি জানিতেন। আমাকে তিনি নিতান্ত অপাত্র বা তাঁহার অনুচরগণের একতম বলিয়াও মনে করিতেন না ; কাযেই আমাকে ঐরূপ প্রশ্ন করা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর নহে।

* [illegible]

আমি কোন ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষা বা উপদেশ লওয়ার নিমিত্ত তাঁহার নিকট যায় নাই; কারণ তিনি কোন প্রকার শাস্ত্রই জানিতেন না। সুতরাং আধ্যাত্মবিষয়, ঈশ্বরতত্ত্ববিষয় বা ব্রহ্মতত্ত্ববিষয় বা তৎপ্রাপ্তিসাধনাদি বিষয়ে কোন কিছুই তাঁহার বিদিত ছিল না। তাঁহার যাহা বিদিত ছিল, তাহা সাধারণ জ্ঞানের বিষয়। শাস্ত্রবিষয়ে যাহারা একেবারেই অজ্ঞ, তাহাদের পক্ষেই তাহা উপযোগী হইতে পারে ও হইত; 'রামকৃষ্ণকথামৃত' দেখিলেই তাহা বুঝিতে পারিবেন। তবে তিনি শাস্ত্রাদি না জানিলেও কেবল গুরুর উপদেশ অনুসারে নিজের অনুষ্ঠান করিয়া অনেকটা উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন এবং সাংসারিক বন্ধনও কতকটা কাটাইয়া উঠিয়াছিলেন; ইহা আমি বিশ্বাস করি এবং ভক্তি-রাজ্যেও তিনি অনেকটা অগ্রসর হইয়াছিলেন, ইহা আমি স্বীকার করি; কিন্তু সে অনুষ্ঠান বা ততটুকু ভক্তিশিক্ষা অনেকের আবশ্যক বা উপযোগী হইলেও সকলের নহে।

তাঁহার ভক্তিমাখা গান শুনিতে বড় ভাল লাগিত, ভক্তির ভাব দেখিতেও আনন্দ হইত। তদ্ব্যতীত তিনি কতটা উন্নত হইতে পারিয়াছিলেন, তাহা বুঝিবার জন্য বিশেষ কুতূহল ছিল। আর তিনি অকপট সাধুপ্রকৃতির লোক বলিয়া ধারণা ছিল।

এই সকল কারণে তাঁহার নিকট মধ্যে মধ্যে যাইতাম। আর তিনি সাধারণ লোকের নিকট হাঁসিতে হাঁসিতে যে সকল টোট্‌কা কথা বলিতেন, তাহাও বেশ মিষ্ট লাগিত। কিন্তু আমার নিকট তিনি কি কারণে সময় সময় আসিতেন। তাহা ঠিক বলিতে পারি না। তবে শাস্ত্রের ২।৪টি কথা জিজ্ঞাসা করিতেন, ইহা স্মরণ আছে। আর আমাকে তিনি বিশেষ একটু মমতার দৃষ্টিতে দেখিতেন এরূপ আমার মনে হইত। আমি ধর্ম্মব্যাখ্যাকার্য্যে ব্রতী ছিলাম, তাহাতেও তিনি বিশেষ আনন্দ ও উৎসাহ প্রকাশ করিতেন, মমতার কারণ বোধ হয় তাহাই হইবে। তিনি আমার কিছু বয়োজ্যেষ্ঠও ছিলেন।

তাঁহার উন্নতি কি পরিমাণ হইয়াছিল, তাহা স্থির করিয়া বলা সুকঠিন, তবে বাহিরে তাঁহার যে সকল লক্ষণ দেখা গিয়াছে, তাহাতে তিনি যে একজন সাধুপ্রকৃতির লোক এবং অধ্যাত্মরাজ্যেও এই স্থূলদেহের সম্বন্ধ কাটাইয়া আন্তররাজ্যের মনোময় কোষ অর্থাৎ প্রথম ভূমিকায় আরোহণ করিতে পারিতেন, ইহা বেশ বুঝিয়াছিলাম। অহঙ্কার, ক্রোধ, ঈর্ষা, হিংসা প্রভৃতি কু-প্রবৃত্তিগুলিও তিনি অনেকটা দমন করিতে পারিয়াছিলেন, ইহা বুঝিয়া-

ছিলাম। তিনি সকলকেই প্রায় সস্নেহে হাস্যমুখে কথা বলিতেন। ভোগ্যবস্তু বিষয়েও তাঁহার আসক্তি অনেকটা কমিয়াছিল, ইহা আমার ধারণা। পূর্ব্বেই বলিয়াছি—তিনি একশ্রেণীর অবধূত, সে অবস্থায় প্রসাদ মৎস্য মাংসাদি ভোজন তাঁহার পক্ষে অসম্ভব নহে; কিন্তু খাইতেন কি না তাহা আমার স্মরণ নাই।

তবে রীতিমত তৈলাভ্যঙ্গপূর্ব্বক স্নান এবং বারম্বার পান খাওয়া দেখিয়াছি। স্ত্রীলোকদিগকে তিনি মাতৃবৎ ব্যবহার করিতেন। তিনি দক্ষিণেশ্বর কালী-বাড়ীতেই থাকিতেন, সেখানে মাএর নানাবিধ উত্তম উত্তম ভোজ হইয়া থাকে, সেই প্রসাদ খাইতেন। তৎপর তাঁহার গুণগরিমা সাধারণে প্রকাশিত হইলে, অন্যলোকেও উৎকৃষ্ট দ্রব্য লইয়া তাঁহাকে দিত, বাড়ী আনিয়াও অনেকে খাওয়াইত। সুতরাং আহার তাঁহার উৎকৃষ্ট যতই হইত, বাসস্থানও উৎকৃষ্টই ছিল। অতএব তাঁহার টাকাকড়ির কোন প্রয়োজনও ছিল না, তাহা নিতেনও না। এ কারণে তাঁহাকে একটি উন্নত পুরুষ অবশ্যই বলিতে হইবে। স্বয়ং গান করিতে করিতে কিম্বা অন্যের গান অথবা ঈশ্বরবিষয়ক প্রসঙ্গ শুনিলে কিছু কালের মত তাঁহার একপ্রকার সমাধির মত অবস্থা হইত, তখন বাহ্যজ্ঞান থাকিত না, কিয়ৎকাল পর আবার জাগ্রত হইয়া উঠিতেন। এই সমাধির ভাব তাঁহার মনোরাজ্যে থাকিয়াই হইত, তাহার উপরে নহে। কারণ তিনি ঈশ্বরের রূপগুণেই মগ্ন থাকিতেন, তাহার উপরে নহে। রূপানুভূতি মনো-রাজ্যেই হইয়া থাকে, ইহা অধ্যাত্মবিদ্যার স্থিরীকৃত সিদ্ধান্ত। তাহার পর যে, অধ্যাত্মরাজ্যের অসংখ্যপ্রকার স্তর আছে, সমাধিরও অসংখ্য অবস্থা আছে; আর সর্ব্বোপরি যে নিত্যশুদ্ধ-বুদ্ধ মুক্তস্বভাব বস্তু আছে,—যেখানে গিয়া নির্বীজ বা নির্বিকল্প সমাধি হইতে পারে, সে সকল বিবরণ তিনি জানিতেনও না, সে সকল সমাধি হওয়ার সম্ভাবনাও তাঁহার ছিল না। সে সকল তত্ত্ব যাহাতে আছে, সেই অধ্যাত্মশাস্ত্র বা ব্রহ্মবিদ্যার গ্রন্থ তাঁহার একেবারেই অবিদিত ছিল। তিনি লেখাপড়া আদৌ জানিতেন না। সে সকল তত্ত্ব এত দুরূহ যে, রীতিমত দর্শন এবং উপনিষদ অধ্যয়ন ব্যতীত কেবল গুরু উপদেশে তাহার ধারণা বা জ্ঞান বা তাহাতে কোন অনুষ্ঠান কদাপি হইতে পারে না। কাজেই তিনি স্থূলদেহ ছাড়িয়া উঠিতে পারিলেও মনোময় কোষ অতিক্রম করিতে পারেন নাই, ইহা বুঝিয়াছিলাম।

তাঁহার যে সমাধির ভাব হইতে দেখিয়াছি, তাহা সমাধির নিয়মানুসারে হয় নাই; গানাদি শ্রবণমাত্রে অমনি তৎক্ষণাৎ হইয়া গিয়াছে। আবার

কিছুকাল পর হঠাৎই তাহা ভঙ্গ হইত। এতদ্দ্বারা এই সমাধিকে ঠিক অনুষ্ঠানের ফলও বলা যায় না। ইহা মস্তিষ্কের অবস্থাবিশেষের ফল হওয়াই অধিকতর সম্ভব। যাহাদের মস্তিষ্কের অংশবিশেষ অধিক দুর্ব্বল থাকে, তাহাদের কোন কোন বিষয়ের সামান্য ঘটনাও মস্তিষ্কে গুরুতররূপে জানাতেই, তখন অবস্থাবিশেষে কাহারও কাহারও বাহ্য সংজ্ঞার লোপ হইয়াও থাকে। গানাদি শ্রবণেও ইহা দেখা গিয়াছে। হাওড়ার নিকট শিবপুরে এক ব্রাহ্মণের একটি ছেলে দেখিয়াছিলাম, তাহার ৫।৬ বৎসর বয়স হইতেই খোল করতালসহ কীর্ত্তনাদি গান হইলে, অনেকক্ষণ বাহ্য সংজ্ঞার অভাব হইত, ২০।২৫ পল বা অর্দ্ধ দণ্ড পর আবার সে প্রকৃতিস্থ হইত, পরে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে ক্রমে তাহা কমিতে লাগিল। ১৬ বৎসরের পর একেবারেই সারিয়া গেল। তখন সে অতি কুপাত্র হইয়াছিল। ৫ বৎসরের সময় ইহার অবস্থা দেখিয়া নব্য অবতারের আবিষ্কারকগণ ইহাকে গৌরাঙ্গের অবতার বলিতে আরম্ভ করিয়াছিল; অজ্ঞের মহিমা অপার! আমার একজন শিষ্য দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়েরও এরূপ অবস্থা হইত, এখন তাহা সারিয়া গিয়াছে।

এইরূপ দৃষ্টান্ত আরও আছে। রামকৃষ্ণ মহাশয়ের মস্তিষ্কের অবস্থাও অত্যন্ত অনুভবশীল ছিল। কোন কুলোক বা সুলোকে তাঁহাকে স্পর্শ করিলে, কিম্বা কোন পানভোজন করিতে দিলে, তদ্দ্বারা তাহাদের শক্তি যেটুকু সংক্রান্ত হইত, তাহাও তাঁহার অনুভবে আসিত। স্বর্ণাদি ধাতব বস্তু স্পর্শেও তিনি বিশেষত্ব অনুভব করিতেন। তাঁহার প্রকৃতি অত্যন্ত কোমল থাকার অন্যান্য প্রমাণও যথেষ্ট আছে। সেই কারণেই গান করা বা শুনাকালে তাঁহার ঐরূপ বাহ্য সংজ্ঞা বিলোপ হওয়ার অধিকতর সম্ভাবনা। অজ্ঞান অবস্থায় যে তিনি হঠাৎ দাঁড়াইয়া উঠিতেন, সেই বিক্ষেপ ইহারই ফল বলিয়া মনে হয়। সমাধিশাস্ত্রে এরূপ হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যায় না।

যদি এই সিদ্ধান্ত সত্য হয়, তবে ঐরূপ অবস্থায় যে তাঁহার মনোময় কোষে সমাধির কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা অমূলক। তবে তিনি বিজনে বসিয়া কতদূর কি করিতে পারিতেন, তাহা তিনিই জানেন। কিন্তু দেহের সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া তিনি ইচ্ছা করিলেই মনোময় কোষে যাইতে পারিতেন, ইহা বিশ্বাস করিতে পারা যায় নাই। তিনি দেহত্যাগ করার পূর্ব্বে মাস ৫।৬ পর্য্যন্ত গলরোগের দরুণ যন্ত্রণায় অত্যন্ত কাতর হইয়াছিলেন। ইচ্ছাপূর্ব্বক মনোময় কোষে উঠিতে পারিলে, তাঁহাকে এ যন্ত্রণা মোটেই ভোগ করিতে হইত না।

এই সময় আমার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ছিল, তখন এই যন্ত্রণানিবৃত্তির জন্য এই জাতীয় একটা অনুষ্ঠান করার পরামর্শ দিয়াছিলাম। তাহাতে তিনি বলিলেন যে, "আমি একাগ্রতার চেষ্টা করিলে ইষ্ট দেবতার দিকেই লক্ষ্য বাড়ে; সুতরাং আমি ইহা করিতে পারিব না।" তাহা হইলেও তিনি যোগশক্তিবলে মনোময় কোষাদিতে উঠিতে পারুন আর নাই পারুন, একটি সাধুপ্রকৃতি-সম্পন্ন মহাশয় লোক ছিলেন, এরূপ সিদ্ধান্তের কোনও বাধা নাই। কিন্তু দেহাবসানের কিছু দিন পূর্ব্বে তিনি কিছু নামিয়া পড়িয়াছিলেন, ইহা বেশ অনুভব করিতে পারিয়াছিলাম।

আমি এইটুকু বুঝিতে পারিয়া একদিন তাঁহাকে বলিয়াছিলাম যে, আমি আত্মীয়ভাবে আপনাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি, তাহা আপনার প্রীতিকর হইবে কিনা ভাবিতেছি। তখন তিনি বলিলেন, আপনি অবশ্যই তাহা বলিবেন। আমি বলিলাম, আপনার সহিত আমার পরিচয় হইলে, প্রথমভাগে আপনার অবস্থা যেরূপ বুঝিতে পারিয়াছিলাম, এখন যেন তাহার একটু নিম্নদিকে পরিবর্ত্তন মনে হইতেছে; ইহা সত্য কিনা তাহাই জানিতে বাসনা, নিজের অবস্থা আপনি নিশ্চয় বুঝিতে পারিবেন। তখন তিনি একটু বিষাদের সহিত বলিলেন, আপনি তো ঠিক্ ধরিয়াছেন। আপনি ইহা কেমন করিয়া বুঝিলেন, আমি তো সর্ব্বদাই আমার অবস্থান্তর অনুভব করিতেছি। ইহার কারণ আপনার কি মনে হয় বলুন দেখি? আমি বলিলাম, অন্য কারণ কিছু থাকিলে, আমার অবিদিত; আপনি কুসংসর্গের আবর্ত্তে পতিত হইয়া আছেন, ইহাই আমি প্রধান কারণ মনে করি। তিনি বলিলেন, ইহা তো আপনি ঠিক্ বুঝিয়াছেন, আমি ইহা বেশ অনুভব করি এবং এ সংসর্গ ত্যাগেরও চেষ্টা সর্ব্বদাই করি। * * * † উহারা যে আমারে ছাড়ে না। এখন আমি উহাদের খপ্পরের মধ্যে পড়িয়াছি। এখন এ বন্ধন কাটানের আর কোন উপায় নাই। কাজেই এবার এই ভাবেই যাইবে। ইহার কিছুদিন পরেই তাঁহার গলরোগ, তৎপরে দেহাবসান হয়।

তাঁহার যোগজ কোনও বিভূতি আমি দেখি নাই; তবে বক্ষাদিতে হস্তামর্ষণের দ্বারা কাহারও কাহারও বেদনাদি অল্পকালের জন্য তিরোহিত হইতে

† বোধ হয় কোনও কোনও ব্যক্তির নাম হইবে। চূড়ামণি মহাশয় তাহাদের উল্লেখ করা সমীচীন মনে করেন নাই।

দেখিয়াছি। ইহা যৌগিক শক্তির কার্য্য নহে, নৈয়াসিক শক্তির কার্য্য ; ইহা বৃহদারণ্যকে বর্ণিত আছে।

ইঁহার উপদেশের দ্বারায় কলিকাতা অঞ্চলের অনেক লোক উপকৃত হইয়াছিল। যাহারা পুরাতন পথেই অবস্থিত, তাহাদের পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তি এবং ধর্ম্মকর্ম্মের আস্থা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এমন কি যাঁহারা সনাতন পথভ্রষ্ট, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া স্বস্থানে আসিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন। তখন শুনিয়াছিলাম ৺ কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় ও ৺ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতির নবাবিষ্কৃত মতের পরিবর্ত্তন ইঁহার দ্বারাই সম্পন্ন হইয়াছিল, এ উপকার হিন্দুসমাজের চিরস্মরণীয়। রামকৃষ্ণ মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই মাত্র যথাজ্ঞান আপনাকে বিদিত করিলাম। আপনি ইচ্ছা করিলে, ইহা যে কোনরূপে প্রকাশ করিতে পারেন। এই পত্রের প্রাপ্তসংবাদ সহ আপনার কুশলবার্ত্তার অভিলাষ করি। অত্র মঙ্গল ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষিণঃ শ্রীশশধর শর্ম্মণঃ।

পণ্ডিতপ্রবর তর্কচূড়ামণি মহাশয় ৺রামকৃষ্ণ দেবকে "পরমহংস" লক্ষণাক্রান্ত না দেখিয়া তাঁহাকে 'অবধূত' বলিয়াছেন ; 'অবধূত' যে 'পরমহংস' অপেক্ষা কম কিছু, তাহা মনে করা অনুচিত—"অবধূতঃ শিবঃ সাক্ষাৎ অবধূতঃ সদাশিবঃ"—ইহা অপেক্ষা উচ্চতর অবস্থা কি হইতে পারে ?

এ স্থলে ইহাও বক্তব্য যে, কোন্নগরনিবাসী প্রসিদ্ধ পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় ৺ দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন মহাশয় ৺ রামকৃষ্ণ দেবকে দেখিয়া সন্ন্যাসীর লক্ষণ না পাইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"আপনি কি আমার নমস্য ?" (৺ রামচন্দ্র দত্ত-কৃত পরমহংসদেবের জীবন বৃত্তান্ত—) ৬২পৃষ্ঠা। *

তারপর ৺ রামকৃষ্ণের ভাবাবেশসম্বন্ধেও তর্কচূড়ামণি মহাশয় যাহা বলিয়াছেন, তাহা সঙ্গতই বোধ হইতেছে ; কেন না তিনি সাধনভজনে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বেই এইরূপ মধ্যে মধ্যে অচেতন হইতেন—৺ রামচন্দ্র দত্ত-কৃত জীবনবৃত্তান্তে আছে, "ঠাকুর-দেবতার প্রতি রামকৃষ্ণের ভক্তি ছিল এবং স্বহস্তে

* কিন্তু এইরূপ সন্দেহ করাতে ৺ রামচন্দ্র দত্ত মহাশয় উক্ত পণ্ডিতপ্রবরকে তীব্র আক্রমণ করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন—ওরূপ ভাব ঠিক্ নহে। মনে রাখা উচিত, কেহই 'অন্তর্য্যামী' নহে—বাহ্য আকার আচরণ দেখিয়াই লোকে অপরকে বিচার করিবে—বিশেষতঃ শাস্ত্রদর্শীরা শাস্ত্রের কষ্টিপাথরেই লোককে কষিয়া দেখিয়া তদ্বিষয়ে ধারণা করিবেন—ইহাই স্বাভাবিক।

মৃত্তিকার ঠাকুর গড়িয়া পূজা করিতেন ও সময়ে সময়ে তিনি তদ্ভাবে অচেতন হইয়া পড়িতেন।" (৪ পৃষ্ঠা)

অতএব এইরূপ ভাবাবেশ যোগজাত সমাধি নহে বলিয়াই বোধ হয় *—ইহার অধিক বলিতে আমার অধিকার নাই—তবে ধর্ম্মসাধনে অভিজ্ঞ পণ্ডিতবর্য্য তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের কথা যে প্রণিধানযোগ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই।

শেষাবস্থায় পরমহংসদেবের 'কু-সংসর্গ' সম্বন্ধে তর্কচূড়ামণি মহাশয় যাহা বলিয়াছেন, তদ্বিষয়েও কিঞ্চিৎ ইঙ্গিত আমরা ৺ রামচন্দ্র দত্ত-কৃত জীবনবৃত্তান্তে পাইতেছি,—"তিনি বার বার বলিয়াছেন যে, তোমাদের সকলের পাপভার গ্রহণ করিয়া আমি অসুস্থতা ভোগ করিতেছি।" (১৫৪ পৃষ্ঠা +

মোটের উপর চূড়ামণি মহাশয় ৺ রামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে অনুকূল ভাবই পোষণ করিতেছেন,—তবে তাঁহার ভক্তগণ যে সকল শক্তিমত্তা তাঁহার উপর আরোপ করেন—সেগুলি চূড়ামণি মহাশয় অনেকটাই স্বীকার করেন না। তিনি একজন প্রত্যক্ষদর্শী। অথচ শ্রদ্ধাসহকারেই ৺ রামকৃষ্ণ দেবের নিকটে যাই-তেন। তাঁহার কথাগুলি, সুতরাং সমাদরযোগ্য। বিশেষতঃ শাস্ত্র ও দেব-দেবীতে যখন বিশ্বাস হারাইয়া হিন্দুসমাজ বিধ্বস্তপ্রায় হইতে বসিয়াছিল—তখন যেমন ৺ রামকৃষ্ণ পরমহংসের আদর্শে ও উপদেশে সমাজের উপকার হইয়াছিল—পণ্ডিত শশধরের ধর্ম্মবক্তৃতার দ্বারা তাদৃশ—এমন কি তদপেক্ষা অধিক উপকার হইয়াছিল। তাঁহার জনৈক শিষ্য কর্ত্তৃক প্রচারিত ও তৎকর্ত্তৃক পৃষ্ঠপোষিত "বেদব্যাস" পত্রে "সাধুদর্শন" শীর্ষক কতিপয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল—তাহাতে ত্রৈলিঙ্গ স্বামী প্রভৃতির সঙ্গে ৺ রামকৃষ্ণেরও প্রসঙ্গ লিখিত হইয়াছিল। ইহা হইতেই অনুমিত হইবে যে, তর্কচূড়ামণি মহাশয় সর্ব্বদাই ৺ রামকৃষ্ণদেবকে আদরের চক্ষেই নিরীক্ষণ করিয়া আসিতেছেন।‡

---

* ব্রাহ্মপ্রচারক ৺শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় ইহাকে "পীড়া" বলিয়াছেন—তদীয় আত্মচরিতে আছে "তদ্ভিন্ন তাঁহার (অর্থাৎ পরমহংসের) একটি পীড়ার সঞ্চার হইয়াছিল, তাঁহার ভাবাবেশ হইলেই তিনি সংজ্ঞাহীন হইয়া থাকিতেন।" (২০৮ পৃষ্ঠা) ইহাকে 'পীড়া' বলা অনুচিত—এবং ইহার "সঞ্চার" হওয়ার কথাটাও ঠিক্ নয়—৺রামকৃষ্ণের বাল্যাবধিই যখন এরূপ ভাব দেখা যাইতেছে।

+ কৌতূহলী পাঠক "জীবন বৃত্তান্তে"র এই প্রসঙ্গটি সমগ্র পড়িয়া দেখিবেন।

‡ এ স্থলে অপর একজন অতিবিশিষ্ট পণ্ডিত মহোদয়ের কথার উল্লেখ না করিয়া পারিতেছি না। পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে যখন দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে যাই, তৎসময়ে পূর্ব্বদিন আমার

৺ রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে আমার যেটুকু ভক্তি বিশ্বাস পূর্ব্বেই তাহা বলিয়াছি—অবশ্য তাঁহার ন্যায় সাধু মহাত্মার সম্বন্ধে কথা বলার আমি নিতান্তই অনধিকারী। তথাপি স্বীয় ধারণা অনুযায়ী কয়েকটি কথা এস্থলে বলা প্রয়োজন মনে করিতেছি।

শ্রীশ্রীভগবতীর ইচ্ছায় জগতের সমস্তই হইতেছে—এই যে রামকৃষ্ণ দেবের বঙ্গদেশের রাজধানীর সন্নিকটে আবির্ভাব, তাহাও তাঁহার একটা বিধান। সনাতন ধর্ম্মের যখন সঙ্কটাপন্ন অবস্থা—সাকার উপাসনার—তথা ধর্ম্মসাধনের সনাতন রীতির প্রতি যখন ইংরেজীশিক্ষিত লোকের অনাস্থা হইতেছিল, তখন অনেকগুলি বিষয় মহামায়ার অঘটনঘটনাপটীসী কৃপায় সংঘটিত হইয়াছিল—৺ রামকৃষ্ণদেবের অভ্যুদয়ও তাহার মধ্যে একটি। তাঁহার উক্তি ইত্যাদি শ্রদ্ধা সহকারে পাঠ করিয়া আমার প্রতীতি এই জন্মিয়াছে যে, তিনি সাধনভজনাদি শাস্ত্রানুসারে করিয়া যেরূপ ধর্ম্মোপদেশ দিয়াছেন—তাহা শাস্ত্রের বিধিরই অনুযায়ী— এই সনাতন ধর্ম্মের পোষক। তাঁহার কথায় ও আদর্শে অনেকের স্বধর্ম্মে আস্থা হইয়াছে—ইহাতে সনাতনধর্ম্মের উপকার হইয়াছে। চূড়ামণি মহাশয়ও একথা বলিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার ভক্তগণ মধ্যে অনেকে সনাতন রীতি নীতির বিরুদ্ধে নানা উপদেশ প্রচার করিয়াছেন—এবং ৺ রামকৃষ্ণকে অবতার বলিয়া খ্যাপিত করিয়াছেন। এতদ্দ্বারা তাঁহারা, আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায়, ৺ রামকৃষ্ণের মাহাত্ম্য খর্ব্ব করিয়াছেন। যাঁহারা তাঁহাকে 'অবতার' সাজাইয়াছেন—তাঁহারা অপর সাধু মহাত্মগণের জীবনচরিত আলোচনা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিতেন যে, 'অবতার' না হইয়াও তাঁহাদের বর্ণনানুরূপ

জনৈক পূজ্যপাদ অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় ৺———মহোদয়ের সহিত ৺রামকৃষ্ণ পরমহংস সম্বন্ধে আলাপ হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন, "বাপু হে, লোকটি বেশ চতুর ছিলেন, কিন্তু তুমি যে বল, তিনি ভগবতীর দর্শন পাইয়াছিলেন, এ সব বাজে কথা—এমন যে পূর্ণানন্দ পরমহংস—তিনিও সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন কি না সন্দেহ, কেনন। তাঁহার গ্রন্থে "এটাও হইতে পারে, ওটাও হইতে পারে," এরূপ সন্দেহ আছে, যাঁর ভগবতীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার হইয়াছে, তাঁর সন্দেহ থাকিবে কেন?" উত্তরে বলিয়াছিলাম—"মহাশয় যে দেবতাকে এমন ব্যাকুলভাবে ডাকিলে বা ঈদৃশ কঠোর তপস্যা করিলেও দর্শন করা যায় না, এমন দেবতা আমি মানি না—পূর্ণানন্দের যে স্থলে সন্দেহ বলিতেছেন, তাহা যদি এমন হয় যে, এটা ওটা উভয়টাতেই ঈপ্সিত বিষয় সমানভাবেই সিদ্ধ হইতে পারে, তাহ'লে?" পণ্ডিত মহাশয় এই অজ্ঞকে হঠাৎ প্রাজ্ঞের ন্যায় কথা বলিতে দেখিয়া বোধ হয় "মৌনমত্র হি শোভনম্" মনে করিয়া আর তর্ক বাড়ান নাই।

(যাহাতে বহু কথা অতিরঞ্জিত আছে) মনুষ্য ভারতবর্ষে অনেকই ছিলেন। ৺ ত্রৈলিঙ্গস্বামী ৺ ভাস্করানন্দ স্বামী, বারদীর ব্রহ্মচারী বামাক্ষেপা, ৺ রামদাস কাঠিয়া বাবা প্রভৃতি বহু মহাত্মা ভারতের নানাস্থানে, অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন হইয়া শিষ্য ও ভক্তগণকে চরিতার্থ করিয়া গিয়াছেন।

৺ রামকৃষ্ণের যাঁহারা মন্ত্রশিষ্য—তাঁহাদের গুরুদেবকে ভগবান্ মনে করা খুবই সঙ্গত—কিন্তু 'অবতার' বলিয়া প্রচার করাতে এই অনিষ্ট হইয়াছে যে, ৺ রামকৃষ্ণের দেখাদেখি বঙ্গদেশময় বহু 'অবতারের' আবির্ভাব হইয়াছে—এবং ৺ রামকৃষ্ণ এই সকল উদ্ভটশ্রেণীর লোকের পর্য্যায়ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। অবতারবাদীরা শ্রীচৈতন্যের অনুকরণে রামকৃষ্ণের 'লীলা' প্রচার করিতেছেন—ইহাতে শ্রীচৈতন্যেরও কিঞ্চিৎ লাঘব হইতেছে। * তারপর ৺ বিবেকানন্দ 'হাঁড়ি-ধর্ম্ম' 'ছুৎমার্গ' ইত্যাদি বলিয়া যাহা প্রচার করিয়াছেন, জানিনা, আজ ৺ রামকৃষ্ণদেব জীবিত থাকিলে তিনি শুনিয়া কি বলিতেন? লোকে যা'তা' খাউক, যার তার পাত চাটুক—এরূপ উপদেশ তাঁহার উক্তি বা আচরণে কোথাও পাইয়াছি বলিয়া তো মনে হয় না। ৺ রামচন্দ্র দত্ত-রচিত "জীবনবৃত্তান্তে" আছে—"তিনি তদনন্তর ভক্তদিগের সহিত একত্রে ভোজন করিয়া অশেষ প্রীতিলাভ করিতেন, কিন্তু এরূপ স্থানে তিনি বর্ণানুরূপ ব্যবস্থা করিতে কহিতেন।" (১৩২ পৃষ্ঠা) ফলতঃ সাধু মহাত্মারা শাস্ত্রদৃষ্ট সনাতন রীতিনীতির বিরুদ্ধে চলিবার জন্য উপদেশ দিবেন—বা তদনুরূপ আচরণ করিবেন, ইহা কদাপি সম্ভাবিত নহে। † বরং অবস্থাভেদে সাধারণের আচার আচরণ হইতে উদাসীন অবধূত কোনও সাধু বিভিন্ন আচারানুষ্ঠান করিলেও তাহা গর্হিত হইত না—তথাপি ৺ রামকৃষ্ণ পরমহংস ওরূপ কিছু করিয়াছেন বলিয়া তো দেখা যায় না। বরং

* চৈতন্যভাগবতাদি পড়িয়া জনৈক ব্যক্তির ধারণা হইয়াছিল, মহাপ্রভু একজন অবতারই হইবেন—তাই জন্মাষ্টমীর ন্যায় ফাল্গুনী পূর্ণিমাতেও উপবাস করিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন। কিন্তু রামকৃষ্ণের এ সকল জীবনচরিত পড়িয়া তাঁহার মনে হইল—যাহা ইদানীং ঘটিতেছে—৪০০ বৎসর পূর্ব্বে সম্ভবতঃ তাহাই হইয়াছিল—অর্থাৎ ভক্তেরা অত্যুক্তিপূর্ণ কাহিনী রচিয়া গিয়াছেন। তাই তিনি এখন আর ঐ তিথিতে উপবাস করেন না।

† শ্রীচৈতন্যচরিত গ্রন্থাবলীতেও এমন দেখা যায় না যে, তিনি 'সবলোট' হইবার জন্য উপদেশ দিয়াছেন। পুরীতে মহাপ্রসাদে স্পর্শদোষ নাই—তথাপি সেখানেও চৈতন্যদেব ব্রাহ্মণের বাড়ী ভিন্ন ভিক্ষাগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া দেখা যায় নাই। অথচ তিনি সন্ন্যাসী, সুতরাং বর্ণভেদের অতীত ছিলেন।

তিনি বলিতেন, "আমি যদি দাঁড়িয়ে মুতি—ওরা দৌড়িয়ে মুতিবে!" তাই নিজের আচরণের প্রতি যথেষ্ট সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়াই চলিতেন।

সতাতন রীতিনীতির বিরুদ্ধে ৺ বিবেকানন্দ যে সকল কথা বলিয়াছেন—এবং তিনি যে ভাবে জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন, তদ্বিষয় ইতোধিক কিছু বলা এস্থলে অনুচিত মনে করিতেছি—ইচ্ছা আছে প্রবন্ধান্তরে এতদ্বিষয় আলোচনা করিব।

শ্রীপদ্মনাথ দেবশর্ম্মা।

দেনা-পরিশোধ।

মহাজন মরণের আমি কিছু ধারি—
সমস্ত সম্পত্তি মোর নিবে বলে' ভারি
নালিশ করিল মৃত্যু, আইনের মতে
বিচারে নিষ্পত্তি তরে সত্য-আদালতে।
সামান্ত আসল দেনা—সুদে বিল্‌কুল্
বেড়ে গেছে এত অর্থ—অনর্থের মূল।
দয়াময় সর্ব্বদর্শী বিভু বিচারক
সুবিচার করিলেন দেখি অপারক—
"যাও যত প্রয়োজন আমি দিব অর্থ।"
মরণের ষড়যন্ত্র সব হ'ল ব্যর্থ!
মরণ ছাড়িয়া দিল, শুনি হেন বাণী—
ঋণমুক্ত হইলাম সুবিচার মানি'।
সেই দিনে পরিশোধ হ'ল মোর দেনা—
অক্ষয় সম্পত্তি শেষে হ'ল মোর কেনা!

শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ফলিত-জ্যোতিষ।

(জাতক)

ফলিত জ্যোতিষকে আধুনিক বিজ্ঞানের মধ্যে গণ্য করা যায় কি না, এই বিষয় লইয়া ইতিপূর্ব্বে বহু আলোচনা হইয়া গিয়াছে ; সুতরাং এ সম্বন্ধে নূতন কিছুই বলিবার নাই। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, আধুনিক বিজ্ঞান বলিতে যদি এরূপ—বুঝায়, উহা সম্পূর্ণ, উহার শেষ পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইলে ফলিত-জ্যোতিষ বিজ্ঞান নহে,—উহার আরম্ভ হইয়াছিল মাত্র। কিন্তু ইহার মধ্যে যে একেবারেই সত্য নাই, এমন কথাও বলা চলে না। ফলিত-জ্যোতিষের ফল প্রত্যক্ষ ; আমরা দেখিতেছি—গ্রহগণসম্ভূত ফলাফলের সহিত মানবজীবনের অনেক শুভাশুভ ঘটনার ঐক্য হইতেছে। যদি এরূপ আপত্তি হয় যে, কোন কোনও গণনার সহিত ত ফলাফলের অনৈক্য হইতেও দেখা যায়। সে ক্ষেত্রে বক্তব্য এই যে, আয়ুর্ব্বেদ একটা শাস্ত্র, কিন্তু তদ্দ্বারা সকলেই কি সকল রোগের উপশম করিতে পারেন ? শাস্ত্রব্যাখ্যা বা শাস্ত্রব্যবসায়ীর দোষ থাকিতে পারে ; কিন্তু আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র নহে এমন কথা বলা চলে না। ফলিত-জ্যোতিষের দ্বারা, কিছু না হ'ক, যদি শতকরা পঁচিশটা গণনা শুভাশুভ ঘটনার সহিত ঐক্য হইতে দেখা যায়, তাহা হইলে ইহার মধ্যে যে কিছু সত্য আছে, এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে।

ফলিত-জ্যোতিষকে প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। (১) উৎপাত, অর্থাৎ দেশ সমাজ বা জাতিবিশেষে যে ফল ঘটে, তাহার গণনা ; (২) মুহূর্ত্ত বিচার, অর্থাৎ যাত্রা, ব্রতপার্ব্বণ, সংস্কার প্রভৃতি সম্বন্ধে দিননির্ণয় ; (৩) জাতক বিচার, অর্থাৎ নরভাগ্যগণনা। এই জাতকবিচার যে কোন্ সময় সূচিত হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। তবে দেখা যায়, মেষ-বৃষাদি রাশি জাতকবিচারের মূল ভিত্তি। সুতরাং যে সময় মেষবৃষাদি রাশি কল্পিত হয় নাই, সে সময় আধুনিক জাতকবিচারও যে ছিল না, এক প্রকার বলা যাইতে পারে। ঋগ্বেদে হিন্দুজ্যোতিষের বীজ বপন, বেদাঙ্গ-জ্যোতিষে তাহার উদ্ভেদ, সংহিতায় তাহার ক্ষুপরূপ, সিদ্ধান্তে তাহার পূর্ণ বিকাশ এবং করণে তাহার বার্দ্ধক্য ঘটিয়াছিল। ঋগ্বেদে বা বেদাঙ্গ-জ্যোতিষে রাশিচক্রের উল্লেখ

নাই। সুতরাং বেদাঙ্গ জ্যোতিষের পূর্ব্বে যে রাশিচক্র কল্পিত হয় নাই, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। বেদাঙ্গ-জ্যোতিষে কথিত আছে,—

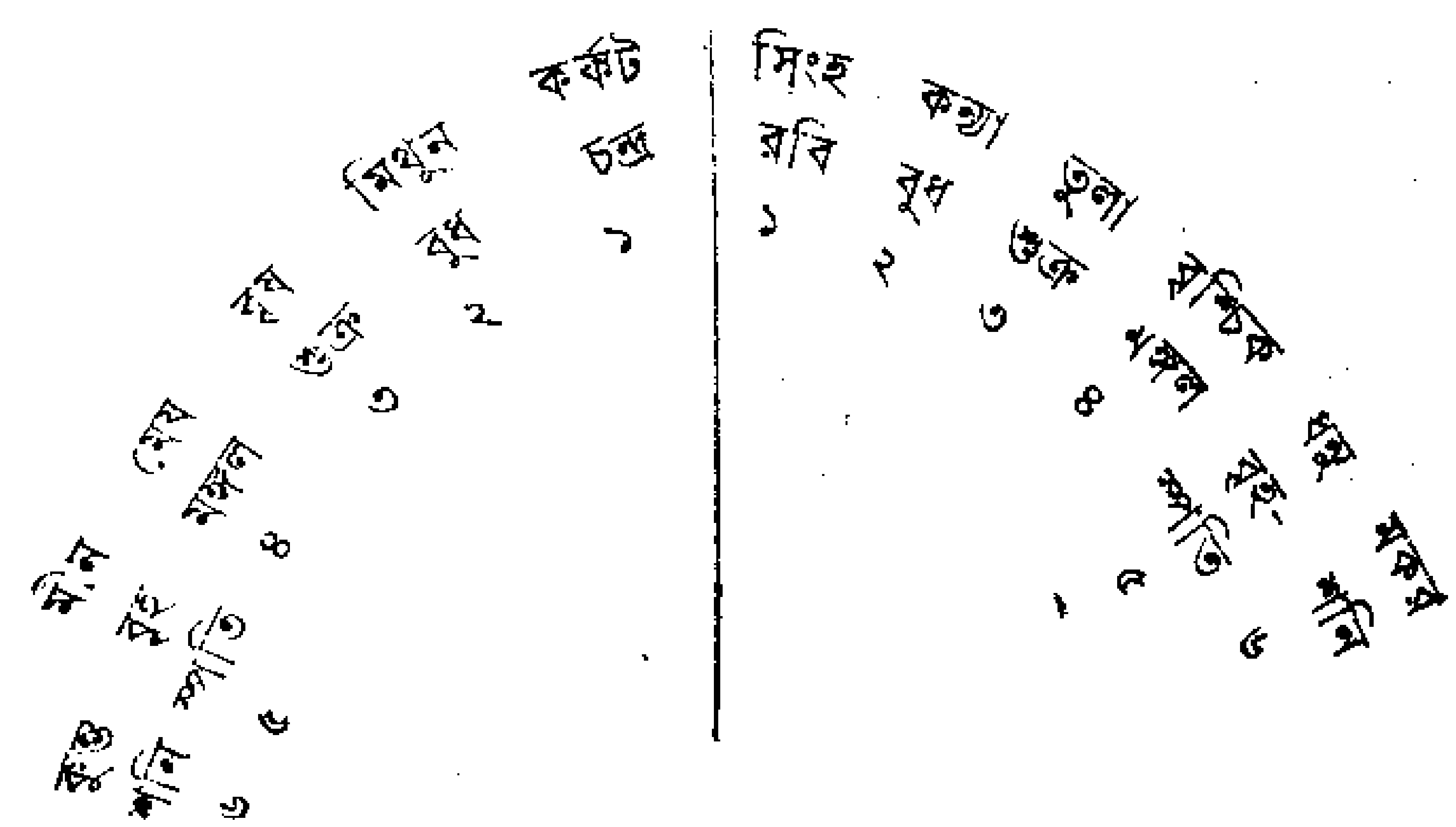
স্বরাক্রমেতে সোমার্কৌ যদা সাকং সবাসবৌ।
স্যাত্তদাদিযুগং মাঘস্তপঃ শুক্লোঽয়নং হ্যুদক্॥

অর্থাৎ বাসব বা ধনিষ্ঠানক্ষত্রে সূর্য্য ও চন্দ্র যখন একত্রে অবস্থান করেন, তখন আদি যুগ মাঘ মাস, তপঃঋতু, শুক্লপক্ষ ও উত্তরায়ণ আরম্ভ হইয়া থাকে। ধনিষ্ঠানক্ষত্রে সূর্য্যের অবস্থানকালীন উত্তরায়ণ হইলে কৃত্তিকানক্ষত্রে বিষুবসংক্রান্তি হয়। অধুনা অশ্বিনীনক্ষত্রের আদিতে বিষুবসংক্রান্তি হইলেও বিষুবন উহা হইতে প্রায় ২১ অংশ পশ্চিমে উত্তরভাদ্রপদনক্ষত্রে অবস্থান করিতেছে। কৃত্তিকানক্ষত্রের আদি বিন্দু বর্ত্তমান বিষুব বিন্দু হইতে প্রায় ৪৭।৪০ অংশ দূরে অবস্থিত। সূর্য্যসিদ্ধান্ত মতে বিষুবন্ $৬৬\frac{২}{৩}$ বৎসরে এক অংশ গমন করিয়া থাকে; সুতরাং এই ৪৭।৪০ অংশ পিছাইয়া আসিতে উহার ৪৭।৪০ $৩১৭৩\frac{১}{৩} \times ৬৬\frac{২}{৩} = ৩১৭৪$ বৎসর লাগিয়াছে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, খৃষ্ট পূর্ব্ব ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বেদাঙ্গ জ্যোতিষের সময়। এই সময় পর্য্যন্ত রাশিচক্র কল্পিত হয় নাই। অশ্বিনী রাশিচক্রের আদি নক্ষত্র। এ কারণ মনে হয়, বিষুবন অশ্বিনীনক্ষত্রে অবস্থান করিবার সময় রাশিচক্র কল্পিত হইয়াছিল। কৃত্তিকা হইতে অশ্বিনীনক্ষত্রের দূরতা এক নক্ষত্র অর্থাৎ ১৩।২০ অংশ। এক অংশ গমন করিতে বিষুব-বিন্দুর $৬৬ \times \frac{২}{৩}$ বৎসর সময় লাগে; সুতরাং এই ১৩।২০ অংশ পিছাইয়া আসিতে উহার $১৩।২০ \times ৬৬\frac{২}{৩} = ৮৮৯$ বৎসর সময় লাগিয়াছে। অর্থাৎ খৃষ্ট পূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীতে বিষুবন অশ্বিনীনক্ষত্রের শেষভাগে অবস্থিত ছিল। ৪২৭ শকে বরাহমিহিরের সময়ে অশ্বিনীনক্ষত্রের আদিতে অয়নফলনের আরম্ভবিন্দু স্থির করা হইয়াছে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দী হইতে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে রাশিচক্র কল্পিত হইয়াছে। এই সময়ের পূর্ব্বে যে জাতকবিচার একেবারে ছিল না, এরূপ বলা যায় না। জাতকোক্ত দশাবিচারে কৃত্তিকানক্ষত্রকে আদি নক্ষত্র বলিয়া গণনা করা হয়। যদি অশ্বিনীনক্ষত্রকে আদি নক্ষত্র বলিয়া গণনা করিবার পরে জাতকবিচার সূচিত হইয়া থাকিত, তাহা হইলে কৃত্তিকা হইতে দশাগণনা করা হইত না, অশ্বিনী হইতেই দশাগণনা করিবার প্রথা প্রচলিত থাকিত। কৃত্তিকাযুগে রচিত সংহিতাদি পাঠেও জানা যায়, ঋক্-সংহিতার সময় হইতেই এদেশে গ্রহফলে বিশ্বাস চলিয়া আসিতেছে। সে ফল রাশ্যাদি লইয়া নহে,

নক্ষত্রাদি লইয়া গণিত হইত। অথর্ব্ব জ্যোতিষেও জন্মনক্ষত্র লইয়া এক প্রকার বিচার করিবার আভাস পাওয়া যায়। অতএব দেখা যাইতেছে যে, রাশিচক্র কল্পিত হইবার পূর্ব্বেও নক্ষত্র চক্রদ্বারা এ দেশে দশা গণনা, অষ্টবর্গগণনা, গোচর ফল প্রভৃতি নানারূপ ভাগ্যফল গণনা প্রচলিত ছিল। পরে রাশিচক্র কল্পিত হইবার পর জাতক বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে।

বর্ত্তমান জাতকবিচারের মূল উপকরণ, মেষ-বৃষাদি দ্বাদশরাশি ও রবি-চন্দ্র-মঙ্গলপ্রভৃতি নবগ্রহ। প্রত্যেক রাশি একএকটি গ্রহের গৃহ বা ক্ষেত্র, কোন কোনও রাশি কোন কোনও গ্রহের মূল ত্রিকোণ অর্থাৎ প্রশস্ত স্থান, আবার কোন কোনওটী বা কোন কোন গ্রহের তুঙ্গস্থান বা নীচ স্থান অর্থাৎ সেই সেই রাশিতে সেই সেই গ্রহ পূর্ণ বলশালী হয়েন অথবা একেবারে হীনবল হইয়া পড়েন। কোন্ ভিত্তি বা হেতুর উপর নির্ভর করিয়া গ্রহগণের এই সকল গৃহাদি কল্পিত হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। তবে এই সকল কল্পনার মধ্যে এমন একটা ধারা দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাতে ইহার মধ্যে কোনও ভিত্তি বা হেতু নাই, এমন কথা বলা চলে না।

প্রথমে গ্রহগণের গৃহ বা ক্ষেত্র সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। রবির গৃহ সিংহ, চন্দ্রের কর্কট, বুধের মিথুন ও কন্যা, শুক্রের বৃষ ও তুলা, মঙ্গলের মেষ ও বৃশ্চিক, বৃহস্পতির মীন ও ধনু এবং শনির কুম্ভ ও মকররাশি। একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিলে দেখা যায়, গ্রহগণের এই গৃহগুলি বেশ শৃঙ্খলার সহিত সজ্জিত আছে। যেমন,—

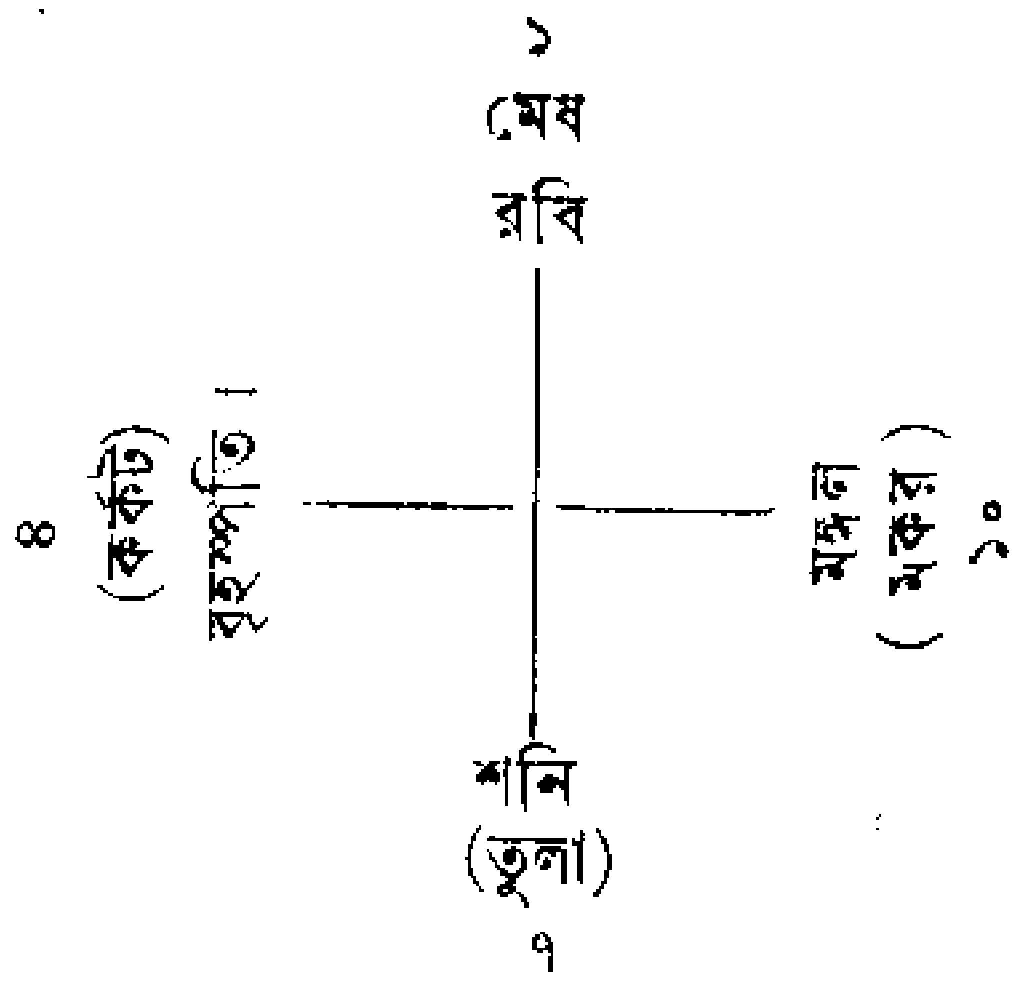


রবি ও চন্দ্র গ্রহরাজ। যে কালে রাশিচক্র কল্পিত হয় নাই, সে সময় লগ্নগণনা করিয়া জাতকবিচার করিবারও পদ্ধতি ছিল না। তখন রবি ও চন্দ্রের অবস্থিতি হইতেই জাতক বিচার হইত। এখনও পর্যান্ত চন্দ্রের অবস্থিতি অর্থাৎ জন্মরাশি হইতে ভাবফল ও গোচরাদি গণনা করা হইয়া থাকে। এই কারণেই বোধ হয় রবি ও চন্দ্রের সিংহ ও কর্কটরাশিতে গৃহ স্থির করিয়া, ইহাদিগকে গ্রহগণের গৃহকল্পনায় কেন্দ্রস্থানীয় বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে। রবি ও চন্দ্রের গৃহের পার্শ্বে পর পর রাশিতে অপরাপর গ্রহগণের গৃহ তাহাদের শীঘ্র ও মন্দগতি অনুসারে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। বুধের একরাশি ভ্রমণ করিতে প্রায় ১৮ দিন, শুক্রের ২৮ দিন, মঙ্গলের ৪৫ দিন, বৃহস্পতির একবৎসর এবং শনির ২॥০ আড়াই বৎসর সময় লাগে। একারণ গতি অনুসারে রবি ও চন্দ্রের গৃহের পার্শ্বস্থ রাশিতে বুধের, তাহার পার্শ্বে শুক্রের, উহার পরে মঙ্গলের, পরে বৃহস্পতির এবং সর্ব্বশেষ রাশিদ্বয়ে অর্থাৎ মকর ও কুম্ভরাশিতে শনির গৃহ কল্পিত হইয়াছে। এখন কথা হইতে পারে, গৃহকল্পনায় সিংহ ও কর্কট রাশিকে কেন কেন্দ্র করা হইল, মীন ও মেষ রাশিতেও ত রবি ও চন্দ্রের গৃহ কল্পিত হইতে পারিত। এ সম্বন্ধে এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে, মেষ বর্ত্তমান রাশিচক্রের আদিরাশি হইলেও রাশিচক্র কল্পনার পূর্ব্বে নক্ষত্রচক্র অনুসারে যে জাতকবিচার হইত, তাহা এই বর্ত্তমান গৃহকল্পনায় একেবারে পরিত্যক্ত হয় নাই। বৈদিক সময়ে পুষ্যানক্ষত্র হইতে কালগণনার সূত্রপাত হয়। ঋগ্বেদে পুষ্যা নক্ষত্রচক্রের আদি নক্ষত্র। বর্ত্তমান জাতকবিচারের প্রধান অবলম্বন যেমন লগ্ন, প্রাচীন নক্ষত্রচক্র অনুসারে জাতকবিচারের তেমনি অবলম্বন ছিল চন্দ্র। এই কারণেই বোধ হয় প্রাচীন গণনার সহিত কিছু সংস্রব রাখিবার জন্য পুষ্যা নক্ষত্রাধিকৃত কর্কটরাশিতে চন্দ্রের গৃহ কল্পিত হইয়াছে। অপর পক্ষে কৃত্তিকায় বিষুববিন্দু থাকিলে মঘানক্ষত্রে দক্ষিণায়ন হয় অর্থাৎ মঘানক্ষত্রে অবস্থানকালীন সূর্য্যের তেজ সর্ব্বাপেক্ষা প্রখর হইয়া উঠে। মঘা সিংহরাশিতে অবস্থিত, এ কারণ সিংহরাশি রবির গৃহ।

গ্রহগণের মূল ত্রিকোণ অথবা প্রসন্ন স্থান কল্পনার মধ্যেও বেশ একটা ধারা দেখিতে পাওয়া যায়। রবি ও চন্দ্র ব্যতীত অপর গ্রহগণের দুইটি করিয়া গৃহ আছে। তন্মধ্যে একটি উহাদের মূল ত্রিকোণ বা প্রসন্ন স্থান। এই প্রসন্ন স্থান কল্পনায় গ্রহগণের শুভ ও অশুভত্ব গ্রহণ করা হইয়াছে। সিংহ হইতে মকররাশি পর্য্যন্ত চক্রার্দ্ধে শুভগ্রহগণের অর্থাৎ বুধ, শুক্র ও বৃহস্পতি

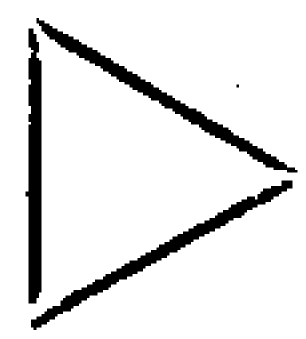
গ্রহের গৃহগুলি (কন্যা, তুলা ও ধনু) উহাদের মূলত্রিকোণ স্থান এবং কর্কট হইতে কুম্ভরাশি পর্য্যন্ত অপর চক্রার্দ্ধে পাপ বা অশুভ গ্রহগণের অর্থাৎ মঙ্গল ও শনিগ্রহের গৃহগুলি (মেষ ও কুম্ভ) উহাদের মূল ত্রিকোণ স্থান। রবি ও চন্দ্রের একটি করিয়া গৃহ, সুতরাং উহাদের স্বগৃহেই মূল ত্রিকোণ স্থান হওয়া উচিত; কিন্তু চন্দ্রের এই নিয়মের কিছু ব্যতিক্রম আছে। বৃষরাশিতে চন্দ্র কর্কটাপেক্ষা অধিক প্রসন্ন হন। কথিত আছে, রোহিণী চন্দ্রের প্রিয়তমা মহিষী, এই কারণেই বোধ হয় চন্দ্র রোহিণীতারকায় গমন করিলে অধিক অর্থাৎ বৃষরাশিতে অধিক প্রসন্ন হইয়া থাকেন।

গ্রহগণের তুঙ্গ বা উচ্চ এবং নীচ স্থানগুলি দেখিলে প্রথমতঃ মনে হয় যেন উহা যদৃচ্ছাকল্পিত হইয়াছে। কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে দেখা যায়, উহা গৃহকল্পনার ন্যায়ই কোনও বিশেষ নিয়মের বশীভূত আছে। চন্দ্র, বুধ ও শুক্র ইহারা শীঘ্রগতি গ্রহ, এবং রবি, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি ইহারা মন্দগতি গ্রহ। মন্দগতি গ্রহগণ তাহাদের গতি অনুসারে পরস্পর পরস্পরের কেন্দ্রে অর্থাৎ ১ম, ৪র্থ, ৭ম, ও ১০ম রাশিতে তুঙ্গী হইয়াছেন। যেমন;—



শনির গতি সর্ব্বাপেক্ষা মন্দ, একারণ শনি রবি হইতে সর্ব্বাপেক্ষা দূররাশিতে তুঙ্গী। মন্দগতি গ্রহগণ যেমন পরস্পর পরস্পরের কেন্দ্রে উচ্চ, শীঘ্রগতি গ্রহগন তেমনি পরস্পর পরস্পরের কোণে অর্থাৎ ১ম, ৫ম ও ৯ম রাশিতে তুঙ্গী। যেমন ;—

৫
(বৃষ)
চন্দ্র



শুক্র (মীন)

বুধ
(কন্যা)
৯

এক্ষেত্রে মঙ্গলকে শীঘ্র ও মন্দগতি উভয়শ্রেণীর গ্রহমধ্যে গণনা করা হইয়াছে। এরূপ গণনায় অবশ্য শুক্র গ্রহকে পাওয়া যায় না। মঙ্গলকে ছাড়িয়া দিলে শীঘ্রগতি গ্রহগণের তুঙ্গ স্থানের মধ্যে যে কোনও ধারা পাওয়া যায় না, এমন নহে। বুধের তুঙ্গ স্থান অর্থাৎ কন্যারাশির ঠিক বিপরীত রাশি অর্থাৎ মীন শুক্রের তুঙ্গস্থান, এবং উহার কোণে অর্থাৎ নবম রাশি বৃষতে চন্দ্র তুঙ্গী। শুক্র বৃদ্ধ এবং বুধ বালক,—উভয়েই বিপরীতভাবাপন্ন, এই কারণেই বোধ হয় পরস্পর বিপরীত রাশিতে ইহাদের তুঙ্গ স্থান কল্পিত হইয়াছে।

পুরাণাদিতে গ্রহগণসম্বন্ধে যেরূপ বিবরণ পাওয়া যায়, তদ্দ্বারা ইহাদের তুঙ্গ-স্থান কল্পনার কিছু কিছু কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে কথিত আছে, বৃহস্পতি পুষ্যানক্ষত্র হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। বিষ্ণুপুরাণেও দেখা যায়, পুষ্যানক্ষত্রে সূর্য্য চন্দ্র ও বৃহস্পতি একত্রে মিলিত হইলে সত্যযুগের আবির্ভাব হইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, পুষ্যা নক্ষত্রের সহিত বৃহস্পতিগ্রহের কোনও না কোনও সম্বন্ধ আছে; এবং এই কারণেই পুষ্যা-নক্ষত্রে অর্থাৎ কর্কটরাশিতে বৃহস্পতি তুঙ্গী। বৃহস্পতি যেমন পুষ্যা নক্ষত্র হইতে উৎপন্ন, মঙ্গল গ্রহও সেইরূপ আষাঢ়ানক্ষত্রে জাত, একারণ মঙ্গলের অপর নাম আষাঢ়াভূ। আষাঢ়ানক্ষত্র মকররাশিতে অবস্থিত, সুতরাং মঙ্গলের তুঙ্গ-স্থান মকররাশি। বুধের জন্মবৃত্তান্ত কিছু বিচিত্র। বিষ্ণুপুরাণে কথিত আছে, চন্দ্র রাজসূয় যজ্ঞ করিয়া দর্পে দেবগুরু বৃহস্পতির ভার্য্যা তারাকে হরণ করেন। পিতামহ ও দেবগণ অনেক অনুরোধ করিলেন, কিন্তু চন্দ্র তারাকে পরিত্যাগ করিলেন না। শুক্র অসুরদিগের আচার্য্য, একারণ দেবগুরু বৃহস্পতির সহিত তাঁহার বিলক্ষণ শত্রুতা। শুক্র চন্দ্রের সহায় হইলেন। এইরূপে দেবাসুর-সংগ্রাম

আরম্ভ হইল। পরিশেষে ব্রহ্মা শান্তি স্থাপন করিয়া বৃহস্পতিকে তাঁহার পত্নী প্রত্যর্পণ করিলেন। ইতিমধ্যে তারা গর্ভবতী হইয়াছিলেন। বৃহস্পতির আজ্ঞায় তারা সেই গর্ভ ঈষিকাস্তম্বে পরিত্যাগ করেন। ইহাতে যে বালকের জন্ম হয়, তাহার তেজ ও সৌন্দর্য্য দেখিয়া বৃহস্পতি ও চন্দ্র উভয়েই উহাকে গ্রহণ করিতে উদ্যত হন। কিন্তু সন্তানের পিতা কে? লজ্জাবশতঃ তারা তাহা বলিতে পারিল না। পরে ব্রহ্মার জিজ্ঞাসায় প্রকাশ পাইল, উহা চন্দ্রের সন্তান। একারণ বুধের অপর নাম চন্দ্রসুত। এখন দেখা যাউক, কোন্ তারা লইয়া চন্দ্রের সহিত বৃহস্পতির বিবাদ হইয়াছিল। পুষ্যানক্ষত্রে বৃহস্পতির জন্ম; সুতরাং পুষ্যা বৃহস্পতির পত্নী হইতে পারে না। রোহিণী চন্দ্রের প্রেয়সী মহিষী, ইহাকে বৃহস্পতির পত্নী বলিয়া গণনা করা যায় না। মহাভারতে কথিত আছে, তারার ছয় পুত্র ও এক কন্যা। কৃত্তিকানক্ষত্রে ছয়টী তারা স্পষ্ট এবং একটী অস্পষ্ট দেখা যায়। উপরন্তু কৃত্তিকার দেবতা অগ্নি এবং বৃহস্পতির সঙ্গেও অগ্নির যথেষ্ট সম্বন্ধ আছে। এ কারণ মনে হয়, এই কৃত্তিকাই বৃহস্পতিপত্নী তারা। * এই কৃত্তিকা নক্ষত্রযুক্ত হইলে অর্থাৎ বৃষ রাশিতে চন্দ্র তুঙ্গী হইয়া থাকেন। বুধ চন্দ্রের পুত্র। ফলিত জ্যোতিষমতে পঞ্চম গৃহ পুত্রস্থান। এই কারণে বোধ হয় চন্দ্রের তুঙ্গ স্থান অর্থাৎ বৃষরাশি হইতে গণনায় পঞ্চম গৃহ অর্থাৎ কন্যারাশিতে বুধ তুঙ্গী। মীনরাশিতে শুক্র তুঙ্গী হইবার কারণ নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা যায় না। তবে দেখা যায়, লিঙ্গপুরাণমতে বুধ ও শুক্র উভয়েই জলময় গ্রহ; উভয়েই শিল্পী ও কবি। উপরন্তু বুধের জন্মবিষয়ে শুক্রের কিছু সম্বন্ধ আছে। একারণেই বোধ হয়, বুধের তুঙ্গ স্থান কন্যারাশির ঠিক বিপরীতে জলময় মীনরাশিতে শুক্রের তুঙ্গস্থান কল্পিত হইয়াছে। মেষরাশির আদিতে সূর্য্যের আগম হইলে বিষুবসংক্রান্তি অর্থাৎ দিবা ও রাত্রি সমান হয়। একারণ মেষ হইতে সূর্য্যের গতি অর্থাৎ বৎসরাদি গণনা করা হইয়া থাকে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, মেষের সহিত সূর্য্যের যথেষ্ট সম্বন্ধ আছে। কাজেই মেষরাশি রবির তুঙ্গস্থান। পুরাণে কথিত আছে, শনি সূর্য্যের ছায়া হইতে উৎপন্ন। ছায়া সাধারণতঃ পদার্থের বিপরীতেই পড়িয়া থাকে। সূর্য্যের তুঙ্গস্থান মেষরাশির বিপরীত রাশি তুলা; সুতরাং তুলারাশি শনির তুঙ্গস্থান।

গ্রহগণ যে যে রাশিতে তুঙ্গগত অর্থাৎ পূর্ণবলশালী হইয়া থাকেন, উহার

---

* শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয়ও তাঁহার জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ গ্রন্থে এইরূপ অনুমান করিয়াছেন।

বিপরীতরাশিতে তাঁহারা নীচস্থ অর্থাৎ একবারে হীনবল হইয়া পড়েন। সুতরাং এ সম্বন্ধে আর অধিক আলোচনা করিবার প্রয়োজন করে না।

এতদূর পর্য্যন্ত রব্যাদি সাতটি গ্রহের কথাই বলা হইল; এই সাতটি গ্রহ ব্যতীত ফলিত-জ্যোতিষে রাহু ও কেতু নামে আরও দুইটি গ্রহ আছে। এই রাহু ও কেতু বাস্তবিক কোনও গ্রহ নহে; ইহারা চন্দ্রপাতদ্বয় অর্থাৎ ছায়া মাত্র। নরভাগ্য-গণনায় অন্যান্য গ্রহগণের ন্যায় ইহাদের কার্য্যকারিতা আছে দেখিয়াই হউক অথবা অন্য যে কারণেই হউক, ফলিত-জ্যোতিষে ইহাদিগকে গ্রহপর্য্যায়ভুক্ত করা হইয়াছে। রাহুর গৃহ কন্যারাশি, মূলত্রিকোণ কুম্ভরাশি এবং উচ্চস্থান বৃষরাশি (মতান্তরে মিথুনরাশি)। চন্দ্রপাতের মস্তক অর্থাৎ অগ্রভাগ রাহু এবং পুচ্ছ অর্থাৎ শেষভাগ কেতু; এ কারণ রাহু যখন যে রাশিতে অবস্থান করেন, উহার ঠিক বিপরীত রাশিতে কেতু সর্ব্বদা অবস্থান করিয়া থাকেন। সুতরাং রাহুর গৃহাদির ঠিক বিপরীত রাশিতে অর্থাৎ মীন, সিংহ ও বৃশ্চিক (মতান্তরে ধনু) রাশিতে কেতুর গৃহ, মূল ত্রিকোণ এবং তুঙ্গস্থান কল্পনা করা হইয়াছে। রাহু ও কেতুর গৃহাদি কল্পনার মধ্যেও একটা হেতু পাওয়া যায়। কথিত আছে রাহু সিংহিকাসুত একজন দৈত্য। শুক্র দৈত্যদিগের গুরু। একারণ বোধ হয় গুরুগৃহে অর্থাৎ শুক্রের ক্ষেত্র বৃষরাশিতে রাহু তুঙ্গী। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, শুক্রের সহিত বুধের একটা সম্বন্ধ আছে। একারণ বুধের এক গৃহ কন্যারাশিতে রাহুর গৃহ এবং অপর গৃহ মিথুনরাশিতে মতান্তরে রাহুর তুঙ্গস্থান কল্পিত হইয়াছে। শনি রাহুর একজন পরম মিত্র। এই হেতু মিত্রগৃহ কুম্ভরাশি রাহুর মূল ত্রিকোণ বা প্রসন্ন স্থান। কেতুর সমস্তই রাহুর বিপরীত; সুতরাং উহার গৃহাদিসম্বন্ধে বিশেষ কিছু আলোচনা করিবার প্রয়োজন করে না।

গ্রহগণের এই সকল গৃহাদি কল্পনা ব্যতীত ফলিত-জ্যোতিষে আরও অনেকানেক প্রয়োজনীয় সংজ্ঞা উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে গ্রহগণের শত্রুমিত্রতা, দৃষ্টি ও স্বরূপ জাতকবিচারের প্রধান অবলম্বন। এই শত্রুমিত্রতা ও দৃষ্টির দ্বারা প্রধানতঃ গ্রহগণের বলাবল নির্ণয় এবং স্বরূপ দ্বারা জাতকের অর্থাৎ যাহার ভাগ্য গণনা করা হইবে, তাহার রূপগুণাদি বিচার করা হইয়া থাকে। ফলিত জ্যোতিষে গ্রহগণের শত্রু-মিত্রতা যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, প্রথমতঃ উহা যদৃচ্ছাকল্পিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় বটে; কিন্তু বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, উহা বেশ একটি নিয়মের বশীভূত আছে। নিয়মটি এই-

রূপ, — গ্রহগণের মূল ত্রিকোণ স্থান হইতে গননায় ৪র্থ ৮ম, ৫ম ৯ম, ২য় ১২শ এবং তুঙ্গ স্থানের অধিপতিগণ সেই গ্রহের মিত্র, এতদ্ব্যতীত রাশির অধিপতিগণ শত্রু এবং মিশ্র অবস্থা প্রাপ্ত হইলে সম। গ্রহগণের দৃষ্টির মধ্যে কিছু বিশেষত্ব নাই। ঠিক সম্মুখ ভাগে দৃষ্টি করাটা যেমন সকলের পক্ষে স্বাভাবিক, গ্রহগণও সেইরূপ তাহাদের ঠিক সম্মুখে অর্থাৎ সপ্তম রাশিতে পূর্ণ দৃষ্টি করিয়া থাকেন। শনি বৃহস্পতি ও মঙ্গল গ্রহের দৃষ্টির কিছু বিশেষত্ব আছে। ইহারা সপ্তম রাশি ব্যতীত যথাক্রমে তৃতীয়-দশম, পঞ্চম-নবম ও চতুর্থ অষ্টম রাশিতে ও পূর্ণ দৃষ্টি করেন। রাহুও পঞ্চম নবম; সপ্তম ও দ্বাদশ রাশিতে পূর্ণ দৃষ্টি করিয়া থাকেন। গ্রহগণের মধ্যে কেবল কেতু অন্ধ, ইহার কোনও দৃষ্টি নাই। গ্রহগণের এই বক্র দৃষ্টির কোনও হেতু পাওয়া যায় না বটে, তবে দেখা যায় চতুর্থ অষ্টম, পঞ্চম নবম ও দ্বিতীয় দ্বাদশ ক্রম শত্রুমিত্রতাকল্পনায় গ্রহণ করা হইয়াছে। কেবল ইহাই নহে, বিবহের যোটক বিচারে ও অন্যান্য গননায়ও এইরূপ ক্রম গ্রহণ করা হইয়া থাকে। একারণ মনে হয়, তৃতীয় দশম, চতুর্থ অষ্টম, পঞ্চম নবম, ও দ্বিতীয় দ্বাদশ ক্রম ফলিত জ্যোতিষের সংজ্ঞা নিরূপণের অথবা বিচারের একটী ধারা।

জাতকে গ্রহগণের স্বরূপ ও স্বভাবাদি যেরূপ কল্পিত হইয়াছে, দেখা যায় পুরাণই তাহার মূল ভিত্তি। পুরাণে গ্রহগণের রূপ, গুণ, বর্ণ, স্বভাব, মারকতা প্রভৃতি যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, জাতকবিচারে তাহার প্রায় সমস্তই গ্রহণ করা হইয়া থাকে, অর্থাৎ সেই সেই গ্রহ হইতে মানবের সেই সেইরূপ গুণাদি কল্পনা করা হয়। বর্ত্তমান জাতকে গ্রহগণ বিম্বাকার জ্যোতিঃপদার্থ নহে, তাঁহারা দেবমূর্ত্তি-বিশিষ্ট ;—সুতরাং মানবের ভাগ্যনিয়ামক। প্রাচীন জাতকে, এমন কি বরাহের জাতকে বা সংহিতায় কিন্তু এসকলের কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রাচীন জাতকে গ্রহগণ মানবের শুভাশুভ ফলের কর্ত্তা নহেন, তাঁহারা কর্ম্মফলের সূচকমাত্র। সুতরাং মনে হয়, বর্ত্তমান জাতকে গ্রহগণের যে পুরাণ-বর্ণিত রূপগুণাদি গ্রহণ করা হইয়াছে, উহা সংজ্ঞামাত্র; গ্রহগণকে ভাগ্যফল-দানের কর্ত্তা কল্পনা জাতকের উদ্দেশ্য নয়।

গ্রহগণকে মানবের সুখদুঃখদানের কর্ত্তা কল্পনা করিলে, সঙ্গে সঙ্গে গ্রহগণের পূজা, যাগ, শান্তি প্রভৃতির ব্যবস্থাও আসিয়া পড়ে; সুতরাং পুরুষ-কারের আর কোনও কৃতিত্ব থাকে না। কিন্তু জাতক শাস্ত্রের এরূপ উদ্দেশ্য হইতেই পারে না যে, লোকে তাহাদের উন্নতিলাভের অথবা বিপদ বা অনিষ্টপাতের প্রতীকারের চেষ্টা না করিয়া, কেবল গ্রহপূজায় রত থাকুক।

যদি এরূপ উদ্দেশ্য হয়, তবে এ শাস্ত্র যে সমাজের বিশেষ অনিষ্টকারক, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। জাতকে দুই প্রকার ভাগ্যফল গণনা করা হইয়া থাকে,—দৃঢ় কর্ম্মফল এবং অদৃঢ় কর্ম্মফল। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত শুভাশুভ কর্ম্মের দ্বারা ইহজন্মে যে ফল ভোগ হইয়া থাকে, তাহার নাম দৃঢ় কর্ম্মফল এবং ইহজন্মেরই কর্ম্মের যে শুভাশুভ ফল ভোগ হয় তাহার নাম অদৃঢ় কর্ম্মফল। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, জীবগণ নিজকর্ম্মের দ্বারাই সুখ দুঃখাদি ভোগ করিয়া থাকে, গ্রহগণ তাহাদের ভাগ্যফলদাতা নহেন। গ্রহগণ যদি ভাগ্যফলদাতা হইতেন, তাহা হইলে গ্রহগণের পূজা শান্তি ইত্যাদি করিয়া নিশ্চেষ্ট হইতে পারা যাইত, পুরুষকার প্রয়োগের কোনও প্রয়োজন থাকিত না। কথিত আছে,—

যথা হ্যেকেন চক্রেণ ন রথস্য গতির্ভবেৎ।
এবং পুরুষকারেণ বিনা দৈবং ন সিধ্যতি॥

অর্থাৎ যেমন এক চক্রে রথের গতি হয় না, সেইরূপ পুরুষকার ব্যতীত দৈব সিদ্ধ হইতে পারে না। আমাদের জীবনে সুখদুঃখাদি ভোগ দৈব ও পুরুষকার উভয়েরই অপেক্ষা রাখে। গ্রহগণের অবস্থিতি হইতে লোকে নিজ নিজ ভাগ্যফল জানিয়া পুরুষকার দ্বারা উন্নতির বা অনিষ্টের প্রতীকারের চেষ্টা করুক, জাতক শাস্ত্রের ইহাই উদ্দেশ্য। অবশ্য পুরাণাদিতে গ্রহগণের পূজা শান্তি প্রভৃতির যে ব্যবস্থা আছে, তাহার কোনও যে কার্য্যকারিতা নাই, এমন কথা বলা যায় না; তবে পুরুষাকারই যে কর্ম্মফল লাভের ও অশুভ কর্ম্মফল-নিবারণের মুখ্য উপায় এবং ইহাই যে জাতক শাস্ত্রের মূল উদ্দেশ্য, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।
গন্ধনালা, দিল্লী।

মসলার ব্যবসায়।

অতি প্রাচীন কাল হইতেই ভারত মসলা ও গন্ধদ্রব্যের জন্য প্রসিদ্ধ। এমন কি খৃষ্ট পূর্ব্ব দ্বাদশ শতাব্দীতে বিশ্ববিখ্যাত সম্রাট্ সলোমোনের সময় ভারতের সহিত অন্যান্য দেশের মসলা-ব্যবসায়ের আভাস পাওয়া যায়। পুরাতন ইতিহাসের কুজ্ঝটিকাময় বিবরণ ছাড়িয়া দিলেও খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে যে ভারতের সহিত তদানীন্তন উদীয়মান রোমক-সাম্রাজ্যের ঘনিষ্ঠ ব্যবসায় সম্বন্ধ-প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, তাহার কোন সন্দেহ নাই। সুবিখ্যাত রোমক গ্রন্থকার প্লিনি বলেন যে, রসুণ ও গন্ধমসলা, বিবিধ গন্ধদ্রব্য ও প্রসাধন উপকরণাদিই ভারতীয় বাণিজ্যের প্রধান পণ্য ছিল। প্রতি বৎসর এই সমুদয় পদার্থ ক্রয়ের জন্য রোমসাম্রাজ্য হইতে বর্ত্তমান হিসাবে প্রায় সাড়ে সাত কোটি টাকা মূল্যের স্বর্ণ অথবা স্বর্ণমুদ্রা প্রেরিত হইত। সে কালে মসলাদির দর অত্যন্ত মহার্ঘ ছিল। ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, সে সময় গোলমরিচ ১৫৲ হইতে ২০৲ টাকা সের দরে রোমনগরে বিক্রয় হইত।

তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে ভারত যে বিশ্ববিশ্রুত মসলার ক্ষেত্র ছিল, এখনও তাহাই আছে। সেই মহীশূর ও ত্রিবাঙ্কুর এখনও যথাক্রমে এলাচি ও গোল-মরিচের জন্মভূমি এবং সেই সদ্‌গন্ধবিশিষ্ট বিভিন্ন জাতীয় জীরক এখনও উত্তর পঞ্জাব ও কাশ্মীরে উৎপাদিত হইয়া থাকে। কিন্তু এত দীর্ঘকাল ধরিয়া মসলা উৎপাদন করিয়া আসিলেও ব্যবসায় হিসাবে ভারত অন্যান্য দেশের ন্যায় এই ব্যবসায়ে ধনবান্ হইতে পারে নাই। অন্যান্য শত শত কাঁচা মালের ন্যায় মসলাতেও ভারত কেবলমাত্র উৎপাদনের মজুরী পাইয়া থাকে; অন্য সমস্ত লাভই বিদেশীয়গণের হস্তে চলিয়া যায়। ভারত হইতে কাঁচা মসলা অতি সুলভ মূল্যে ক্রয় করিয়া বিদেশীয় ব্যবসায়িগণ তৎসমুদয়কে কত বিভিন্ন প্রকারে প্রস্তুত করিয়া বিভিন্ন শ্রেণীর ক্রেতাগণের নিকট উপস্থিত করেন। তাহাতে সাধারণতঃ প্রায় টাকায় আট আনা লাভ হইয়া থাকে। অথচ আমরা হলুদ, লঙ্কা, জীরে, ধনে প্রভৃতিকে অতি তুচ্ছ দ্রব্য মনে করি এবং মুদি ভিন্ন অন্য কাহারও সহিত যে ইহাদের সম্পর্ক থাকিতে পারে, তাহা বিশ্বাস করি না।

সকল সুসভ্য জাতিই খাদ্যদ্রব্যের স্বাদ, গন্ধ ও বর্ণের উৎকর্ষ সাধনের জন্য কোন না কোন প্রকার মসলা ব্যবহার করিয়া থাকেন। অবশ্য রুচি হিসাবে বিভিন্ন মসলা ব্যবহৃত হয়; কিন্তু সমস্ত সভ্য জগতেই কতকগুলি মসলার ব্যবহার সাধারণ। ভারতের কথা বিশেষ করিয়া বলিতে গেলে আমরা কয়েকটি মসলার উল্লেখ করিতে পারি:—১। লঙ্কা। ২। সা-জীরা। ৩। রাঁধুনি। ৪। দারুচিনি। ৫। তেজপত্র। ৬। ধনে। ৭। জীরা। ৮। হলুদ। ৯। ছোট এলাচ। ১০। লবঙ্গ। ১১। মৌরী। ১২। জায়ফল ও জয়িত্রী। ১৩। সুলফা। ১৪। গোলমরিচ। এই তালিকার দুই একটি দ্রব্য বঙ্গদেশে বিশেষরূপে ব্যবহৃত না হইতে পারে; কিন্তু স্থূলতঃ বলিতে গেলে এই মসলাগুলি শুধু যে ভারতময় ব্যবহৃত হয় তাহা নহে; ইহাদের ব্যবসায়ও নেহাৎ নগণ্য নহে। অন্তর্ব্বাণিজ্য ব্যতিরেকে ইহাদের অধিকাংশেরই বহির্ব্বাণিজ্য আছে, তাহা আমরা পরে বিবৃত করিব। এস্থলে পাঠকবর্গকে এইমাত্র বলা আবশ্যক যে, মসলা শুধু রন্ধনের উপাদান নহে; এই সমুদয় দ্রব্য অপর কার্য্যেও ব্যবহৃত হয়। সা-জীরার তৈল সাবান প্রস্তুতকারকগণ যথেষ্ট আদর করেন; লঙ্কার বীর্য্য উত্তেজক ঔষধ; দারুচিনি ও লবঙ্গের তৈল সাবান প্রস্তুতে, ঔষধে ও অন্যান্য ব্যবহারে আইসে। এইরূপে মসলা শুধু মুদির জিনিষ নহে, বিশেষ বিশেষ শিল্প-ব্যবসায়ীরও ইহা আবশ্যকীয় দ্রব্য।

স্বাদ ও গন্ধোৎপাদক গুণ ব্যতীত মসলার আরও একটি বিশেষ গুণ আছে—তাহা পচননিবারক ক্রিয়া (antiseptic action)। বলা বাহুল্য যে, প্রায় সকল মসলাতেই অল্প বিস্তর পরিমাণে এই গুণ বর্ত্তমান রহিয়াছে। কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, তাহা হইলে মসলা সমুদয় সমধিক পরিমাণে খাদ্য-সংরক্ষণে ব্যবহৃত হয় না কেন? তাহার কারণ অনেক। কিন্তু প্রধান কারণ এই—যে পরিমাণ মসলা স্বাদ ও গন্ধোৎপাদনের জন্য আবশ্যক হয়, ঠিক সেই পরিমাণ মসলা দ্বারা পচননিবারক ক্রিয়া সংসাধিত হয় না; অনেক স্থলে তদপেক্ষা অধিক পরিমাণ আবশ্যক হয়। তাহাতে খাদ্য সংরক্ষিত হয় বটে, কিন্তু স্বাদের বিকৃতি ঘটিয়া থাকে। অবশ্য অপেক্ষাকৃত অধিক মূল্য মসলা তৈলের সাধারণ ব্যবহৃত রাসায়নিক দ্রাবণসমূহে অদ্রবণীয়তা হেতু অসুবিধা; গুরুপাক হইবার সম্ভাবনা—এ সকলই গৌণ প্রতিবন্ধক। কিন্তু কালক্রমে নূতন নূতন প্রয়োগপ্রণালী উদ্ভাবিত হইয়া খাদ্যসংরক্ষণে মসলার ব্যবহারের প্রসার অবশ্যম্ভাবী।

অধিকাংশ মসলাতেই একপ্রকার লঘুবীর্য্য তৈল (Essential oil) পাওয়া যায়। উহা সাধারণতঃ ফলে, ত্বকে, বীজে, বীজাবরণে অথবা পত্রে অবস্থিতি করে। এই তৈলই পচননিবারণের সহায়। বিভিন্ন মসলার তৈল সম্বন্ধে অনেক গবেষণা হইয়াছে ও হইতেছে। তাহার ফলে ইহা জানিতে পারা যায় যে, কোন নির্দ্দিষ্ট মসলায় তৈলের পরিমাণ, প্রকৃতি ও উপাদানের উপর উক্ত মসলার পচননিবারক ক্রিয়া নির্ভর করে।

আমরা এ স্থলে কয়েকটি প্রধান প্রধান ভারতীয় মসলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিতেছি :—

১। লঙ্কা :—মসলার মধ্যে ইহার ব্যবহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইলেও অনেকেই শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন যে, ইহা ভারতের আদিম অধিবাসী নহে। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর কোন সময় পর্ত্তুগীজগণ আমেরিকা হইতে ইহার বীজ আনিয়া গোয়ায় চাষ করেন। তৎপরে ইহা ভারতময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে এবং স্থানে স্থানে অর্দ্ধবন্য অবস্থায় দেখিয়া কেহ কেহ ইহাকে আদিম অধিবাসী বলিয়া ভ্রম করিয়া থাকেন। বিলাতী ব্যবসায়িগণ বিভিন্ন শ্রেণীর লঙ্কাকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেন ;—ক্যাপ্‌সিকাম্‌ (Capsicum) ও চিলি (Chilli)। আমাদের ধানী লঙ্কা 'ক্যাপ্সিকাম্‌'-শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত এবং ইহা প্রধানতঃ ক্যাপসিলিন্‌ (Capsilin) নামক লঙ্কার বীর্য্য প্রস্তুতে ব্যবহৃত হয়। সাধারণ চাষের লঙ্কা 'চিলি'শ্রেণীর। ব্যবসায়ে নানা শ্রেণীর লঙ্কা দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে 'বড়লাল,' 'মধ্যমাকার লাল' 'লম্বা হলদে' ও 'গোল পীতাভ লাল' লঙ্কা সুপরিচিত। ভারতের সর্ব্বত্রই লঙ্কা উৎপাদিত হয়, তবে ফসলের পরিমাণাধিক্য হিসাবে মান্দ্রাজ, ব্রহ্মদেশ, বঙ্গ ও বোম্বাই প্রধান। এতদ্দেশের লঙ্কা সিংহল, ষ্ট্রেট্‌-সেটেল্‌মেণ্টস্‌, মরিচদ্বীপ, এডেন ও ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে রপ্তানী হয়। সাধারণতঃ শ্রেণী হিসাবে বিলাতী বাজারে লঙ্কা ৪০-৫০৲ টাকা হন্দর দরে বিক্রয় হয়। আপাততঃ অন্যান্য মসলার ন্যায় ইহার মূল্যও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে।

২। সা-জীরা :—ইহা তত অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত না হইলেও উচ্চ শ্রেণীর খাদ্যাদি পাকে আবশ্যক হয়। পারস্য, আফগানিস্থান, কাশ্মীর ও উত্তর পশ্চিম হিমালয়ের স্থানে স্থানে ইহা পাওয়া যায়। কর্ষিত ক্ষেত্রসমূহে এবং ঘাসযুক্ত ময়দানে ইহা স্বতঃই জন্মিয়া থাকে এবং পার্ব্বত্য জনগণ দ্বারা সংগৃহীত হইয়া রামপুর, অমৃতসহর, পেশয়ার প্রভৃতি স্থানে আনীত হয়। এতদ্দেশীয়

সা-জীরা বিলাতী সা-জীরা হইতে বিভিন্ন; কিন্তু স্বাদ, গন্ধ ও বর্ণে দুই জীরাই প্রায় সমান এবং উভয়ই রন্ধনকার্য্য ব্যতীত ঔষধার্থ, বিশেষ বিশেষ প্রকারের মদ্য প্রস্তুতে, সাবানে গন্ধসংযোগে ও অন্যান্য সুগন্ধ দ্রব্য উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। যুদ্ধের সময় ইহার উৎপাদন-কেন্দ্র হল্যাণ্ড দেশে চাষ কমিয়া যাওয়ায় ইহা এত দুষ্প্রাপ্য হইয়াছিল যে, বিলাতী বাজারে হন্দর দর প্রায় ২০০৲ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। এখন মরোক্কো, মোগাডোর, টিউনিস্ প্রভৃতি স্থান হইতে সা-জীরা বিলাতে প্রেরিত হইতেছে। কিন্তু ভারতীয় সা-জীরার ব্যবসায় অথবা উৎপাদনের উন্নতিসাধনের জন্য কেহই চেষ্টা করিতেছেন না। সা-জীরার তৈলের জীবাণুনাশক শক্তি প্রায় লবঙ্গতৈলের সমান।

৩। রাঁধুনি:—মসলার জন্য ইহার যথেষ্ট চাষ হয়। রাঁধুনি তৈলেরও যথেষ্ট জীবাণুনাশক শক্তি আছে এবং উদরাময় রোগে ইহা নানা স্থানে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

৪। তেজপাত:—Cinnamomum শ্রেণীর ২।৩ জাতীয় বৃক্ষ হইতে তেজপাত সংগৃহীত হইয়া থাকে। শতদ্রুর পর হইতে পূর্ব্বদিকে হিমালয়ের পাদদেশে যে সমুদয় অরণ্য আছে, উহাদের মধ্যে অধিকাংশেই তেজপাত পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন আসামের স্থানে স্থানেও ইহার চাষ আছে। বিভিন্ন প্রদেশের তেজপাতের মধ্যে কিছু পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার কারণ এই যে, সকল স্থানে একই জাতীয় গাছ হইতে তেজপাত সংগৃহীত হয় না। Cinnamomum obtusifolium হইতে যে তেজপাত সংগৃহীত হয়, তাহা অপেক্ষাকৃত বড়; কিন্তু কম গন্ধবিশিষ্ট; পক্ষান্তরে C. Tamalaর পাতা ছোট হইলেও গন্ধ অধিক। এস্থলে ইহা উল্লেখ করা উচিত যে, কোন কোন তেজপাত গাছের ত্বক্ দারুচিনিরূপে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ইহা আসল দারুচিনি নয়। তেজ পাতার গাছ নিম্ন বঙ্গে বেশ জন্মিতে পারে এবং দুইটি গাছ হইতে একটি পরিবারের এক বৎসরের তেজপাতা পাইতে পারা যায়।

৫। দারুচিনি:—দক্ষিণ ভারত ও সিংহল উভয় স্থানেই বন্য দারুচিনি বৃক্ষ পাওয়া যায়; কিন্তু শেষোক্ত দেশেই ইহার রীতিমত চাষ হয় ও উৎকৃষ্ট দারুচিনি জন্মিয়া থাকে। দারুচিনির ত্বক, পত্র ও মূল হইতে তিনটি বিভিন্ন প্রকারের তৈল পাওয়া যায়। এই সমুদয় তৈলের জীবাণুনাশক শক্তি এত অধিক যে, কেহ কেহ দারুচিনির তৈলকে Corosive Sublimate এর সমকক্ষ মনে করেন। ২১০০ ভাগ জলে ১ ভাগ দিলেও এই তৈলের জীবাণুনাশক ক্রিয়া

প্রকাশ পায়। বাজারে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর দারুচিনি পাওয়া যায়ঃ—১ম স্থূল ত্বক্‌ ও মলিনবর্ণ বিশিষ্ট—ইহা চীন দেশ হইতে আমদানি হয় এবং ইহা নিকৃষ্টজাতীয়। ২য় পাতলা ত্বক্‌ ও অপেক্ষাকৃত 'ফিকে' বর্ণবিশিষ্ট; ইহা সিংহলদেশীয় ও উৎকৃষ্টজাতীয়। এই দুই প্রধান শ্রেণীর মধ্যবর্ত্তী নানাবিধ মিশ্রিত শ্রেণী দেখিতে পাওয়া যায় এবং উহাদের বাণ্ডিলে নানাজাতীয় বৃক্ষের ত্বক্‌ ভেজাল থাকে।

৬। ধনে ঃ—ধনের বিশেষ পরিচয় অনাবশ্যক। অতি পুরাকালেও ভারতের ধনে মিশর, গ্রীস্‌, রোম প্রভৃতি স্থানে রপ্তানি হইত। কিন্তু প্রতীচ্যে ভারতীয় ধনের আজ কাল তেমন আদর নাই। রুশিয়া ও যুবিজ্ঞিয়ার স্থানে স্থানে যে ধনের চাষ হয়, তাহাতে তৈলের মাত্রা অধিক থাকায় বাজারে অধিক দরে বিক্রয় হয়। ভারতের ধনেতে তৈলের মাত্রা অতি কম; সেই জন্য বিলাতী ব্যবসায়িগণ ইহা পছন্দ করেন না। বলা বাহুল্য যে, ইউরোপীয় ব্যবসায়ে ধনে প্রধানতঃ তৈল পেষাইর জন্য ব্যবহৃত হয়। এতদ্দেশে ধনে শুধু মসলা নয়। নানা স্থানে বিশেষতঃ যুক্তপ্রদেশ ও পঞ্জাবে ধনের চাটনি এবং ধনেশাকভাজি সাধারণ তরকারির মধ্যে গণ্য। ভারতের প্রায় সব প্রদেশেই অল্প বিস্তর পরিমাণে ধনে চাষ হয়। বর্ত্তমান সমরের সময় হইতে কিয়ৎ পরিমাণে ভারতীয় ধনে বিলাতে যাইতেছে। বিলাতে বাজার দর প্রায় ৪৭৲ টাকা হন্দর।

৭। জীরা ঃ—ধনের ন্যায় জীরাও নিত্য ব্যবহারের মসলা। কিন্তু ধনের রপ্তানি কমিয়া গিয়াছে, পক্ষান্তরে ইহার রপ্তানি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। বঙ্গদেশে জীরার চাষ বড় বেশী দেখিতে পাওয়া যায় না। যুক্তপ্রদেশ ও পঞ্জাবেই প্রভূত পরিমাণে জীরার চাষ হয়। কিন্তু স্থানভেদে জীরার অল্পবিস্তর পার্থক্য আছে। স্বকীয় অভিজ্ঞতার ফলে আমরা অবগত আছি যে, বর্ণ, আকৃতি, স্বাদ ও গন্ধ ভেদে দেশীয় জীরাসমূহের মধ্যে অন্ততঃ তিনটি জাতি আছে। অমৃতসহর অথবা কানপুর বাজারে ইহা সহজেই দেখা যায়। এ সম্বন্ধে স্বতন্ত্র গবেষণা হওয়া আবশ্যক। প্রতীচ্যে জীরার প্রধান ব্যবহার মদ্যের মসলায়। কিন্তু এতদ্দেশে রন্ধন ব্যতীত আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধেও যথেষ্ট পরিমাণে জীরা ব্যবহৃত হয়। জর্ম্মণির প্রসিদ্ধ তৈলব্যবসায়ী মিসেল এণ্ড কোম্পানি প্রচুর পরিমাণে জীরার তৈল প্রস্তুত করেন। সাধারণতঃ জীরা হইতে ওজন হিসাবে শতকরা ৩ হইতে ৪ ভাগ তৈল পাওয়া যায়।

৮। হরিদ্রা ঃ—হরিদ্রা যে ভারতের অধিবাসী, তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ

নাই; যদিও কোন কোন উদ্ভিদ্‌বিদ্ বলেন যে, কয়েকটি উৎকৃষ্টজাতি হরিদ্রা প্রথমতঃ চীন হইতে এতদ্দেশে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। ভারতের সর্ব্বত্রই হরিদ্রা চাষ হয় ও মশলারূপে ব্যবহৃত হয়। হরিদ্রার অপর ব্যবহার—রঞ্জক পদার্থ-রূপে। 'অ্যানিলিন' রঞ্জকসমূহের প্রচলনে অপরাপর উদ্ভিজ্য রঙ্গের ন্যায় হরিদ্রার ব্যবহারও প্রভূত পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে, তবুও ইহা এতদ্দেশের নানা স্থানে রঞ্জনের জন্য ব্যবহৃত হয় ও বিদেশে রপ্তানি হয়। প্রসাধন কার্য্যে পূর্ব্বে হরিদ্রা অনেক পরিমাণে ব্যবহৃত হইত ও কতকটা সাবানের কাজ করিত। এতদ্ভিন্ন হরিদ্রার কীটনাশক শক্তিও অল্প বিস্তর পরিমাণে আছে।

ব্যবসায়ের জন্য হরিদ্রা মাটি হইতে উঠাইয়া বিশেষ প্রণালীতে শুষ্ক করা হয়। মোটা মূল লম্বালম্বি দ্বিখণ্ডিত করিয়া, রৌদ্রে শুকাইয়া আবার জলে সিদ্ধ করিয়া শুকান হইয়া থাকে। কোন কোন স্থানে জল না দিয়া কাঁচা হরিদ্রা মৃৎপাত্রে ঢাকনি বন্ধ করিয়া মৃদু উত্তাপে শুকাইয়া লওয়া হয়।

হরিদ্রা ভারতের নানাস্থানে উৎপাদিত হইলেও বঙ্গ, মান্দ্রাজ ও পেগুর হরিদ্রা সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং বোম্বাই ও সিন্ধুদেশের হরিদ্রা অপকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয়। বিলাতী ব্যবসায়ীরা চিনে হলুদ অধিক পছন্দ করেন, কিন্তু ভারতীয় হলুদেরও বিলাতী বাজারে কাটতি কম নয়। রপ্তানির জন্য সাধারণতঃ হরিদ্রাকে চূর্ণ করা হয় এবং উহা 'ডবল' থলিয়ায় 'প্যাক্' করিয়া চালান হয়। গোটা হলুদ চালান দিতে হইলে বড়, শক্ত ও গাঢ় বর্ণ হলুদ বাছিয়া লওয়াই ভাল। মান্দ্রাজ ও কলিকাতা বন্দর হলুদ রপ্তানীর অন্যতম কেন্দ্র।

৯। ছোট এলাচ ঃ—মলয় পর্ব্বতই ছোট এলাচের জন্মস্থান। মহীশূর, ত্রিবাঙ্কুর, কুর্গ, কানাড়া, মদুরা প্রভৃতি স্থানের পার্ব্বত্য অঞ্চলে বন্য ছোট এলাচ যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায় এবং চাষও হইয়া থাকে। ছোট এলাচের জাতির সংখ্যাসম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ দৃষ্ট হয়; কিন্তু ব্যবসায়ীর পক্ষে দুইটি জাতিই প্রধান ঃ—(১) মালাবার—ইহার ফল অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, শ্বেতবর্ণ, প্রায় গোল, কোণযুক্ত এবং স্থুল শিরাবিশিষ্ট; (২) মহীশূর—ফল অপেক্ষাকৃত বৃহৎ; পূর্ব্বোক্ত জাতির প্রায় দ্বিগুণ, বর্ত্তুলাকার ও ক্ষুদ্র শিরাবিশিষ্ট। ছোট এলাচের চাষের বিবরণ এস্থলে অনাবশ্যক। তবে সাধারণভাবে এই মাত্র বলিতে পারা যায় যে, বন্য ছোট এলাচের গাছ তিন বৎসরের অধিক বড় হইলে তাহা হইতে ফল লওয়া হয় এবং গাছগুলি ৮।৯ বৎসর জীবিত থাকে। চাষ করিলেও প্রথম ফসল পাইতে প্রায় সাড়ে তিন বৎসর লাগে। গাছ হইতে অর্দ্ধপক্ক

অথবা প্রায়-পক্ক ফল তুলিয়া তাহা বিশেষ বিশেষ প্রথায় শুষ্ক ও বর্ণহীন করা হয়। যে ছোট এলাচ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ও কৃষ্ণবর্ণ বীজবিশিষ্ট, তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত হয়। কিন্তু সাধারণতঃ বাজারে যে কয়েকশ্রেণীর ছোট এলাচ দেখা যায়, সেগুলি প্রায়ই নিকৃষ্টজাতীয় ফল। উৎকৃষ্টজাতীয় এলাচ লইতে হইলে একবারে বড় বড় এলাচ বাগান হইতে লওয়াই ভাল। আজ কাল কতিপয় ইংরাজ এলাচ চাষে মন দিয়াছেন। সমগ্র ভারতে প্রায় ২৭ হাজার মণ এলাচ উৎপাদিত হয় এবং ইহার কিয়দংশ বিদেশে রপ্তানি হয়। কিন্তু সিংহল হইতেও প্রভূত পরিমাণে এলাচ ভারতে আইসে। সুতরাং দেখিতে পাওয়া যায় যে, সর্ব্বদেশ অপেক্ষা ভারতেই ছোট এলাচের খরচ অধিক।

১০। লবঙ্গ ঃ—সাধারণ মসলা হিসাবে লবঙ্গের ব্যবহার সুপরিচিত। লবঙ্গের তৈল গন্ধ দ্রব্য উৎপাদনে ও ঔষধে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। লবঙ্গ তৈলের প্রধান উপাদান ইউজিনোল (Eugenol)। ইহার জীবাণুনাশক শক্তি দারুচিনি তৈলের প্রায় চতুর্গুণ। ইহা অপেক্ষাকৃত ভারী; কিন্তু জলে অধিক মাত্রায় দ্রবণীয়। সেই জন্য সংরক্ষক হিসাবে ইহার অধিক ব্যবহার হইতে পারে। লবঙ্গ প্রধানতঃ জাঞ্জিবার হইতে আসে। বলা বাহুল্য যে, পুষ্পমুকুল বিকশিত হইবার পূর্ব্বেই ইহাকে গাছ হইতে তুলিয়া লইয়া শুষ্ক করা হয়। মান্দ্রাজ প্রদেশে সামান্য পরিমাণে লবঙ্গ উৎপাদিত হয়। জাঞ্জিবারের হিসাবে তাহা কিছুই নয়, কারণ জাঞ্জিবারে লবঙ্গ চাষের জমির পরিমাণ প্রায় দুই লক্ষ বিঘা। উক্ত স্থানে লবঙ্গের দর যথাক্রমে প্রতি ১৭ সের ১০৷৷০—১১।০ ও ৯৸৵—১১৷৷০।

১১। মৌরী ঃ—বঙ্গদেশে মৌরীর চাষ তত অধিক নয়, কিন্তু যুক্তপ্রদেশে অনেক স্থানেই বাগানে মৌরীর চাষ হয়। সাধারণ মসলার হিসাব ব্যতীত মৌরীর আরক একটি ঔষধ ও নানা প্রকার বিলাতী পানীয় দ্রব্য (Cordial) প্রস্তুতে মৌরীর তৈল একটী প্রধান উপাদান। ভারতের মৌরী সিংহল ব্যতীত অন্যান্য দেশে অধিক যাইত না, কিন্তু বিগত যুদ্ধের সময় হইতে ইহা বিলাতী বাজারে যাইতেছে।

১২। জায়ফল ও জয়েত্রী ঃ—নীলগিরি পর্ব্বতের পূর্ব্বাংশে কন্ধর উপত্যকায় সামান্য পরিমাণে জায়ফল চাষ হয় বটে, কিন্তু ব্যবসায়ের জায়ফল প্রধানতঃ মলক্কা দ্বীপ হইতে আসে। পিনাং, সুমাত্রা, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ প্রভৃতি স্থানেও জায়ফল উৎপাদিত হয়। ভারতের জায়ফল আমদানি প্রধানতঃ ষ্টেটসেটল্‌মেণ্টস্

হইতে। কঙ্কণ হইতে ভারতের দক্ষিণাংশে জায়ফলের সমজাতীয় একপ্রকার বৃক্ষ জন্মে। ইহা প্রকৃত জায়ফল নয়, কিন্তু দুষ্ট ব্যবসায়ীরা আসল জায়ফলের সহিত ইহা মিশ্রিত করিয়া দেয়। জয়ৈত্রী জায়ফলের আবরণ মাত্র। জায়ফল হইতে লঘু ও গুরুবীর্য্য দুই প্রকার তৈল পাওয়া যায়। লঘুবীর্য্য তৈল প্রচুর পরিমাণে গন্ধ দ্রব্য উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। আমাদের দেশ অপেক্ষা ইউরোপে মশলা হিসাবে জায়ফলের চলন অধিক। জীবাণুনাশক শক্তির হিসাবে জায়ফলের তৈল তার্পিণ তৈলের সমান।

১৩। মুলকা, মওয়া ঃ—ভারতের অধিকাংশ স্থলেই মুলকার চাষ হয় ও তরুণ অবস্থায় শাকরূপে ব্যবহৃত হয়। মুলকা বীজ সুপরিচিত মসলা। মওয়া তৈল ঔষধে ও সাবানে গন্ধসংযোগে যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। ইহার রপ্তানির মাত্রাও নিতান্ত কম নয়। উৎকর্ষতা হিসাবে বিলাতী বাজারে মুলকা বীজের মুল্য হন্দর প্রতি প্রায় ৫০৲ হইতে ৫৫৲ টাকা।

১৪। গোলমরিচ—দক্ষিণ ভারতের ত্রিবাঙ্কুর ও মালবার প্রদেশের জঙ্গলে বন্য অবস্থায় গোল মরিচের গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। পানের ন্যায় ইহা লতানে গাছ। বঙ্গদেশের মধ্যে যশোহরের উত্তরাংশে সামান্য পরিমাণে গোল মরিচের চাষ হইত শুনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহার কোন সঠিক বিবরণ পাওয়া যায় না। আসামে কিছু গোল মরিচের চাষ হয়, কিন্তু দক্ষিণ ভারতই পুরাকাল হইতে মরিচ উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র। আজ কাল যবদ্বীপ, সুমাত্রা, দক্ষিণ মহাসাগরের হাওয়াই, অ্যাণ্টিচ প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জ, ষ্টেট সেটেলমেণ্টস্‌, সিংহল ও পূর্ব্ব আফ্রিকা প্রভৃতি দেশেও যথেষ্ট মরিচ চাষ হইয়া থাকে এবং শেষোক্ত তিনটি স্থান হইতে ভারতে অনেক মরিচ আমদানি হয়। প্রায় পক্ক অবস্থাতে মরিচ গাছ হইতে তুলিয়া বাছিয়া, সুপক্ক ফলসমূহ জলে ভিজাইয়া রাখা হয়। ৪।৫ দিন ভিজিয়া নরম হইয়া গেলে পায়ে মাড়াইয়া শাঁষ হইতে বীজ পৃথক্ করা হয়। শাঁষবিহীন বীজ শুভ্রবর্ণ; ইহাই শ্বেত মরিচ এবং ইহার মূল্য কাল মরিচের প্রায় দেড়গুণ। শাঁষ সমেত বীজ শুকাইলে কাল ও কুঞ্চিত হইয়া যায়; ইহাই সাধারণ গোল মরিচ। মসলা ও ঔষধার্থে গোলমরিচের ব্যবহার সকলেই জানেন।

উপরোক্ত কয়েকটি মসলা ভারতীয় মসলাবাণিজ্যে প্রধান পণ্য। মসলার বহির্ব্বাণিজ্য সম্বন্ধে আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বিদেশ হইতে যে সমুদয় মসলা আসে, তন্মধ্যে সুপারি ও লবঙ্গ সর্ব্বপ্রধান। এই দুইটি ও

অন্যান্য প্রকারের মসলা লইয়া সর্ব্বসমেত ১৯০ লক্ষ টাকার মসলা ১৯১৭-১৮ সালে ভারতে আমদানি হইয়াছিল। যুদ্ধের পূর্ব্বে ১৯১৩-১৪ সালে ১৭৩ লক্ষ টাকার মসলা আমদানি হয়। সুতরাং আমদানির পরিমাণ ৫ বৎসরে ১৭ লক্ষ টাকা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। রপ্তানির অবস্থা যে আমদানির অনুরূপ, তাহা নিম্নোদ্ধৃত তালিকায় দৃষ্ট হইবে :—

মসলার নাম	মূল্য ১৯১৩-১৪	১৯১৭-১৮
গোলমরিচ	৪৩,৪৯,০০০	৫১,৮৩,০০০
লঙ্কা	২০,১৩,০০০	২৬,৩৬,০০০
আদা	১৮,৪০,০০০	১৬,৭৪,০০০
বিবিধ	৯,৩৯,০০০	১৪,২৭,০০০
মোট	৯১,৪১,০০০	১,০৯,২০,০০০

রপ্তানি ৫ বৎসরে ৯১ লক্ষ টাকা হইতে ১০৯ লক্ষ টাকায় উঠিয়াছে অর্থাৎ মোট ১৮ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু আদার পর্য্যায়ে দেড় লক্ষ টাকার উপর কমিয়া গিয়াছে। মসলার অন্তর্ব্বাণিজ্য সম্বন্ধে সঠিক সংখ্যাদি পাওয়া কঠিন। কিন্তু দেশীয় নৌকা দ্বারা উপকূলপথে ভারতের এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশে যে অনেক মসলার আদান প্রদান হইয়া থাকে, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

কাঁচা মসলার ব্যবসায়ে ভারতীয় ব্যবসায়িগণ তেমন লাভবান্ হইতে পারেন না কেন? তাহার প্রধান কারণ তিনটি :—প্রমতঃ বিক্রয়ের জন্য যে মসলা বাজারে আসে, তাহা অপরিষ্কৃত এবং উৎকর্ষতা হিসাবে তাহার শ্রেণীবিভাগ করা হয় না। ভালমন্দ সমস্তই একসঙ্গে মিশাইয়া বিক্রয় করা হয়; দ্বিতীয় :—বিক্রয়সম্বন্ধে সুবন্দোবস্তের অভাব; কোথাও অতি সামান্য এবং কোথাও সমধিক পরিমাণে মসলা স্বতন্ত্রভাবে বিক্রয় হয়। এক একটি কেন্দ্রস্থল হইতে বিক্রেতা সম্মিলনী দ্বারা বিক্রয় হইলে উচ্চতর মূল্য পাওয়া যাইতে পারে; তৃতীয় :—বর্ত্তমান প্রথায় কাঁচা মসলা বিক্রয় অপেক্ষা তাহা বিভিন্ন শ্রেণীর ক্রেতাগণের ব্যবহারোপযোগী অবস্থায় বিক্রয় করিলে অধিক লাভ পাওয়া যায়। বিলাতী ব্যবসায়িগণ মসলা বাছাই ও চূর্ণ করিবার কলের সাহায্যে এইরূপ উচ্চ শ্রেণীর মসলা প্রস্তুত করেন। বাছাই করা মাল হইতে প্রস্তুত চূর্ণ মসলা বড় বড় খাদ্য, গন্ধদ্রব্য ও ঔষধ প্রস্তুতের কারখানায় সাদরে গৃহীত হয়।

আমাদের দেশেও উপযুক্ত স্থানে এইরূপ কল প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। তৈল প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করা, অবশ্য মসলা ব্যবসায়ে লাভবান্ হওয়ার উৎকৃষ্ট উপায়; কিন্তু তাহাতে আবশ্যকীয় কলকব্জার মূল্য অনেক। বিশিষ্ট ধনী ভিন্ন অপরে এই কাজে হাত দিতে পারেন না।

সর্ব্বশেষে ইহাও বলা আবশ্যক যে, মসলার উৎকর্ষতা অনেকটা চাষের উপর নির্ভর করে। উত্তম জাতি নির্ব্বাচন, উন্নত প্রথায় চাষ এবং উৎকৃষ্ট অবস্থায় বাজারে আনয়ন করা—এ সমুদয় ঠিক ব্যবসায়ীর কাজ না হইলেও ব্যবসায়ীর সহানুভূতি ও সাহায্য ব্যতীত কৃষক তাহার বর্ত্তমান নিঃসহায় অবস্থায় কিছুই করিতে পারে না। সুতরাং এ বিষয়ে সমবেত চেষ্টা আবশ্যক। যে সমুদয় মসলা বিদেশ হইতে আসে, তৎসমুদয়ের চাষ এতদ্দেশে হইতে পারে কি না, তাহাও অনুসন্ধানযোগ্য। সকলেই আশা করেন যে, এমন ব্যবসায় জগতে নবযুগের প্রবর্ত্তক হইবে—এই নবযুগে ভারতীয় বাণিজ্য ও ব্যবসায়ে যাহাতে নব উদ্দীপনা আইসে, সে সম্বন্ধে সকলেরই যত্নবান্ হওয়া আবশ্যক।

শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত।

চিত্রাবতী।

[গল্প]

(১)

"চিত্রাবতি,—আর কত দিন অপেক্ষা করা যায়? তোমার পিতার আদেশ পালন কর।"

"জীবধ্বজ মিথ্যা স্তোক বাক্যে নিজেকে ভ্রান্ত ক'রো না। আমার পিতা আমার বিবাহবিষয়ে কোনই আদেশ দিয়ে যান্ নি।"

"আদেশ দেন্ নি? তিনি তো তোমায় স্বাধীনতা দিয়েছেন।"

"হাঁ,—এ কথা ঠিক্; কিন্তু তা'তে কি বুঝ্‌তে হবে যে, তিনি আমায় তোমাকে—"

"তোমায় তিনি যে স্বাধীনতা দিয়েছেন, তা'তে তুমি আজই আমাকে বিবাহ ক'র্‌তে পার।"

"পারি।—কিন্তু তা' আমি ক'রবো না। জীবনে কারু সঙ্গেই আমার বিবাহ হবে না।"

—হঠাৎ চিত্রাবতী অনেকদূর পর্য্যন্ত বলিয়া ফেলিয়াছে।

বালিকার বাক্যের শেষাংশ জীবধ্বজ বোধ হয় বিশ্বাস করিল না,—সে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া চলিয়া গেল।

চিত্রা পাঠে মনঃসংযোগ করিবার চেষ্টা করিল। সে আজ পিতৃহীনা, অভিভাবকশূন্যা!

যে প্রসঙ্গের এখন কোনরূপ আবশ্যক ছিল না, তাহাই লইয়া আজ এতটা উৎপীড়নে,—জীবধ্বজের উপর চিত্রার যতটুকু শ্রদ্ধা অবশিষ্ট ছিল, সে খুঁজিয়া দেখিল, তাহার প্রায় সমস্তই যেন নিঃশেষিত হইতেছে।

(২)

খৃষ্ট পূর্ব্ব ২৬৯ শকাব্দা। তখন মহারাজ অশোকবর্দ্ধন মগধের রাজা,—ভারত-সম্রাট্।

চিত্রাবতী পাটলিপুত্রের বৌদ্ধ নাগরিক-কন্যা। তাহার পিতা উচ্চপদে

প্রতিষ্ঠিত রাজভক্ত প্রজা ছিলেন ; জীবধ্বজের পিতা ছিলেন—পাটলিপুত্রের ধনবান্ শ্রেষ্ঠী।

এক সময়ে জীবধ্বজের পিতার নিকট চিত্রার পিতা অর্থ-ঋণে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। শ্রেষ্ঠীর মৃত্যুর পর চিত্রাবতীর পিতা সেই ঋণ পরিশোধ করেন,—তার পর তাঁহারও মৃত্যু হয়।

চিত্রার পিতার মৃত্যুর পূর্ব্বে জীবধ্বজ তাঁহার নিকট চিত্রার সহিত বিবাহ-প্রস্তাব করায়, তিনি বলিয়াছিলেন, এ বিষয়ে চিত্রার যেরূপ অভিপ্রায় হইবে, সে তাহাই করিতে পারিবে,—এই মাত্র।

সে আজ পাঁচ বৎসরের কথা।

এখন চিত্রার বয়স ষোড়শ বৎসর,—সে অধ্যয়ন-পরায়ণা ; একটু চিত্র অঙ্কন করিতে ও কবিতা লিখিতে পারে। জীবধ্বজের বয়স বিংশ বৎসর,—সে মধ্যে মধ্যে চিত্রার অধ্যয়ন-কার্য্যে সহায়তা করিত। চিত্রা বাল্য-সহচরের সঙ্গে অবাধে, সহজভাবেই বাক্যালাপ করিত।

সেই বৎসর [খৃঃ পূঃ ২৬৯] মহারাজ অশোকের অভিষেকোৎসব।—তিনি যদিও পিতার মৃত্যুর পরই সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াছিলেন, তথাপি কয়েক বৎসরের জন্য অভিষেকোৎসব স্থগিত ছিল। এবার বিশাল রাজ্যের সমগ্র বৌদ্ধ ও হিন্দু প্রজার আনন্দধ্বনির মধ্যে “রাজ” অভিষেকের উৎসব-কার্য্য সম্পাদিত হইল।

* * * * *

পাটলিপুত্রের রাজপথ দিয়া আজ মহাসমারোহে অভিষেকের ‘শোভাযাত্রা’ চলিয়া গেল।

মহারাজ অশোকের বয়স তখন প্রায় বিংশ বৎসর।

রথে আরূঢ় মহারাজ স্মিতবদনে, শত শত প্রজার সাদর সংবর্দ্ধনা গ্রহণ করিতে করিতে, ধীরভাবে অগ্রসর হইতেছেন।

সহস্র দর্শনপ্রয়াসী প্রজাবৃন্দের মধ্য হইতে চিত্রা দেখিল,—এমনি ধীর গাম্ভীর্য্যের সহিত, এমনি উদার সহাস্য মুখেই বুঝি ধরণীর অধীশ্বর তাঁহার প্রাপ্য শ্রদ্ধা ও ভক্তির অর্ঘ্য অনায়াসে গ্রহণ করিয়া থাকেন।

—তখনও মহারাজ অশোকবর্দ্ধন সম্মিলিত জনশ্রেণীর দিকে মুখ ফিরাইয়া সকলকেই সমভাবে প্রত্যভিবাদন করিতেছিলেন।

* * * *

তার পর দিন চিত্রাবতী নিজ কক্ষে বসিয়া এক চিত্র অঙ্কন করিতেছে। জীবধ্বজ আসিতেই চিত্রা সেই আংশিক অঙ্কিত চিত্র স্থানান্তরে রাখিতেছিল,—কিন্তু জীবধ্বজ তাহা ইতিমধ্যেই দেখিয়া ফেলিয়াছে।

—চিত্র মহারাজ অশোকবর্দ্ধনের

"তুমি মহারাজ অশোককে বিবাহ করবে না কি?—মন্দ কি! এইজন্যই বুঝি—জীবধ্বজের ব্যঙ্গ বাক্য চিত্রার আত্মাভিমানে আঘাত করিল। সে কোন উত্তর দিবার আবশ্যক বোধ করিল না।

জীবধ্বজ ক্রুদ্ধ হইয়া চলিয়া গেল।

রাজপথে যাইতেই সম্মুখে জীবধ্বজ দেখিল, মহারাজ অশোকবর্দ্ধন অশ্বারোহণে সেই দিক্ দিয়া চলিয়া যাইতেছেন,—সুসজ্জিত বীর মূর্ত্তি।

জীবধ্বজ আবার ভ্রূ কুঞ্চিত করিল। চিত্রা তাহা দেখিতে পাইল।

(৩)

আবার একদিন চিত্রার আবাসগৃহসন্নিকটস্থ রাজপথ দিয়া গভীর নিশীথে কাহাদের এক বিবাহের 'শোভাযাত্রা' চলিয়াছে। কত নাগরিক তাহাতে যোগদান করিয়াছে। পাটলিপুত্রের অট্টালিকাশ্রেণীর মধ্য দিয়া বাদ্যোদ্যমে জনসঙ্ঘ চলিয়া গেল,—দীপালোকে সুপ্রশস্ত রাজপথ উদ্ভাসিত হইল।

বিবাহের শোভাযাত্রা চিত্রার মনে আজ কি যেন এক নবভাব জাগাইয়া দিল। কি যেন রুদ্ধ আকাঙ্ক্ষা, কি যেন অতৃপ্ত হৃদয়ের উদ্দাম কম্পন,—সে আজ সর্ব্বপ্রথম অনুভব করিল। কি যেন যুগ-যুগান্তরের লুপ্তপ্রায় স্মৃতি, কত জন্ম-জন্মান্তরের প্রার্থিত সম্পদ, কত সংযত সাধনার অপ্রাপ্ত ঐশ্বর্য্য,—আজ তাহার 'মানব' হৃদয়কে ব্যাকুল করিল! *

—ছিঃ, এও কি ভাবিতে আছে?

যা' কখনও হইবার নয় তা'ও কি ভাবা যায়?

পরদিন প্রভাতে বালিকা কবিতা লিখিতেছিল,—দুই ছত্র ভিন্ন কিছুই লেখা গেল না,—

---

* Tennyson কর্ত্তৃক চিত্রিত Lady of Shallot এর বিষয় চিন্তা করা যাইতে পারে।

—লেখক।

"আজ কিসের নিনাদ তুলি কোলাহল,—
জাগিয়ে দিতেছে হেন,
স্তবধ নিশীথে বিবাহ বাজনা
কাঁপায়ে মেদিনী যেন !

* * * *

হের দুয়ারে তোমার হেলায়ে কিরীট
বর বেশে যমরাজ !
গাঢ় আলিঙ্গনে বেঁধে নাও তারে—
বিবাহ বাসরে আজ !"

—চিত্রা লেখা সমাধা করিয়া চক্ষু ফিরাইতেই দেখিল,—নিকটে জীবধ্বজ।

"তুমি তো বেশ কবিতা লিখ্‌ছ ! তা' যমরাজকে কেন, মহারাজ অশোক-কেও তো সংবাদ দেওয়া যায়।"

—আবার ব্যঙ্গোক্তি !

চিত্রা বলিল,—"তুমি যদি সংযত হ'য়ে কথা ব'লতে না পার, তবে আমায় তোমার সঙ্গে বাক্যালাপ পরিত্যাগ ক'রতে হবে।"

"রাজসঙ্গ প্রত্যাশায় দরিদ্রের সঙ্গ পরিত্যাজ্য বৈ-কি !"

চিত্রার চক্ষুতে অগ্নিশিখা। সে ঘৃণায় মুখ ফিরাইয়া লইল,—বাক্যোত্তর আবার অনাবশ্যক বোধ করিল।

জীবধ্বজ চিত্রার মুখের ভাব দেখিয়া বলিল,—"আমি চ'ল্‌লেম,—কিন্তু এমন সময় আস্‌তে পারে যখন মহারাজ অশোকও আমাকে নিতান্ত অসমর্থ ব্যক্তি ব'লে মনে ক'রতে না পারেন।"

জীবধ্বজের বোধ হইল যেন মহারাজ অশোক তাহাকে তাহার প্রাপ্যস্থান হইতে বিচ্যুত করিতেছেন।

আবার জীবধ্বজের ভ্রূ কুঞ্চিত হইল।

কি এক অজ্ঞাত ত্রাস চিত্রার হৃদয়কে মেঘাচ্ছন্ন করিল।

(৪)

তারপর আরও প্রায় আট বৎসর চলিয়া গিয়াছে।

চিত্রার সঙ্গে জীবধ্বজের আর দেখা হয় নাই। উভয়ের কাহারও এ পর্য্যন্ত বিবাহ হয় নাই।

চিত্রা বৌদ্ধসন্ন্যাসিনী হইবে বলিয়া সুদীর্ঘ আট বৎসর মন স্থির করিবার চেষ্টা করিতেছে; মন স্থির তো আজও হয় নাই।

কেন হয় নাই?

—জীবধ্বজের সেই ভ্রূ কুঞ্চিত মুখ আর মহারাজের প্রসঙ্গে তাহার সেই ভীতি-সঞ্চারক বাক্য চিত্রার পক্ষে আত্ম-দমনচেষ্টায় বাধা দিতেছে।

চিত্রা এখন কি করিবে?

(৫)

খৃষ্ট পূর্ব্ব ২৬১।—এবার কলিঙ্গ-প্রদেশের সঙ্গে মহারাজ অশোক যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন।

কলিঙ্গ-রাজ অশোকের পিতা বিন্দুসারের রাজত্ব-কালে একবার মগধ-বাহিনীর হস্তে পরাজিত হইলেও এখন আবার বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছেন। এবার মহারাজ অশোক স্থির করিয়াছেন, তিনি কলিঙ্গপ্রদেশ মৌর্য্য-সাম্রাজ্যভুক্ত করিবেন।—রাজত্ব বৃদ্ধির জন্য মহারাজের সেই সর্ব্ব-প্রথম যুদ্ধাভিযান।

উভয় পক্ষে সৈন্য সংগৃহীত হইতেছে। যুদ্ধকাল সন্নিকটবর্ত্তী।

জীবধ্বজ পাটলিপুত্র পরিত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে।

তাহার ভ্রূ কুঞ্চিত বদন আবার চিত্রার মনে পড়িল,—আর মনে পড়িল তাহার সেই ভীতি-প্রদ বাক্য,—"মহারাজ অশোকও আমাকে নিতান্ত অসমর্থ ব্যক্তি, ব'লে মনে না ক'রতে পারেন।"

(৬)

সে-দিন মহারাজ অশোক সৈন্য-সংগ্রহ কার্য্য স্বয়ং পরিদর্শন করিতেছিলেন। এক নবীন যুবক আসিয়া অসিহস্তে তাঁহার পদস্পর্শ করিল। সে বলিল,—

"মহারাজ,—আমি আপনার সেনানী-শ্রেণীভুক্ত হ'তে চাই।"

মহারাজ বলিলেন,—"তোমার মূর্ত্তি যেমন কোমল, আমার বোধ হ'চ্ছে তুমি সৈনিকের জীবনের কঠোরতার বিষয়ে অনভিজ্ঞ।"

"মহারাজ, সে-বিষয়ে আমি পরীক্ষিত হ'তে প্রস্তুত আছি। আমার ভরসা আছে, আমি কর্ত্তব্য-সাধন দ্বারাই তার প্রমাণ দিতে পারবো।"

"তুমি যুদ্ধ-কার্য্য কখনো ক'রেছ?"

"না,—কিন্তু আমি অসি ও বর্শা ব্যবহার ক'রতে জানি; আমি অশ্বারোহণ

ও অশ্বচালনায় সক্ষম ; তার পর যে-শিক্ষার আবশ্যক তা, বোধ হয় আমি সেনানীশ্রেণীভুক্ত হ'লেই আমার হ'তে পারবে।"

যুবকের বাক্যে মহারাজ সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—"বেশ তুমি নিযুক্ত হ'লে। আমি তোমার উত্তরে সন্তুষ্ট হ'য়েছি।—তোমার নাম কি ?"

যুবক বিনীত, স্থির ভাবে উত্তর করিল,—"চিত্রবীর্য্য।—আমি আপনার প্রজা।"

(৭)

একমাস চলিয়া গিয়াছে।

কলিঙ্গ-প্রদেশের সঙ্গে ভীষণ যুদ্ধ হইল। উভয় পক্ষে লক্ষাধিক লোক হত ও আহত হইল। মহারাজ অশোক যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছেন,—কিন্তু জনক্ষয়ে তাঁহার হৃদয়ে আঘাত লাগিল।

সে-দিন তিনি যুদ্ধ-জয়ের পর অশ্বপৃষ্ঠে চিন্তিত মনে নিজ শিবিরে ফিরিতে-ছিলেন।

চিত্রবীর্য্য আশ্চর্য্য উৎসাহের সহিত তাঁহার পক্ষে [illegible]রিয়াছেন,—যুদ্ধকালে সর্ব্বদা তাঁহার নিকটেই ছিলেন। এখনও চিত্র[illegible] মহারাজের সঙ্গে-সঙ্গে তাঁহার দক্ষিণ দিকে থাকিয়া শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন।

—সহসা বামদিক্ হইতে অগ্রসর হইয়া এক বিপক্ষীয় অশ্বারোহী মহারাজের বক্ষঃ লক্ষ্য করিয়া বর্শা নিক্ষেপ করিল।

নিমেষের মধ্যে চিত্রবীর্য্য অশ্বারোহণে দক্ষিণ দিক হইতে মহারাজের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন ; আততায়ীর হস্তনিক্ষিপ্ত বর্শা চিত্রবীর্য্যের নাভিদেশ ভেদ করিয়া বিদ্ধ হইল ;—তিনি অশ্ব হইতে পড়িয়া গেলেন।

দুইজন পারিষদ আসিয়া আততায়ী সৈনিককে বন্দী করিল।

মুহূর্ত্তে এই সব ঘটনা হইয়া গেল ; তখনও মহারাজ অশোক যেন সম্পূর্ণ বিষয় সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই।

* * * *

আততায়ী বন্দী হইয়াছে।

মহারাজ ভূপতিত নবীন সৈনিকের দেহ হইতে শত্রু-নিক্ষিপ্ত অস্ত্র স্বহস্তে উত্তোলন করিলেন ; আঘাত-জনিত ক্ষত-পথের রক্তনির্গম নিবারণ করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন।—এ কি সত্য ?

"মহারাজ,—আমি নারী ; আপনার পাটলিপুত্রের প্রজা-কন্যা !"

বন্দী জীবধ্বজ বলিল,—"তুমি চিত্রাবতী !"

তখন চিত্রার মুখে ক্লেশ-চিহ্ন নাই, গৌরবশ্রী !

মহারাজ চক্ষু মুছিলেন। নিমেষে তাঁহার হৃদয়-মধ্যে কি এক প্রভঞ্জন বহিয়া গেল !

*　　　*　　　*　　　*

জীবধ্বজের রাজদ্রোহিতার কারণ চিত্রা উল্লেখ করিতে পারিলেন না। এ-বিষয়ে তাঁহাকে কেহ কিছু জিজ্ঞাসাও করিল না। কিন্তু জীবধ্বজ যে মহারাজের প্রজা, তাহা প্রকাশ হইল এবং রাজদ্রোহীর ন্যায্য বিচারের জন্য সে যথাস্থানে নীত হইল। চিত্রা সে বিষয়ে কিছুই জানিলেন না।

মহারাজ মুমূর্ষু চিত্রার দিকে চক্ষু ফিরাইলেন।

*　　　*　　　*　　　*

তখন চিত্রার নির্ব্বাক্ আরাধনা সফল হইল ; তাঁহার সমস্ত সাধনার আজ সিদ্ধিলাভ হইল।

এই এক মুহূর্ত্তের তুলনায় তাঁহার সমস্ত জীবনকাল যেন তুচ্ছ বোধ হইল,—সহস্র যুগব্যাপী জীবনধারণের পরিবর্ত্তে তিনি আজ তাঁহার পার্থিব জীবনের এই অবসান-মুহূর্ত্তকে অধিকতর মূল্যবান্ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিতেন।

চিত্রার আনন্দোজ্জ্বল চক্ষুদ্বয় মহারাজের প্রভা-মণ্ডিত সজল নয়নের উপর দৃষ্টিবদ্ধ হইয়া চিরতরে প্রস্তরতুল্য স্থির হইল !

(৮)

চিত্রার মৃত্যুর পর যখন যথারীতি তাহার দেহের সৎকার-কার্য্য হইবে, তখন তাঁহার বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে পাওয়া গেল,—বালিকা-হস্ত-অঙ্কিত এক চিত্র আর এক ছিন্ন-পত্রে লিখিত কিয়দংশ।

মহারাজ অশোক দেখিলেন,—চিত্র তাঁহার নিজ মূর্ত্তির।

পত্রের ছিন্নাংশে বালিকা-হস্তে লিখিত রহিয়াছে,—

"হের দুয়ারে তোমার　হেলায়ে কিরীট
　　　বর-বেশে যমরাজ !
গাঢ় আলিঙ্গনে　বেঁধে নাও তারে
　　　—বিবাহ-বাসরে আজ !"

মহারাজ আবার চক্ষু মুছিলেন।

—এবার চিত্রা পার্থিব নয়নে তাহা দেখিতে পাইলেন না; কিন্তু তাঁহার জীবন ও মৃত্যু উভয়ই আজ সার্থক হইল!

*　　*　　*　　*　　*

মহারাজ অশোকের সেই প্রথম ও সেই শেষ যুদ্ধাভিযান।

তাঁহার সুদীর্ঘ রাজত্বকালে তিনি ভারতবর্ষে কত বড় সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা সর্ব্বজনবিদিত, কিন্তু কলিঙ্গ-যুদ্ধের পর আর জীবনে তিনি জনক্ষয়কর যুদ্ধাভিযানে হস্তক্ষেপ করেন নাই।

শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘটক

চট্টগ্রাম।

'অমৃতলিঙ্গম্' শিব।

দাক্ষিণাত্যে কাবেরী উত্তর ভারতের গঙ্গার মত পবিত্রা বলিয়া পূজিতা। কাবেরীতে ভবানীনামে এক নদী দক্ষিণ দিক্ হইতে আসিয়া মিলিয়াছে। এই দুই নদীর সঙ্গম স্থান প্রয়াগের মত একটি তীর্থ স্থান। সঙ্গম স্থানে ভবানী নামক একটি ছোট নগর আছে। এই সঙ্গম মাদ্রাজ হইতে মঙ্গলোর Manglore পথে ২৪৩ মাইল দূরে, ইরোড জংশন Erode gunction হইতে আট মাইল দূরে।

পুরাকালে এই সঙ্গমস্থানে এক ঋষি আশ্রম বাঁধিয়া বাস ও তপস্যা করিতেন। তাঁহার তপস্যায় তুষ্ট হইয়া বিষ্ণু তাঁহাকে বর দিতে আসিলেন। ঋষি অমর হইবার জন্য এক ভাঁড় অমৃত চাহিলেন। বিষ্ণু তাহাই দিলেন। ঋষির আরও কিছু মনস্কামনা ছিল বলিয়া তিনি তখন অমৃত পান করিলেন না। ভাঁড়টি আপনার কুটীরে লুকাইয়া রাখিয়া আবার তপস্যা করিতে বসিলেন। দৈত্যেরা অমৃতের সন্ধান পাইয়া চারজন সাহসী দৈত্যকে অমৃত চুরি করিতে পাঠাইল। ঋষি বিপদ দেখিয়া বিষ্ণুকে অমৃত রক্ষা করিবার জন্য রক্ষী পাঠাইতে অনুরোধ করিলেন। ভক্তবৎসল বিষ্ণু ভক্তের অনুরোধ রক্ষা করিতে বাধ্য হইলেন ও একজন বিষ্ণুদূত পাঠাইয়া দিলেন। বিষ্ণুদূত চারটি চোর দৈত্যকে মারিয়া ফেলিল। দৈত্যেরা অন্য লোক পাঠাইবার চেষ্টা করিল; কিন্তু বিষ্ণুদূতের ভয়ে কেহ আসিতে চাহিল না।

কিছুকাল পরে ঋষির তপস্যা শেষ হইলে তিনি অমৃত পান করিবার জন্য ভাঁড়টি বাহির করিলেন; কিন্তু দেখিলেন যে, ভাঁড়ের অমৃত জমিয়া কঠিন হইয়া গিয়াছে। ভাঁড়টি ভাঙ্গিয়া ঢেলাটি পরীক্ষা করিয়া জানিতে পারিলেন যে, ঢেলা সাধারণ ঢেলা নহে, শিবলিঙ্গরূপ ধারণ করিয়াছে। ঋষি ধ্যান করিয়া জানিতে পারিলেন যে, এই শিবরূপী অমৃত পূজা করিলেই মনুষ্য অজর, অমর হইতে পারে। অতএব তিনি আপন আশ্রমে সেই শিবলিঙ্গ স্থাপন করিলেন ও তাহার নাম 'অমৃতলিঙ্গম্' শিব রাখিলেন। তিনি স্বয়ং ও তাঁহার কয়েকটি বন্ধু ঋষি ঐ 'লিঙ্গম্' পূজা করিয়া নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলেন। কালে, দেশের ভক্তেরা একটি কারু-

কার্য্যময় মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছে। ভক্তেরা বলিয়া থাকেন—বিশ্বাস করিয়া পূজা করিতে পারিলে এখনও নির্ব্বাণ পাওয়া যায়। পাঠক মহাশয়দের মধ্যে যে কেহ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন।

'শ্রীজনার্দ্দনম্'।

একদিন ভক্তশ্রেষ্ঠ নারদ মুনি হরিগুণ গান করিতে করিতে বৈকুণ্ঠে গিয়া উপস্থিত হইলেন। কতক্ষণ সেখানে গান করিবার পর বিষ্ণুকে প্রণাম করিয়া আপন পিতা ব্রহ্মার সহিত দেখা করিতে চলিলেন। কিন্তু তাঁহার মধুর গানে আকৃষ্ট হইয়া বিষ্ণু যে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতেছিলেন, তাহা তিনি জানিতে পারেন নাই। বিষ্ণু এত মোহিত হইয়াছিলেন যে, নারদ কোথায় যাইতেছেন, তাহা লক্ষ্য করেন নাই। কতক্ষণ পরে বিষ্ণু দেখিলেন যে, তিনি নারদের সঙ্গে ব্রহ্মলোকে আসিয়া পড়িয়াছেন, আর ব্রহ্মা তাঁহাকে নারদের পশ্চাতে দেখিয়া গলবস্ত্র হইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতেছেন। বিষ্ণু আপন বিহ্বলতায় লজ্জিত হইয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্দ্ধান করিলেন। নারদ বিষ্ণুর আগমন জানিতে পারেন নাই, তিনি ব্রহ্মাকে প্রণাম করিতে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। ব্রহ্মা, প্রণামান্তে মাথা তুলিয়া দেখেন—সম্মুখে কেবল নারদ, বিষ্ণু নাই। ব্রহ্মলোকে সে সময়ে প্রজাপতিরা ব্রহ্মার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারাও বিষ্ণুকে দেখিতে পান নাই। তাঁহারা এই মাত্র দেখিলেন যে, ব্রহ্মা নারদকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতেছেন। তাঁহারা ব্রহ্মাকে বলিলেন, "বিধি কি কোন নূতন বিধি বিধিবদ্ধ করিলেন? পুত্রকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করা ত পুরাকালের বিধি ছিল না, আর এ নূতন বিধিও ন্যায়সঙ্গত বোধ হইতেছে না।" ব্রহ্মা যখন বিষ্ণুকে দেখিতে পাইতেছেন না, তখন প্রণাম করিবার কারণ কি বলিবেন খুঁজিয়া পাইলেন না, অথচ প্রজাপতিদের বিদ্রূপবাক্যে বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। এই বিরক্তির ফলে প্রজাপতিদের প্রতি এইরূপ অভিশাপ হইল যে, "তোমরা পৃথিবীতে গিয়া মনুষ্য হইয়া জন্মগ্রহণ কর।" নারদ দেখিলেন, তাঁহার বৃদ্ধ পিতা অকারণে প্রজাপতিদের শাপ দিলেন। তিনি মনুষ্যজন্মের

দুঃখ লাঘব করিবার জন্য প্রজাপতিদের বলিলেন—"তোমরা ভয় করিও না, পৃথিবীতে যাও, আমি এমন একটি স্থান দেখাইয়া দিব, যেখানে বসিয়া তপস্যা করিলে অতি শীঘ্রই স্বর্গে ফিরিয়া আসিতে পারিবে।"

প্রজাপতিরা ভারতে জন্মগ্রহণ করিলে একদিন নারদ আপনার বল্কলখানি আকাশ হইতে ফেলিয়া সঙ্কেত করিলেন যে, বল্কল যেখানে পড়িবে, সেইটিই তপস্যা করিবার সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্থান। বল্কলখানি যেখানে পড়িয়াছিল, সেইখানে প্রজাপতিরা জনার্দ্দনমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন, ও অল্পকাল পরে মুক্ত হইয়া স্বর্গারোহণ করিলেন। সেই স্থানকে এখনও 'বল্কল' বলে ও দূর-দেশান্তরের লোকেরা সেই শ্রীজনার্দ্দনমূর্ত্তি পূজা করিতে আসে। লোকমুখে নগরের নামটি এখন বিকৃত হইয়া বার্কলে Varkalay হইয়া পড়িয়াছে। স্থানটি পশ্চিম সমুদ্রতীরে ত্রিবাঙ্কুর Trivancore রাজ্য মধ্যে। এখন সেখানে রেল হইয়াছে, মাদ্রাজ হইতে ৫৬৮ মাইল, কুইলোন Kuilon হইতে ১৮ ও ত্রিবান্দ্রম Trivandrum হইতে ২৩ মাইল। পবিত্রতায় এই স্থান উত্তর ভারতের কাশী-তুল্য, গিরিশৃঙ্গে শ্রীজনার্দ্দন মন্দির, গিরির পাদদেশে চক্রতীর্থ। ভারতের অনেক বৈষ্ণব এই পবিত্র মন্দির দর্শন করিতে গিয়া থাকেন।

মতান্তরে, প্রাচীন মন্দির এখন নাই। বহুকাল পূর্ব্বে সমুদ্রে ডুবিয়া গিয়াছে। পরে আবার সেই স্থান জাগিয়া উঠিয়াছে; কিন্তু কেহ স্থানমাহাত্ম্য সম্বন্ধে কিছুই জানিত না। এক সময়ে পাণ্ড্য দেশের এক রাজা ব্রহ্মহত্যা করিয়াছিলেন। পাপ তাঁহার স্কন্ধে সকল সময়ে চাপিয়া থাকিত। তিনি বহুকাল পরে একবার এই প্রদেশে আসিয়াই দেখিলেন—কোন কারণে তাঁহার পাপ দূর হইয়া গিয়াছে। তিনি আনন্দিত হইয়া সেইখানেই রাত্রি যাপন করিলেন। রাত্রে স্বপ্নে বিষ্ণু জানাইলেন যে, প্রাতে সমুদ্রের যে স্থানে একটি পুষ্প ভাসিতে দেখিবেন, সেইখানে প্রাচীন শ্রীজনার্দ্দনের শ্রীবিগ্রহ আছে, তাহাকে উদ্ধার করিয়া উপযুক্ত স্থানে স্থাপন করুন। রাজা প্রাতে পুষ্পসঙ্কেত মত বিগ্রহ পাইলেন; কিন্তু তাহার একখানি হস্ত ভাঙ্গা। তিনি সুবর্ণ দিয়া হাত জুড়িয়া বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা আরম্ভ করিলেন। কিন্তু শুভমুহূর্ত্তে সকলেই অচৈতন্য হইয়া পড়িল। স্বয়ং ব্রহ্মা আসিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়া গেলেন। রাজা স্বপ্নে জানিতে পারিয়া আধুনিক মন্দির নির্ম্মাণ করিলেন ও মন্দিরের সেবার জন্য কয়েকখানি গ্রাম দান করিলেন। আজ কাল ত্রিবঙ্কুর রাজসরকার মন্দিরের ভার লইয়াছেন।

'শুচীন্দ্রম্' বা ইন্দ্রমোক্ষণ তীর্থ।

পুরাকালে অত্রিনামে এক ঋষি ছিলেন। তিনি আপন ধর্ম্মপত্নী অনসূয়াকে লইয়া একস্থানে আশ্রম স্থাপন করিয়া তপস্যা করিতেন। একদিন ত্রিমূর্ত্তি—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব—সতীশ্রেষ্ঠ অনসূয়ার সতীত্ব পরীক্ষা করিবার প্রয়াসী হইলেন। তাঁহারা তিনটি পথিক ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করিয়া মধ্যাহ্নের পূর্ব্বে ঋষির আশ্রমে দেখা দিলেন। তখন অত্রি আশ্রমে ছিলেন না। ঋষিপত্নী অভ্যাগতদের পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া সৎকার করিলেন; তাঁহারা বিশ্রাম করিলে মধ্যাহ্ন সমাগত দেখিয়া ঋষিপত্নী তাঁহাদের অন্নগ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন ও অতি শুদ্ধাচারে নানা ভোজ্য প্রস্তুত করিয়া তাঁহাদের আসন গ্রহণ করিতে বলিলেন। ব্রাহ্মণরূপী দেবতারা আসনে উপবিষ্ট হইয়া বলিলেন,—"আমরা তিন জনেই এক ব্রত গ্রহণ করিয়াছি, তাহার নিয়ম এই যে, যে কোন ব্যক্তি আমাদের ভোজ্য পরিবেশন করিবে, তাহাকে আমাদের সম্মুখে দিগম্বর-বেশে পরিবেশন করিতে হইবে। ভো ঋষিপত্নি! আমরা এক্ষণে ক্ষুধায় কাতর হইয়াছি, আমাদের সম্মুখে দিগম্বরবেশে পরিবেশন করিয়া আমাদের ব্রতরক্ষা ও অতিথিসৎকার কর।" অনসূয়া ব্রতের অদ্ভুত নিয়ম শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন। পুরুষের সম্মুখে দিগম্বরবেশে পরিবেশন কিরূপে করিতে পারেন? না করিলে অতিথি-নারায়ণ বিমুখ হয়েন, তাঁহার ব্রত ভঙ্গ হয় ও গৃহস্থাশ্রমে পাপ স্পর্শ করে! এ অবস্থায় কি করা উচিত ভাবিতে লাগিলেন। অতিথিরা অন্নের জন্য ব্যস্ত হইতে লাগিলেন। অন্য উপায় না পাইয়া তিনি হস্তে একটু জল লইয়া বলিলেন—"আমি যদি পাতিব্রত্য ধর্ম্ম পালন করিয়া থাকি, তবে সেই পুণ্যে আমার অতিথি তিনটি সদ্যোজাত শিশুর মত অবস্থা ও অজ্ঞানতা প্রাপ্ত হউক।" এই বলিয়া তিনি অতিথিদের গায়ে জল ছিটাইয়া দিলেন। অতিথিরা তৎক্ষণাৎ সদ্যোজাত শিশুর মত আসনে শুইয়া হাত-পা ছুড়িয়া ক্রীড়া করিতে লাগিলেন ও ক্ষুধায় কাতর হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তখন ঋষিপত্নী তাঁহাদের ব্রতের নিয়ম রক্ষা করিয়া দিগম্বরীবেশে দুগ্ধপান করাইয়া তৃপ্ত করিলেন। পরে আপনার সাংসারিক

কাজ শেষ করিয়া এই শিশু তিনটির সহিত খেলা করিয়া অপত্যহীন মাতার পুত্রের সাধ মিটাইতে লাগিলেন। এইরূপে, তিনটি শিশুই তাঁহার আশ্রমে প্রতিপালিত হইতে লাগিল। তাঁহাদের আর পূর্ব্বাবস্থায় প্রত্যাবর্ত্তনের ক্ষমতা রহিল না।

ত্রিমূর্ত্তির অর্দ্ধাঙ্গিনীরা—সরস্বতী, লক্ষ্মী ও পার্ব্বতী—কর্ত্তাদের যথাসময়ে গৃহে প্রত্যাগমন করিতে না দেখিয়া নানা প্রকার ভয় ও চিন্তায় কাতর হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা ত্রিভুবন খুঁজিতে খুঁজিতে অত্রির আশ্রমে আপনাদের স্বামীদিগকে দুগ্ধপোষ্য শিশু অবস্থায় চিনিতে পারিয়া চিন্তিত হইলেন ও কিরূপে তাঁহারা পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারেন, তাহার উপায় ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহারা আপন আপন স্বামীর উদ্ধার কামনায় তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। কিছুকাল পরে তাঁহাদের তপস্যার প্রভাবে ভগবান্ দেবাদিদেব মহাদেবের রূপ ধারণ করিয়া দেখা দিলেন। তাঁহার বরে ত্রিমূর্ত্তি আপন পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইলেন। অনসূয়া তাঁহাদের চিনিতে পারিয়া লজ্জিতা হইলেন। তাঁহাদের পরীক্ষাতে অনসূয়া উত্তীর্ণা হইয়াছেন বলিয়া তাঁহারা তুষ্ট হইয়া অনসূয়াকে বর দিতে চাহিলেন। অনসূয়া বলিলেন, আপনারা যখন তুষ্ট হইয়া বর দিতে চাহিতেছেন, তখন আমাকে এমন এক পুত্রলাভের বর দিন, যাহাতে আপনাদের তিনজনের উৎকৃষ্ট গুণগুলি থাকে। তাঁহাদের বরে অনসূয়ার ঐরূপ এক পুত্র হইল, তাহার নাম দত্তাত্রেয় রাখা হইল। দত্তাত্রেয়ের ছবিতে তিনমুণ্ড ও ছয় ভুজ আঁকা হয়।

অত্রির আশ্রমে এখনও ত্রিমূর্ত্তির পূজা হইয়া থাকে। আশ্রমটি এখন তৃণ ও পত্রের কুটীর নহে, সুন্দর কারুকার্য্যময় প্রস্তর-মন্দির।

গুরুপত্নীগমনাপরাধে ইন্দ্র যখন গৌতমমুনির শাপে নরকযন্ত্রণার তাড়নায় ত্রিলোক ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন ও তাঁহার পাপ ছায়ার ন্যায় সর্ব্বদা তাঁহার অনুগমন করিতেছিল, তখন এক দিন এই আশ্রমের কাছে আসিতেই দেখিলেন যে, তাঁহার পাপ তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছে। ইন্দ্র এই স্থান-মাহাত্ম্য দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত ও আনন্দিত হইলেন। তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার জন্য এখানে দেবাদিদেব মহাদেবের স্থাণুমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া পূজা করিলেন। ভক্তেরা বলিয়া থাকেন যে, ইন্দ্র এখনও প্রতিরাত্রে ঐ স্থাণুমূর্ত্তি পূজা করিতে আসিয়া থাকেন। ইন্দ্র শুচি হইয়াছিলেন বলিয়া এই ফলপ্রদ পবিত্র স্থান "শুচীন্দ্রম্ বা

ইন্দ্রমোক্ষণ তীর্থ" বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে। ইহা ভারতের দক্ষিণতম স্থানে কন্যা-কুমারীর মন্দির হইতে এক যোজন—প্রায় আট মাইল—উত্তর-পশ্চিমে স্থিত।

কন্যা-কুমারীর মন্দিরে পার্ব্বতী, কুমারী-কন্যামূর্ত্তিতে পূজিতা হন। এখানে প্রবাদ এই যে, এককালে স্থাণুমূর্ত্তি শিবের সহিত এই কন্যারূপিণী পার্ব্বতীর বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছিল। বিবাহের দিন স্থির, হইয়া গিয়াছিল, পরে কোন কারণে বিবাহ ভাঙ্গিয়া গেল। বিবাহের জন্য প্রয়োজনীয় সংগৃহীত দ্রব্যগুলি, প্রয়োজন না থাকায়, কন্যা-কুমারীর মন্দিরের চারিদিকে ছড়াইয়া ফেলিয়া দেওয়া হইল। তাহার প্রমাণ, কন্যা-কুমারীর মন্দিরের চারিদিকে বালির উপর হরিদ্রাচূর্ণ, কুঙ্কুম-মাখা অক্ষত (তণ্ডুল) ও কুঙ্কুমচূর্ণ ছড়ান আছে। এখনও অল্প পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। যাত্রীরা সন্ধান পাইলে কিছু কিছু সংগ্রহ করিয়া আনে। অবিশ্বাসীরা বলে, সেগুলি রক্ত বা পীতবর্ণ বালুকা মাত্র (Coloued Sand)।

মণিপুর ও গোকর্ণ।

বঙ্গদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়মধ্যে অনেকে বিশ্বাস করেন যে, তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন পূর্ব্ববঙ্গে গিয়া মণিপুরে রাজকুমারী চিত্রাঙ্গদাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। কিন্তু মহাভারতে (আদি ২১৫ অধ্যায়) স্পষ্ট উল্লেখ আছে—"অর্জ্জুন বঙ্গদেশ ঘুরিয়া যখন দাক্ষিণাত্যে প্রবেশ করিলেন, তখন সমভিব্যাহারী ব্রাহ্মণেরা কলিঙ্গ রাজ্যের দ্বারদেশ পর্য্যন্ত আসিয়া তাঁহার অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় অত্যল্পমাত্র সহায়সম্পন্ন হইয়া সাগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি কলিঙ্গদেশ ও তত্রত্য পুণ্যতীর্থ সকল অতিক্রম করিয়া সুরম্য হর্ম্ম্যাবলী অবলোকন করিতে করিতে চলিলেন। মহাবাহু অর্জ্জুন তাপসগণ-পরিশোভিত মহেন্দ্র পর্ব্বত নিরীক্ষণ করিয়া মহাসাগরের উপকূলমার্গে মণিপুরে গমন করিলেন।" এই মহেন্দ্র পর্ব্বত আধুনিক ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের পূর্ব্ব সীমাতে, ভূমধ্যরেখা হইতে ৮ ডিগ্রি ২৩' উত্তর ও গ্রীনিচ হইতে ৭৭ ডিগ্রি ৩২' পূর্ব্বে

৫৩১০ ফুট উচ্চ গিরিশৃঙ্গ। ইহা পরশুরামের স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। অর্জ্জুন যখন বঙ্গদেশ হইতে উড়িষ্যা, গঞ্জাম, গোদাবরী কৃষ্ণা জেলা পার হইয়া তামিল দেশ অতিক্রম করিয়া মহেন্দ্র পর্ব্বত দেখিয়া সমুদ্রতীরের দিকে মণিপুরে গমন করিয়াছিলেন, তখন মণিপুর পূর্ব্ববঙ্গে হইতে পারে না। মহেন্দ্র পর্ব্বত ও অরব সাগরের মধ্যে কোন স্থানে প্রাচীন মণিপুরের ধ্বংসাবশেষ থাকিবার কথা। আধুনিক মহীশূর রাজ্যের উত্তর পশ্চিম অংশে চমরাজনগর নামক একটি নগর আছে। তাহার কাছে প্রাচীন মণিপুরের ধ্বংসাবশেষ স্থানীয় অধিবাসীরা যাত্রীদের দেখায়। এই মণিপুরে তিন বৎসর বাস করিয়া বভ্রুবাহনের জন্মের পর অর্জ্জুন গোকর্ণ তীর্থে যাত্রা করিয়াছিলেন। গোকর্ণ আধুনিক গোয়া Goaর কাছে পশ্চিম সমুদ্রতটে। রেলে মারমাগাঁও Marmagao পর্য্যন্ত যাওয়া যায়। ইহাই গোয়া রেলের শেষ সীমা। মারমাগাঁও হইতে ২।৩ মাইল দূরে সমুদ্র। আধুনিক গোকর্ণ তীর্থস্থান সমুদ্রতট হইতে প্রায় দুই মাইল দূরে এক দ্বীপে। সেখানে মহাবলেশ্বর শিব আছেন। এককালে এই মন্দির ভারত ভূমিতে ছিল, কালে ভারত ভূমি ও তীর্থস্থানের মধ্যে খাড়ি পড়িয়াছে।

প্রবাদ আছে, যে লঙ্কেশ্বর রাবণ একবার শিবের উপাসনা করিয়া তাঁহাকে তুষ্ট করিলে তিনি বর দিতে চাহিলেন। রাবণ নিত্যপূজা করিবার জন্য শিবের আত্মলিঙ্গ চাহিলেন। ভোলানাথ ভবিষ্যৎ বিবেচনা না করিয়াই প্রার্থনা মত দান করিলেন। রাবণ যখন এই লিঙ্গ লইয়া আপন দেশে যাইতেছিলেন, তখন নারদ বিষ্ণুকে সংবাদ দিলেন ও বলিলেন—রাবণ যদি এই আত্মলিঙ্গ আপনার বাটী লইয়া যায় ও ইহার নিত্যপূজা করে বা পূজা করিয়া দেবতাদের জয় করিতে যাত্রা করে, তবে দেবতারা নিশ্চয় লাঞ্ছিত ও পরাজিত হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। চক্রী বিষ্ণু গণেশকে এক নির্ব্বোধ বালব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণ সাজাইয়া দিলেন ও বিষ্ণুমায়ায় সেই সময়ে সূর্য্যকে আচ্ছাদিত করিলেন। তৃতীয় প্রহর বেলায় রাবণের সূর্য্যাস্ত ভ্রম হইল; কিন্তু রাবণ শিবলিঙ্গ হাতে করিয়া অস্তগামী সূর্য্যকে অর্ঘ্যদান ও সন্ধ্যা বন্দনা করিতে পারেন না, অথচ ইহাও জানিতেন যে, আত্মলিঙ্গ একবার মাটীতে রাখিলে আর তুলিতে পারিবেন না। তিনি যখন উপায় চিন্তা করিতেছিলেন, তখন সম্মুখে বালব্রহ্মচারীরূপী গণেশকে দেখিতে পাইলেন। তিনি গণেশকে অল্পক্ষণ লিঙ্গটি হাতে করিয়া দাঁড়াইতে অনুরোধ করিলেন ও এই কার্য্যের জন্য নানা ধনরত্ন দিতে স্বীকার করিলেন। গণেশ বলিলেন, তুমি যখন এই সামান্য কার্য্যের জন্য এত ধন দিতে চাহিতেছ, তখন নিশ্চয় এটা মন্দ কার্য্য

হইবে, আমি করিব না। পরে রাবণের কাকুতি-মিনতিতে গণেশ বলিলেন, আমি ঐ ভারি পাথরখানা লইয়া বেশীক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিব না। আমি তোমাকে তিনবার ডাকিব। তৃতীয় ডাকে না আসিলে মাটিতে রাখিয়া দিব। রাবণ সন্ধ্যা কাল উত্তীর্ণ হয় দেখিয়া তাহাতেই স্বীকৃত হইলেন। গণেশের হাতে লিঙ্গ দিয়া সমুদ্রতীরে উপাসনা করিতে গেলেন। গণেশের উদ্দেশ্য ভিন্ন ছিল। তিনি রাবণকে তাড়াতাড়ি উপাসনা শেষ করিয়া আসিতে দেখিয়া তিনবার ডাকিলেন ও রাবণ নিকটে আসিবার পূর্ব্বেই লিঙ্গটী মাটিতে রাখিয়া দিলেন। ইহাতে রাবণ ক্রুদ্ধ হইলেন। রাবণকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া, গণেশ বলিলেন, "তুমি রাগ করিতেছ কেন? না হয় আমাকে যাহা দিবে বলিয়াছ, তাহা দিও না।" মহাবল রাবণ প্রাণপণ চেষ্টাতেও আর সে লিঙ্গ তুলিতে পারিলেন না। তাঁহার টানাটানিতে লিঙ্গটি মোচড় খাইয়া দেখিতে গাভীর কর্ণের মত হইয়া গেল। সেই জন্য তাহাকে 'গোকর্ণ' বলে। নতুবা শিবের নাম মহাবলেশ্বর শিব। শিবরাত্রির সময়ে দূর দেশান্তরের ভক্তেরা পূজা করিতে আসিয়া থাকে।

অর্জ্জুনের শ্বশুরের দেশে মহীশুর রাজ্য মধ্যে আর এক অদ্ভুত দ্রব্য আছে। ভিমন কাট্টি Bhimankatte নামক এক মঠ আছে। মঠ ও গ্রামের আধুনিক নাম তীর্থহল্লি Tirttahall.। সেই মঠে একখানি অতি প্রাচীন কালের দান-পত্র আছে। দানপত্রের মর্ম্ম এই যে:—যুধিষ্ঠিরাব্দ ৮৯ সালে দাতার প্রপিতা-মহ মহারাজ যুধিষ্ঠির যে স্থানে (সম্ভবত বন ভ্রমণ কালে) বিশ্রাম করিয়াছিলেন, তুঙ্গভদ্রা নদীতীরে সেই স্থানে বসিয়া মহারাজ জন্মেজয় দান করিলেন।

মহীশূর দেশে প্রবাদ যে, সর্পযজ্ঞ আধুনিক কাডুর Kadur জেলান্তর্গত হিরে মুগলুর Hiremugalur নামক স্থানে হইয়াছিল। আধুনিক শিমোগা Shimaga জেলায় তিনটি অগ্রহারম্ (১) (গজ, কুপ্পগাঙ্গে ও বেগুর) আছে। তাহাদের তিন খানি তাম্রলিপি আছে। ইহার একখানি কিছু পরিষ্কার, অন্য দুই খানি পড়া যায় না। যে লিপি অল্প পড়িতে পারা যায়, তাহাতে এইরূপ লেখা আছে:—"সর্পযজ্ঞের হোতাদের দক্ষিণাস্বরূপ হস্তিনাপুরের সম্রাট্ সোম বংশীয়, পাণ্ডব কুলোদ্ভব মহারাজ পরীক্ষিতের পুত্র, যাঁহার ধ্বজে সুবর্ণবরাহ

(১) কেবল ব্রাহ্মণদের গ্রামকে 'অগ্রহারম্' বলে। এ গ্রামে নীচজাতীয় লোক প্রবেশ করিতে পায় না; প্রবেশ করিলে সে স্থান ধুইয়া শুদ্ধ করিতে হয়। কোন আচ্ছাদিত স্থানে বা ঘরে নীচ জাতীয় অস্পৃশ্য পঞ্চম (পারিয়া বা পঞ্চম বর্ণ) প্রবেশ করিলে সে ঘর পোড়াইয়া ফেলা হয়।

চিত্রিত, দক্ষিণ বিজয়কালে দেবতা হরিহরকে সাক্ষী করিয়া তুঙ্গভদ্রা ও হরিদ্রা-নদীর সঙ্গমস্থলে এই তিনখানি 'অগ্রহারম্' দান করিতেছেন।'

বিশেষজ্ঞরা এই লিপির সত্যতাসম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া অনেক তর্ক বিতর্ক করিয়াছিলেন।

শ্রীঅমৃতলাল শীল।

হায়দ্রাবাদের প্রাচীন কালের স্মৃতি।

———:০:———

দক্ষিণ হায়দ্রাবাদের "লঙ্গর" একটি দেখিবার বস্তু। তবে দিন দিন তাহার বিশেষত্ব লোপ পাইতেছে। এখন ইহা ৫ই মহরমের অপরাহ্নে নিজাম গবর্মেণ্টের সিটিপুলিস, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সেনা ও জায়গীরদারদের ক্ষুদ্র সেনার শোভাযাত্রা মাত্র। পূর্ব্বে যে ইহা ছাড়া আর কিছু ছিল তাহা নহে, ছিল ইহাই, তবে প্রাচীনকালের কোতওয়াল বা কোটাল ও অশিক্ষিত সেনাদল এখন আর নাই। সে কালে এই দুইটির যে দৃশ্য দেখিয়াছি, তাহা এখনকার নবীন পাঠক সহজে বিশ্বাস করিতে পারেন না।

হায়দ্রাবাদের নগর-পুলীশের প্রধানকে এখনও কোতওয়াল বলে। কিন্তু এখন তাঁহাকে দেখিয়া প্রাচীনকালের কোটাল যে কি বস্তু ছিলেন, তাহা কল্পনা করাও অসম্ভব। এখনকার কোতওয়ালকে ইংরেজি নামের বলিতে অনুকরণে বলিতে গেলে হয়—সিটি-পুলীশ-কমিশনার মাত্র। কিন্তু প্রাচীনকালের কোতওয়া-লের ক্ষমতা দেশের রাজার মত বা ততোধিক ছিল। চিত্রগুপ্তকে লইয়া যমরাজ যেরূপ সভা করিয়া বসেন, যমদূতেরা পাপীদের ধরিয়া আনিলে তাহাদের বিচার করিয়া শাস্তি দেন, প্রাচীনকালের কোটালও ঠিক সেইরূপ করিতেন। তাঁহার বিস্তৃত সভার একদিকে চিত্রগুপ্তের বংশধর খাতাপত্র সাজাইয়া বসিত, অন্য একদিকে অভিযুক্ত ও অপরাধীরা পিঠমোড়া বাঁধা বা হাত-পা বাঁধা পড়িয়া থাকিত; অন্য একদিকে বিস্তৃত দালানে, আঙ্গিনাতে ছায়াতে বা রৌদ্রে যন্ত্রণা দিবার নানাপ্রকার যন্ত্র সজ্জিত থাকিত। প্রায় প্রত্যেক যন্ত্রেই কোন না কোন ভাগ্যহীন অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে দেখা যাইত। কোন কোন যন্ত্রে সংলগ্ন মৃতদেহটী পড়িয়া আছে, অপরাধী কোটালকে ফাঁকি দিয়া স্বর্গে চলিয়া গিয়াছে। তাহাদের কাতরোক্তিতে পাষাণ হৃদয়ও দ্রব হইত, কিন্তু কোটাল ও তাঁহার চরদের হৃদয় বলিয়া কোন বস্তু থাকিত না। অতএব দ্রব হইবার সম্ভাবনা বা

ভয় ছিল না। কোটালের চরেরা যাহাদের ধরিয়া আনিত, তাহাদের সহিত সভ্য বা শিক্ষিত সাক্ষী ও প্রমাণ আনিত। কোটাল আধুনিক ভাষায় কেবল পুলীশ ছিলেন না ; তিনি একাধারে জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, হাইকোর্ট সবই। তাঁহার আজ্ঞার বিরুদ্ধে আপীল একমাত্র ভগবান্ ছাড়া আর কাহারও কাছে চলিত না। ভগবান্ বোধ হয়, কোটালের ভয়ে আপীল শুনিতেন না বা শুনিবার অবসর পাইতেন না। কেন না কোটালের সম্মুখে নীত হইলে তৎক্ষণাৎ বিচার হইত ও তৎক্ষণাৎ শাস্তি দেওয়া হইত। সম্মুখে সারি সারি লোক যন্ত্রণাদায়ক নানা কলে পীড়িত হইতেছে দেখিয়াও তাঁহার মনে দয়া, মায়া, ঘৃণা, ভয়, ইহকাল পরকাল ইত্যাদি কোন প্রকারের ভাব উদয় হইত না। তেমন বড় অপরাধী হইলে তাহার শিরশ্ছেদের আজ্ঞা হইত। সম্মুখে আঙ্গিনাতে জল্লাদ তৎক্ষণাৎ আজ্ঞা পালন করিত। সভাভঙ্গ হইলে তবে মৃত দেহ তোলা হইত। যতক্ষণ সভা ও বিচারকার্য্য চলিত, ততক্ষণ রক্তাক্ত কলেবর ও মুণ্ড সম্মুখে পড়িয়া থাকিত। ঝাঁকে ঝাঁকে মাছি, পোকা, মাকড়, কাক, চীল ইত্যাদি রক্তের ও মৃতদেহের সদ্ব্যবহার করিত। আজ্ঞা না পাইলে মৃত ব্যক্তির আত্মীয়েরাও সংকারার্থ দেহ ছুঁইতে পাইত না।

জল্লাদ প্রায় হবশী নিগ্রো ; অন্য জাতীয় লোকেরা প্রায় এ কার্য্য স্বীকার করিত না বা এখনও করে না। নিজাম রাজ্যে এখনও শিরশ্ছেদপ্রথা প্রচলিত আছে। তবে আদালত প্রায় মৃত্যুদণ্ড ব্যবস্থা করেন না, হত্যাকারীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগ করিতে হয়। জল্লাদের কাছে তাহার স্ত্রীকে উপস্থিত থাকিতে হয়। অপরাধীর শিরশ্ছেদ করিলে প্রায়ই জল্লাদের এক প্রকার মানসিক বিকার হয়। এরূপ বিকারকে "খুনচাপা" বলে, তখন সে সম্মুখে যাহাকে পায়, তাহাকেই আক্রমণ করে। সেই জন্য জল্লাদ আপন কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিতে অগ্রসর হইলেই তাহার স্ত্রী ও চার পাঁচজন বলবান ব্যক্তি সতর্ক থাকে। মাথাকাটা হইলেই তাহার স্ত্রী খড়্গ কাড়িয়া লয়। যদি বিকার উপস্থিত হয়, তবে রমণী বলে পারিয়া ওঠে না। যে বলবান্ ব্যক্তিরা নিকটে থাকে, তাহারা খড়্গ কাড়িয়া জল্লাদকে বাঁধিয়া ফেলে। অল্পক্ষণ পরে বিকারের ঘোর কাটিয়া যায়। কোতওয়াল-সভাতে পূর্ব্বে চারজন জল্লাদ থাকিত। এখন দুইজন মাত্র থাকে। তাহাদেরও গত দশ বৎসর মধ্যে কোন কার্য্য করিতে হয় নাই।

শিরশ্ছেদ করিবার সময়ে অপরাধীকে প্রথমে পিঠ মোড়া করিয়া বাঁধে, পরে হাঁটু গাড়িয়া বসাইয়া তাহার কটিদেশ পিছনে একটা গাছের গুঁড়িতে

বাঁধিয়া দেয়। পরে মাথা ও দড়িতে ফাঁদ দিয়া সম্মুখের দিকে একজন টানিয়া ধরে, তখন গলাটা যত লম্বা হইতে পারে হইয়া যায়। এই সময়ে কোটালের আজ্ঞা পাইয়া জল্লাদ এক কোপে গলা কাটিয়া ফেলে। মাথা কাটিতে সাধারণ তরবারি ব্যবহার করা হয় না। জল্লাদের খড়্গ ১৮।২০ ইঞ্চ ফলক, সম্মুখের অংশ চ্যাপ্টা ও প্রায় আড়াই সের ভারী, ক্ষুরের মত তীক্ষ্ণধার। আঘাত করিবারও কৌশল আছে। জল্লাদকে অনেক দিন ধরিয়া এই বিদ্যার সাধনা করিতে হয়। তাহার শারীরিক বল ও প্রকৃতিদত্ত স্নায়বিক বল খুব বেশী থাকা একান্ত প্রয়োজনীয়। তাহার একটু হাত কাঁপিলে যেমন অপরাধীর কষ্ট, সেইরূপ তাহার নিজের মস্তিস্ক বিকার হওয়া সম্ভব। স্নায়ু দুর্ব্বল হইলে এই খুনচাপা বিকার বহুকাল উন্মত্ততারূপে থাকিয়া যায়। এ কাজ এত কঠিন ও ইহার উপযুক্ত এত অল্প লোক পাওয়া যায় যে, একজন জল্লাদ কর্ম্মত্যাগ করিলে সময়ে সময়ে বহুকাল লোক পাওয়া যায় না। প্রাচীনকালে জল্লাদ অভাবে আসামীকে মুক্তি দিতে বাধ্য হইয়ার গল্পও শুনিয়াছি।

আমি যখন সর্ব্ব প্রথম শোভাযাত্রায় অশিক্ষিত সেনা দেখিয়াছিলাম, তখন সেনানায়ক একটি প্রকাণ্ড অশ্বপৃষ্ঠে ২০।২৫ ফুট লম্বা চাবুক লইয়া বসিতেন, ও আপনার অধীনস্থ সৈনিকদের একস্থানে দাঁড় করাইয়া তাহাদের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। মেষরক্ষক যেমন আপন মেষগুলিকে এক কেন্দ্রে রাখিয়া তাহাদের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়, সেইরূপ তাহাদের রক্ষা করিতেন। সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে হইত—যাহাতে কোন সৈনিক দল ছাড়িয়া বাহিরে না যায়। কেহ একটু আগে পাছে হইলেই তাঁহার দীর্ঘ চাবুক তাহাকে সতর্ক করিয়া দিত। এ দৃশ্য এখন আর দেখিতে পাওয়া যায় না। এখনকার অশিক্ষিত ও শিক্ষিত সৈনিকে বেশী প্রভেদ নাই। তাহারা কেবল নামে অশিক্ষিত ও তাহাদের অস্ত্রগুলি অল্প মূল্যের। তখনকার অশিক্ষিতদের কোন বাঁধা নিয়মের অস্ত্র ছিল না। নগরের পনের আনা লোকের হাতে তখন তরবারি থাকিত (এখন আর সেরূপ দেখা যায় না) তাহাদের কটিদেশে একখানা চাদর জড়ান থাকিত, তাহাতে একটি জম্বিয়া গোঁজা থাকিত। জম্বিয়া নেপালী ভুজালীর মত বক্র, ৮।১০ ইঞ্চ ফলকযুক্ত দুমুখো ধার ছুরি। বড়লোকেদের তরবারি ও জম্বিয়ার দস্তা সোণা ও মাণিক দিয়া সাজান থাকিত। একবার একটি জম্বিয়া দেখিয়াছিলাম, তাহার মূল্য কয়েক লক্ষ টাকা। অশিক্ষিত সৈনিকের হাতে তোড়াদার বন্দুক থাকিত। ঐ বন্দুক ছুড়িতে অগ্নির প্রয়োজন। সৈনিক শোলা ও কার্পাস মিলাইয়া একটি

দড়ি প্রস্তুত করিত। এই দড়ির এক মুখ ধরাইয়া লইলে ধীরে ধীরে পুড়িত; প্রয়োজন মত এই অগ্নি দিয়া বন্দুক ছুড়িত। এখনও নগরে আরববাসীদের হাতে এইরূপ বন্দুক দেখিতে পাওয়া যায়। কোন সৈনিক তরবারি বা বন্দুক অভাবে বর্শা বা গুল বসান লাঠি ঘাড়ে করিয়া শোভাযাত্রাতে যাইত।

ইহা ছাড়া আর এক দৃশ্য দেখিয়াছি। অশিক্ষিত সৈনিকদের মধ্যে তিন চারটি রমণী চলিয়াছে, তাহাদের পৃষ্ঠে তরবারি বাঁধা, ক্রোড়ে দুগ্ধপোষ্য শিশু-পুত্র। শুনিলাম, ঐ শিশুই অশিক্ষিত সৈনিক; তাহার মাতা বাহন মাত্র। এখানকার অশিক্ষিত সৈনিকের চাকরি পুরুষানুক্রমে চলিত। কোন সৈনিক গর্ভবতী স্ত্রী রাখিয়া মরিলে,তাহার গর্ভস্থ পুত্র চাকরি পাইত। তাহাকে ১৪ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত কোন কাজ করিতে হইত না,কেবল 'লঙ্গর' শোভাযাত্রার সময়ে মাতৃ-ক্রোড়ে যোগ দিত। সৈনিক যদি অপত্যহীন অবস্থায় মরিত, তবে তাহার বিধবা হয় পোষ্য গ্রহণ করিয়া মৃত স্বামীর চাকরি সেই পুত্রকে দেওয়াইতে পারিত,কিম্বা বিবধা কোন ব্যক্তিকে মনোনীত করিয়া গবর্মেণ্টকে বলিত, এই ব্যক্তিকে এই কড়ারে চাকরি দেওয়া হউক যে, ঐ ব্যক্তি আপনার বেতন হইতে আমার ভরণ-পোষণের জন্য এত টাকা মাসিক দিবে। সে ব্যক্তি যদি ভবিষ্যতে কোন কালে বিধবার টাকা না দিত, তবে বিধবা নালিশ করিলেই তাহার চাকরি যাইত ও বিধবার মনোনীত নূতন ব্যক্তি চাকরি পাইত। এইরূপে গবরমেণ্ট কিছু ব্যয় না করিয়াই বিধবার 'পেনশন' করিয়া দিতেন। এ নিয়ম অন্য বিভাগেও ছিল, এখন নাই। এখন 'পেনশন' নিয়মগুলি ইংরাজি নিয়মের মত। তবে আমাদের সহৃদয় নিজাম বাহাদুর বিধবাদের ভরণপোষণের জন্য এক নূতন নিয়ম করিয়া-ছেন। যদি কোন রাজকর্ম্মচারী চাকরি করিতে করিতে মারা যায়, তবে মৃত্যুর সময়ে তিনি যত 'পেনশন' পাইবার অধিকারী ছিলেন, তাহার সিকি ভাগ তাহার বিধবা যাবৎ জীবন পাইবে। যেমন একব্যক্তি ১০০৲ বেতন পায়, ২০বৎসর চাকরি করিয়া সে মরিয়া গেল, তাহার বিধবা যাবৎজীবন ১২৷৷০ 'পেনশন' পাইবে। ইহা ছাড়া অল্পবয়স্ক পুত্রদের পড়িবার বৃত্তি দেওয়া হয়, তাহার কোন নিয়ম নাই। একজন মৌলবী অধ্যাপক ১০০৲ বেতন পাইতেন। গত প্লেগে ২৬৷২৭ বৎসর চাকরির পর মারা গিয়াছেন। তাঁহার পুত্রস্থানীয় এক মাত্র ভাগিনেয় যতদিন ডিগ্রি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হন, তাবৎ তিনি ৩০৲ টাকা বৃত্তি পাইবেন। মৌলবীর বিধবা পত্নীও যাবৎজীবন ৩০৲ টাকা 'পেনশন' পাইতেছেন।

শ্রীঅমৃতলাল শীল।

সাহিত্যে স্বাস্থ্যরক্ষা।

(৭)

আর্ট স্বভাবের অবিকল নকল হইবে না—সত্য, কিন্তু আর্টকে স্বভাবের অনুগামী হইয়া চলিতে হইবে ; নচেৎ কবির সৃষ্ট নরনারী কিম্ভূত-কিমাকার ধারণ করে। একজন চিত্রকর একটা মানুষের ছবি আঁকিতে আরম্ভ করিয়া যদি তাহার দুই হাতের পরিবর্ত্তে চারি হাত লাগান, তবে সে দেবতা হইবে—নয় দানব হইবে—মানুষ হইবে না। এই গ্রন্থে নিখিল, বিমলা ও সন্দীপ ইহার কেহই মানুষ হয় নাই। কবিশ্রেষ্ঠ মাঘ শিশুপালকে রাবণের অবতার বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, এই সন্দীপও আমাদের নিকট সেই রাবণের একটি ক্ষুদ্র অবতার বলিয়া মনে হয়। হউক তাহাতে দোষ নাই—কিন্তু এতদূর পাশবতা, এতদূর নির্লজ্জতা, এতদূর কাপুরুষতা প্রকৃত মানুষে কখনও সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না.—সন্দীপ প্রকৃতই একটা দানব বা রাক্ষস। এই কারণেই কবিবর তাহার মুখ দিয়া সীতা দেবীর গ্লানিকর একটা কথা বাহির করিয়াছেন, যে জন্য অনেকে রবীন্দ্রনাথকে গালি দিয়াছেন। সন্দীপ বলিতেছে :—

"যে রাবণকে আমি রামায়ণের প্রধান নায়ক বলে' শ্রদ্ধা করি, সেও এমনি করেই মরেছিল। (অর্থাৎ নিঃসঙ্কোচে বল-প্রকাশ না করে) সীতাকে আপনার অন্তঃপুরে না এনে সে অশোক বনে রেখেছিল—অতএব বীরের অন্তরের মধ্যে ঐ এক জায়গায় একটু যে কাঁচা সঙ্কোচ ছিল, তারই জন্যে সমস্ত লঙ্কাকাণ্ডটা একেবারে ব্যর্থ হয়ে গেল। এই সঙ্কোচটুকু না থাক্‌লে সীতা আপন সতী নাম ঘুচিয়ে রাবণকে বরত।"—

এই শেষ কথাটি নকল করিতে করিতে আমার চিত্ত শিহরিয়া উঠিল ; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জাতীয় সংস্কার হইতে এত দূর মুক্ত হইয়াছেন যে, অবলীলা-ক্রমে তাঁহার নিজের মনে এইরূপ ভাবের কল্পনা করিয়া কলম দিয়া তাহা লিখিয়াছেন। কবিকে অবশ্যই ভালমন্দ সব বিষয়ের কল্পনা করিয়া লিখিতে হয়। তিনি সন্দীপের যে চরিত্রাঙ্কন করিয়াছেন, তাহার মুখে অবশ্য এ কথা খুবই মানায়—কিন্তু পূর্ব্বে বলিয়াছি কাব্যের মধ্যে কবির নিজের ছাপও কিছু কিছু পড়ে, তাহা না হইলে চিত্র কেবল ফটোগ্রাফ হইয়া দাঁড়ায়। মাইকেল

নাকি তাঁহার মেঘনাদবধে রাম ও লক্ষ্মণকে নিতান্ত হীন করিয়া আমাদের জাতীয় গৌরব নষ্ট করিয়াছেন। এই জন্য স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই মাইকেলকে এইরূপ ভাবে দূষিয়াছেন "মহৎ চরিত্র যদি বা নিজে সৃষ্টি করিতে না পারিলেন, তবে কবি কোন মহৎ কল্পনার বশবর্ত্তী হইয়া অন্যের সৃষ্ট মহৎ চরিত্র বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন? কবি বলেন—"I despuse Ram and his rabble—সেটা বড় যশের কথা নহে। তাহা হইতে এই প্রমাণ হয় যে, তিনি মহাকাব্য রচনার যোগ্য কবি নহেন।" আমরাও এখানে বরীন্দ্রনাথের সঙ্গে সুর মিলাইয়া বলিতে পারি, মাইকেল যে টুকু বাকী রাখিয়াছিলেন, বরীন্দ্রনাথ সন্দীপ চরিত্রের মধ্য দিয়া, সীতার চরিত্র খর্ব্ব করিয়া তাহা শেষ করিয়া দিলেন। থা'ক সে কথা, সন্দীপ নিজেই রাবণের অবতার, কাজেই রাবণের সহিত তাহার যথার্থ সহানুভূতি আছে। সে সময় বুঝিয়া বিমলাকে হরণ করিল না কেন, সেজন্য অনুতাপ করিতেছে, কিন্তু নিখিল ও মানুষ, সে কোন্ প্রাণে সন্দীপকে এইরূপ সুযোগ দিল? স্বয়ং রামচন্দ্র যিনি বিষ্ণুর অবতার বলিয়া পূজিত, তিনি পর্য্যন্ত রাবণকে ক্ষমা করিতে পারিলেন না—নিখিল কোন্ প্রাণে স্বয়ং মধ্যস্থ হইয়া দিনের পর দিন বিমলার এই অধঃপতনের সাহায্য করিল? একজন এম, এ পাশ করা সুশিক্ষিত স্বামীর পক্ষে ইহা কি স্বাভাবিক? হয় ত স্ত্রীকে পরপুরুষের সঙ্গে মিশিতে দিয়া তাহার মনুষ্যত্ব ফুটাইয়া তোলার একটা খেয়াল তাহার মাথার মধ্যে ঢুকিয়াছিল; কিন্তু নিখিল ত একেবারে পাগল হয় নাই, সে সন্দীপের সঙ্গে স্বদেশী ব্যাপার লইয়া যে সকল তর্ক করিয়াছে, তাহাতে তাহাকে ধীরপ্রকৃতির লোক বলিয়াইত মনে হয়, সেই নিখিল বিমলার অধঃপতনের সূচনায় তাহাকে থামাইল না কেন? কাপুরুষের মত নিজে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বুক ভাসাইয়া না দিয়া একটু শক্ত কঠোর হইয়া সন্দীপকে আগেই তাড়াইল না কেন? স্ত্রীর মধ্যে মনুষ্যত্ব ফুটিয়ে তোলাত একটা Theory—কোন প্রকৃতিস্থ ব্যক্তি সেই Theory নিজের স্ত্রীর উপর Experiment করিতে বসিয়া তাহাকে রাজরাণী হইতে পথের কাঙ্গালিনী করিতে পারে! যে সকল ডাক্তার ঔষধ লইয়া Experiment করেন, তাঁহারা প্রায়ই ইতর প্রাণীর শরীরের উপরেই করিয়া থাকেন। সংসারে এরূপ মূর্খ কয় জন আছে যে, নিজের স্ত্রীর শরীরে রোগের সূচনা দেখিয়া তাহা ঔষধ প্রয়োগে বন্ধ করিতে চেষ্টা না করিয়া, রোগের হাতে স্ত্রীকে ছাড়িয়া দিয়া তামাসা দেখে যে, তাহার স্ত্রীর শরীর রোগের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহার বল বাড়াইতে পারে কিনা? স্বয়ং কবি কি কখনও তাঁহার নিজের জীবনে এরূপ

করিতে পারিতেন ? অবশ্য কখনই না। সুতরাং তাঁহার এই যে Idea, তাহা কখনও নিজের অনুভূতিমূলক নহে, ইহা আকাশকুসুমের মত তাঁহার কল্পনা। Tolstoy এর সেই আর্টের সংজ্ঞা অনুসারে এইরূপ আকাশকুসুম-কল্পনা প্রকৃত আর্ট নহে।

নিখিলের ন্যায় বিমলাও সুশিক্ষিতা রমণী। তাহার যেরূপ গভীর বিদ্যা, তাহাতে তাহার নিকট কি আমরা একটু সাধারণ বৈষয়িক জ্ঞান—একটু Common Sense আশা করিতে পারি না ? অবশ্য প্রবৃত্তির তাড়নায়—অনেকেই হিতাহিতজ্ঞান-বর্জ্জিত হয়—এমন কি Common Sense ও সব সময়ে থাকে না। কিন্তু কবি তাহার মনের যেরূপ বিশ্লেষণ করিয়াছেন, তাহাতে সে প্রথম হইতেই ত উদ্দাম প্রবৃত্তির বশীভূত হয় নাই, প্রথম অবস্থায় ত তাহার ভালমন্দ, হিতাহিত-জ্ঞান ছিল। তবে তাহার মত শিক্ষিতা রমণী প্রথম হইতেই সন্দীপের চাটুবাক্যে কেন আত্ম-হারা হইল ? সন্দীপ যেই তাহাকে বলিল, "তুমি বঙ্গের বাণী ; তুমি বঙ্গরমণীর একমাত্র প্রতিনিধি, তুমি দেবী" অমনি সে গলিয়া গেল কেন ? কেবল গলিয়া যাওয়া নয়, তাহার স্বামীকে ভুলিয়া সন্দীপকে একেবারে আত্মসমর্পণ করিয়া বসিল, এমন কি যখন সন্দীপকে মন্দ লোক বলিয়া বুঝিল, তখনও তাহার লোভ চরিতার্থ করিবার জন্য নিজে চুরি পর্য্যন্ত করিল! অবশ্য এরূপ রমণীও দেখা যায়, যাহারা স্বামীর টাকা চুরি করিয়া লইয়া পরপুরুষের সঙ্গে বাহির হইয়া যায়। কিন্তু তাহাদের সঙ্গে বিমলার তুলনা হয় না। বিমলাকে কবি ভিন্ন আবহাওয়ার মধ্যে স্থাপন করিয়াছেন, তাহার পক্ষে সন্দীপের কথার ছটায় মুগ্ধ (Fascinated) হইয়া এতটা অধোগামী হওয়া নিতান্ত অস্বাভাবিক বোধ হয়। সুতরাং বিমলার চরিত্রও আকাশকুসুমের ন্যায় অবাস্তব, এখানেও কবির আর্ট বিফল হইয়াছে।

এইরূপে আমরা দেখিলাম, এই উপন্যাসের যে তিনটি প্রধান চরিত্রকে অবলম্বন করিয়া কবি তাঁহার মায়াজাল বিস্তার করিয়াছেন, তাহার তিনটিই নিতান্ত অস্বাভাবিক। কাজেই তাহারা কেহই আমাদের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে পারে না। সন্দীপের ন্যায় অতি মানুষ (Super-human) দানব লইয়া পুরাণ রচনা চলে, কিন্তু উপন্যাস রচনা ব্যর্থ হয়। সেই পুরাণের দেবতা হইবেন শীতলা, কারণ তাঁহার মধ্যে সংক্রামক রোগের বীজ লুক্কায়িত, এবং নিখিল হইতেছে তাঁহার বাহন। বিমলা সুশিক্ষিতা যুবতী হইয়াও নিতান্ত শিশু। শিশুকে রাস্তায় পাইয়া যদি কোন লোক তাহার হাতের মোয়া কাড়িয়া লয়,

তখন আমরা সেই শিশুর দোষ দিই না, দোষ দিই তাহার বাপ-মায়ের। সেই শিশুর কান্না দেখিয়া আমাদের দয়া হয় না, বরং তাহার সৃষ্টিকর্ত্তার উপরে রাগ হয়।

কেহ হয় ত বলিবেন, এই উপন্যাসখানির কলা-কৌশল অতি সূক্ষ্ম। আমাদের ন্যায় স্থূলবুদ্ধি লোকের বোধগম্য নহে। তাহা হইলে কেবল সেই কারণেই ইহাতে আর্টের অভাব বলিতে হইবে। কারণ টলষ্টয়ের সূত্র অনুসারে যে কাব্য অধিকাংশ পাঠকের মনে কবির হৃদয়ের অনুভূতি সংক্রামিত করিতে না পারে, তাহাতে যথার্থ আর্ট নাই। (A work of art that united every one, with the auth r and with one another would be perfect art)

এই কাব্যে মানসিক ভাব বিশ্লেষণের চূড়ান্ত ছড়াছড়ি ইহার আখ্যায়িকা গ্রন্থকার নিজের কথায় ব্যক্ত করিয়া পাত্রপাত্রীদের আত্মকথার দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে ক্রমাগত নিখিল, বিমলা ও সন্দীপের Sick Sentimentalism পাঠকের চিত্তে বিরক্তি উৎপাদন করে। সময় সময় তাহাদের পূতিগন্ধময় ভাবের বিশ্লেষণ দ্বারা পাঠকপাঠিকার মনে ঘৃণার উদ্রেক হয়। তখন মনে হয় যেন এই তিন ব্যক্তি তাহাদের পেটের নাড়ী ভুঁড়ি বাহির করিয়া ক্রমাগত চটকাইতেছে, এবং তাহার দুর্গন্ধে চতুর্দ্দিকের আব-হাওয়া ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে।

কবি অবশ্যই স্কুল মাষ্টারী করিতে বসেন নাই এবং তাঁহার নিকট আমরা কোন উচ্চ শিক্ষার আশা করি না। কিন্তু এই পুতিগন্ধময় কাব্য রচনা করিয়া সমাজের নৈতিক বায়ু (Moral at mosphere) কলুষিত করিবার তাঁহার কোন অধিকার আছে কিনা ইহাই সুধীগণের বিবেচ্য।

কবিবর রবীন্দ্রনাথ যেটুকু বাকী রাখিয়াছিলেন, শ্রীযুত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাহা শেষ করিয়াছেন। আমরা এবার তাঁহার "চরিত্রহীন" গ্রন্থ সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

রবীন্দ্রনাথ কি কুক্ষণেই লিখিয়াছিলেন—কবির কার্য্য স্কুলমাষ্টারী নহে। আমার বোধ হয় তাঁহার এই নীতি অবলম্বন করিয়াই শরৎবাবু তাঁহার "চরিত্রহীন" উপন্যাস লিখিয়াছেন। ইহাতে যেন কাব্যের স্কুলমাষ্টারদিগকে Challenge করা হইয়াছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের "চোখের বালি" "নষ্ট নীড়" ও "ঘরে বাইরে" অপেক্ষা শরৎবাবুর "চরিত্রহীন" সমাজের পক্ষে অধিকতর

অনিষ্টকর, কারণ শরৎবাবুর আর্ট অধিকতর মর্ম্মস্পর্শী এবং তাঁহার লেখা অনেক বেশী popular আবার এই চরিত্রহীনে আমরা রবীন্দ্রনাথ-সৃষ্ট— বিনোদিনী, চারুলতা ও বিমলাকে এক সঙ্গে পাই। Congress-এর Omnibus Resolution"এর ন্যায় ইহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব চরিত্রহীন ও চরিত্রহীনাদিগের একটা বিরাট মিলনভূমি, অথবা তাহাদের একটা বড় মেলা।

এই বিশাল গ্রন্থের সংক্ষিপ্তসার প্রস্তুত করা কঠিন, তাহার সামর্থ্যও আমার নাই। তবে অতি সংক্ষেপে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দিতেছি। উচ্চ শিক্ষিত আদর্শ যুবক উপেন এই উপন্যাসের মেরুদণ্ড। অর্দ্ধশিক্ষিত যুবক সতীশ তাঁহার চেলা, কিন্তু সে কলিকাতায় পড়িতে গিয়া এক মেসের ঝি সাবিত্রীর প্রেমে পড়িল। সাবিত্রী বেশ্যার গৃহে বাস করিলেও তাহার চরিত্র কলুষিত হইতে দেয় নাই। সতীশের সঙ্গে সে প্রেমের খেলা খেলিত, কিন্তু ধরা ছোঁয়া দিত না। ক্রমে সতীশের প্রতি তাহার খাঁটি ভালবাসা জন্মিল। সে অনেক দুঃখ পাইয়া সতীশকে নিজের নিকট হইতে তফাতে রাখিল। সতীশ কিন্তু সে অন্যের প্রেমে আসক্ত মনে করিয়া তাহার জন্য পাগল হইল—এবং "বড় দিদির' সুরেন ও দেবদাসের ন্যায় হতাশ প্রণয়ীদের অনুকরণে মদ গাঁজা ইত্যাদি ধরিল। এ দিকে উপেনের এক বিলাত-ফেরত বন্ধু জ্যোতিষের ভগিনী বেথুনকলেজের ছাত্রী সরোজিনী সতীশের প্রেমে পড়িল। উপেনের আর বন্ধু হারাণ মাষ্টার মৃত্যুশয্যায় পড়িয়া তাহাকে আহ্বান করিল। উপেন সতীশের সঙ্গে তাহাকে দেখিতে গেল, হারাণের স্ত্রী কিরণময়ী উপেনকে দেখিয়া তাহার প্রেমে পড়িল। কিরণময়ী যেমন সুশিক্ষিতা, তেমন চরিত্রহীনা। সে বিদ্বান্ স্বামীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া অনেক পুঁথিগত বিদ্যা আয়ত্ত করিয়াছিল, কিন্তু প্রবৃত্তির উচ্ছৃঙ্খলতা দমন করিতে শিখে নাই। স্বামী যখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত, তখন সে পাশের ঘরে অনঙ্গ ডাক্তারের, প্রেম-পিপাসা মিটাইত। তাহার শাশুড়ীর নাকি ইহাতে ইঙ্গিত ছিল। এই ডাক্তারটি অবশ্য সন্দীপের ন্যায় কেবল বাক্যের দ্বারা প্রেম করিতেন না, তাঁহার ততদূর শিক্ষাও ছিল না। তিনি কিরণময়ীর প্রেমে মুগ্ধ হইয়া তাহাদের সংসারের অর্দ্ধেক ব্যয়ভার বহন করিতে লাগিলেন। কিন্তু উপেনকে দেখামাত্রই কিরণময়ীর প্রেম নিতান্ত ইন্দ্রিয়লালসার স্থূলত্ব হইতে সূক্ষ্মত্বের দিকে 'প্রমোশন' পাইল। হারাণ মাষ্টার মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্ব্বে কিরণময়ীর সেবা পাইয়া মারা গেলেন, কিন্তু কিরণময়ী উপেন ও সতীশের সঙ্গে যথেষ্ট আত্মীয়তা করিয়া লইল। তাহারা কিন্তু তাহাকে

আমল দিল না, তবে সতীশ তাহার স্নেহের ঠাকুর পো হইয়া উঠিল। সতীশ তখন আর এক জনের জন্য পাগল, কিরণময়ীর নিকট সে ঠাকুর পো হইয়াই রহিল। উপেন তাহার আশ্রিত দিবাকর নামক ছোকরাকে কলেজে পড়িবার জন্য কিরণময়ীর কাছে আনিয়া রাখিল। তাহাকে কাছে পাইয়া কিরণময়ী সেই "নষ্ট নীড়ে"র চারুলতার মত ঠাকুরপো-সম্বন্ধ পাতাইয়া তাহার সঙ্গে সাহিত্য-চর্চ্চা ও প্রেমচর্চ্চা আরম্ভ করিয়া দিল। এটা অবশ্য দুধের সাধ ঘোল দিয়া মিটানর মত। একদিন হঠাৎ স্বয়ং ভ্রষ্ক মহাশয় অর্থাৎ উপেন আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং কিরণময়ী তাঁহার ব্যবহারে যখন বুঝিল—সে বড় কঠিন ঠাঁই, তখন তাহার মনের মধ্যে প্রতিহিংসা অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিল এবং বিনোদিনী যেমন বেহারীর জন্য পাগল হইয়া মহেন্দ্রের স্কন্ধে চড়িয়া পশ্চিমে গিয়াছিল, কিরণময়ীও দিবাকরের সঙ্গে "বাহির" হইয়া পূর্ব্ব দেশে অর্থাৎ আরাকান যাত্রা করিল। কিন্তু বিনোদিনী বাঘিনী হইলেও কিরণময়ীর সঙ্গে তুলনায় যেন একটি পোষা বিড়াল। কিরণময়ী উপেনের প্রতি প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার অভিপ্রায়ে দিবাকরকে গ্রাস করিয়া ফেলিল, এবং উভয়ে আরাকানের এক নীচ পল্লীতে প্রাকাশ্যতঃ স্বামি-স্ত্রীভাবে বাস করিতে লাগিল। উপেনের আদেশে সতীশ গিয়া তাহাদিগকে সেখান হইতে উদ্ধার করিয়া আনিল। এ দিকে উপেন পত্নীহারা হইয়া সংসারে উদাসীন এবং যক্ষ্মা-রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। কিরণময়ী শেষকালে উন্মাদ হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল, কিন্তু যদিও শেষ পর্য্যন্ত উপেনকে পোষাকীভাবে ভালবাসিত, তবু উপেনের মৃত্যুশয্যায়ও সে তাহার দর্শন পাইল না। ইহাই নাকি তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত। সতীশ যখন মদ গাঁজা ও তান্ত্রিক সাধনায় নিতান্ত বিভোর হইয়া পড়িল, তখন সাবিত্রী আসিয়া তাহাকে উদ্ধার করিল; কিন্তু কিছুতেই তাহার অপবিত্র দেহ সতীশকে দান করিতে সম্মত হইল না। সাবিত্রীর ও উপেনের একান্ত অনুরোধে সতীশ সেই বেথুনকলেজের ছাত্রী সরোজিনীকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহ করিল; কারণ সরোজিনী তাহাকে নিতান্ত চরিত্রহীন জানিয়াও ভালবাসিতে ক্ষান্ত হয় নাই। সাবিত্রী উপেনের বাসায় আসিয়া তাহাকে ভগিনীর ন্যায় শুশ্রূষা করিতে লাগিল, উপেন অল্প দিন পরেই সকলকে কাঁদাইয়া দেহত্যাগ করিল।

আখ্যায়িকার এই সংক্ষিপ্ত চুম্বক (Outline) পড়িয়া কেহ তাহার প্রকৃত রস পাইবেন না। গ্রন্থকার তাঁহার প্রায় ছয় শত পৃষ্ঠাব্যাপী প্রকাণ্ড পুস্তকে ইহাকে পল্লবিত করিয়া চরিত্রগুলিকে জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার

লেখার গুণে এই চরিত্রহীন এবং চরিত্রহীনাদের মেলাও পাঠকপাঠিকাকে আকর্ষণ না করিয়া পারে না। সেইজন্যই এইরূপ লেখা আরও বিশেষ বিপদ্-জনক। তবে অবশ্যই কিরণময়ীর চরিত্র যে ভাবে চিত্রিত হইয়াছে, তাহাতে মনে ঘৃণার উদ্রেক না হইয়া যায় না। কিন্তু এরূপ সমালোচকও আছেন, যাঁহারা আর্টের হিসাবে কিরণময়ীকে প্রশংসা করিয়াছেন। এই পাপ-পঙ্কিল আর্ট আমাদের মাথায় থাকুক, যে আর্টের দ্বারা সমাজের আব-হাওয়া দূষিত হয়, পাঠকপাঠিকার মনে কুপ্রবৃত্তির উত্তেজনা করে—আমরা সে আর্ট চাই না। আমরা এ পর্য্যন্ত যত কলুষিত নারীচরিত্র সাহিত্যে পাইয়াছি, কিরণময়ী তাহার সকলের উপরে টেক্কা দিয়াছে। তাহার অসাধারণ প্রতিভা ও ঈশ্বরে বিশ্বাসহীন শিক্ষা তাহার কুপথ গমনের সাহায্য করিয়াছিল। সে এতকাল স্বামিসঙ্গ লাভ করিয়াও স্বামীকে ভালবাসিতে শেখে নাই, কেবল ছাত্রীর ন্যায় তাঁহার নিকট বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিল। অথচ পুরুষকে বশ করিবার ছলাকলা ও চাতুরী সে বিলক্ষণ জানিত। সেই স্বামী যখন রোগ-শয্যায় পতিত, তখন সে পরপুরুষের প্রেমলাভের জন্য লালায়িত। অবশ্য স্বামী যখন অন্তিমশয্যায়, তখন অল্প কয়েকদিনের জন্য সে স্বামীকে যথার্থই ভাল বাসিয়াছিল। এ বিষয়ে উপেনের স্ত্রী সুরবালাই নাকি তাহার গুরু। কিন্তু সুরবালার সহিত পরিচয়ের পূর্ব্বে কি কখনও সে সতী নারীর কথা কোন কাব্যে বা ইতিহাসে পাঠ করে নাই? সে সকল পড়িয়া সে যাহা শিখে নাই, দুই দিন সুরবালাকে দেখিয়া বা তাহার কথা সতীশের মুখে শুনিয়া এতকাল পরে সে পতিপ্রেম শিক্ষা করিল কিরূপে? যাহা হউক, স্বামীর প্রতি সে প্রেমও সে আবার ঝাড়িয়া ফেলিল, এবং পুনরায় পরকীয় প্রেমের জন্য লালায়িত হইল। সেই প্রেমও একজনে সীমাবদ্ধ থাকিল না—প্রথমে সেই প্রেম অনঙ্গ ডাক্তারের প্রতি ছিল, পরে উপেনের ও সতীশের প্রতি, অবশেষে দিবাকরের প্রতি—অথবা এক সঙ্গেই উপেন এবং দিবাকরের প্রতি ধাবিত হইল। উপেন তাহাকে নির্ম্মমভাবে প্রত্যাখ্যান করিলে, উপেনকে শাস্তি দেওয়ার অভিপ্রায়ে সে বাঘের মত দিবাকরকে মুখে করিয়া ঘরের বাহির হইয়া পড়িল। আরা-কানের পথে জাহাজে তাহার সঙ্গে যে ভাবে কাটাইল, তাহা লিখিতে লেখনী কলঙ্কিত হয়। এইরূপ চরিত্রের বিকাশ দেখাইতে গিয়া লেখকের কল্পনা যেমন কলুষিত হয়, আবার পাঠকের চিত্তও সঙ্গে সঙ্গে কলুষিত হয়। এত বড় পাপ চিত্রের সংসর্গে পাঠকপাঠিকার মনে বীভৎস রস ভিন্ন অন্য রসের সঞ্চার

হইতেই পারে না। বীভৎস রসেরও অবশ্য কাব্যে স্থান আছে; কিন্তু তাহা অন্য উৎকৃষ্ট রসের অধীন হইয়া থাকে—অন্য রসের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া কাব্যের অধিকাংশ ভাগ জুড়িয়া বসে না।

কিরণময়ী প্রকাশ্যভাবে বেশ্যা না হইয়াও বেশ্যার অধম। সাবিত্রী প্রকাশ্যভাবে বেশ্যার গৃহে বাস করিলেও সে প্রকৃত বেশ্যা নহে। সে নানা প্রলোভনের মধ্যে পড়িয়াও নিজের চরিত্র ঠিক রাখিয়াছিল।

সতীশের সঙ্গে তাহার যে প্রেমের খেলা চলিত, তাহাতে সতীশকে সে ধরা-ছোঁয়া দেয় নাই। অথচ সেবা দ্বারা তাহাকে সুখী করিতে চেষ্টা করিয়াছে। অনেকটা চন্দ্রমুখী ও দেবদাসের মত। সে সতীশের যথার্থ হিতৈষিণী ছিল, সে জন্য সতীশকে আপনা হইতে দূরে রাখিয়া নিজে কত দুঃখ ভোগ করিয়াছে। সতীশ অবশ্য তাহাকে ভুল বুঝিয়া পাগলের মত হইয়াছিল; অবশেষে সতীশ তাহার প্রেমে হতাশ হইয়া যখন নিজের সর্ব্বনাশ করিতে বসিল, তখন সাবিত্রীই আসিয়া তাহাকে উদ্ধার করিল ও তাহার বিবাহ দিল। সাবিত্রীর ভালবাসা, দেবদাসের প্রতি চন্দ্রমুখীর ভালবাসার ন্যায় স্নেহের পবিত্র সীমায় উঠিয়াছিল। সাবিত্রী সতীশের জন্য যেরূপ দুঃখভোগ করিয়াছে, তাহা পড়িতে পড়িতে আমাদের চোখে জল আসে। কিন্তু তাহা হইলেও সাবিত্রী-চরিত্র সমাজ-শরীরে বিষের কার্য্য করিবে। ইহার পরে যদি 'মেসে'র ছেলেরা সুন্দরী যুবতী চাকরাণীর সঙ্গে প্রেম করিতে যায়—তবে এই সাবিত্রীর জন্মদাতা সে জন্য দায়ী হইবেন। অধিকাংশ 'মেসে'র ঝি অবশ্য সাবিত্রী নহে, সুতরাং সতীশের অনুকরণে ঝির সঙ্গে প্রেম করিতে গেলে কত কত ছেলের পরকাল নষ্ট হইবে, তাহার বিচিত্র কি? অন্ততঃ 'মেসে' এই সকল চরিত্র লইয়া যে আলোচনা ও 'এয়ারকি' চলিবে, তাহা-দ্বারা ছাত্রনিবাসের আবহাওয়া দূষিত হইবে, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

সতীশ অবশ্য এই উপন্যাসের নায়ক,—সেই "চরিত্রহীন"। গ্রন্থকার পুস্তকের নাম চরিত্রহীন রাখিয়া সচ্চরিত্র লোকদিগকে যেন challenge করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। অর্থাৎ তোমরা যাহাকে চরিত্রহীন বলিয়া ঘৃণা কর, তাহার হৃদয় কত মহৎ—সেও প্রেমের জন্য কিনা করিতে পারে দেখ। কিন্তু প্রেমের জন্য স্বার্থত্যাগ অর্থাৎ সংসারে উদাসীন হইয়া ভ্রমণ, মদ গাঁজা খাওয়া, ইত্যাদি গ্রন্থকারের লেখায় নূতন নহে। তাঁহার সতীশ "বড় দিদি" গ্রন্থের সুরেন ও দেবদাসের পুনরাবৃত্তি বলিয়া বোধ হয়। আর প্রেমে হতাশ হইলেই কি উচ্ছৃঙ্খলচরিত্র হইয়া বেড়াইতে হইবে? হতাশ-প্রণয়ীর সংযত চরিত্র

হইয়া থাকাটা কি শরৎবাবুর অলঙ্কারশাস্ত্রে একটা দোষ বলিয়া গণ্য? উপেন আদর্শচরিত্র যুবক। উপেন কিরণময়ীর কুহক হইতে নিজেকে বাঁচাইয়াছে। কিন্তু তবুও যেন সন্দেহ হয়, তাহার মনে একটু কালো দাগ লাগিয়াছিল; নতুবা সে নিজে বিদ্বান, বুদ্ধিমান্ হইয়াও এবং কিরণময়ীর সবিশেষ পরিচয় পাইয়াও দিবাকরকে কিরণময়ীর হাতে সঁপিয়া দিয়া তাহার সহিত একটা সম্বন্ধ ঠিক রাখিল কেন? তাহার অথবা দিবাকরের সংস্পর্শে আসিয়া কিরণময়ী ক্রমে ভালর দিকে যাইবে, উপেনের মত বুদ্ধিমান্ লোকের কি এই আশা নিতান্ত দুরাশা নহে? উপেনের স্ত্রীকে গ্রন্থকার স্বামিগতপ্রাণ করিয়া অঙ্কিত করিয়াছেন; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় তাহার মৃত্যুশয্যার পাশে দাঁড়াইয়া পাঠকের চোখে জল আসে না।

জ্যোতিষ ব্যারিষ্টারের উচ্চশিক্ষিতা ভগিনী কোন্ গুণ দেখিয়া সতীশের প্রতি এতটা আকৃষ্ট হইল? সতীশের হৃদয় পরদুঃখে কাতর, আর তাহার মধ্যে সরল আন্তরিকতা (sincerity) যথেষ্ট ছিল, সে প্রাণ দিয়া অন্যকে ভাল বাসিতে পারিত। কিন্তু তাহা হইলেও একজন ইংরেজীশিক্ষিতা রমণী যখন সতীশের সাবিত্রীর জন্য প্রেমোন্মত্ততা জানিতে পারিল, তখনও তাহাকে ভাল বাসিবে কেন? বাস্তব জীবনে কয়জন উচ্চ শিক্ষিতা রমণী এরূপ পারেন? বোধ হয় লেখকের এখানেও সেই একমাত্র মামুলি কৈফিয়ৎ—"Love is ever blind."

কয়েকটা গোড়ার কথা।

আমরা বিধবার প্রেম ও সধবার প্রেমের প্রসঙ্গ এক প্রকার শেষ করিলাম; এখন এই সম্বন্ধে কয়েকটি গোড়ার কথার আলোচনা করিব। প্রথম কথা এই— সধবা ও বিধবার পরপুরুষাসক্তি কি সমাজে নাই? যাহা সমাজে আছে, অর্থাৎ যাহা সত্য ঘটনা, কবি যদি সেই সত্য অবলম্বনে তাঁহার আখ্যায়িকা রচনা করেন, তবে তাঁহাকে দোষ দিলে চলিবে কেন? আখ্যায়িকা যদি সমাজের প্রকৃত চিত্র হয়, তবে তাহাতে সমাজের ভাল মন্দ দুইই থাকিবে। কবির আর্ট সত্যে প্রতিষ্ঠিত, ইহা স্বীকার করি; সত্যকে সুন্দর করিয়া প্রকাশ করাই কবির কার্য্য। কিন্তু জগতে যাহা সত্য ও সুন্দর, তাহার সঙ্গে মঙ্গলেরও সম্বন্ধ আছে। কারণ জগৎস্রষ্টা যিনি, সত্য শিব সুন্দরই হইতেছে তাঁহার স্বরূপ। আর সৃষ্ট জগৎ তাঁহারই স্বরূপের বহিঃপ্রকাশ মাত্র। কবির সৃষ্টিও যদি সেই বিশ্বসৃষ্টির

অনুকরণ করে, তবে তাহাতে আমরা সত্য ও সুন্দরের সঙ্গে শিব বা মঙ্গলকেও দেখিতে আশা করি। কবি কেবল সত্যকে সুন্দর করিয়া দেখালেই চলিবে না, তাহার সঙ্গে মঙ্গলও থাকা চাই। কেহ হয় ত বলিবেন, একজন ডাক্তার রোগীর মঙ্গলের উদ্দেশ্যেই তাহার শরীরের ক্ষত অস্ত্র দ্বারা কাটিয়া চিরিয়া বাহির করেন, এবং তাহার ফলে রোগী রোগমুক্ত হইয়া সুস্থ হয়; কবিও সেইরূপ সমাজশরীরের সুস্থতাসম্পাদনের জন্যই সমাজের ক্ষত সকল ঢাকিয়া না রাখিয়া প্রকাশ করেন। ইহার উত্তরে আমি বলি, মানবশরীরের ক্ষত অস্ত্রচিকিৎসায় আরাম হয় সন্দেহ নাই, কিন্তু সমাজশরীরের ক্ষত কখনও আরাম হইবার সম্ভাবনা নাই। মনুষ্যজাতির সৃষ্টি হইতে আরম্ভ করিয়া মনুষ্যসমাজে পাপ-পুণ্য একই ভাবে রহিয়াছে; কারণ যে তিনটি উপাদানে জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—তাহাদের সমষ্টিতে পাপ ও পুণ্য উভয়ই আছে। তবে কখনও পুণ্যের ভাগ বাড়ে, পাপের ভাগ কমে, কখনও বা পাপের ভাগ বাড়ে, পুণ্যের ভাগ কমে। পাপ-পুণ্যের মিশ্রণ যদি মনুষ্যজাতির স্বভাব হয়, তবে মনুষ্যসমাজের অস্ত্রচিকিৎসা বা যে কোন চিকিৎসাই কর না কেন, তাহাকে কখনও পাপমুক্ত করিতে পারিবে না। বরং অনেক কুচিকিৎসক যেমন মনুষ্যশরীরে অস্ত্র করিয়া ক্ষত বাড়াইয়া নালিঘা করিয়া বসেন, এই সকল সমাজচিকিৎসকও তাঁহাদের আর্টের দ্বারা প্রলোভনময় পাপ-চিত্রকে অধিকতর মনোরম করিয়া সমাজের ক্ষত অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি করেন। সমাজে অনেক বিনোদিনী, বিমলা বা কিরণময়ী অপেক্ষাও খারাপ লোক আছে, সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহাদের কে খোঁজ রাখে? কবি তাঁহার আর্টের দ্বারা তাহাদের প্রালোভনময় পাপচিত্র অধিকতর প্রলোভনীয় করিয়া ধরাতে, তাহারা আমাদের পরিচিত হইয়াছে, এমন কি অনেকের অনুকরণীয়ও হইতে পারে। তবে, কবি কি পাপচিত্র তাঁহার কাব্য হইতে একেবারে বর্জ্জন করিবেন? তাহা কখনও সম্ভবপর নহে। তাহা হইলে কাব্য অসম্পূর্ণ হইবে, এবং আলোকের পার্শ্বে আঁধার না ধরিলে, চিত্র ফুটিবে কেন? আলো ও আঁধারের কি পরিমাণে মেশামিশি হইলে কাব্য সার্থক হইবে, তাহা প্রকৃত কলাবিৎ কবির বোধগম্য, সেখানেই তাঁহার আর্টের প্রকৃত পরিচয়। কবি পুণ্যের আলোক ফুটাইবার জন্য যেমন তাহার পাশে পাপচিত্র অঙ্কিত করিবেন, সেইরূপ আবার পাপের দণ্ডবিধান করিয়া পুণ্যের মর্য্যাদাবৃদ্ধি করিবেন, কারণ ইহাই সমাজের পক্ষে মঙ্গলজনক। এখানে আপত্তি হইতে পারে, এ সংস্কারে অনেক সময়ে

অধর্ম্মেরইত জয় দেখা যায়, পাপীর দণ্ড সব সময়ে দেখা যায় না ; সুতরাং কাব্যে তাহা দেখাইতে হইবে কেন ? ইহার উত্তরে আমি বলি, আমরা এ সংসারে মনুষ্যের জীবনের সবটুকু দেখিতে পাই না, অর্দ্ধাংশ দেখি মাত্র। তাহার মৃত্যুর পরে জীবনের অপরার্দ্ধ কিরূপে অতিবাহিত হয়, তাহা আমাদের প্রত্যক্ষের বিষয় নহে। সুতরাং পাপীর যে দণ্ড হইবে না, তাহা কে বলিতে পারে ? বরং মহাপুরুষদের বাক্য ও শাস্ত্র যদি সত্য হয়, তবে পাপের দণ্ড অবশ্যই ভোগ করিতে হয়, ইহাই আমাদিগকে বিশ্বাস করিতে হইবে। স্বভাবের (Nature) ঘটনা যাহা অসম্পূর্ণ থাকে, তাহা সুন্দর সৌষ্ঠবসম্পন্ন করিয়া দেখানই কবির কার্য্য। সুতরাং কবির সৃষ্টিতে আমরা জগতের হিতের জন্য নৈতিক জগতের Moral ouder of the universe একটা সম্পূর্ণ চিত্রই দেখিতে আশা করি। জগতের মহাকবিগণও এই পন্থাই অবলম্বন করিয়াছেন, ইহার নাম Poetic jnstice

কেহ বিজ্ঞানের দোহাই দিয়া বলিবেন, anatomy, Physiology Biology প্রভৃতি বিজ্ঞান যেরূপ জীবদেহের সব অংশ তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করে,—তাহার মধ্যে শ্লীলতা, অশ্লীলতা বলিয়া কোন কথা নাই—আজকাল এক শ্রেণীর কবি সমাজশরীরের ভাল মন্দ সব অংশই কাব্যকলার সাহায্যে তন্ন তন্ন করিয়া আমাদের সম্মুখে ধরিয়া দেখান। ইহার নাম realism in art বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতের কার্য্য যদি দোষাবহ না হয়, তবে কবির দোষ কোথায় ?

ইহার উত্তরে আমি বলি, শরীরবিজ্ঞানবিদের সহিত কবির অনেক পার্থক্য। শরীরবিজ্ঞানবিৎ মানবদেহের গোপনীয় অংশ যে ভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখান, তাহাতে কাহারও মনে রিপুর উত্তেজনা হয় না—কিন্তু কবি অথবা চিত্রকর নগ্ন মানবদেহ বা সমাজকে তাঁহার শিল্পকলার সাহায্যে যেরূপ লোভনীয় করিয়া চিত্রিত করেন, তাহাতে সাধারণ নর-নারীর মনে কুভাবের উদয় হওয়াই স্বাভাবিক। এই কারণে Reynolds, zole প্রভৃতি বিখ্যাত উপন্যাসলেখকের গ্রন্থ পাঠ করা অনেকে দোষাবহ মনে করেন। যদি কেহ সমাজের হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া সমাজের কলঙ্ক প্রচার করিতে ইচ্ছা করেন, তবে তিনি কাব্যের সাহায্য না লইয়া অন্যবিধ রচনা দ্বারাও ত তাহা প্রকাশ করিতে পারেন। বিজ্ঞানের ভাষা কাব্যের ভাষা নহে, বৈজ্ঞানিক কখনও তাঁহার বৈজ্ঞানিক সত্য প্রচারের জন্য কাব্যের আশ্রয় গ্রহণ করেন না।

আর একটি কথা হইতে পারে—প্রেম মানবহৃদয়ের স্বাভাবিক আকর্ষণ, তাহার মধ্যে আবার বিধবা সধবা কি ? প্রত্যেক মানুষই তাহার স্বভাবসিদ্ধ

শক্তি বা গুণ লইয়া জন্মগ্রহণ করে, এবং স্বভাবের নিয়মানুসারে অন্যের সংসর্গে আসিয়া ক্রমে সেই সকল গুণ বা শক্তির বিকাশের (development) দ্বারা তাহার মনুষ্যত্ব লাভ করে। প্রেম তাহার হৃদয়ের একটা স্বাভাবিক বৃত্তি, সেই প্রেম তাহাকে অন্যের সংসর্গে আনিয়া বা অন্যের সহিত বাঁধিয়া তাহার মনুষ্যত্ব বিকাশের সাহায্য করে। সুতরাং সেই প্রেমের সম্বন্ধ খর্ব্ব বা সীমাবদ্ধ করিয়া তাহার মনুষ্যত্ব লাভের বাধা জন্মানে কাহারও অধিকার নাই। অর্থাৎ এক কথায়, individual (ব্যক্তি বিশেষের) পরিণতির উপ র s cie'y (সমাজের) হস্তক্ষেপ করিবার কোন অধিকার নাই। অন্য ভাবে বলিতে গেলে মন্ত্রপড়া বিবাহটা ব্যক্তিত্ব-বিকাশের বাধা জন্মাইলে তাহাকে অগ্রাহ্য করাই উচিত। কোন কোন কবি এই ভাবে সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা তুলিয়াছেন। "ঘরে বাইরের" নিখিলেশ এই ভাবে বিমলার সহিত নিজের মন্ত্র-পড়া বিবাহ সম্বন্ধ কতকটা অগ্রাহ্য করিয়া তাহার মনুষ্যত্বের বিকাশের জন্য পরপুরুষের সহিত তাহার মিলন ঘটাইয়াছেন। "স্বামীর" নায়িকা সৌদামিনীকে নরেন এই অর্থে সৌদামিনীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে সংঘটিত মন্ত্রপড়া বিবাহসম্বন্ধ লাথি মারিয়া ভাঙ্গিয়া তাহার নিজের সঙ্গে বাহির হইয়া যাইতে উপদেশ দিয়াছিল। "দেবদাসের" পার্ব্বতীর আজীবন দুঃখও তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সংঘটিত মন্ত্রপড়া বিবাহ হইতে সঞ্জাত। কবি যেন ইঙ্গিতে দেখাইতে চান, একজন নিরপরাধ নারীকে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে অন্য পুরুষের সঙ্গে মন্ত্র পড়িয়া বাঁধিয়া দিয়া তাহাকে যাবজ্জীবন কষ্ট দেওয়াতে সমাজের কোন অধিকার নাই। আবার এই কবিই তাঁহার "শ্রীকান্ত" আখ্যায়িকায় এই কথাটা আর একটি চরিত্রের মধ্য দিয়া অধিকতর স্পষ্ট করিয়া খুব জোরের সহিত তুলিয়াছেন। অভয়া নাম্নী একটি যুবতী তাহার স্বামী কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইয়া রোহিণীনামক পর পুরুষের সঙ্গে বাহির হইয়া স্বামীর উদ্দেশ্যে রেঙ্গুনে গিয়াছিল; সেখানে শ্রীকান্তের চেষ্টায় তাহার স্বামীর সঙ্গে দেখা হইল বটে—কিন্তু সেই পাষণ্ড তখন এক বর্ম্মিজ রমণীকে লইয়া ঘর করিতেছিল, তাহার সুখের ঘরকন্নার মধ্যে অভয়া কেন আসিল বলিয়া সে অভয়াকে নিতান্ত নির্দ্দয়-ভাবে প্রহার করিয়া তাড়াইয়া দিল। তখন অভয়া সেই রোহিণীর বাসায়ই ফিরিয়া আসিয়া তাহার সঙ্গে পূর্ব্ববৎ স্বামি-স্ত্রীভাবে বাস করিতে লাগিল। এই অভয়াও কিরণময়ীর ন্যায় প্রখর বুদ্ধিশালিনী, সে শ্রীকান্তকে এইরূপ বলিতেছে :—

"শ্রীকান্ত বাবু আপনি একটা 'কিন্তু' পর্য্যন্ত বলেই থেমে গেলেন। অর্থাৎ সেখান থেকে আমার চলে আসাটা অন্যায় হয় নি—'কিন্তু'—এই 'কিন্তু' টার অর্থ কি এই যে, যার স্বামী এত বড় অপরাধ করেচে, তার স্ত্রীকে তার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তে সারাজীবন জীবন্মৃত হ'য়ে থাকাই তার নারীজন্মের চরম সার্থকতা ? একদিন আমাকে দিয়ে বিয়ের মন্ত্র বলিয়ে নেওয়া হয়েছিল—সেই 'বলিয়ে-নেওয়াটা'ই কি আমার জীবনের একমাত্র সত্য, আর সমস্তই একেবারে মিথ্যে ? এত বড় অন্যায়, এত বড় নিষ্ঠুর অত্যাচার কিছুই আমার পক্ষে একেবারে কিছু না ? আর আমার পত্নীত্বের অধিকার নেই, আমার মা হবার অধিকার নেই, সমাজ, সংসার, আনন্দ কিছুতেই আর আমার কিছুমাত্র অধিকার নেই ? একজন নির্দ্দয়, মিথ্যাবাদী, কদাচারী স্বামী বিনাদোষে তার স্ত্রীকে তাড়িয়ে দিলে বলেই কি তার সমস্ত নারীত্ব ব্যর্থ হওয়া চাই ? এইজন্যই কি ভগবান্ মেয়ে মানুষ গড়ে তাকে পৃথিবীতে পাঠিয়ে ছিলেন ?"

এই Individual 'Versus' Societyর দ্বন্দ্ব সংক্ষেপে মীমাংসা করা কঠিন। আর ইহার কোন উপযুক্ত মীমাংসা আছে কিনা তাহাও জানি না। তবে সংক্ষেপে এই মাত্র বলা যায়, প্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিতগণের মতে ঈশ্বরের সৃষ্টিটা এখনও ঠিক চরম পরিণতিতে (perfection) উপস্থিত হয় নাই, এখনও ইহার মধ্যে সকল বিষয়ে ন্যায় ধর্ম্মের (justice) পরাকাষ্ঠা দেখিতে পাওয়া যায় না, এখনও অনেক বিষয়ে অন্যায়, অধর্ম্মের অত্যাচার রহিয়াছে; তাহা যেমন ব্যক্তিবিশেষের জীবনে, তেমন সমাজে—উভয়তই সমান। তবে সমাজ প্রত্যেক ব্যক্তির চরম সুখ ও মঙ্গলের ব্যবস্থা করিতে না পারিলেও, যাহাতে অধিকাংশ লোকের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে সুখ ও মঙ্গল হয়—greatest good of the greatest number—তাহারই ব্যবস্থা করিয়াছে। "পার্ব্বতী", "সৌদামিনী," "অভয়া"—ইহারা সেই সমাজ-ব্যবস্থার অল্পসংখ্যকের মধ্যে অর্থাৎ exception এর মধ্যে পড়িয়াছে। ইহারা যেন রেলপথে চলিতে চলিতে কোন accident (দুর্ঘটনা) বশতঃ আহত হইয়া চীৎকার করিয়া বলিতেছে—"যে গাড়ীতে উঠিয়া আমাদের এই দুর্দ্দশা হইল, ইহার জন্য দায়ী সেই রেলগাড়ী, অতএব আর কেহ গাড়ীতে চড়িও না।" ইহাদের দুঃখের আর্ত্তনাদ শুনিয়া আমাদের হৃদয় ব্যথিত হয় সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহাদিগের সান্ত্বনা এই যে,—"তোমরা এ জীবনে সুখী হইতে পারিলে না, ইহা তোমাদের দুর্ভাগ্য। কিন্তু তোমরা বিশ্বাস কর, মানুষে

ভাগ্যবিধাতা একজন আছেন। তোমরা তাঁহার দয়ার উপর নির্ভর কর। এ জন্মে না হয় পরজন্মে তিনি নিশ্চয়ই তোমাদের সুখ দিবেন। দুঃখের পর সুখ ও সুখের পর দুঃখ—ইহাই ত জগতের নিয়ম। আর প্রকৃত কথা বলিতে গেলে নিরবচ্ছিন্ন সুখ কাহারও ভাগ্যে ঘটে না। পৃথিবীর মহীয়সী রমণীগণ দুঃখাগ্নিতে জীবনাহুতি দিয়াই ত চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন।”

অভয়া তাহার পাষণ্ড স্বামীর অত্যাচারে তাহার নারীজন্ম সার্থক হইল না বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছে, কিন্তু যে সকল সমাজে পুরুষ ও নারী পরস্পরকে নির্ব্বাচন করিয়া লইতে পারে, ও অল্প কারণেই যাহাদের সেই বিবাহবন্ধন ছেদন করিবার অধিকার আছে, সেই সকল সমাজেই কি সকল স্ত্রীর নারীজন্ম সার্থক হয়? কত শত রমণীর বিবাহই ঘটিয়া উঠে না। আবার বিবাহ হইলেও স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে কলহবিবাদ হইয়া চিরজীবনের জন্য তাহারা পৃথক্ হইয়া থাকে। ইংলণ্ডের প্রসি উপন্যাসরচয়িত্রী George Eliotএর জীবনে আমরা কি দেখিতে পাই? তাঁহার প্রকৃত নাম Mary Ann Erans, ইনি George Henry Lewis নামক একজন বিখ্যাত সাহিত্যিকের প্রতি প্রেমাসক্ত হইয়া, তাঁহার স্ত্রী জীবিত থাকা সত্ত্বেও, তাঁহার সঙ্গে স্বামি-স্ত্রী-ভাবে একত্র বাস করিতেন। পরে Lewisএর মৃত্যু হইলে তিনি অন্যত্র গমন করেন। একজন সমালোচক George Eliot এর এই জীবন যাপন সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—“While it must be said that George Eliot herself always spoke of this relationship as sacred and moral, most writers are agreed that much of the melancholy of her life was due to the difficult situation in which this act placed her.” কিন্তু তাই বলিয়া কি তিনি তাঁহার উপন্যাসে সমাজে প্রচলিত মন্ত্র পড়া বিবাহের নিন্দা করিয়াছেন? তাহা কখনও নহে। এই সমালোচকই বলিতেছেন,—“In all her best books there seems to be a tendency to insist upon the sanctity of traditional bonds which whatever their origin, are essential to social welfare. In story after story she attempted to impress on her readers the sacredness of the marriage relations which her own action had apparently shown her to be indifferent.”

(“Times of India”—Dec. 1919.)

শ্রীকান্তের অভয়া যাহাই বলুক, সেই মন্ত্রপড়া বিবাহ সকল সমাজেই অধিকাংশ নর-নারীর কল্যাণকর বলিয়া চিরদিন স্বীকৃত হইয়া আসিয়াছে। এই মন্ত্রপড়া বিবাহই সুসভ্য সমাজকে অসভ্য ও ইতর-প্রাণী হইতে পৃথক্ করে। ইহাতে যাহার সুখ হয় না,—তাহার নিজেরই দুর্ভাগ্য, নিজেরই কর্ম্মফল বলিতে হইবে। আসল কথা এই—প্রতি মানুষেরই সুখ দুঃখ তাহার নিজ নিজ কর্ম্মের ফল—আমরা হিন্দুজাতি—আমরা বিশ্বাস করি, প্রতি মানুষের নিজ নিজ কর্ম্মের মধ্য দিয়াই তাহার বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ ব্যক্তিত্ব (individuality) গঠিত হয়। আমরা এই কর্ম্মবিধানের (Law of Karma) মধ্য দিয়াই মনুষ্য জীবনের সুখদুঃখাদি জটিল তত্ত্বের মীমাংসা করিতে চেষ্টা করি। তুমি যদি ঈশ্বর না মান,—পরকাল না মান, কর্ম্মফল না মান, তবে তোমাকে ইহা বুঝান শক্ত হইবে।

'অহং'এর অহঙ্কার।

আমি না রহিলে বঁধু
তুমি যে কেমনে রবে ?
তোমার তুমিত্ব যে গো,
সাথে সাথে লয় পাবে।
আমি জীয়ে না রহিলে
এ চির যামিনী জাগি,
তোমার বিরহে কেঁদে
কে ফুলাবে মদির আঁখি।
'তুমি' যে হ'য়েছ 'আমি'
পরশি অহং রাগ,
পরশি সোণার কাঠি,
জেগেছে জীবন-যাগ্।
তোমাতে না পেয়ে কিছু,
আমাতে দিয়েছ ধরা,
আমারি মাঝারে তব
পরিপূর্ণ প্রেম-ভরা।

আমি যে তোমার সব—
রূপ-গুণ-প্রেম-ময়ী,
আমারি পরশে তুমি
সুন্দর ভুবন-জয়ী।
তুমি ত কিছু না বঁধু
হীনরাগ অনুরাগ,
আমি ত তোমারি সব
আমারি ভেস্কীর লাগ।
তুমি যে উঠেছ জেগে
আমারি পরশলাগি,
আমিই দিয়েছি জেলে
ও চিত্তে প্রেমের আগি।
(তাই) লুকাইয়া কর প্রেম
লাজ পাও দিতে ধরা,
তোমাতে আমাতে হেন
গোপন পিরিতি করা।
তুমি যে হ'য়েছ মধু
তুমি সৌন্দর্য্যের সার,
আমার মাঝারে তুমি
সতত মধুরাকার।
তাই আমি
ভ্রমি সদা রূপ-ফুলে,
সুরভিতে মাতোয়ারা
মধুকর সম বুলে,
একেরই বিহার-ক্ষেত্র
বহুরূপা মায়াময়ী,
সতেরই বিকাশ আমি
অ-সতী ভুবনজয়ী।

শ্রীগিরীন্দ্রমোহিনী দাসী

আমার কথা।

সে কি আজকের কথা! আমি যখন সবে কলিকাতায় খবরের কাগজের চাকরী লইয়া আসিয়াছিলাম, তখন দামিনীদীপ্তির চপল খেলার মধ্যে হ্যারিসন রোডে আমি সুরেশচন্দ্রকে দেখিতে পাই। আমার কিশোর-সখা শ্রীমান্ নিখিলনাথ রায় এ পরিচয়ের মধ্যস্থতা করেন। তখন সুরেশ কৈশোর পার হইয়া যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন, আমি পূর্ণাঙ্গ যুবক। সেই দিন হইতে আমি দাদা সাজিলাম,-সুরেশের দাদা বলিয়া সাহিত্যক্ষেত্রের অনেকেই—প্রায় সকলেই, আমাকে দাদা বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করেন। ইহার পূর্ব্বে আমি ঘরে-বাহিরে কোনখানেই দাদা সাজিতে পারি নাই,—আমিই সকলকে দাদা বলিয়া ডাকিতাম। বঙ্গবাসী আফিসে আসিয়া, ইন্দ্রনাথ, কৃষ্ণচন্দ্র, ব্রজরাজ, অক্ষয়চন্দ্র, চন্দ্রশেখর, চন্দ্রনাথ, ক্ষেত্রমোহন, বিহারীলাল প্রভৃতি সকলকেই আমি দাদা বলিয়া ডাকিতাম। সকলের কাছেই আমাকে একটু ছোট হইয়া, খাট হইয়া থাকিতে হইত। সুরেশই আমাকে সর্ব্বাগ্রে দাদা বলিয়া, দাদা বানাইয়া, আমার হেঁটমুণ্ডকে উন্নত করিয়া দিয়াছিল। সেই সুরেশ তাহার দাদাকে ফেলিয়া চলিয়া গেল!

বঙ্গবাসীর চাকরী গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে আমি যে সুরেশ-যতীশকে দেখি নাই বা চিনিতাম না, তাহা নহে। বিদ্যাসাগর মহাশয় আমাকে চিনিতেন ও জানিতেন; সম্পর্কে আমি তাঁহার নাত্-জামাই ছিলাম! মেট্রপলিটান কলেজের সুপারিন্টেন্ডেণ্ট ৺ ব্রজনাথ আমাকে স্নেহ করিতেন, তাঁহার সঙ্গে আমি অনেকবার সাগর দর্শনে গিয়াছি। অনেক সময়ে ৺ ভূধর চট্টোপাধ্যায়, স্বামী বিবেকানন্দ (তখন নরেন্দ্রনাথ দত্ত) আমার সাথী হইতেন। সে সময়ে সুরেশকে দূর হইতে দেখিতে পাইতাম। বঙ্গবাসীর সম্পাদক হইবার পর, ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগ হইতে সুরেশের সহিত আমার ঘনিষ্ঠতা হয়। আমি তাহার দাদা সাজিলাম। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্ব অবস্থায়ও সুরেশ ঘোর প্রলাপে তাহার "পাঁচু দাদা"র কথা কহিয়াছে; আমার আহত অবস্থার কথা শুনিয়া দেখিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছে! আমার দুর্ভাগ্য শেষ দিনে আমি

তাহার মুখখানি দেখিতে পাই নাই; উভয়ে এ জগতে শেষ দেখা হয় নাই।

দাদা-সম্বন্ধের কথাটা এমন করিয়া ফলাইয়া বলিবার হেতু আছে। আমি আমার জনক-জননীর একমাত্র সন্তান, আমার সহোদর ভাই-ভগিনী নাই। দূর জ্ঞাতি বা বান্ধব সম্পর্কের এবং পাতান সম্পর্কের ভাই-ভগিনী লইয়া আমার সৌভ্রাতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে হইয়াছে। সেকেলে ব্রাহ্মণবংশের বংশধর আমি কখনও পাতান এবং আসল সম্বন্ধের বৈষম্য বিচার করিতে শিখি নাই। আমার কাছে পাতান দাদাও যেমন দাদা, আসল দাদাও তেমনি দাদা; এ ব্যাপারে জাতিবর্ণ ধর্ম্ম কোন বিচারই করিবার আমাদের অধিকার ছিল না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গৃহেও এই ভাব প্রবল ছিল; সুরেশের মা আমার জননীতুল্যা পূজনীয়া; সুরেশও আমার জননীকে তাহার জননীর সমাদর দিতে কখনই ক্রটি করিতেন না। আমাদের উভয়ের মধ্যে, ভাইয়ে—ভাইয়ে খুব জোর সাহিত্যিক ঝগড়া চলিতেছে,সে সময়ে উভয়ের জননী উভয়কে ডাকাইয়া পাঠাইলে উভয়েই এক অপরের অনুপস্থিতিতে মাতৃদর্শন করিতে ক্রটি করিতাম না। ঠিক এই ভাবে, এই স্নেহের প্রগাঢ় সম্বন্ধে সম্বদ্ধ, ভাই আমার আর সংখ্যায় তত অধিক নাই। একে একে অনেকেই আমাকে একলা ফেলিয়া ফাঁকি দিয়া চলিয়া গিয়াছেন। সুরেশের মহাপ্রস্থানটা একটু অপূর্ব্ব রকমের হইল। সে কনিষ্ঠ, আমার শিষ্যতুল্য স্নেহের পাত্র, সে চলিয়া গেল—আর আমি জ্যেষ্ঠ আমাকে তাহার "সাহিত্যের" ভার গ্রহণ করিতে হইল, তাহার শোকজীর্ণা জননীর এবং শোকদগ্ধা পত্নীর রক্ষার ভার স্কন্ধে লইতে হইল। এতটা দাগা আমাকে আর কেহ দেয় নাই; এমন জব্দ আর কেহ করে নাই; শোক-শিশির স্নিগ্ধ স্নেহের নাগপাশে বাঁধিয়া রাখিয়া আর কেহ চলিয়া যায় নাই। জানিনা এভার বহন করিয়া আমি কত দিন জীবিত থাকিব; জানি না এমন নাগপাশে আবদ্ধ আমি কতদিন থাকিতে পারিব; জানিনা এ ভার বহনের যোগ্যতা আমার আছে কি না,—আমি সুরেশের "সাহিত্য" পত্রকে নিষ্কলঙ্ক ও নিরাবিল-ভাবে রক্ষা করিতে পারিব কি না!

সুরেশচন্দ্রের পৈতামহ বাসস্থান নদীয়া কৃষ্ণনগর জেলার আংশমালী গ্রামে ছিল। উঁহারা বাৎস্য গোত্রের ঘোষাল, শ্রোত্রিয়; সমাজপতি উপাধি উঁহাদের কবে হইতে হইয়াছিল, তাহার কোন বৈজ্ঞানিক ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই। তবে গল্পে শুনিয়াছি যে, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র একবার রাঢ়ীয় কুলীন ব্রাহ্মণসমাজের

গোষ্ঠীপতি হইয়া মালাচন্দনের প্রার্থী হন। সমবেত কুলীনগণ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে মালাচন্দন দিতে অস্বীকৃত হয়। মালা ও চন্দন হাতে করিলে তাহার বিনিয়োগ করিতেই হয়, ফেলিয়া যাইতে নাই। সম্মুখে শ্রোত্রিয় ঘোষালকে পাইয়া অনেকে তাঁহাকেই মালাচন্দন দান করেন। সেই অবধি উহাদের উপাধি নাকি সমাজপতি হইয়াছিল। সুরেশচন্দ্রের জনক ৺গোপালচন্দ্র সমাজপতি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে লেখাপড়া করিতেন; সেই সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় গোপালচন্দ্রকে দেখিয়া পছন্দ করেন এবং জ্যেষ্ঠা কন্যাকে এই পাত্রেই দান করেন। তখন বিধবা-বিবাহের জোর হুজুগ চলিতেছিল, গোপালচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জামাতা হইয়া সামাজিক হিসাবে একটু গোলে পড়িয়া ছিলেন। তাই তাঁহাকে অধিকাংশ সময়ে শ্বশুরগৃহে বাস করিতে হইত। গোপালচন্দ্র হা-ভাতে হা-ঘরে ঘরের ছেলে ছিলেন না; তাঁহার আত্মীয় স্বজন, জ্ঞাতিগোষ্ঠী অনেক ছিল। সেকালের ব্রাহ্মণের জীবিকা নির্ব্বাহের উদ্দেশ্যে যতটুকু ভূ-সম্পত্তি থাকিলে সাড্ডল বলা চলিত, তাহা গোপালচন্দ্রের যে ছিল না, এমন কথা বলিতে পারি না। অতি অল্প বয়সে গোপালচন্দ্র কাশী যাইয়া ওলাউঠা রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হন। সুরেশ-যতীশ দুই ভাই, মাতামহের গৃহেই মানুষ হইয়াছিলেন।

সুরেশের জন্মতিথি, লগ্ন, নক্ষত্র প্রভৃতি তাহার কোষ্ঠী হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

চৈত্র মাস, কৃষ্ণা-চতুর্দ্দশী, বুধবার, মকর লগ্ন। উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্র। মীন রাশি, বিপ্রবর্ণ। ইহাই সুরেশের কোষ্ঠীলিখিত জন্মকালের বিবরণ।

সুরেশ আকারে অবয়বে তাহার জনকের অনুরূপই ছিলেন। নির্ভীক তেজস্বী পুরুষ গোপাল চন্দ্রের মতন খুব কম যুবকই তখনকার সংস্কৃত কলেজে ছিলেন। সুরেশ তাহার জনকের এই গুণ পাইয়াছিল।

সুরেশচন্দ্র চলিয়া গিয়াছেন, ত্রিশ বৎসরকাল অব্যাহতভাবে সাহিত্য-সম্পাদন করিয়া চলিয়া গেলেন। মনে হয় তাঁহার জননী ও পত্নী যতদিন জীবিত থাকিবেন, এ পক্ষে অর্থস্বাচ্ছল্য যতদিন থাকিবে, আমি যতদিন সমর্থ ও সজ্ঞান থাকিব, ততদিন "সাহিত্য" চলিবে। ইহা ছাড়া "সাহিত্য" প্রচারের ভার গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্য একটা স্বতন্ত্র আছে। আমাদের ইংরেজিশিক্ষিত হিন্দু-সমাজের মুখপত্রস্বরূপ অধুনা কোন মাসিক পত্র তেমন প্রবলভাবে চলিতেছে না। বঙ্গদর্শন, নবজীবন, প্রচার প্রভৃতি মাসিকপত্র সকল সাহিত্যের ও সমাজের যে সেবা করিয়া গিয়াছেন, ঠিক সেই ভাবের সেবা এখন কেহ করিতে পারিতেছে না।

এই অভাব দূর করিবার উদ্দেশ্যেই আমরা "সাহিত্যে"র ভার গ্রহণ করিলাম। "সাহিত্য" ঠিকমত সাম্প্রদায়িক মাসিক পত্র না হইলেও, উহা যে হিন্দু শিক্ষিত বিদ্বজ্জনসমাজের পত্ররূপে পরিচালিত হইবে, এ পক্ষে আমাদের চেষ্টার ত্রুটি হইবে না। তবে সে পক্ষে পর্য্যাপ্ত যোগ্যতা ফুটাইতে পারিব কি না বলিতে পারি না। যে বয়স হইয়াছে, তাহাতে নূতন 'সাহিত্য'-বন্ধু গড়িয়া তুলিতে পারিব না,—অবসর ও সময়ে কুলাইবে না, সামর্থ্যেও কুলাইবে না। আশা আছে 'বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি'র পৃষ্ঠপোষকগণ, সুরেন্দ্রনাথ-নিখিলনাথ-প্রমুখ শৈশবসখা সকল, সতীন্দ্রমোহন সিংহ-প্রমুখ নবীন ও প্রৌঢ় স্নেহাস্পদ লেখক সকল আমাকে সহায়তা করিতে কোনরূপ কৃপণতা করিবেন না। সুরেশচন্দ্র কোন্ নীতি অবলম্বন করিয়া এতকাল সাহিত্য চালাইয়াছিলেন, মাসিক সাহিত্য সমালোচনে মতামত প্রকাশ করিতেন, তাহা আমি জানি এবং বুঝি; সে নীতির ব্যতিক্রম যাহাতে না ঘটে, সে চেষ্টাও করিব।

এ সকল কথা লিখিতে যে কতটা বেদনা পাইতে হইতেছে, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করিবার উপায় নাই। দিন যা'বে দিন রবে না, কেবল শোকের ও বেদনার স্মৃতি থাকিয়া যাইবে। তাহা তো দূর হইবার নহে। স্মৃতির বেদনার বোঝা লইয়া এই মাস হইতে সাহিত্যের সম্পাদনভার লইলাম; এখন "যদ্বিধের্মনসি স্থিতম্"।

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।



সুরেশ-স্মৃতি।

ভগ্ন স্বাস্থ্য লইয়া পুরীধামের সমুদ্রসৈকতে শয্যা গ্রহণ করিয়াছিলাম। যখন দেশে ফিরিলাম, তখন আর কর্ম্মশক্তি ফিরিয়া পাইলাম না। দেহ দুর্ব্বল, মন অবসন্ন, কর্ম্ম শৃঙ্খলাহীন,—দিনগুলি কোনরূপে কাটিয়া যাইতে লাগিল। এমন অসময়ে সংবাদ পাইলাম,—সমাজপতি নাই, 'সাহিত্য' নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছে! আছে কেবল স্মৃতি,—সুখদুঃখবিজড়িত এক অনির্ব্বচনীয় স্মৃতি,—তাহাও কালে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে!

সকলই যায়, কর্ম্মফল যায় না; সমাজপতি ও 'সাহিত্য' যাহা করিয়া গিয়াছে, তাহা যাইতে পারে না। নাম যায়, স্মৃতি যায়, কর্ম্মফল কদাচ লুপ্ত হয় না।

এতদিন কেহ তাহার কথা জিজ্ঞাসা করে নাই। বন্ধুজন প্রথারক্ষার্থ শোক-সভা করিয়া হৃদয়ভার লঘু করিয়া লইয়াছে, সামাজিক কর্ত্তব্য পরিসমাপ্ত হইয়াছে। একখানা চিত্রপট কিছুদিন কীটকীটাণুর দ্বন্দ্বযুদ্ধে আত্মরক্ষার চেষ্টা করিবে।

এখন শুনিতেছি, 'সাহিত্যে'র পুনঃ প্রচারের প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছে, তাহার যথাযোগ্য আয়োজন হইয়াছে, আবার 'সাহিত্য' বাহির হইতেছে। যাঁহারা এই কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহারা সাধুবাদের পাত্র। তাঁহাদের চেষ্টা সাধু চেষ্টা, তাহার সহিত 'অসহযোগ' চলে না। তাই এ সম্বন্ধে কিছু লিখিবার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়াছি। সমাজপতির সহযোগিগণ কেহই বেশী কথা লিখিতে পারিবেন না, কারণ, সকলের পক্ষেই 'সাহিত্যের' কথা অল্প বিস্তর আত্মকথা।

'সাহিত্যে'র একটা আসর ছিল। সুর ছিল বলিয়াই আসর ছিল। অর্থ ছিল না, প্রভুত্ব ছিল না, নিয়মিত সময়ে প্রকাশিত হইবার সামর্থ্য ছিল না। তথাপি 'সাহিত্যের' আদর ছিল, কদর ছিল, সমজদার ছিল। তাহার কারণ ঐ সুর। তাহা দেশের সুর, দশের সুর, একতান বাদ্যের সম্মিলিত সুর। তাহাতে অপূর্ণতা ছিল না, অবসাদ ছিল না, 'হা হতোঽস্মি' ছিল না, প্রাণপূর্ণতা ছিল।

কি ছিল, এক কথায় তাহা ব্যক্ত করা যায় না। কি ছিল না, তাহা এক কথায় ব্যক্ত করা যায়, ছিল না—ভণ্ডামি। তাহা অশেষ মূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করিয়া বঙ্গসাহিত্যের অশেষ কল্যাণ সাধন করিত।

প্রবন্ধনির্ব্বাচনের কড়াকড়ি 'সাহিত্য'কে, এই অসাধারণ গৌরব দান করিয়াছিল। এখন লেখকের সংখ্যা অসংখ্য, বুঝি বা পাঠকের সংখ্যা অপেক্ষা অধিক। এমন দিনে যে কেহ লিখিতেছেন, যাহা ইচ্ছা লিখিতেছেন, বিষয়-বিন্যাসে ও বচনবিন্যাসে স্বেচ্ছাচার সমানভাবে প্রশ্রয় লাভ করিতেছে। এমন দিনে প্রবন্ধ নির্ব্বাচন করা যে কত কঠিন, তাহা 'সাহিত্য' সম্পাদককে সর্ব্বদা স্বীকার করিতে হইত। তথাপি দৃঢ়তা তাঁহার রক্ষাকবচ ছিল।

এই দৃঢ়তা কেবল প্রবন্ধবর্জ্জনেই ব্যক্ত হইত না, প্রবন্ধসৃষ্টিতেও ইহা আর এক আকারে আত্মপ্রকাশ করিত, তাহা আব্দার। সম্পাদক অনেক সময়ে নিজেই বিষয়নির্ব্বাচন করিতেন, লেখক নির্ব্বাচন করিতেন, এবং লেখার জন্য ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেন। এই দৃঢ়তা 'সাহিত্যে'র আসরে যাহাদিগকে টানিয়া আনিয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই হয় ত টানাটানিতে না পড়িলে লেখনী ধারণ করিতেন না। ইহাতে অনেক নূতন পুরাতন লেখক জড়তা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ইহার জন্য যে তাড়না ছিল, সে বড় মধুর স্নেহের তাড়না, তাহা কেমন করিয়া প্রয়োগ করিতে হয়, সমাজপতিই তাহা জানিতেন।

'সাহিত্যে' ভণ্ডামি ছিল না বলিয়াই গোঁড়ামি তাহাকে সঙ্কীর্ণ নীতিতে গণ্ডীবদ্ধ করিতে পারে নাই। এই উদারতা না থাকিলে প্রকৃত সাহিত্য গড়িয়া উঠিতে পারে না। বিদেশের সাহিত্যে যাহা কিছু ভাল বাহির হইত, বিদেশী-বর্জ্জনের তুমুল আন্দোলনের দিনেও, তাহা সাদরে সাহিত্যে স্থান লাভ করিত।

সাহিত্যের সমালোচনা 'সাহিত্যে'র বিশিষ্ট গৌরব বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। তাহাতে অকুণ্ঠিতভাবে তিরস্কার পুরস্কার বিতরিত হইত। সাহিত্যকে অনাবিল রসের আধার করিবার আন্তরিক আকুলতাই 'সাহিত্য'-সম্পাদককে সমালোচনায় সীমাশূন্য, ক্ষমাশূন্য কশাঘাত প্রকাশ করিতে অভ্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। মমত্ববোধ যত আন্তরিক হয়, অনধিকারচর্চ্চাকে সুশাসিত করিবার ইচ্ছা ততই প্রবল হইয়া থাকে। আমার দেশ, আমার ভাষা, আমার সাহিত্য, এই মমত্ববোধ প্রবল হইলে, তাহার প্রতি উৎপীড়ন অত্যাচার নিবারণের জন্য স্বতই সীমাশূন্য ক্ষমাশূন্য কশাঘাত প্রয়োগ করিবার প্রয়োজন অনুভূত হইয়া থাকে। ইহাতে বঙ্গসাহিত্য ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই,—লাভবান্ হইয়াছে।

সুরেশ শক্তিধর ছিল। বক্তৃতায় ও রচনায় তাহার অনেক পরিচয় প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছে। তাহার মূল আন্তরিকতা। এই গুণ তাহার অনেক দোষ ঢাকিয়া ফেলিয়াছিল, এই গুণে অনেক সময়ে তাহাকে তিরস্কার করিতে গিয়া ক্ষমা করিয়া ফিরিয়া আসিতে হইত। সুরেশ চলিয়া যাইবে, আমাকে তাহার কথা লিখিতে হইবে, এমন কথা একদিনও মনে হয় নাই। ইহাই আমার প্রধান শোক। বড়াল কবি বাঁচিয়া থাকিলে শোক যথাযোগ্য ভাষায় প্রকাশিত হইতে পারিত। আমার পক্ষে নীরবে অশ্রুপাতই শোকপ্রকাশের একমাত্র উপায়। যাহা গিয়াছে, তাহা গিয়াছে। তাহার আরব্ধ কার্য্য সমাপ্ত হয় নাই, 'সাহিত্যে'র প্রয়োজন তিরোহিত হয় নাই, বরং তাহা কিছু অধিক হইয়া উঠিতেছে। যাঁহারা ইহার পুনঃপ্রচারে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, তাঁহাদের সাধু চেষ্টা সফল হউক।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

আসামে বিবেকানন্দ।*

আজ ঠিক ২৮ বৎসর হইল, স্বামী বিবেকানন্দ গৌহাটি সহরে সদলবলে আগমন করেন; এখানে কয়েকদিন অবস্থান করিয়া ৺কামাখ্যা দর্শনান্তে শিলং যান এবং তথা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পুনশ্চ দু-একদিন এখানে থাকেন। তখন গৌহাটিতে সেন্‌সাস্ আফিস ছিল—সেই আফিসে কাজ করিতাম। তাই বিবেকানন্দের দর্শনলাভের সুযোগ ঘটিয়াছিল—শিলং যাওয়া-আসা উভয় কালেই তাঁহার সঙ্গে আমার আলাপ হইয়াছিল।

১৩০৭ সালের মহাবিষুব সংক্রান্তির কয়েকদিন পূর্ব্বে স্বামী বিবেকানন্দ গৌহাটি সহরে আগমন করেন। সঙ্গে অনেক পুরুষ এবং দু-একজন স্ত্রীলোকও ছিলেন—তাঁহার জননীও না কি ৺কামাখ্যা দর্শনার্থ এখানে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের অবস্থানের নিমিত্ত একটি সুবৃহৎ 'বাঙ্গালা' ঘর দেওয়া হয়—এবং গৌহাটীস্থ সর্ব্বসাধারণ হইতে চাঁদা সংগ্রহপূর্ব্বক তাঁহাদের আহার ও যাতায়াতের ব্যয় প্রদান করা হয়।

বিষুব সংক্রান্তির পূর্ব্ব দিবস অপরাহ্ণে জনৈক ভদ্রলোক সহ আমি ঐ বাঙ্গলো ঘরে যাই। বারান্দায় একখানি টুলের উপর একটি গৌরবর্ণ 'গেরুয়া ধুতি ও গেঞ্জি পরা' লোক একাকী বসিয়া আছেন—চুলগুলি এলোমেলো, পান চিবাইয়া ঠোঁট লাল হইয়াছে; দেখিয়া মনে করিলাম, ইনি বোধ হয় স্বামীজীর

---

* 'সাহিত্য' পত্রে প্রকাশিত হইবার জন্য যখন ৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের পত্র কয়েকখানি পাঠাই, তখন ৺সুরেশ সমাজপতি মহাশয় জিজ্ঞাসা করেন, ঈদৃশ আরো চিঠিপত্র আছে কি না? উত্তরে লিখি, যে সকল চিঠি আছে, তাহার লেখকগণ সৌভাগ্যক্রমে জীবিত—তবে ৺স্বামী বিবেকানন্দ গৌহাটি আসিলে তাঁহার সঙ্গে যে সকল আলাপ আলোচনা হয়, তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া প্রকাশার্থে পাঠাইতে পারি—কিন্তু সে সব স্বর্গীয় স্বামীজীর তেমন গৌরবজনক না হইবার কথা—বিশেষতঃ আমি তাঁহার 'ভক্ত'ও নহি। ইহার উত্তরে সুরেশ বাবু লিখিয়াছিলেন, '* * * আমি বিবেকানন্দের পরম ভক্ত বটে, কিন্তু আর কাহারও অভক্ত হইবার অধিকার নাই, তাহা মনে করি না। ইহাও বোধ করি বিবেকানন্দেরই শিক্ষা। সে যাহা হউক প্রবন্ধটি পাঠাইবেন। পাঠান্তে আমার অভিপ্রায় আপনায় জানাইব। * * *' প্রবন্ধ 'সাহিত্যে' প্রেরিত হইল; কিন্তু হায় সুরেশবাবুর অভিপ্রায় হইতে ইহা বঞ্চিত হইল। (লেখক)

কোনও "চেলা" হইবেন। ইহার পূর্ব্বে স্বামীজীর ছবি দেখিয়াছিলাম বটে, কিন্তু বড় বড় দুইটি চোখ ছাড়া এই মূর্ত্তির সঙ্গে ছবি দেখিয়া যে মূর্ত্তি কল্পনা করিয়াছিলাম, তার বিশেষ কোনও সাদৃশ্য দেখিতে পাই নাই।* সে যাহা হউক, ইহাঁকেই জিজ্ঞাসা করিলাম—স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছি—দেখা হইবে কি? ইনি ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—'তা, আপনাদের কি কথা আছে, বলুন।† তখন বুঝিলাম, ইনিই বিশ্ববিশ্রুত স্বামী বিবেকানন্দ। সঙ্গী ভদ্রলোকটি আমার পরিচয় দিলেন। তখন নানারূপ প্রসঙ্গ হইতে লাগিল।

কথায় কথায় উঠিল—আমাদের প্রাচীন সভ্যতার কথা। স্বামীজী বলিলেন, "বৌদ্ধযুগের পূর্ব্বে এদেশে স্থাপত্য শিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন তেমন পাওয়া যায় না।" আমি বলিলাম, "কেন রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতিতে কত উৎকৃষ্ট সৌধ প্রভৃতির বর্ণনা পাওয়া যাইতেছে।" তিনি বলিলেন "ও সব অত্যুক্তিপরিপূর্ণ বর্ণনা।" তারপর প্রসঙ্গতঃ বলিলেন—"এই যে আপনার গলায় পৈতে, এটাও পারসীকদের কাছ হইতে পাওয়া গিয়াছে।" আমি বলিলাম "সে কি, উপবীত শোধনে যে বেদমন্ত্র আছে—তাতে 'যজ্ঞোপবীত' শব্দটিও তো স্পষ্ট রহিয়াছে।" তিনি বলিলেন—"আচ্ছা, ঐ মন্ত্রটা পড়ুন তো?" পড়িলাম "যজ্ঞোপবীতং পরমং পবিত্রং" ইত্যাদি। তখন বলিলেন, "দেখুন, এ মন্ত্র প্রক্ষিপ্ত; ইহার শব্দ ও ছন্দ আধুনিক।" আমি একটু উত্তেজিত হইয়াই বলিলাম—"তা হ'লে স্বামীজী, আপনাতে আর দয়ানন্দে ‡ কোনও প্রভেদ দেখিতেছি না; এরূপ অবস্থায় কোনও তর্ক চলিতে পারে না। ফলতঃ ঐরূপ আলোচনার ঐখানেই বাধা পড়িল—আর কোনওরূপ 'তর্ক বিতর্ক' তাঁহার সঙ্গে আমার হয় নাই।

---

* এখানে একটি অবান্তর কথা বলিতেছি। যতদূর স্মরণ হয়, স্বামীজীর কপালে একটা দাগ—কাটার চিহ্ন যেন দেখিয়াছিলাম; কিন্তু তাঁহার ছবিতে এরূপ কোনও দাগ দেখা যায় না। তাঁহার জীবনচরিতেও এই দাগের কথা আছে (স্বামী বিবেকানন্দ—শ্রীযুত প্রমথনাথ বসু-কৃত ২৮ পৃষ্ঠা)। তবে ছবিতে দাগটা থাকা কি ভক্তগণের অনভিপ্রেত বলিয়াই ইহা নাই? চরিত্রাখ্যানেও কি এরূপ হস্তাবক্ষেপ ঘটিয়াছে?

† এ স্থলে ইহা বক্তব্য যে, এতদিন পরে স্মরণ করিয়া লেখাতে অনেক কথাই লিখিতে পারা গেল না—যাহা লিখিত হইল, তাহাতেও ঠিক এইরূপ ভাষাতেই উক্তি প্রত্যুক্তি হইয়াছিল, একথা সাহস করিয়া বলিতে পারিব না। তবে 'মর্ম্ম' এইরূপই ছিল, এটুকু বলিতে পারি। দিন-তারিখ হুবহু ঠিক না হইতে পারে, কেন না আমার কোনও 'ডায়েরি' নাই।

‡ পাঞ্জাব প্রভৃতি অঞ্চলে আর্য্যসমাজের প্রবর্ত্তক স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী।

অতঃপর আরও কিছুকাল কথাবার্ত্তা হইল—অবশেষে জানা গেল ; স্বামীজী পরদিন সংক্রান্তিতে (খুব সম্ভব) কামাখ্যা দর্শন করিবেন এবং তৎপরদিন বশিষ্ঠাশ্রমে যাইবেন।

সঙ্গী ভদ্রলোকটীর সহিত পরামর্শ করিয়া আমরা কয়েকজন মিলিয়া নির্দ্দিষ্ট দিনে বশিষ্ঠাশ্রম গেলাম। আশা ছিল, স্বামীজী সদলবলে সেখানে যাইবেন—তাঁহার সঙ্গে কথোপকথন হইবার যথেষ্ট সময় ও সুবিধা পাওয়া যাইবে। কিন্তু আমাদিগকে বড়ই নিরাশ হইতে হইল—কোনও কারণে তিনি সে দিন বশিষ্ঠাশ্রমে যাইতে পারেন নাই। ক্ষুণ্ণমনে সহরে ফিরিয়া আসিয়া শুনিলাম, স্বামীজীর বক্তৃতা হইতেছে। দ্রুতগতিতে বক্তৃতার জায়গায় গিয়া দেখি, লোকারণ্য, এই ভিড় ঠেলিয়া তাঁহার নিকটবর্ত্তী হওয়া তখন অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শুনিলাম ইতঃপূর্ব্বে সভায় পণ্ডিত (পরে মহামহোপাধ্যায়) বীরেশ্বরাচার্য্য মহাশয়ের সঙ্গে না কি স্বামীজীর সংস্কৃত ভাষায় কিঞ্চিৎ কথোপকথন হইয়াছিল ; সকলেই তাঁহার সংস্কৃত আলাপে সুদক্ষতা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

আমি যখন গিয়া জনতার পশ্চাদ্ভাগে কথমপি দাঁড়াইতে সমর্থ হইলাম, তখন সভা নিস্তব্ধ—স্বামীজী দণ্ডায়মান হইয়া বক্তৃতা দিবেন না, বসিয়াই দু'চার কথা বলিবেন। তিনি বারম্বার বলিতে লাগিলেন, "একটা প্রসঙ্গ তুলুন—কোনও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন, তদবলম্বনে কিছু বলিতে পারি।" কিন্তু সমবেত জনগণের মধ্যে কেহই অগ্রসর হইয়া কোনও প্রশ্ন করিতেছেন না দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "সেই ভট্‌চার্জি কোথায় ?" একজন, "ভট্‌চার্জি"র সঙ্গে স্বামীজীর সেই দিনের তর্কবিতর্কের কথা বোধ হয় শুনিয়াছিলেন, তাই, বুঝিতে পারিয়া উত্তর দিলেন—"উনি বশিষ্ঠাশ্রমে গিয়াছেন।" তখন কিন্তু খোদ "ভট্‌চার্জি" জনতার অন্তরালে—সাড়া দিবার অবস্থায় না থাকাতে চুপ করিয়াই রহিয়াছিলেন। সে যাহা হউক—এই প্রশ্নোত্তরে সভার নীরবতা ভঙ্গ হইল—তাই অপর একজন ঐ সময়ে বলিলেন,—"জাতি-বিচার উপলক্ষ্য করিয়া কিছু বলুন।"

তদুত্তরে স্বামীজী যাহা বলিলেন, তাহাতে জাতিভেদের উপকারিতা প্রথমতঃ প্রদর্শন করিলেন ; অবশেষে ইহার সঙ্গে যে স্পৃশ্যাস্পৃশ্য বিচার জড়িত রহিয়াছে, তদ্বিরুদ্ধে বহু বলিলেন। সেই সময়েই দুইটি কথা তাঁহার মুখ হইতে শুনি ; (১) 'হাঁড়িধর্ম্ম', (২) 'ছুঁৎমার্গ'। তখন, "খুলিল বাক্যের দ্বার না লাগে কপাট"—

'জাতিবিচার' ছাড়িয়া নানা প্রসঙ্গ চলিতে লাগিল। এই জাতিটা একটা জড়পদার্থ, সেই মনুর সময় হইতে একই ভাবে চলিয়াছে—'রেখামাত্রমপি ক্ষুণ্ণা-দামনোর্বর্ত্মনঃ পরম্। ন ব্যতীয়ুঃ প্রজাঃ'—এটা কি ভাল? এইরূপ জড়তায়—দেশ উচ্ছন্ন হইতে বসিয়াছে—বুদ্ধি খাটাইয়া একটা কিছু কর—না হয় বড় দরের একটা চুরি ডাকাতি কর—তবুও বুদ্ধি খুলুক, ইত্যাদি ইত্যাদি বহু কথা বলিলেন। তাঁহার সেইদিনকার বক্তৃতা শুনিয়াই স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে আমার পূর্ব্ব ধারণা বহুল পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। তাঁহার 'চিকাগো' বক্তৃতা অথবা অপর যে সকল বক্তৃতা পড়িতে পাইয়াছিলাম, তাহাতে মনে হইয়াছিল, ইনি একজন বেদান্তবাদী ধর্ম্মপ্রচারক। কিন্তু ঐ দিনকার বক্তৃতায় বুঝিলাম যে, ধর্ম্মপ্রচার একটা 'খোলস' মাত্র—ভিতরে স্বতন্ত্র ভাব। জাতিটা তাঁহার মতে নিদ্রিত—এটা জাগিয়া উঠুক—উঠিয়া একটা নাড়া-চাড়া দিউক; খাদ্যা-খাদ্য বিচার ইত্যাদিতে তাঁহার মতে সমগ্র জাতিকে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে দিতেছে না, সেটা উঠিয়া যাউক, ইত্যাদি। প্রকৃত ধর্ম্মবক্তা জাতিটার উপর একটা মোহের আবরণ দেখিয়া উদ্বুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিবেন বটে—কিন্তু জাতীয় বৈশিষ্ট্য যাহা আছে, তাহা দূর করিয়া দাও, "না হয়, একটা বড় দরের চুরি ডাকাতি করিয়া বুদ্ধি খোল" এইরূপ উপদেশ কখনও দেন না।

অতঃপর স্বামীজীর শিলং যাত্রার পূর্ব্বে আবার দুই দিন বক্তৃতা হয়। সেই দুই বক্তৃতা ইংরেজীতে নিয়মমত বিজ্ঞাপন দ্বারা বিষয় নির্দ্দেশপূর্ব্বক প্রদত্ত হয়। প্রথম দিন জনৈক বাঙ্গালী প্রবীণ উকীল সভাপতি হন—অপর দিন আসাম-ভ্যালি ডিভিসনের কমিশনর মিঃ এ, পোর্টিয়াস্ বাহাদুর সভাপতি হইয়াছিলেন। একদিন বিষয় ছিল "Transmigration of the Soul" এটা খুবই স্মরণ আছে; কিন্তু অপর দিনের বক্তৃতার বিষয়টি ঠিক স্মরণ নাই; তাহাতে "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া" ইত্যাদি উপনিষদ্বাক্য ছিল, ইহাদ্বারা অনুমান হয়—"Vedanta in Indian life" এইরূপ একটা বিষয় ছিল।*

তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার জিনিসই বটে। কি সুমিষ্ট আওয়াজ, কি সুন্দর

* এই অনুমানের একটা কারণ আছে। স্বামীজীর বক্তৃতা লইয়া উকীলদের বৈঠকখানায় আলোচনা হইয়াছিল, তাহাতে নাকি কেহ কেহ বলিয়াছিলেন, 'বক্তৃতায় নূতন কিছুই নাই—পূর্ব্বে প্রদত্ত বক্তৃতারই পুনরাবৃত্তি করা হইয়াছে—মুখস্থ শক্তি খুব অদ্ভুতই বটে।' মাদ্রাজের নটেশান প্রকাশিত স্বামীজীর বক্তৃতাবলীর ঐ বিষয়ক বক্তৃতাতেই 'দ্বা সুপর্ণা' শ্লোকের উল্লেখ ও তরজমা আছে।

আবৃত্তি—কি সুষ্ঠু শব্দযোজনা। বিশেষতঃ প্রথম দিন যাঁহাকে দেখিয়া 'বিবেকানন্দ' বলিয়া ধরিতে পারি নাই—তাঁহার সেই পাগড়', সেই আল্‌খেল্লা দেখিয়া মনে হইল, "হাঁ ইনিই সেই স্বামী বিবেকানন্দ—যাঁর ছবি পূর্ব্বে দেখিয়াছি।" তাঁহার বক্তৃতার রীতি ছিল পায়চারি করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বলা, যেন যাত্রার দলের অধিকারী। তাঁহার উজ্জ্বল বিশাল নেত্রদ্বয়, সস্মিত সুন্দর মুখমণ্ডল, এও এক দেখিবার জিনিস। ফলতঃ আজ বিশ বৎসর পরে যেন সেই মূর্ত্তি চোখে ভাসিতেছে—সেই কণ্ঠস্বর কাণে বাজিতেছে। সাধে কি আমেরিকা ক্ষেপিয়াছিল ?

এই দুই বক্তৃতার দিন অনেক সাহেব বিবি সভাস্থ হইয়া স্বামীজীর বক্তৃতা শুনিয়া ঘন ঘন করতালির দ্বারা হৃদয়ের আনন্দোচ্ছ্বাস পরিব্যক্ত করিয়াছিলেন।

অতঃপর স্বামীজী শিলং চলিয়া যান। * সেখানেও তাঁহার অবস্থান ও অভ্যর্থনার জন্য বাঙ্গালী ভদ্রলোকগণ চাঁদা তুলিয়াছিলেন। সেখানে একদিন মাত্র বক্তৃতা হইয়াছিল। তারপর শ্বাসকাশে অভিভূত হইয়া পড়াতে বক্তৃতা দিতে পারেন নাই, বৈঠকী আলোচনা অবশ্যই হইয়াছিল। লোকপ্রিয় শাসন-কর্ত্তা (সার) হেন্‌রী কটন চিফ কমিশনর ছিলেন। তিনি স্বামীজীরখুব তত্ত্বাবধান করিয়াছিলেন। সভায়ও যথেষ্ট প্রশংসাবাদ করিলে, স্বামীজী বক্তৃতারম্ভে বলেন ;—তীর্থস্থান পরিভ্রমণই সন্ন্যাসীদের কর্ত্তব্য, তাই কামাখ্যা হইয়া শিলঙে আসিয়াছি। এস্থানেও হেন্‌রী কটনের ন্যায় সাধু পুরুষ রহিয়াছেন—তাই ইহাও একটি তীর্থ—"তীর্থীকুর্ব্বন্তি সাধবঃ।" ইত্যাদি। শিলং সহরের অনেকে স্বামীজী ও তাঁহার দলের উপর একটু বিরক্ত হইয়াছিলেন। শিলঙে পাঁঠা খুব সস্তা, আহার্য্য বস্তু মধ্যে মাংসসম্ভারই সমধিক থাকিত—একদিন তাহাতে কিছু ত্রুটি ঘটাতে সঙ্গীরা না কি ক্রোধ প্রকাশও করিয়াছিলেন। শিলং হইতে ফিরিবার কালে বোতলে বোতলে "সুরুয়া' পাথেয়স্বরূপ আনীত হইয়াছিল। এই সকল কারণে, বিশেষতঃ জনৈক নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণবমতাবলম্বী ভদ্রলোকের একটি প্রশ্নের উত্তরে স্বামীজী একটা অশ্লীল কথা বলাতে† শিলঙে অনেকেই

---

* স্বামীজীর শিলং যাওয়ার কয়েক মাস পরেই আমিও 'সেন্‌সারে'র কাজে শিলং গিয়াছিলাম—এবং তত্রত্য বন্ধুবর্গের প্রমুখাৎ তাঁহার কাহিনী শুনিয়াছিলাম—তাই যথাশ্রুত দু'একটি কথা লিখিতে পারিলাম।

† সেই ভদ্রলোকটি এবিষয়ে যাহা (সম্প্রতি) লিখিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত হইল :—" * * * কথাপ্রসঙ্গে স্বামীজী "নামরূপ মিথ্যা" বলিয়া উঠিলেন। আমি তাহা শুনিয়া বিনীতভাবে

তাঁহার উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিলেন। নদীয়া ভাজনঘাটের বৈষ্ণ গোস্বামিবংশীয় জনৈক অত্যুচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী বিবেকানন্দ অভ্যর্থনায় চাঁদা দিয়াছিলেন, বলিয়া পশ্চাত্তাপগ্রস্ত হইয়া একদিন না কি উপবাসও করিয়াছিলেন।

শিলং হইতে ফিরিয়া স্বামীজী গৌহাটীতে দুই চারি দিন অবস্থান করিয়াছিলেন। এবারও তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া বহুক্ষণ আলাপ করিয়াছিলাম। একটি 'রুমে' তিনি ও আমি নির্জ্জনে বসিয়া কথাবার্ত্তা বলিয়াছিলাম—তিনি অকপটে এবং অত্যন্ত অমায়িকভাবেই আলাপ করিয়াছিলেন। হাঁপানিতে বড়ই কষ্ট পাইতেছেন দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "স্বামীজী শুনিয়াছি যোগীদের শ্বাসের উপর অধিকার জন্মে—এ দেখিতেছি শ্বাস আপনার উপরে অধিকার করিয়া বসিয়াছে! ইহার অর্থ কি?" তিনি উত্তরে মাত্র বলিলেন—"ভট্‌চাজ মহাশয়, বলুব, বলুব।" আমি আর বাড়াবাড়ি করি নাই—কিন্তু মনে মনে যাহা ভাবিলাম—তাহা (যখন স্বামিজীকে বলিতে সাহসী হই নাই, তখন) এ স্থলেও না বলাই সঙ্গত।

কথাপ্রসঙ্গে তাঁহার আমেরিকার কাজের বিষয় উত্থাপিত হইল। তিনি বলিলেন—'সেখানে এমন করিয়া আসিয়াছি যে, এখন যে কেহ গিয়া ক'রে-কর্ম্মায়ে বেশ থাকতে পারবে, 'মণৌ বজ্রসমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেব।' থিয়সাফিষ্টদের কথা উঠিল; আমি একটু প্রশংসাই করিলাম—"এরা সেই আমাদেরই শাস্ত্রের ই কথা প্রচার করিতেছে।" উত্তরে স্বামীজী যেন একটু উত্তেজিতভাবেই বলিলেন,—"সাহেবেরা আমাদের উপরে সব বিষয়েই কর্তৃত্ব করিতেছে, আবার ধর্ম্মবিষয়েও আসিয়া গুরুগিরি করিবে, এটা আমি সহিতে পারি না।"* আমার

তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "যদি তাহাই হয় তবে, 'নিত্য লীলার' অর্থ কি?" এই কথা শুনিবামাত্র স্বামীজী ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া তারস্বরে বলিয়া উঠিলেন 'ঐ নিত্যলিঙ্গ আর ঐ নিত্য যোনি কি, তাহা আমি জানি না। বলাবাহুল্য, ঐ বিষম কটূক্তি শুনিয়া আমি ও আমার সঙ্গে সঙ্গে * * * দাদা প্রভৃতি অনেকেই মর্ম্মাহত হইলেন। * * * উত্তর দিবার জন্য যখন আমি উদ্যত, তখন * * দাদা আমাকে লইয়া তাঁহার বাসায় গেলেন। * * *"

* এই কথাটি আমার কাছে বড়ই ভাল লাগিয়াছিল—১৯১১ অব্দে ময়মনসিংহ সাহিত্য-সম্মেলনে যখন শ্রীযুত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের সঙ্গে একত্র কয়েকদিন অবস্থান করি, তখন একদিন তাঁহাকে ইহার উল্লেখ করিয়াছিলাম, এবং 'বিবেকানন্দ ঠিকই বলিয়াছেন' এরূপও বলিয়াছিলাম। হীরেন্দ্র বাবু স্বয়ং থিয়সফিষ্ট দলের একজন নেতৃস্বরূপ। তিনি বলিয়াছিলেন—'সাহেবেরা গুরু হইবে কেন? তাঁহাদেরও তো নেতা আমাদেরই 'মহাত্মাগণ।'" "আমি বলিলাম, মহাত্মারা এদেশে কি লোক পাইলেন না যে, অলকট ব্লাভাট্‌স্কির স্কন্ধে ভর

জীবনের এক উদ্দেশ্য ছিল—বেদান্ত দ্বারা ওদের জয় করা। বহু সাহেব বিবি দ্বারা পা টেপাইয়াছি।” কথায় কথায় তাঁহার ‘চিকাগো’ বক্তৃতার সম্বন্ধে আলাপ হইল। বলিলাম, স্বামীজী, আপনার গুরুদেব ৺ রামকৃষ্ণ পরমহংস তো প্রতিমা অর্চ্চনা করিয়াই চরম সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। আপনি তা’হলে ‘চিকাগো’ বক্তৃতায় কিরূপে একথা বলিলেন, From high soaring flights of Vedanta philosophy to vulgar ideal of idolatry!’ মূর্ত্তি পূজাটা কি “Vulgar’? স্বামীজী বলিলেন, ‘আমি কি ‘Vulgar’ বলিয়াছিলাম?’ আমি বলিলাম ‘আমার তো যেন তাই মনে হয়।’ তিনি বলিলেন, “তা’হলে ‘Vulgar people, Vulgar অর্থ ‘popular’ এই আমি মীন্ করিয়াছিলাম।” আমি বলিলাম, “তা হ’লে ‘Vulgar’ না বলিয়া সোজাসুজি ‘popular’ বলিলেই তো পারিতেন?” অতঃপর এ বিষয় আর কথা চলে নাই। *

আরো বহু কথা হইল—সব স্মরণও নাই—দু-একটা কথা (উপরে উল্লিখিত ছাড়া) মনে আছে, তাহা নানা কারণে প্রকাশযোগ্য নহে। তবে, পূর্ব্বের বৈঠকী বক্তৃতা শুনিয়া যে ধারণা হইয়াছিল, এই আলাপের দ্বারা তাহা দৃঢ়ীভূত হইল। মনে হইল যে, এই সন্ন্যাসীর সাজপরা লোকটি যেন মেষবর্ম্মাচ্ছাদিত একটি কেশরী।

আলাপাবসানে বিদায় গ্রহণের সময় তিনি ‘ফ্রেঞ্চ নভেল’ দুএকখানি পাঠাইয়া দিতে পারি কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন; তদর্থে আমি কমিশনার পোটিয়াস সাহেব নিকটে চিঠি-দিয়া লোক পাঠাইয়াছিলাম, কিন্তু তিনি তাহা পাঠাইয়াছিলেন কিনা ইত্যাদির খবর আর নেই নাই। একজন সন্ন্যাসীর ‘ফ্রেঞ্চ নভেল’ পাঠের স্পৃহাটা আমার কাছে তত ভালও ঠেকে নাই।

আসামে স্বামী বিবেকানন্দের পরিভ্রমণস্মৃতি আমাদের পক্ষ হইতে বিবৃত

করিলেন?” উত্তরে বোধ হয় তিনি এই বলিয়াছিলেন—“সমগ্র জগদ্ব্যাপী কাজ করিবার সমর্থ লোক আমাদের দেশে কোথায়? এঁদের দ্বারা ইউরোপ আমেরিকা প্রভৃতি সমগ্র জগতে তত্ত্ববিদ্যার প্রচার হইতেছে। আমাদের দেশের অনেকেও এঁদের প্রতি শ্রদ্ধাবিশ্বাসের আধিক্য বশতঃ উপকৃত হইতেছেন।”

* সত্যের অনুরোধে এখানে বলিতে হইল যে, আমার স্মৃত্যনুসারেই আমি তাঁহার বক্তৃতার ঐ বাক্যাংশটি উদ্ধৃত করিয়াছিলাম। ইদানীং প্রকাশিত তাঁহার ঐ বক্তৃতায় কথাটি এ ভাবের আছে “From the high spiritual flights of Vedantic Philosophy.” * * * to the low ideas of idolatory.” শব্দটা ‘low’ আছে, ‘vulgar’ নহে। এই ‘low’টা স্বামীজী কিরূপে বুঝাইতেন, জানি না।

করা হইল। ঐ সম্বন্ধে তাঁহার নিজের স্মৃতিও এ স্থলে আলোচনাযোগ্য মনে করিতেছি।

বেলুড় মঠে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তিনি পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের গল্প করিয়াছিলেন। * * * কামাখ্যার তন্ত্রমন্ত্রের প্রাধান্য উল্লেখ করিয়া বলিলেন—"এক 'হঙ্কর' দেবের নাম শুনলুম। তিনি ও অঞ্চলে অবতার বলে পূজিত হন। শুনলুম তাঁর সম্প্রদায় খুব বিস্তৃত; ঐ 'হঙ্কর' দেব আর শঙ্করাচার্য্য একই লোক কিনা বুঝিতে পারিলাম না। তবে লোকগুলিকে দেখিয়া বোধ হইল ত্যাগী—সম্ভবতঃ তান্ত্রিক সন্ন্যাসী কিংবা শঙ্করাচার্য্যেরই সম্প্রদায়বিশেষ।" *

যাঁহারা জ্ঞাতসার, তাঁহারা এইটুকু পড়িয়া স্বামীজীর গবেষণার প্রসর দর্শনে স্তম্ভিত হইবেন, সন্দেহ নাই। আসামে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচারক মহাত্মা শঙ্কর দেবের নামটি 'হঙ্কর' দেব এই তুচ্ছভাবে উল্লেখ করা কতদুর সমীচীন, তাহাও বিবেচ্য। কোথায় কায়স্থ বৈষ্ণব গৃহস্থ শঙ্করদেব, আর কোথায় ব্রাহ্মণ বৈদান্তিক সন্ন্যাসী শঙ্করাচার্য্য। জানি না তিনি কার কাছে শঙ্করদেবের কথা শুনিয়াছিলেন, এবং কাহাদের দেখিয়া 'ত্যাগী' বোধ করিয়াছিলেন। ফলতঃ ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের এবং আক্ষেপের বিষয় যে, ধর্ম্মপ্রচারক বলিয়া বিখ্যাত স্বামী বিবেকানন্দ আসাম অঞ্চলের এই সুবিখ্যাত ধর্ম্মপ্রচারকের প্রকৃত তথ্য অনুসন্ধানকল্পে কোনও প্রযত্ন করেন নাই; তাহা করিলে তিনি জানিতে পারিতেন যে, তাঁহারই জাতীয় একজন মহাপুরুষ পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে এই কামরূপ অঞ্চলে কি এক প্রবল ধর্ম্মান্দোলন করিয়া গিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য যেরূপ বঙ্গদেশে আপামর সাধারণের হিতার্থে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন; তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াই যেমন বঙ্গসাহিত্য পুষ্টিলাভ করিয়াছে, এই মহাত্মাও তাদৃশ কীর্ত্তি করিয়া গিয়াছেন। পার্ব্বত্য জাতীয়েরাও আজ তাঁহার প্রদর্শিত পথে চলিয়া হিন্দুধর্ম্মের গণ্ডীর ভিতরে আসিতেছে—আসামীরা তাঁহারই স্বরচিত কীর্ত্তন ভাওনা (নাটক) প্রভৃতির দ্বারা পরিপোষিত হইয়াছে। †

স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে ভবিষ্যতে সবিশেষ আলোচনা করিবার বাসনা রহিল।

শ্রীপদ্মনাথ শর্ম্মা।

---

* শ্রীযুত প্রমথনাথ বসু প্রণীত 'স্বামী বিবেকানন্দ—৪র্থ খণ্ড ১০২৪—২৫ পৃষ্ঠা।

† যাঁহারা শঙ্করদেবসম্বন্ধে বিস্তারিত জানিতে সমুৎসুক, তাঁহারা বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভা হইতে প্রকাশিত শ্রীযুত উমেশচন্দ্র দেব-প্রণীত 'শঙ্কর দেব' গ্রন্থখানি পাঠ করিতে পারেন।

উপন্যাসে সমাজ-সংস্কার।

‘ওপারের আলো’।

আজকাল উপন্যাসের সাহায্যে সমাজ-সংস্কার করিবার একটা বিরাট চেষ্টা চলিতেছে। হিন্দুসমাজের যে সকল রীতি, পদ্ধতি, প্রতিষ্ঠান ও অনুষ্ঠান যুগযুগান্তর ধরিয়া সমাজকে রক্ষা করিয়া আসিতেছে, উপন্যাসে তাহার একটা বিকৃত চিত্র আঁকিয়া কৌশলে তাহার উপর অল্পবুদ্ধি লোকের বিরাগ ও বিতৃষ্ণা জন্মাইয়া দিবার চেষ্টা হইতেছে। আমাদের দেশে গৃহস্থের সংসারে নারীরাই বিশেষভাবে ধর্ম্মভাব ও পবিত্রতা রক্ষা করিয়া থাকেন। এহেন নারী-জাতিকে বিগড়াইয়া দিতে না পারিলে সমাজসংস্কার করা সম্ভবে না, ইহা অনেকেই মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতেছেন। বড়ই দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, বিকৃত শিক্ষার প্রভাব পরোক্ষভাবে আমাদের নারীসমাজেও আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। নারীরা এখন রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতি পাঠ ছাড়িয়া কতকগুলা অসার উপন্যাস ও নাটক পাঠেই আকৃষ্টা হইতেছেন। সমাজদ্রোহী সমাজসংস্কারকরা এই অবসর পাইয়া উপন্যাসের আশ্রয়ে যোষিদ্‌গণের ধর্ম্মবুদ্ধি ক্ষুণ্ণ করিতে চেষ্টা করিতেছে। হিন্দুসমাজপতিগণ সে দিকে একেবারেই দৃষ্টি দিতেছেন না। অদূর ভবিষ্যতে ইহার ফল যে অতিশয় মন্দ হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

রায় সাহেব শ্রীযুত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়কে এই শ্রেণীর উপন্যাসলেখকের অন্তর্ভুক্ত হইতে দেখিয়া আমরা দুঃখিত হইয়াছি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃপায় রায় সাহেব সাহিত্যিক-সমাজে যশস্বী। ইঁহার লিখিত “বঙ্গভাষা ও সাহিত্য” বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘চান্সলার’ এবং ‘ভাইস চান্সলার’ কর্ত্তৃক প্রশংসিত। এ হেন রায় সাহেব দীনেশ বাবু বৃদ্ধবয়সে উপন্যাসে হাত মক্স করিতে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। উপন্যাস লেখা নিতান্ত সহজ নহে। ইহাতে অনেক বিষয়ের জ্ঞানের প্রয়োজন। মানবপ্রকৃতি এবং মানবচরিত্র সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে, সেই জ্ঞানের অভাব সত্ত্বেও অনেকে উপন্যাস লিখিতে প্রয়াস পাইয়া থাকেন। অন্যের পক্ষে যাহা হয় হউক, কিন্তু রায় সাহেব দীনেশচন্দ্রের গ্রন্থে পদে পদে সেই জ্ঞানদৈন্যের নিদর্শন দেখিয়া

আমরা দুঃখিত, ক্ষুব্ধ এবং মর্ম্মাহত। হায় মা বঙ্গ ভারতি? ইহা তোমার পক্ষে অল্প আপ্‌সোসের কথা নহে!

আমরা রায় সাহেব দীনেশচন্দ্র সেনের 'ও-পারের আলো' পড়িয়া বাস্তবিকই বিস্মিত হইয়াছি। এই পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত পড়িলে বেশ মনে হয় যে, এমন বিষয় নাই—যে বিষয়ে রায় সাহেব তাঁহার বিরাট মূর্খতা উৎকট নগ্ন মূর্ত্তিতে প্রকাশ না করিয়াছেন। পুস্তকের ৮৯ পৃষ্ঠায় রায় সাহেব লিখিয়াছেন,—

"দেখলেন, প্রায় দুইবিঘা দূরে সাদা রঙ্গের মখমল বিছান রয়েছে, সেই মখমলের ধারে ধারে নীলপদ্ম, লালপদ্ম—লতায় বিজড়িত। মধ্যে রাধাকৃষ্ণের যুগলরূপ, কানু রাইকে বাঁশী বাজাতে শিখাচ্ছেন। এগুলি সকলই ফুলে আঁকা। ঋতুপুষ্প (Season flower) দিয়ে মকমলের শয্যা তৈরী করা হইয়াছে এবং নানা বর্ণের ঐ ফুল দ্বারা লতা ফুল ও রাধাকৃষ্ণবিগ্রহ আঁকা হয়েছে।"

বলা বাহুল্য বাঙ্গালাদেশের, কেবল বাঙ্গালাদেশের কেন সমস্ত ভারতবর্ষের কুত্রাপি নীলপদ্ম জন্মে না। ত্রেতায় অঞ্জনানন্দন মানস সরোবর হইতে নীলপদ্মের আমদানি করিয়াছিলেন শুনিতে পাই। আর এই কলিতে বিংশ শতাব্দীতে রায় সাহেব তাহারই অনুকরণে কোথা হইতে এই নীলপদ্ম বাঙ্গালায় আমদানী করিলেন? মকমলের শয্যা ত ঋতুপুষ্পে অঙ্কিত,—রাধাশ্যামের বিগ্রহও উহাতে আঁকা, লতাপাতাও উহাতে আঁকা,—কিন্তু লালপদ্ম, নীলপদ্ম ম্যাগ্‌নোলিয়া প্রভৃতি ঋতুপুষ্পে আঁকা যায় না। যাহা হউক, দৈনেশী কল্পনা যে স্থলে নীলপদ্ম ফুটাইল,—ইহা অদ্ভুতও বটে, অপরূপও বটে।

পুস্তকের ভাষা ত অদ্ভুত। একটা নমুনা দেখুন;—"আপনি বৃদ্ধ, আপনাকে কি আমি শ্রমসাধ্য কাজে টেনে আন্‌তে পারি।" 'শ্রমসাধ্য কাজে টেনে আনা' কোন্ অঞ্চলের কথোপকথনের ভাষা? ইহা যে ইংরেজীর তর্জ্জমা! এরূপ ভাষার ভুল গ্রন্থের আগাগোড়ায় পাওয়া যায়।

১৫১ পৃষ্ঠায় "তারা নির্দ্দোষী হ'লেও তাদের কুৎসা রটনা ক'রেছ।" স্কুলের ছেলে 'নির্দ্দোষী' লিখিলে পণ্ডিত মহাশয় তাহার কর্ণমর্দ্দন করিয়া দিতেন। কিন্তু বি,এর বাঙ্গালাপরীক্ষক রায় সাহেব ব্যাকরণসম্বন্ধে নিরঙ্কুশ। ইহা কথোপকথনের ভাষা বলা যায় না,—কারণ কথা বলিবার সময় কেহ 'নির্দ্দোষী' বলে না 'নিদ্দুষীই' বলে। 'তুমি মানবের হিতৈষী দেবতা নহ,—তুমি নরদ্রোহি রাক্ষসী"—ইহাও চলিত গ্রাম্যভাষা নহে। সুতরাং সাধু প্রয়োগ হিসাবে এখানে 'হিতৈষী' স্থলে 'হিতৈষিণী' এবং 'নরদ্রোহি'স্থলে 'নরদ্রোহিণী' হওয়াই উচিত।

কিন্তু দৈনিনী বিদ্যা এখানেও যথাপূর্ব্বং তথা পরম্। দৈনিশী নিরঙ্কুশতায় যদিই বা 'হিতৈষী' দীর্ঘ ঈকার হয়, তবে 'নরদ্রোহি' হ্রস্ব ইকার পাইল কেন? ফলে কম্বলের লোম বাছা আর রায়সাহেবী বাঙ্গালার ভুল বাছা প্রায় সমান। অগত্যা আমরা উহাতে নিরস্ত হইলাম। ফল কথা, রায়সাহেবী গ্রন্থে ভাষার আদ্যশ্রাদ্ধ যেরূপ ভাবে সমাধা হইয়াছে, এমন আর কোথাও হয় নাই।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যাদিগ্‌গজ রায় শ্রীযুত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের পৌরাণিকী বিদ্যার বহর দেখিয়াও আমরা বিস্মিত। অজ্ঞতা কোথাও এমন লজ্জাজনকভাবে উলঙ্গ মূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করে নাই। পাঠক উহার দুই একটির নমুনা দেখুন,—"খুব মোটা তুলিতে * * * দেবেশবাবু কৃষ্ণলীলাটি এঁকে ফেলেছেন। * * * কোনটিতে নন্দ শিশু কৃষ্ণকে ক্রোড়ে নিয়ে কারাগারের দ্বারের কাছে দাঁড়িয়ে। প্রহরীগুলি ঘুমে ঢলে পড়ছে। তাদের কোষসংলগ্ন খড়্গগুলিকেও যেন ঘুমের নেশায় পেয়েছে। তারাও যেন প্রাচীরের গায়ে ঢলে পড়ছে। নন্দ এক হাতে দ্বার স্পর্শ করছেন, লৌহের একপাটি দ্বার শ্লথ হয়ে খুলে পড়েছে।" রায় সাহেবী মূর্খতার এই অপূর্ব্ব নমুনা দেখিয়া আমরা স্তম্ভিত। কংসকারাগারে নন্দ ঘোষ কবে শিশু কৃষ্ণকে কোলে করিতে গিয়াছিলেন,—তাহা ত কেহই জানে না। রায়সাহেবী প্রতিভা এই অপূর্ব্ব তথ্য আবিষ্কৃত করিয়া বুঝি বা বিশ্ববিদ্যালয়ে এইবার আর এক দফা উপাধি পাইবেন! প্রতিভার এমন জৌলুস না হইলে কি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশংসা অর্জ্জন করা যায়? আবার লিখিয়াছেন,—"কোনটিতে কারাগারে কংস ভ্রূকুটি করে কোন নবজাত কন্যাকে আছাড় মারিতেছেন।" যশোদাসুতা যোগমায়াকে কংস কারাগারে আছাড় মারিয়াছিলেন, না কারাগারের বাহিরে বধ্যভূমিতে যাইয়া আছাড় মারিয়াছিলেন? ভাগবতে তাহা স্পষ্ট করিয়া বলা না থাকিলেও ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে বলা হইয়াছে যে, কংস উহাকে কারাগারের বাহিরে শিলাখণ্ডে আছাড় মারিয়াছিলেন। রায়সাহেব কিন্তু উহাকে কারাগারেই আছাড় মারিবার ফতোয়া দিয়াছেন। দৈনেশী প্রতিভা কি পুরাণের বেড়ার মধ্যে আটক থাকিতে পারে,—উহা ছাপাইয়া উঠিবে যে! রায়সাহেব আবার লিখিয়াছেন—"তারপর যশোদা কৃষ্ণকে সাজিয়ে গোষ্ঠে পাঠাচ্ছেন, বলরাম এক হাতে শিঙ্গা ধরে, আর এক হাত কাঁকালে রেখে প্রতীক্ষার ভাবে দাঁড়িয়ে আছেন।" বলরামের হাতে শিঙ্গা কেন? ফুঁকিবেন নাকি? বলরামের ত দুই হাত; এক হাতে মুষল আর এক হাতে লাঙ্গল। যথা—

"বলদেবং দ্বিবাহুঞ্চ শঙ্খকুন্দেন্দুসন্নিভম্।
বামে হলায়ুধধরং দক্ষিণে মুষলং করে॥"

আর বালককালে যখন গোরু চরাইতে যাইতেছেন, তখন না হয় মুষলের স্থানে পাঁচন বাড়ি থাকিত, কিন্তু শিঙ্গা আসিয়া জুটিল কোথা হইতে? অবশ্য গোপালরা কেহ কেহ বেণু বা কেহ শিঙ্গা বাজাইত, কিন্তু বলরাম যে তাঁহার হল মুষল ছাড়িয়া শিঙ্গা ধরিয়াছিলেন, তাহার ত প্রমাণ নাই।

৭৪ পৃষ্ঠায় গ্রন্থকার লিখিয়াছেন,—"বশিষ্ঠের আশ্রম হতে কপিলা গাভীকে বিশ্বামিত্র জোর করে নিয়েছিলেন—আজ বশিষ্ঠের মনের অবস্থা আমার।" বহুৎ আচ্ছা রায় সাহেব! আপনি কোথায় পাইয়াছেন যে, বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের হোমধেনু হরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং সেই হোমধেনু হারাইয়া বশিষ্ঠ দারুণ মনস্তাপে দগ্ধ হইয়াছিলেন? এদেশের মেয়েরাও জানেন যে, বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের গাভী হরণ করিতে পারেন নাই। বরং পরাজিত বিশ্বামিত্র স্বয়ং বলিয়াছিলেন,—

"ধিগ্‌বলং ক্ষত্রিয়বলং ব্রহ্মতেজো বলং বলম্।
একেন:ব্রহ্মদণ্ডেন সর্ব্বাস্ত্রাণি হতানি মে।"

রামায়ণ ১।৫৬

"ক্ষত্রিয়বলে ধিক্! ব্রহ্মবলই অত্যন্ত প্রবল। কারণ একমাত্র ব্রহ্মদণ্ড দ্বারাই আমার সমস্ত অস্ত্র নষ্ট হইয়া গেল।" সুতরাং "বিশ্বমিত্র জোর করে বশিষ্ঠের আশ্রম হতে কপিলা গাভীকে নিয়েছিলেন", এই তথ্য রায়সাহেবী ভিয়ানখানা ভিন্ন আর কোথাও পাওয়া যায় না। বিশ্বামিত্র যখন জোর করিয়া শবলাকে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিয়াছিল, তখন বশিষ্ঠের কোনরূপ মনস্তাপ জন্মে নাই, তিনি স্বেচ্ছায় শবলাকে দিতে চাহেন নাই এই মাত্র। শবলা যখন আসিয়া কাঁদিয়া বশিষ্ঠকে বলিয়াছিল, আপনি কি দোষে আমাকে ত্যাগ করিয়াছেন,—তখন তিনি বলিয়াছিলেন,—আমি তোমাকে ত্যাগ করি নাই; উহারা জোর করিয়া তোমাকে লইয়া যাইতেছে। রায়সাহেব ব্রাহ্মণ্য আদর্শটাকে খাটো করিবার জন্য অনেক কূট চা'ল চালিয়াছেন।

পুস্তকের ৮৮ পৃষ্ঠায় রায়সাহেব লিখিয়াছেন,—"একটা মোড়ার উপর বুদ্ধদেবের মত স্থির হয়ে ব'সে, ভোগের ঘরে' উনুনের নিকট ময়দা ছেনে, ঘিয়ের ময়ান দিয়ে, পাণ্ডাজী মোটা মোটা রুটি তৈরী কচ্ছেন এবং নিচে(?) মেজের উপর আসীন দেবেশের সঙ্গে কথা বার্ত্তা বলছেন।"

পাঠক ইহার অর্থ বুঝিলেন কি? বুদ্ধদেব কি কেবল স্থির হয়ে বসে থাকতেন? গয়া হইতে হাঁটিয়া তিনি ঋষিপত্তনে আসেন নাই না কি? অবশ্য ধ্যানী বুদ্ধ (Buddha in eternal contemplation)" স্থির ও নিশ্চল হইয়া বসিয়া থাকিবার একটি উদাহরণস্থল। ধ্যানী বুদ্ধ কি স্থির হয়ে বসে ময়দা ছেনিতেন? বুদ্ধের মত স্থির হয়ে বসে কি ময়দা ছেনা যায়, না রুটি তৈয়ার করা যায়? এখানে "বুদ্ধের মত স্থির হয়ে ব'সে" বলিবার স্বার্থকতা কি? তাহার পর পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, 'ময়দা ছেনে' পরে বলা হইয়াছে "ঘিয়ের ময়ান দিয়ে," লেখায় এই পারম্পর্য্যের সার্থকতা কোথায়? তবে কি ময়দা ছেনিবার পর "ঘিয়ের ময়ান দেওয়া" হয় না কি? রায় সাহেবী প্রতিভা সকল দিকেই গজ গজ করিয়া বাহির হইতেছে দেখিতেছি। ময়ানটা কি ঘি ভিন্ন অন্য কিছুর হয়? তেলের ময়ান দিবার প্রথা দীনেশবাবুর মহানসে প্রচলিত আছে না কি? "ঘিয়ের ময়ান" বলিবার স্বার্থকতা কি?

পাঠক, এদিকেত রায় সাহেবী বিদ্যার যথেষ্ট পরিচয় পাইলেন; হিন্দুর ব্যবহারশাস্ত্রে রায় সাহেবের বিদ্যা কিরূপ তাহার একটু পরিচয় লউন। এই গ্রন্থে লিখিত হৃদয়েশ ভট্টাচার্য্য ও দেবেশ ভট্টাচার্য্য দুই সহোদর। হৃদয়েশ জ্যেষ্ঠ, দেবেশ কনিষ্ঠ। হৃদয়েশের জ্যেষ্ঠ অন্য কোন সহোদর ছিল এ কথা গ্রন্থে নাই। গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—'জ্যেষ্ঠ হৃদয়েশকে তাঁহার খুল্লতাত পোষ্যপুত্র লইয়াছিলেন। হিন্দুপরিবারে জ্যেষ্ঠ পুত্রকে পোষ্য পুত্র দিবার ব্যবস্থা নাই। কিন্তু রায় সাহেব দীনেশচন্দ্র সেন,—সেই জ্যেষ্ঠকেই পোষ্যপুত্র দিয়া আপনার অপূর্ব্ব বিদ্যা জাহির করিয়াছেন। দৈনেশী প্রতিভা কতদিকে মূর্খতা প্রকাশ করিল, পাঠক তাহা দেখুন।

আমরা এ পর্য্যন্ত এই পুস্তকের যে সকল দোষের আলোচনা করিয়াছি, ইহার অন্য দোষের তুলনায় তাহা অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর। পুস্তকে হিন্দুর আচারের, সংস্কারের এবং বিশ্বাসের উপর পরোক্ষভাবে দারুণ আঘাত করা হইয়াছে। যে সকল সিদ্ধান্ত তর্কের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভবে না, সেই সকল সিদ্ধান্ত উপন্যাস-লিখিত ব্যক্তিবিশেষের মুখ দিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের উপর অনেকস্থলে ঘোর আক্রোশ প্রকাশ পাইয়াছে। লেখক ব্রাহ্মণ জাতির উপর পরোক্ষভাবে বিষম গ্লানিকর মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ ইহাতে পুণ্যাত্মার ও ধার্ম্মিকের যেরূপ কষ্ট ও দুঃখ বর্ণিত হইয়াছে, পাপীর শাস্তি সেরূপভাবে বর্ণিত হয় নাই। সংসারে অবশ্য সকলক্ষেত্রে

পাপীর পাপের অনুরূপ দণ্ড দেখা যায় না। অনেকক্ষেত্রে বাহ্য দৃষ্টিতে আমাদের মনে হয় যে, সংসারে বটে, পাপ করে—বিশ্বাসঘাতকতা, পরশ্রীকাতরতা, চৌর্য্য, পরস্বাপহরণ প্রভৃতি করে, তাহারা তাহাদের কার্য্যের অনুরূপ শাস্তি পায় না। অনেক সাধুকেও নানা সময়ে নানা বিড়ম্বনায় বিড়ম্বিত হইতে হয়। কিন্তু Realistic novel লিখিবার অনুরোধে ঐ সকল চিত্র সাহিত্যে প্রকটিত করা সঙ্গত নহে। ইহা হিন্দুর রীতিবিরুদ্ধ। ইহার দ্বারা সমাজে দুর্নীতির প্রচার হয়। অল্পবুদ্ধি পাঠকগণ উহা পড়িলে পাপের দিকেই আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। আমরা জানি যে, য়ুরোপের একশ্রেণীর লোক আমাদের বিরুদ্ধমতাবলম্বী আছেন। কিন্তু সেই অজুহতে আমরা যে তাঁহাদের অনুকরণ করিবই, ইহা কোন মতেই সঙ্গত হইতে পারে না। দীনেশবাবু স্বয়ং মেদিনীপুরের সাহিত্যসম্মেলনে 'দেশী ও বিদেশী' শীর্ষক যে সন্দর্ভটি পাঠ করিয়াছিলেন, আমাদের মতে তাহা সুন্দর হইয়াছিল। ১৩২১ খৃষ্টাব্দের বৈশাখের 'প্রবাসীতে' তাহা প্রকাশিত হইয়াছিল। আজ যদি আর্টের নাম দিয়ে দীনেশবাবু 'অধর্ম্মের জয় এবং ধর্ম্মের ক্ষয়ে''র চিত্র আঁকিতে থাকেন, তাহা হইলে কি বলিব না যে, তিনি নিজের কথার বিপরীত কার্য্য করিতেছেন?—সুবিধা পাইয়া নিজের মতটা বদলাইয়া ফেলিয়াছেন? দুর্ভাগ্য ক্রমে রায় সাহেব তাহাই করিয়াছেন বলিয়া আমাদের মনে হইল। আমরা ক্রমশঃ তাহা দেখাইব।

প্রথমতঃ তিনি কানাই বাবাজির মুখ দিয়ে বলাইতেছেন—"যিনি সাক্ষাৎ ভগবানের পূর্ণরূপ—জগতে আচণ্ডাল সকলের নিকট প্রেম বিতরণ করেছেন, তাঁর কাছে আবার জাতিভেদ কি? তিনি ব্রাহ্মণের পাদোদক খেয়েছিলেন, সে কেবল বিনয়।" যে কানাই বাবাজীকে তিনি আদর্শ পুরুষ বলিয়া অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহারই মুখ দিয়া এই কথা বলাইলেন, আর তাহার প্রতিপক্ষ রেমো গোসাই চুপ করিয়া গেল। কিন্তু নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিলে কানাই বাবাজির এ কথা ভ্রান্ত বলিয়াই মনে হয়। যাহা হউক, এ স্থলে সে তর্কের অবতারণা করা সম্ভবে না, সঙ্গতও নহে। এই সকল বিষয় এমন ভাবে উপন্যাসে অবতারণা করা অসঙ্গত।

গ্রন্থের ২৫ হইতে ২৭ অধ্যায়ে গ্রন্থকার এক অতিপ্রাকৃত বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন।—অসুস্থ অবস্থায় দেবেশ ত্রিস্রোতাতীরে যশোমাধবের মঠে অবস্থিতি করিতেছিলেন। একদা রজনীযোগে নৈশ অন্ধকার ভেদ করিয়া একটি সঙ্গীত তাঁহার কর্ণে পশিল। গানের মর্ম্ম এই যে "পরকে আঘাত করো না,

নিজে আঘাত পাবে, পরকে মের না নিজের বুকে দাগা লাগবে।" কয়েক দিন পরে এক নারীমূর্ত্তি দেবেশের সমক্ষে উপস্থিত। নারী নিজের আত্মপরিচয় দিতে আরম্ভ করিল। সে কাহিনী পুস্তকের ১৩২ পৃষ্ঠা হইতে ১৫৩ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই নারী যে আত্মকাহিনী বিবৃত করিয়াছেন, তাহা কেবল যে অস্বাভাবিক বা অতিপ্রাকৃত তাহা নহে,—তাহা নিষ্ঠাবতী হিন্দুমহিলার একটি অত্যন্ত বিকৃত চিত্র। ইনি বলিয়াছেন,—"ইনি বৃন্দাবনে বাস করিতেন, নানা তীর্থে স্নান করিয়াছিলেন, দেবমন্দির পূজা করিতেন, হিন্দু বিধবার আচার অনুষ্ঠান পালনে বিশেষ বাড়াবাড়ি করিতেন,—এবং আচারবিষয়ে কাহারও শিথিলতা দেখিলে তাঁহাকে নানারূপ কষ্ট দিতেন। ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য সমস্ত জাতীয় লোকের প্রতি তাঁহার ঘোরতর ঘৃণা ছিল। একদা এক বাগদীর ছেলে দারুণ পিপাসায় পীড়িত হয়ে তাঁহার নিকট জল চাহিয়াছিল, তাহার কাতরকণ্ঠে 'মা' শব্দে তাঁহার মন গলে গেল, কিন্তু পর ক্ষণেই ঘেন্নায় গাটা জ্বলে গেল,—'ছি! বাগ্‌দীর ছেলে। এই অপবিত্র জীবটাকে আমি জল দেব!' তিনি সেই তৃষ্ণাকাতর শিশুকে জল না দিয়া চলিয়া গেলেন।" আমরা জিজ্ঞসা করি, ইহা কি কোন নিষ্ঠাবতী ব্রাহ্মণকন্যার স্বাভাবিক চিত্র? যে ব্রাহ্মণের গৃহে সামান্য কাজ কর্ম্মে আচণ্ডাল সকলকে অন্নদান করা হয়, নিত্য পঞ্চমহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান হয় এবং যে ব্রাহ্মণ ভোজনান্তে পিপীলিকাদি প্রাণিহিতার্থেও অন্ন ত্যাগ করেন, ইহা কি সেই ব্রাহ্মণের ঘরের মহিলার চিত্র! হিন্দু মহিলা যদি অতিশয় শুচিবায়ুগ্রস্তা হয়, তাহা হইলেও সে ঐরূপ অবস্থায় নিশ্চয়ই জল দিবে,—জল দিয়া স্নান করিয়া আসিবে, তথাপি জল দিবে। হিন্দু মহিলার হৃদয় কখনও এত নির্ম্মম হইতেই পারে না যে, সে এইরূপ তৃষ্ণাতুর জীবকে জল না দিয়া থাকিতে পারে। আমরা কোথাও কোন ব্রাহ্মণকন্যাকে, এমন কি অতি উৎকট বায়ুরোগগ্রস্তা ব্রাহ্মণললনাকেও এত নির্ম্মম, এমন পিশাচী হইতে দেখি নাই। এ চিত্র Realistic বা বস্তুগত নহে, ইহা রায় সাহেবের উৎকট ব্রাহ্মণবিদ্বেষবিজৃম্ভিত কল্পনার অলীক চিত্র। নিষ্ঠাবতী হিন্দুমহিলা মাত্রই জানেন,—"যাবৎ জীব তাবৎ শিব।" হইতে পারে ইহা কোন উৎকট বায়ুরোগগ্রস্তা মহিলার চিত্র। কিন্তু একটা উন্মাদরোগগ্রস্ত ললনার চিত্র অঙ্কিত করিতে গিয়া হিন্দুললনার নিষ্ঠার ও ধর্ম্মবিশ্বাসের তথা ব্রাহ্মণজাতির উপর গ্লানি করা নিতান্ত কাপুরুষের কাজ। এই উন্মাদরোগগ্রস্তা, অপ্রকৃতিস্থা মহিলাকে লেখক নিজের কাগজ-কলমে অতি কঠোর শাস্তি বিধান করিয়াছেন। তাহার মনের ভিতর ঘোর

সঙ্কীর্ণতা থাকিলেও সে নিষ্ঠাবতী ও সতী ছিল। রায় সাহেব কল্পনাবলে মুসলমান দ্বারা তাহার সতীত্ব অপহৃত করাইয়াছেন। হতভাগিনী দুরন্ত মর্ম্ম-জ্বালায় আত্মহত্যা করিয়াছিল। কিন্তু দীনেশবাবু তাহাতেও নিরস্ত হন নাই। মৃত্যুর পর পারলৌকিক দেহেও তিনি উহাকে অশেষ যন্ত্রণা দিয়াছেন।—"মনে হ'ল শত শত ছুরি দিয়ে কেউ আমায় কাটছে। যেখানে একবার কেটেছে, ভয়ানক রক্ত বেরুচ্ছে, সেইখানেই আবার ছুরি চালাচ্ছে। খানিক পরে মনে হ'ল ভীষণ শীতে আমার দাঁতকপাটি লেগেছে; আবার তার পরই যেন আগুনে ফেলে আমায় দগ্ধ ক'রে তাহার উপর হলাহল বিষ ছড়িয়ে দিচ্ছে। কেউ যেন শত শত ছুঁচ আমার গায় ফুটিয়ে দিচ্ছে এবং একটু পরে বিস্ফোটকের যন্ত্রণায় আমি অসহ্য কষ্ট পাচ্ছি।" দীনেশ বাবুর মানসকন্যার এই নিষ্ঠাবতী ব্রাহ্মণীর উপর এত বিদ্বেষ যে, তিনি তাহার দগ্ধ দেহের উপর হলাহল নামক তীব্র বিষ ছড়াইয়া দিয়াও সন্তুষ্ট হইলেন না, তিনি উহাকে পরলোকে পাঠাইয়া বহুকাল ধরিয়া এইরূপ যন্ত্রণা দিয়াছেন। "এই অবস্থায় আমার কতদিন, কত মাস বা কত বৎসর গেল, তা বুঝতে পাল্লেম না।" (১৪৬ পৃষ্ঠা)

তাহার পর 'ওপারের আলো' আসিল। উহা কি শুনুন ;—

"দেহের পবিত্রতা কি,—এ দেহ ত অস্থি মজ্জা বসা; ইহা পচে গলে ভাঙ্গে।" * * * * জলে স্নান করলে পবিত্রতা হয় না। যমুনার ঘাটে ঘাটে কত কুমীর আছে, রাত দিন তারা জলে থাকে। তুমি মাত্র সাত বার স্নান করে যদি পুণ্য অর্জ্জন করে থাক, তবে ত তারা দেবতা হয়ে গেছে; উপোসে কি ফল হয় বল দেখি! গর্ত্তের সাপ ছ'মাস উপোস করে থাকে, তারা ত মুনি ঋষি হয়ে যায় নি।" ইত্যাদি

একটা অস্বাভাবিক চরিত্র অঙ্কিত করিয়া এমন ভাবে হিন্দুর শৌচাচার-ধর্ম্মের বিরুদ্ধে "জেহাদ" ঘোষণা করিবার সুবিধা করিয়া লওয়া রায় সাহেব দীনেশচন্দ্রের পক্ষেই সম্ভবে। "Fools rushin where angels fear to tread ?"

তাহার পর—"তুমি যে সকল মন্দিরে গেছ—তা শুধু ইট চূণ সুরকীর ডেলা, তুমি যে সকল দেবতার পূজা ক'রেছ, তা মাটী আর পাথর। জীবন্ত দেবতা এলে তুমি অন্তরূপ হয়ে যেতে।" একটা কাল্পনিক চিত্র আঁকিয়া এইরূপ কথা বলা 'কালাপাহাড়ে'সংস্কারকের চাতুরী মাত্র।

তাহার পর এই পরলোকগতা মহিলাটি যখন ভগবান্‌কে কায়মনোবাক্যে ডাকিয়া "ওপারের আলো" প্রাপ্ত হইল, তখন সে ভগবানের নিকট কি প্রার্থনা করিল দেখুন।—"আমি চল্লুম,—আমি তার কাছে চেয়েছি যেন আবার জন্ম দিলে আমায় ব্রাহ্মণকুলে জন্ম দিও না, স্পর্দ্ধার মধ্যে নিজকে বড় করে অপরকে তুচ্ছ করিবার প্রবৃত্তির মধ্যে যেন জন্ম না হয়। আমাকে চাঁড়াল কর, আমাকে মেথর কর, পরকে পীড়ন করেছি—এতকাল পরে পরের সেবায় অতি হীন কার্য্যেও যেন আমি তোমাকে স্মরণ করে গৌরব বোধ করতে পারি।"

উঃ! কি ভীষণ ব্রাহ্মণবিদ্বেষ! ব্রাহ্মণকুলে জন্মিলেই কি স্পর্দ্ধার মধ্যে জন্ম হয়? ব্রাহ্মণ অন্য জাতিকে ঘৃণা করে। উপন্যাস লিখিয়া যাহারা সমাজ মধ্যে ব্রাহ্মণবিদ্বেষের এইরূপ হলাহল ছড়াইতেছেন, তাঁহারা হিন্দুসমাজের বিষম শত্রু,—বর্ণাশ্রমধর্ম্মের উচ্ছেদসাধক কালাপাহাড়। ইহাদের স্পষ্ট করিয়া সোজা ভাবে কোন কথা বলিবার সাহস নাই; তাই এরূপ কাপুরুষতা অবলম্বনপূর্ব্বক অস্বাভাবিক চিত্র আঁকিয়া ইহারা বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের গ্লানি করে। ইহাদের বিদ্যার দৌড় এতদূর যে, নন্দঘোষকে কংসকারাগারে বন্দী করে,—ময়দা ছানিয়া তাহার পর উহাতে ঘিয়ের ময়ান দেয়। যাঁহারা এরূপ গ্রন্থপ্রচারের সহায়তা করেন, তাঁহারাই বা কিরূপ সমাজহিতৈষী?

একটা শুচিবায়ুগ্রস্তা সঙ্কীর্ণচিত্তা মহিলার অতিরঞ্জিত চিত্র আঁকিয়া রায় সাহেব দীনেশচন্দ্র ত তাহাকে ইহকালে ও পরকালে যথেষ্ট শাস্তি দিয়াছেন,—কিন্তু তাঁহার গ্রন্থের মধ্যে যাহারা সত্য সত্যই ঘোর পাতকী, সেই রতন কবিরাজকে, হৃদয়েশকে ও পাপিনীর পা-ঝাড়া জ্ঞানদায়িনীকে তাহাদের পাপের অনুরূপ শাস্তি দিতে তিনি কুণ্ঠিত। হেন কুকর্ম্ম নাই যাহা রতন কবিরাজ করে নাই। জাল জুয়াচুরী নরহত্যা ব্যভিচার, বিশ্বাসঘাতকতা, সে সবই করিয়াছে। সে দৈবাৎ একবার দস্যুহস্তে লাঞ্ছিত হইয়াছে। হৃদয়েশ ঘোর প্রজাপীড়ক, পরস্বাপহারী, ভ্রাতৃহন্তা, এবং কতকটা ভ্রাতুষ্পুত্রহন্তা, তাহার শাস্তি তাহার পুত্রবিয়োগে কতকটা হইয়াছিল,—কিন্তু অপরাধের তুলনায় তাহা সামান্য।

তাহার পর জ্ঞানদায়িনী। ইনি রাজা কিশোর রায়ের পত্নী। যৌবনের প্রারম্ভে ইনি কিছুকাল পিত্রালয়ে ছিলেন,—সেই সময় হইতে ইনি স্বামীর উপর বিরক্ত হন। কিন্তু স্বামী কিশোর রায় ইহাঁর মন পাইবার জন্য পাগল। তথাপি ইনি কিশোরকে চাহেন না। তাঁহার কথার উত্তরই দেন না। পক্ষান্তরে

কিশোর রায় তাঁহাকে না দেখিলে দশদিক্ অন্ধকার দেখেন। শেষে জ্ঞানদায়িনীর উপেক্ষা ও অবজ্ঞা তাঁহার অসহ্য হইল। তিনি কানাই বাবাজির শরণ লইলেন। কানাই বাবাজি তাঁহাকে উপদেশ দিলেন, "তুমি তোমার স্ত্রীর কোন কার্য্যের প্রতিবাদ ক'রো না।" বাড়ী ফিরিয়া রাজা কিশোর রায় সেই উপদেশ পালন করিতে লাগিলেন। জ্ঞানদা ক্রমে কিশোর রায়কে বিষ প্রয়োগে পাগল করিবার চেষ্টা পান। শেষে কিশোর রায় জানিতে পারিয়াছেন জানিয়াও তিনি প্রতি রাত্রিতে অভিসারে যাইতে থাকেন ; এইবার কিশোর রায়ের রাগ হইল। তিনি বাহির হইবার দুয়ারে চাবি দিলেন। জ্ঞানদা কুলের বাহির হইয়া গেল। কিশোর রায় সন্ন্যাসীর আশ্রমে যাইয়া লোকসেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন। কিছু দিন পরে জ্ঞানদা দস্যুহস্তে সাংঘাতিকরূপে আহতা হইয়া ঐ আশ্রমে গমন করেন। তথায় তাঁহার প্রাণান্ত হয়। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি কিশোর রায়ের নিকট অনুতপ্তহৃদয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কিশোর রায়ের জ্ঞানদাপ্রেম তখনও টুটে নাই। তিনি তাহাকে উদারতার সহিত ক্ষমা করিলেন। ইহাই হইল স্বেচ্ছায় সতী-ধর্ম্মবিসর্জ্জনকারিণী জ্ঞানদার পাপের প্রায়শ্চিত্ত !!! এরূপ নাম মাত্র প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিয়া গ্রন্থকার সমাজে কোন্ শ্রেণীর নরনারীর আধিক্য ঘটাইতে চাহেন তাহা পাঠক বিবেচনা করিয়া দেখুন।

হিন্দুর দৃষ্টিতে এইরূপ নারীচরিত্র অস্বাভাবিক। কোন হিন্দুললনাই আজও পর্য্যন্ত পতিকে জানাইয়া দম্ভভরে ব্যভিচার করিতে পারে, এ ধারণা আমাদের নাই। সাহিত্যে এরূপ পাপিষ্ঠার এই প্রকার চিত্র প্রকটিত করা অত্যন্ত অসঙ্গত ও সমাজের অমঙ্গলকর। ইহাতে সমাজে পাপ প্রশ্রয় পায়। আর পাঠক ব্যভিচারিণী জ্ঞানদার পাপের প্রায়শ্চিত্তের সহিত উক্ত সঙ্কীর্ণচিত্তা নিষ্ঠাবতী ব্রাহ্মণীর পাপের শাস্তির তুলনা করুন।

এই দীনেশ বাবু মেদিনীপুরে বলিয়াছিলেন—"এই সকল লেখক এদেশীয় নারীপ্রকৃতিতে এরূপ কল্পিত অসংযম আরোপ ক'রে তাঁদের মা-বো'নদের অপমানিত কর্‌ছেন। শিক্ষিত লোকদের মধ্যে যাঁরা এই বিলাতী নকল চালাচ্ছেন, তাঁরা তাঁদের মা-বো'নদের হাতে তাঁদের রচিত বইগুলি দিয়ে দেখ্‌বেন, তাঁরা এই সকল পুস্তক পোড়ে লজ্জায় মাথা হেঁট করেন কি না। তাঁদের মন্তব্য আগে নিয়ে তার পর বই প্রকাশ করবেন।" আমরা জিজ্ঞাসা করি দীনেশবাবু কি এই জ্ঞানদায়িনীর চরিত্রে অতি উৎকট অসংযমের আরোপ

করিয়া তাঁহার মাতা ভগিনীদিগকে অপমানিত করেন নাই? তাঁহাদিগকে দেখাইয়া কি তিনি এই গ্রন্থ প্রকাশিত করিয়াছেন? না এ কেবল তাঁহার পরোপদেশে পাণ্ডিত্য প্রকাশ?

মেদিনীপুরে এই দীনেশবাবুই বলিয়াছিলেন,—"কিন্তু বাৎসল্য এবং দাম্পত্য এখনও বাঙ্গালার তপস্যার সামগ্রী, তার উপর ঘা দিলে আমাদের যেটা একমাত্র তীর্থ, তার পবিত্রতা নষ্ট হতে পারে—অন্য কোন দিক্ থেকে যে সে ক্ষতি পূরণ হবে,—তার তো সম্ভাবনা দেখচি না।" দীনেশবাবু জ্ঞানপাপী, সেই জন্য তাঁহার অপরাধ অমার্জ্জনীয়। তিনি মেদিনীপুরেই বলিয়াছিলেন,—"এ ভাবের অসংযম আমাদের সমাজে নেই, তা উড়ে এসে কিছুতেই আমাদের অন্তঃপুর অধিকার কর্ত্তে পার্ব্বে না।" যিনি এই কথা বলিয়াছেন, তিনিই আবার অসংযমের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া জ্ঞানদায়িনীর চরিত্র আঁকিলেন,—ইহাই বিস্ময়ের বিষয়। হায় দীনেশ, সকল দিকেই শেষটা এমন করিয়া লোক হাসাইলে! ঔপন্যাসিক হইবার দুরাশায় এমন করিয়াও দিশা হারাইলে! তোমার উপন্যাস পড়িয়া মনে হয়,—

"যত ছিল নাড়াবুনে সব হ'ল কীর্ত্তুনে
কাস্তে ভেঙ্গে গড়ায় করতাল।"

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়। (বিদ্যারত্ন)

নিরাপদ।

সকলের সাথে আছে বিচ্ছেদ—
আছে বিরহের—ভয়
সুখ-দুঃখ-দ্যুতি ক্ষণপ্রভাসম
চিরস্থায়ী কেহ নয়।
তুমি আছ চির আঁকড়ি আমারে
প্রেমময় বঁধু স্বামী—
বিপদ সম্পদ বেড়ুক না ঘিরে
(তবু) চির নিরাপদ আমি।
জীবন মরণ যত টানাটানি
করুক না শতবার
অমৃত বেষ্টনী চারিধারে মোর
(ওগো) ভয় কি আমার আর।

শ্রীগিরীন্দ্রমোহিনী দাসী।

হবচন্দ্র রাজার গবচন্দ্র মন্ত্রী।

(১)

পুরাকালে হবচন্দ্র নামক একজন বিখ্যাত রাজা ছিলেন, এবং গবচন্দ্র নামক তদপেক্ষা বিখ্যাত তাঁহার একজন মন্ত্রী ছিলেন। কি করিয়া প্রজাগণকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়া তাঁহারা নির্ব্বিকল্পে রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন, তাহারই কিঞ্চিৎ পরিচয় দিবার জন্যই এই ক্ষুদ্র গল্প।

হবচন্দ্র রাজা পরম বৈষ্ণব ছিলেন; সুতরাং সংসারের কোন খবর রাখিতেন না। কোন জটিল বিষয় উপস্থিত হইলেই তিনি মন্ত্রীকে বুঝাইয়া দিতে বলিতেন।

সে দিন পুণ্যাহ। হবচন্দ্র মজলিস করিয়া বসিয়া আছেন। রাজ্যের অন্তর্গত ও বহির্গত প্রদেশ হইতে অনেক গণ্যমান্য লোক উপস্থিত। অমাত্যগণ রাজসন্নিধানে তাঁহাদের পরিচয় দিতেছিলেন। রাজার নিকট তাঁহাদিগের যাহা বক্তব্য, তাহা শুনিয়া রাজা হবচন্দ্র, মন্ত্রী গবচন্দ্রের সহিত পরামর্শ করিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিতেছিলেন।

সর্ব্বপ্রথমে রাজপুরোহিত মাল্যচন্দনহস্তে রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। রাজা নমস্কারপূর্ব্বক তাহা গ্রহণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, রাজ্যের মঙ্গল ত?

পুরোহিত। একরকম বটে, কিন্তু সনাতন ধর্ম্ম লোপ পাচ্ছে'। আপনি রক্ষা করুন।

রাজা। (সত্রাসে মন্ত্রীর দিকে চাহিয়া) এ কি রকম?

গবচন্দ্র। বৃদ্ধ হলেই একটা না একটা লোপ পায়। যেমন দাঁত। এ সব জিনিষের উপর বল প্রয়োগ ক'রে রক্ষা করা অসম্ভব। তবে দাঁত যেমন সোণা দিয়ে বাঁধানো যায়, তেমনি ধর্ম্মও পুঁথিতে ভাল ক'রে ছাপিয়ে বাঁধানো যায়। এ সম্বন্ধে প্রজাগণকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া উচিত।

রাজা। (মন্ত্রীর কর্ণে)। এত দূর স্বাধীনতা দিলে ভবিষ্যতে কোন গোলযোগ হবে না ত?

গবচন্দ্র। (রাজার কর্ণে) এ রকম অনেক স্বাধীনতা দিতে হবে, কাজেই স্বাধীনতায় কাটাকাটি: হয়ে' ফলে মঙ্গলেই দাঁড়াবে।

রাজা। 'তথাস্তু'। আমার প্রথম হুকুম 'ধর্ম্ম বাঁধিয়ে রাখ'।

পুরোহিত বিদায় হইলে সেনাপতি সম্মুখীন হইয়া রাজাকে অভিবাদন করিলেন।

রাজা। ক্ষাত্রধর্ম্মের সংবাদ কি?

সেনাপতি। সকলের বলবীর্য্য লোপ পাচ্ছে'। শত্রুদের আক্রমণ হ'তে রাজ্য রক্ষা করা দুষ্কর হয়ে পড়েছে।

রাজা। মন্ত্রী! এর উপায়?

গবচন্দ্র। বার্দ্ধক্য ও রোগে ধ'রলে বলবীর্য্য ক্রমে লোপ পায়। আগে এ দু'টোর সঙ্গে যুঝ লে তবে ত শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ।

রাজা। তবে কি রাজ্যটা হারাব?

গবচন্দ্র। (হাসিয়া) মোটেই না। শত্রু আক্রমণ করে কেন? কাঞ্চন কিম্বা কামিনীর জন্য। কাঞ্চন এদেশে নাই। আছে কেবল চাষীর ধান, গরুর চামড়া, গোটাকতক বুনো গাছ ও পাথরের পাহাড়। তার মধ্যে কি আছে, তার এখনো আবিষ্কার হয় নি। চাসীদের একেই অবস্থা খারাপ। শত্রু এলে তারা গরুশুদ্ধ চীৎপাত হয়ে, চো'খ উল্‌টে প'ড়ে থাক্‌বে। কাজেই আক্রমণকারী বেকুফ হয়ে স'রে পড়বে। গাছ-পাথর সম্বন্ধে এই কথা যে, সেগুলো আপনার অধীনস্থ জমিদারের। সেগুলো যদি কেটে লুটে নিয়ে যায়, তবে আপদ চুকে যাবে। এখন জমিদার সেইগুলো বিক্রী ক'রে গাঁজা মদ ওড়াচ্ছে। নিকেশ হয়ে গেলে ঠাণ্ডা হবে। তবে স্ত্রীলোক সম্বন্ধে একটু সাবধান হ'তে হবে। পাছে তাদের উপর আক্রমণ ক'রে যদি সোনার গহনা গুলো কেড়ে লয়—

রাজা (সত্রাসে)। তবে কি করা উচিত?

গবচন্দ্র। তাদের স্বাধীনতা দেওয়া উচিত। ক্ষত্রধর্ম্ম তারাই ঘরের মধ্যে খানিকটা রেখেছে। সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিলে তারা গহনাগুলো বেচে ফেলে কতকগুলো গাউন ও শাড়ী ও পুঁথি কিনে বস্‌বে, ও লেখাপড়া শিখে খুব বক্তৃতা ক'রবে। পুরাণো গাউন ও মুখের চোটপাট দেখে কোন শত্রুই অগ্রসর হবে না। সে সম্বন্ধে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

রাজা। 'তথাস্তু'। আমার দ্বিতীয় হুকুম—"স্ত্রীলোকদের খুব স্বাধীনতা দেও"।

ইহাতে রাজার ও মন্ত্রীর 'জয় জয়কার' পড়িয়া গেল।

সেনাপতি বিদায় হইলে উত্তর পশ্চিমাঞ্চল হইতে প্রকাণ্ড পাগড়ীশোভিত-মস্তক একজন বণিক্ উপস্থিত হইল।

বণিক। মহারাজের জয় হউক। আমি চারিটি বিখ্যাত সামগ্রী আপনার রাজ্যের মধ্যে প্রচার কর্ত্তে এনেছি। যদি অনুমতি দেন তবে—

রাজা (হাসিয়া) আমার অনুমতি আছে যে, যাহার যা খুসী প্রচার ক'র্ত্তে পারে। বৃষ্টির জল হতে আরম্ভ ক'রে দুঃখীদের আর্ত্তনাদ, সকলই প্রচার হয়। আপনার জিনিষগুলো দেখি।

বণিক্। এই দেখুন।

১। সূর্য্যরশ্মিনিবারিণী টুপি।—তিব্বত দেশের লোম ও জাপানের সোলা হ'তে তৈরি। এটা মাথায় দিয়ে চাষীরা নির্ব্বিবাদে সারাদিন লাঙ্গল চস্‌বে। আপনার রাজস্বও বাড়্‌বে।

২। চরণযুগলপ্রসারিণী জুতো। চটি পায় দিয়ে চাষ করা অসম্ভব। হঠাৎ খুলে গেলে তার মধ্যে বর্ষাকালে কাদা ও ব্যাং ঢুকে পড়ে। এ জুতোর মধ্যে পদতল ছাড়া আর কেউ ঢুক্‌তে পার্‌বে না।

৩। সংক্ষেপে লজ্জানিবারিণী সুট। অর্থাৎ পায়জামা ও কোট ও ওয়াটার প্রুফ। এগুলো শীঘ্র খুলে যায় না, ও বৃষ্টি বাদলা হ'লে এই অয়েল-ক্লথের ওভার-কোটটা গায় ফেলে দিলেই হ'ল। ইচ্ছে হ'লে এর মধ্যে প্রচুর মুড়ি মুড়কি রাখা যায়।

৪। মিঠেকড়া ধূম্রশালিনী সিগারেট। এতে হুকো, কল্‌কে, তামাক, ঘুটের আগুন, চিম্‌টে, সরা প্রভৃতির কিছুরই দরকার নাই। একটা দেশলাই জালিয়ে মুখে দিলেই হ'ল। স্ত্রীলোকেরাও খেতে পারে।

রাজা চমৎকৃত হইয়া মন্ত্রীকে বলিলেন—'শুঁকে দেখ'!

গবচন্দ্র। চমৎকার গন্ধ!

হবচন্দ্র। সংবচ্ছরে এই চারিটি জিনিষে কত খরচ হবে?

বণিক। পঁচিশ টাকার বেশী নয়।

হবচন্দ্র। এ টাকা তারা পাবে কোথায়?

গবচন্দ্র। ধান বেচে।

হবচন্দ্র। কিন্তু খাজনা আদায় হবে কিসে? হয়ত এইগুলো দিয়ে আপাদ মস্তক ঢেকে তেড়ে মেড়ে দাঁড়াবে; ধান গেলে খাবে কি? দুর্ভিক্ষ হবে! জমিদার খাজনা পাবে না, আমি রাজস্ব পাব না।

বণিক্। মহারাজ! আপনার কোন ভয় নাই। পূর্ব্বেই বলেছি যে, এগুলো ব্যবহার কর্লে বেশী চাস হবে, বেশী ফসল হবে, গরুর সার বেশী হবে। তাতেও না কুলিয়ে উঠে, তবে কলে চাষ করবে। টাকার দরকার হয়, তবে আমি ধার দেব! এমন কি, পরে কলকারখানা খুলে এগুলো এ দেশেই তৈরি হবে। একদিকের কলে চাষ হবে, আর একদিকের কলে জুতো হবে।

ধান গেলে, কলকারখানা ও টাকায় কি করিয়া ধান আসে, তাহা হবচন্দ্রের মাথায় প্রবেশ কতে বিলম্ব হইল। বিশেষতঃ হবচন্দ্রের একজন স্বদেশী শ্রেষ্ঠী পূর্ব্বকালে বাণিজ্য করিতে গিয়া টাকা দিয়াও অন্য দেশ হইতে ধান পান নাই, কারণ সকলেই নিজের নিজের দেশের খাদ্য সাবধানে রক্ষা করে। সুতরাং রাজা হতাশ ভাবে মন্ত্রীর দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন।

গবচন্দ্র। বণিক্ মহাশয় যা বল্‌ছেন, সেটা সভ্যতার কথা। সভ্যতা যত বাড়ে, বেশীভাগ লোক অকর্ম্মণ্য হয়, গোটা কতক শেষে টিঁকে যায়। খাজনায় ও রাজস্বের জোরে জমিদার ও দেশশুদ্ধ কর্ম্মচারী জীবন ধারণ ক'রছে। তাতে টান পড়লেই তারা দৌড়ে গিয়ে লাঙ্গল ধরবে, ও কৃষকদের সঙ্গে ঐ 'চরণযুগল-প্রসারিণী' দিয়ে দাঙ্গা বাধাবে। এটার যত শীঘ্র শেষ হ'য়ে যায়, ততই মঙ্গল। প্রবৃত্তির পথে কখন বাধা দেবেন না। স্বাধীনতার দৌড় কতদূর, তা সকলেই একবার দেখে নেবে। আমরা সেটা খর্ব্ব ক'রে লোক নিন্দার ভাগী হব কেন?

হবচন্দ্র। আর খেতে না পেলে যখন সকলে লুটপাট করবে?'

গবচন্দ্র। তখন স'রে পড়বেন। আসল কথা তখন লুটপাট করবার কিছুই থাক্‌বে না। কেবল ঐ অপদার্থ জিনিষগুলো। তা খাওয়া যায় না। আপনি বণিক্‌প্রবরকে শীঘ্র ওগুলো পাঠাতে বলুন। আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠীরা ওর নিকট হ'তে সেগুলো কিনে, আর একদিকে সেইগুলো বেচে ধানগুলো গুদামজাত করে কুবেরের মতো 'গট' হয়ে বসুক। এ রকম না হলে সহর হয় না। সহর না হ'লে রাজ্যের শোভা হয় না।

রাজা হৃষ্টমনে বলিলেন 'তথাস্তু'। আমার তৃতীয় হুকুম—"অবাধ বাণিজ্য ও ব্যবসা। ইহাতে কেহ হস্তক্ষেপ করিবে না।'

বণিক্ বিদায় হইলে, কতকগুলি শূদ্র এবং ইতর জাতি নানাবিধ ফলফুল লইয়া রাজাকে উপহার দিতে আসিল। তাহাদের নেতা—শ্রীযুক্ত জলদপটল মাইতি। রাজা তাঁহাকে পূর্ব্বেই জানিতেন। সে দালালি করিয়া বেড়াইত।

হবচন্দ্র। কিহে ভালত?

জলদপটল। সকলিই মঙ্গল, তবে এই পুণ্যাহের দিনে একটা উৎকৃষ্ট বাক্য বল্‌তে চাই।

হবচন্দ্র। সে উৎকৃষ্ট কথাটা কি ?

জলদপটল। মহারাজ! অনেক্‌দিন আমরা ব্রাহ্মণের দাসত্ব স্বীকার ক'রে এসেছি। আমাদের সাধ যে, একটা 'জাতিমারার হোটেল' খুলে জাতিভেদটা তুলে দিই।

হবচন্দ্র (মন্ত্রীর প্রতি)। মন্ত্রী! জাতি কি একেবারে মারা যায় ?

গবচন্দ্র। জাতি সব মারিয়া দিলে শেষে যে জাতি দাঁড়ায়, সেটাও একটা জাতি। যেন নিগুর্ণ ব্রহ্ম। তাতে ধর্ম্ম ও ঈশ্বর মান্‌বার দরকার নাই।

হবচন্দ্র। তুমি ধর্ম্ম ও জাতির মধ্যে গড়বড় কর্চ্ছ।

গবচন্দ্র। আমাদের দেশে জাতি ও ধর্ম্মের অর্থ একই। ধর্ম্মের শেষে যেমন নিগুর্ণ ব্রহ্ম, জাতির শেষেও অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ ও অব্যয় একটা জাতি। যেমন সাতটা সুর একত্র টিপে ধ'র্লে কিম্বা সাতটা রং একত্রে মেশালে সুন্দর হয়; সেই রকম। যখন সকলিই সেইদিকে যা'চ্ছে, তখন প্রবৃত্তির পথে বাধা দিয়ে আপনি ঠ'ক্‌বেন। ভেবেদেখুন—দেশ শুদ্ধো একটা জাতি হয়ে গেলে কত সুখের হবে। সকলে পরস্পরকে বাপ মা, ভাই বলে আদর করবে। প্রেমের রাজ্য এত বেড়ে উঠবে যে, কে কাকে ভালবাস্‌বে তার ঠিক্ থাক্‌বে না। প্রথমে কারো মনে কষ্ট হবে 'আমার নিজের ভাই ও নিজের পুত্র কাহাকে ব'লব' কিন্তু এটা কেবল স্বার্থপরতা। মনে করুন, আপনি দেহত্যাগ করে স্বর্গলাভ ক'রলে, সেখানে আপনার বাপ মা ভাই বন্ধুকে কি আর চিন্‌তে পারবেন ? কখনই না। অথচ স্বর্গে কত আনন্দ! সেই রকম, ধরাতলই স্বর্গ হবে। আপনিত নিজেই পরম বৈষ্ণব। আমার বুঝানোই বাহুল্য।

হবচন্দ্র দিগ্‌বিদিগ্‌বিহীন একটা দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, 'তথাস্তু' আমার চতুর্থ হুকুম যে, জাতিভেদ যাহার ইচ্ছা তুলিয়া দিতে পারে। এ সম্বন্ধে সকলকেই সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিলাম।

রাজা আরও বলিলেন—

আমার শেষ হুকুম যে, যদিও সকলকেই স্বাধীনতা দিয়াছি, কিন্তু কেহ কাহার সহিত ফৌজদারী বাধাইতে পারিবে না। কেহ কাহারো হিংসা করিবে না। নচেৎ, দণ্ডনীয় হইবে।

এই পঞ্চপ্রকার হুকুম জারি করিয়া রাজা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন, এবং

অন্তঃপুর পার হইয়া একটা পুরাতন সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া ত্রিতলে আরোহণ করিলেন, এবং সেখানে নিশ্চিন্তমনে শয্যায় হস্তপদ যথাসাধ্য বিস্তার করিয়া নাসিকাকে যৎপরোনাস্তি স্বাধীনতা প্রদান করিলেন। নাসিকা ডাকিয়া উঠাতে হবচন্দ্র নিরুপায় হইয়া নিদ্রিত হইলেন। এদিকে মন্ত্রী গবচন্দ্র স্বীয় হরিনামের মালা জপপূর্ব্বক, ভুত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান নামক তিনটি কালের বিভাগ চিন্তা করিতে লাগিলেন।

রাজার হুকুম জারি হওয়াতে রাজ্যের অবস্থা ফিরিয়া গেল।

রাজপুরোহিত গজেন্দ্রগোপাল ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণগণকে লইয়া একটা সভা স্থাপন করিলেন। উদ্দেশ্য,—'ধর্ম্মকে কি প্রকারে বাঁধান' যায়?' প্রথমে সকলে বলিল—'টীকা বাহির করুন'। কিন্তু যতই টীকা বাহির হইতে লাগিল, ততই ধর্ম্মের কলেবর বৃদ্ধি হইতে সুরু হইল। ব্রাহ্মণ সত্রাসে মন্ত্রী গবচন্দ্রের নিকট গিয়া সেই কথা সমূলে নিবেদন করিলেন।

গজেন্দ্র। মন্ত্রী মহাশয়! এখন উপায়?

গবচন্দ্র। প্রথমতঃ সমস্ত জাতিকে টীকা করিতে দেও। ক্রমে টীকায় টীকায় কাটাকাটী হ'লে ধর্ম্ম ঠিক স্থানে পঁহুচিবে।

গজেন্দ্র। কিন্তু বেদের অধিকারী সকলেত নয়!

গবচন্দ্র। টীকা দেখলেই তাহা প্রকাশ পাবে; কাহার কত বিদ্যাবুদ্ধি এটা টীকাতেই জানা যায়। অন্য কোন উপায় নাই।—

তিন মাসের মধ্যে রাজ্যের ছত্রিশ জাতীয় বিদ্বান্ মণ্ডলী সকলেই রাশীকৃত পুঁথি লইয়া রাজার নিকট উপস্থিত! রাজা নিদ্রা হইতে উঠিয়া এবং সেই স্তূপাকার টীকা নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন—'এসব দেখছি কর্ম্মযোগের টীকা?'

সকলে বলিল—'হাঁ। এখন কাহার টীকা সর্ব্বাপেক্ষা ভাল, তাহা মহারাজকে বিচার করিতে হইবে।'

হবচন্দ্র। মন্ত্রীর মত কি?

গবচন্দ্র। আমার মতে সকলে যাহার টীকা বুঝাইয়া দিতে পারিবে, সেই টীকাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

সকলে তাহাতে সম্মত হইয়া পরস্পরের টীকা পরীক্ষা করিতে লাগিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কেহ কাহারও টীকা বুঝিতে পারিল না।

সভাপণ্ডিত উঠিয়া বলিলেন, 'মহারাজ! যতদূর বুঝা গেল, সকলই বিফল হইয়াছে।'

হবচন্দ্র। আমার যতদূর রাজকার্য্যে অভিজ্ঞতা, তদ্দ্বারা জানতে পেরেছি যে, আমাদের সব কর্ম্মই বিফল হয়। এই জন্য ভগবান্ বলেছেন যে, কর্ম্মের ফল তাঁকেই আপনারা দেবেন। যাহোক্, এখন সকলকে কিছু কিছু পুরস্কার দেওয়া উচিত।

মন্ত্রী। তা ঠিক হয়ে যাবে। কর্ম্ম যখন বিফল, তখন পুরস্কারও বিফল। সুতরাং আর একটা নিষ্কাম কর্ম্ম ক'রে পুরস্কার দেওয়া উচিত।

হবচন্দ্র। সেটা কি প্রকার?

গবচন্দ্র। সেটা ক্ষৌরকর্ম্ম অর্থাৎ মস্তক প্রভৃতি মুণ্ডন। এর চেয়ে নিষ্কাম কর্ম্ম জগতে এপর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। প্রথমতঃ ক্ষৌরকারের বিশেষ কোন লাভ নাই, এবং দ্বিতীয়তঃ ক্ষৌরকর্ম্মেরও কোন উদ্দেশ্য নাই, অথচ সকলে প্রাণপণে মুখের সাম্‌নে দর্পণ ধারণ করতঃ মনের মত চুল, গোঁপ ও দাড়ি প্রভৃতি কামিয়ে নেয়।

হবচন্দ্র। সভাপণ্ডিতের মত কি?

সভাপণ্ডিত। সমিতি ইহাতে একমত হয়েছেন।

হবচন্দ্র। অতএব আপনারা অনুগ্রহ ক'রে পরস্পরের মাথা মুড়িয়ে গৃহে যান।

তখন সকলে একবাক্যে সম্মত হইয়া মস্তক মুণ্ডন করিলেন, এবং সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া রাজা হবচন্দ্রও স্বীয় মস্তক সেই অবস্থায় পরিণত করিলেন। এবং পুনরায় রাজা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

রাজা দর্পণে মুখ দেখিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন, ও রাজ্ঞীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

'কেমন দেখাচ্ছে বলত?'

রাজ্ঞী। এইবার মানুষের মত দেখাচ্ছে।

রাজা। আমারও তাই মত। মানবের চিন্তাশক্তি যত বাড়ে, চুলও তত পাকিয়া উঠে; অতএব তাহার পূর্ব্বে সেগুলো ফেলে দেওয়াই প্রশস্ত।

রাজ্ঞী। মহারাজের চিন্তাশক্তি ইদানীং খুব বেড়ে উঠেছে।

হবচন্দ্র। বোধ হয়, তুমি আমার রাজ্য শাসনভারনামক স্বরচিত প্রবন্ধ পড়ে দেখেছ?

রাজ্ঞী। সমস্তটাই পড়েছি। কিন্তু কার্য্যে কতদূর পরিণত হবে, তার কোন প্রমাণ এখনও পাই নাই।

হবচন্দ্র। কল্যাই পাবে। অর্থাৎ তোমাকেই রাজ্যশাসনের ভার গ্রহণ কর্ত্তে হবে।

রাজ্ঞী। আমার এ বিষয়ে এখনও সম্পূর্ণ দক্ষতালাভ হয় নাই।

হবচন্দ্র। (হাসিয়া) যে রাজাকে শাসন করে, তার পক্ষে রাজ্যশাসন শক্ত কথা নয়। তবে আপাততঃ গবচন্দ্রকে ব'লে দিইছি যে, কোন জটিল প্রশ্ন উঠ্‌লে সে পূর্ব্বেকার প্রথা, ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যগুলি বুঝিয়ে দেবে।

রাজ্ঞী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। রাজা স্বীয় দীর্ঘনিশ্বাস দ্বারা সেটুকু আরও বর্দ্ধিত করিলেন। তৎপর রাজ্ঞী রাজার পদসেবায় নিযুক্তা হইলেন।

দারুণ গ্রীষ্ম। রাজজামাতা বীরেন্দ্রকিশোর সিং খট্টাঙ্গের উপর নিদ্রিত। হঠাৎ পাখা বন্ধ হইয়া গেল। দিবা দ্বিপ্রহর!

দিবা দ্বিপ্রহরে রাজবাটীতে পাখা বন্ধ হইয়া যাওয়া, বিশেষ দুর্ঘটনার কথা। অন্যান্য দিন সাড়াশব্দ দিলে রাজকন্যা খবর লইতেন। অদ্য তাঁহার কোন চিহ্ন দেখিতে পাইলেন না। কচিৎ তাম্বুলকরঙ্কবাহিনী, কিংবা অন্তঃপুরস্থা তালবৃন্ত-ব্যজনকারিণীর পদসঞ্চারণের শব্দ মধ্যে মধ্যে শুনা যাইত। অদ্য বোধ হয় অন্তঃপুর জনশূন্য!

ক্রমশঃ দরদর ধারায় ঘর্ম্ম বহির্গত হওয়াতে রাজজামতা কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইলেন। ঘর্ম্মের এতদূর স্বাধীনতা অসহ্য! বীরেন্দ্রসিংহ শয্যা হইতে উঠিয়া ডাকিলেন —

'কে আছিস্ রে?''—

কোন উত্তর নাই! ক্রমে স্থুর হইতে আরম্ভ করিয়া পঞ্চমে শব্দ চড়াইয়া রাজজামাতা নানাবিধ ভাব প্রকাশপূর্ব্বক ডাকিলেন। শেষে তিনি স্থির করিলেন যে, অন্তঃপুরে স্ত্রীপুরুষ কেহই নাই!

গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া রাজজামাতা বৈঠকে আসিলেন। চিরকালের খানসামা পটলচন্দ্র সেখানে অন্যদিন শয়ন করিয়া থাকিত। আজ সে স্মিতমুখে বহির্দ্বারে দাঁড়াইয়া। বীরেন্দ্রসিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন—'পটল! ব্যাপার কি?'

পটল হাসিয়া বলিল,—আপনি বুঝি জানেন না? মহারাজ সকলকে আজ হ'তে স্বাধীনতা দিয়েছেন। তাই সকলে চতুর্দ্দিকে বেড়াতে বেরিয়েছে। বোধ হয় সন্ধ্যার সময় একটা মহাসভা বাগানের মধ্যে হবে।

বীরেন্দ্র। এটা বুঝি গবচন্দ্রের বুদ্ধি?

পটল। মহারাজ নিজেই তাঁর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে হুকুম দিয়েছেন।

রাজজামাতা মস্তককণ্ডুয়নপূর্ব্বক বলিলেন—সে কথা জান্‌লে আমি এখানে আর একদিনও থাকতুম না। আপাততঃ তামাক্ খাওয়ার কি হবে?

পুটল। তামাকের পাঠ উঠে গিয়েছে। মহারাজ, নিজেই এখন সিগারেট্ খান। চাকরদের কষ্ট দেন না, তারা প্রসাদ পায় মাত্র।

বীরেন্দ্র। এটা খুব চমৎকার প্রথা সন্দেহ নাই। যা'হোক মহাশয় যদি তামাক্ ও টিকের সন্ধানটা অনুগ্রহ ক'রে আমাকে দেন, তবে একবার সেজে নিয়ে খাই।

পটল। তাতে আমার কোন আপত্তি নেই।

ইহা বলিয়া পটলচন্দ্র রাজজামাতাকে তামাক্ আনিয়া দিল। বীরেন্দ্রসিংহ চেষ্টা করিয়া দেখিলেন যে, তামাক সাজা বিশেষ কৌশলের কর্ম্ম নয়; সুতরাং অনায়াসে মনের সাধে প্রকাণ্ড এক 'দলা' তামাক সাজিয়া হুক্কার জল ফিরাইয়া লইলেন, এবং প্রাণপণে কসিয়া টান দিলেন। তাঁহার মস্তিষ্কের জড়তা দূর হইয়া দিব্য দৃষ্টির আবির্ভাব হইল।

সেই দিব্য দৃষ্টির প্রভাবে বীরেন্দ্র কিশোর দেখিতে পাইলেন যে, সময়ের পরিবর্ত্তন স্বাভাবিক। এবং সময়ের সহিত প্রথারও পরিবর্ত্তন হয়। পরিবর্ত্তন হয় বলিয়াই সময়, 'সময়' নামক অদ্ভুত পদার্থ আছে বলিয়াই পরিবর্ত্তন। সেই দার্শনিক তথ্যের আরও নিকটে উপস্থিত হইয়া তিনি বলিলেন—

"দেখ, পটলবাবু! এই স্বাধীনতা বজায় রাখতে গিয়ে মারামারি দাঙ্গা-হাঙ্গামা হবে না ত?'

পটল। মহারাজের হুকুম যে, কেউ ফৌজদারি কর্ত্তে পাবে না। ফৌজদারী হলে উভয় পক্ষেরই শাস্তি। অর্থাৎ যে মেরেছে তার শাস্তি, এবং যে মার খেয়েছে, তারও শাস্তি। উভয়েই কারাগারে বদ্ধ হবে, এবং পরস্পরের মানের হানি হয়েছে বলে পরস্পরের পা টিপে দেবে। একজন বলবে 'মশায়! বড়ই অন্যায় কাজ হয়ে পড়েছে, হঠাৎ রাগের মাথায় এক ঘা মেরে দিইছি, এতে আপনার মানের লাঘব হয়েছে।' আর একজন বলবে 'সে কি ম'শায়? যা হবার তা হয়ে গিয়েছে। আপনার হাতে দু ঘা খেয়ে আমার মান বেড়েছে বই আর কমে নাই। এই রকম সদালাপ ক'রে উভয়ে উভয়ের মুখের দিকে চেয়ে ভেউ ভেউ ক'রে কাঁদবে, এবং কারারক্ষক গিয়ে রাজদরবারে জানাবে, এবং মন্ত্রী মহাশয় সেটা টুকে নিয়ে বলবেন—'উভয়েই—খালাস'।

বীরেন্দ্রকিশোর। বিধানটা মন্দ নয়। ম'শায়ের এতে মত কি?

পটল। আমার মতে জাত্যভিমান ও পদাভিমানটা তুলে দেওয়াই ভাল। আমি জগার মাকে (পটলের সহধর্ম্মিণী) অনেক কষ্ট দিয়েছি, তাইতে সে ঘর ছেড়ে বাপের বাড়ী পালিয়ে তিন বৎসর অজ্ঞাতবাসে ছিল। জগা সন্ধান পেয়ে একদিন কেঁদে আছাড় খেয়ে পড়ল। 'আমি বলি 'কি রে জগা'? সে বলে 'মা বেঁচে আছে গো বাবা'। তাই শেষে অন্বেষণ ক'রে তাকে টেনে বা'র করি। যা দেখলেম, তাতে বুক বিদীর্ণ হয়ে গেল।

বীরেন্দ্র। কি দেখ্‌লে?

পটল। তার মানের হানি হয়ে কেবল হাড় ক'খানাই ছিল। যেমন তার পায় ধরা, অমনি সে পূর্ণ জীবিত হয়ে পড়া। মানুষের মানটুকুই সব। 'উষ'-টুকু কিছুই নয়।

রাজজামাতা পটলের বক্তৃতা শুনিয়া বড় খুসী হইলেন, এবং হুক্কা হইতে কলিকা তুলিয়া পটলের হস্তে দিয়া বলিলেন—'এই তামাকটা মজেছে, আপনি একটা টান দিন।'

পটল অষ্টাঙ্গুলিসংযোগে উভয় করাভ্যন্তরে কলিকা লইয়া টান দিল, এবং ধূম্র-পান করিয়া কহিল—'বল্‌তে কি আমার চেয়ে আপনিই তামাক ভাল সাজেন'।

* * * *

রাজকুমারী চন্দ্রমল্লিকা সূর্য্যাস্তের সময় অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া সখীগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন—'আপনারা গিয়ে সব তৈয়ারী হয়ে থাকুন, আজ আমি আপনাদের কাব্যরসের পদ্ধতি বেশ ক'রে বুঝিয়ে দেব'।

রাজকুমারীকে দেখিয়া রাজজামাতা কুচিতভাবে একপার্শ্বে দাঁড়াইলেন। ভাবটা এই 'দেহ মনপ্রাণ সবই দিয়াছি, কেবল আত্মাটুকু লইয়া এইবার সরিয়া পড়িলে হয়'।

চন্দ্রমল্লিকা সে ভাব বুঝিয়া স্বামীর কর ধারণ পূর্ব্বক একপার্শ্বে লইয়া উপ-বেশন করিলেন। উভয়ে অনেকক্ষণ নীরব হইয়া থাকিলেন।

চন্দ্রমল্লিকা। বোধ হয় আপনি একটু ভয় পেয়েছেন?

বীরেন্দ্র। খানিকটা বটে, তবে আপনার ভাবে বোঝা যাচ্ছে, শীঘ্রই অভয় প্রদান করবেন।

চন্দ্রমল্লিকা। (হাসিয়া) ভয়ের কোন কারণ নেই। আজ আপনাকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের সভায় যাব, আপনি একটু সাজগোজ ক'রে নিন্‌।

বীরেন্দ্র। (সভয়ে) স্ত্রীলোকের সভায় পুরুষ!

চন্দ্রমল্লিকা। আজ সেইটার বিচার হবে। পুরুষের মধ্যে কেবল আপনি থাক্‌বেন। আপনি জামাইমানুষ ব'লে কাহারও লজ্জা করার কথা নাই।

বীরেন্দ্র। সভার বিষয়টা কি ?

চন্দ্রমল্লিকা। কাব্যরচনার নূতন পদ্ধতি। আপনি একজন সুকবি, সেই জন্যই আপনার কথা শুন্‌তে সকলে ব্যস্ত।

বীরেন্দ্রকিশোর দ্বিরুক্তি না করিয়া বলিলেন—'আপনার যাহা ইচ্ছা'।

রাজবাটীর উদ্যানেই সেই সভা। প্রকাণ্ড সতরঞ্চি পাতিয়া রাজ্যের সুন্দরীকুল উপবিষ্টা। বীরেন্দ্রকিশোর মস্তকে প্রকাণ্ড পাগ বাঁধিয়া উপস্থিত হওয়াতে সকলে তাঁহাকে যত্নপূর্ব্বক অভ্যর্থনা করিল। একজন বৈষ্ণবী প্রকাণ্ড আলবোলায় তামাক্ সাজিয়া রাজজামাতাকে বলিল—'আপনি ইহা সেবন করিয়া সভাপতির আসন গ্রহণ করুন।'

বীরেন্দ্রকিশোর এই সম্মানসূচক ব্যবহারে সাতিশয় প্রীত হইয়া একটা বকুল গাছের তলে গিয়া সানন্দমনে তামাকু সেবন করিলেন, এবং পুনরায় সভামণ্ডপে আসিয়া উপবিষ্ট হইলেন।

তখন চন্দ্রমল্লিকা উঠিয়া বলিলেন, এই আমাদের প্রথম সভা। সম্প্রতি রাজ্যে যে অনুজ্ঞা প্রচার হইয়াছে, তাহা শিরোধার্য্য করিয়া, আমরা গহনাপত্র প্রায় সকলই বেচিয়া ফেলিয়াছি, এবং তাহার পরিবর্ত্তে অনেক পুঁথি কিনিয়াছি। সেই পুঁথির মধ্যে তিনটী কথা আমরা সচরাচর দেখিতে পাই। অর্থাৎ স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রীস্বাধীনতা ও স্ত্রীসৌন্দর্য্য। স্ত্রীশিক্ষা আমরা পূর্ব্বেই খানিকটা বিস্তার করিয়াছিলাম। স্বাধীনতাও আমরা পাইয়াছি। কিন্তু সৌন্দর্য্যসম্বন্ধে পুরুষেরা, কাব্যে উপন্যাসে, আমাদের অত্যন্ত প্রশ্রয় দিয়াছেন। তজ্জন্য আমরা নিতান্ত লজ্জিত। অকারণে আমাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলির সৌন্দর্য্য প্রতিপন্ন করিবার জন্য এতদূর বর্ণনাধিক্য হইয়া পড়িয়াছে যে, আমাদের সমাজে আর মুখ দেখাইবার যো নাই। জীব স্বভাবতঃ আত্মপ্রশংসা ভাল বাসেন, এবং সেই প্রশংসা যদি অন্যজাতীয় জীবের মুখ কিম্বা লেখনী হইতে বহির্গত হয়, তবে সেটা শ্লেষোক্তি বলিয়া মনে হয়, এবং নানাবিধ সন্দেহ আসিয়া উপস্থিত হয়।

এই সৌন্দর্য্যবর্ণনার অবৈধ আধিক্য দেখিয়া বহুপূর্ব্বে আমাদিগের নিজেরই সম্মতিক্রমে অবরোধ প্রথার সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য পুরাকালিক এবং আধুনিক কাব্যসমূহ ক্রমে আমাদিগের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ লইয়া এতই আলোচনা করিতেছে যে, কাব্যকলা পদ্ধতি, এমন কি চিত্রকলাপদ্ধতি,

সম্পূর্ণরূপে বদলাইয়া না দিলে আমরা ক্রমে বিরক্তির আধিক্যে জীর্ণ শীর্ণ হইয়া পড়িব। অবয়বের উপর এবম্বিধ দৃষ্টি আমরা শনির দৃষ্টির ন্যায় বিবেচনা করি।

অতএব আমার প্রস্তাবনা ইহাই যে, কাব্যে উপন্যাসে ও চিত্রে অঙ্গসৌন্দর্য্যের বর্ণনাটা একেবারে উঠিয়া যাউক, নচেৎ আমরা পয়সা নষ্ট করিয়া ভবিষ্যতে ওগুলি গৃহে সঞ্চয় করিব না।

এই প্রস্তাবের অনুমোদন করিয়া অনেক সুন্দরী বক্তৃতা করিলেন। তবে কেহ বলিলেন যে, নাসিকা ও চক্ষু পর্য্যন্ত বর্ণিত হইতে পারে, কাহারও মতে কর্ণ, ওষ্ঠ, কাহারও মতে কেবল ভ্রূ ও কেশ।

অনেক তর্কবিতর্কের পর, সভাপতির মত জানিবার জন্য সকলে ব্যগ্র হইলেন।

সভাপতি বীরেন্দ্রকিশোর বলিলেন, 'আমার এ সম্বন্ধে মত প্রকাশ করা কতদূর সঙ্গত, তাহা আপনারাই বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। তবে সৌন্দর্য্য বর্ণনাতে আপনাদের যদি এতই আপত্তি থাকে, তবে তাহার বিহিত উপায় আছে। আমি স্বীকার করি যে, পুরুষজাতি এ বিষয়ে অতিশয় স্বাধীনতা দেখাইয়াছেন। ইহার প্রতিশোধ লইয়া আপনারাও সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেখাইতে পারেন। অর্থাৎ তাহাদিগের মুণ্ডিত গোঁফ ও দাড়ি ও কর্ত্তিত কেশের সৌন্দর্য্য যদি আপনারাও কাব্যে ও চিত্রে বর্ণনা করিতে সুরু করেন, তবে কালক্রমে তাহারা যে রণে ভঙ্গ দিয়া সরিয়া পড়িবে, তাহার খুব সম্ভাবনা। বোধ হয় আপনাদের মুখে তাহাদের অঙ্গ-সৌষ্ঠবের প্রশংসা বিদিত হইবার জন্যই পুরাতন কাব্যপ্রথা। আপাততঃ যে রকম দেখিতে পাইতেছি, এ রাজ্যে পুরুষবর্গের একটা সাধারণ সুচেহারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এবং তাহা হাড়ি মুচি হইতে আরম্ভ করিয়া রাজ-সভার সভাসদ্ পর্য্যন্ত সকলেই অনুকরণ করিতেছে। অতএব আমার প্রস্তাব যে, সকলে সেইদিকে চাহিয়া অহোরাত্র চীৎকার করিয়া হাসুন।'

সকলের দ্বারা এই প্রস্তাব অনুমোদিত হওয়াতে তাহা মন্তব্য স্বরূপ গৃহীত হইল, এবং বিরাট হাস্যধ্বনিপূর্ব্বক সভাভঙ্গ হইল।

রাজা হবচন্দ্র তাহারই কিছুদিন পরে রাজধানী দর্শন করিতে বাহির হইলেন। সঙ্গে গবচন্দ্র মন্ত্রী।

রাজধানীর শ্রী ফিরিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বের সে গ্রাম্যভাব আর নাই। গ্রাম হইতে দলে দলে যত ছোট ও বড় লোক রাজধানীতে আসিয়া বসতি করিয়াছে, এবং গো-শকট আরোহণ করিয়া আবালবৃদ্ধবনিতার সমাগম তখনও

চলিতেছে। বড় বড় রাজপথের দুই পার্শ্বে সারি সারি দোকান। তাহাতে এত মনোহারী দ্রব্য সাজান—সে রকম দ্রব্য রাজা কিংবা তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ স্বপ্নেও কখন দেখিয়াছিলেন বোধ হয় না। রাজা তাঁহার নয়নদ্বয় প্রাণ-পণে বিস্ফারিত করিয়া দেখিতে লাগিলেন।

হবচন্দ্র। যত বাড়ী দেখ্‌ছি সবই দোকানের মত। যত লোকের জনতা, কেবল এই দোকানে। এরা থাকে কোথা ?

গবচন্দ্র। ওরি মধ্যে কোন স্থানে থাকে। তবে সেটা তদন্ত না ক'র্‌লে জানা যাবে না।

হবচন্দ্র। একটি দোকানে গিয়া দেখিলেন যে, রাশীকৃত জিনিষ। ছবি, বহি, তোরঙ্গ, আর্শি, সুগন্ধি, তাস, সাবান, সিগারেট, প্যাকেট, টুপি, ঘড়ি,—এই প্রকার অনেক দ্রব্য স্তূপাকার। তিনি দোকানদারকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'মহাশয়ের রাত্রিকালে কি এই দোকানেই থাকা হয়' ?

শ্রেষ্ঠী। তার কোন ঠিকানা নাই। গোটা কতক সরাই ও হোটেল আছে, তাহাতেই কোনপ্রকারে শেষ রাত্রি কাটান' যায়।

হবচন্দ্র। সহরের মধ্যে দোকান ও বসতবাটীর কোন তফাৎ দেখ্‌ছিনে।

শ্রেষ্ঠী। বড়দোকানের জিনিষ কিনে নিয়ে সকলে বসতবাটীগুলি ছোট ছোট দোকানের মত সাজায়। সেগুলো তাদের আত্মীয় বান্ধব এসে দেখে, আবার তাদের বাড়ী তারা সেই রকম ক'রে সাজায়। ফলে সকলিই দোকানের মত দাঁড়িয়েছে। রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর আমোদ আহ্লাদ ক'রে, যার যেখানে খুসি শুয়ে থাকে।

হবচন্দ্র (মন্ত্রীর প্রতি)। এদের স্ত্রীলোক রান্না করে কোথায় ?

গবচন্দ্র। সেরকম রান্নাবান্নার প্রথা আমি তুলে দিইছি। সম্প্রতি এক রকম পাতা এদেশে এসেছে, তার নাম চা'। তাই খেয়েই সকলে আঠার' ঘণ্টা কাটিয়ে দেয়। যদি ক্ষুধার উদ্রেক হয়, তবে হোটেলে গিয়ে কিঞ্চিৎ অন্ন ব্যঞ্জন মুখে দেয়। রাজবাটীতে বোধ হয় চা'র সরঞ্জাম এখনও যায় নি ?

হবচন্দ্র। না।

মন্ত্রী—গবচন্দ্র রাজার জন্য একসেট চা'র বাসন ও সরঞ্জাম কিনিয়া বলিলেন—'এটা অদ্ভুত জিনিষ। ভবিষ্যতে ইহাই দেশের আসল খাদ্য হবে।"

শ্রেষ্ঠী। অনেকগুলো চা'র হোটেলও হয়েছে। যদি ইচ্ছা হয়, সেখানে গিয়ে এক পেয়ালা খেতে পারেন।

রাজাকে লইয়া গবচন্দ্র একটা বিখ্যাত হোটেলে উপস্থিত হইলেন। সেখানে নানাজাতি একত্রে বসিয়া, কসিয়া সিগারেট টানিতেছিল ও মধ্যে এক এক পেয়ালা চা খাইতেছিল। হবচন্দ্র ও গবচন্দ্র তাহাদিগের মধ্যে উপবেশন করিলেন।

হবচন্দ্র। এটা কি ব্রাহ্মণের হোটেল ?

সকলের চক্ষু অতি বিস্তৃত হইয়া পড়িল। এক জন 'মহাশয়ের নিবাস ?' এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। আর একজন তাহার মুখে 'সোডা-ওয়াটার' দিয়া আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা করিল। কতিপয় স্ত্রীলোক আসিয়া বলিল—মাগো ! এরা কোথাকার লোক গো ? গো-ব্রাহ্মণের নাম করে দেখ্‌ছি ! ইহা বলিয়া রাজার মুণ্ডিত মস্তক ও মন্ত্রীর দীর্ঘ দাড়ি দেখিয়া ভয়ানক হাস্য করিতে লাগিল।

একজন বলিল—'মহাশয় কি জাতিমারার হোটেলের নাম শুনেন নাই' ?

হবচন্দ্র। শুনেছিলেম বটে, তবে সেটা দেখি নাই। আপনারা জাতি মারেন কি ক'রে ?

দোকানদার। বাস্তবিক পক্ষে বিচার করলে চা'তে জাতি যায় না। বরং সতেজ হয়ে উঠে। তাই সকলে মিলে একত্র হয়ে চা খায়। আপনি পাড়াগেঁয়ে লোক, তাই এর মর্ম্ম এখন বুঝেন নি। আপনার চাস বাস কিছু আছে ?

রাজা। সামান্যমাত্র।

দোকানদার। সেটা বেচেফেলে সহরে চা ও সিগারেটের দোকান খুলুন। অনেক গর্দ্দভ আছে যে, সেই জমি কিনে দু'দিন চাষ ক'রে কুপোকাৎ হবে। তারাও শেষে সহরে এসে পড়বে। যারা একসের চাল একবেলা সাবাড় করে, তারাও স্বীকার করে যে, চা ও সিগারেট ধর্‌লে আর ভাতের দরকার হয় না। ভাতেই আমাদের বলবীর্য্য মেরে দিয়েছে।

গবচন্দ্র। তবে একপেয়ালা দেও।

মন্ত্রীমহাশয় চা পান করিয়া কহিলেন—'অতি উৎকৃষ্ট' সন্দেহ নাই। হবচন্দ্রও মন্ত্রীর পথ অনুসরণ করিয়া বলিলেন—'অতি উৎকৃষ্ট'। এবং উভয়ে চা'র বাসনগুলি ও চা'র প্যাকেট মস্তকে করিয়া ধীরে ধীরে রাজবাটীর দিকে চলিয়া গেলেন।

সেই অবধি রাজা হবচন্দ্র ত্রিতলে চা' খাইতেন। মন্ত্রী মহাশয় জল গরম করিয়া দিতেন এবং রাজ্ঞী দুগ্ধ ও শর্করা মিশাইয়া অতি উপাদেয় চা তৈয়ারী করিতেন।

প্রাতঃকালে চা' খাইবার সময় রাজকার্য্যের আলোচনা হইত। রাজ্ঞী রাজ্যভার গ্রহণ করিবার পর ,রাজার কোন জঞ্জাল ছিল না। একদিন তিন পেয়ালা চা নিঃশেষ করিয়া রাজা সানন্দমনে জিজ্ঞাসা করিলেন—'রাজকার্য্য বেশ চল্‌ছে ত ?''

রাজ্ঞী। বেশ সুচারুরূপেই চল্‌ছে।

হবচন্দ্র। রাজকোষাগারে এখন অর্থ কত ?

গবচন্দ্র। আপাততঃ অর্থের কোন দরকার দেখা যায় না।

হবচন্দ্র। সে কি ?

গবচন্দ্র। রাজপরিবারের দিন চল্‌বার মত অন্নবস্ত্রের যোগাড় আছে।

হবচন্দ্র। কিন্তু রাজকর্ম্মচারী, সৈন্য, সামন্ত, গজবাজী ?

গবচন্দ্র। প্রজারা মামলা মোকদ্দমা বন্ধ করে দিয়েছে, সেইজন্য ধর্ম্মাধিকরণের দরকার নেই। রাজকোষ শূন্য, সুতরাং কোষাধ্যক্ষের দরকার নেই। যখন রাজকোষ অর্থশূন্য, তখন রাজ্য আক্রমণের ভয়ও নাই। সৈন্য সামন্তগুলোকে আমরা বরখাস্ত করে দিইছি। গজবাজী অরণ্যে চ'রে বেড়ায়। এরকম অবস্থা হলে ভগবান্‌ই রক্ষা করে থাকেন ; সুতরাং প্রহরী, রক্ষক, দ্বারপাল, নগরপাল প্রভৃতি যতপ্রকার পাল, সব সরে পড়েছে। আমরা প্রজাদের নিকট আর কোন কর গ্রহণ করিনে। কারাগারের বন্দীগুলো বসে খেত, তাদেরও ছেড়ে দিইছি।

হবচন্দ্র। তারা এখন করে কি ?

গবচন্দ্র। দোকান করে।

হবচন্দ্র চক্ষু মুদ্রিত করিয়া রাজ্যের সেই অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন হৃদয়ঙ্গম করিলেন, এবং অবশেষে বলিলেন—'এখন আমাদের রাজ্যে থাকাটা কি নিতান্ত দরকার ?''

রাজ্ঞী। মোটেই না। বরং চন্দ্রমল্লিকার হাতে রাজ্যটা দিয়ে আমাদের বনে গিয়ে বানপ্রস্থ অবলম্বন কর্‌লে হয়।

এই প্রস্তাবনায় রাজা ও মন্ত্রী উভয়েই অনুমোদন করিলেন এবং রাজা হবচন্দ্র তাঁহার জামাতা বীরেন্দ্রকিশোর সিংহকে ডাকাইয়া বলিলেন "বাবা! রাজ্যের যে রকম সমৃদ্ধি, এবং প্রজাগণ যে রকম সুখী, ও স্বাধীন, তাহাতে রাজা ও মন্ত্রী প্রভৃতির মত পূর্ব্বকালের জাবের থাক্‌বার কোন দরকার দেখ্‌ছিনে।

বীরেন্দ্রকিশোর। মহারাজের আজ্ঞা শিরোধার্য্য। এখন যে রকম উন্নতি হয়েছে, তাতে সকলে বল্‌ছে যে, 'ইয়ারকি' মার্‌লেই রাজ্য চলে যাবে।

গর্ব্বচন্দ্র। তবে এখনও একজনের থেকে সাহস দেওয়া উচিত। বাড়ীর ছেলেগুলো যখন খুব বকাটে হয়ে পড়ে, তখন কর্ত্তা চলে গেলে প্রথমতঃ একটু ভয় পায়। সেই সময় অন্ততঃ কর্ত্তার জামাতা থাক্‌লেও তাদের একটু ভরসা হয়।

বীরেন্দ্রকিশোর সেই সম্বন্ধে একবার চন্দ্রমল্লিকার সহিত পরামর্শ করিলেন। চন্দ্রমল্লিকা বলিলেন, 'আপাততঃ আপত্তি নাই, তবে কাব্যকলা ও চিত্র নিয়ে এরা কতদিন কাটাবে তা বুঝ্‌তে পার্‌ছিনে।'

রাজা এই প্রকারে রাজ্যভার জামাতা ও কন্যার করে অর্পিত করিয়া মন্ত্রী ও রাজ্ঞী সহ বনে গমন করিলেন।

এদিকে রাজ্যের অধিবাসিগণ অতিশয় সুখে থাকিয়া ক্রমে বিরক্ত হইয়া পড়িল। যাহারা গ্রামে ছিল, তাহারা আর সহর হইতে প্রত্যাবর্ত্তন না করিয়া সেখানেই জীবনের নূতন অভিনয় সুরু করিল। ক্রমে নূতন দলে ও পুরাতন দলে বিবাদ আরম্ভ হইল।

দাঙ্গা ও মানহানি যাহাতে না হয়, তাহার জন্য সকলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিল; সুতরাং দাঙ্গা না করিয়া অনেকে লুটপাট আরম্ভ করিল। তাহাতে অনেকে বিরক্ত হইয়া সহর ছাড়িয়া পলাইয়া গেল, কিন্তু গ্রামে গিয়া দেখিল—সেখানে খাদ্যাভাব এবং জ্বরের প্রাদুর্ভাব, সুতরাং তাহারা সহরে আসিয়া চুরি ও প্রবঞ্চনা আরম্ভ করিল।

এই সকল লোকের মতিগতি দেখিয়া স্ত্রীলোকগণ একদিকে সরিয়া পড়িল। তাহাতে পুরুষগণের কোন আপত্তি ছিল না, কারণ তাহাদের গহনাপত্র কিছুই ছিল না। পুরুষগণ একদিকে ও অন্যপক্ষ একদিকে বক্তৃতা ও কাব্য দ্বারা পরস্পরকে আক্রমণ করিয়া কিছুদিন জীবন সংগ্রাম সতেজে চালাইয়াছিল, কিন্তু দুই বৎসর পরে খাদ্যের অভাব এত হইয়া পড়িল যে, সকলে পরস্পরের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত ও হাস্য ছাড়া আর কোন গতি ছিল না। সকলেই অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছিল; সুতরাং জমি পতিত হইয়া গেল। চা'র আমদানী বন্ধ হইয়া গেল। বাকি গৃহে যাহা রহিল, তাহা—পুঁথি।

সুতরাং সেই পুঁথি বগলে করিয়া সকলে স্থির করিল যে, বনে গিয়া ভূতপূর্ব্ব রাজা ও তস্য মন্ত্রীর পরামর্শ গ্রহণ করাই প্রশস্ত পথ।

চন্দ্রমল্লিকা পিতৃদেবকে সংবাদ দিলেন যে, রাজ্যের সমস্তই মঙ্গল। শিক্ষার ও সভ্যতার বিস্তার অদ্ভুত রকম হইয়াছে। কেবল যা কষ্ট—অন্ন বস্ত্রের। এ সম্বন্ধে প্রজাগণকে তিনি বনে গিয়া পিতার পরামর্শ গ্রহণ করিবার জন্য আদেশ দিয়াছেন। স্ত্রীলোকেরা এখন যাইবে না। কেবল পুরুষবর্গের একটা দল যাইতেছে।

এই পুরুষবর্গের দল—সকল দলের এক একজন প্রতিনিধি। তাহারা রাজকন্যার পত্র লইয়া বনে উপস্থিত হইল, ও বহুকষ্টে রাজা হবচন্দ্রের কুটীর আবিষ্কার করিল।

রাজা হবচন্দ্রের মস্তক ইদানীং ক্ষৌরকারের অভাবে প্রতিনিয়ত মুণ্ডিত না হওয়াতে, পুরাতন পক্ক কেশগুলি আবার স্বাধীনভাবে বাহির হইতেছিল। সেগুলিকে মহুলের তৈল দ্বারা রাজ্ঞী সযত্নে রক্ষা করিতেছিলেন।

লোক সমাগম দেখিয়া রাজা সত্রাসে বলিলেন তোমরা মন্ত্রীকে ডাকিয়া আন, ততক্ষণ তোমাদের আবেদন পত্র আমি পাঠ করিয়া চিন্তা করি।

মন্ত্রী গবচন্দ্র বনের যে অংশে বাস করিতেন, তাহা কেবল পশুপক্ষীতে পরিপূর্ণ এবং পাছে তাহারা কামড়াইয়া দেয়, সেই ভয়ে তিনি একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষের উপর কাষ্ঠময় কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া, রাজা হবচন্দ্র-রচিত 'নব্যরাজ্য শাসন-প্রণালী' নামক গ্রন্থের টীকা প্রণয়ন করিতেছিলেন।

প্রতিনিধিগণ কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া মন্ত্রী রাজসন্নিধানে গমন করিলেন। এবং উভয়ে অনেকক্ষণ পরামর্শ করিবার পর গবচন্দ্র সমাগত ভদ্রলোকদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন—

"আপনাদের প্রধান অভাব দেখ্‌ছি খাদ্য?'

সকলে। হাঁ।

গবচন্দ্র। "এবং সে খাদ্য আপনারা পরিশ্রমপূর্ব্বক সংগ্রহ করিতে নারাজ?"

সকলে। ঠিক তাই।

গবচন্দ্র। এ অতিশয় সুন্দর কথা।—ব্রহ্মা যখন পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তখন সকল জীব জন্তুর খাদ্যোপযোগী ফলমূল, কীট পতঙ্গ প্রভৃতিও সৃষ্টি করিয়াছিলেন। মানব সেই খাদ্য পরিত্যাগ করিয়া পরিশ্রমপূর্ব্বক অন্য খাদ্যের সৃষ্টি করিতে গিয়া বিষম জঞ্জালে পড়িয়াছে। তাহা না হইলে, জগতে দুর্ভিক্ষ, মহামারী, রোগ, শোক ও পাপ পুণ্য কিছুই থাকিত না।

সকলে। তাই আমাদেরও ক্রমে বোধ হচ্ছে'। এখন উপায়?

গবচন্দ্র। খুব সোজা উপায়। জঙ্গল বাড়াইয়া দেওয়া, তথায় বাস করা, ও পশুপক্ষীর ডিম ও ফল মূল খাওয়া। যদি বিশ্বাস না হয়, তবে আমাদের অতিথি হইয়া দেখুন।

মন্ত্রীমহাশয় অতিথিগণকে যথারীতি অভ্যর্থনা করিয়া প্রায় বত্রিশ প্রকার অন্ন ব্যঞ্জন আহার করিতে দিলেন, এবং তাহা সকলে ভোজন করিয়া পরম প্রীত হইল।

তখন মন্ত্রী গবচন্দ্র আবার বলিলেন—"ডিমই মানবের আহার। অশ্ব, হস্তী, ভেড়া, গর্দ্দভ, কচ্ছপ, নানাপ্রকার পক্ষী, মৎস্য ও কীট পতঙ্গ, ইহাদের এত ডিম্ব হয়ে নষ্ট হয় যে, প্রকৃতি তজ্জন্য ক্ষুব্ধা। আমি গণনা ক'রে দেখেছি যে, ত্রিশ কোটীর অধিক ডিম্ব প্রত্যহ নষ্ট হয়, সুতরাং জীবহত্যার পাপে লিপ্ত না হ'য়ে আপনারা যদি এই ডিম্বগুলি সংগ্রহ করেন, তবে তাহারাও মরে না ও আপনা-দেরও প্রাণ বাঁচে।

"এই ডিম্বের সঙ্গে ফল মূল যোগ করিলে তাহার নাম হয় 'ডিম্বযোগ'। এ যোগটা ঋষিরা প্রচার করেন নাই। এটা সম্প্রতি আপনাদের পুণ্যশ্লোক রাজা হবচন্দ্র এই বনে আবিষ্কার ক'রে একটা পুঁথি লিখছেন, তাতে দেখিয়েছেন যে, মানবসমাজ অরণ্যের মধ্যেই ধনুর্ব্বাণ ও জাল প্রভৃতি নিয়ে সুখে কাটিয়ে যেতে পারে, এবং এখানেই তাহারা যত রকম সুন্দর বেশভূষার সৃষ্টি কর্ত্তে পারে, ও স্ত্রীলোকদের স্বাধীনতা দিতে পারে, ও ছেলেপুলেদের লেখাপড়া শেখাতে পারে। সহরের পত্তন ক'রে জঞ্জাল বাধানোই মানবের অবনতির কারণ।"

ইহাতে সকলের চক্ষু জলভারাক্রান্ত হইল, এবং সকলে বলিল—

'রাজা হবচন্দ্র ও তস্য মন্ত্রী গবচন্দ্রের জয়'।

তাহার পর মন্ত্রী সকলকে লইয়া বনপ্রদর্শন করিতে লাগিলেন, ও প্রত্যেক অধিবাসীর জন্য শতহস্ত দূরে এক একটি বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন, ও তাহারই মধ্যে প্রত্যেকে কি করিয়া প্রচুর ডিম্ব সংগ্রহ করিতে পারে, তাহার উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া দিলেন।

এইরূপে সহর হইতে পুরুষগণ বনে আসিয়া অধিবাসী হইয়াছিল, এবং সহরের পূতিগন্ধ বিকট হইয়া পড়াতে পরে স্ত্রীলোকেরাও বনের অন্তপ্রান্ত আসিয়া অধিকার করিয়াছিল।

নিধিরাম।

সাহিত্যে স্বাস্থ্যরক্ষা।

গণিকার প্রেম।

(৮)

এবার আমরা বঙ্গ-সাহিত্যে বারবনিতার প্রেমসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। 'চরিত্রহীনে'র কিরণময়ীর চরিত্র আলোচনার পরে বারবনিতার প্রেমের আলোচনাতে আমাদের আলোচনার ধারাবাহিকতা ক্ষুণ্ণ হইবে না। কারণ কিরণময়ীকে গৃহস্থ নারী ও বারনারীর মধ্যবর্ত্তী সেতু মনে করা যাইতে পারে।

বারনারীর প্রেম সাহিত্যে কতটা প্রসার লাভ করিয়াছে, সে সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ সমালোচক শ্রদ্ধাস্পদ—শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় "গণিকাতন্ত্র সাহিত্য" নামক প্রবন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার সেই প্রবন্ধটি গত শ্রাবণ, ভাদ্র ও আশ্বিনের "নারায়ণ" মাসিক পত্রিকায় বাহির হইয়াছে। তাঁহার অগাধ অধ্যায়নের ফলে তিনি এই প্রকার সাহিত্যের এক বিস্তৃত তালিকা দিয়া তাহাকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থের অন্তর্গত—পতিতা নারী কোন মহাপুরুষের সংস্রবে আসিয়া অথবা হরিভক্তি লাভ করিয়া কিরূপে উদ্ধার লাভ করিয়াছিল, তাহার ইতিহাস। যেমন হরিদাস ঠাকুরকে মজাইতে আসিয়া হীরানাম্নী এক বেশ্যার উদ্ধার হইয়াছিল। দ্বিতীয় শ্রেণীর সাহিত্যকে সাহিত্যের ওস্তাদগণ "realism in art" এই নাম দিয়াছেন। এই শ্রেণীর সাহিত্যে "বেশ্যার হাব ভাব, ছলাকলা, চতুরী, কপটতা, ভালবাসার ভাণ, নীচতা, অর্থলোভ, আমোদ-প্রমোদ, বিলাসলালসা প্রবৃত্তির,—এক কথায় বেশ্যার জঘন্য জীবন-যাত্রার চিত্র রং ফলাইয়া অঙ্কিত করা হইতেছে।" নারায়ণে প্রকাশিত "কমলের দুঃখ" গল্পে হেনা চরিত্র ইহার দৃষ্টান্তস্থল। তৃতীয় শ্রেণীর সাহিত্যে পতিতার প্রেমের প্রভাবে প্রকৃতির পরিবর্ত্তন অঙ্কিত হইয়াছে—যেমন দেব-দাসের প্রেমে পড়িয়া চন্দ্রমুখীর পরিবর্ত্তন। চতুর্থ শ্রেণীর সাহিত্যে পণ্ডিতা

নারী পতিতা হইলেও সে নারীর বিশিষ্টতা একেবারে হারায় না, মন্দ'র ভিতরেও ভাল বীজ থাকে, এক শুভ মুহূর্ত্তে অনুকূল অবস্থা পাইয়া তাহা আত্মপ্রকাশ করিয়া সেই পতিতা নারীর সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন সাধিত করে, ইহাকে romantic movement তথা unmanitarianismএর ফল বলা যাইতে পারে।

এই চারি শ্রেণীর সাহিত্যসম্বন্ধে আলোচনা করিয়া ললিত বাবু যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, মোটের উপর তাঁহার সঙ্গে আমাদের সে বিষয়ে কোন মতভেদ নাই। প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য ধর্ম্মসাহিত্যের অন্তর্গত হইয়াছে, তাহাতে বারবিলাসিনীর চিত্র মহাপুরুষের চিত্রের পাশে অতি সঙ্কুচিত হইয়া আছে। বরং "মহাপুরুষের পবিত্রতা, উদারতা, তিতিক্ষা প্রভৃতি গুণ পাপীয়সী কুলটাদিগের বিরোধিতায় (Contrast) উজ্জ্বলবর্ণে ফুটিয়া উঠে।" দ্বিতীয় শ্রেণীর সাহিত্যসম্বন্ধে সপক্ষ বিপক্ষ উভয় প্রকার যুক্তির আলোচনা করিয়া ললিত বাবু বলেন—

"জগতে যাহা কিছু আছে, তাহাই যে কাব্যের বিষয়ীভূত হইবে, এমন কোন কথা নাই; প্রকৃত কবি বিষয়নির্ব্বাচনে বিচারশক্তির প্রয়োগ করিবেন, কোন্‌টা চিত্রপটের অন্তর্ভুক্ত করিবেন, কোন্‌টা বাদ দিবেন,—কোন্‌টুকু রাখিবেন, কোন্‌টুকু ঢাকিবেন, এবিষয়ে সবিশেষ বিবেচনা করিবেন। এইখানেই খাঁটি ও ঝুটা কবির প্রভেদ। মানবশরীরের নগ্নতা অশোভন, সাহিত্যেও নগ্নবস্তুতন্ত্রতা সেইরূপ অশোভন। অবশ্য আমরা পাপের চিত্র মাত্রকেই কাব্যচিত্রশালা হইতে নির্ব্বাসিত করিবার রায় দিতেছি না। যে চিত্রদর্শনে পাপের প্রতি ঘৃণা বা আতঙ্কের উদয় হয়—সে সব চিত্র পাপের চিত্র বলিয়াই বর্জ্জনীয় নহে। বরং তাহাতে পাপের প্রতি গভীর বিতৃষ্ণার উদ্রেক করে বলিয়া তাহা উপকারী। কিন্তু যে সব চিত্রে উত্তেজক উন্মাদক উপাদান আছে, চিত্ত কলুষিত হইবার সম্ভাবনা আছে, সে সব চিত্র উদ্ঘাটন করা যুক্তিযুক্ত নহে। পরিণতবয়স্ক লোকে হয়ত এ সব চিত্র দর্শনে অবিচলিত থাকেন। কিন্তু অগঠিতচরিত্র যুবকযুবতী সকলেরই যে এরূপ সুবুদ্ধি হইবে, তাহা বলা যায় না।"

ইহার সঙ্গে আমি আর একটা কথা বলিতে চাই। পাপের চিত্রদর্শনে যেমন ঘৃণা ও আতঙ্কের উদয় হয়, তাহা আবার ক্রমাগত পাপের চিত্র দেখিতে দেখিতে পাপের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা (Familiarity) জন্মিলে থাকে না। যেমন

দেবদাস প্রথম দিন চন্দ্রমুখীর বাড়ীতে গিয়া যেরূপ ঘৃণায় মুখ ফিরাইয়াছিল, পরে সেখানে যাইতে যাইতে তাহার আর সে ঘৃণা থাকিল না—সেই চন্দ্রমুখীর বাড়ীই তাহার একটা আড্ডা হইয়া উঠিল। সুতরাং সৎ-সাহিত্য-মধ্যে-পাপের চিত্র যে কারণেই হউক উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করা সমাজের পক্ষে নিতান্ত দূষণীয়।

তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর বারবনিতাসংশ্লিষ্ট সাহিত্যসম্বন্ধেও একথা খাটে।

বেশ্যার মধ্যে সুষুপ্ত নারীত্ব বা মানবিকতা ফুটাইয়া তোলা খুব ভাল কথা সন্দেহ নাই। যে বেশ্যা সে যে চিরদিনই বেশ্যা থাকিবে, কখনও ভাল হইতে পারিবে না—তাহার কোন কথা নাই। কিন্তু একটি বেশ্যাকে ভাল করিতে গিয়া লেখক যদি সেই সঙ্গে সঙ্গে আর দশটি সতীরমণী বা সচ্চরিত্র যুবককে পাপ-পথে টানিয়া নামান, তবে তাঁহার সেই সমাজহিতৈষণা থাকিল কোথায়? দুঃখের বিষয়, এই গণিকাতন্ত্র-সাহিত্য-রচয়িতা কবিগণ সব সময়ে একথা মনে রাখেন না। এই জন্যেই তাঁহাদের রচিত এই প্রকার সাহিত্য দ্বারা সমাজের উপকার অপেক্ষা অপকারই বেশী হয়। আর বড়ই দুঃখের বিষয়, বঙ্গসাহিত্যে এই শ্রেণীর সাহিত্যের প্রসার দিন দিন বাড়িতেছে। তাহার প্রধান কারণ বেশ্যার উপকার সাধন নহে, লেখকের নবেল লেখার সাধ—তাঁহাকে নবেল লেখার জন্য প্রেমের চিত্র খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে—তাহা বেশ্যাপল্লীতেই যেন আজকাল কতকটা সুলভ হইয়া পড়িয়াছে। নারায়ণপত্রিকায় প্রথম যখন "ডালিম," "মরণে জয়," "হাসির দাম," "প্রাণপ্রতিষ্ঠা," "বিভারক" প্রভৃতি গল্প বাহির হইত, তখন মনে করিতাম—নারায়ণের পূজার জন্য দেশমান্য সম্পাদক এই সকল গোময় ও গোমূত্রের আয়োজন করিয়াছেন। তখন উহা হাসিয়া উড়াইয়া দিলাম। কিন্তু ললিতবাবু তাঁহার প্রবন্ধে এই শ্রেণীর সাহিত্যের যে প্রকাণ্ড তালিকা দিয়াছেন, তাহা দেখিয়া বাস্তবিকই ভয় হয়। ললিতবাবু প্রবন্ধশেষে নিজেই বলিয়াছেন—বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গলাসাহিত্যের এইদিকে একটা ঝোঁক (Tendency) দেখা যাইতেছে—এমন কি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত জলধর সেন প্রভৃতি চিন্তাশীল প্রবীণ ব্যক্তিগণও এই পথ ধরিয়াছেন। বলা বাহুল্য, তাঁহাদের চেলারা যে তাঁহাদের অনুগামী হইবেন, তাহা একেবারেই বিচিত্র নহে। এই জন্য এই শ্রেণীর গল্পের অত্যন্ত বাড়াবাড়ি হইতেছে। ওস্তাদগণ অবশ্য মহৎ উদ্দেশ্যেই এই সব লিখিতেছেন এবং তাঁহারা কতকটা ওজন ঠিক রাখিয়া লিখিতে পারেন—কিন্তু চেলাগণকে সামলান অত্যন্ত কঠিন। আজকাল বঙ্গ-সাহিত্য

পাপ চিত্রের প্রসারে ভারাক্রান্ত হইয়া 'ত্রাহি ত্রাহি' করিতেছে। ভগবান্ বাঙ্গালীর অতি সাধের ধন, সাধনার বস্তু বঙ্গসাহিত্যকে পাপ হইতে রক্ষা করুন।

উপসংহার।

(৯)

এখন কথা হইতেছে, বাঙ্গালা উপন্যাসে যদি বিধবার প্রেম, সধবার প্রেম, বারবনিতার প্রেম না আসিল—এক কথায় যদি সকল রকমের প্রেমচিত্রই বাঙ্গলাসাহিত্য হইতে বর্জ্জন করা হয়,—তবে বাঙ্গালার কবিগণ কোন্ উপাদান লইয়া কাব্য রচনা করিবেন? তাঁহারা কি কেবল Moral tent book রচনা করিবেন?

না—আমি তাঁহাদিগকে কেবল হিতোপদেশ রচনা করিতে বলি না। তাঁহারা বাঙ্গালীজীবনের বাস্তব চিত্র অঙ্কিত করিবেন, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালীকে মনুষ্যত্ব লাভের পথ দেখাইবেন। বাঙ্গালীজীবনের সুখ-দুঃখ, আমোদ-আহ্লাদ, অভাব-দৈন্য, অত্যাচার-অবিচার, আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্নেহ-প্রীতি প্রভৃতি তাঁহাদের কাব্যের বিষয় হইবে। বাঙ্গালীজীবনের সাধনা কি, সিদ্ধির পথ কি, সিদ্ধি কতদূরে, ইহা তাঁহারা দেখাইবেন। বাঙ্গালীজীবনের যাহা সত্য বস্তু—তাহাই তাঁহারা বাঙ্গালীর মঙ্গলের জন্য সুন্দর করিয়া দেখাইবেন। ইংরেজী Love জিনিষটা, যাহাকে আমরা প্রেম নাম দিয়া তরজমা করিয়া থাকি, তাহা বাঙ্গালীজীবনে সত্য নহে, উহা বাঙ্গালীর সমাজে ছিল না, এবং এখনও ইঙ্গ-বঙ্গসমাজ ভিন্ন বাঙ্গালীসমাজে নাই। স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে যে ভালবাসা বা স্নেহ, তাহা স্বতন্ত্র জিনিষ, তাহা এই Love নহে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালবাসা বিবাহের পূর্ব্বে জন্মে না, বিবাহের দ্বারা তাহার উৎপত্তি হয়। কিন্তু Love বা প্রেম বিবাহের পূর্ব্বেও জন্মে। Love এর মধ্যে জোয়ার ভাঁটা খেলে, ভালবাসা যেন স্তিমিতপ্রবাহা নদী, তাহা একবার জন্মিলে আর তাহার তেমন হ্রাস বৃদ্ধি নাই। Love সর্ব্বগ্রাসী—তাহা স্ত্রী বা পুরুষের হৃদয়কে "খাসদখল" করিয়া বসে, সে হৃদয়ে মাতা পিতা, ভ্রাতা ভগিনীর স্থান আর

তেমন থাকে না—যাঁহারা এই প্রেমে পড়েন অন্ততঃ তাঁহাদের সংসারে মাতা-পিতা ভ্রাতা ভগ্নীদিগের স্থান হয় না। কিন্তু ভালবাসা স্ত্রী বা পুরুষের হৃদয়কে এরূপ একচেটিয়া করিয়া রাখে না। পাশ্চত্য সমাজের প্রেমের সহিত আমাদের সমাজের স্নেহ বা ভালবাসার ইহাই মোটামুটী প্রভেদ। আবার পাশ্চাত্য সমাজে আমাদের ন্যায় স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে ভালবাসা থাকিলেও, Love নাও থাকিতে পারে। যাঁহারা Marie Correli প্রণীত "Sorrows of Satan" এবং Mrs. Henry w od প্রণীত East Lynne উপন্যাস পড়িয়াছেন, তাঁহারা আমার কথার তাৎপর্য্য সহজে বুঝিবেন। ইহাঁরা দেখাইয়াছেন—"পাশ্চাত্য" সমাজে প্রেমকে অতিমাত্র স্বাধীনতা দিতে দিতে এমন তাহার পাখা হইয়াছে, সে এখন সুদূর সূক্ষ্মতম আকাশে Ethereal rejion এ—উড়িতে আরম্ভ করিয়াছে, সে এখন আর সাধারণ ঘরকন্না-রূপ খুঁটিনাটির মধ্যে অবরুদ্ধ হইয়া নিজকে ধূলিমলিন করিতে একান্তই অনিচ্ছুক। পাশ্চাত্যসমাজে স্ত্রী এখন স্বামীর নিকট হইতে আদর অনুরাগ স্নেহ সবই পাইতেছেন, কেবল পা'ন না সেই অদ্ভুত রহস্যময় বস্তুটি অর্থাৎ Love বা প্রেম। স্ত্রীর নিকট হইতে সেই সূক্ষ্মতম পদার্থটিকে লাভ করা কদাচিৎ কাহারও ভাগ্যে ঘটে। কারণ Love বড় ethereal আকাশশরীরী, তাহা কাহাকেও ধরাছোঁয়া দেয় না—তাহা নর-নারীর ইচ্ছাধীন নহে, তাহা নর-নারীর ইচ্ছাশক্তির অধীনতা পাপ ছিন্ন করিয়া বহু উর্দ্ধে উঠিয়াছে।—It is a capricious passion and generally comes without the knowledge, against the will"—(মৎপ্রণীত "তপস্যা"—৪১ পৃষ্ঠা)। আমাদের উপন্যাসলেখকগণ আর্টের সাহায্যে এই বিলাতী প্রেমকে আমাদের সমাজে আমদানি করিতেছেন। বিলাতী আলু, বিলাতী বেগুন প্রভৃতির ন্যায় এই বিলাতী প্রেমেরও চাষ এখন আমাদের সামাজে তাঁহারা চালাইতে চান। চোখের বালির "বিনোদিনী" বড় দিদির "মাধবী," পল্লীসমাজের "রমা" নষ্ট নীড়ের "চারুলতা," ঘরে বাইরের "বিমলা," চরিত্রহীনের "কিরণময়ী" "দেলখোসের" "পার্ব্বতী" স্বামীর "সৌদামিনী" ইহার দৃষ্টান্ত স্থল। আমাদেয় সমাজে প্রচলিত স্বামি-স্ত্রীর ভালবাসার একটা ব্যভিচারী ভাব ছিল এবং এখনও আছে, যাহাকে ইতর ভাষায় বলে "পীরিত"। ইহা চিরদিনই ঘৃণার বস্তু ছিল এবং এক বৈষ্ণব সাহিত্য ভিন্ন ইহা কখনও সৎসাহিত্যে মাথা তুলিতে পারে নাই। আমাদের উপন্যাসলেখকগণ ইহাকেও প্রেম নাম দিয়া ভদ্রবেশে উচ্চাঙ্গের সাহিত্যে চালাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাহার

দৃষ্টান্তও সেই "কিরণময়ী" দেবদাসের "চন্দ্রমুখী," শ্রীকান্তের "রাজলক্ষ্মী" ও "অভয়া"। আমার বিশ্বাস, এই সকল বিলাতী প্রেম ও ব্যভিচারী প্রেমের আমদানি না করিলেও বাঙ্গালীজীবনের সুখদুঃখময় কাব্যকাহিনী রচিত হইতে পারে।

এই পৌষ মাসের "মানসী ও মর্ম্মবাণী" পত্রিকায় "বঙ্গসাহিত্যে বাস্তবতা" নামক একটী প্রবন্ধে লেখক শ্রীযুক্ত হরিচরণ চট্টোপাধ্যায় বস্তুতন্ত্র সাহিত্যের উদ্দেশ্য এইরূপ লিখিয়াছেন—

"বস্তুতন্ত্র সাহিত্যের উদ্দেশ্য বাঞ্ছিতের ও প্রকৃতের, সমাজের ও সমাজব্যাপী সভ্যতার যথাযথ চিত্রাঙ্কন, আমাদের ক্রমপরিবর্ত্তনশীল সমাজগত জীবন সংসার-প্রবাহে কোন্ দিকে ভাসিয়া যাইতেছে, সমাজে কি আদর্শ কোন্ চিন্তা, কি শক্তি, কি ভাবে কতটা ব্যাপকতার সহিত কার্য্য করিতেছে, এবং তাহাতে সমাজের স্থিতি ও বিস্তারে, পুষ্টি ও আনন্দলীলার কোন্ দিকে কি হানি হইতেছে বা হইতে পারে, আপাতমধুর দৈহিক পুষ্টি ও তুষ্টির অসঙ্গত ঔৎসুক্যের অনিবার্য্য ফল কি, অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা ব্যাকুলতায় সংযম হারাইয়া, শাসন না মানিয়া, সমাজগত সমষ্টিকে উপেক্ষা করিয়া আত্মগত সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য লইয়া সর্ব্বদা উন্মত্ত থাকিলে, সমাজ কিরূপে জরাগ্রস্ত হইয়া ধীরে ধীরে অনিবার্য্য বিশ্লেষণের দিকে অগ্রসর হয়, বর্ত্তমান যুগের ইহকালসর্ব্বস্ব কাঞ্চনসভ্যতার অপ্রতিহত প্রভাবে আমাদের পুণ্যময় প্রাচীন আদর্শগুলি কিরূপ কর্দ্দমাক্ত ও মলিন হইয়া পড়িয়াছে, এই সমস্ত সম্যক্ আলোচনা করিয়া দেশের ও দশের মনে ও প্রাণে প্রাচীন মহৎ আদর্শের জীর্ণ স্মৃতি ও বিস্মৃতপ্রায় অধিকার উদ্বোধিত করিয়া তাহাকে সুনিয়ন্ত্রিত করিবার উচ্চ উদ্দেশ্যও আন্তরিক প্রয়াসই বস্তুতন্ত্র সাহিত্যের জনয়িতা। বর্ত্তমান সমাজের ও তদন্তরে প্রবহমাণ ভাবলহরীর গতি কোন্ দিকে এবং তাহা আমাদের সমাজের স্বাস্থ্যের ও সফলতার উপযোগী কিনা—ইহা বাহ্য ও মনোজগতে নানা প্রকার নূতন পুরাতন, পরিচিত অপরিচিত ঘটনাবলীর সাহায্যে প্রাণস্পর্শিরূপে আলোচনা করিবার সাধু চেষ্টাতেই বাস্তব সাহিত্যের জন্ম। আধুনিক বিলাসপ্রপীড়িত, ইহকালসর্ব্বস্ব, প্রকৃতিপরায়ণ জীর্ণ অথচ অতৃপ্ত এই ভোগের বিক্ষিপ্ত সমাজকে সুসংস্কৃত করিয়া, সেই সুখের ও শান্তির উপেক্ষিত, উচ্চ আদর্শের পূর্ণ পরিতৃপ্ত নিবৃত্তিপরায়ণ সমাজে পরিণত করিবার পক্ষে বাস্তবিকতার উপযোগিতা একরূপ স্বতঃসিদ্ধ।"

উদ্ধৃতাংশের বহুল বাক্যাড়ম্বর ও আইনের ভাষা হইতে সার কথাটুকু

ছাঁকিয়া লইলে, আমি যাহা উপরে বলিয়াছি, মোটের উপর তাহাই দাঁড়ায়। লেখক আরও বলেন—

"বাস্তব সাহিত্যে মর্ত্ত্যবাসী নরনারীর প্রতি দিবসের স্থূলতায় বাহুল্য থাকিলেও, ইহাতে সত্যশিব সুন্দরের নির্ম্মল চিত্র না থাকিলেও ইহা সত্যের সমষ্টি এবং ইহাতে উপভোগের দ্রব্য সামগ্রী যথেষ্ট আছে। যিনি যাহাই বলুন কুরুচি বা কুনীতির প্রশ্রয় ইহার উদ্দেশ্য নয়। সাহিত্যের এই অঙ্গের একমাত্র উদ্দেশ্য পার্থিবতার দিক্ হইতে কাব্যসৌন্দর্য্যের সাহায্যে উচ্চ মানবিকতার উদ্দীপনা এবং সহজ ও সরল ভাবে মানব জীবনের একটা সুশৃঙ্খল মীমাংসা করা। প্রত্যক্ষ বোধ্য ইন্দ্রিয়সেব্য বস্তু ইহার শেষ কথা নহে।"

আমি এ স্থলে লেখকের সহিত একমত হইতে পারিতেছি না। যাঁহারা "Art for art's sake"—এই কাব্যনীতি প্রচার করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই উচ্চ মানবিকতার উদ্দীপনার জন্য অথবা মানব জীবনের একটা সুশৃঙ্খল মীমাংসার অভিপ্রায়ে বস্তুতন্ত্র কাব্য রচনা করেন না। তাঁহারা কাব্যকে অন্যান্য ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুর ন্যায় একটা ভোগ্য বস্তু ভাবেই দেখেন, এবং সেই ইন্দ্রিয় ভোগ চরিতার্থ করিবার জন্যই কাব্য রচনা করেন। কুরুচি বা কুনীতির প্রশ্রয় দেওয়া তাঁহাদের অভিপ্রায় না থাকিলেও ফলে তাহাই দাঁড়ায়, ইহা আমরা পূর্ব্বে অনেকবার কাব্যসমালোচনাতে দেখাইয়াছি। আর বস্তুতন্ত্র কাব্য যে "সত্যের সমষ্টি" লইয়া রচিত হয়, ইহাও আমি স্বীকার করি না। সমাজে যে Love বা প্রেম নাই, যাহা বিলাত হইতে আমদানি, বস্তুতন্ত্র কাব্য তাহারই কৃষিক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে, একথা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বস্তুতন্ত্র সাহিত্যের প্রলোভনময় মাদকতা হইতে পাঠক-পাঠিকাগণের আত্মরক্ষা করা কঠিন, একথা লেখক নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলেন—"কিন্তু একথা ঠিক যে, মানুষ যতদিন পৃথিবীর মানুষ, নামের ভিখারী, স্বার্থের পূজারী, কামনার দাস, সৌন্দর্য্যের উপাসক থাকিবে, মানুষ যতদিন না পূর্ণ দেবত্ব পায়, ততদিন মানুষ বিহ্বল সৌন্দর্য্যের প্রবল মাদকতার প্রভাব হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিবে না।" অথচ লেখক মানুষের এই প্রবল ইন্দ্রিয়বিহ্বলতা দূর করিবার একমাত্র ঔষধ বস্তুতন্ত্র সাহিত্যই ব্যবস্থা করিয়াছেন। তিনি বলেন—ইন্দ্রিয়াসক্ত "Natural man" কে সদুপদেশ দিলে কোন উপকার হইবে না; তাহাকে কেন্দ্রচ্যুত উল্কার মত তাহার নিজের পছন্দসই ধর্ম্মহীন অশিবের পশ্চাতে চলিতে দাও, সে যোড়শোপচারে ভোগ বিলাসের সেবা করিতে করিতে তাহার

ইন্দ্রিয়পরায়ণতার অন্ধকারে আলোকরেখা ফুটিয়া উঠিবে অর্থাৎ তাহার মোহ কাটিয়া যাইবে।

লেখকের ইন্দ্রিয়পরায়ণতা-রোগের এই চিকিৎসাটাকে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বলা যাইতে পারে "Similia Similibus curantor" অর্থাৎ "সমঃ সমং শাময়তি অথবা বিষস্য বিষমৌষধম্"। যাহার অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়লালসা আছে, তাহাকে আরও অধিক ভোগের বস্তু যোগাও—সে ভোগ করিতে করিতে আপনিই শ্রান্ত হইয়া পড়িবে—তাহার মোহ কাটিয়া যাইবে। এই ব্যবস্থা অনুসারে কোন কোন স্থলে সুফল ফলিতে পারে। কিন্তু ইহা এতদূর বিপজ্জনক যে অধিকাংশ স্থলেই ইহা প্রযুজ্য নহে। অবশ্য একটা দুষ্ট ঘোড়াকে ক্রমাগত ছুটাইতে ছুটাইতে সে অবশেষে হয়রান হইয়া পথে আসে, কিন্তু মানুষ যখন ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিতে করিতে পথে আসে, তখন তাহার জীবনের কোন পদার্থই থাকে না। এই বীরাচারী চিকিৎসার চেয়ে বরং বেদাচারী ব্যবস্থা অধিকতর ফলপ্রদ বলিয়া মনে হয়। প্রথম হইতে মানুষকে সদাচার ও সংযম শিক্ষা দিলে তাহার ইন্দ্রিয়পিপাসা বাড়িতেই পারে না। আমাদের ঋষিগণ বলিয়াছেন,—

> "নজাতু কামঃ কামনামুপভোগেন শাম্যতি।
> হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে ॥"

কামী ব্যক্তির ভোগলালসা উপভোগের দ্বারা কিছুতেই নিবৃত্ত হয় না, অগ্নিতে ঘৃতাহুতির ন্যায় তাহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। এইজন্য তাঁহারা নানা প্রকার সদাচার ও সংযমের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

লেখক আরও বলেন—"যাঁহারা আশঙ্কা করেন যে, আধ্যাত্মিকতাবিরহিত ধর্ম্মসম্পদ-শূন্য অথচ অপূর্ব্ব মধুরতাময় বস্তুতন্ত্র সাহিত্যের বহুল প্রচারের সহিত আমাদের দেশে পাশ্চাত্য দেশের পাপ তাপ আসিয়া পড়িবে, লালসা ও চাঞ্চল্যের বেগ ও ব্যভিচার বাড়িয়া উঠিবে, তাঁহাদের সেই আকুল আশঙ্কা ভিত্তিহীন ও একান্তই কাল্পনিক বলিয়া আমার মনে হয়! আমরা স্থিতিশীল প্রাচীন জাতি। আমাদের শান্তিপ্রিয় অচঞ্চল গতিহীন সমাজ বেশ আঘাতসহ, আমাদের পরিপুষ্ট ধর্ম্মসংস্কার আজও অক্ষুণ্ণ এবং ভাঙ্গন সামলাইতে বেশ নিপুণ। আমরা সাংসারিক বিকলতায় বিচলিত নহি। ব্যাস, বাল্মীকি, মনু, যাজ্ঞবল্ক্যের পুণ্য স্মৃতি যতদিন আমাদের হৃদয়ে জাগরূক থাকিবে, ততদিন

আমাদের কর্ম্মধারা, আমাদের জীবনযাত্রার প্রথা-পদ্ধতি, আমাদের সমাজ সদাচার অনেকটা নিরাপদ!"

বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, অনেকে আমাদের সমাজের যে জড়তাকে নিন্দার বিষয় মনে করেন, লেখক তাহাকেই প্রশংসার বস্তু মনে করেন। আমি কিন্তু আমাদের সমাজকে ততদূর গতিহীন বলিয়া মনে করি না এবং আমি এই লেখকের ন্যায় ততদূর Optimisticও নহি। আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি— পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রচণ্ড আঘাতে আমাদের স্থিতিশীল সমাজে অনেক দিন হইতে "ভাঙ্গন" ধরিয়াছে," সমাজের আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষার মধ্যে অত্যন্ত চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছে, সেই প্রবল স্রোতের মুখে ব্যাস, বাল্মীকি, যাজ্ঞবল্ক্যের পুণ্য-স্মৃতি কোথায় ভাসিয়া যাইতেছে, পাশ্চাত্য সমাজের লালসা-পিপাসা উদ্দীপিত হইয়া—হিন্দু জাতির মজ্জাগত সংযমের বন্ধন শিথিল করিয়া দিতেছে, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরীশ্বর শিক্ষা-পদ্ধতি godless education নব্য যুবকদিগকে কেন্দ্রভ্রষ্ট উল্কার ন্যায় লক্ষ্যভ্রষ্ট করিয়া ফেলিতেছে। ইহার পরে বাস্তব নাম-ধারী কামকলুষময় সাহিত্য যদি আর্টের পুষ্টির জন্য লালসার ইন্ধন যোগাইতে আরম্ভ করে, তবে সমাজকে কিসে রক্ষা করিবে? কেহ কেহ হয়ত ইহাকেই আমাদের সমাজের উন্নতি মনে করেন। কিন্তু আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে, বাঙ্গালী সমাজের একটা বিশিষ্টতা আছে, একটা বিশেষ লক্ষ্য আছে, একটা বিশেষ সাধনা আছে। কেবল অর্থোপার্জ্জন করিয়া ভোগবৃত্তি চরিতার্থ করা বাঙ্গালীর জীবনের চরম লক্ষ্য নহে। মানুষকে সদাচার, সংযম, তিতিক্ষার মধ্য দিয়া ঈশ্বরাভিমুখী করা, ইহাই আমাদের লক্ষ্য। আমাদের দেশের ব্যাস, বাল্মীকি, কালিদাস ভবভূতি প্রভৃতি মহাকবিগণ এই লক্ষ্য স্থির রাখিয়া লোকশিক্ষার্থে কাব্য রচনা করিয়াছেন। আমাদেরও সেই লক্ষ্য স্থির রাখিয়া সমাজের হিতার্থে, মানবজীবনের সফলতার জন্য কাব্যরচনা করা উচিত। যে সকল কবি ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতার অধিকারী হইয়া বিজাতীয় আদর্শে কাব্য রচনা করিয়া সমাজে নরনারীর মধ্যে বিসদৃশ প্রেমলালসা জাগাইয়া সতী নারীকে উদ্‌ভ্রান্ত ও বিধবার ব্রহ্মচর্য্যব্রতের ব্যাঘাত করিতেছেন, তাঁহারা কতদূর দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, একবার তাঁহাদের স্মরণ করা উচিত। সমাজ ভাঙ্গা সহজ, কিন্তু আর একটা সমাজ গড়া বড়ই কঠিন। যে প্রবল পদ্মানদী এক পাড় ভাঙ্গিতেছে, সে আবার অন্য পাড় গড়িতেছে। যাহাদের গড়িবার সাধ্য নাই, তাহারা ভাঙ্গিতে চেষ্টা করে কেন? আবার সেই নদীও এক পাড়ের যে

সৌধ-মন্দির-শোভিত নগর ভাঙ্গিতেছে, অপর পারে কি তাহাই গড়িতে পারে? কখনই না—সে যাহা গড়ে, তাহা কেবল বৃক্ষলতাশূন্য প্রান্তর—মরিচীকাময় মরুভূমির ন্যায় তাহা ধূ ধূ করিতেছে। যাঁহারা আমাদের এই সংযম-শাসিত প্রাচীন সমাজ কাব্যকলার সাহায্যে ভাঙ্গিতে চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদের এই কথা স্মরণ রাখা উচিত। অশেষ দুঃখদৈন্যপ্রপীড়িত বাঙ্গালীর জীবনে বাহিরের শত লাঞ্ছনার মধ্যে গৃহই একমাত্র জুড়াইবার স্থান। ভগবান্ আমাদিগকে সেই গৃহের সুখ-শান্তি-পবিত্রতা রক্ষার সুবুদ্ধি প্রদান করুন।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ।

শ্রীদোল-সঙ্গীত।

(আজ) দেখনা চেয়ে নয়ন ভ'রে ধরাভরা দোল।
নভের নীলে স্থলে জলে উথলে উঠে মধু বোল॥
দুলে মলয় বায়ু চলে,
তরুলতা তালে দোলে,
দোলে শাখে শুকসারি—সলিলে হিল্লোল॥
মঞ্জরী মঞ্জুল দোলে শাখি-শিরে,
ফুল্ল ফুল-কুল দোদুল সমীরে—
বিহঙ্গ-সঙ্গীতে ভৃঙ্গ-গুঞ্জিতে মাতে কুঞ্জ-কোল॥

আজি নিখিল এ ভুবন
সাজিল বৃন্দাবন,
নিধুবন মধুবন পুন হের হাঁসল,—
পুন বনমালি-মুখে মধুবেণু বাজল।
পুন হের নরনারী
আবীর-কুঙ্কুম-কেলিরসে মাতল।—
পুন রাধামাধব শ্রীদোলে দোলত,
বঞ্জুল-কুঞ্জে মঞ্জীর শিঞ্জিত—
পুন রে পরম প্রেমে প্লাবিত ধরাতল।
সফল জনম হেরি—ললিত যুগল-দোল॥

শ্রীযতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

চৈতন্য ও নিত্যানন্দ।

মহাপ্রভু চৈতন্য ও প্রভু নিত্যানন্দ স্বরূপতঃ কি—তাঁহারা প্রাগ্‌যুগের কৃষ্ণ ও বলরাম কি না—তাঁহারা শ্রীভগবানের অবতার কি না—এই সকল প্রশ্ন লইয়া আমরা তর্ক করিব না। বিশ্বেশ্বরের এই লীলা-নাট্যমঞ্চে শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইলেন কে—শ্রীনিত্যানন্দরূপে আবির্ভূত হইলেন কে—তাহা জানিবার তপোবল—সে মহানটবরের নিগূঢ় প্রেক্ষাগৃহের সজ্জামণ্ডপ দেখিবার সুকৃতি কয়জনের অদৃষ্টেই বা ঘটে! আমরা চৈতন্য ও নিত্যানন্দ এই দুই মহাপুরুষের কার্য্যকলাপ দেখিব—বিশেষ-নির্দ্দেশে তাঁহাদের নেপথ্য-তথ্য-সন্ধানে প্রবৃত্ত হইব না। শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে,—

> "ন চাস্য কশ্চিন্নিপুণেন ধাতুরবৈতি জন্তুঃ কুমনীষ ঊতীঃ।
> নামানি রূপাণি মনোবচোভিঃ সংতন্বতো নটচর্য্যামিবাজ্ঞঃ॥"

কুবুদ্ধি অজ্ঞজনে তর্কাদি কৌশলের দ্বারা সেই বিধাতার লীলা জানিতে পারে না। কারণ ভগবান্ নটের আচরণের ন্যায় বার বার অবতীর্ণ হইয়া মন ও বাক্যের দ্বারা রূপ ও নাম বিস্তার করেন।

চৈতন্য ও নিত্যানন্দের কার্য্যকলাপের আলোচনায় তাঁহাদের লৌকিক কার্য্যাদিই এ স্থলে সংক্ষেপতঃ কথিত হইবে—তাঁহাদের অলৌকিক লীলার বিষয় বিশেষতঃ উত্থাপিত হইবে না। সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবগণ ও বৈষ্ণবসাহিত্যের পাঠকগণ এই অলৌকিক লীলার কথা জানেন। আমরা লৌকিক চৈতন্য ও লৌকিক নিত্যানন্দকে—ঐতিহাসিক চৈতন্য ও ঐতিহাসিক নিত্যানন্দকে বুঝিতে চেষ্টা করিব। শ্রীচৈতন্যের ষড়্‌ভুজমূর্ত্তি ধারণ, অথবা প্রভু নিত্যানন্দকর্ত্তৃক জম্বীরবৃক্ষে কদম্বপুষ্পের বিকাশন, আমরা অসম্ভব মনে করি না। ঐতিহাসিক আলোকে এই প্রকার ঘটনা দেখিলে ইহাই বুঝা যায় যে, তাঁহারা উভয়ে অসাধ্য সাধন করিয়াছিলেন। অসাধারণশক্তিসম্পন্ন লোকে সাধারণের অসাধ্য বহু কার্য্য করিতে পারেন। যোগবল-বিশিষ্ট মহাপুরুষগণ সাধারণ জন্তুজড়বুদ্ধির অগম্য অনেক কার্য্য করিয়া থাকেন; অলৌকিক কার্য্য হইলেই যে তাহা অলীক হইবে—এমন নহে। যাঁহারা প্রকৃতপক্ষে আমাদের এই ভূলোকের

অধিবাসী নহেন, তাঁহাদের কোন কোন কার্য্য যে অ.লৌকিক হইবে, ইহা বিচিত্র বা অস্বাভাবিক নহে। আমরা সেই পরমপুরুষে বিশ্বাস করি,—যিনি এক বামনব্রাহ্মণের বেশে যজ্ঞস্থলে আসিয়া নাভি হইতে তৃতীয়পাদ প্রকাশ করিয়া ত্রিভুবন অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন—যিনি এক সময়ে স্ফটিকস্তম্ভ বিদারণ করিয়া নরসিংহমূর্ত্তিতে বাহির হইয়া দৈত্য বিনাশ করিয়াছিলেন—যিনি শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া অশ্রুতপূর্ব্ব বংশীরবে কালিন্দীর জলতরঙ্গে উজান বহাইয়াছিলেন, তিনি যদি আবার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যবেশে আসিয়া কোন ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়া থাকেন, তবে তাহাতে সন্দেহ করিবার হেতু কি আছে? চৈতন্যবেশে তিনি আসিয়াছিলেন কি না—তাহার বিচার আমরা এস্থলে করিব না—পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

শ্রীচৈতন্য কোন সময়ে যদি ষড়্ভুজরূপেই ভক্তচক্ষে প্রতীয়মান হইয়া থাকেন, তবে তাহা তাঁহার পক্ষে অতি সামান্য কথা। আমরা ইতিহাসের আলোকে দেখিতে পাই—তিনি সহস্রভুজ হইয়া সুবিশাল এই ভারতমণ্ডলে কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনাধিক কার্য্যকলাপ সংসাধিত করিয়া গিয়াছেন! সূর্য্যমণ্ডলকে আটচল্লিশ বার মাত্র প্রদক্ষিণ করিতে পৃথিবীর যে সময় লাগে, তাহার অষ্টমাংশ কালমধ্যে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য, এই সুবিস্তীর্ণ ভারতভূমির সমস্ত প্রধান প্রধান তীর্থ পদব্রজে পর্য্যটন করিয়া, তদষ্টমাংশকালার্দ্ধ সময়ে কিয়দংশন্যূন সমগ্র ভারতবর্ষে তাঁহার নববৈষ্ণব ধর্ম্ম সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া অন্তর্হিত হইয়াছেন! দুই বাহু, দুই পদ, আর এক মস্তক লইয়া কি এতাদৃশ সুবৃহৎ ব্যাপার অত অল্প সময়ে সুসম্পন্ন হইতে পারে? তবে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য কি—'সহস্রশীর্ষাঃ পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ' যিনি আছেন—তিনিই হইবেন, বা তাঁহারই কিছু হইবেন? দীপ হইতে দীপ প্রজ্বালনে জাত দীপশিখায় মূলশিখার সকল লক্ষণই বর্ত্তমান থাকে। সে যাহা হউক, শ্রীচৈতন্য যে সহস্রবাহু হইয়া কার্য্য করিয়াছিলেন—ইহা অলৌকিক নহে—ঐতিহাসিক সত্য।

প্রভু নিত্যানন্দও চৈতন্যের মত অসাধারণ শক্তির অংশাধিকারী ছিলেন। তিনিও যৌবনারম্ভের পূর্ব্বেই তীর্থপর্য্যটনে বাহির হইয়া বিংশ বৎসর যাবৎ ভারতের সকল তীর্থই সন্দর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহারও মানসিক বল চৈতন্যের মতই অমানুষিক ছিল। তিনিও মহাপ্রভুর মত বহুভুজ হইয়া কার্য্য করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ ধর্ম্মবিষয়ে চৈতন্য ও নিত্যানন্দের অসাধারণ শক্তিমত্তা দেখিয়া, তাঁহাদের উভয়কে বৈষ্ণবধর্ম্মের যেন যুগলাবতার বলিয়া ধারণা হয়। একথে

দেখা যাউক, চৈতন্য-নিত্যানন্দের কাল, পুরাণ-কথিত অবতারাদির আবির্ভাব-সময়ের সদৃশ লক্ষণযুক্ত হইয়াছিল কি না ?

অবতারের আবির্ভাবসম্বন্ধে স্বয়ং ভগবানের শ্রীমুখের উক্তি এই,—

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ-যুগে এই আর্য্য ভূমিভাগে ধর্ম্মের কি গ্লানি হইয়াছিল ? অধর্ম্ম কি কালীয়-বিষধরের মত ভীষণ ফণা তুলিয়া সমাজতল হইতে উত্থিত হইয়াছিল ? সাধুগণের পরিত্রাণ—দুষ্কৃত-দৈত্যদলের বিনাশ এবং ধর্ম্মের সংস্থাপন, সে যুগে আবশ্যক হইয়াছিল কি ? এ প্রশ্নের উত্তর ইতিহাস এইরূপ দিতেছে ;—

শ্রীচৈতন্যের ও শ্রীপাদ নিত্যানন্দের জন্মপরিগ্রহ সময়ে ভারতবর্ষে ধর্ম্মের ও সমাজের অবস্থা শোচনীয় হইয়াছিল। * ভারতবর্ষ তখন প্রধানতঃ যবনরাজার অধিকারভুক্ত। গৌড়ের অধিপতিও তখন যবন। উচ্চশ্রেণীর অনেক হিন্দু সে সময়ে এই ভিন্নধর্ম্মী রাজগণের সেবায় আপনাদের গৌরবান্বিত মনে করিতেন। এই সকল যবনরাজার ও তাঁহাদের কর্ম্মচারীদিগের প্রভাব সে সময়ে সমাজে সবিশেষ প্রবল ছিল। তৎকালে হিন্দুপ্রজাগণের উপর এই রাজপুরুষগণের নানাপ্রকার অত্যাচার হইতেছিল। অনেক হিন্দুকে স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বাধ্য হইয়া যবনধর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। এই সময়ের শেষ ভাগেই হিন্দু কুলাঙ্গার কালাপাহাড় প্রাদুর্ভূত হয়। নিত্যানন্দের দেহত্যাগের ষোল সতের বৎসর পরেই কালাপাহাড় উড়িষ্যা জয় করে। হিন্দুধর্ম্মের প্রতি—হিন্দু দেব-দেবীর প্রতি কালাপাড়ের উপদ্রব সুধীগণের সুবিদিত আছে। এই সময়েই আবার খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী পর্ত্তুগীজ্‌জাতি দাক্ষিণাত্যের উভয় উপকূলেই প্রভাব বিস্তার করিতেছিল।

চৈতন্য-নিত্যানন্দ-যুগে বৈদেশিক ধর্ম্মের এই প্রভাব ব্যতীত, আভ্যন্তরীণ বহুপ্রকার উৎপাত হিন্দুসমাজকে উৎপীড়িত করিতেছিল। তাহার মধ্যে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম ও তান্ত্রিকধর্ম্মের উপদ্রবই অতিশয় প্রবল হইয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচারক-

---

* চৈতন্যের অবস্থানকাল—খৃষ্টাব্দ ১৪৮৫-১৫৩৩
নিত্যানন্দের অবস্থান কাল— " ১৪৭৩-১৫৪২

গণ দেশের সর্ব্বত্র গমন করিয়া সহস্র সহস্র লোককে বৌদ্ধ করিতেছিলেন। বাঙ্গালাদেশের "চব্বিশ পরগণা"তেও তাঁহাদের কার্য্য অবাধে চলিতেছিল।* খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর প্রথম ভাগে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য যদিও স্বীয় অসামান্য প্রতিভা-বলে ভারতের সমস্ত বৌদ্ধমঠধারীকে বিচারে পরাজিত করিয়া,—বৌদ্ধধর্ম্ম দমিত ও দেশ হইতে বিতাড়িত করেন—তথাপি বৌদ্ধধর্ম্মের বীজ ভারতভূমি হইতে একেবারে অপহৃত হয় নাই। শঙ্করাচার্য্যের তিরোভাবের কিছুকাল পর হইতে প্রায় পাঁচশত বৎসর ধরিয়া এই বৌদ্ধবীজ শনৈঃ শনৈঃ অঙ্কুরিত হইয়া দেশে আবার বিষ-বৃক্ষের বিস্তার করিতেছিল। চৈতন্যযুগের অব্যবহিত পূর্ব্বেই বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মকে পুনঃগ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছিল।

এই সময়ে তান্ত্রিক ধর্ম্মের উৎপাতও সমাজকে দিন দিন হীন করিতেছিল। তন্ত্রের নিগূঢ়তত্ত্ব ভুলিয়া তাহার সুকঠিন সাধনমার্গ ছাড়িয়া, দুষ্টবুদ্ধি লোকে তন্ত্রের দোহাই দিয়া 'পঞ্চমকারে'র সর্ব্বপ্রকার ব্যভিচার করিতে লাগিল। নব-দ্বীপের জগাই মাধাই, তাৎকালিক তান্ত্রিক ব্যভিচারের আদর্শস্থল। † হিন্দু-সমাজ রক্ষার জন্য স্মার্ত্ত রঘুনন্দনকে এই সময়ে অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব প্রকাশ করিতে হয়। রঘুনন্দনের এই ধর্ম্মশাস্ত্রসঙ্কলনই তদানীন্তন সমাজের ধর্ম্মগ্লানির সর্ব্বপ্রধান নির্দ্দেশক বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। কথিত তিন চারি প্রকার ধর্ম্মোপ-দ্রব ব্যতীত শৈব ও জৈনাদিধর্ম্মের অত্যাচারও তৎকালে সমাজকে ক্ষুব্ধ করিতে-ছিল। ভারতভূমিতে যখন এই ষট্‌প্রকারে ধর্ম্মের গ্লানি হইতেছিল—যখন ভারতবর্ষে দুষ্কৃতগণের রৌদ্রাচারে সাধু সমাজ 'ত্রাহি ত্রাহি' করিতেছিলেন—তখন সাধুগণের পরিত্রাণের জন্য—তেমন শত শত জগাই-মাধাইকে সৎপথে আনয়ন দ্বারা তাহাদের কুৎসিত পূর্ব্বজীবনের বিনাশের জন্য, এবং লোকসমাজে ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য, শ্রীভগবানের কৃপাবিকাশের আত্যন্তিক প্রয়োজন হইয়াছিল। চৈতন্যযুগের এই ষট্‌প্রকার উৎপাতের দূরীকরণের নিমিত্ত ষড়্‌ভুজের আবশ্যক হয় নাই কি? ভারতভূমির এই বিষম ধর্ম্মগ্লানির যুগেই শ্রীচৈতন্য নবদ্বীপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। শ্রীপাদ নিত্যানন্দও এই সময়ে জন্মপরিগ্রহ করেন। হিন্দুসমাজের সেই ঘোর দুর্দ্দিনেই নিত্যানন্দ-সঙ্গ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, অপূর্ব্ব প্রেম-মাধুর্য্যময় এক নূতন বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেশ হইতে অধর্ম্ম ও অপধর্ম্মের

* মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর অভিভাষণ (সাহিত্য-সম্মিলন-১৩২০)

† প্রসিদ্ধ তান্ত্রিকাচার্য্য জগন্মোহন তর্কালঙ্কার, তাঁহার এক পুস্তিকায় জগাই-মাধাইকে তান্ত্রিকাচারী বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

অপসারণ করিয়াছিলেন। যে গৌরাঙ্গ, তাঁহার প্রিয়সখা নিত্যানন্দের সাহায্যে অভিনব প্রেমধর্ম্মের মনোহর মন্ত্রে সমাজের সহস্র সহস্র হিংস্র নরশার্দ্দূলকে মুগ্ধ করিয়া হরিনাম মত্ত করিয়াছিলেন, তিনি যে বৃন্দাবনপথে বনের ব্যাঘ্রাদি শ্বাপদকে কৃষ্ণনাম বলাইয়া শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য প্রকাশ করিবেন, ইহা অসাধারণ হইতে পারে—অসম্ভব নহে, অলৌকিক হইতে পারে—অলীক নহে। ভগবৎ-প্রেমের যাদুকরের পক্ষে পশুবশ অতি সামান্য কার্য্য। ভক্ত বালক ধ্রুব-প্রহ্লাদও তাহা পারিয়াছিল।

সে যাহা হউক, শ্রীচৈতন্যের এই ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠা, শঙ্করাচার্য্যের বিজয় অপেক্ষা কঠিনতর ও মহত্তর—গভীরতর ও দৃঢ়তর কার্য্য। শঙ্করের ধর্ম্মযুদ্ধ শুদ্ধ বৌদ্ধ-ধর্ম্মের বিরুদ্ধে ঘোষিত হইয়াছিল—শ্রীচৈতন্যের সমর, শৈব, শাক্ত, বৌদ্ধ, ম্লেচ্ছ ও তান্ত্রিক এই মহাপ্রবল ধর্ম্মপঞ্চকের প্রতিকূলে চালিত হইয়াছিল। এই অতি প্রবল পঞ্চধর্ম্মের অত্যাচার হইতে সমাজ রক্ষা করিতে চৈতন্যকে একটি নূতনধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করিতে হইয়াছিল। শঙ্করাচার্য্যের কার্য্য, দুই ভুজেই সম্পন্ন হইবার উপযোগী ছিল। তিনি এক ভুজে বৌদ্ধনিরাস ও অপরভুজে অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্যকে ষড়্ভুজ লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে নামিতে হইয়াছিল। তিনি, বৌদ্ধাদি পঞ্চধর্ম্মের বঞ্চন-বিড়ম্বনা বারণে পঞ্চ হস্ত প্রসারিত করিয়া, ষষ্ঠ করে তাঁহার অভিনব দ্বৈত-প্রেমবাদ সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। শঙ্করাচার্য্যের ধর্ম্ম, অতি দুর্বোধ্য "গুহায়াং নিহিতং" তত্ত্ব—শুদ্ধ পণ্ডিতসঙ্ঘ-সম্বদ্ধ—সাধারণজনের একেবারে অনধিগম্য। শ্রীচৈতন্যের হরিপ্রেমধর্ম্ম, শিক্ষিত, অশিক্ষিত—অধিকারী, অনধিকারী—উচ্চতন, অধস্তন—সর্ব্বপ্রকার লোকসমাজের সম্পূর্ণ উপযোগী। শঙ্করের 'সোঽহংবাদ', জটিল কঠোরনীরস তত্ত্বানুশীলনের আলোকে মানবসমাজের শীর্ষস্তরেই অঙ্কুরিত হইতে পারে। চৈতন্যের 'দাসোঽহং-বাদ,' সমাজের সর্ব্বস্তরেই—সরল সাধনার গুণে, নামপ্রেমের মধুররস সেচনে সহজেই পুষ্পিত হইয়া উঠে। তাই, সার্ব্বজনীনতায়, সহজ সাধ্যতায় ও আশুসফল-তায় চৈতন্যের প্রেমধর্ম্ম, শঙ্করাচার্য্যের "ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গম্-পথস্তৎ"-ইতি লক্ষণাক্রান্ত জ্ঞানধর্ম্ম অপেক্ষা লোকসমাজে দৃঢ়তর, গভীর ও মধুরতর। হেথায়—কঠোর, কোমলের কাছে পরাজিত—গম্ভীর, মধুরের মোহে মুগ্ধ—জ্ঞান, ভক্তির শক্তি দেখিয়া বিস্মিত। হেথায়—বেদবেদান্তের মহামহিম মহাকাশ, এবং পুরাণোপপুরাণের বিপুলবপুঃ হিমাদ্রি, শ্রীচৈতন্যের হরিপ্রেম-ধর্ম্মের অনন্ত রসসাগরতলে আপন আপন ছায়া প্রতিবিম্বিত দেখিয়া স্তম্ভিত

হইয়াছে। হেথায় নামের সহিত রূপ মিশিয়াছে—রূপের সহিত প্রেম মিশিয়াছে—প্রেমের সহিত মোক্ষ মিশিয়াছে। এমন মহামিলন—মানবমনের এমন মহারস—উপাসনার এমন সুধাময় তৃপ্তি, আর কোন মার্গে আছে কি? যে মহাপ্রেমিক এই পরমপ্রেমধর্ম্মে ভারতভূমি পরিপ্লাবিত করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রেমের অনন্তকাল জয় হউক।

অদ্বৈতে অদ্বিতীয় শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় নবদ্বীপের এই প্রেমদ্বৈপায়ন "নিমাই পণ্ডিত"ও জ্ঞানের অভ্রভেদী কাঞ্চনজঙ্ঘা-শিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন। তিনি সে উত্তুঙ্গ শৃঙ্গ হইতে দিব্যনেত্রে দেখিতে পাইলেন—দূর চক্রবালপ্রান্তে বিষ্ণুপ্রেম রসের মহাসাগর, বিশ্বরূপের রূপকিরণে ঝক্‌মক্ করিতেছে। তখন সে বেদোজ্জলবুদ্ধি ন্যায়সিদ্ধান্ত-সিদ্ধি 'নিমাই পণ্ডিতে'র নবচৈতন্য হইল। তিনি, তাঁহার সে সুমহান্ জ্ঞান-তুষার দ্রবীভূত করিয়া প্রেমভক্তির গঙ্গাযমুনা শতমুখে ছুটাইয়া, ভগবদারাধনার অভিনব ধারা সেই রসসাগরে মিশাইয়াছিলেন! জ্ঞানের নিমাই, প্রেমের চৈতন্যরূপে দেখা দিলেন! নবদ্বীপ, প্রেমদ্বীপ হইল! নীলাচল, প্রেমাচল হইল! শ্রীবৃন্দাবনে প্রেমের নূতন তরঙ্গ উঠিল! পৌরাণিক বৈষ্ণবধর্ম্ম নবরাগে সমুজ্জল হইল।

এই সময়ে শ্রীধাম নবদ্বীপ এই নববৈষ্ণবধর্ম্মের কেন্দ্র হইয়াছিল। এই প্রেমধর্ম্মপ্রচারে আচার্য্য অদ্বৈত ও শ্রীপাদ নিত্যানন্দ প্রথমতঃ শ্রীচৈতন্যের দুই হস্তস্বরূপ ছিলেন। তৎপরে শ্রীরূপসনাতনাদি "ষড়্‌গোস্বামী"কে লইয়া তিনি দশভুজ হইলেন। ক্রমে শ্রীবাস-রাঘবাদি শত শত পার্ষদ ভক্তবৃন্দসংযোগে মহাপ্রভু সহস্রভুজ হইয়া নামপ্রেমধর্ম্ম সহস্রদিকে প্রচার করিতে লাগিলেন। প্রভু নিত্যানন্দ, মহাপ্রভুর অর্দ্ধাঙ্গ হইলেন। প্রেমমোক্ষতত্ত্বদর্শী শ্রীচৈতন্য, তখন স্বয়ং নীলাচলে অধিষ্ঠান করিয়া, শ্রীপাদ নিত্যানন্দকে গৌড়দেশে জাতি-নির্ব্বিশেষে হরিনাম-দানের নিমিত্ত প্রেরণ করিলেন, এবং মোহনরূপ অবধূত নিত্যানন্দকে সংসারাশ্রমী হইতে উপদেশ দিয়া, প্রেমসন্ন্যাসের ভিত্তি প্রেমানুরাগের উপর সংস্থাপিত করিয়া, তাঁহার নববৈষ্ণবধর্ম্ম সমাজে সুদৃঢ় করিলেন। আদ্য জীবনে চৈতন্য অতি অল্পদিনের জন্য সংসারী ছিলেন—চতুর্ব্বিংশতি বর্ষ পূর্ণ হইতে না হইতেই মহাবৈরাগ্য তাঁহার হৃদয়াধিকার করিয়াছিল। নিত্যানন্দ এতাবৎ অবধূত ছিলেন—চৈতন্য তাঁহাকে সংসারী করিলেন। সংসারী সংন্যাসী—এবং সন্ন্যাসী, সংসারী হওয়াতে প্রেমধর্ম্ম পূর্ণতা লাভ করিল। বিরাগ ও অনুরাগ—ত্যাগ ও ভোগ—এই দুই বিপরীত তত্ত্বের যুগপৎ সম্মিলনে হরিপ্রেম-

মোক্ষ-লক্ষ্য নববৈষ্ণবধর্ম্মের রমণীয় পরিণতি হইল। অর্দ্ধাঙ্গ নিমাই রহিলেন—'চিৎ', অপর অর্দ্ধাঙ্গ নিতাই হইলেন—'আনন্দ'। 'নিমাই-নিতাই'এর এই চিদানন্দ-যোগই বৈষ্ণবধর্ম্মের চরম স্ফূর্ত্তি। 'চিৎ'-শক্তি কহিলেন,—নাম গাহ।' 'আনন্দ'-মূর্ত্তি আসিয়া বলিলেন—নামেই পরমানন্দ—নামানন্দে নৃত্য কর। নববৈষ্ণবধর্ম্মের জন্য চৈতন্য সৃষ্টি করিলেন—'কীর্ত্তন', নিত্যানন্দ সৃষ্টি করিলেন—'নর্ত্তন'। প্রেমিক প্রভুগণের হৃদয়োন্মাদন এই কীর্ত্তন-নর্ত্তন-প্রভাবে বিমোহিত হইয়া কোটি কোটি নরনারী তাঁহাদের চরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল।

শ্রীচৈতন্যের এই প্রেমধর্ম্ম, আদিকেন্দ্র নবদ্বীপ হইতে আরব্ধ হইয়া ভারত-তলে একটি সুবিশাল বৃত্তাভাসরূপে প্রসারিত হইয়াছিল। এই বৃত্তাভাসের দুই অধিকেন্দ্রে—নীলাচলে চৈতন্য ও গৌড়াঞ্চলে নিত্যানন্দ—সূর্য্যচন্দ্রের মত দীপ্তি পাইতেছিলেন। অদ্বৈতপ্রভু, নবদ্বীপ শান্তিপুরে চন্দ্রসূর্য্যের মধ্যমণি শুক্রতারার ন্যায় বিরাজমান ছিলেন। তাঁহাদের অসংখ্য পরিকর ও ভক্তবৃন্দ ক্রমে ক্রমে কোটি কোটি তারকারূপে ফুটিয়া উঠিয়া ভারতের ধর্ম্মাকাশ জ্যোতির্ম্ময় ও মহিমময় করিয়া তুলিয়াছিলেন। এই সুবিশাল প্রচারক্ষেত্রের পূর্ব্ব সীমায় পুরুষোত্তম তীর্থ ও মণিপুর—উত্তরে কামরূপ ও পরশুরামকুণ্ড—পশ্চিম সীমায় কাশী, মুলতান-দ্বারকা বরদা ও পূনা—দক্ষিণে সেতুবন্ধ-রামেশ্বর, কুমারিকা ও ত্রিবাঙ্কুর। এই সুবিস্তীর্ণ ভূভাগে আজও শ্রীচৈতন্য-প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত—কচিৎ কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত, কচিদ্‌ বা কিছু বিকৃত। শ্রীক্ষেত্রে আজও শ্রীচৈতন্য "জঙ্গমব্রহ্ম" নামে অভিহিত ও উপাসিত। শ্রীভগবানের মথুরা-বৃন্দাবনাদিলীলাস্থলের কত শত লুপ্ততীর্থ চৈতন্যের অনুরাগে ও উদ্যোগে পুনঃপ্রকট হইয়া তাঁহার ও তৎপার্ষদগণের মহিমা-কীর্ত্তন করিতেছে। শ্রীবৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণের উপাসনায় কীর্ত্তন-নর্ত্তনের প্রচলন, চৈতন্য-নিত্যানন্দের মুখরিত কীর্ত্তি। তথাকার "নিত্যানন্দ-বট" ও "অদ্বৈত-বট" নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত প্রভুর ধর্ম্মপ্রভাবের অক্ষয়বটস্বরূপ।

শ্রীচৈতন্য তাঁহার জীবনের শেষ অষ্টাদশ বৎসর উৎকলখণ্ডে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। উৎকলরাজ প্রতাপরুদ্র, শ্রীগৌরাঙ্গের মন্ত্রশিষ্য হইয়া তৎপ্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবধর্ম্ম স্বরাজ্যে প্রচলিত করিয়া আদর্শ গুরুদক্ষিণা দিয়াছিলেন। এই সময়েই প্রতাপরুদ্রের সভাপণ্ডিত বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক বাসুদেব সার্ব্বভৌমকে শ্রীচৈতন্য,আপনার অসাধারণ পাণ্ডিত্যে স্তম্ভিত করিয়া বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষিত করেন। সূর্য্য যেমন উদয়াচলে আরোহণ করিয়া দিগ্‌বিদিকে সহস্রকর বিস্তার করিয়া অর্দ্ধ

ভূমণ্ডল নবালোকে আলোকিত করেন, মহাপ্রভু গৌরাঙ্গও সেইরূপ নীলাচলে অধিষ্ঠিত হইয়া নানাদিকে সহস্র সহস্র পরিকর-কর প্রেরিত করিয়া প্রেমধর্ম্মের নবমধুরালোকে ভারতভূমি সমুজ্জ্বল করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যের তিরোধানও তপনাস্তেরই অনুরূপ। অস্তাকাশ প্রান্তলম্বী সুবর্ণ-গৌর ভাস্করেরই মত, শ্রীগৌরাঙ্গ পুরুষোত্তমতীর্থের সমুদ্রমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। সাগরতলে তিনি কি নিধি দেখিলেন? যাঁহার নাম প্রচারের জন্য তাঁহার জন্ম—যাঁহার প্রেম বিলাইবার জন্যই তাঁহার দেহ ধারণ, সেই অনন্তসুন্দর অনন্ত প্রেমময় ব্রজের উজ্জ্বল নীলমণিই তিনি নীলাম্বুতলে প্রত্যক্ষ করিলেন! প্রেমময়ের আহ্বানে তিনি 'শ্যামের' প্রেমসায়রে ডুব দিলেন! আর উঠিলেন না! কে উঠে? সে প্রেমসাগরে ডুবিতে পারিলে কে উঠে! দেখ দেখ সে প্রেম সমুদ্রতলে "কে কাহাকে আলিঙ্গন করিয়াছে! জ্ঞান আসিয়া ভক্তিকে ধরিয়াছে—ধর্ম্ম আসিয়া কর্ম্মকে ধরিয়াছে—বিসর্জ্জন আসিয়া প্রতিষ্ঠাকে ধরিয়াছে!"—গোলোকের নিরঞ্জন আসিয়া ভূলোকের হৃদয়রঞ্জনকে হৃদয়ে তুলিয়া লইলেন!

মহাপ্রভু গৌরাঙ্গ যখন ধরাধাম হইতে অন্তর্হিত হইলেন, তখন তাঁহার শ্রীধর্ম্ম-প্রতিনিধি প্রভু নিত্যানন্দ কোথায়? শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সে সময়ে শ্রীপাট খড়দহে বিরাজিত। তিনি মহাপ্রভুর উপদেশানুসারে গৌড়াঞ্চলের সর্ব্বত্র সর্ব্বশ্রেণীর মধ্যে প্রেমধর্ম্ম প্রচারে ব্রতী হইয়া ভাগীরথীতীরবর্ত্তী খড়দহ গ্রামকে তাঁহার কার্য্যের কেন্দ্রস্থল করিয়াছিলেন। নীলাচল হইতে গদাধর-পরমেশ্বর-রঘুনাথ প্রভৃতি প্রিয় ভক্তগণকে সঙ্গে লইয়া গৌড়ে আসিয়া তিনি সর্ব্বপ্রথমে শ্রীচৈতন্য-পদরজঃপূত শ্রীপাট পাণিহাটি গ্রামে ভক্ত রাঘব পণ্ডিতের ভবনে কয়েক মাস অবস্থানপূর্ব্বক হরিমাহাত্ম্য প্রচার করেন। এই রাঘব-ভবনেই তাঁহার অভিষেকোৎসব হয়, এবং সেই অভিষেকের সময়েই তিনি জম্বীর-বৃক্ষে কদম্বপুষ্প ফুটাইয়াছিলেন। ইহার পর তিনি অম্বিকা গ্রামের সূর্য্যদাস পণ্ডিতের সুলক্ষণযুক্তা দুই কন্যা বসুধা ও জাহ্নবীর পাণিগ্রহণ করিয়া "চব্বিশ পরগণা"র অন্তর্গত খড়দহে আসিয়া শ্রীপাট স্থাপন করিলেন। নিত্যানন্দের আগমনের পূর্ব্ব হইতেই খড়দহ ভাগীরথী তীরের একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম। তৎকালে দেশবিখ্যাত পণ্ডিতরাজ কামদেব ও তদগ্রজ যোগেশ্বর পণ্ডিত এই গ্রামে বাস করিয়া ইহাকে সমুজ্জ্বল করিয়াছিলেন।* কুলীন ব্রাহ্মণ সমাজের মেলবন্ধন-

* "যোগেশ্বরাধিকঃ কামঃ কামাৎ পরতরো নহি।"—কুলকারিকা। (প্রবন্ধলেখক, পূজ্যপাদ কামদেব হইতে ত্রয়োদশ পুরুষ অধস্তন)

কারী সুপ্রসিদ্ধ দেবীবর, এই যোগেশ্বর পণ্ডিতের মাতৃষস্রেয়। খড়দহবাসী যোগেশ্বর কামদেবকে লইয়াই দেবীবরের "খড়দহ মেল" বন্ধন হয়। খড়দহের এই প্রসিদ্ধিই নিত্যানন্দকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। খড়দহের অবস্থানও শ্রীপাট হইবার সবিশেষ উপযোগী ছিল। ইহা শ্রীধাম নবদ্বীপ ও শান্তিপুর হইতে অল্প দূরেই স্থিত। শ্রীপাট পাণিহাটি ইহার সন্নিহিত। ইহার পরপারেই প্রাচীন বৈষ্ণব তীর্থ 'মাহেশ' নামক গ্রাম। আবার, এই মাহেশ গ্রামে, নিত্যানন্দের প্রিয় পার্ষদ কমলাকর (পিপলাই) বাস করিতেন। কমলাকর, আবার উক্ত যোগেশ্বর পণ্ডিতের শ্বশুর ছিলেন। যোগেশ্বর ও বিশেষতঃ তদনুজ কামদেব, সাতিশয় আগ্রহ প্রকাশপূর্ব্বক শ্বশুর কমলাকরকে অনুরোধ করিয়া শ্রীপাদ নিত্যানন্দকে খড়দহে আনয়ন করেন। পুরন্দর, পরমেশ্বর ও চৈতন্যদাস প্রভৃতি নিত্যানন্দের প্রিয় কয়েকজন খড়দহবাসী শিষ্যও তাঁহাকে পাণিহাটি হইতে খড়দহে আনয়নের জন্য সচেষ্ট ছিলেন। প্রধানতঃ এই কয়েকটি কারণেই নিত্যানন্দ, আপনার শ্রীপাট স্থাপনের জন্য খড়দহ গ্রামটি মনোনীত করেন। নিত্যানন্দ পূর্ব্বে অবধূতদণ্ডী ছিলেন। তত্ত্বদর্শী কামদেব পণ্ডিত আপনার যজ্ঞোপবীত হইতে নিত্যানন্দকে ত্রিসূত্র দান করিয়া তাঁহাকে লৌকিক সমাজভুক্ত করিয়া খড়দহে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

সে যাহা হউক, নিত্যানন্দ যখন খড়দহে আগমন করেন, তখন তাঁহার অদ্ভুত বেশে সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহার দুই পার্শ্বে দুই নারী (বসুধা ও জাহ্নবী) বামস্কন্ধে ভিক্ষার ঝুলি—দক্ষিণহস্তে অবধূতের দণ্ড, বক্ষে তাঁহার আত্মোপাসিত ত্রিপুরাসুন্দরীযন্ত্র—গলদেশে অনন্তদেব নামক শালগ্রামশিলা—মাথায় একটি পাগড়ী—পাগড়ীর উপরি সযত্নে বাহিত এক পুঁথি! এ পুঁথিখানি কি? বৈষ্ণবগণের পরম শাস্ত্র শ্রীমদ্ভাগবত! কোন্ ভক্ত বৈষ্ণব না এই গ্রন্থ মাথায় করিয়া রাখিবে? কিন্তু প্রভু নিত্যানন্দ যে এই পুঁথি খানি মাথায় করিয়া বহিয়া আনিয়াছিলেন, তাহার আর একটি গুরুতর কারণ ছিল। এই পুঁথিখানি মহাপ্রভু চৈতন্যের স্বহস্ত-লিখিত! এ অমূল্য পুঁথি নিত্যানন্দ কোথায় পাইলেন? এ অমূল্য রত্ন তিনি বিবাহের যৌতুকস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই পুঁথিখানি তাঁহার শ্বশুরের জ্যেষ্ঠ সহোদর গৌরীদাস পণ্ডিতের নিকট ছিল। গৌরীদাস নিত্যানন্দের পার্ষদ হইয়াছিলেন। গুরুদক্ষিণাস্বরূপ এই গ্রন্থখানি নিত্যানন্দকে দানও সম্ভবপর হইতে পারে।

সে যাহা হউক, প্রভু নিত্যানন্দের দণ্ড, ভিক্ষার ঝুলি, ত্রিপুরাসুন্দরীযন্ত্র, অনন্তদেব ও এই ভাগবতখানি শ্রীপাট খড়দহের শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর দেবের মন্দিরে আজও রক্ষিত আছে। এই পবিত্র স্মৃতিচিহ্নগুলি, কত ধর্ম্মপ্রাণ নরনারী সবিশেষ আগ্রহের সহিত দেখিয়া নয়ন সার্থক করিয়াছেন। * খড়দহের এই শ্যামসুন্দর বিগ্রহ শ্রীপাদ নিত্যানন্দ কর্তৃকই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ স্থাপন না করিলে শ্রীপাটের ভাব ও শোভা সম্পূর্ণ হয় না। শ্রীপাট পাণিহাটিতে ভক্তচূড়ামণি রাঘব পণ্ডিত যেমন মদনমোহন নামক বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করেন, নিত্যানন্দও তেমনি স্বীয় শ্রীপাটে শ্যামসুন্দর মূর্ত্তির স্থাপনা করিয়াছিলেন। † এই বিগ্রহ-স্থাপন বিষয়ে তিনি গ্রামেই আদর্শ ও পরামর্শ পাইয়াছিলেন। পূর্ব্বোক্ত কামদেব পণ্ডিতই এবিষয়ে তাঁহার প্রধান পরামর্শদাতা এবং কামদেবপ্রতিষ্ঠিত খড়দহের আদি-বিষ্ণুবিগ্রহ শ্রীশ্রীরাধা-কান্তই নিত্যানন্দের সুমহান্ আদর্শ। ‡

এইরূপে শ্রীপাদ নিত্যানন্দ খড়দহ গ্রামকে একটি শ্রেষ্ঠ শ্রীপাটে পরিণত করিয়া শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের অর্দ্ধাঙ্গ-স্বরূপ প্রভু নিত্যানন্দ খড়দহে অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন বলিয়াই শ্রীপাট খড়দহ শেষে 'শ্রীধাম' মধ্যে পরিণত হয়। বস্তুতঃ খড়দহ শ্রীপাটও বটে, শ্রীধামও বটে। শ্রীধাম, শ্রীপাট অপেক্ষা মহত্তর। মহাপ্রভু ও প্রভুগণের বাসস্থানাদিই শ্রীধাম হয়, আর তাঁহাদের প্রসিদ্ধ পরিকরগণের বাসভূমিই শ্রীপাটনামে অভিহিত হয়। পশ্চিমাঞ্চলের শ্রীধাম বৃন্দাবন ব্যতীত এই গৌড়দেশে পাঁচটি শ্রীধাম আছে। এ সম্বন্ধে ভক্তপ্রধান অভিরামঠাকুরের উক্তি এই,—

পাট পরিক্রমা যে যে করিবারে হয়।
সঙ্ক্ষেপে দিঙমাত্র লিখিয়ে নিশ্চয়॥

---

* রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দাশ্রমীয় "ভগ্নী নিবেদিতা"ও খড়দহে আসিয়া এই স্মৃতিচিহ্নগুলি দেখিয়া গিয়াছেন। তল্লিখিত "Studies from an Easten Howe" নামক গ্রন্থে "An collegiate village" (খড়দহ) অভিহিত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

† এ সম্বন্ধে যে কিংবদন্তী আছে, তাহা বাহুল্যভয়ে উল্লিখিত হইল না।

‡ নিত্যানন্দ তাঁহার মস্তকের "পাগড়ী" প্রিয়শিষ্য বলরাম দাসকে ইহাঁর ভজন-পদ্ধতিতে সন্তুষ্ট হইয়া দান করিয়াছিলেন। এই পাগড়ী নদীয়া জেলার দোগাছী নামক গ্রামে বলরাম দাসের বংশধরগণের নিকট আজও আছে। বলরাম দাসের 'মেলায়' ইহা প্রতি বৎসর প্রদর্শিত হইয়া থাকে।

পঞ্চধাম দ্বাদশ পাট সপ্তদশ হয়।
ভক্তগণের সপ্তদশ সহ চৌত্রিশা পাট কয়॥
চৌত্রিশ পাট যে যে গ্রামে তার নাম কহি।
ক্রমাগত নাম সব শুনহ নিশ্চহি॥
যেই গ্রামে যার বাস আছিল নির্দ্ধার।
নাম গ্রাম লিখি মুঞি করি পরিহার॥
শ্রীনবদ্বীপ ধাম প্রভুর জন্ম হয়।
কাটোওা প্রভুর ধাম জানিবা নিশ্চয়॥
এক চাকা জন্মভূমি' খড়দহে বাস।
শ্রীনিত্যানন্দের দুই ধাম জানিবা নির্যাস॥
শ্রীঅদ্বৈতের ধাম শান্তিপুরে হয়।
এই পঞ্চধাম সবে জানিহ নিশ্চয়॥ (ইত্যাদি)

অভিরাম ঠাকুরের এই বিবরণ হইতে জানিতে পারা যায় যে খড়দহ পঞ্চধামের মধ্যে অন্যতম 'ধাম'। 'পঞ্চধাম' ও আদ্য 'দ্বাদশপাট' লইয়া সর্ব্বশুদ্ধ 'সপ্তদশপাট' হয়। এই সপ্তদশ পাটের সহিত 'ভক্তগণের' আর 'সপ্তদশ পাট' লইয়া সর্ব্বসমেত 'চৌত্রিশ পাট' কথিত। প্রভু নিত্যানন্দের, উক্ত অভিরাম, কমলাকর ও গৌরী দাস এবং মুকুন্দ প্রভৃতি বারজন প্রসিদ্ধ পরিকর ছিলেন। ইহাঁরা, দ্বাপর যুগের কৃষ্ণবলরাম সখাদিগের পরিচয়ানুসারে "দ্বাদশ গোপাল" নামে খ্যাত হয়েন। এই দ্বাদশ গোপালের বাসস্থানই প্রথমে 'দ্বাদশপাট' হয়। ক্রমে দ্বাদশ পাটের স্থলে চৌত্রিশপাট হইয়াছে। আধুনিক বৈষ্ণবগণের মধ্যে অনেকে ভুলিয়া গিয়াছেন যে, প্রভু নিত্যানন্দের, জন্মভূমি একচক্র গ্রাম ও তাঁহার নিবাসীভূত খড়দহ গ্রাম—উভয়ই শ্রীধাম। শ্রীপাট খড়দহকে শ্রীধাম খড়দহ নামে অভিহিত করিলে গ্রামের গৌরব বৃদ্ধি হইবে।

সে যাহা হউক, প্রভু নিত্যানন্দ খড়দহে অধিষ্ঠান করিবার পর শ্রীধাম খড়দহ গৌড়দেশে বৈষ্ণব ধর্ম্মের কেন্দ্রস্বরূপ হইয়াছিল। দেশদেশান্তর হইতে নানা শ্রেণীর লোক দলে দলে আসিয়া তাঁহার নিকট ধর্ম্মোপদেশ ও দীক্ষামন্ত্র গ্রহণ করিতে লাগিল। বর্ত্তমান সময় হইতে প্রায় চারিশত বৎসর পূর্ব্বে একদিন এই শ্রীধাম খড়দহে আড়াই হাজার বৌদ্ধ ভিখারিণী উপস্থিত হইয়া, দয়ার অবতার উদার প্রভু নিত্যানন্দের শ্রীচরণতলে পতিত হইয়া উদ্ধার ভিক্ষা করে। নিত্যানন্দ তাহাদের নাম মন্ত্র দিয়া বৈষ্ণব সমাজভুক্ত করেন। কুলকামে

দীক্ষিত এই বৌদ্ধ ভিখারিণীরাই "নেড়ানেড়ী" নামে অভিহিত হয়। * গৌড়দেশ হইতে বৌদ্ধ ধর্ম্মের নিরাস, শ্রীপাদ নিত্যানন্দের এক অক্ষয়কীর্ত্তি। ইতিহাস পাঠে বুঝিতে পারা যায়, শিখসম্প্রদায়ের গুরু 'গুরু নামক'ও শ্রীধাম খড়দহে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি হিন্দু ম্লেচ্ছ নির্ব্বিশেষে যে নবধর্ম্মের মন্ত্র দান করেন, তাহার শিক্ষার জন্য তিনি শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দের নিকট বহু পরিমাণে ঋণী। তিনি ধর্ম্ম প্রচারের প্রাক্কালে বঙ্গদেশে আসিয়া নানাস্থান পর্য্যটন করিয়াছিলেন। প্রভু নিত্যানন্দের নিকটে তিনি দীক্ষা-গ্রহণ করেন এবং তাঁহারই নিকট হইতে নামদানতত্ত্ব শিক্ষা করেন। এ কথা গুরু নানক, তাঁহার লিখিত নিজ জীবন-চরিতে ও স্বরচিত "গ্রন্থ সাহেবা" নামক পুস্তকে বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। † খড়দহ-গ্রামে গুরু নানকের আগমন, ইতিহাস মুখ ফুটিয়া না বলিলেও অঙ্গুলি সঙ্কেতে নির্দ্দেশ করিতেছে। তিনি বঙ্গদেশের নানা-স্থানে আসিয়াছিলেন—ইহা ঐতিহাসিক সত্য। তিনি যে প্রভু নিত্যানন্দের মন্ত্রশিষ্য হইয়াছিলেন—ইহাও ঐতিহাসিক সত্য! তাহা যদি হইল, তবে নানক শ্রীপাদ নিত্যানন্দের সন্ধানে, তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণের নিমিত্ত, প্রভুর আবাসস্থল—তাঁহার ধর্ম্মকেন্দ্র শ্রীধাম খড়দহেই আসিয়াছিলেন।

এইরূপে এই প্রাচীন খড়দহগ্রাম—শ্রীপাদ নিত্যানন্দের স্থাপিত শ্রীপাট—এই শ্রীধাম খড়দহ, তৎকালে গৌড়দেশে বৈষ্ণবধর্ম্মের একটি মহামিলনক্ষেত্র হইয়াছিল। চারিশত বৎসর পূর্ব্বে শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দের প্রেমধর্ম্মের যে মহতী ধারা এই শ্রীধাম হইতে শতমুখে শত দিকে প্রবাহিত হইয়াছিল—চারিশত বৎসর ধরিয়া সে প্রেমভক্তিপ্রবাহ বিশাল এ গৌড়ভূমির নানা অঞ্চলে, পট্টে পট্টে, হট্টে, হট্টে, চক্রে চক্রে, ঘুরিতে ঘুরিতে—চারিশত বৎসর পরে আজ আবার তাহার সেই পবিত্র প্রাচীন উৎপত্তিতীর্থে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। ‡

শ্রীযতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

---

* 'ভগ্নী নিবেদিতা'র "Studies from on Eastern Home" গ্রন্থের "Au old Collegiate Village" দ্রষ্টব্য।

† শ্রীমান্ জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস প্রণীত "বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী" নামক পুস্তকের ৪০৫ সংখ্যক পত্র দ্রষ্টব্য।

‡ শ্রীপাট খড়দহে "গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্মিলনী"র অষ্টম বার্ষিক মহোৎসব।

নবীন সন্ন্যাসী।

(১)

'নবীন সন্ন্যাসী'র কথা সচরাচর উপন্যাস-নাটকেই দেখা যায়। গ্রামে যদি একজন নবীন সন্ন্যাসী আসে, তবে হৈ চৈ পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা। পুরাতন সন্ন্যাসীর জন্য লোকে তত ব্যস্ত হয় না। হয়ত ঔষধ প্রভৃতি যোগাড় করিবার জন্য দুই চারিজন লোক তাঁহার নিকট উপস্থিত হয় এবং হয়ত ভবযন্ত্রণা হইতে মুক্তিপ্রাপ্তির প্রত্যাশায় দুই একটা কথা জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু নবীন সন্ন্যাসীর আবির্ভাব একটু নূতন ধরণের। মেরিকোরেলির একখানা নূতন উপন্যাস, কিংবা রবি ঠাকুরের একটা নূতন কাব্যের মত' তাহার মধ্যে কি আছে, তাহা জানিবার জন্য লোক উৎসুক এবং উৎকণ্ঠ হইয়া পড়ে।

ঘনশ্যামপুর রেলের ধারে, এবং গঙ্গানদীর তটে। স্থানটি এত সুন্দর যে, এতদিন কোন একটা সন্ন্যাসীর আসা উচিত ছিল। কিন্তু সেখানকার জমিদার বিরূপাক্ষবাবু এত দুর্দ্দান্ত যে, ভয়ে হয়ত কেহ আসিতে চাহিত না। অতএব মণ্ডলদের অতিথিশালায় একজন শিষ্য সঙ্গে লইয়া, শনিবারে যখন একজন নবীন সন্ন্যাসী উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহার আগমনবার্ত্তা তৎক্ষণাৎ প্রকাশ হইয়া পড়িল।

ধীরেন্দ্রবাবু, জমিদার বিরূপাক্ষবাবুর একমাত্র তনয়। পিতার অজ্ঞাতে 'গীতা' প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র মধ্যে মধ্যে পাঠ করিতেন। তিনি সন্ধ্যার পর ক্ষীণ চন্দ্রালোকে বন-বাদাড় এবং পগার ডিঙ্গাইয়া অভ্যাগতের সঠিক সন্ধান আনিতে গিয়াছিলেন। রাত্রি দশটার সময় আম্রবাগানের দিকে নলিনী মাষ্টারকে ডাকিয়া বলিলেন—'লোকটা অদ্ভুত। ডিটেক্টিভ নয়, তাহা ঠিক। ডাক্তারও নয়, ঔষধের বাক্স সঙ্গে সঙ্গে নাই। কন্যাদায়গ্রস্ত ত হইতেই পারে না। বয়স খুব কম, আমাদের মত। মাথা ন্যাড়া হইলেও দেখিতে খুব সুশ্রী, এবং তাঁহার সঙ্গে যে শিষ্য আছে, তাহার কথাবার্ত্তায় বোধ হয় যে টাকাকড়ির অভাব নাই।"

নলিনী মাষ্টার মনে করিলেন যে, কোনো পত্রিকার সংবাদদাতা হইলেও

হইতে পারে। অনেক তর্ক বিতর্ক করিয়া স্থির হইল যে, তাঁহার সন্ন্যাসী হওয়াই খুব সম্ভব।

পরদিন স্নানের সময় গ্রামের ডাক্তারবাবু, মোক্তারবাবু এবং নলিনী মাষ্টার সন্ন্যাসী দেখিতে গেলেন। সন্ন্যাসী তখন নদীতটে। পরিধৃত গেরুয়াবসন খুব মলিন এবং উজ্জল মুখমণ্ডলের সঙ্গে সেখানা খুব সুন্দর দেখাইতেছিল। পালে পালে পালভরে বিদেশী নৌকা নদী দিয়া চলিয়া যাইতেছিল। সন্ন্যাসী তাহা একদৃষ্টে দেখিতেছিলেন।

আগন্তুকদিগকে দেখিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন,—"আপনারা বোধ হয় আমার আসাতে সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়া পড়িয়াছেন। অতএব যতদূর আমার পক্ষে সম্ভব, পরিচয় দিতেছি। আমাকে সকলে 'হরিদাস' বলিয়া ডাকে। আমি উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলবাসী। আমার পিতা বাঙ্গালা কথা কহিতেন, অতএব আমিও কহি। হয়ত আমি একজন বাঙ্গালী। আমি সন্ন্যাসী যে ঠিক, তাহাও নয়। পরিব্রাজক বলিতে পারেন।"

নলিনী মাষ্টার জানিতেন যে, সন্ন্যাসীদিগের পিতৃপুরুষের কথা জিজ্ঞাসা করা ধর্ম্মবিরুদ্ধ, অতএব কথা বাড়াইবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলেন—'আপনার এখানে আসার উদ্দেশ্য ?'

সন্ন্যাসী খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন।

এমন সময় সন্ন্যাসীর শিষ্য বটব্যালের সঙ্গে গল্প করিতে করিতে ছোটতরফের জমিদার-তনয় ধীরেন্দ্রবাবু আসিয়া উপস্থিত। তিনি সেখানে বসিলে, সন্ন্যাসী বলিলেন—'বহুদেশ পরিভ্রমণ করিয়া আমি শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি। শ্রান্ত হইলে পরিব্রাজকগণ পীড়িত এবং মুমূর্ষুর শুশ্রূষায় রত হন। আমারও উদ্দেশ্য সেই রকম একটা কিছু করা'।

মোক্তার মহাশয় ডাক্তারের দিকে বক্রদৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন—'এটা বড় আশ্চর্য্যের কথা'।

সন্ন্যাসী। ইহাই আশ্রমের ধারা। গৃহস্থাশ্রমে কেহ শ্রান্ত হইলে অন্যলোক তাহার শ্রান্তি দূর করে।

বটব্যাল। যেমন ইস্তিরি পুত্তুর।

সন্ন্যাসী। কিম্বা জননী। কিন্তু সন্ন্যাসীর পক্ষে পরকে শান্তি দিয়া, নিজের ব্যথা দূর করা শাস্ত্রীয় বিধান।

ডাক্তার। অনেকটা আমাদের হোমিওপ্যাথিক বিধানের মত।

সন্ন্যাসী। বোধ হয়। এখন আমার উদ্দেশ্য এই যে, দশকাঠা জমি পাইলে এখানে একটা কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া মুমূর্ষুদিগের সেবার বন্দোবস্ত করিব। এই গ্রামে এমন দুই একজন্ লোক থাকিতে পারেন যে, মরিবার পূর্ব্বে গঙ্গাতীরে তাঁহাদের বাস করিবার বিলক্ষণ ইচ্ছা, অথচ কেহ দেখিবার নাই বলিয়া, বাটীতেই শেষ পার্থিব প্রাণবায়ু ত্যাগ করিতে বাধ্য। এই রকমের দুই এক জন পীড়িত লোকও থাকিতে পারেন।

বটব্যাল। যাঁহাদের ডাক্তরে জবাব দিঁয়ে চুকেছেন।

ধীরেন্দ্রবাবু খুব মন দিয়া নবীন সন্ন্যাসীর কথা শুনিতেছিলেন।

খুব বেলা হইয়াছিল। দুই একটা সাদা পাখী নদীর এপার হইতে উড়িয়া যাইতেছিল। গ্রীষ্মকাল। জল খুব স্থির এবং স্বচ্ছ বালির উপর দিয়া একটা সুন্দর ঘাট। সকলেরই স্নান করিবার দুর্দ্দান্ত ইচ্ছা হইল।

সন্ন্যাসীর সঙ্গে সকলেই স্নান করিতে এক গলা জলে অবতীর্ণ হইলেন। জমিদার পুত্র ধীরেন্দ্র এবং সন্ন্যাসী উভয়েই সন্তরণপটু। খানিক দূর সাঁতার দিয়া ধীরেন্দ্র নবীন সন্ন্যাসীর খুব কাছে গেল।

ধীরেন্দ্র। একটা কথা বলিব।

সন্ন্যাসী। স্বচ্ছন্দে।

ধীরেন্দ্র। আমি দশকাঠা লাখ্‌রাজ জমি দিব, কিন্তু আমাকে মধ্যে মধ্যে গীতার মানে বুঝাইয়া দিতে হইবে। আমাকে ছোট ভ্রাতার মত দেখিবেন।

সন্ন্যাসী তখন একটা খুব বড় নৌকার পালের দিকে তাকাইয়া দেখিতেছিলেন। ধীরেন্দ্র তাঁহার মুখ দেখিতে না পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল 'আপনার মত কি?'

সন্ন্যাসী। হয়ত তুমি এরি মধ্যে 'গীতা' যতদূর বুঝিয়াছ, আমি ততদূর বুঝি নাই।

ধীরেন্দ্র। আপনি ছলনা করিবেন না। আমাকে শিখাইতে হইবে। এই গঙ্গাজলে শপথ করুন।

সন্ন্যাসী অতি মৃদুস্বরে বলিল 'আচ্ছা'। এত মৃদু যে, জগৎ না শুনিলেও ধীরেন্দ্র তাহা স্পষ্ট শুনিয়াছিল।

(২)

প্রায় এক সপ্তাহ পরেই সকলে দেখিল যে, নদীতীরে একটা কুটীর নির্ম্মিত হইয়াছে, এবং সেটার নাম 'মৃত্যুকুটীর'। বটব্যাল, চিত্রগুপ্তের মত সেই

কুটীরের পাহারা দিত। কুটীরের কিছু দূরে পুরাতন বটবৃক্ষের নীচে স্নানের পর অতি প্রত্যূষে সন্ন্যাসী বসিয়া জপ করিতেন, এবং মধ্যে মধ্যে ধীরেন্দ্রবাবু সাবধানে সেখানে আসিয়া সন্ন্যাসীর নিকট উপদেশ লইয়া যাইতেন। একথা ধীরেন্দ্রের পিতা বিরূপাক্ষ বাবু মোটেই জানিতে পারেন নাই। পাছে কেহ জানিতে পারে, সেইজন্য ধীরেন্দ্র বাবু একখানি ক্ষুদ্র 'জেলেডিঙ্গী'র উপর চড়িয়া ঘাটে আসিয়া অবতীর্ণ হইতেন।

সে স্থানটা গ্রাম হইতে অনেকদূর। সেইজন্য কৃষকগণ বড় একটা সেদিক যাতায়াত করিত না। তবে কখন কখন কেহ পথভ্রান্ত গাভীর সন্ধানে কিংবা শব কাঁধে করিয়া শ্মশান-ঘাটের দিকে গিয়া সেই অপূর্ব্ব কুটীর দেখিতে পাইত। ক্রমে কুটীরের অস্তিত্ব, এবং নবীন সন্ন্যাসীর কথা কৃষকদিগের মধ্যে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল।

অনেকে খবর লইয়াছিল যে, সন্ন্যাসীর শিষ্য বটব্যাল একজন সিদ্ধপুরুষ, এবং মধ্যে মধ্যে কেবল লাউসাক কিংবা ডাঁটা সিদ্ধ করিয়া খায়। একদিন তিন চারিটা গাভী তাহার সুপ্ত দেহের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছিল; কিন্তু বটব্যালের ঘুম ভাঙ্গে নাই। এই রকম দুই একটা অদ্ভুত বিভূতি দেখিয়া সকলে স্থির করিল যে, বটব্যাল এবং তাহার গুরু সেই আগন্তুক নবীন সন্ন্যাসী উভয়েই মহাযোগী। কেহ কেহ বলিল যে, সন্ন্যাসী রাত্রিকালে নদীবক্ষে অনায়াসে এপার হইতে ওপার চলিয়া যাইতেন।

সন্ন্যাসী লোকালয়ে যাইতেন না, ভিক্ষা করিতেন না। কামিনী এবং কাঞ্চনের দিকে তাঁহার দৃষ্টি ছিল না। এগুলি অনেকে লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছিল। সুতরাং সকলেই একমত হইয়া স্বীকার করিল যে, তিনি একজন মহাপুরুষ। গ্রামের মধ্যে প্রজাদিগের সর্দ্দার গদার বাপ। গদার মা নাই, এবং গদাও নাই। গদা খুব তেজঃপূর্ণ যুবাপুরুষ ছিল। সকলের অতিশয় প্রিয় এবং দুর্ব্বলের সহায়। গদা বিবাহের তিন বৎসর পরেই বসন্তরোগে মরিয়া যায়। গদার বিধবা স্ত্রীকে লইয়া তাহার পিসী গদার বাটীতে কালযাপন করিত। গদা এবং গদার জননীর বিহনে সে বাটী অন্ধকার হইলেও, কৃষকগণ সেটাকে একটা ধর্ম্মাশ্রম এবং পুণ্যাশ্রম বলিয়া মনে করিত। ধান্যে গৃহ পরিপূর্ণ হইলে গদার শোকে গদার পিতা তাহা দুঃখী কৃষকগণকে বিতরণ করিয়া দিত। গদার পিসীর গুণে কাহারও জমিদারের নিকট খাজনা বাকী পড়িত না, এবং গৃহলক্ষ্মী তরুণী বিধবা, কৃষকদের ছোট ছোট মেয়েগুলিকে একত্র করিয়া বাংলা পড়াইত। গদার

শ্বশুর তাঁহার সাধের কন্যা মালতীকে বালিকাবিদ্যালয়ে পড়াইয়াছিলেন, এবং বিবাহের সময় অনেক পুঁথি কিনিয়া দিয়াছিলেন। যখন নারিকেলডাঙ্গা হইতে বিধবা কন্যাকে দেখিবার জন্য মধ্যে মধ্যে ঘনশ্যামপুরে আসিতেন, তখন নিতান্ত ইচ্ছা হইলেও তাহাকে লইয়া যাইতেন না। যাইবার সময় অশ্রুজল মুছিয়া এবং কন্যার অশ্রুজল মুছাইয়া বলিতেন "মা তুই যে ব্রত লইয়াছিস, তাহা মহৎ'।

গদার বাপ খঞ্জ, এবং দৃষ্টিশক্তি অতিশয় ক্ষীণ। হৃদয়ের গভীর শোকে, জীবনী শক্তির সঙ্গে দৃষ্টিশক্তির হ্রাস দেখিয়া সকলে ভয় পাইয়াছিল যে, গদার পিতা অন্ধ হইয়া যাইবে। একদিন গদার পিসী গঙ্গাস্নানের পর বাটীতে ফিরিয়া বলিল—'দাদা! যে সন্ন্যাসীর কথা সকলে কহে, সে বাস্তবিকই মহাপুরুষ, এবং তন্ত্র-মন্ত্র জানে, নতুবা আমার মনের কথা জানা কি কাহারো সম্ভব?'

গদার পিসীর মনের কথা কি, তাহা বিশেষ না জিজ্ঞাসা করিয়াই গদার বাপ বলিল—'আমি সেই সন্ন্যাসীর নিকটে যাইব'।

সন্ধ্যাকালে 'মৃত্যুকুটীরের' নিকট সন্ন্যাসী আকাশের তারকা দেখিতে-ছিলেন। বটব্যাল সেই সময় গদার বাপকে লইয়া আসিয়া জ্ঞাপন করিল।—

'এই একজনকে লিএ এসেছি! ইনি খুব দুঃখী সুখী মানুষ'।

গদার বাপ প্রণাম করিয়া বলিল, 'আমি গদার বাপ, কিন্তু গদার বাপ হইয়াও সুখ নাই, কারণ যে দুঃখে আমি খোঁড়া, সেই দুঃখে গদা মরিয়াছে। এ দুঃখ আপনাকে দূর করিতে হইবেই, নচেৎ আমি ধন্না দিব'।

নবীন সন্ন্যাসী মৃদুস্বরে বলিলেন—'আপনার দুঃখ ভগবান্ দূর করিবেন। আপনি স্থির হইয়া বসুন'।

গদার বাপ তাহার দুঃখের কথা খানিকটা বলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনি তন্ত্রমন্ত্র নিশ্চয় জানেন। কোন উপায়ে আমার চির জীবনের শত্রু, কিংবা তাহার পুত্র কলত্রের সর্ব্বনাশ করিয়া আমার জীবনের ব্রত রক্ষা করুন।'

গদার বাপ কথাটা বলিয়া ভয় পাইল। কোন সন্ন্যাসী যে সহজে কাহারও সর্ব্বনাশ করিবে, একথা সে কোথায়ও শুনে নাই। কিন্তু নবীন্ সন্ন্যাসীর মুখে এমন একটা ভাব সে দেখিতে পাইয়াছিল, যাহাতে তাহার বোধ হইল যে তাহার যে ব্রত, সন্ন্যাসীরও তাহাই।

অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন,—সে লোকটা কে?

গদার বাপ। বড় তরফের জমিদার।

সন্ন্যাসী। তিনি এখন কোথায়?

গদার বাপ। বৃন্দাবনে।

সন্ন্যাসী। আপনার কি সর্ব্বনাশ তিনি করিয়াছিলেন ?

তখন গদার বাপ সর্ব্বনাশের কথা বলিতে লাগিল। 'আমি যাহাকে ভাল বাসিতাম, সেও তাহাকে ভাল বাসিত। আমি তাহাকে বিবাহ করিয়া সেই দুষ্টের কুদৃষ্টি হইতে রক্ষা করিয়াছিলাম। সেই ক্রোধে সে আমার অর্দ্ধেক জমি ছলে বলে কাড়িয়া লইয়া আত্মসাৎ করিয়াছিল। এই খানেই বোধ হয় একদিন সন্ধ্যাকালে নদীর পাড়ে বসিয়া আমি তাহার মৃত্যুগণনা করিতেছিলাম। সেই সময়, দুর্দ্দান্ত অজ্ঞাতভাবে আসিয়া আমাকে নদীতে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়াছিল। তাহার পদাঘাত আমার পৃষ্ঠে এখনও লাগিয়া আছে। আমি সেই অবধি খঞ্জ। প্রায় ত্রিশ বৎসর গিয়াছে। যাহার জন্য এত সব, সেও গিয়াছে। আমার পুত্রও গিয়াছে।' কেবল আমার মনের আগুন এখনও জ্বলিতেছে। ইহাকে কি বলিবে ? "প্রতিহিংসা" ?

(৩)

সন্ন্যাসী। হাঁ।

গদার বাপ। সেটা ভাল কি মন্দ ?

সন্ন্যাসী। অগ্নির ভাল মন্দ বুঝা দুষ্কর।

গদার বাপ। আমি তাহার মৃত্যু কামনা করি। যদি তাহার পুত্র থাকে, তাহারও সর্ব্বনাশ কামনা করি। অহোরাত্র তাহা জপিতেছি। মরিবার পূর্ব্বে তাহা যাহাতে ঘটে, আপনাকে করিতেই হইবে। সন্ন্যাসী ধীরভাবে বলিলেন 'তথাস্তু'।

গদার বাপ সন্দিগ্ধনেত্রে সন্ন্যাসীর দিকে তাকাইল। কিন্তু দেখিল—সন্ন্যাসীর নেত্র স্থির, মুখ পাণ্ডুবর্ণ, দৃঢ়তাপরিপূর্ণ। সন্ন্যাসী বলিলেন, 'সন্দেহের কোন কারণ নাই। মৃত্যুর পূর্ব্বে যাহাতে জীব শান্তি পায় ইহাই আমার ব্রত। তন্ত্রে মন্ত্রে অনেক সাধিত হয়, তোমার জন্যও সাধিত হইবে। কিন্তু তিনি যদি মরিয়া গিয়া থাকেন ?'

গদার বাপ। হয়ত পরলোকেও তাঁহার যন্ত্রণার অনুষ্ঠান করিতে পারেন।

সন্ন্যাসী শিহরিয়া উঠিলেন। প্রতিহিংসা কি ভয়ানক অনল! মরিলেও তাহার শিখা পরলোক পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হয়।

গদার বাপ। আপনি ধ্যানস্থ হইয়া জানুন। তিনি যদি থাকেন, কিংবা

তাহার পুত্র কলত্র যদি কেহ থাকে, তবে যেন গদা ও গদার মা, এবং আমি সেই 'পুরাণো' ব্যথার প্রতিশোধ লইতে পারি।

সন্ন্যাসী অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন, 'তোমার অভিপ্রায় পূর্ণ হইবে'।

গদার বাপ আশ্বস্ত হইয়া সেখানে শুইয়া পড়িল।

তাহার ভগ্ন পদের ব্যথা আজ প্রতিহিংসার সঙ্গে সঙ্গে বৰ্দ্ধিত হইয়াছিল। তাহার নয়নের জ্যোতি ক্ষীণতর হইতেছিল। সে আবার বলিল—'আমি বোধ হয় আর বেশী দিন বাঁচিব না'।

নবীন সন্ন্যাসী হরিদাস তাহার মধ্যে প্রাকৃতিক মনুষ্যের একটি উজ্জ্বল ছবি দেখিতে পাইলেন। কৰ্ম্মক্ষেত্রে এই যে অনল চিরকাল জ্বলিয়া উঠে, তাহা প্রশমিত করিবার সাধ্য কাহার ?

হরিদাস ধীরে ধীরে বৃদ্ধ গদার বাপকে শয়ান দেখিয়া নিকটে আসিলেন। তাহার নয়নে হাত বুলাইয়া দিলেন। পীড়িত পদ অঙ্কে লইয়া টিপিতে লাগিলেন। গদার বাপ তাহাতে বাধা দিল না। একদৃষ্টে সন্ন্যাসীর অপূর্ব্ব শুশ্রূষা দেখিতে লাগিল।

কেবল গদার বাপ দেখিতেছিল, তাহা নহে ; দূর হইতে গদার পিসী, এবং গদার বিধবা স্ত্রী মালতী মন্ত্রপুত্তলিকাবৎ তাহা দেখিতেছিল।

গদার বাপ তাহাদিগকে দেখিয়া ডাকিল—'ওরে তোরা নিকটে আয়, এই আমার গদা। আমার চক্ষুর জ্যোতি বাড়িয়াছে। তোদের দেখিতে পাইতেছি। তোরা নিকটে আয়। আমার পায়ের ব্যথা কমিয়া গিয়াছে। নিকটে আয়। ঠাকুরকে নমস্কার কর'।

তরুণী এবং বৃদ্ধা উভয়ে সন্ন্যাসীর চরণে প্রণাম করিল। সন্ধ্যার অন্ধকার খুব ঘনাইয়া আসিতেছিল।

হরিদাস সন্ন্যাসী ডাকিলেন— 'বটব্যাল, প্রদীপ জালিয়া দে'।

কিন্তু বটব্যালের কোন সাড়া শব্দ নাই। বটব্যালের মনে কেমন একটা আনন্দসঞ্চার হাওয়াতে সে কৃষকদের আড্ডায় শাস্ত্রের কথা প্রচার করিতে গিয়াছিল। সে যাইবার সময় গদার পিসীকে বলিয়াছিল 'আজ সন্ধ্যাকালে তোমরাই পিরদিপ জেলিয়ে দিও'।

মালতী প্রদীপ জালিবার ভার লইল। অন্যদিন হইতে আজিকার সন্ধ্যা-'প্রদীপ' যেন খুব মনোহর। বোধ হয় 'মৃত্যুকুটীরে' সেই প্রদীপ জীবনের খানিকটা

আলোক সঞ্চার করিয়াছিল। সেই আলোকের মধ্যে সন্ন্যাসী মালতীর দেবী-প্রতিমার ছটা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন।

গদার বাপ সন্ন্যাসীর দিকে তাকাইয়া বলিল 'ঐ আমার গদার বৌ। নিষ্কলঙ্কা সাধ্বী বৌ। আজন্ম দুঃখিনী। বাবা! আমি মরিলে উহার কি হইবে, তাহাও বলিয়া দেও'।

এই কথা শুনিয়া মালতী কুটীরের মধ্যে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে গেল। গদার পিসী কাতরভাবে কাঁদিয়া বলিল, 'ঠাকুর, ওর কানে একটা মন্ত্র দেও। ওর জীবনের সাধ যে মন্ত্র নিয়ে ব্রহ্মচারিণী হয়। বাবা! আমরা ক্ষত্রিয় তা জান? জমিদারেরাও ক্ষত্রিয়, কিন্তু আমাদের মত উঁচু নয়। আমাদের অবস্থা ছোট হইলে কি হয়? এক সময় আমরা সহমরণে যাইতাম। তাদের বংশে কেহ যায় নাই।'

সন্ন্যাসী বলিলেন 'মা, সহমরণ কলিকালে উঠিয়া গিয়াছে। মনুষ্যত্বের বিকাশ অনেক রকমে সম্ভবে। ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া যাহরা জীবের হিতসাধন করিতে পারে, তাদের পক্ষে সহমরণ প্রথা অন্যায়।'

গদার বাপকে কুটীরে রাখিয়া উভয়ে চলিয়া গেল। বটব্যাল আসিয়া উপস্থিত।

বটব্যালের মনে আজ সন্ধ্যাকালে যে আনন্দের সঞ্চার হইয়াছিল, তাহার বিশেষ কারণ ছিল। 'ঠাকুর মশাই'কে সংসারী করিয়া তুলিবার তাহার ভয়ানক ইচ্ছা। প্রভুভক্ত হইলেও শ্রীরামচন্দ্রের সীতাদেবীর মত একটা প্রতিমা ঘরে খাড়া করিবার অভিপ্রায় বটব্যালের মনে মনে ছিল, এবং সেই জন্য সন্ন্যাসী বিরক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু বটব্যাল একদিন মুখ ফুটিয়া অনেকগুলি কথা বলিতে ছাড়ে নাই। 'ঠাকুর মশাই, কর্ম্মযোগের মহিমা কর্ম্মসন্ন্যাস হতে বড়। আপনি তন্ত্র মন্ত্র ছাড়িয়া দিয়ে গৃহস্থ আশ্রমের সন্ন্যাসী হন, ইহাই আমার সাধ'। কিন্তু বটব্যালের সাধে কি আসে যায়?

সন্ন্যাসীর জীবন যে দিকে গিয়াছিল, তাহার পথ তিনি নিজেই বুঝিতে পারেন নাই।

হঠাৎ মালতীকে দেখিয়া বটব্যালের মনে হইল—যেন তাহার সেই সাধ পূর্ণ হইবে। সে যতই মালতীর অতুলনীয় রূপ, সলজ্জ ভক্তিভাব, এবং অপূর্ব্ব লাবণ্যময় দেহকান্তি দেখিতে লাগিল ততই তাহার আশার সঞ্চার হইল। সন্ন্যাসীর হৃদয় নিহিত যে প্রেমের উৎস তাঁহার জ্ঞানাগ্নিকে সীমাবদ্ধ করিয়া, জগতের

কর্ম্মক্ষেত্র প্লাবিত করিতে মধ্যে মধ্যে ছুটিত, তাহার আভাস বটব্যাল নিশ্চয় পূর্ব্বে পাইয়াছিল, নচেৎ তাহার সে আশা হইত না। তথাপি বটব্যালের মনে বড় ভয় হইত।

কি রকম করিয়া ঠাকুরের হৃদয়ে সেই সংসারগ্রন্থিটুকু অটুট হইয়া যায়, তাহাই বটব্যালের ধ্যান।

বটব্যালকে সম্মুখীন দেখিয়া হরিদাস সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন—'তুমি কোথায় গিয়াছিলে' ?

বটব্যাল খুব আনত মুখ করিয়া বলিল,—'আমি আমি কৃষকদের পাড়ায় গিয়েছিলেন। এখানকার ষকেরা খুব আশ্চর্য্য লোক। তারা ধর্ম্ম অধর্ম্ম বুঝে। তাদের ছেলেরাও খুব আশ্চর্য্যি। আমাকে পেট ভ'রে জলখাবার দিলেক। ছোট ছোট মেয়েরাও আরও আশ্চর্য্যি। তারা সুন্দর কবিতা ও ধর্ম্মকথা জানে। এই যে ঠাকরুণটি এসেছিলেন, তিনিই সে সব কথা শিখান। দেবী—দেবী বল্লেও হয়'।

সন্ন্যাসী গম্ভীর স্বরে বলিলেন, 'চুপ করিয়া থাক। তোমার কাজ তুমি কর'।

(৪)

সন্ন্যাসী প্রত্যূষে স্বচ্ছ গঙ্গাজলে শরীর নিমগ্ন করিয়া ভাবিলেন 'এই যে গঙ্গা-জল, যদি মৃত্যুসঙ্কল্প করিয়া সমুদ্রের দিকে ছুটে, তবে বালির বাঁধে তাহার গতি রোধ করা দুঃসাধ্য'। কিন্তু এই মরণের পথেও আমরা সেই জলে ডুব দিয়া আনন্দ উপভোগ করি। প্রেমের মধ্যে একটা রমণীয় ছন্দ আছে। ভাঙ্গিয়া গেলেও তাহার মধ্যে জীব নাচিয়া নাচিয়া আনন্দ পায়'।

অন্যদিন অপেক্ষা সন্ন্যাসী আজ অনেকক্ষণ ধরিয়া জলে থাকিলেন। ধীরেন্দ্র একাকী পদব্রজে ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইল।

ধীরেন্দ্র বলিল—'বেলা হইয়াছে'।

সন্ন্যাসী। তাতে কোন ক্ষতি নাই। তুমি তীরে দাঁড়াও, আমি তোমার কথা শুনিব।

ধীরেন্দ্র। আমি গোটাকতক হৃদয়ের কথা কহিব। জীবন-মরণের কথা।

সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিলেন—'তাহা হইলে আমার আরও জলে থাকা উচিত। হয়ত আমার গাত্রদাহ হইতে পারে। 'হৃদয়ের কথা', 'জীবনের কথা,' 'মরণের কথা,' এগুলি আগুন না জ্বলিলে কেহ বলে না!'

ধীরেন্দ্র। উপহাস নয়, আমি যে সকল উপদেশ পাইয়াছি, তাহাতে আমার মনে একটা বিপ্লব ঘটিয়াছে। একটা বিষয়ে আমার কর্ত্তব্য কি, তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

সন্ন্যাসী। বিষয়টা কি?

ধীরেন্দ্র। প্রেম। সুধু প্রেম নহে, অবৈধ প্রেম।

সন্ন্যাসী। তোমার ত বিবাহ হয় নাই। অবৈধ প্রেম কিসের? পরস্ত্রী?

ধীরেন্দ্র। এককালে ছিল, এখন নয়। আমি তাহাকে ভালবাসি, এবং সে ভালবাসার প্রতিদান পাইয়াছি। তাহাকে লইয়া যদি পলাইয়া যাই, তবে তাহার কুলে কালি পড়িবে, এবং আমিও পিতৃ-ত্যাজ্য হইয়া পড়িব। এই রকম করিয়া সকলের মনে ব্যথা দেওয়া ভাল, না হৃদয়ের আশা হৃদয়ে রুদ্ধ করিয়া ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ ভাল।

সন্ন্যাসী। আমিও জলে দাঁড়াইয়া সেই কথা ভাবিতেছিলাম। যদি একজন ব্রহ্মচারীর তোমার মত অবস্থা হয়, তাহারও জিজ্ঞাস্য 'ব্রহ্মচর্য্য' ছাড়িয়া দিব, না প্রেমের হাটে কেনা বেচা করিতে অবতীর্ণ হইব?

ধীরেন্দ্র। ভাই! ছলনা করিও না।

সন্ন্যাসী। ভাই! আমরা কৃষ্ণের জীব, পুত্তলির মত হয়ত নাচিয়া বেড়াই, নয়ত জড়ভরতের মত সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়া পড়িয়া থাকি। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের জ্ঞান বড় দুরূহ জিনিষ। যখন কর্ম্মই বুঝিয়া উঠিতে পারি না, তখন কর্ত্তব্য বুঝিব কি করিয়া? তবে একটা কথা বলি, কাহারও মনে ব্যথা দিও না। সমাজ-বন্ধন কোনোখানে একটু শিথিল হইয়া যাওয়া বিশ্বের চিরন্তন বিধান। দুই একটা উল্কাপাত হইয়া গেলেই গ্রহগণ গতিভ্রষ্ট হয় না, এবং ভাঙ্গা যায়গাটুকু আবার জুড়িয়া যায়। তোমার দায়িত্ব কেবল তোমার মন লইয়া। তুমি প্রেমসূত্র দিয়া যদি কাহাকেও বাঁধ, এবং সেই বন্ধনে যদি জগতের সৌন্দর্য্য এবং মঙ্গল বাড়ে, তবে তাহার জন্য তর্ক করিও না।

ধীরেন্দ্র। যদি দুইটী জীব পরস্পরকে বাঁধিয়া আনন্দ উপভোগ করে, তাহাও কি নির্দ্দোষ?

সন্ন্যাসী। সে কোন্ আনন্দ? যাহা ব্যাপ্ত হয়, তাহাই আনন্দ। একটা জীবকেও সে আনন্দের মধ্যে বাঁধে, এমন লোক কোথায়? তুমি যদি সে আনন্দ পাও, তবে আমার জীবন আজ সার্থক হইবে।

ধীরেন্দ্র সন্ন্যাসীর উদ্ভাসিত আনন্দের মূর্ত্তি দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেল।

'ভাই, কথার এখনও শেষ হয় নাই। জল হইতে উঠিয়া আইস'।

সন্ন্যাসী। তোমার কথা বলিয়া তুমি চলিয়া যাও, আজ তর্পণ করিতে আমার অনেক বেলা হইবে। ভাই! এ জগতে তোমার পথ ও আমার পথ এক নয়। আমি বুঝিতে পারিয়াছি, তুমি মালতীকে ভালবাস। তুমি তাহাকে লইয়া যাও। বিবাহ কর। আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি, সুখী হও। তোমার কোনো ভাবনা নাই, যিনি সকলের গুরু, তিনি তোমার সহায় হইবেন।

বোধ হয় সেই আশীর্ব্বাদের সঙ্গে সন্ন্যাসীর চক্ষু বহিয়া দুই এক বিন্দু অশ্রু পড়িয়াছিল; কিন্তু তাহা ধীরেন্দ্র দেখিতে পায় নাই।

ধীরেন্দ্র দূর হইতে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। ঠাকুরের বিলম্ব দেখিয়া বটব্যাল কতকগুলি কৃষক লইয়া গদার বাপের নিকট একটা মন্ত্রণায় ব্যস্ত ছিল। সে মন্ত্রণা—মালতীসম্বন্ধে।

'বিধবার বিবাহ কি একটা শক্ত কথা? আমার ব্রত সফল হইলে হরিদাস ঠাকুরই ত আমাদের রাজা! উনিই ত আমার গদা। মালতী রাজরাণী হইবে, তাহার কি সন্দেহ আছে?'

গদার বাপের এই রকম উন্মনা ভাব দেখিয়া গদার পিসী বলিল—'মালতী কোথায়? বোধ হয় সে বাড়ী গিয়াছে।' গদার পিসী তাহাকে আনিতে গেল।

সন্ন্যাসী স্নান করিয়া রক্তবর্ণনেত্রে 'মৃত্যুকুটীরে' উপনীত হইলেন। বটব্যালকে বলিলেন—'গোটাকতক কাঁটার গাছ ও নদী হইতে বালি সংগ্রহ করিয়া আন্। আজ সন্ধ্যার সময় সেই তান্ত্রিক যজ্ঞটা করিতে হইবে।'

সন্ন্যাসী সারাদিন অনাহারে থাকিলেন। তাঁহার উজ্জ্বল অগ্নির 'মত' দৃষ্টি দেখিয়া গদার বাপের মনে খুব আনন্দ হইতে লাগিল। আজ তাহার চিরশত্রু বিনষ্ট হইবে!

সন্ন্যাসী বলিলেন—'দেখ, মৃত্যুর মধ্যেও কেমন একটা আনন্দের ছন্দ আছে। তুমি যাহাকে মারিতে চাহ, তাহার আনন্দ জগতে বিলুপ্ত হইয়া তোমার আনন্দবিধান করিবে। যখন কেহ মরে, তখন এক দল কাঁদিতে থাকে, এবং অন্য দল নৃত্য করে। তুমি কখনও মহাকালীর রূপ দেখিয়াছ?'

গদার বাপ। না।

সন্ন্যাসী। অদ্য দেখিতে পাইবে।

সন্ধ্যার সময় কুটীরের মধ্যে বেদীর সম্মুখে অগ্নি জ্বালিয়া সন্ন্যাসী ধ্যানমগ্ন হইলেন। ক্রমে অপূর্ব্ব ছন্দে বিনাশের মন্ত্র সকল তাঁহার মুখ হইতে উচ্চারিত হইতে লাগিল। সেই মন্ত্রগুলি নানাবর্ণে চতুর্দ্দিক্ ব্যাপ্ত হইয়া পুনরায় তাঁহারই দেবতুল্য দেহকে বিদ্ধ করিতে লাগিল। সন্ন্যাসী যন্ত্রণায় অধীর হইয়া পড়িলেন। তাঁহার পবিত্র মুখ হইতে কেবল একটি কথা শুনা গেল, 'মা'!

(৫)

কুক্ষণে বটব্যাল মালতীর সন্ধানে গিয়াছিল। সন্ন্যাসী যে মন্ত্রশক্তির সঞ্চার করিয়াছিলেন, জগতে তাহা রুদ্ধ হয় না, কেবল তাহার গতির পরিবর্ত্তন সম্ভব। সে পরিবর্ত্তনের উপায় বটব্যাল ছাড়া আর কেহ জানিত না।

গদার বাপ যজ্ঞের নিকট বসিয়া যাহা দেখিল, তাহা অদ্ভুত! কোন মানবদেহ সেখানে নাই!

নিবিড় আঁধারের কোলে মধ্যে মধ্যে তড়িতের ন্যায় নৃত্যশীল জ্বলন্ত রেখা! কখনো বক্র, কখনো সরল, কখনো চক্রাকার। ঘোর ভৈরবছন্দে সেগুলি বহুদূর ছুটিয়া গিয়া আবার যজ্ঞস্থলে ফিরিতেছিল। গদার বাপ ভয় পাইয়া বলিল—'ঠাকুর তুমি কোথায়?'

সেই আঁধারের মধ্যে সন্ন্যাসীর ক্ষীণ স্বর গদার বাপের কর্ণে প্রবেশ করিল।

'জগতে আমাকে দেখিতে পাইবে না। তুমি যাঁহাকে বিনাশ করিতে চাহিয়াছিলে, তিনি ইহসংসারে নাই। তিনি আমার পিতা, জন্মদাতা এবং পরমগুরু। পিতৃসত্যপালনের জন্য আমি এখানে কুটীর বাঁধিয়াছিলাম। প্রাণ দিয়া সে সত্য পালন করিয়াছি। তুমি নিশ্চিন্ত হও। কোন ভয় নাই। আমিই সেই বংশের একমাত্র সন্তান। পিতার আজ্ঞাক্রমে তোমার মর্ম্মব্যথা দূর করিতে আসিয়াছিলাম। যদি তাহা করিয়া থাকিতে পারি, তবে আমার জীবন সার্থক'।

গদার বাপ আর কিছু দেখিতে পাইল না। শোকার্ত্ত অন্ধের ন্যায় সে স্বর্গের উদ্দেশ্যে চাহিয়া ডাকিল—'ঠাকুর আমার অপরাধ হইয়াছে। তোমার কোমল হস্তস্পর্শেই আমার বহু বর্ষের ব্যথা দূর হইয়া গিয়াছিল, সে কথা ত জানিতে, তবে এই পাপীর জন্য কেন প্রাণ দিতে গেলে। ঠাকুর আবার এস! মরণে তোমার এত আনন্দ, তাহা কে জানিত?'

কিন্তু ঠাকুর আর উত্তর দিলেন না। গভীর নৈশবায়ু সেই পুণ্যযজ্ঞের

করাল-অগ্নি নিভাইতে যত্নবান্ হইল। মৃত্যুকুটীরের চারিদিকে ঝড় বহিল। কল্লোলিনী পবিত্রসলিলা জাহ্নবী সেই কুটীরের পদধৌত করিয়া তরঙ্গের উপর তরঙ্গের সঞ্চার করিল। সেই উত্তাল তরঙ্গমালায় সন্ন্যাসীর মৃতদেহ কোথায় ভাসিয়া গেল, কেহ দেখিতে পাইল না।

তীরস্থ অন্ধকার ভেদ করিয়া রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় বটব্যাল কুটীরে উপস্থিত। বুঝিতে পারিল—যজ্ঞ শেষ হইয়া গিয়াছে এবং যজ্ঞের হোতা ইহলোক ছাড়িয়া গিয়াছে। অগ্নি নিভিয়াছে। কুটীরের দ্বারে গদার বাপ পড়িয়া। বটব্যাল উন্মাদের ন্যায় গঙ্গাজলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল।

মানুষের পদশব্দ পাইয়া গদার বাপ আবার আর্ত্তনাদ করিয়া কাঁদিল— 'ওরে তোরা কে আছিস্ আয়। ঠাকুর আমাকে ছাড়িয়া গিয়াছে। গদার সঙ্গে ঠাকুরও চলিয়া গিয়াছে'।

নৈশবায়ুর মধ্যে কেবলমাত্র প্রতিধ্বনি হইল—'গিয়াছে'।

পরদিন প্রাতে নববধূ মালতীকে লইয়া ধীরেন্দ্র যখন মৃত্যুকুটীরে আসিল, তখন গদার বাপের অন্তিম অবস্থা। "মা, তোমার সন্ন্যাসী চলিয়া গিয়াছে; বলিয়া গিয়াছে,—'ভাই ধীরেনের হাতে তাহাকে সঁপিয়া গেলাম। তাহারা সুখে থাকুক। তাহাদের পুত্র সন্তান সুখে থাকুক।' আমি তাহাকে খাইয়াছি। বড় তরফের শেষ সন্তানকে আমি খাইয়াছি। ঠাকুরকে খাইয়াছি।"

উভয়ে অবাক্ হইয়া সন্ন্যাসীর শেষ কথা শুনিল।

মূর্চ্ছিতা মালতীর সংজ্ঞা সঞ্চার করিয়া, বাষ্পসিক্তনয়নে ধীরেন্দ্র তাহাকে নদীতটে লইয়া গেল।

'মালতী! তিনি আমার বড় ভাই। আমার গুরু এবং জ্ঞানদাতা। তাঁহার আত্মবিসর্জ্জনে এই শ্মশান এখন পবিত্র তীর্থস্থান। উদ্দেশ্যে তাঁহাকে প্রণাম কর'।

তখন উভয়ে নদীতটে নতজানু হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। তাহাদের গভীর শোকাশ্রু বহুবিন্দুরূপে জাহ্নবীর পুণ্য স্রোতে মিশিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিমালা তাহা লইয়া সানন্দে অনন্তদেবকে উপহার দিতে ধাবিত হইল।

প্রভাতবায়ু বহিয়া গিয়াছে। দলে দলে কৃষকগণ আসিয়া গদার বাপের শবদেহ সৎকার করিয়া চলিয়া গিয়াছে; 'মৃত্যুকুটীর' একটি অদ্ভুত গ্রাম্য ইতিহাস লইয়া সেখানে পড়িয়া আছে।

বিরূপাক্ষ বাবু অগ্রজের পথ অনুসরণ করিয়া বৃন্দাবনে চলিয়া গিয়াছেন।

নলিনী মাষ্টার এবং ডাক্তার সন্ন্যাসীর শবদেহের বহু সন্ধান করিয়াছেন, কিন্তু তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। সন্ন্যাসীদিগের মৃত্যু অপূর্ব্ব রহস্য।

ঘনশ্যামপুরের অর্দ্ধেক বিষয় আতুর এবং অনাথদিগের সেবায় নিযুক্ত হইয়াছে। সেই 'মৃত্যুকুটীরে'র দ্বার রুদ্ধ করিয়া একটা প্রকাণ্ড ধ্বজা সেখানে প্রোথিত হইয়াছে। গ্রাম্য লোক কেহ সেদিকে যায় না। কেবল শোকার্ত্তের মধ্যে কেহ কেহ সেখানে গিয়া সন্ধ্যাকালে ঠাকুরের উদ্দেশে প্রণাম করিয়া আসে।

তবে দুই বৎসর পরে সেখানে একজন বিকটাকার সন্ন্যাসী আসিয়া বসতি করিয়াছিল। সে ধ্বজার নীচে বসিয়া হরিনাম জপ করিত। কখনো কোন কৃষক বালক সেদিকে উপস্থিত হইলে তাহাদের লইয়া চক্রাকারে নৃত্য করিত। লোকটা মৌনী এবং পাগলের মত ছিল, অতএব সকলে তাহাকে 'পাগলা বাবাজী' বলিয়া ডাকিত।

মহাবারুণীর স্নানে এক দিন শিশু সন্তান কোলে করিয়া মালতী সেই শ্মশান ঘাটে গিয়াছিল। ধ্বজার সম্মুখে ষোড়শোপচারে বিল্বপত্র রাখিয়া 'পাগলা বাবাজী'কে প্রণাম করিল। পাগলা বাবাজী আনন্দে আশীর্ব্বাদ করিলেন। সেই দিন তিনি একবার কথা কহিয়াছিলেন।

'ঠাকুর এখনও তোমাকে ভাল বাসেন। এখনও অনেক নূতন লোক জগতে আসে, পুরাতন চলিয়া যায়, কিন্তু ঠাকুরের প্রেম অটুট। তিনি চিরদিনই ভাল বাসিবেন। যাহারা তাঁহার প্রেমে বাঁধা, তাহাদের মৃত্যুভয় নাই'।

'মৃত্যুকুটীরে'র চারিদিকে এখন অনেক ফুলের গাছ। পাগলা বাবাজী স্থানটাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া লইয়াছে। যাহারা বটব্যালকে পূর্ব্বে দেখিয়াছিল, তাহারা নিশ্চয় কহিতে পারে যে, পাগলা বাবাজীই সেই বটব্যাল। পাগলা বাবাজীর অনেক বয়স। সে ঠাকুরের অপেক্ষায় সেখানে বসিয়া আছে। তাহার ধীর বিশ্বাস যে, ঠাকুর যেখানে প্রেম রাখিয়া যান, সেখানে একবার নিশ্চয় আসেন। প্রেমই তাঁহার পুঁজিপাটা।

শ্রীসু—

প্রাচীন ভারতের রাজ্যপদ্ধতি।

'স্বতন্ত্রতা' বা 'স্বাধীনতা' এই দুইটা শব্দ শুনিতে, অত্যন্তই মনোহর। আধুনিক সভ্য ও শিক্ষিত সম্প্রদায়, উহাকে প্রাণাপেক্ষাও অধিক জ্ঞান করেন। কিন্তু তা' সত্ত্বেও, এই শব্দ দুইটীর বাস্তবিক অর্থ, সামাজিক ও নৈসর্গিক বন্ধনের কারণে অত্যন্ত সীমাবদ্ধ।

পক্ষিগণকে আকাশে বিচরণ করিতে দেখিয়া, আমরা মনে মনে ভাবি যে,—"উহারা যথেচ্ছা যাইতে পারে এবং উহারা 'স্বতন্ত্র' ও 'স্বাধীন'। কিন্তু এই স্বাধীন পক্ষীরাও সমুদ্র উল্লঙ্ঘন করিতে বা বাতাবরণের বিশিষ্ট উচ্চতায় উত্থিত হইতে পারে না,—'জন্মতঃস্বতন্ত্র'-আখ্যাপ্রাপ্ত মানবেরও এই দশা,—মনুষ্য নিজের ইচ্ছায়, যে কোন বিষয়ে, যতই 'স্বতন্ত্র' হইতে চেষ্টা করুক না কেন, কিন্তু তাহার 'স্বতন্ত্রতা'র গতি, সৃষ্টি এবং সমাজের মূল নিয়মাবলীর গণ্ডী অতিক্রম করিতে অক্ষম। "মানব 'জন্ম' হইতেই 'স্বতন্ত্র',—স্বাধীনতাপ্রাপ্তির জন্যই তাহার জন্ম"—পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এরূপ বলিলেও,—স্মরণ রাখিতে হইবে যে,—"মানব-স্বাধীনতা বা স্বতন্ত্রতারও একটা গণ্ডী আছে।" আবার এই শব্দ দুইটাকে ছাড়িয়া, মানব-জন্ম-রহস্য বিশ্লেষণ করা যাক্, তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, "স্বাধীনতার পরিবর্ত্তে, জীব জন্মগ্রহণ করিবামাত্র, স্বাধীনতা রহিত হইয়া যায় এবং 'সংসার' তাহাকে মায়ার বন্ধনে বাঁধিয়া ফেলে।"

রাজকীয় স্বতন্ত্রতারও একটা সীমা আছে। উহা দুই ভাগে বিভক্ত—প্রথম ভাগ,—"কোন এক দেশের রাজ্যপদ্ধতির উপর অন্য দেশের রাজকর্ম্মচারিগণের হস্তক্ষেপ করা অনুচিত।" রাজকীয় স্বতন্ত্রতার এই ভাগকে "বাহ্য-স্বাতন্ত্র্য" কহে। দ্বিতীয় ভাগ,—"রাজ্যাবস্থার অত্যন্ত আবশ্যকীয় বিষয় বাদে,—অন্যান্য বিষয়ের বিচার প্রজার মতামতের উপর নির্ভর করে,—স্বতন্ত্রতার এই ভাগকে "অন্তঃস্বাতন্ত্র্য" কহে। "বাহ্য-স্বাতন্ত্র্যাবলম্বী" রাজ্যের সহিত অন্যান্য রাষ্ট্রীয়গণের পরস্পর সম্বন্ধ থাকে। দেশে অনিয়ন্ত্রিত রাজসত্তা-পদ্ধতির বর্ত্তমানেও, "বাহ্যস্বাতন্ত্র্য" দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু "প্রজাস্বত্বাত্মক"

রাজ্যপদ্ধতির বর্ত্তমানেও, উক্ত "বাহস্বাতন্ত্র্য" পূর্ণরূপে দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রায় অনেকেরই এই অনুমান যে,—"অন্তঃস্বাতন্ত্র্য এবং রাজ্যপদ্ধতির (Constitution) অত্যন্ত নিকট সম্বন্ধ।" কিন্তু এ সম্বন্ধকে নিত্যসম্বন্ধ মনে করা ভ্রমমূলক। রাজ্যপদ্ধতি অর্থাৎ রাজ্যব্যবস্থা এবং প্রজাস্বাতন্ত্র্যের পরস্পর সম্বন্ধ বস্তুতঃ সাধন-সাধ্যেরই সদৃশ। কোন বিশেষ প্রকারের রাজ্যপদ্ধতি হওয়াই সাধন, এবং সুখকরী রাজ্যব্যবস্থা ও "প্রজাস্বাতন্ত্র্য" হওয়াই তাহার সাধ্য অর্থাৎ উদ্দেশ্য। কিন্তু হরবার্ট স্পেন্সরের কথানুসারে * অনেক সুশিক্ষিত ব্যক্তিও ইহা ভুলিয়া যান। সত্য কথা এই যে,—অনিয়ন্ত্রিত এবং রাজসত্তাক রাজ্যপদ্ধতির বর্ত্তমানেও, প্রজাগণ স্বাধীনতা পাইতে পারেন,—উদাহরণার্থ,—"প্রাচীন ভারতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামের লোকস্বত্তাক রাজ্যসঙ্ঘের সহিত গঠিত, অনিয়ন্ত্রিত রাজসত্তাক-পদ্ধতির প্রতি দৃষ্টিপাত করুন,—উহাতে রাজসত্তাক-পদ্ধতি নাম মাত্র দেখিতে পাওয়া যায়, গ্রাম্য-সম্প্রদায়ের কারণে অনেকাংশে প্রজাবর্গের পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য ছিল। দ্বিতীয় উদাহরণ, "লোকস্বত্তাক রাজ্য-পদ্ধতি", এই পদ্ধতির অনুসারে রাজকর্ম্মচারী যদ কর্ত্তব্যপরাঙ্মুখ হন, অথবা নিজের সময় নষ্ট করেন, স্পেন্সর তাহাকে over government নির্দ্দেশ করিয়াছেন—এরূপ দশায় প্রজার স্বতন্ত্র হওয়া আমরা মানিতে পারি না।

সমাজের অস্তিত্ব.:স্থিরতা এবং উন্নতির জন্য, সেই সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি ও প্রত্যেক সম্প্রদায়ের সকল কার্য্যেই দৃষ্টি রাখিতে হয়। উহার মধ্যে প্রধান কার্য্য এই :—"ঐ সমাজকে অন্য কোন সমাজের আক্রমণ হইতে রক্ষা করা এবং ঐ সমাজের অন্তর্গত ব্যক্তিগণকে সামাজিক অত্যাচার হইতে রক্ষা করা"—সমাজের এই দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য যে সম্প্রদায়ের উপর নির্ভর করে, তাহার নাম "রাজ্য-সম্প্রদায়" এবং "রাজ্য-সম্প্রদায়ের" প্রধান কর্ত্তব্য ইহাই। এই কর্ত্তব্যপথ হইতে যদি ঐ সম্প্রদায়ের পদ-স্খলন হয়, তবে যেমনই রাজ্যপদ্ধতি হউক না কেন, প্রজার "স্বতন্ত্রতা" দিন দিন নষ্ট হইতে থাকিবে। রাজ্য-সম্প্রদায় "সমাজব্যবস্থার" এক মহত্বপূর্ণ অঙ্গ। সামাজিক ও নৈতিক আদর্শ যত উচ্চ হইবে,—রাজ্যপদ্ধতি ও রাজ্যব্যবস্থাও সেইরূপ উচ্চ-আদর্শের হইবে,—কিন্তু কিন্তু রাজ্যপদ্ধতি যে প্রকারেরই হউক না কেন,—যদি সমাজের "আধ্যাত্মিক" "নৈতিক" এবং সামাজিক সম্প্রদায় উচ্চাদর্শের হয়, তাহা হইলে ঐ সম্প্রদায়ের আদর্শানুসারে, সেই দেশের রাজ্য-ব্যবস্থা এমন সুচারু হইবে,

* Herbert Spencer. Life of Vol I, P, 459.

যাহাতে প্রজাবর্গ অবশ্যই শান্তি ও স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। সমাজের ঐ সম্প্রদায় না থাকিলে কোন লাভই নাই,—কারণ,—"যখন দ্রব্য ও দাবী লইয়া ব্যক্তিবর্গের মধ্যে কলহ হওয়া সম্ভব এবং ঐ কলহের মীমাংসা সুচারুরূপে হওয়া অসম্ভব,—এ অবস্থায় রাজপদ্ধতির বর্ত্তমানেও কোন লাভ নাই। "কোন্ দেশের, কোন বিশিষ্টকালের রাজ্যব্যবস্থা কিরূপ ছিল" ইহার মীমাংসা ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ রাজনীতিজ্ঞ "এডমণ্ডবর্ক" অতি সুচারুরূপে করিয়াছেন। "যদি দেশের জনসংখ্যা ও সম্পত্তি অধিক হয়, তাহা হইলে, রাজ্য-ব্যবস্থাও উত্তম হইবে,—অন্যথায় নহে।" "ষ্ট্রেবো" নামক গ্রীক ইতিহাসকার লিখিতেছেন, যে, হায়ডাস্পিস্ (ঝোলম) ও হায়পলিস্ ওর্ফে হায়পানিস্ (ব্যাস্) এই দুই নদীর মধ্যস্থিত একহাজার নগরে 'যুক্রেটাঈদীজ' রাজার সত্তা বর্ত্তমান ছিল। উক্ত দুই নদীর মধ্যে দেড় সহস্র নগর ছিল। "এপোলো ডোরস্" বলিতেছেন যে, * প্রত্যেক নগরের মনুষ্যসংখ্যা কোসসহরের জনসংখ্যা হইতে ন্যূন ছিল না। 'মেগস্থনীস' বলিতেছেন যে, ভারতবর্ষে সর্ব্বশুদ্ধ একশত বিশটি ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্র। 'এরিয়ন' নামক গ্রন্থকার লিখিয়াছেন:—আর্য্যাবর্ত্তের মনুষ্য-সংখ্যা এবং নগরের বিস্তীর্ণতার, একটা মোটামুটী হিসাব করা অসম্ভব। প্রফেসর মেক্স ডঙ্করের উক্তি:—(১) "পৃথিবীর সমস্ত রাষ্ট্র অপেক্ষা ভারতীয় রাষ্ট্র, জনসংখ্যার হিসাবে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।" টেশিয়শ' নামক গ্রন্থকার লিখিয়াছেন:—"সমসাময়িক অন্যান্য সমস্ত রাষ্ট্রের সংখ্যা যত ছিল, একা ভারতের হিন্দুগণের সংখ্যা ততই ছিল।" 'ষ্ট্রেবো' ইতিহাসকার লিখিতেছেন যে,—পোলিবোথ্রা (পাটলিপুত্র বা পাটনা) নগর আট মাইল লম্বা ছিল এবং উহার বিস্তীর্ণ দুর্গে পাঁচশত ৭০টী বুরুজ (গম্বুজ) ও ৬৪টী দ্বার ছিল। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে, কনোজে ত্রিশ সহস্র তামলী এবং ষাট সহস্র বাদ্যকার বাস করিত। (২) ভারতের জনসংখ্যা কিছুকাল পূর্ব্বে কত ছিল, উপরোক্ত কথা হইতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, দেশোন্নতির দুইটী মুখ্য লক্ষণ, প্রসিদ্ধ রাজনীতিজ্ঞ 'এডমণ্ড বর্ক', নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রথম:—জনসংখ্যার বৃদ্ধি হওয়া, দ্বিতীয়:—জনসংখ্যার বিপুলতা। ভারতবর্ষের জনসংখ্যা সম্বন্ধে কোন কথা

---

* এলিফিন্‌ষ্টোনের History of India, P. 281.

(১) History of Antiquity Vol. V. P. 18.

(২) Researches Vol. II. P. 220.

বলা বাহুল্য,—এখন প্রাচীনকালে সম্পত্তি কিরূপ ছিল, তাহাই দেখা যাউক,—এই বিশ্লেষণে যদি বিবেচ্য হয় যে, প্রাচীন ভারত অতুল সমৃদ্ধিশালী ছিল। প্রাচীন ভারতসন্তানকে আধুনিক ভারতসন্তানের ন্যায়, পেটের জন্য লালায়িত হইতে হইত না,—ইহার পরিবর্ত্তে বরং সে ধনকুবের ছিল, তখন এ কথা স্পষ্টই প্রতীত হইবে যে, প্রাচীন ভারতের রাজ্য-পদ্ধতি সর্ব্বথা মাননীয় হইত। সম্পত্তির বিপুলতার কারণে ভারতবর্ষ "সুবর্ণ-ভূমি" নামে অভিহিত হইয়াছে। 'ষ্ট্রেবো' যথাসাধ্য অনুসন্ধানের পর লিখিয়াছেন,—"ভারতে তস্করের নামও কেহ জানিত না।" সে সময় যদি, এখনকার মত ধনের অভাব হইত, বা তখনকার অধিবাসীরা এখনকার অধিবাসীদের মত, উদরান্নের জন্য লালায়িত থাকিত, তাহা হইলে বোধ করি 'ষ্ট্রেবো' ঐরূপ উক্তি প্রয়োগ করিতেন না। ইহা হইতেই ভারতের সম্পত্তি বিপুলতার অনুমান করা যাইতে পারে। মেগস্থনীস লিখিয়াছেন,—"চন্দ্রগুপ্তের বিশাল সেনানিবাসে চার লক্ষ সেনা বাস করিত, এবং প্রত্যহ যথানিয়মে, তস্করদিগকে কঠোর শাস্তি দান করা হইত।" এই উক্তি হইতে ঐ সময়ের শান্তিরক্ষক-সম্প্রদায়ের সভ্যতার প্রমাণ পাওয়া যায়। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, 'মহারাণী ভিক্টোরিয়ার শাসনকালেও, ইংলণ্ডের শান্তিরক্ষা-বিভাগের প্রবন্ধ পূর্ণরূপে হয় নাই।"

কোন কোন বিদ্বানের মত যে, প্রতিনিধিসত্তাক রাজ্যপদ্ধতি কিরূপ? হিন্দুগণ তাহা স্বপ্নেও জানিতেন না।—সত্য সংরক্ষণ কল্পে এ কথা বলিতে বাধ্য হইলাম যে, যাঁহারা ভারতের প্রতি ঐরূপ উক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন, তাঁহারা ভারতের সমাজ-শাসন ও রাজ্য-পদ্ধতি সম্বন্ধে একেবারেই অনভিজ্ঞ। 'কর্ণেল মার্ক উইল্কস্' লিখিয়াছেন,—"প্রাচীন সময়ে ভারতবর্ষের প্রত্যেক গ্রাম ও নগর, এক একটী পূর্ণ লোকসত্তাক রাজ্য ছিল এবং সমস্ত ভারতখণ্ড এইরূপ ছোট ছোট স্বরাজ্যের এক সমূহ ছিল।" * এরিয়ন বুঝি এইজন্যই বলিয়াছেন, "ভারতের প্রত্যেক ব্যক্তি স্বতন্ত্র।" 'মিলের' ন্যায় দুরাগ্রাহী ও অহংমনা ইতিহাসকার, বোধ হয় নাই, কিন্তু তিনিও, "প্রাচীন ভারতের রাজ্য-পদ্ধতি এবং নিয়মাবলীতে, লোকসত্তাক রাজ্যের বর্ত্তমান থাকা, স্বীকার করিয়াছেন।" 'সার চার্লস মেটকফ' গ্রাম্য-সম্প্রদায়ের গুণ বর্ণন করিয়া বলিতেছেন, "গ্রাম্য-সম্প্রদায়রূপী, ক্ষুদ্র লোকসত্তাক রাজ্যে, প্রায় সমস্ত বিবাদেরই মীমাংসা হইয়া যাইত, অন্য কোন রাজ্যসত্তার উহাতে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার ছিল না।

(*) Historical Sketches of the South of India. Vol. I. P. 119.

যেখানে অন্যান্য তর্ক ক্ষণভঙ্গুর বিবেচ্য হইত, যেখানে গ্রাম্য-সম্প্রদায়ের যুক্তিই 'সনাতন' বলিয়া গৃহীত হইত। এক, এক করিয়া, কত গেল, কত আসিল, মোগল, পাঠান, মহারাষ্ট্র, শিখ, ইংরাজ ইত্যাদি, কত শত জাতির উত্থান-পতন হইল, কতশত জাতির বিজয়পতাকা, অনন্ত-কাল-গর্ভে বিলীন হইল, কিন্তু গ্রাম্য-সম্প্রদায় পূর্ব্ববৎ অটলই রহিল। ঐ গ্রাম্য-সম্প্রদায়রূপী ছোট ছোট লোকসত্তাক রাজ্যের সমূহ থাকাতেই, ভারতবাসী হিন্দুগণ, রাজকীয় স্বতন্ত্রতা, স্বাবলম্বন এবং সুখ প্রাপ্ত হইতে পারিয়াছিলেন।" (১) "রাজগণ প্রত্যেক গ্রামে একজন, দশ বারটি গ্রাম্য-সম্প্রদায়ের উপর একজন, এবং ঐরূপ দশ-পাঁচটি সম্প্রদায়ের উপর একজন অধিকারী নিযুক্ত করিয়া দিতেন এই পদ্ধতির অনুসারে রাজকার্য্য পরিচালিত হইত" (২)

ভারতের ধর্ম্মগ্রন্থের মধ্যে, "মনুস্মৃতি" সর্ব্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত, উহার রচনা যেমন সরল, তেমনি নিয়মাবলীও দূরদৃষ্টি ও বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। সার উই-লিয়ম জেন্স লিখিতেছেন, "মনুস্মৃতি, গ্রীক-স্মৃতিকার সোলন এবং লায়কুরগ্‌সের নিয়মাবলী হইতেও প্রাচীন। মনুস্মৃতির লিখিত, ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী, সেই সময় হইতে প্রচলিত, যে সময় হইতে, ইজিপ্ট ও ভারতের মধ্যে প্রথম রাজসত্তা স্থাপিত হয়। ক্রীট দ্বীপের প্রাচীন নিয়মাবলী মনুস্মৃতির অনুকরণ, এবং ঐ নিয়মাবলীই 'লায়কুরগ্‌স্' স্পার্টে প্রথম প্রচার করেন।" (৩) 'দী বাইবেল ইন ইণ্ডিয়া' নামক গ্রন্থকর্ত্তার মত :—"ইজিপ্ট, ইরান, গ্রীস এবং রোমের নিয়মাবলী, মনুস্মৃতির আধারেই রচিত। ইউরোপের বিচারালয়ে অদ্যাবধি ঐ নিয়মাবলীই প্রচলিত।" (৪) ডেমেমৃত্বরেটের শাসনকালে গ্রীকগণ, ভারতীয়

(১) The village-communities are little republics having nearly every-thing they can want within themselves and almost independent of any foreign nation. They seem to last where nothing lasts. Dynasty after dynasty tumbles down, revolution succeeds revolution; and Pathan, Moghul, Marhatta, Sikh, English are all Masters in turn, but the village communities, remain the same. This union of village communities each one forming a little state in itself, is in a high degree conducive to their (Hindoo) happiness and to the enjoyment of a great portion of freedom and independence. (Report of the Select Committee. Vol. III. of the House of Commons 1832.)

(২) মনুস্মৃতি অধ্যায় ৭।১২৩—১২৪।

(৩) Houghton's Institutes of Hindu Law. Preface. P. 10—12.

(৪) The মনুস্মৃতি was the foundation upon which the Egyptian, The Parsian, The Grecian and the Roman codes of law were built and influence of মনু was still every day felt in Europe.

স্মৃতি হইতেই, নিজেদের নিয়মাবলী প্রস্তুত করেন এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশের নিয়মাবলী রোমান গ্রন্থ হইতে গৃহীত। প্রফেসর উইলসন লিখিয়াছেন, "হিন্দুদিগের এই স্মৃতিতে, সমাজের ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের নিয়মাবলী বিদ্যমান আছে। যে সম্প্রদায়ে এই নিয়মাবলী প্রচলিত আছে, নিঃসন্দেহ,—সেই সম্প্রদায় সভ্যতা ও মনুষ্যত্বের আদর্শস্বরূপ হইবে।"

কয়েকজন বিদেশী মুক্তকণ্ঠে ভারতের গুণ কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহার উদাহরণ উদ্ধৃত করা হইল। এখন এমন একজন বিদেশীর অনুসন্ধান করিতে হইবে, ভারতসম্বন্ধে যাঁহার অভিমত, দুরাগ্রহবশতই হউক, বা অন্য কোন কারণেই হউক, নিতান্তই মন্দ, এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাও দেখিতে হইবে যে, তিনি নিজের অলীক ধারণার উপর নির্ভর করিয়া কিরূপ বিষ উদ্‌গিরণ করিয়াছেন। হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্র সম্বন্ধে,'মিল' নামক ইতিহাস-কারের অভিমত,—"হিন্দুর স্মৃতি,ধর্ম্মশাস্ত্র ও নিয়মাবলীর রচনা এবং বর্গীকরণ দুই-ই হস্তপদবিহীন, ইহা হইতে হিন্দুরাষ্ট্রীয় গণের অসভ্যতা প্রকাশ পাইতেছে। তাহারা (হিন্দুরা) কোন দ্রব্য বন্ধক না রাখিয়া, কর্জ্জ দান করে না, ইহাও তাহাদের অসভ্যতার একটি নিদর্শন। হিন্দুর ধর্ম্মগ্রন্থাদি মিথ্যা কথার জলন্ত দৃষ্টান্ত। হিন্দুর শাস্ত্রাদি অতিরঞ্জিত, এইজন্য ধর্ম্ম-শাস্ত্রার্থে দুইজন পণ্ডিত একমত হইতে পারেন না। মুসলমানী ধর্ম্মশাস্ত্র, হিন্দু-ধর্ম্ম-শাস্ত্রাপেক্ষা শতগুণে শ্রেষ্ঠ।" * এই লেখকের লেখনী হইতে এইরূপ অসংবদ্ধ-যুক্তিহীন উক্তি অনেকবার প্রসূত হইতে দেখা গিয়াছে। ইঁহার ইতিহাসের সম্পাদক প্রফেসর উইল্‌সন, নিজের প্রমাণ-কুঠারাঘাতে, মিলের ভিত্তিহীন নিরর্থক কল্পনাবলীর যথাবিহিত সদ্ব্যবহার করিয়াছেন! উইল্‌সন স্পষ্টই বলিয়াছেন—"নিয়মাবলীর রচনা ও বর্গীকরণ হইতেই যদি রাষ্ট্রীয় সভ্যতার গুণাগুণ নির্ণীত হয়, তাহা হইলে এ কথাও স্বীকার করিতে হইবে যে, ইংরাজের রাষ্ট্রসভ্যতা, হিন্দু রাষ্ট্রসভ্যতা অপেক্ষা অনেকাংশে হেয়। বন্ধক রাখিয়া কর্জ্জ দেওয়াতেই যদি হিন্দুগণ অসভ্য হন, তাহা হইলে লণ্ডনের অসংখ্য pawn brokers মহাজনকেও, উক্ত অসভ্য শ্রেণীভুক্ত হইতে হইবে। 'হিন্দু-ধর্ম্মগ্রন্থাদি মিথ্যা কথায় পূর্ণ' মিলের এই উক্তি সম্পূর্ণ নিরাধার,—ইহা তাঁহার রোগগ্রস্ত কল্পনাশক্তির পরিচায়ক। হিন্দু-পণ্ডিতগণের শাস্ত্রার্থে মত-ভেদ হয় সত্য,—কিন্তু তা' বলিয়া কি উহা অতিরঞ্জিত,—ইংরাজশাসিত ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত একই নিয়ম প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও, বিভিন্ন

* Mills' India, Vol. II.

প্রদেশের শাসন-সম্প্রদায়ের মধ্যে, মতভেদ হইবার কারণ কি? মুসলমানী ধর্ম্ম-গ্রন্থাদিতে প্রতিশোধ লইবার অনুমতি আছে,—ইহা অসভ্যতাসূচক, কিন্তু হিন্দু-ধর্ম্মগ্রন্থাদিতে প্রতিশোধের পরিবর্ত্তে ক্ষমার আদেশ আছে। প্রফেসর উইলসনের উদ্ভট কল্পনা—ইহা নয়;—ইহা সমস্ত সত্য ও প্রমাণিত।" প্রফেসর মেক্সমূলার মিলের ইতিহাসসম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"ইংরাজি ভাষায় যদি দু-এক-খানি দুষ্টবিচারপূর্ণ, হস্ত-পদবিহীন ইতিহাস থাকে তো সে 'মিল'কৃত "ভারতবর্ষের ইতিহাস।" * * * * * মিলের ইতিহাস এরূপ বিষপূর্ণ যে, প্রফেসর উইলসন্-প্রদত্ত বিষনাশক ঔষধিরূপ ভূমিকায়ও, তাহার প্রভাব খর্ব্ব করিতে পারে নাই, (১) * * * * ইনি আর একস্থানে বলিতেছেন,—"এই পুস্তকখানি সিবিল-সার্ভিস-পরিক্ষার্থীদিগকে পাঠ করিতে দেওয়া অনুচিত।"

কলমন্ তাঁহার (২) গ্রন্থে লিখিয়াছেন ঃ—"মনুর লেখনীতে এমন এক বিচিত্রতা আছে, যাহা পাঠ মাত্রেই, পাঠকের হৃদয় অধিকার করে, হৃদয়ে শ্রদ্ধা উৎপন্ন না হইয়া থাকিতে পারে না। ঈশ্বর ব্যতীত, আর সকলের সম্বন্ধে নিয়ম প্রচার করিতে, মনু পূর্ণ স্বাধীনতা গ্রহণ করিয়াছেন—এমন কি ন্যায়-নিষ্ঠুর রাজার চিত্রও উৎকৃষ্টতায় অঙ্কিত করিয়াছেন।" (৩) ডাক্তার রবার্টসন্ লিখিয়াছেন,—"বিবেচনা করিয়া দেখিলে, দেখিতে পাওয়া যায় যে, মনুস্মৃতি, 'জাষ্টিনিয়নের' রোমন ধর্ম্মশাস্ত্র অথবা অন্য কোন সভ্যদেশের, ধর্ম্ম-শাস্ত্রাপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে,—উহার নিয়মাবলী স্বাভাবিক ও স্পষ্ট। উহার বর্ণিত নিয়মাবলী, সংসারের সর্ব্বস্থানে, সর্ব্বকালে সকল মনুষ্যেরই মাননীয়,—উহা উচ্চ, সনাতন ন্যায়তত্ত্বের আধারে প্রস্তুত। এই ধর্ম্ম-শাস্ত্রা-বলম্বী সম্প্রদায়ের, বৈভবশালী, উন্নত এবং সভ্য হওয়ার বিষয়ে, কোন সন্দেহ নাই। এই স্মৃতির নিয়মাবলী ব্যাপকতা বিস্তার ও সূক্ষ্ম বর্গীকরণ এমনভাবে

---

(১) The book which I consider most mischievous, nay which I hold responsible for some of the greatest misfortunes, that have happened in India, is Mill's History of India, * * * * * even with the antidote against its poison which is supplied by Prof. Willson's notes. (India what can it teach us, P. 42.)

(২) Mythology of Hindus.

(৩) The style of মনু had a certain austere majesty that sounds like the language of legislation and extorts a respectful awe. The sentiments of independence on all beings but God and the harsh administrations even to kings are truly noble. পুস্তকখানির নাম পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে।

করা হইয়াছে, যাহা ইউরোপিয়ন শাস্ত্রকারগণ কল্পনায়ও অনুভব করিতে পারেন নাই। মনুস্মৃতি পাঠ করিলে, সমাজের শ্রেষ্ঠতা তৎক্ষণাৎ বিদিত হই এবং ঐ (হিন্দু) সমাজের প্রাচীন শ্রেষ্ঠতা ও সভ্যতা দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া যাই।" (২) হিন্দুশাস্ত্রের গুণাগুণের বিষয়ে, মান্দ্রাজ হাইকোর্টের চীফজষ্টিস 'সার থাম্‌স্ ষ্ট্রেঞ্জ' বলিয়াছেন,—"এই শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে, ইংরাজি পণ্ডিতগণের লাভ তো হইবেই,—সঙ্গে সঙ্গে উহার সম্বন্ধে একটা অপার আনন্দলাভ হইবেই।" (১)

মনুস্মৃতির টীকাকার কুল্লুকের বিষয়ে, সার উইলিয়ম্ জোন্স নিজের মত এইরূপ প্রকাশ করিয়াছেন :—এই টীকা অন্যান্য টীকা অপেক্ষা ক্ষুদ্র হইলেও, সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অর্থপ্রকাশক। ইহাতে টীকাকারের পূর্ণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাতে অনর্থক পাণ্ডিত্যপ্রদর্শন করা হয় নাই,—ইউরোপ এবং এশিয়ার গ্রন্থাদির, অত্যন্ত গভীর ও সর্ব্বমান্য টীকা রচনায়, কল্লুকের ন্যায় অন্য কেহ পূর্ণ সফলতা প্রাপ্ত হন নাই।" পাঠকবৃন্দ যদি বিরক্ত না হ'ন, তাহা হইলে বারান্তরে প্রাচীন ভারতসম্বন্ধে, সামান্য আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। এখন বিদায়।

শ্রীবিমলকান্তি মুখোপাধ্যায়—ছুরি।

---

(২) Disquisit on concerning India. Appl. P. 217.

(১) It (Hindu law of Evidence) will be read by every English lawyer with a mitxure of admiration and delight, as it may be studied by him to advantage.

(২) It is the shortest yet most luminous, the least ostentatious yet the most learned, the deepest yet the most agreeable commentary ever composed on any author ancient or modern, European or Asiatic. (Houghton's Institutes of Hindu law. Preface. P. 18.)

কালবৈশাখী।

১

অগ্নিবর্ষী বৈশাখের জ্বলন্ত তপন,
মেঘহীন বিশুষ্ক আকাশ ;
ধূলিম্লান দিগ্বলয়, প্রতপ্ত পবন
রহি' রহি' ছাড়ে উষ্ণশ্বাস !
ঊর্দ্ধমুখে যাচে বারি চাতক কাতর—
"কোথা মেঘ তৃষা কর নাশ।"

২

নবোদ্ভিন্ন কিশলয় পল্লব পাণ্ডুর,
তাপে দগ্ধা লুণ্ঠিতা লতিকা ;
ধূসর হরিৎ ক্ষেত্র—ধূ ধূ করে মাঠ,
মধ্যাহ্নের জলে মরীচিকা ;—
তাপসী উমার মত ধরণী কি আজি
জ্বালিয়াছে পঞ্চাতপ শিখা ?

৩

দগ্ধ তাম্র আকাশের কি কঠোর রূপ,
করুণার নাহি মেঘ লেশ ;
ধ্যানমগ্ন ভস্মাবৃত যোগেশ যেমন
স্পন্দহীন নেত্র নির্নিমেষ !
ভাঙ্গে নাই যোগ যদি, বসন্ত-মদন
তবে কেন ভস্ম-অবশেষ ?

৪

কোথা সম্মোহন শর, কোথা পুষ্প ধনু,
অকস্মাৎ জাগিলা ঈশান ;—
দিগন্ত পিঙ্গল জটা উড়িল ভয়াল,
মেঘমন্দ্রে গর্জ্জিল বিষাণ ;
স্ফুরিল বিদ্যুৎপ্রভা ললাট-নয়নে,
চরাচর ভয়ে কম্পমান !

৫

কি ঘোর তাণ্ডব নৃত্য, পিনাক-টঙ্কার !
পাপ দক্ষ করিতে দমন—
সতীদেহত্যাগে ক্রুদ্ধ পুনঃ কি ধূর্জ্জটি—
রুদ্ররূপ করিলা ধারণ !
ক্রোধে—ক্ষোভে অশ্রুসহ প্রলয়-নিশ্বাস
ঝঞ্ঝা-বৃষ্টি বহিল সঘন !

৬

উন্মথিয়া—উন্মূলিয়া তরু-গুল্ম-লতা
রণে মত্ত ঝটিকা নির্ঘোষে ;
দিগন্তে বাসুকি যেন আস্ফালি' লাঙ্গুল
সহস্র ফণায় গর্জ্জি ফোঁসে !
আকাশ বিদীর্ণ করি' ঝলসি নয়ন
কড়-কড় বজ্র পড়ে রোষে।

৭

"সংহর সংহর ক্রোধ, হে ভীম ভৈরব,
সৃষ্টি বুঝি যায় রসাতলে ;
ক্ষণিকের লীলা তব, জীব নাহি সহে,
লুটাইয়া পড়ে ভূমিতলে !
দর্পোদ্ধত মানবের অহঙ্কার-চূড়া,
ভেঙ্গে পড়ে তব ক্রীড়াচ্ছলে।"

* * * * *

৮

দূরে গেল রুদ্রভাব—কিন্তু জটাজূট,
দীপ্ত ক্রোধ লুপ্ত চক্রবালে !
শান্ত দিক্—শিবরূপ পুনঃ দিগম্বর,
বিভাসিল শশিকলা ভালে !
বহিল মরুৎ মন্দ মৃদ্গন্ধবহ,
মেদুর পরশ অঙ্গে ঢালে।

শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায় (কবিভূষণ।)

বৈঠকী।

"সাহিত্যে"র সেবায় ত ব্রতী হইলাম; এখন গোটা কয়েক কথা খোলসা করিয়া বলিয়া রাখিতে হইবে। খোলসা কথা কহিতে হইলেই সোজা বা সর্ব্বজনবোধ্য শব্দ যোজনা করিয়া মনের ভাব ব্যক্ত করিতে হইবে। অর্থাৎ পাঠক-পাঠিকাদিগের সহিত একটু বৈঠকী আলাপ করিয়া রাখিব।

* * * *

ইদানীং বাঙ্গালা-গদ্যের লিখনভঙ্গীর 'জাতি মারিবার' চেষ্টা বহুজনের দ্বারা বহুস্থানে হইতেছে। বিশিষ্টতা নষ্ট করিবার উদ্‌যোগ করিলেই জাতি মারার আয়োজন করা হয়; বিশিষ্টতার অপচয় ঘটাইতে পারিলেই জাতি মারা হয়। বাঙ্গালা গদ্য একেবারেই অপূর্ব্ব অর্থাৎ বাঙ্গালা দেশে পূর্ব্বে রসব্যঞ্জনার উদ্দেশ্যে গদ্যের প্রচলন এমন ভাবে ছিল না। মূল বাঙ্গালা সাহিত্য কাব্যপ্রধান সাহিত্য পদ্য ও পয়ারপূর্ণ সাহিত্য; পরন্তু ইংরেজী যুগের আধুনিক বাঙ্গালা-সাহিত্য গদ্যপ্রধান সাহিত্য। এই গদ্য-সাহিত্যের জাতি মারিবার চেষ্টা অধুনা বেশ সতেজে চলিতেছে।

* * * *

রাঢ়দেশের প্রাদেশিকতার উপরেই কি নূতন, কি পুরাতন, কি গদ্য, কি পদ্য বাঙ্গালার সকল সাহিত্যই সুবিন্যস্ত; কেন না বাঙ্গালার আদি কবিগণ, মনীষী—মেধাবী—প্রতিভাশালী পদ্য-গদ্য লেখকগণ সকলেই রাঢ়ের অধিবাসী। শূন্য পুরাণ হইতে ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল পর্য্যন্ত, কি বৈষ্ণব, কি শাক্ত, সকল শ্রেষ্ঠ কাব্যই রাঢ়ে লিখিত এবং রাঢ়ীয় কবিগণের দ্বারা রচিত। মনোহরসাহী ও রেণিটির কীর্ত্তনের সকল মহাজনীপদ ও গীতই রাঢ়ের প্রাদেশিকতায় পূর্ণ; অথচ এই কীর্ত্তনের পদাবলী সকল পঞ্চকোট হইতে মণিপুর পর্য্যন্ত বঙ্গের সর্ব্বত্র সদাই গীত হয় এবং সকল প্রদেশের কাব্যামোদী উহার রসাস্বাদন সমানভাবে করিয়া থাকেন। বৈষ্ণব কাব্য ও মহাজনী পদ বাঙ্গালার সাহিত্যকে সাবয়ব করিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে উহার জাতি ও ধর্ম্মের নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছে।

* * * *

কেবলই কি গৌড়ীয় বৈষ্ণবযুগের বঙ্গ-সাহিত্যের এই বিশিষ্টতা! কেরী—মার্শম্যান এবং ফোর্ট উইলিয়মের পণ্ডিতগণ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কে ...

কর্ম্মচারিবৃন্দের শিক্ষা সৌকর্য্যার্থে যে বাঙ্গালা গদ্যের উন্মেষ-সাধন করেন, তাহাও মূলে রাঢ়ের ছাঁচে ঢালা, রাঢ়ের পণ্ডিতগণের বিশিষ্টতার বিভায় সমুদ্ভাসিত। তাহার পর মৃত্যুঞ্জয়, তারাশঙ্কর, রামনারায়ণ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রামগতি, মদনমোহন, ঈশ্বরগুপ্ত প্রভৃতি যে বাঙ্গালা গদ্যের সম্প্রসারণ সাধন করেন, তাহাও ষোল আনা রাঢ়ের ছাঁচে ঢালা। ইহাঁদের রচিত শিশু-পাঠ্য পুস্তক সকল বঙ্গীয় শিক্ষাবিভাগের আনুকূল্যে বাঙ্গালার সকল বিদ্যালয়ে পঞ্চাশ বৎসরকাল অব্যাহত ভাবে পঠিত ও পাঠিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া ঈশ্বরগুপ্তের 'প্রভাকর' 'দৈনিক চন্দ্রিকা', 'সুলভ সমাচার' প্রভৃতি সমাচার ও সাময়িক পত্রের লেখার প্রভাবে রাঢ়ের গদ্য ও লিখনভঙ্গী বাঙ্গালার জনসাধারণের অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে।

* * * *

শেষ কথা, মাইকেল মধুসূদন, রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, বিহারী চক্রবর্ত্তী, এবং রবীন্দ্রনাথের সাড়ে পনর আনা অংশ কাব্যগ্রন্থ সকল রাঢ়ের আদর্শে লিখিত। আর ভূদেব, বঙ্কিম, রাজকৃষ্ণ, অক্ষয়কুমার দত্ত, অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রমুখ আধুনিক গদ্যলেখকগণ রাঢ়ের ছাঁচেই অপূর্ব্ব ও অতুল্য গদ্য-সাহিত্যের সৃষ্টি ও উন্নতি সাধন করিয়াছেন। 'সাধারণী', 'নব-বিভাকর', সোমপ্রকাশ, এবং সস্তা-সাপ্তাহিকের অগ্রণী "বঙ্গবাসী"র মারফতে ক্ষেত্রনাথ, ইন্দ্রনাথ অক্ষয়চন্দ্র ও যোগেন্দ্রচন্দ্র প্রমুখ মনস্বী লেখকগণ যে গদ্যের প্রচলন করিয়া গিয়াছেন, তাহা রাঢ়ের গদ্য এবং শ্রীহট্ট হইতে মালদহ পর্য্যন্ত বাঙ্গালার সর্ব্বজন-বোধ্য ও উপভোগ্য হইয়া আছে। ইহাই বাঙ্গালা গদ্যের এবং সাহিত্যের জাতি পরিচয়। মানুষের যেমন জাতি-বর্ণ-ধর্ম্ম আছে, ভাষারও তেমনি জাতি-বর্ণ-ধর্ম্ম আছে। এ তত্ত্ব পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে মার্কিণ ইঙ্গরসোল বনাম রেভারেণ্ড ওয়ার্ড বীচার বিতণ্ডায় সুব্যাখ্যাত হইয়াছিল। বীচার স্পষ্টই বলিয়াছিলেন যে, ইংরেজী ভাষার ধর্ম্ম খ্রীষ্টান; উহার প্রতিবাক্যে, প্রতিশব্দ যোজনায়, কাকু ও ব্যঞ্জনায় খৃষ্টান ধর্ম্ম ও সংস্কার ফুটিয়া বাহির হইতেছে। তুমি ইঙ্গরসোল নিজেকে নাস্তিক বলিয়া প্রকাশ করিলে হইবে কি? খৃষ্টানী সংস্কার তোমার ভাষায়, ভাবে অশনে-বসনে পরিস্ফুট। বীচারের এই সিদ্ধান্ত ইয়োরোপে এখন বিদ্বজ্জন-গ্রাহ্য, এ সম্বন্ধে অনেক পুস্তক পুস্তিকা ফ্রান্সে জর্ম্মণীতে এবং ইংলণ্ডে লিখিত ও প্রচারিত হইয়াছে। ভাষারও জাতি এবং ধর্ম্ম আছে।

* * * *

ফ্রান্সে, ভাষার জাতি এবং ধর্ম্ম রক্ষার জন্য 'আকাদামীর' পণ্ডিতগণ সদাই যেন উদ্‌গ্রীব হইয়া আছেন। ফরাসী গদ্যের সাধুতা রক্ষিত না হইলে ফরাসী পণ্ডিতগণ বিষম হৈ-চৈ বাধাইয়া দেন। ইংলণ্ডেও King's Englishএর পবিত্রতা বজায় রাখিবার জন্য চেষ্টার অভাব নাই। সকল স্বাধীন দেশে এবং স্বাধীন জাতির মধ্যে, জাতির সাহিত্যের শুদ্ধিরক্ষার জন্য আয়োজনের অভাব নাই। ফরাসী জাতি এ বিষয়ে বড়ই গোঁড়া, তাহারা লেখকগণকে একচুল এদিক ওদিক টলিতে দেয় না। বাঙ্গালার এই রাঢ়ীয় গদ্যের ব্যাপ্তি প্রায় সর্ব্বজনীন বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। পূর্ব্ববঙ্গের নবীনচন্দ্র ও কালীপ্রসন্ন ঘোষ-প্রমুখ মনস্বী লেখকগণও এই রাঢ়ীয় গদ্যের পোষকতা করিয়াছিলেন। বাঙ্গালার গদ্যের জাতি রাঢ়ীয়—উহার গুণ গৌড়ীয়; উহার ধর্ম্ম গৌড়ের 'শ্যাম শ্যামার ধর্ম্ম; উহার বর্ণ ব্রাহ্মণ; উহার কর্ম্ম লোকশিক্ষা ও ভাব প্রচার; উহার মূল বৌদ্ধ যুগে নিহিত।

* * * *

ভারতবর্ষের সকলদেশের প্রাদেশিক ভাষার উৎপত্তি এবং পুষ্টি বৌদ্ধ যুগেই হইয়াছিল। জনসাধারণেরমধ্যে ধর্ম্মকথার প্রচার ও ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যেই প্রাদেশিক ভাষা সকলের প্রচার ও বিশুদ্ধি সাধন হয়। স্বয়ং গৌতম বুদ্ধ পালি ভাষাকে অবলম্বন করেন। বাঙ্গালার সহজিয়া ধর্ম্মের কল্যাণে বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি এবং ব্যাপ্তি ঘটে। সিদ্ধাচার্য্যগণ এবং নাঢ় পণ্ডিতের শিষ্য সকল দোহা এবং পদাবলীর সাহায্যে সহজ ধর্ম্ম প্রচার করেন। দোহাগুলি চর্য্যাচর্য্য বিনিশ্চয়ের পদাবলী সকল প্রথমে "সন্ধ্যা" ভাষায় রচিত হইয়াছিল। মগধ এবং রাঢ়ের মধ্যস্থলের দেশকে "সন্ধি দেশ" বা মগধ ও বঙ্গের সন্ধিস্থলে অবস্থিত দেশ বলিয়া পরিচিত হইত। পঞ্চকোট, মানভুম, মুঙ্গের জেলার জমুই মহকুমার দক্ষিণাংশ এবং সাঁওতাল পরগণায় বৌদ্ধ যুগের সন্ধিদেশে অবস্থিত। এই সন্ধি ভূমির ভাষাকেই সহজিয়া পণ্ডিতগণ সন্ধ্যা ভাষা বলিতেন। গোড়ায় দোঁহাবলী সন্ধ্যাভাষায় রচিত হইত। কাহ্নু পণ্ডিত উহার সহিত "ব্রজবুলি" এবং রাঢ়ের ভাষা মিলাইয়া পদাবলী ও গীত রচনা করেন। কাহ্নুর গীত রাঢ়ে ও পঞ্চকোটে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। তাই রাঢ়ে প্রবচন প্রচলিত হয় যে, "কানু ছাড়া গীত নাই" অর্থাৎ কাহ্নু পণ্ডিত ছাড়া আর কে গীত রচনা করিতে পারে? কাহার গীতই বা সর্ব্বজনমনোরমা হইতে পারে? পরে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রভাব বৃদ্ধি হওয়াতে "কানু ছাড়া গীত নাই" এই প্রবচনে লোকে সাধারণতঃ বুঝিতে

লাগিল—শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া রসের গীত হইতেই পারে না। এই রাঢ়ীয় ভাষা হইতেই আধুনিক বাঙ্গালার উৎপত্তি। কেবল এইটুকুই নহে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রাধান্যকালে খাস গৌড়ের অর্থাৎ মালদহ এবং রাজসাহী জেলার পুরাতন মৈথিল সম্মিশ্রিত গৌড়ীয় ভাষার যোগ হয়। ইহাই আধুনিক বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি কথা।

* * * *

ইহার বর্ণ ব্রাহ্মণ—কানু পণ্ডিত, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, মুকুন্দ-রাম, ঘণরাম,—ভারতচন্দ্র পর্য্যন্ত সকল বড় কবি ও পদকর্ত্তা সবাই ব্রাহ্মণ। বাঙ্গালা-গদ্যের জন্মদাতা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রামনারায়ণ, রামগতি, মদন-মোহন প্রভৃতি সকলেই ব্রাহ্মণ। উহার ধাত্রী বঙ্কিমচন্দ্র ও ভূদেব, উভয়েই ব্রাহ্মণ। বৈদ্য এবং কায়স্থ কবি ও লেখকগন সবাই ব্রাহ্মণ ভাবাপন্ন, ব্রাহ্মণ সংস্কারে আচ্ছন্ন। অমন যে মাইকেল মধুসূদন, তাঁহার "মেঘনাদ" পাঠ করিলে মনে হয় না যে, উহা ব্রাহ্মণ্যসংস্কারের বিরোধী লেখকের লিখিত। সুতরাং বলিতে হয়, বাঙ্গালা ভাষার বর্ণ ব্রাহ্মণ; ঐ ভাষার ধর্ম্ম হিন্দু—বৌদ্ধ, সহজ, গৌড়ীয় বৈষ্ণব ও শাক্ত ধর্ম্মের সমবায়ে উৎপন্ন আধুনিক হিন্দু ধর্ম্ম। চণ্ডীদাস যাহার একজন মূল কবি, তাহার মধ্যে সহজসিদ্ধান্ত ওতপ্রোতোভাবে পরিব্যাপ্ত। তাহার উপর মুকুন্দরামের তন্ত্রোক্ত চণ্ডীর ধর্ম্ম আছে। শ্যামার মালসী এবং শ্যামের পদাবলী ছাড়া বাঙ্গালায় আর তেমন কি আছে! মূল যখন বৌদ্ধ এবং সহজ, তখন বাঙ্গালা ভাষার কর্ম্ম হইল লোকশিক্ষা, ভাব প্রচার ও তত্ত্বব্যাখ্যা। মুকুন্দরাম হইতে ভারতচন্দ্র পর্য্যন্ত,—এমন কি হেমচন্দ্র—নবীনচন্দ্র পর্য্যন্ত সকল কবির রচিত মহাকাব্যই লোক শিক্ষার এবং কথা প্রচার উদ্দেশ্যে প্রকাশিত। ভাষার জন্ম, ধর্ম্ম, বর্ণ, গুণ ও কর্ম্মের পরিচয় দিলাম।

* * * *

বাঙ্গালা ভাষার এই পরিচয়গত বিশিষ্টতার অপহ্নব যিনি বা যাঁহারা ঘটাইতে চেষ্টা করিবেন, আমরা তাঁহারই সহিত বিরোধ ঘটাইব। যত পার ভাষাকে সরল, প্রাঞ্জল কর, তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই। ইংলণ্ডে ফ্রিম্যান সাহেব স্যাক্সন ইংরেজি গদ্য প্রচলনের জন্য অদ্ভুত চেষ্টা করিয়াছিলেন। পরন্তু তিনি ইংরেজি ভাষার গড়নের এবং ছাঁদের উপর হস্তক্ষেপ করেন নাই। যে ছাঁদ King's English-এর পরিচায়ক, সে ছাঁদ ও ভঙ্গী ফ্রিম্যান সাহেব অক্ষুন্ন রাখিয়াছিলেন। আমরাও বলি, ঈশ্বরচন্দ্র এবং বঙ্কিমচন্দ্রের প্রদত্ত বাঙ্গালা

ভাষার ছাঁদ—রাঢ়ীয় রীতি—বাঙ্গালার বিশিষ্ট লেখক মাত্রকেই রক্ষা করিতে হইবে। ৺ সুরেশচন্দ্র এই বিশুদ্ধি রক্ষার পক্ষে কম যত্নশীল ছিলেন না। আমরা তাঁহার সেই প্রযত্নের ধারা অব্যাহত ও নিরাবিল ভাবে রক্ষা করিবার পক্ষে আমাদের ক্ষুদ্র শক্তি বিনিয়োগ করিতে ত্রুটি করিব না। মনস্বী শ্রীযুত বিপিন চন্দ্র পাল এ সম্বন্ধে কিছুকাল পূর্ব্বে "নারায়ণ" পত্রে যে সকল সন্দর্ভ নিবন্ধ লিখিয়া ছিলেন, আমরা তাহার প্রায় সবটারই সমর্থন করি। সোজা কথা এই যে, বাঙ্গালা ভাষার বিশিষ্টতা যাহাতে বিবুজন-গ্রাহ্য থাকে, সে পক্ষে যুক্তি তর্কের অবতারণা করিতে কখনই অবহেলা করিব না। ভাষার জাতি, ধর্ম্ম, বর্ণ এবং কর্ম্ম যাহাতে ঠিক থাকে, পূর্ব্বের ধারানুসারে অক্ষুণ্ণ থাকে, সে দিকে আমাদের স্থির দৃষ্টি থাকিবে। ধ্বংসবাদের প্রভাবে ভাষা ও ভাবগত জারজতার প্রাবল্যের দিনে এই সিদ্ধান্ত কথাটা স্পষ্ট বলিয়া রাখা প্রয়োজন বিবেচনা করিয়াই এত কথা কহিয়া রাখিলাম।

সহযোগী সাহিত্য।

অসুর সংহিতা।

আমাদের মন্বত্রি-বিষ্ণু-হারীত প্রমুখ অষ্টাদশ বা একবিংশ সংহিতা বা ধর্ম্মশাস্ত্র আছে। যে বিধিনিষেধের প্রচলন-প্রভাবে সমাজের সংহতি-শক্তি অব্যাহত এবং অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহাকেই সংহিতা বলে। যে শাস্ত্র মান্য করিয়া চলিলে গোষ্ঠীর ধৃতিশক্তি সুরক্ষিত হয়, তাহাই ধর্ম্ম-শাস্ত্র। ইংরেজিতে ইহাকে code বলে।

কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে ইরাক দেশের সুসানগরের পার্শ্বে একদল ফরাসী প্রত্ন-তত্ত্ববিদ্ মসিয়ে জ্যাক্স্-ডি-মর্গাণের তত্ত্বাবধানে এক অতি প্রাচীন স্তূপ খনন করিতে করিতে বাবিলন প্রদেশের সম্রাট্ হামুরাবির সময়কালের এক সংহিতার উদ্ধার করেন। ঐ বাবিলনীয় সংহিতা একখানি আট ফিট উচ্চ প্রস্তরখণ্ডের দুই দিকে উৎকীর্ণ ছিল। বলিয়া রাখা ভাল যে, বাবিলনে কাগজ, তাম্রফলক, ভূর্জ্জপত্র প্রভৃতির প্রচলন ছিল না। মাটির চাব্ড়ার উপর বা চতুষ্কোণ প্রস্তর ফলকের উপরে ছাপ মারিয়া বা কুঁদিয়া রাজাজ্ঞা, চুক্তিনামা প্রভৃতি লিখিত হইত। নিনেভে নগরের খননকালে স্যর হেনরী লেয়ার্ড এমন অনেক

লেখা-যুক্ত মাটির চাক্তি এবং প্রস্তরফলক উদ্ধার করিয়াছিলেন। বাবিলনে, মিশরে এবং অসুর বা আসুরীয় দেশে cuneiform বা নারাচ অক্ষরের প্রচলন ছিল। তীর-ধনুকের তীরের আকারে এবং তীরাকার সমবায়ে এই লেখার উৎপত্তি হইয়াছিল। মহাভারতে নিবাত-কবচ বধের বর্ণনায় এক স্থলে নারাচ অক্ষরের উল্লেখ আছে; তাই আমরা cuneiform শব্দের নারাচ-অক্ষর বলিয়া নির্দ্দেশ করিলাম।

বাবিলনের সম্রাট হামুরাবী খৃষ্টপূর্ব্ব ২১৩৩—২০৮১ পর্য্যন্ত বিরাজ করিয়াছিলেন। কাজেই বলিতে হয় এখন হইতে চারি হাজার বর্ষের পূর্ব্বে হামুরাবি জীবিত ছিলেন, এবং বাবিলন সাম্রাজ্য প্রবল ছিল। এই হামুরাবি-সংহিতা তাই অতি পুরাতন ও প্রাচীন বলিয়া মান্য। বিশেষতঃ হামুরাবির সংহিতা পাঠ করিলে মনে হয়, তিনি পূর্ব্বপ্রচলিত বিধি-নিষেধ সকল একত্র করিয়া তাহারই প্রচার করিয়াছিলেন। কাজেই অনুমান করিতে হয় যে, হামুরাবির সময়ের বহু পূর্ব্ব হইতে বাবিলনের সমাজ সভ্য হইয়াছিল এবং ঐ প্রদেশের লোকে বিধিনিষেধ মান্য করিয়া চলিতে শিক্ষা করিয়াছিল। হামুরাবির সংগৃহীত বিধিনিষেধ সকল পাঠ করিলে আমাদের মন্বত্রি শাস্ত্রকারগণের প্রচারিত অনেক বিধিনিষেধের মূল পাওয়া যায়। প্রয়োজন হইলে সে আলোচনা পরে করিতে পারি।

আসিরীয় বা অসুর সংহিতা।

জর্ম্মণ যুদ্ধের পূর্ব্বে একদল জর্ম্মণপ্রত্নতত্ত্ববিদ্ পুরাতন আসিরিয়া প্রদেশের কালে-শরঘটের নিকট আদিম অসুর নগরের ভগ্নস্তূপ সকল খনন করিতেছিলেন। যুদ্ধ বাধিয়া উঠায় এবং ইংরেজ সৈন্য ঐ পথে অগ্রসর হওয়ায় তাঁহারা তাঁহাদের কার্য্য পরিসমাপ্ত না করিয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য হন। তথাপি তাঁহারা একটা অপূর্ব্ব সামগ্রীর আবিষ্কার করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহারা অসুর বা আসিরীয় জাতির একখানা সংহিতার খণ্ডাংশ আবিষ্কার করিয়াছেন। অসুর বা আসিরীয় জাতি অতি রণদুর্ম্মদ ও দুর্দ্ধর্ষ জাতি ছিল; তাহারা বাবিলনের উত্তরাংশে, পার্ব্বত্যপ্রদেশে বাস করিত। "হামুরাবি সংহিতা" এবং "অসুর-সংহিতা" এই উভয়ের তুলনায় সমালোচনা করিলে বুঝা যায় বাবিলন অধিকতর সভ্য ছিল। তাই অনেকে অনুমান করেন, এই অসুরসংহিতা হামুরাবি সংহিতা হইতে অধিকতর পুরাতন।

একটা কথা এইখানে বলিয়া রাখিব। কালে-শরঘটের খননের ফলে জর্ম্মণগণ পুরাতন অসুরদিগের ধর্ম্ম-গ্রন্থের আবিষ্কার করেন। অসুর নগরে একটা প্রকাণ্ড গ্রন্থশালা ছিল, তাহারই অংশ-বিশেষ হইতে ছয় খণ্ড ধর্ম্মগ্রন্থ বাহির হইয়াছে। জর্ম্মণ পণ্ডিত ডাক্তার এবেলিঙ্‌ যে পাঠোদ্ধার করিয়াছেন, তাহা হইতে বুঝা যায়—আমাদের ঋক্‌বেদের সহিত অসুরধর্ম্মগ্রন্থের অনেকটা সাম্য আছে। এমন কি এবেলিঙ্‌ সাহেবের ব্যাখ্যা অনুসারে এখন বেদের অনেক দুর্ব্বোধ্য কথার নূতন অর্থ বাহির হইতেছে। আসিরিয়া, বাবিলন, ইরাণ ও তাতার দেশের সহিত পুরাতন ভারতবর্ষের যে ভাবগত ও ভাষাগত খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল, তাহা ক্রমে প্রকাশ পাইতেছে। জেন্দ, অসুর ও বাবিলনীয় ভাষার সহিত যে বৈদিক সংস্কৃতের সৌসাদৃশ্য অনেকটা আছে, তাহাও ডাক্তার এবেলিঙ্‌ অবিসংবাদিতরূপে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। পঁয়ষট্টি বৎসর পূর্ব্বে লেয়ার্ড সাহেব নিনেভে খননের সময়ে অসুর-বনপাল রাজার গ্রন্থশালার আবিষ্কার করেন; তাহারপর এই সকল আবিষ্কার হইয়াছে এবং হইতেছে। তুলনায় সমালোচনা করিয়া ইরোরোপের বুধগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের অনেক আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি এবং ধর্ম্মপদ্ধতির মূল অসুর এবং বাবিলন দেশে খোঁজ করিলে পাওয়া যাইবে। এই সকল দেশের ও জাতির সহিত ভারতবর্ষের আর্য্যগণের খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল। একটা উদাহরণ দিব,—

অবগুণ্ঠন বা ঘোম্‌টা।

আমাদের ভারতবর্ষে বৈদিক বা পৌরাণিক কোন যুগেই অবগুণ্ঠনের প্রচলন ছিল না। এখনও মহারাষ্ট্রে, মালাবারে, ত্রিবাঙ্কুড়ে, কঙ্কনে, কেরলে, দ্রবিড়ে-দ্রাবিড়ে—দাক্ষিণাত্যের কোন অংশেই নাই। সীতা ঘোম্‌টা টানিয়া শ্রীরামচন্দ্রের সহিত বনগমন করেন নাই, ঘোম্‌টা টানিয়া রাবণকে ভিক্ষা দেন নাই। দ্রৌপদীর ঘোম্‌টার উল্লেখ একেবারেই নাই; দময়ন্তী অবগুণ্ঠনবতী হইয়া স্বয়ম্বরসভায় ঘুরিয়া বেড়ান নাই। রুক্মিণী ও সুভদ্রাহরণে ঘোমটার উল্লেখ নাই। বেদে পুরাণে মহাকাব্যে, নাটকে, কুত্রাপি অবগুণ্ঠনের উল্লেখ পাইবে না। উমা শিবের সেবা ঘোম্‌টা টানিয়া করিতেন না। পুরাতন বৌদ্ধ মূর্ত্তি সকল যাহা আবিষ্কৃত হইয়াছে বা হইতেছে, তাহাতেও খাঁটি অবগুণ্ঠন দেখিতে পাওয়া যায় না। অথচ এখন উত্তর ভারতবর্ষে ঘোম্‌টার খুব প্রচলন রহিয়াছে। ইহার মূল কোথায়? নবাবিষ্কৃত অসুরসংহিতায় দেখিতে পাইলাম যে, নাগরিকবিশেষের পত্নী এবং কন্যা, ভগিনী এবং পিতৃস্বসা প্রভৃতি অবগুণ্ঠিতা হইয়া রাজপথে বাহির হইবেন। অবগুণ্ঠন দেখিলেই বুঝিতে হইবে যে, অবগুণ্ঠনবতী নারী কুলমহিলা, গৃহস্থের অধিকৃতা। তাহাদের প্রতি কেহ দৃষ্টিপাত করিবে না, তাহাদের অঙ্গে কেহ হস্তার্পণ করিবে না। যাহারা দেবদাসী (Hiero dule), যাহারা বারমুখী নর্ত্তকী বা বাঁদী (Harlot) কেবল তাহারাই মাথার কাপড় খুলিয়া হাটে বাজারে ঘুরিয়া বেড়াইতে পারিবে।

অধিকন্তু যদি কোন দেবদাসী বারমুখী, কিম্বা দাসী বা বাঁদী ঘোমটা টানিয়া গৃহস্থের কুলকন্যার ন্যায় রাজমার্গে বাহির হয়, তবে তাহাকে দণ্ডিত হইতে হইবে। একদল বাঁদী বা দাসী সুরা বা পানীয় হস্তে চলিত, তাহারা তৃষ্ণার্ত্তকে পানীয় দিত। ইহাদের নাম ছিল আর-সুরা, আর-হুরা বা আর-হোরী। অপ্সরা শব্দের সহিত আর্-সুরা বা আর্-হুরার একটা আকারগত সাম্য নাহি কি? কাজেই বলিতে হয় যে, প্রায় পাঁচহাজার বৎসর পূর্ব্বে অসুরদিগের মধ্যে, বাবিলন রাজ্যে অবগুণ্ঠনের প্রচলন ছিল। ইস্লাম ধর্ম্মের প্রাবল্যের পরে মুসলমানগণ উহাকে অবলম্বন করেন এবং পাঠান অভিযানের পরে ভারতবর্ষে উহার প্রথম প্রচলন হয়। এই অসুরসংহিতার বিধি মান্য করিয়া চলিতেন বলিয়া, পরম্পরাগত প্রচলন অনুসারে এই বিধি পশ্চিম এশিয়ায় সর্ব্বজনমান্য ছিল বলিয়া, পদস্থ মুসলমানগণ—পাঠানগণ অবগুণ্ঠনবতী হিন্দুনারীর উপর অত্যাচার উৎপীড়ন করিতেন না। আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যেই পঞ্জাবে এবং যুক্ত-প্রদেশে নারী সকল অবগুণ্ঠনবতী হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। "পদ্মাবৎ" মহা-কাব্যে একটা মজার কথা আছে। পাঠান আলাউদ্দীন যখন মুকুরে পদ্মিনী বা পদ্মাবতীর প্রতিচ্ছবি দেখিলেন, তখন তিনি অবগুণ্ঠনবতী ছিলেন না। অমনি আলাউদ্দীন দাবী করিলেন যে, আমাকে পদ্মিনী দিতেই হইবে; উহার ত ঘোমটা নাই, ও যে বাঁদী। আলাউদ্দীনের এই উক্তি শুনিয়া ভীমসিংহ প্রমুখ রাজপুতগণ ক্রোধে অধীর হইয়াছিলেন বটে; পরন্তু নবাবিষ্কৃত এই অসুরসংহি-তার বিধান পাঠ করিয়া এখন বুঝিতেছি যে, আসুরিক নীতি অনুসারে পাঠান বিজয়ী নিতান্ত অবৈধ প্রস্তাব করেন নাই। "পদ্মাবৎ" মহাকাব্য পাঠ করিলে বুঝা যায়, তখনও ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র অবগুণ্ঠনের প্রচলন হয় নাই।

অসুরসংহিতার যে সকল শ্লোকের উদ্ধার করিয়া তাহার ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে উশনা, অঙ্গিরা, আপস্তম্ব প্রভৃতি অনেক সংহিতার শ্লোক মনে পড়ে,—মনে হয় যেন ওগুলি সংস্কৃত শ্লোকেরই ইংরেজি অনুবাদ। ভারতবর্ষের মন্বাদি ধর্ম্মসংহিতার সহিত হামুরাবির ও অসুর সংহি-তার সৌসাদৃশ্য দেখিয়া সত্যই আমরা চমৎকৃত এবং বিস্মিত হইয়াছি। পত্নী এবং কন্যা স্বামী এবং জনকের সম্পত্তি বলিয়া অসুরসংহিতায় গ্রাহ্য হইয়াছে। অসুরসংহিতা পাঠ করিলে মনে হয়, লাম্পট্যদোষ অসুরদিগের মধ্যে প্রবল ছিল; বোধ হয় নারীর সংখ্যা অসুরজাতির মধ্যে নর অপেক্ষা অল্পই ছিল। ব্যভিচারের এত দণ্ড এবং ব্যভিচারের এত আকার ইদানীং ত আর দেখিতে পাই না। এই লাম্পট্যদোষে এখনও ইরাক, ইরাণ আরবিস্তানের অধিবাসিবর্গ দূষিত ও কলুষিত বলিয়া মনে হয়। এখনও বোখারার বাজারে বাঁদী বিকায়, এবং বাঁদী খরিদ এক উৎকট ব্যাপার!

আমরা American Oriental Society বা মার্কিণ প্রাচ্য সমিতির একখানি জর্ণ্যাল অবলম্বনে অসুরসংহিতার একটু পরিচয় দিলাম।

বিজ্ঞাপন।

ফাল্গুন-চৈত্রের "সাহিত্য" বাহির হইল। ৺ সুরেশচন্দ্র সমাজপতির ঋণ পরিশোধ হইল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাঁহার চিহ্নিত এবং নির্দ্দিষ্ট প্রবন্ধ-নিবন্ধ সকল বাহির করিয়া, পূর্ব্বপ্রকাশিত খণ্ডিত প্রবন্ধসকলের শেষ অংশ সংগ্রহ করিয়া ছাপিয়া গতবর্ষের "সাহিত্য" পূর্ণ করিয়া দিয়াছি।

বৈশাখের "সাহিত্য" পুরাদস্তুর আমাদের সম্পাদিত হইবে। বৈশাখ এবং জ্যৈষ্ঠের "সাহিত্য" প্রকাশ করিতে একটু বিলম্ব ঘটিবেই। পরে আষাঢ়ের সংখ্যা হইতে আমরা নির্দ্দিষ্ট দিনে "সাহিত্য" বাহির করিতে প্রযত্ন করিব।

"সাহিত্যের" আকার নববর্ষেও পরিবর্ত্তিত হইবে না। "সাহিত্যের" পুরাতন লেখক এবং পৃষ্ঠপোষকগণ উহার পুরাতন আকার বজায় রাখিতে অনুরোধ করিয়াছেন। অতঃপর প্রতিমাসের "সাহিত্য" অবয়বে ডবল ডিমাই পাঁচ ফর্ম্মার কম হইবে না অর্থাৎ প্রতিমাসে আশীপৃষ্ঠা বাহির হইবে। প্রয়োজন হইলে ইহার অধিকও দিব। তাই "সাহিত্যের বার্ষিক মূল্য, সহরে ও মফস্বলে

সাড়ে চারি টাকা।

ধার্য্য করিলাম। আশীপৃষ্ঠাপূর্ণ এক এক সংখ্যা বাহির করিতে হরে-দরে মোটের উপর প্রতিখণ্ডে ছয় আনা খরচা পড়িবেই; কাগজের মূল্য আরও বাড়িলে আট আনার কমে হইবে না। প্রতি গ্রাহককে বারোমাসে বারো খণ্ড "সাহিত্য" যোগাইতে আমাদের সাড়ে চারিটাকা খরচা পড়িবে। আমরা গ্রাহকগণের নিকট এই খরচার টাকা যাচঞা করিতেছি। বিজ্ঞাপনের আয় হইতে কোন ক্রমে ৺ সুরেশচন্দ্রের বিধবা জননী ও বিধবা পত্নীর মাসিক বৃত্তি যোগাইবার চেষ্টা করিব। আমরা সাহিত্য প্রকাশ করিয়া লাভবান্ হইতে চাহি না, প্রত্যাশাও করি না। গ্রাহকগণের আনুকূল্যে যাহাতে সুরেশচন্দ্রের বড় সাধের

"সাহিত্য" বজায় থাকে, বিদ্বজ্জন-সমাদৃত হয় এবং তাহার জননী ও পত্নীর মাসিক বৃত্তি দিতে পারি, আমরা কেবল তাহারই জন্য যত্নশীল হইব।

গ্রাহকগণ দয়া করিয়া—

৫৬ নং সীতারামঘোষের ষ্ট্রীট

'নায়ক' বা 'সাহিত্য' আফিসে তাঁহাদের অভিমত পত্রের দ্বারা সত্বর জ্ঞাপন করিলে আমরা বৈশাখের সংখ্যা V. P. করিয়া তাঁহাদের নিকট পাঠাইব; অথবা অগ্রিম দেয় বার্ষিক মূল্য সাড়ে চারি টাকা ডাকযোগে বা কোন মানুষের দ্বারা পাঠাইয়া দিলে অধিকতর বাধিত এবং উপকৃত হইব! তবে গ্রাহকগণ স্মরণ রাখিবেন যে, তাঁহাদের পত্র না পাইলে আমরা V. P. করিব। 'মৌনং সম্মতিলক্ষণং' মহাবাক্যানুসারে বুঝিব, তাঁহারা গ্রাহক হইবেন। আশা আছে—সাহিত্যানুরাগী বাঙ্গালার বিদ্বজ্জনসমাজ এ পক্ষে কৃপণতা করিবেন না।

'বঙ্গদর্শন' সম্বন্ধে আমাদের সহিত কোন ব্যবস্থা হয় নাই। যে সকল গ্রাহক 'বঙ্গদর্শনের' জন্য টাকা অগ্রিম দিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন যে, ৫নং রামনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের লেন, কলিকাতার ঠিকানায় ব্যারিষ্টার এ,কে, ঘোষ মহাশয়ের নিকট পত্র লিখিলে ঐ সম্বন্ধে সমস্ত জ্ঞাত হইতে পারিবেন। তবে আমরা যতদূর জানি শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় 'বঙ্গদর্শন' ছাপাইবার ভার লইয়া বোলপুরে তাঁহাদের প্রেসে ছাপাইবার ব্যবস্থা করিতেছেন। বোধ হয় শীঘ্র ছাপা শেষ হইবে, এবং আপনাদের নিকট পাঠাইবার ব্যবস্থা করিবেন।

কর্ম্মকর্ত্তা—সাহিত্য।
৫৬নং সীতারামঘোষের ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

৫৬নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা "তারা প্রেস" হইতে
শ্রীশশধর ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

REG. No. C. 58

